ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

Ebong Prantik

এবং প্রান্তিক

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
Vol. 8th Issue 17th, May, 2021

সম্পর্ক

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
Vol. 8th Issue 17th, May, 2021

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 8th Issue 17th, May 2021, Rs. 650/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৮ম বর্ষ ও ১৭ তম সংখ্যা
৩১ মে, ২০২১

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৬৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী,

ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. মনোজ মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক

ড. আশিস রায়

সহ-সম্পাদক

ড. টুম্পা রায়

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজন্তা বিশ্বাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. চন্দন আনোয়ার (নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

ড. বিনায়ক রায় (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ফাহমিদা সুলতানা তানজী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. মৃন্ময় প্রামাণিক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ইনতাজ আলী (নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102

Ph. No. : 9804923182

E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

ষাট-সত্তরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি

সেলিম বক্স মন্ডল ১৩

আত্মদর্শী ফেইড্রা : নিমগ্ন বীক্ষণ

ফাহমিদা সুলতানা তানজী ২১

বাংলা নাটকে আধুনিকতা : মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু

অনির্বাণ সাহু ৩৩

দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়ন এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর চারটি ছোটগল্প

হাসনারা খাতুন ৪১

গল্প, উনিশ শতক এবং ছোটোগল্পের সম্পর্ক

সারমিন রহমান ৫০

মৃণাল সেনের 'খারিজ' : চাকর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির
সম্পর্কের বাস্তব চিত্রায়ণ

অলোক বিশ্বাস ৮০

জল সংস্কৃতিঃ প্রসঙ্গ কোচরাজবংশী ব্রত

কৃষ্ণকান্ত রায় ৮৯

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ : মানবধর্ম ও ঔপনিষদিক সম্পর্কের আলোকে

অজয় কুমার দাস ১০১

আদিম : নতুন সম্পর্কের আখ্যান

রচনা রায় ১২১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

আকাশ বিশ্বাস ১২৯

নাড়ির টান: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে সম্পর্কের এক আমোঘ বন্ধন

সোমা দাস (চৌধুরী) ১৩৬

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস : দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন

অচিন্ত্য দে ১৪৪

রাজকৃষ্ণ রায় : নাট্যকার ও থিয়েটার মালিক

নিরুপম ব্যানার্জী ১৫৩

রবির সত্য, সত্যর রবি : রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের পারস্পরিক
সম্পর্কের খতিয়ান
স্বরূপ দত্ত ১৬০
বাংলায় বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নরহরি
সরকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের সম্পর্ক
পুরঞ্জয় তন্তুবায় ১৬৯
আলোক সরকারের কবিতা ও কাব্যভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের
ভিত্তিতে কবির বিশিষ্টতার পর্যালোচনা
শৌভিক পাল ১৯১
বাংলা শিশু সাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্ব
সুমন্ত চন্দ ২০৬
মা ও সন্তান সম্পর্ক : প্রসঙ্গ মনোজ মিত্রের নাটক
চন্দন কুমার সাউ ২১৬
দুই বিশ্ব নাগরিক এবং তাঁদের শিক্ষা ভাবনা পারস্পরিকতা ও
প্রতি তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই
পঞ্চানন দেওয়াশী ২২৮
প্রচলিত বাংলা প্রাইমার ও মুসলমানি বাংলা প্রাইমার : সম্পর্কের (অ)মিল
রাকিব ২৪০
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বনাম স্থানীয়ঃ পারস্পারিক সম্পর্ক ও
আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস
সঙ্ঘমিত্রা দাস ২৫১
বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ
অহিন রায়চৌধুরী ২৬০
‘অমৃত’ পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের সাথে সমকালের বিশিষ্ট মনীষীগণের সম্পর্ক
সন্ধ্যা মন্ডল ২৭১
দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকসংস্কৃতিতে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা,
প্রবাদের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক
ধীমান মণ্ডল ২৮৪

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ভাবনা
রেখা মণ্ডল ২৯৪
লোকসংস্কৃতির আলোয় লৌকিক দেবদেবী, পার্বণ-গ্রামীণ মেলা,
টেরাকোটা শিল্প : পারস্পারিক সম্পর্ক ভিত্তিক আলোচনা
জয়ন্ত মণ্ডল ৩০৫
সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক
জয়দেব বেরা ৩১৬
কুসুমকুমারী দাস : অধ্যাত্মসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত এক কবি
উত্তম বিশ্বাস ৩৩০
ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা
কস্তুরী কর ৩৩৮
সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রান্তিক জীবন-সম্পর্কের অনন্য আখ্যান
প্রসেনজিৎ রায় ৩৫১
সম্পর্কের উত্তরণে পাঞ্চালী যখন পাণ্ডবপ্রিয়া
সৌমিতা মুখার্জ্জী ৩৬০
কালচেতনার নিরিখে আধুনিক বাংলা কবিতা : বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়
সীমা পুরকাইত ৩৭২
বাংলায় ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৯৩): ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ৩৯১
জীবন-দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও সম্পর্কের পরিণতি: জয় গোস্বামীর
'শয্যাগত' অবলম্বনে
প্রতিম দত্ত ৪০১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাশ্চাত্ত্য সম্পর্ক
সিদ্ধার্থ ঘোষ ৪১০
উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ ও ইনডেনচার সিস্টেম : নারাচ
উপন্যাসের আলোকে
অসীম কুমার মৃধা ৪১৭
দেশভাগ ও স্বদেশপ্রেমের আলোকে সমরেশ মজুমদারের অনুপ্রবেশ
আবদুল্লা রহমান ৪২৫

সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতঃ মন্দাক্রান্তা সেনের ‘ঝাঁপতাল’
শম্পা সিনহা বসু ৪৩৮
সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারী
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৪৪৫
আদিবাসী জীবনে জীবিকা ও গানের দ্বিরালাপ
চন্দনা সাহা ৪৫৪
কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুর ও বৈষ্ণব পদাবলী :
একটি তুলনামূলক আলোচনা
ওম প্রকাশ সিংহদেও ৪৬২
‘কবি’র লোকসংস্কৃতিঃ একটি নিবিড় অনুধ্যান
অসীম হালদার ৪৬৯
জগদীশ গুপ্তর 'অরূপের রাস' : Fetishism বা
'বস্তুকাম' সম্পর্কের রসায়ন
শান্তনু দলাই ৪৮৫
দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিপর্যয়
প্রহ্লাদ রায় ৪৯৫
দেশভাগ: দ্বি-জাতি সম্পর্ক-একটি পর্যালোচনা
পায়েল নন্দী ৫১৪
দ্রবময়ীর সম্পর্ক
শর্মিষ্ঠা ঘোষ ৫২১
নাচনী : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে
অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী ৫৩১
প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত কালপত্র-পত্রিকার
সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পর্যালোচনা
শুভ্র সরকার ৫৩৮
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধারণ বাঙালি পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক
গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৪
রবীন্দ্রভাবনায় কালিদাসের সাহিত্য কৃতির সম্পর্ক অনুসন্ধান
সুকন্যা সরকার ৫৫৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে সম্পর্কের জটিল জাল
ললিতা রায় ৫৬১

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া সম্পর্ক
শ্রেয়া মণ্ডল ৫৬৯

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রযুক্তিগত পরিষেবার চিত্র: একটি তুলনামূলক আলোচনা
হীরক ঘোষ
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ৫৭৯

মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ : একটি নারীবাদী পর্যালোচনা
সৌতি বসু ৫৯০

সেক্স, পর্নোগ্রাফী ও বাঙালীর যৌনতা : একটি সামাজিক মূল্যায়ন
উৎকলিকা সাহু ৬০৫

সবুজ বিপ্লব ও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা : পারস্পরিক সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
অঞ্জন ঘোষ ৬১৯

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘কিনু গোয়ালার গলি’ ও ‘সুধার শহর’ : সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা
সুব্রত পাল ৬২৬

লোকশিক্ষা ও টুসু গান
সুমন্ত মন্ডল ৬৩৪

মহিয়সী অঘোরকামিনী : নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল দূত
দীপংকর বিশ্বাস ৬৪৪

A study on Indian Culture in South East Asia under the Shailendra Dynasty
Ganesh Das ৬৬১

Conditions and Requirements of Marrital Relationship in The Society of Kathasaritsagara
Suhrid Chakraborty ৬৬৮

Dalit Votebank and a New face of Electoral politics in
India: A Case Study of West Bengal
Avishek Biswas ৬৭৫
Sunil Ganguly's *East West* and V.S. Naipaul's *A House for Mr. Biswas*: Relatedness in the Literatures of
Partition and Diaspora
Tamali Neogi ৬৮২
REFLECTION OR REFRACTION: History and
Biography in Indian Cinema
Somshankar Ray ৬৯৯
Introspecting the Relation between Ethics and
Politics: Key Concerns and Future Ahead
Kunal Debnath
Souvik Chatterjee ৭১০
Significance of the Basics: Charlie Chaplin and
the Culinary World
Dr. Ajanta Biswas
Ritaja Mukherjee ৭২০
Study on Personality Profile of Selected Girl Students
Amit Dey
Susanta Sarkar ৭২৯

সম্পাদকীয়

টান যে সবসময় টান টান থাকে তা নয়। উত্তেজনার সঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাবও থাকে। পাওয়া না পাওয়ার সাথে ভুল বোঝাবুঝি। একটু মনোমালিন্য। যাই হোক, যেমন ভাবেই হোক যেখানে খুশি হোক। সব কিছুর সাথে একটি যোগসূত্র আছে। সেটা হোকনা কোনো মধুর অথবা বেদনাতুর। নাইবা রইলো কোনো রোমন্থনকারী স্মৃতি, অথবা ভালোবাসার আবেগ। কিন্তু তারপরেও খুঁজলে যেটা পাওয়া যাবে, সেটা সম্পর্ক। এই ‘সম্পর্ক’কেই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এবারের সংখ্যায়।

ষাট-সত্তরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি

সেলিম বক্স মন্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানা বৈপরীত্যময় ঘটনারাজির সমাবেশে ষাট-সত্তরের দশক গুরুত্বপূর্ণ। 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দ্বিধা-ত্রিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের সূচনা হয়েছিল। আবার মুক্তি সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আশা ও হতাশা, আনন্দ ও বিষাদে সত্তর দশক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ছিল। উত্তাল ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অনেক ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসের কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ষাট-সত্তর দশকের উপন্যাসের সেই প্রবণতা, গতি-প্রকৃতি তুলে ধরাই প্রয়াস রয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।*

মূল শব্দ : *ষাট-সত্তরের দশক, প্রতিবাদী লেখক, হাই পেড লেখক, প্রগতিবাদী লেখক, শিল্পীর স্বাধীনতা, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ।*

মূল আলোচনা

শিল্প সাহিত্যচর্চার দশকওয়ারি বিন্যাস যেমন সবসময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়না, তেমনি তা স্বয়ং সম্পূর্ণও হতে পারে না। অধ্যাপক গোপিকানাথ রায় চৌধুরী বলেছেন-

> *"সাহিত্যের কোন বিশেষ কাল পর্বকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই খন্ডিত অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার আলোচনা কিছুটা জটিল ও দুরূহ প্রয়াস। সাহিত্য এক অখন্ডতার প্রবাহমান ধারা। কাব্য বা কথা সাহিত্য যাই হোক না কেন; তার কোন বিশেষ পর্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। পূর্বযুগের সঞ্চিত ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য উত্তরকালের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এক যুগের চিন্তা উপলব্ধি ও শিল্পরীতি অন্যযুগের সৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে একাকার হয়ে এক অখন্ড প্রবাহের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।"*
>
> *(গোপিকানাথ রায় চৌধুরী-'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', পৃ-১৪)*

তৎসত্ত্বেও বিদ্যায়তনিক চর্চায় সময়ের নিরিখে এই বিন্যাস চলমান। শিল্পসাহিত্য চর্চায় সমাজ প্রেক্ষাপট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পসাহিত্য পরিবর্তিত হয় দেশ-কাল-সমাজের নানা ঘাত প্রতিঘাতে। উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। 'উপন্যাস'- মানব জীবনের গদ্য মহাকাব্য। ঔপন্যাসিক যখন গদ্য মহাকাব্য রচনা করেন, তখন তিনি তাঁর দেশ-কাল-সমাজ অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান কুড়োন। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন সমাজ জীবনের নরনারীর জীবনচিত্র আঁকলে বা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনার হুবহু বর্ণনা করলে বা তথ্যের বর্ণনা নিখুঁত করলেই যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পাওয়া যায়না। তার জন্য প্রয়োজন হয় জীবনকে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির, যা আসলে শিল্পীর জীবনবোধ। এই বিশেষ জীবনবোধের জন্যই শিল্পীর শিল্প বিশ্বজনীন মূল্য পায়। এক্ষণে ষাট-সত্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল বা সেগুলির প্রবণতা কেমন ছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভাঙা বাংলার ষাট-সত্তর দশক ছিল জোয়ার-ভাঁটার দশক। এক বিশেষ কালপর্ব। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানা বৈপরীত্যময় ঘটনারাজীর সমাবেশে ষাট-সত্তরের দশক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ রক্তপাতহীন দ্বিধা বিভক্ত স্বাধীনতার স্বাদ অনেকের কাছে 'ঝুটা' মনে হল। 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ারে ভাঙা বাংলা টালমাটাল। খাদ্য সঙ্কট তীব্র। এরই পাশাপাশি ছিল নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ দিয়ে যে ষাটের দশকের সূচনা হয়েছিল, সেই দশকই এগিয়ে গিয়ে দেখল দ্বিধা-ত্রিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, দেখল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন। ষাটের দশকেই পরপর দুবার ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে বিধানসভার নির্বাচন হল-ভাঙলো জাতীয় কংগ্রেস, তৈরী হল বাংলা কংগ্রেস। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বেও মিলিত যুক্তফ্রন্ট সরকার(প্রথম ও দ্বিতীয়) পতন আবার পতন আবার রাষ্ট্রপতি শাসন। হাজার হাজার মেধামী ছাত্রের চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। যুব সন্ত্রাস-আন্দোলন রাষ্ট্রপতি শাসন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের উত্তাল জনজোয়ার জনসংগ্রাম যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এতদিনকার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার গুণগত পার্থক্য গুলিও। যাইহোক বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে ষাটের দশক সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গিয়ে রেখে গেছে পদসঞ্চার। যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতি শাসন দিয়েই শুরু হল সত্তর দশক। সত্তর দশক অগ্ন্যুদগীরণের দশক। কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতন ঘটিয়ে জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠা। চালু হল মিসা আইন, জারি হল জরুরী অবস্থা। সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নকশালবাড়ি আন্দোলন। জোতদারদের কবল থেকে উদ্ধার করা জমিতে ভূমিহীন কৃষকেরা একদিকে যেমন ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলেছে তেমনিভাবে করেছে লড়াই-সংগ্রাম। এসবের পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে আশা-নিরাশার স্রোত, লড়াই-প্রতিলড়াইয়ের স্রোত। কোথাও বা 'তোমার নাম, আমার নাম ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' বা 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা'র আদর্শকে সামনে রেখে স্পন্দিত বুকে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন। আবার এই স্বপ্ন নিয়ে চলল ভুল বোঝাবুঝি এবং শাসক শ্রেনীর ষড়যন্ত্র। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেখা গেল ভ্রাতৃবধের আবহাওয়া. বাংলা দেখল নারকীয় গণহত্যালীলা। এরপর নকশালবাড়ির আন্দোলনের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের (চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায় চৌধুরী) মৃত্যুতে নকশালবাড়ির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসলো। ১৯৭৭ নির্বাচনের পর বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটল।

ষাটের দশক ছিল রাজপথে উত্তাল ছাত্র-যুবক, কলকারখানা ও মাঠের বীর সেনানীদের রক্তঝরানো গণ আন্দোলনের সংগ্রামী জীবনের উজ্জ্বল দশক। আর এই দশকে যে রক্তবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল তাই সত্তর দশকে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। অগ্ন্যুদগীরণে, মুক্তি সংগ্রামে, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে, আশা ও হতাশায়, আনন্দ ও বিষাদে সত্তর দশক ছিল বাংলার বুকে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দশক। ষাট-সত্তরের দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে ঔপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাসের উপাদান কুড়িয়েছেন, দলিলায়িত করে উপন্যাসের ফ্রেম বন্দী করেছেন।

১৯৩৬ এ 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কার্যক্রম, তদুপরি '৪৩ এর মন্বন্তরের সেবাকার্যে ঐক্যবদ্ধভাবে চলার প্রতিশ্রুতি প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। সমাজ বাস্তবতার দর্শন সবার গ্রহণের বস্তু হয়ে ওঠার চারের দশকের গল্প উপন্যাসে মার্কসীয় ভাবনার অনুসরণ একটা স্পষ্ট লক্ষ্য প্রকৃতি ধর্ম হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট নেতা পূরনচাঁদ যোশী সমকালীন সমাজ বাস্তবতাধর্মী রচনা চর্চা করতে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদেরকে অনুরোধ করেন। কলম ধরেন গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু,

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ষাটের-সত্তরের দশকের এই ধারা হয়েছে দ্রুত বেগবান। লিখেছেন- তপোবিজয় ঘোষ, স্বর্ণ মিত্র(উৎপলেন্দু চক্রবর্তী), অসীম রায়, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, গুণময় মান্না, শৈবাল মিত্র, কিন্নর রায় প্রমুখ রচনাকারেরা।

১৯৬২ 'দেশ' পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামক একটি কলম প্রকাশিত হতো। সেখানে আসলে শিল্পীর স্বাধীনতার নামে অবাধ যৌনাচার ও অরণ্যচারী জীবনের মন্ত্রে পারদর্শিতার কথা বলেছে। পাশাপাশি এই একই সময় থেকে 'পরিচয়' পত্রিকা 'শিল্পীর দায়' কলম প্রকাশ করতে থাকে। স্বভাবত স্পষ্ট হয়ে যায় বিভাজনটি। আসলে নেহেরুর 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়া'র পরিকল্পনা ভেঙে পড়লে আম জনতাকে পরিকল্পনা মাফিক আনন্দবাজার-দেশ গোষ্ঠী হাই-পেড সাহিত্যিকদের দিয়ে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র দোহাই দিয়ে শাসকের ব্যর্থতাকেই ঢাকতে চেয়েছে। তারা বোঝাতে চাইল সমাজবাস্তব ভিত্তিক রচনার চরিত্রগুলো আসলে 'কাগুজে বাঘ' কিম্বা রচনাগুলো 'রাজনৈতিক প্রচারমূলক'। শাসক শ্রেনীর প্রতি মোহমুক্ত মধ্যবিত্তদের মগজধোলাই করবার জন্যই বুদ্ধিজীবিদের হাতিয়ার করা, ঐ 'হাই-পেড' সাহিত্যিকেরা মানুষকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রবণতার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে- সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ', গৌরকিশোর ঘোষের 'গড়িয়াহাট ব্রীজের উপর থেকে দুজনে', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ইত্যাদি।

সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়' উপন্যাসের নায়ক রাকেশ রাজনীতির হয়তো প্রথম পাঠও নেয়নি, তথাপি এই রাকেশের যখন অতীতে পার্টি-পলিটিক্স করার অপরাধে চাকরি যায় তখনই রাকেশ চাকরি ফিরে পিতে দৌড় শুরু করে। দৌড়তে রাকেশকে হতে হয়েছে বেসুড়ে দালাল। আর উপন্যাসের অন্য চরিত্র মিঃ রায় ভোগ করেছে অরণ্যচারী স্বাধীনতা, গিলেছে যৌনতার স্বাদ। এইভাবে অর্থের অহমিকায় অরণ্যচারী স্বাধীনতা ও যৌনতার স্বাদ গ্রহনের চিত্রের মধ্যে দিয়ে সমরেশ মজুমদার না-রাজনীতি করার শিক্ষা দিয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্যাওলা' উপন্যাসের নায়ক হিরন্ময়কে নিজের অতলেই করেছে 'আউটসাইডার'। রাজনীতি না করে জুয়া-মদ যৌনতার নেশায় জীবনকে উপভোগ করার প্রবনতা ধরা পড়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ'

উপন্যাসে। রাজনীতি না করার পরামর্শ খুব সূক্ষ্মভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাসে। সেখানে দেখা যায় সিদ্ধার্থ একসময় রাজনীতি করতো কিন্তু আজ তাঁর শুধু মিটিং করে আর পোস্টার লিখে কাটাবার ধৈর্য্য নেই। সিদ্ধার্থের কাকা কালীপ্রসাদবাবু মনে করে-“ছাত্রনেতা? তাঁর মানে তো ট্রাম-বাস পোড়ানোর আর স্ট্রাইক। পড়াশোনাটাই শুধু বাদ।” অথচ তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার পাঠ নিলে দেখা যাবে প্রেসিডেন্সি সহসময়ের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্ররাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজনীতিকে ভাওতাবাজি হিসেবে দেখিয়েছেন সমরেশ বসু তাঁর ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’য়। রুহিতন কুর্মির রাজনীতি ও ব্যর্থতার ছবি এঁকে সমরেশ রাজনীতি সম্পর্কে মানুষকে ভয় ধরিয়েছেন।

তবে না-রাজনীতি, অরণ্যচারী স্বাধীনতা, যৌনতার স্বাদ ইত্যাদি চিত্র দেখানো ‘হাই-পেড’ সাহিত্যিকদের সমান্তরালভাবে এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীও সক্রিয় ছিলেন, যাদের মধ্যে তপোবিজয় ঘোষ, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কার্তিক লাহিরী, অসীম রায়, গুনোময় মান্না, জয়ন্ত জোয়ারদার, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, মহাশ্বেতা দেবী, শৈবাল মিত্র, স্বর্নমিত্র(উৎপলেন্দু চক্রবর্তী), শংকর বসু প্রমুখ। এখন এই শ্রেনীর লেখকদের প্রবনতা গুলিকে সুত্রায়িত করা যেতে পারে-

১. প্রতিবাদী লেখকেরা সবসময় তাঁদের লেখায় সমাজের শোষক ও শোষিত, এই দুই শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বকে স্বীকার করেন, তা কখনো হয়েছে জোতদার-ভূস্বামীদের সঙ্গে কৃষক ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। আবার কখনো হয়েছে শাসক গোষ্ঠীর শাসন নীতির ফলে উপেক্ষিত হওয়া নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

২. এই শ্রেনীর সাহিত্যিকদের প্রদর্শিত চরিত্রগুলি সবসময় সংগ্রামী জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছে। সে সংগ্রাম কোথাওবা শহরের, কোথাওবা গ্রামের তবে প্রেম-প্রণয়ের চিত্র একেবারেই আসেনি তা নয়। নায়ক-নাইকাদের কাছে ভালোবাসা বিপ্লবেরই অঙ্গ, তা কখনোই বিপ্লবকে ছাড়িয়ে নয়।

৩. হাই-পেড সাহিত্যিকেরা এই শ্রেনীর লেখকদের রচনাকে সমালোচনা করে বলেছেন ‘প্রচারমূলক’। সমালোচনা কিয়দংশে সঠিক, তবে দুটোই প্রচারমূলক। হাই-পেড সাহিত্যিকদের করা প্রচার নেতিবাচক কিন্তু এই শ্রেনীর প্রচার

ইতিবাচক। নিরপেক্ষতার ভানকরে মুখোশ পড়ে চাইতে সমাজ গঠনের কাজের প্রচার অবশ্যই ইতিবাচক।

৪. প্রগতিবাদী সাহিত্যিকেরা একটি গঠনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়ে উপন্যাস শেষ করেছেন। তাঁদের প্রদর্শিত চরিত্রগুলিকে হতাশার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে উপন্যাস শেষ করেননি। শ্রেনী দ্বন্দ্বের পুনর্বার আভাস দিয়েছেন কোথাও, কোথাওবা পুনরায় আন্দোলনের বীজ নিহিত করেছেন।

৫. সর্বোপরি প্রতিবাদী ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনীতি কখনো ঘৃন্যবস্তু বলে বিবেচিত হয়নি। তাঁদের কাছে রাজনীতি জীবন দর্শনেরই একটি রূপ। একে অবলম্বন করার মধ্যে কোনো অধ্যায় নেই। এখানে প্রতিবাদী সাহিত্যিকদের দু-একটি উপন্যাসের পরিচয় দিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করবো।

তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' এর নায়ক তমাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের যাত্রাপথ শুরু। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে তমালের রাজনীতির বিচরণকেন্দ্র হয়ে ওঠে অবতলের মানুষদের দরবার। সুবক্তা তমাল ঠান্ডা মাথায় ধীরস্থির ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সে যেমন কংগ্রেস সমর্থক সদাশির ডাক্তারকে কমিউনিস্ট করে তুলেছে তেমনি উগ্রকমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝুঁকে পড়া অশোককেও নকশাল আন্দোলন থেকে সড়িয়ে নিয়ে আসে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তমালরা পাড়ায় পাড়ায় মিটিং মিছিল করেছে। খাদ্যের দাবীতে, বন্দীমুক্তির দাবীতে তমালরা লড়াই আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালিত করেছে। তমাল যে কতবড় বিপ্লবী সৈনিক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'শহীদ' হওয়ার পর হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদী মিছিলের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মৃত্যুতে লক্ষাধিক মানুষের বহ্নিশিখার মশাল হাতে বন্যার বেগে ছুটে এসেছে। বার্তা গেছে লড়াইয়ের পথ তৈরী, সকলে সমন্বয়ে বলেছেন- " কমরেডস, তৈরী হও, সামনে লরাই।" তপোবিজয়বাবু শাসক শ্রেনীর প্রতিভূ স্বরূপ ত্রিদিবশংকর-মনিশঙ্কর-জয়শঙ্কর তিন প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন। তৃদিবশঙ্কর ইংরেজদের চাপরাশিগিরি করে সামন্ত প্রভু হয়েছে। মনিশঙ্কর পিতার সম্পত্তিসহ নিজের প্রতিষ্ঠা করা গ্রাম, ফ্যাক্টরি, ফ্লাওয়ার মিল, বাস সার্ভিস ইত্যাদি রক্ষা করতে শাসক শ্রেনীর প্রতিভূ হয়েছে। আর যোগ্যপিতার যোগ্যসন্তান জয়শঙ্কর কমিউনিস্ট নিধনের একজন উল্লেখযোগ্য সৈনিকে পরিণত হয়েছে। সেই ঘাতক খুন করেছে তমালকে। উপন্যাসের ভূমিকাতে তপোবিজয় বাবু লিখেছেন-

"উপন্যাসের কালসীমা মোটামুটি ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এ এপ্রিল-মে। এই সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাও আন্দোলন এ তে স্থান লাভ করেছে, তারই প্রখর প্রত্যাশা উত্তাপে চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। রাজনীতিই এই উপন্যাসের কুললক্ষণ, পিতা ধর্মক্ষুন্ন হয়েছে কিনা সে বিচারের ভার পাঠকদের হাতে।"

এছাড়াও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তমাল ছাড়ায় জয়শঙ্কর, অলকেশ, নন্দিতা যেভাবে তাদের জবানবন্দী দিয়েছে তা থেকে ষাটের দশকের যুগচিত্র ও প্রবনতা স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭২ নির্বাচন পরবর্তী তিনদিনের কালাপাহাড়ি দৌরাত্মের টাটকা দলিল কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'অমানবিক' উপন্যাস। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন-

"উপন্যাসটি যখন লিখছি তখন সর্বস্বখোয়ানো অবস্থায় ঘরে আমার স্ত্রী দুবেলা চোখের জল ফেলেছেন। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ থেকে উপন্যাসটি লেখা।"

শান্তিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত পাড়াপাল সমাজতন্ত্রী কালাচাঁদ উপন্যাসের কথক ডাক্তার বোসের ভাইপো অতীনকে কলোহ থেকে ধরে নিয়ে এসে হাত-পা-মুখ বেঁধে কোমোরে দড়ি জড়িয়ে কালাচাঁদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। কালাচাঁদের বৌ তিরু 'অতীনদা মারতে পারবেনা' বলে বাধা দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। অতীনহত্যা দেখে তিরু পাগল হয়ে যায়। তিরু পাগল হওয়ার কারণ নির্দেশ করতে কালাচাঁদের মা জানিয়েছে কাল রাতে তাঁর ছেলে কুঠির মাঠে একটা পাঁঠা কাটলে তিরু রক্ত রক্ত বলে চিৎকার করতে করতে পাগল হয়ে যায়। ডাক্তার বোস তাঁর ভাইপো খুন হলে থানায় ডায়েরি করতে গেলে থানার ডিউটি অফিসার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলেছে-

"শালা ডায়েরি করতে এসেছে? ভাইপো মরেছে? শালা কমিউনিস্ট তো মরবেই। তার আবার ডায়েরি কি হে?"

ডায়েরি তো হলইনা পরিবর্তে মার্ক্সবাদীদের চিকিৎসা করবার অপরাধে ডাক্তারের ঘাড়ের কাছে জামা ধরে লক-আপে পুরেছে। নির্মম সমাজ বাস্তবতার ছবি চিত্রিত হয়েছে।

এই ধারার উপন্যাসের আরও উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কার্তিক লাহিড়ীর 'যুবক', গুণময় মান্নার 'শালবনি', জয়ন্ত জোয়ারদারের 'এভাবেই এগোয়',

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের ‘দগ্ধদিনে রাজার ছেলেরা’, দিব্যেন্দু পালিতের ‘সহযোদ্ধা’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’, শঙ্করের ‘জন অরণ্য’, শঙ্কর বসুর ‘কম্যুনিস্ট’, স্বর্ণ মিত্রের ‘গ্রামে চলো’, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘হাংরাস’ প্রভৃতি।

সুতরাং ষাট-সত্তরের উপন্যাসের মূল প্রবণতা জনপ্রিয় উপন্যাস এবং রাজনৈতিক উপন্যাস। জনপ্রিয় উপন্যাসে না-রাজনীতির কথা বললেও আসলে সেটা একটা রাজনীতি। বিজ্ঞান বলে in action আসলে একটা action. যাইহোক শিল্পীর স্বাধীন দোহাই দিয়ে চলেছে একধরনের সাহিত্য রচনা আর তার সমান্তরাল ভাবে ‘শিল্পী দায়’ কে হাতিয়ার করে চলেছে আর এক শ্রেনীর উপন্যাস রচনা। দুই ধরনের উপন্যাসই বাংলা উপন্যাসের ধারাকে করেছে গতিশীল ও সমৃদ্ধ।

আত্মদর্শী ফেইড্রা : নিমগ্ন বীক্ষণ

ফাহমিদা সুলতানা তানজী
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ: *সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত Tragic নাট্যকার জ্যা রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) অত্যন্ত সফলভাবে দেখিয়েছেন প্রচণ্ড আত্মানুশীলনে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ এক নারী ফেইড্রাকে , যে কিনা শৃঙ্খলা, যুক্তি, ধর্মীয় ভাবাবেগ, সামাজিক বিধি নিষেধ সবকিছু উপেক্ষা করে ভালবাসে তারই সৎপুত্র হিপোলিটাসকে। তীক্ষ্ণবিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে সৎপুত্র হিপোলিটাসের প্রতি অনুরক্ত হবার পরেও সে আত্মসচেতনাতা হারায়নি। সে ভালভাবেই জানত তার অতিবাসনার জন্য শৃঙ্খলায়ন প্রয়াজন। এতে অত্যন্ত যত্নে বিশৃঙ্খল অনুভূতির সংযোজন ঘটায় তার সহচর ইনোন। পরবর্তীতে পূর্ণ পঙ্কিল মনকে শাসন করার লক্ষ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ প্রভাবিত হয়ে ফেইড্রা ইনোনকে তিরস্কার করে কঠোরভাবে। তারপরও সুখ ও বেদনার অতিরেক ঘটিয়ে সে চালিত হয়েছিল আফ্রোদিজিয়ার পথে। যেহেতু সে তার অতিবাসনাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি, কঠোর আত্মঅনুশীলনে লিপ্ত হবার পরও সে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেহেতু সে হতাশায় ভুগছিল। তার ভীষণরকম ত্রাসসঞ্চারিত আত্মবিবেচনা চায় মুক্তি। ফেইড্রা যে উপায়ে শক্তিশালী আকর্ষণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে তা বিশ্লেষণ করণে দর্শক/পাঠককে অভিভূত হতে হয়। আত্মশাসনে ব্যর্থ ফেইড্রা চেয়েছিল মুক্তি। এর মাঝেই সে স্থাপন করে যায় শুদ্ধ অনুভূতির এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সফল মানুষ হিসেবে।*

Abstracts : *Famous tragic dramatist of the 17th century Jean Racine (1639-699) has shown the character Pheadra so effectively. A lady who had to take taste of failure in spite of corning strong self contemplation. The lady loves her step-son Hippolytus ignoring social, religions rules, regulation, logic, low everything. Because of her sharp analysis outlook; she did not lose her self-consciousness although she had strong inclination for her step-son Hippolytus. She knows it very well. Her excessive desire should be subjugated. Here her companion Oenone added obliqueness into her feeling with deep care. Next time, for ruling the full transgressed heart from moral and are religions ideology; Pheadra rebuked Oenone sharply later, she driven herself to the path of afrodijia after over whelming the flow of exhilaration and pain. Despite her lust at strong self-Contemplation. She was under deep frustration as she engrossed herself as a lady of failure. She wants to be released. The Audience/Readers are astonished to see the way of Phaedra has she saved herself and stood against strong attraction. After failing to rule the heart of own, Pheadra wanted to have freedom. Within this she established pure feelings and consecrated her as successful human being.*

শৃঙ্খলা, যুক্তি, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, সামাজিক আদেশ, সংযত ভাবাবেগ সবকিছু উপেক্ষা করে ফেইড্রা ভালবাসে তার সৎপুত্র হিপোলিটাসকে। সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও অনৈতিক এই ভালবাসার প্রতি পুরো মাত্রায় সচেতন ছিল ফেইড্রা। তবুও আবেগদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় সে। ফলাফল হিসেবে দেখা যায় ফেইড্রার করুণ মৃত্যু। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত Tragic নাট্যকার জ্যা রেসিন(১৬৩৯-১৬৯৯) অত্যন্ত সফলভাবে 'ফেইড্রা' নাটকে ফেইড্রার অন্তর্দ্বন্দ্বগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকাটিতে ঘটনার বদলে চরিত্রবলীর অন্তর্গত টানাপোড়েন ও জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ফেইড্রার জীবনের পরিণতিতে একরকম সমতা আনার প্রয়াস চালিয়েছেন নাট্যকার রাসিন। আর এই সমতা তিনি এনেছেন ফেইড্রার করুণ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়াস থাকবে ফেইড্রার এই অতিবাসনার কারণ অনুসন্ধান, যার ফলে সে আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং পরিণতিতে আত্মহত্যার মত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও পিছু হটেনা। মূলত ফেইড্রার আত্মসংগ্রামটি ছিল আদশর্কে আকড়ে ধরার ইচ্ছাগুলোর অন্যতম, যা বিশ্বাস করার মাধ্যমে সে নিরাপদবোধ করে, জীবনে কোন জিনিসটা অর্জন করা জরুরি তা বুঝতে পারে এবং কীভাবে নিজের আবেগ ও আগ্রহ সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়ে পরিচালিত করতে হবে তা সম্পর্কেও ফেইড্রা ওয়াকিবহল ছিল। আর এরই পরিণতিতে ফেইড্রা দেখতে পায় তার বাসনাটি অতিবাসনায় রূপ নিয়েছে এবং তা অর্জন অসম্ভব, এর থেকে তাই সে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধানের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে ফেইড্রার এই অতিবাসনাকে ঘিরে।

নাটকের শুরুতে দেখা যায় ফেইড্রা অনেকদিন ধরে তার সৎপুত্র হিপোলিটাসকে ভালবাসে এবং তাঁর এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যায় আত্মহত্যার দিকে। যেখানে প্রস্ফুটিত হয় তার নৈতিকতা। সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চায় যখন সে শোনে তাঁর স্বামী থিসিয়াস মৃত। ইনোন (ফেইড্রার নার্স এবং সহচর) ফেইড্রাকে প্ররোচিত করে তার মনের গোপন বাসনার কথা হিপোলিটাসকে জানাতে। ফেইড্রা হিপোলিটাসকে তার ভালবাসার কথা জানায়। কিন্তু হিপোলিটাস তার নির্লজ্জ ও অসঙ্গত আচরণে চরম বিতৃষ্ণায় তার প্রেম প্রচণ্ড রূঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। ফেইড্রা আবার ভেঙ্গে পড়ে। ইনোন তাকে যুক্তি দিয়ে চিত্রে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে। শীঘ্রই সে আলো নিভে যায় যখন জানা যায় থিসিয়াস জীবিত এবং তিনি ট্রোজেন অর্থাৎ ঘটনাস্থলে আসছেন।

থিসিয়াস আসার পর ফেইড্রা নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। একদিকে তার স্বামী অন্যদিকে ভালবাসা। ইনোন হিপোলিটাসের বিরুদ্ধে থিসিয়াসের কান ভারী করে তোলে। থিসিয়াস হিপোলিটাসকে অভিশাপ দেয়। ফেইড্রা আবার অনুশোচনায় ভোগে সে সব কিছু খুলে বলতে উদ্যত হয় এবং ইনোনকে দোষারোপ করে। কিন্তু

ঘটনাক্রমে ফেইড্রা জানতে পারে এরিসিয়ার প্রতি অনুরক্ত। সে তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রচণ্ড ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। অবশেষে হিপোলিটাস যখন ট্রয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন তার করুণ মৃত্যু হয়। থিসিয়াস সবকিছুর মাঝে রহস্যের আভাস পায়। বিস্তারিত জানার জন্য ইনোনকে ডেকে পাঠায়। তখন জানা যায় ইনোন মৃত। রাণীর কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। থিসিয়াস বুঝতে পারে তার পুত্র নির্দোষ। ফেইড্রা অবশেষে প্রকৃত সত্য থিসিয়াসের কাছে প্রকাশ করে। ফেইড্রা বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে অসহনীয় শোকে বিষপাণে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে।

আলোচনার এই পর্যায়ে গবেষক ফেইড্রার এই আচরণের কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকবে। মূলত ফেইড্রার ইচ্ছাশক্তি ভাল ও মন্দ দুটো শব্দ দিয়ে গ্রথিত ছিল। নাট্যকার রাসিন নাটকে এমন একটি চরিত্র চিত্রণ করেছেন, যে চরিত্রটি প্রথাগতভাবে নৈতিক দিক থেকে ছিলো সৎ কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত আবেগকে ঘিরে। নাটকের প্রথম অঙ্কে থেরামেনেসের সংলাপ থেকে জানা যায় ফেইড্রা অসুস্থ জীবনের ভার বইবার সামর্থ্য সে হারিয়েছে। যদিও অসুস্থতার কারণ সবার অজানা।

থেরামেনেস... অব্যক্ত কোনো কারণে জীবনের ভার বইবার শক্তি যিনি হারিয়েছেন, দিনের আলো যে সইতে পারেনা...

আর এই তথ্যের গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য স্বয়ং ফেইড্রা দেয়। কোন এক অজানা কারণে সে অসুস্থ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে। তার এই অসুস্থতায় তাকে আত্মহননের দিকে ধাবিত করে বারংবার। কারণ নৈতিক দিক থেকে সে সৎ থাকতে চেয়েছিল। তার এই মনোদৈহিক অসুস্থতার নাম অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একে বলে ডিপ্রেশন- যা এক ভয়াবহ মানসিক ব্যাধি, এর ফলে মানুষ তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেয়। এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা উদ্বেগজনক হারে কমিয়ে দেয়। কেন ফেইড্রা সৎপুত্রকে ভালবাসায় আত্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় বারবার রত থেকেছে। এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের প্রথম ব্যর্থ চেষ্টা করে। এ কাজে তাকে বাঁধা দেয় তার সহচর ইনোন। নাটকটির এ অবধি ফেইড্রার ডিপ্রেশনের কারণ পাঠকের অজানা। নাট্য ঘটনা এগিয়ে চলে চরিত্রদ্বয়ের কথোপকথনে। নাটকের দ্বন্ধ ক্রমশ আরো জটিল। ইনোনের মার্জিত জেরায় ফেইড্রা খুলে বলে তার ভালবাসার কথা যা কোন সভ্য সমাজ স্বীকৃতি দেবে না। প্রচন্ড দ্বিধায় সে স্বীকার করে হিপোলিটাসের প্রতি আসক্তির কথা। ফেইড্রা যখন প্রথম এথেন্সের মাটিতে পা রাখে তখনই আসক্ত হয় হিপোলিটাসের মত তরুণ বীরকে। তাইতো তার প্রণয়কাতর উক্তি–

ফেইড্রা : ...এযিয়াসের পুত্রের সাথে বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণের বিহ্বলতা নিয়ে এথেন্সে পা ফেলতেই আমি আমার ঘোরতর শত্রুর মুখ দেখি। তাকিয়ে থেকে লজ্জায় কখনো রাঙা হয়েছি, আবার সব রঙ হারিয়ে ফিকে হয়ে গেছি। ... আমার উপর ভর করেছিলেন দেবী ভেনাস।

যেহেতু তার আত্ম কর্ম বিশ্লেষণের ও বিচারের ক্ষমতা প্রবল ছিল তাই আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে বিমাতার রূঢ় রুপ ধারণ করে। নির্বাসনে পাঠায় হিপোলিটাসকে। আত্মশাসনের প্রথম পদক্ষেপটি ছিলো দুর্বল। হিপোলিটাস ফেইড্রার দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও লালন করে গেছে সেই বীর পুরুষকে। গবেষণার এই পর্যায়ে গবেষক অনুসন্ধান করবে কেন থিসিয়াস দেশের রাজা হওয়া সত্ত্বেও ফেইড্রা তার চেয়ে কম ক্ষমতাধর ব্যক্তির প্রতি আকর্ষিত হলো এই প্রশ্নকে সামনে রেখে।

ফেইড্রার সাথে হিপোলিটাসের সাক্ষাত হয় দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে। সেখানে ফেইড্রা কথা বলতে শুরু করে আপন সন্তান প্রসঙ্গে। ফেইড্রা নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেহেতু পেনোপী মারফত সে সংবাদ পেয়েছে তার স্বামী রাজা থিসিয়াস মৃত। প্রথমে ফেইড্রার মাতৃরূপটি ফুটে উঠলেও নিজের নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ চেষ্টায় ফেইড্রা তার গোপন বাসনার কথা খুলে বলে। যা এতদিন ছিল মনের একান্ত গোপন কুঠীরে, যার সন্ধান সহচর ইনোন ছাড়া সকলের অগোচরে ছিল তার সব সে প্রকাশ করে ফেলে এবং ফলস্বরূপ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভালবাসা না পেয়ে উন্মাদিনী ফেইড্রা পুনরায় ইনোনকে পাঠায় গোপন বাসনা পূরণের স্বার্থে। কিন্তু ইনোন ফিরে আসে এবং ফেইড্রাকে বলে বাসনা সংবরণ করতে কারণ রাজা থিসিয়িাস জীবিত এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদে ফিরবেন। ফেইড্রার অত্মদ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইনোন তাকে মন্ত্রণা দেয় পাল্টা অভিযোগের। থিসিয়াসের প্রাসাদে আগমনের পর ফেইড্রা তার সাথে স্বাভাবিক আচরণে ব্যর্থ হয়। এহেন পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্তির স্বার্থে ইনোন রাজা থিসিয়াসের চোখে হিপোলিটাসকে অজাচারী হিসেবে প্রমাণ করে এবং সফল হয়। পরিণামে থিসিয়াস কঠিন অভিশাপে অভিশপ্ত করে তারই প্রিয় পুত্রকে। ফেইড্রা সব জানার পর পরিত্রাণ দিতে চেয়েছিল হিপোলিটাসকে কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে নেয় যখন সে থিসিয়াস মারফত জানতে পারে হিপোলিটাস এরিসিয়ার প্রতি আসক্ত। অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে ট্রোজেন ছেড়ে চলে যাবার পথে সমুদ্র দানবের হাতে করুণ মৃত্যু ঘটে হিপোলিটাসের। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় জীবন যন্ত্রণার ভার সইতে না পেরে ফেইড্রা আত্মহত্যা করে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নৈতিকতা, ধর্মীয় ভাবাবেগ, শুদ্ধ অনুভূতির। ফেইড্রা চরিত্রটির মাঝে আছে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গী। হিপোলিটাসের প্রতি অনুরক্ত হবার পরও সে আত্মসচেতনাতা হারায়নি। যেহেতু তার নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগাঢ় সেহেতু সে নিজ আকাঙ্ক্ষার নেতিবাচক মূল্যায়ন করে।

আর এর মাধ্যমে সে উপলব্ধি করতে পারে এই সম্পর্ক প্রয়োজনীয় নয়। যে আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটেছে তার মনের গহীনে তাকে আত্ম অনুশীলনে গাঢ় করে পুষ্পায়িত হতে দেয়নি সে। ফেইড্রার এ ধরণের অজাচারী স্বপ্ন দর্শনের আকারকে বলা যায় 'এনিপনিয়া'* সে বুঝতে পারে যে আকাঙ্ক্ষা সংযমের তা অবশ্যই পরিহার্য। সে আরো জানে তার আকাঙ্ক্ষাটি নৈতিকতার শাসনক্ষেত্র দ্বারা বাঁধা। তাই তার এহেন অজাচারী আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবদমন প্রযোজ্য ছিল। প্রয়োজন ছিল তার অতিবাসনার শৃঙ্খলায়ন। তা না করে এই সুখের জন্য অত্যন্ত যত্নে বিশৃঙ্খল অনুভূতির সংযোজন ঘটায় ইনোন। নিশ্চিতভাবে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ফেইড্রা তার দক্ষতা নিরাসক্তির প্রভাবসমূহ কাজে লাগাতে পারেনি। যদিও পুরো টেক্সট জুড়ে ফেইড্রাকে তার অজাচারী অনুভূতির/ বাসনার অস্তিত্বের জন্য অনুতপ্ত হতে দেখা গেছে। নৈতিকতার বিরুদ্ধাচারণ কেবল অনুতপ্ততা চায়নি আর এই বাসনাকে অতিক্রমের প্রয়োজনীতা সে অনুভব করে। তার বিশৃঙ্খল মনের শৃঙ্খলায়নে প্রথমত, সে তার বাসনাকে দায়ী করে; দ্বিতীয়ত, সে দায়ী করে তার সহচর ইনোনকে। তার অতিবাসনার পূর্ণ পঙ্কিল মনকে শাসন করার লক্ষ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইনোনকে তিরস্কার করে কঠোরভাবে। পরবর্তীতে ইনোন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে । একথা স্পষ্ট যে ফেইড্রা আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আত্মপ্রশ্রয়দানে সচেষ্ট ছিল । তাঁর ক্রিয়াকলাপ সামাজিক ও ধর্মীয়নীতিকে লজ্ঘন করে এবং অবশ্যই এটি একটি অস্বাভাবিক প্রকৃতি বা আকাঙ্ক্ষা । 'সুখের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব' তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয় । সুখ ও বেদনার অতিরেক ঘটিছে সে চলিত হয়েছিল 'আফ্রোদিজিয়ার'* পথে । ফেইড্রার নিজ স্বীকারোক্তিতে জানা যায় তাঁর ওপর ভর করেছিল দেবী ভেনাস । যেকিনা আত্মার মাঝে চুপিসারে প্রবেশ করে এবং আকাঙ্ক্ষাগুলোকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল । তবে এ বিষয়ে সে নিযে সতর্ক অবস্থা গ্রহণ করে । বিবেকের নির্দেশকেরা তাকে চাহিদা ও প্রত্যাখ্যানের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করে এবং দূর্বলভাবে প্রতিরোধে সমর্থ হয় । 'আত্মপ্রশ্রয়শীল' হতে চায়নি বলে সে হিপোলিয়াসকে বিমাতার রূঢ় সাজ ধরে প্রত্যাখ্যান করতে চায় । তবু সে ভয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি । একথা সত্য, যে ক্রিয়াটি সে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল, যা তাঁর 'আকাঙ্খার উত্থান' ঘটিয়েছিল তাঁর তাঁর সুখের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে সে শক্তির সাথে 'সুখ ও আকাঙ্ক্ষা' দ্বারা উদ্বেলিত হয়েছিল- যা তাঁর ক্রিয়া,সুখ ও আকাঙ্ক্ষাকে একত্রে যোগবদ্ধ করে । তবে যে আফ্রোদিজিয়ায় 'নৈতিক অভিজ্ঞতার বুনট' থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। তবু আত্ম অনুশীলনে জয়ী হবার জন্য তাকে নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এক নারী বলা যায়।

হিপোলিটাসকে দেখার পর ফেইড্রার মনে যে আবেগের সঞ্চারন ঘটে এবং সে (ফেইড্রা) যেহেতু এই আবেগকে সায় দিতে পারেনি, ভেতরে তাঁর একরকম অসন্তুষ্টি

বিরাজ করছিল এই বিষয়টিকে বর্তমান প্রবন্ধে frustration হিসেবে দেখানো হবে। এই frustration টি সমাজের যে বিধি ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ এই বিষয়টি সম্পর্কেও ফেইড্রা সম্পুর্ণ ওয়াকিবহল ছিল। 'মানুষের সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক কৃতকার্য, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট আত্মা এবং যে নৈতিক নিষেধ-গন্ডির সে স্বয়ং আবদ্ধ' একথা ফেইড্রা ভাল করেই জানে। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল তৎকালীন সময়ের জন্য নয়। বরং তা বর্তমান সময়ের জন্যও প্রযোজ্য। সভ্যতা মানুষকে তাঁর আদিম পাশবিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু এরপরেও সমাজের কিছু মানুষ এমন কিছু বিজয়ের অধীন পড়ে। যার মাধ্যমে তারা অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হইয়ে পড়ে। এই তাড়নাজাত আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে আছে অজাচার, প্রাণনাশ করার মত লিপ্সা । আকাঙ্খাগুলো পাশাপাশি স্থাপন করলে খুবই অদ্ভুত শোনায় । সবাই একযোগে বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে।

প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলোর অন্তরালে সক্রিয় অজাচারী আকাঙ্ক্ষার শক্তি এখনও চিহ্নিত করা যায়; কার্যত 'সভ্যতার আদেশেই করা হয়।' এই আদিম তাড়নজাত প্রত্যাখ্যানগুলোর সাথে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানজড়িত থাকে। এগুলো পরবর্তীতে তাড়নজাত প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে জরুরী ভূমিকা পালন করে। আদিম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব মানসিকতার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিটা শিশুর বেলায় আমরা একটা বিষয় দেখতে পাই যে, মানুষে অধিঅহম (Super ego) নামে একটি বিশেষ মানসিক সংঘটক তারা অধিকার করে রাখে এবং নিজের অনুশাসনের মধ্যে তা অন্তভুক্ত করে। এমন রূপান্তরের মাধ্যমে শিশুরা হয়ে ওঠে 'নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সামাজিক প্রাণী।' যাদের মধ্যে এই রূপান্তর বিষয়টি ঘটে তারা হয়ে ওঠে সভ্যতার মাধ্যম। যে কোন সংস্কৃতিতে এদের সংখ্যা যত বেশি হবে সেই সংস্কৃতি তত বেশি নিরাপদ হবে এবং সেখানে বাহ্যিক বল প্রয়োগের প্রয়োজনও তত কম হবে। সমাজে এমনও অগনিত মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের ধনলিপ্সা, কামলিপ্সা সন্তুষ্ট করতে পিছু হটে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা শাস্তি পাবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। যদি কেউ নিজের কল্পনায় সভ্যতার নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে দেয়, তবে সে নিজের ইচ্ছেমত যে কোন নারী-পুরুষ যৌন আশয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তার বঙ্কিম চলার পথে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোন রকম ইতস্তত না করে মেরে ফেলতে পারে, সম্মতির তোয়াক্কা না করে অন্যের মালপত্র নিজের বলে দাবী করতে পারে। এমন সীমাহীন আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে যে কেউ হয়ে উঠতে পারে সেচ্ছাচারী বা একনায়ক। কিন্ত এমনটি কোন সভ্য সমাজের নিয়ম হতে পারে না। এমনি এক সত্য আমরা ফেইড্রা নাটকটির ফেইড্রা চরিত্রের মাঝে দেখতে পাই।

ফেইড্রা :... ওহ, কী ঘৃণ্য, কী কলঙ্কময় পিতার দিকে তাকালে আমি দেখেছি পুত্রের মুখ !

ফেইড্রা নাটকটির প্লট বিশাল না হলেও এতে রয়েছে আত্ম দ্বন্দ্ব, যা প্রতিটা যুগে প্রতিটা দেশের কিছু মানুষের মাঝে আজও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার রাসিন করুণ রসের মহিমা অক্ষুন্ন রেখেছেন। মানব জীবনে আত্মদ্বন্দ্ব ও আপাতগম্ভীর ভাবের পাশাপাশি নির্মল প্রেমের দৃশ্য এঁকেছেন নাট্যকার, যা মিলেমিশে এমন এক বোধের জন্ম দেয় যা কোন বিশেষ দেশ কাল নেই, ভূগোল নেই। আত্ম দ্বন্দ্ব এবং এর থেকে পরিত্রানের প্রচেষ্টাই নাটকটির মূল সুর। যা আবহমান কাল ব্যাপি মানব হৃদয়ের সঠিক বোধের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। রাসিনের বাস্তবদৃষ্টি ও সংগতিবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল বলেই ফেইড্রাসহ প্রতিটা চরিত্রই দর্শক/পাঠকের মনে গভীরভাবে রেখোপাত করে। সমকালীন জীবনের প্রেক্ষাপট সম্মুখে রেখেছিলেন বলেই নাটকটির প্রতিটা চরিত্র বাহুল্য বর্জিত, জীবন্ত ও এত উজ্জ্বল। অতি বাসনায় জর্জরিত নারীর প্রেম এ নাটকের স্থায়ী ভাব; এই আবেগের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পিতার স্নেহ, প্রেমিকার প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা নামক মানবিক চিত্তবৃত্তি। এসবে সমন্বয়েই 'ফেইড্রা' নাটকের চিরায়ত মহিমা। ফেইড্রা, হিপোলিটাস, থিসিয়াস, এরিসিয়া, ইনোন, থেরামেনেস এর চরিত্র বিশ্লেষণ ও নাটকটি প্রতিটা মুহুর্তে তাদের আচরণ পরিমাপ করলে এর সত্যতা পরিমাপ করা যায়। অজাচারী প্রেম এ নাটকে দুর্লজ্ঘ্য অনতিক্রমনীয় ভুমিকার প্রধান পরিচালিকা শক্তি হিসেবে ফেইড্রার জীবনে ক্রিয়াশীল।

মূলত মা ও ছেলের মাঝে এরূপ অজাচারী সম্পর্ক কোন সভ্য সমাজে সমর্থন করেনা। তাই তাদের মিলনও বাস্তবে সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। ফেইড্রার মাঝে যে আবেগের অসুন্তষ্টি বিরাজ করেছিল তা নাটকটি পাঠ করলে প্রথমে নজরে আসে। এই অসুন্তষ্টির কারণে সে Frustration এ জর্জরিত ছিল। সাধারণভাবে এরূপ জীবন যাপন করাটা যে কোন মানুষের পক্ষেই কষ্টকর। মূলত ব্যক্তিমানুষ যে সভ্যতার সভ্য সেই সভ্যতার পক্ষ থেকে তার ওপরও কিছু পরিমান নিয়ম বর্তায়। এর ফলে সভ্যতার আদেশ নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অন্য সভ্যরা সেই ব্যক্তি মানুষকে কিছু পরিমাণ ভোগান্তি উপহার দেয়। এরসাথে যোগ হয় অবশীভূত প্রকৃতির অনিষ্ট-যাকে ব্যক্তিমানুষ নিয়তি নামে চেনে। কিন্তু কিভাবে ফেইড্রা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা তথা নিয়তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে তা বিশ্লেষণ করলেই দর্শক/পাঠক অবিভূত হতে হয়। একজন ব্যক্তির মতই নিয়তি ফেইড্রাকে শাসিয়েছে বারংবার। তার ভীষণরকম ত্রাসসঞ্চারিত আত্ম বিবেচনা চায় মুক্তি। আবার এটাও সত্য যে প্রবলতম বাস্তবিক স্বার্থ থেকে উদ্বেলিত ফেইড্রার ভীত সন্ত্রস্ত মন বারবার এক রকম উত্তর দাবী করছে, যা তার অজাচারী আবেগের পক্ষে কথা বলবে। 'কখনো কখনো মন দেহকে কারণিকভাবে (Causally) প্রভাবিত করে এবং কখনো কখনো দেহ মনকে কারণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে'।

নাটকটিতে ফেইড্রাকে বাইরের প্রতিবন্ধক অথবা ভিতরের খাপ খাইয়ে নেবার অক্ষমতা- এ দুয়ের কারণে অসুস্থ হতে দেখি, এর ফলে তার যৌন চাহিদার তৃপ্তি বাস্তবে প্রত্যখ্যাত হয়। ফলে শত চেষ্টার পরও ফেইড্রা পূর্বের চেয়েও বেশিরকম আসক্ত হয়ে হিপোলিটাসের প্রতি। যা সমাজে এক অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বলে পরিচিত। ‘এমন মানসিক রোগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাস্তব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া; কিন্তু এটাই হয়ে দাঁড়ায় রোগজনিত প্রধান ক্ষতি; ফেইড্রা সমাজের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে, নিজের মনকে এক প্রকার তুষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে কিছুমাত্রায় এই অতিবাসনা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা চালিয়েছিল। ‘রোগগ্রস্ত অঙ্গাকে স্পর্শ করে শুধু মাত্র বেদনা দেওয়া ছাড়া যদি আর কিছু সম্ভব না হয় তাহলে সেটা না করাই ভালো’। তার এ প্রচেষ্টায় বাঁধ সাধে ইনোন যখন পেনোনী মারফত সংবাদ এলো রাজা থিসিয়াস মৃত। ফেইড্রার অতিবাসনাকে উসকে দেওয়ার পক্ষে ইনোন নিম্মোক্ত সংলাপই যথেষ্ট-

ইনোন থিসিয়াসের মৃত্যু আপনার প্রেমকে গ্লানিমুক্ত করেছে। হিপোলিটাস এখন আর কোনো দ্বিধা-লজ্জার নাম নয়।

এখানে ইনোনের বক্তব্য ফেইড্রার ইচ্ছার ভুমিকা পালন করেছে। যার ভিত্তিতে ফেইড্রা আরও বেশি অতিবাসনার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর একটি শৈশবকালীন আদল রয়েছে। ছোট বেলায় পিতা-মাতাকে, বিশেষত পিতাকে ভয় পাবার কারণ ছিল, তারপরও শিশু জানে যে কোন বিপদে সে পিতার কাছ থেকে সাহায্য পাবে। এ বিষয়টির সাথে ফেইড্রার ঘটনা- এ দুটো পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্যবিধান করা অস্বাভাবিক নয়। এমন জটিল পরিস্থিতিতে ফেইড্রা সম্পূর্ণই ইনোনের প্রতি নির্ভবশীল হয়ে ওঠে।

সময়ের অগ্রগমনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চগুলোতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার লক্ষণগুলো আরও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যখন সংবাদ এল ফেইড্রার স্বামী থিসিয়াস মৃত নয়, জীবিত এবং সে প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এমত পরিস্থিতিতে ফেইড্রা জটিলতার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কারণ ‘প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নারী হবে সহ্যশীল, সরল, মুগ্ধ, নিশ্চিত প্রেমিক’। প্রচলিত এই আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে বলেই ফেইড্রার কম্পিত হৃদয় পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে চায়। ‘চীন দেশে প্রবাদ আছে, ছেলে পঙ্গু হলেও উজ্জ্বল দক্ষ মেয়ের চেয়ে ভাল। আমরা ছেলের শতদোষ ঢাকতে বলি, সোনার আঙটি আবার বেকা! বলি শিবরাত্রির সলতে, একমাত্র মেয়েকেও কিন্তু এ কথা বলা হয় না! ফেইড্রাকে বাঁচাতে তাই ইনোন নতুন পরিকল্পনা করে। আত্মসংগ্রামে লিপ্ত ফেইড্রার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ইনোন প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফেইড্রাকে নির্দোষ প্রমাণের স্বার্থে থিসিয়াসের কাছে হিপোলিটাসের বিরুদ্ধে গল্প ফাঁদে। প্রমান হিসেবে

উপস্থাপন করে হিপোলিটাসের ফেলে যাওয়া তরবারি। তবুও ফেইড্রার অসহায়ত্ব থেকে যায়, আর থেকে যায় অতিবাসনা থেকে মুক্তি পাবার আকুলতা। আর এভাবেই ফেইড্রা চরিত্রের জন্য তৈরী হয় মহৎ আদর্শের এক ভান্ডার। ফেইড্রার অসহায়ত্বের বোধকে সহনীয় করার চাহিদা থেকে এর উৎপত্তি। এই পৃথিবীতে মানবজীবন একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের তরে নিহিত। নিঃসন্দেহে তা মানুষের স্বভাব সংস্কারের তাৎপর্য বহন করে। এ জগতে যা কিছু ঘটে তার সবই আমাদের থেকে উচ্চতর এক চৈতন্যের অভিপ্রায়ের প্রকাশ, 'যার সরল বা ঘুরতিপথ অনুসরণ করা সহজ না হলেও শেষ পর্যন্ত সব কিছুকে তা ভালোর পথে নিয়ে আসে অর্থাৎ আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে'।

এই জগতে যেমন আমরা সকল প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাই না। তেমনি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ যে সকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই যে ফেইড্রার জীবনে অতিবাসনার উপস্থিতি, যার বিরুদ্ধে ফেইড্রা সোচ্চার ছিল,সচেতনতা সত্ত্বেও অনৈতিক ঘটনার উপস্থিতির করুণ খুঁজে বের করা মশকিল হলেও অসম্ভব নয়। থিসিয়াস ফেইড্রার জীবনে জ্বলন্ত সত্য হলেও সে ভালবেসেছে তারই সৎপুত্র হিপোলিটাসকে। একজন তরুণী একজন বলিষ্ট যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হবে এটাই স্বভাবিক, যদিও ধর্মীয় ও সামাজিক মানদন্ডের বিচারে এমন সম্পর্ক অনৈতিক। সত্যিকার অর্থে যৌনবিষয় অবদমিত থাকেনা। আর তাই ফেইড্রা হিপোলিটাসের দিকে ধাবিত হতে দেখা গেছে বারবার। যেখানে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে ক্ষমতার উপস্থিতি সেখানেই। এ ক্ষমতার মাধ্যমে ফেইড্রা হিপোলিটাসকে তার পিতার আক্রমন থেকে বাঁচাতে গিয়েও পিছু হটে। সমাজ ও ধর্ম যেহতু মানুষের কামনা বাসনাকে বৈধ-অবৈধ, অনুমোদিত কিংবা বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং শৃঙ্খলার জন্য সুপারিশ করে সেহেতু সমাজের প্রতিটা মানুষকেগই সচেতন থাকতে হয়। তবু ফেইড্রার অবচেতন মন হিপোলিটাসকে স্পর্শ করার জন্য , সুখের অভিজ্ঞতা নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। ধর্মীয় আদর্শের দাবী পূরন করতে পারেনি বলে তার পক্ষে জীবন জ্বালা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

ফেইড্রা আত্মশাসনে ব্যর্থ হয়ে মুক্তি চেয়েছিল, এই মুক্তি তার ব্যক্তিগত মুক্তি। 'মৃত্যু হলো ক্ষমতার সীমা যে, মুহুর্তে তাকে এড়িয়ে যায়; মৃত্যু হয়ে ওঠে অস্তিত্বের সবচেয়ে গোপন দিক, সবচেয়ে ব্যক্তিগত' মূলত মানুষের কোনো গভীর সহজ প্রবৃত্তিকে কেন সামাজিক আইনের দ্বারা সুরক্ষিত করতে হয় তা সহজবোধ নয়। পানাহারের ব্যাপারে কিংবা আগুনে হাত দেবার ব্যাপারে মানুষকে নিরস্ত করতে কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। এই সহজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে অনিবার্য ফলস্বরূপ সে শাস্তি পায়, এরজন্য সামাজিক কিংবা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজন নেই। অপকর্ম করার প্রবণতা যদি না থাকত তাহলে অপরাধের প্রশ্ন উঠেনা। অতএব,

অজাচার নিষেধকে আইনের চোখ দিয়ে না দেখে বরং এভাবে দেখা উচিত যে, এর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। সমাজের সভ্যগণ মনে করেন, যদি এই প্রবৃত্তিকে দমন করা না যায় তাহলে সমাজের পক্ষে হানিকর হবে। ফেইড্রা যতবার চেয়েছে হিপোলিটাস সম্পর্কে নিজস্ব মনোভাব বদলে ফেলবে ততোবারই সে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়ে। কোনমতেই সে এহেন হীন বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারেনি। নাটকটির শেষে দেখা যায় নৈতিক মতবাদগুলোর কাছে ফেইড্রা পেয়েছিল একমাত্র সান্তনা আর শুধু এর সহায়তায় তার পক্ষে জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। থিসিয়াসের ভালবাসার বিনিময়ে শ্রেয়তর কিছু না দিয়ে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিপোলিটাসকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ফেইড্রা। স্পষ্টতই মানব সভ্যতার কল্যাণে নৈতিকজ্ঞান অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে এবং আজও করছে। অসামাজিক তাড়নাগুলো পোষ মানানোর ক্ষেত্রে নৈতিকতার অবদান অপরিসীম। তবে তা যথেষ্ট নয়। কারণ যদি কেবল নৈতিকজ্ঞান সম্পন্ন মানবজাতি সুখী হতে পারত, সান্ত্বনা পেত, জীবনের সাথে বোঝাপড়া করতে পারত আর মানুষকে সভ্যতার চালিকাশক্তি হিসেবে রূপান্তর করতে সফল হতো তাহলে মানুষ পরিস্থিতি বদলানোর কথা ভাবতনা। পাপ করার পর যাদ প্রায়শ্চিত্ত দিয়েই পাপমোচন সম্ভব হত তাহলে নিজেকে পবিত্র রাখার কোন অর্থ হয়না। কারণ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সে পুনরায় পাপ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাসিনের ফেইড্রা নাটকে ফেইড্রা চরিত্রের মাঝে দেখা যায়, পরবর্তী জীবনের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত নয় বরং নিজেকে শুদ্ধ করার পথ বেছে নিয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক, কেন আপনি আপনার প্রতিবেশিকে খুন করবেন না- এর কারণ হিসেবে যদি একমাত্র ঈশ্বরকে দোষারোপ করা হয় যে ঈশ্বর আপনাকে শাস্তি দেবেন- আর যখন আপনি জানছেন যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কোন ভয় পাবার বা শাস্তি পাবার আশঙ্কা নেই, তখন আপনার প্রতিবেশিকে খুন করবে আর তখন পৃথিবীর আইনের মাধ্যমে আপনার ওপর জোর খাটিয়ে আপনাকে নিরস্ত করা হবে। আদতে মানুষের আচরণ একজন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের মতো হওয়া উচিত। যিনি নতুন কোন আসন্ন বিকাশের বিরোধিতা করবেনা বরং বিকাশের পথ সহজ করার উপায় খোঁজেন। কোনো সংস্কৃতির আর্দশগুলো মানুষ তার মানসিক ঐশ্বর্যগুলোর মধ্যে গন্য করে এই আদর্শগুলো দিয়েই পরিমাপ করা হয় জীবনে সর্বোত্তম জিনিসটা কী এবং জীবনে কোন জিনিসটা অর্জন করা সবচেয়ে জরুরী। রাসিনের ফেউড্রা নাটকটির মধ্যদিয়ে এর উত্তর সহজেই মেলে। কারন নাটকটিতে শেষে পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই প্রচণ্ড নৈতিকজ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার কারণে ফেইড্রা তার জীবনকে শুদ্ধ করার অভিযান চালায় এবং এক মহৎ আদর্শের ভান্ডার আমাদের সামনে রেখে যায়। জীবনের কঠিন সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা না পেয়ে আত্মশাসনে শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে সে।

আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে সঠিক মানুষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হওয়া নারী ফেইড্রা।

ফেইড্রা-মিডিয়া যে বিষ নিয়ে এসেছিল গ্রীসে, আমার জ্বলন্ত শিরাগুলোকে একটু স্বস্তি দিতে আমি পান করেছি সেই বিষ। ... আকাশ, পৃথিবী, সঙ্গী সবকিছু ম্রিয়মান...।

ফেইড্রার জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি সামাজিক নির্মাণ হলে এটি তাকে একজন সম্পূর্ণ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আবেগের বশবর্তী নয় বরং আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য তার এই প্রচেষ্টার সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পেরেছে। ফেইড্রার নিজস্ব যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জগত এত দিন ধোয়াঁশাচ্ছন্ন ছিল, তার নিরন্তর খননের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে এক নতুন মহাকাশ, তার নিজস্ব শৈলি। অভ্যস্ত ছকের বাইরে অতিবাসনাকে প্রশ্রয় দিয়ে ব্যতিক্রম উন্মোচনে ফেইড্রা চরিত্রটি এগিয়ে যায়নি বরং সে প্রচলিত নিয়মের মধ্যে থেকেই নিজের অজাচারকে তরণ করে সমাজে উৎকৃষ্ট উদাহারণ স্থাপনে সক্ষম হওয়া এক নারী। এই শৃঙ্খলা প্রতিটি সভ্য সমাজেই কাম্য। তার সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে ভাবালেও সামাজিকদের নতুন ভাবনায় তরান্বিত করছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. www.theatrewala.net, visited on 10.05.2021.

২. www.theatrewala.net, visited on 10.05.2021.

৩. মিশেল ফুকো, অনুবাদঃ শামছুদ্দিন চৌধুরী, *সুখের ব্যবহার যৌনতার ইতিহাস-৩*, ১ম সংস্করণ,ঢাকাঃ বর্ণায়ণ, ২০১৪)

৪. মিশেল ফুকো, অনুবাদঃ শামছুদ্দিন চৌধুরী, *সুখের ব্যবহার যৌনতার ইতিহাস-৩*, ১ম সংস্করণ,ঢাকাঃ বর্ণায়ণ, ২০১৪)

৫. তদেব

৬. তদেব

৭. তদেব

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. ফ্রয়েড সিগমুন্ড, ভাষান্তরঃ ধনপতি বাগ, *টোটেম ও টাবু*, চতুর্থ মুদ্রণ; কলিকাতাঃ সুবর্ণ রেখা, ২০১৬

১১. ফ্রয়েড সিগমুন্ড, অনুবাদ হোসেন, আলীফ। *একটি দৃষ্টিভ্রমের ভবিষ্যৎ*, ১ম প্রকাশ; ঢাকাঃ সংহতি প্রকাশন, ২০১৩

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৪. www.theatrewala.net, visited on 10.05.2021.

১৫. শেফার, এ, জেরোম ও অনুবাদ- হক, মুহাম্মদ জহুরুল। মনোদর্শন। প্রথম প্রকাশ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

১৬. ফ্রয়েড সিগমুন্ড, ভাষান্তর বন্দোপাধ্যায় সুস্মিতা। পঞ্চম সংস্করণ; কলিকাতা : দীপায়ন, ডিসেম্বর ২০১১

১৭. তদেব।

১৮. www.theatrewala.net, visited on 10.05.2021.

১৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। ষষ্ঠ মুদ্রণ; কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

২০. তদেব

২১. একটি দৃষ্টিভ্রমের ভবিষ্যৎ।

২২. মিশেল ফুকো

২৩. www.theatrewala.net, visited on 10.05.2021.

বাংলা নাটকে আধুনিকতা : মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু

অনির্বাণ সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড

'আধুনিকতা শব্দটি আপেক্ষিক। কারণ আজ যা আধুনিক তথা নূতন, কালের নিয়মে কাল-তা হয়ে যায় পুরাতন। তবুও গতানুগতিক মানবজীবনে বা সমাজজীবনে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা আগামী দিনে চলার পথে একটা নূতন পথের সন্ধান দেয়।' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। আর নাটক যেহেতু সাহিত্যেরই একটি 'Form' তাই নাট্যকলাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা নাটকে আধুনিকতার ক্ষেত্রে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর অবদান। সংস্কৃত নাটকের বেড়াজাল ভেদ করে বাংলা নাটকের শরীরে মধুসূদন যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন দীনবন্ধু সেই শরীরে দান করেন লাবণ্য। এর পেছনে কাজ করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণা। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসনের ও শিক্ষার সংঘাতে বাঙালীর আচার-আচরণে, চিন্তায়-মননে যে আধুনিক ভাবের জোয়ার এসেছিল তার ছায়াপাত সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত তার নাটকেও পড়েছিল। বাংলা নাটকে যে আধুনিকতা এসেছিল তার পথিকৃতের সমান দাবীদার দু'জন — মধুসূদন ও দীনবন্ধু। কারণ (বাংলা নাটকে আঙ্গিকগত ও বিষয়গত দু'ভাবে যে আধুনিকতা এসেছিল তাতে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে মধুসূদন এবং বিষয়ের দিকে দীনবন্ধু ছিলেন স্রষ্টা।) যদিও দু'জনের কেউই আধুনিকতার ক্ষেত্রে পূর্ণসফলকাম হননি।

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাটকের কোন বিশিষ্টরূপ ছিল না; যা ছিল তা'হল প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যধারার অনুসরণের ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও মননে (দীক্ষিত) মধুসূদন তাঁর পূর্বসূরীদের পথে পা না বাড়িয়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন পথের দিশারী হলেন। এর জন্য তিনি কখনও গ্রীক নাটকের রীতি আবার কখনও শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেন। যদিও কোন রীতিটি সঠিক সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। তাই তিনি কখনও পুরাণ থেকে কখনও ইতিহাস থেকে নাট্যকাহিনী সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছিলেন আধুনিক রূপ। পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) ও 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) দিয়ে যে নাট্যকার মধুসূদনের যাত্রারম্ভ সেই নাট্যপ্রতিভার পরমোৎকর্ষ ঘটল প্রথম বাংলা ট্র্যাজেডি নাটক

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)-র মধ্যে; আর অসুস্থ অবস্থায় লেখা শেষ নাটক 'মায়া-কানন' (১৮৭৪)-এ সেই প্রতিভার শক্তি নিঃশেষিত। এরই সঙ্গে চলেছে 'একেই বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) -র মত নবীন ও প্রবীণের দোষত্রুটির সমালোচনামূলক প্রহসন রচনা। গম্ভীর ও লঘুরসাত্মক নাট্যসৃষ্টিতে মধুসূদনের প্রতিভা সাফল্যের সাক্ষর রাখল সুনিশ্চিত ভাবে।

বাংলা নাটকের আধুনিকতার ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক দিয়ে মধুসূদন সফলকাম হলেও বিষয়গত বৈচিত্র্য আনয়নে হয়েছিলেন অক্ষম। আর দীনবন্ধু মিত্র ঠিক এইখানটাতেই হয়েছিলেন পুরোমাত্রায় সক্ষম। মাইকেলের মত বিচিত্র ও বহুমুখী শিক্ষা দীনবন্ধুর মধ্যে ছিল না। কিন্তু যেটা ছিল তা'হল দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা। আর ছিল সাধারণ মানুষ ও সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ — কারণ তাঁর পেশা। মানব সমাজ ও মানব চরিত্রের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগ কতটা নিবিড় ছিল এবং তা তিনি তাঁর নাটকে কতটা সুনিপুণভাবে আঁকতে পেরেছিলেন তা বোঝা যায় বন্ধু সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি মন্তব্য থেকে — "সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।" দীনবন্ধুর পূর্বে মধুসূদন তাঁর দু'খানি প্রহসনে সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করলেও নাটকের বিশাল ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারেননি। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'(১৮৬০)-এ নাট্যিক বিষয়ের সঠিক ও সার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পরবর্তী বাংলাদেশে নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিভীষিকার সূত্রপাত হয়েছিল তাকে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে দীনবন্ধু বাংলা নাটককে একলাফে আধুনিকতার দোরগোড়া পার করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু আরও পাঁচখানি নাটক লেখেন — 'নবীন-তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়েপাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) ও 'জামাই-বারিক' (১৮৭২)। এর মধ্যে 'নবীন-তপস্বিনী' নাটক এবং 'বিয়েপাগলা বুড়ো' বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ প্রহসন বা বিশুদ্ধ প্রহসনের গুণান্বিত নাটক। আর বাকি তিনটি নাটক। এই প্রহসনধর্মী ও হাস্যরসপ্রধান নাটকগুলিতে তিনি কোথাও শুধুমাত্র মানব চরিত্রের অসঙ্গতি দেখানো, কোথাও বা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যায় পটভূমি দেখানোর প্রয়াস করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের শেষ নাটক ছিল পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে

লেখা 'কমলেকামিনী' (১৮৭৩)। কিন্তু এই নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছিলেন।

আলোচ্য দুই নাট্যকারের বিভিন্ন নাটক সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বাংলা নাটকে আধুনিকতার সৃষ্টিতে কতখানি সফল হয়েছিলেন তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে প্রাচ্য বা ভারতীয় নাট্যধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যধারার সংযোগ ঘটালেন। তিনি বরাবরই নাটকে পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন; (যার প্রমাণ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি চিঠি। সেখানে তিনি লিখছেন "আমার মত হচ্ছে, আমাদের নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা হওয়া উচিত, তবে এই পরিবর্তনটা ধাপে ধাপে করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। .....আমি মিস্টার বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণের নিময়াবলীতে বন্দী হয়ে পড়ব না।

আমি ইউরোপের মহান নাট্যকারদের আদর্শ অনুসরণ করব।" এই মানসিকতার বশবর্তী হয়েই তিনি বাংলা নাটককে ইউরোপীয় রীতিতে (শেক্সপীয়রিয় ও গ্রীকের) আধুনিক সাজসজ্জা ও অলঙ্কারে ভূষিত করেন। কারণ তাঁর মতে য়ুরোপীয় নাটকে "Seven realities of life. Lofty passion and heroism of sentiment" আছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত নাটকে শুধু "all softness, all romance." যদিও তিনি তাঁর প্রথম দু'খানি নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'-তে এই 'softness' ও 'romance'-এর আতিশয্য কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের প্রথায় তাঁর নাটকগুলি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অঙ্ক কয়েকটি দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত।

পাশ্চাত্য রীতির আমদানী বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ও ভারতীয় নাট্যরীতির সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় সংস্কৃত নাট্যধারায় অভ্যস্ত পাঠক ও দর্শক ভালোভাবে নেবে না এটা মাইকেল পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে 'শর্মিষ্ঠা' ও পরে 'পদ্মাবতী' নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য রীতির প্রসার ঘটান। তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকের বিষয়বস্তু গ্রীক নাটক 'Apple to Discord' থেকে গৃহীত। যদিও এই নাটকের শেষ হয়েছে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী সকলের শুভকামনার মধ্য দিয়ে।

মধুসূদনের নাটকের সর্বপ্রধান আধুনিক বৈশিষ্ট্য ও গুণ -নাটকের শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত কাহিনীকে এক দৃঢ় সূত্রে সংঘবদ্ধ করা। প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'-তেই নানা

ত্রুটি সত্ত্বেও এই গুণটির দেখা মিলেছিল এবং পরবর্তী নাটকগুলিতে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

নাটকের চরিত্রের মধ্যে আধুনিক নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি মধুসূদনই প্রথম বাংলা নাটকে আনয়ন করেন। এর প্রমাণ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ চরিত্রটি। রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়ে রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম ও তার পরিণতিতে উদয়পুরের ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘের সূচনা করে তাতে জড়িয়ে পড়েন উদয়পুর রাজের ভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ। রাজা ভীম সিংহ তাঁর রাজ্য এবং রাজ্যবাসীকে দুই যুযুধুবান রাজার হাত থেকে বাঁচাতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার জন্য বলেন্দ্র সিংহকে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে বলেন্দ্র সিংহ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কারণ একদিকে দেশরক্ষা, রাজানুগত্য ও রাজাদেশ অপরদিকে প্রাণাধিকা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণহরণ — কোনটি পালনীয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেন্দ্র সিংহের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা নাটকে চরিত্রের মধ্যে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা নাটকের আধুনিকতার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন।

মধুসূদনের পূর্বে সংস্কৃত নাট্যসংলাপ ত্রিস্তরে বিন্যস্ত ছিল। অপরদিকে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য নাট্যসংলাপ এ ধরণের নয়। সেখানে সংলাপ ও সংঘাতের একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সংলাপ যেমন দ্বন্দ্বের বাহক, দ্বন্দ্বও তেমনি সংলাপকে সৃষ্টি করে। সংলাপ দ্বন্দ্বকে টেনে নিয়ে যায়। আবার দ্বন্দ্ব না থাকলে সংলাপ প্রাণ পায় না। নাটকের চরিত্র কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তার উপরই সংলাপের চরিত্র নির্ভর করে। সংলাপের এই রীতিটিকে মধুসূদন বাংলা নাটকে প্রথম নিয়ে এলেন।

পাশ্চাত্য নাট্যরীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য ট্র্যাজেডিতে নাটকের পূর্ণতা। বাংলা নাটকে প্রথম ট্র্যাজেডি নিয়ে এলেন মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে এবং এতে তিনি সফলতাও লাভ করেন। ট্র্যাজেডির যে যে বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি নাটক সফল ট্র্যাজেডি নাটক হয়ে ওঠে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল। নাটকে রাজা ভীমসিংহের যে করুণ পরিণতি আমরা দেখতে পাই তার জন্য রাজা নিজে পুরোপুরি দায়ী নন। কারণ রাজা ভীমসিংহ বীর হলেও একদিকে আক্রমণকারী দুই রাজার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে দ্বিধা অন্যদিকে রাজ্যবাসীর ও রাজ্যের ক্ষতি এড়ানোর চিন্তা তাঁর চরিত্রে যে দোলাচল বৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে তাতে তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়েছেন। যার পরিণতি ফুলের মতো নিষ্পাপ রাজকন্যা কৃষ্ণার বিষপানে আত্মহত্যা। ফলস্বরূপ সন্তান

হারানোর তীব্র মর্মবেদনায় রাজা তথা পিতা ভীমসিংহের নিদারুণ হাহাকার যা আধুনিক ট্র্যাজেডির সার্থক রূপায়ন।

মধুসূদন তাঁর প্রহসন দুটিতে ('একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') সংস্কৃত প্রহসনের পরিবর্তে ইংরাজী ফার্সের ধারা গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের আগে রামনারায়ণ তর্করত্ন যে সমস্ত প্রহসন রচনা করেছিলেন তার মধ্যে আর যাই হোক আধুনিকতা বা বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছিল না। কিন্তু মধুসূদন তাঁর প্রহসন দু'খানিতে তৎকালীন সমাজের নবীন ও প্রবীণের দোষক্রুটির যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন তাতে আধুনিকতার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তারও যথেষ্ট ছাপ ছিল।

মধুসূদন যেখানে বাংলা নাটককে ছাড়েন ঠিক সেখানেই ধরেন দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদন বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য রীতির প্রণয়ন করায় বাংলা নাটক লাভ করেছিল এক অন্যমাত্রা। নাটকে আধুনিকতার পূর্ণতা ঘটানোর ক্ষেত্রে যে বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব ছিল তা পুরোপুরি ঘোচান দীনবন্ধু। দীনবন্ধুই প্রথম বাংলা নাটককে বিষয়গত দিক দিয়ে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তাতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। দীনবন্ধু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীকে তাঁর নাটকের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেন নি। তিনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে সমাজের তৎকালীন নানা বাস্তব ঘটনা ও বিষয়কে নির্বাচন করেছিলেন ; যার সার্থক রূপায়ন অসামান্য মঞ্চসফল ও যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দুটি প্রধান গুণ ছিল ঃ সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং প্রবল ও স্বাভাবিক সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি। এই অভিজ্ঞতা ও মানব প্রীতিকে সম্বল করেই তিনি সামাজিক নাটক রচনায় সফলতা অর্জন করেন। নীলের হাঙ্গামা আজ প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিরূপে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এই নাট্য রচনা কালে নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার এবং নীলচাষীদের প্রতিবাদ ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। দীনবন্ধুর এই নাটকের বিষয়বস্তু সমকালীন এবং সেকালের ঘটনা আজকে শতাব্দী পূর্বের ইতিহাসও সেই বিষয় অবলম্বনে লেখা নাটক আজ দলিল রূপে মান্য।

নাটকটির বড় গুণ তার বাস্তবতা যা বাংলা সাহিত্যের পথ নির্দেশ করেছিল। জনৈক সমালোচকের মতে— " নাটকটির সর্বাঙ্গে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের এক আশ্চর্য, দীপ্তি ঝলমল করছে। মনে হয় এর সব ঘটনাই নাট্যকার জীবনের কোন না কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।" নাটকটির অপর সম্পদ এর ভাষা। ভাষার এমন আশ্চর্য তীক্ষ্ণ সহজ প্রয়োগ একেবারে কথ্য ভাষার যাবতীয় গ্রাম্যতা যুক্ত প্রয়োগ বাংলা নাটকে এর পূর্বে আর দেখা যায়নি। চরিত্রের মুখের ভাষার এই গ্রাম্যতার

জন্য অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে রুচিহীনতার অভিযোগ এনেছেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ পাইতাম।"

দীনবন্ধু তাঁর অন্য তিনখানি নাটকের ('সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' ও 'জামাই বারিক') ক্ষেত্রেও বিষয় নির্বাচনে বিশেষ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। এই নাটকগুলি অল্পবিস্তর নাগরিক স্পর্শযুক্ত এবং এই তিনখানি নাটকেই সামাজিক সমস্যাকে তিনি স্পষ্ট এবং গভীর ভাবে এঁকেছেন। 'সধবার একাদশী'-র পটভূমি খাস কলকাতা শহর, 'লীলাবতী'-র কলকাতার উপকণ্ঠ শ্রীরামপুর এবং 'জামাই বারিক'-এর পটভূমি কলকাতার উপকণ্ঠ সংলগ্ন কোন স্থান। এর থেকে প্রমাণিত হয় তাঁর নাটকের বিষয় বৈচিত্রের বিভিন্নতা, যা তাঁর নাটকগুলিকে করেছিল সমৃদ্ধ।

তাঁর দুটি প্রহসন নাটকের মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে এক কাল্পনিক দিবাস্বপ্নের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে তিনি সত্যকারের মানুষদের নিয়ে এক সকৌতুক সরস কাহিনী নাটকের মাধ্যমে রচনা করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। এতে যে সরস ও সকৌতুক কাহিনীর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে সার্থক কমেডির প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রথম সার্থক বাংলা কমেডি নাটক রচয়িতার কৃতিত্ব দীনবন্ধুর যার প্রমাণ 'লীলাবতী' ও 'নবীন তপস্বিনী' নাটক। — যা আধুনিক বাংলা নাটকের রীতিগত দিক থেকে আর একটি বিবর্তন ঘটিয়েছিল।

সাহিত্য ক্ষেত্রে মধুসূদন ও দীনবন্ধু দু'জনেরই প্রথম আবির্ভাব ঘটে কবি হিসেবে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় ও প্রয়োজনের তাগিদে দু'জনেই বাংলা নাট্যক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন। মধুসূদন বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের মহড়া দেখতে গিয়ে বাংলা নাটকের দৈন্যদশা উপলব্ধি করে নিজেই তার দৈন্যতা ঘোচাতে অবতীর্ণ হন এবং কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও সফল হন। অপরদিকে কবি দীনবন্ধুর জীবিকার সূত্রে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন যাকে প্রকাশ করবার একটি মাত্র শিল্পরীতি নাট্যরচনা — যা তিনি অনিবার্যভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তার সঙ্গে নীলকরের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দৃষ্টিপথে যাতে পড়তে পারে সেই কারণেও হয়তো তিনি এই অত্যাচারের কাহিনীটি প্রকাশের তীক্ষ্ণতম ও প্রত্যক্ষতম পন্থা হিসাবে নাটক-রচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন কালানুযায়ী অনিবার্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীনবন্ধুকে নাট্যকার হিসাবে প্রকটিত করেছিল।

সবশেষে বলা যায় মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা নাটককে সূতিকাগার থেকে মুক্ত করে আধুনিক বাস্তব পৃথিবীর শক্ত জমিতে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, জৈষ্ঠ্য ১৪১৭।

২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫ম সংস্করণ, বইমেলা ২০০২, কলিকাতা।

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, নাট্যকার মধুসূদন, গ্রন্থনিলয়, ভাদ্র ১৩৬৯।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।

৫. সুশীলকুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, মাঘ ১৩৫৮।

৬. বনানী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), নীলদর্পণ : দীনবন্ধু মিত্র, ২০০৮, রত্নাবলী, কলকাতা।

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা।

৮. সব্যসাচী রায় (সম্পাদনা), দীনবন্ধু রচনাবলী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা।

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪০৫, কলকাতা।

১০. অজিতকুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৯৭, কলকাতা।

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ২য় খণ্ড, সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০, কলকাতা।

১২. জামান মানসী, বাংলা নাটক আর্থ সামাজিক দৃশ্যপট, জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯২, কলকাতা।

১৩. পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, প্রমা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ১৯৯২, কলকাতা।

১৫. দেবনারায়ণ গুপ্ত, একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, ১৯৮২, কলকাতা।

১৬. শীতল ঘোষ, বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডিতত্ত্বের প্রয়োগ, বর্ণালী, ১৯৮৩, কলকাতা।

১৭. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ২০০৪, কলকাতা।

১৮. উজ্জ্বল মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা।

১৯. কিরণচন্দ্র দত্ত, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি, জানুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা।

২০. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত।

২১. তরুণ মুখোপাধ্যায়, বাংলা নাটকের দিগবলয়, ভাষা ও সাহিত্য, আগস্ট ২০১৪, কলকাতা।

দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়ন এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর চারটি ছোটগল্প

হাসনারা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : *বর্তমান টাচ ওয়ার্ল্ডের যুগে সম্পর্কের বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে অবিরত। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়, সুস্থ-সুন্দর সম্পর্কগুলো কীভাবে মানুষের বিকৃত মানসিকতার বলি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই পরিস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিটিও নতুন করে 'দাখিলা' নিতে চাইছে। একুশ শতকের অতি আধুনিক জীবনধারায় দাম্পত্যের বন্ধন কী ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? নাকি সেক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নতুন কোন রসায়ন? সোস্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের যুগে, নারী-পুরুষের বিশ্বাসের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা এবং টিকে থাকা দাম্পত্যের বহুমাত্রিক রূপ হাজির করেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। এই নিবন্ধে সেই দিকটিই আলোচনা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ : *দাম্পত্য সম্পর্ক, আধুনিক জীবন-যাপন, সম্পর্কের জটিলতা, মানসিক অবসাদের কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে যাওয়া, বিচ্ছেদের মুক্তি এবং বিরহের যন্ত্রণা*

মূল নিবন্ধ :

"সন্ধেবেলা ঝগড়া হবে, হবে দুই বিছানা আলাদা
হপ্তা হপ্তা কথা বন্ধ মধ্যরাতে আচম্‌কা মিলন
পাগলী, তোমার সঙ্গে ব্রহ্মচারী জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে আদম ইভ কাটাব জীবন।"[১]

পাঁচালী: দম্পতীকথা/জয় গোস্বামী

চূড়ান্ত ঝগড়াঝাঁটির মাঝে 'মধ্যরাতের আচমকা মিলন' আবহাওয়ার পারদ নামিয়ে দাম্পত্যের নতুন সকাল নিয়ে এলো; সেই সঙ্গে আর এক ঝগড়ার্ সূত্রপাতও। সেক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) হয়তো বলবেন, ঝগড়া-ঝাঁটির সময় একবার তাৎক্ষণিক 'ডিভোর্স' হয়ে যাক। তারপর রাগ কমলে আবার না হয় মিলনের 'লেখাপড়ি' তৈরি করে নেওয়া যাবে।[২] শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত দম্পতির ক্ষেত্রে দাম্পত্য

সম্পর্কের নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি না থাকাই আধুনিকতা। বোঝা গেল। তবে হাজার বছরের 'পৌরুষ'কে শিথিল করিবে কেমনে! যেখানে পঁচিশ তলার ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট থেকে দামি গাড়িতে চড়ে পার্টিতে যাওয়ার আগে ম্যাডামকে শরীরের কালসিটে দাগ ঢাকার জন্য মেকআপের প্রলেপ লাগাতে হয়, সেখানে কানুনের কোন ধারাই যে 'ফাউন্ডেশানে'র সমকক্ষ হতে পারে না। আবার কোন ক্ষেত্রে উষ্ণতাহীন সম্পর্ককে বয়ে নিয়ে যেতে হয়, মেকি হেসে সোস্যাল মিডিয়ায় ছবি দিতে হয়। আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ নিরুপায়, অসহায়। দাম্পত্যের বন্ধনে তার হরেক কিসিমের 'হওয়া' 'না-হওয়া' কে হাজির করেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী (জন্ম-১৯৫৬)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঠেলায় দাম্পত্যের হেঁসেলে পরিবর্তন এসেছে বৈকি! তবে পৌরুষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিব্যক্তি প্রকাশের স্থল হিসেবে স্ত্রীর ওপর নির্যাতনের প্রশান্তি আজও বিলুপ্ত হল কই! পরিবর্তিত জীবনধারায় নারী আজ কর্মক্ষেত্রের অঙ্গনে প্রবেশ করছে ঠিকই, দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে এখনও সে সমানাধিকারের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাতে কি পেরেছে? বর্তমান সময়ের অতিপরিচিত লেখক, অনিতা অগ্নিহোত্রীর রচনায় সেই সম্পর্কের বুনন পেয়েছে আলাদা মাত্রা। এক্ষেত্রে তাঁর চারটি গল্পের ('সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক', 'পিঞ্জর', 'হ্রদ', 'নিস্ফলা') প্রসঙ্গ আমরা আলোচনায় আনবো।

অভিজ্ঞতার ঝুলি আর কল্পনার মেল-বন্ধনের এক নিবিড় বুননই সাহিত্যের চেহারা নেয়। সে চেহারা তো আসলে সম্পর্ক স্থাপনেরই ফল। তারপর পাঠকের দরবারে আর এক সম্পর্ক স্থাপনের পালা। শব্দরাজির সঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি পাঠকের জীবনের ভাস্বর হয়ে ওঠে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পগুলিতে সেই স্বাদ পাঠকেরা অনুভব করতে পারেন। সেই সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের রসদও। ওড়িষার আদিবাসী সমাজের গল্প হোক বা মহারাষ্ট্রের আখকাটাই শ্রমিকের কথা – অনিতা অগ্নিহোত্রীর কলম কোথাও 'কম্প্রমাইজ' করেনি। তবে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার ছবিও যে সেখানে আলাদা মাত্রা পাবে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা। প্রতিষ্ঠিত দম্পতির উত্তাপহীন সম্পর্ক, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, সন্দেহের অতিমাত্রা, শারীরিক নির্যাতন, উন্নাসিক ব্যবহার, হত্যা বা আত্মহত্যায় বাধ্য করা – দাম্পত্য সম্পর্কের নানা জটিলতার ইঙ্গিত মেলে অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে।

২

'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি একটি বিচ্ছেদের গল্প। সুমন্ত্র আর বুলবুলির দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটার গল্প। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখেছি সুমন্ত্র অসময়ে বাড়ি ফিরছে।

পরে ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারছি, সেদিন তার ডিভোর্সের দিন ছিল। কোর্ট থেকে সরাসরি বাড়িতে চলে গেছে সে। বুলবুলির স্মৃতি জড়ানো বাড়িটায় সুমন্ত্র বড় একা বোধ করে। অথচ তেমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না। তাদের সম্পর্কের উষ্ণতা তো অনেক দিন আগেই উবে গিয়েছিল। দুজনেই চেয়েছিল, ডিভোর্স নামক মুক্তির স্বাদ নিতে। কিন্তু সুমন্ত্রের আজকের এই অনুভূতির জায়গাটা একটু আলাদা, একটু বেদনাদায়ক, একটু চিনচিনে ব্যথা দেয়। বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিসে সে বুলবুলির স্পর্শ অনুভব করতে চেষ্টা করে। তার তানপুরাটাকে যত্ন করে ডিভানের ওপর শুইয়ে রাখে। সেটাকে স্পর্শ করে বুলবুলির অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করে। প্রেমের সম্পর্ককে পরিণতি দিতে যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল, সেই বিয়ে নামক বন্ধনের শেষ পরিণতি, বিচ্ছেদ। সম্পর্কের এই ছেঁড়া অভিজ্ঞতা নিয়ে সুমন্ত্র কি আবার 'ব্যাচেলারে'র দলে ভিড়তে পারবে? বুলবুলির মধ্যেও কি সুমন্ত্রকে ঘিরে বিচ্ছেদের কোন সুর বাজছে? নাকি সে ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হবে? সুমন্ত্রের মধ্যে চলে এক কাল্পনিক কথোপকথন –

> *"আচ্ছা, বুলবুলি কীভাবে বলবে? ...*
> *... হ্যাঁ রে, পেয়ে গেছি। বাব্বাঃ কেশ যেন আর শেষ হয় না ...*
> *অথবা, মাসিমণি, শোন, আয়্যাম ফ্রি! কি দারুণ না...*
> *অথবা, কিছুই না বলে চুপ করে থাকবে। পারবে না বুলবুলি?"*[৩]

পাঠকের মনে প্রশ্নগুলো গেঁথে দিয়ে গল্পকার সুমন্ত্রকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। আধুনিক মানুষের এই বিচ্ছেদ, একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গ অনুভূতিই 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটির মূল বিষয়বস্তু। গল্পটিতে মুক্তির সংজ্ঞাটিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

'পিঞ্জর' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। দাম্পত্য সম্পর্ক, প্রেম সন্দেহ, সেখান থেকে বিকার, শারীরিক নির্যাতন এবং মৃত্যু – এই হল 'পিঞ্জর' গল্পটির মূল বিষয়। পিঞ্জর অর্থাৎ খাঁচা যেখানে কাউকে বন্দি করে রাখা হয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, বুড়ো কেশব তার পুরোনো বাড়িতে যাচ্ছে। সে বাড়ি বিক্রি করতে। টাকাপয়সার লেনদেন আগেই হয়ে গেছে। সেদিন শুধু বাড়ির চাবি হস্তান্তরের পালা। নিজের ফেলে আসা পুরোনো বাড়িতে যেতে যেতে কেশবের মনে ভেসে ওঠে পুরোনো স্মৃতির ডালি। কিশোরী, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। কিশোরীর মধ্যে ছিল এক আকর্ষণী শক্তি। আর ছিল রূপের বাহার। সেটাই ছিল কেশবের অশান্তির মূল কারণ। কিশোরী কেশবকে ভালোবাসলেও, কেশবের মনে তখন ঢুকে গেছে সন্দেহের বীজ। বাইরের লোক তো

বটেই এমনকি নিজের ভাইদের সঙ্গেও কিশোরীর কথা বলা, হাসি ঠাট্টা করাকে বিষ নজরে দেখতে লাগল। আসলে সম্পর্কের মূল সম্পদ হল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের কোঠায় সন্দেহের ভার বেশি হতে শুরু করল। সেই সন্দেহ একদিন চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেল, শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে। ট্রেনে করে ফেরার সময় অচেনা এক লোক কিশোরীকে বাদাম ছাড়িয়ে খাইয়েছিল। সেই দেখে রক্তচক্ষু কেশব বাড়িতে এসে কিশোরীকে মারধর করে। তারপর থেকে রটে যায় কিশোরী বেপাত্তা। কেশব দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। কিন্তু কিশোরীর স্মৃতি মন থেকে সরাতে পারেনি। পুরোনো বাড়িও ছেড়ে চলে যায়। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কেশব এসেছে সেই বাড়িতে। এর আগে যদিও বাড়ির নতুন মালিক বহুবার তাড়া দিয়েছে, বাড়িটা হস্তান্তর করার। কিন্তু কোন না কোন কারণ দেখিয়ে কেশব এড়িয়ে গেছে। আসলে এই বাড়িতেই ছিল কিশোরীর প্রাণহীন শরীর। কেশবের হাতে মার খাওয়ার পর সে আত্মহত্যা করে। তার লাশকে রান্নাঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখে কেশব। কুড়ি বছর পর সেই লাশকে, যা এখন কয়েক খণ্ড হাড়ে পরিণত হয়েছে, বাক্সবন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাক্স নিয়ে কোথায় যেত তা স্পষ্ট করে বলা নেই তবে তার আগেই বাসে কন্ডাক্টার তাকে নামিয়ে দেয়। কেশবের অন্তরের ভালোবাসা ডুকরে ওঠে,

> *“খুব চেয়েছিলাম রে, বউ, তোকে, নিজেই জানিনি কত। রঙ, রক্ত, মাংস, রূপ সব ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চাইতে চাইতে। ঘুমের মধ্যে দীর্ঘ এক রেলগাড়ি কেশব আর কিশোরীকে নিয়ে ছুটতে থাকে, ছুটতেই থাকে দিগন্তের দিকে।”*[৪]

এক অজানার উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করে। রক্ত, মাংস, রূপ, রঙ, গন্ধ – কিছুই যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

‘হ্রদ’ গল্পটিতে হ্রদ আসলে বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া এক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একটি অঞ্চলেই এই হ্রদের অস্তিত্ব। গল্পের কথক অতনু এবং তার স্কুল বেলার বন্ধু সুজিতের নানা স্মৃতির কথা উঠে এসেছে গল্পের কথকের বর্ণনায়। সেই সুজিত নিরুদ্দেশ। তার মায়ের একান্ত অনুরোধে অতনু বেরিয়েছেন সুজিতের খোঁজে, সঙ্গে সুজিতের স্ত্রী অ্যানা এবং কুকুর টাও। পথে যেতে যেতে কথকের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে টুকরো সব স্মৃতি। বদমেজাজী সুজিত মেয়েদের মহলে বেশ জনপ্রিয় তার শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য। অন্যদিকে কথক অতনু ছিল, ‘রোগা’, ‘বেঁটে’। একবার মেয়ে ঘটিত কারণেই কথককে মারধোর দেয়। থানা-পুলিশ অব্দি

গড়িয়েছিল সেই ঘটনা। তারপর আঠারো বছর কেটে গেছে। অতনু এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সুজিতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে সে টিকে গিয়েছিল, "যাকে মুঠোয় আনতে না পেরে অন্ধ রাগে সুজিত"[৫] তাকে মেরেছিল, সেই শ্যামলা এখন তার বউ। "শান্ত বন্ধুত্বের পথ ধরে ফলে-ফুলে ভরে উঠেছে দাম্পত্য।"[৬] তার মায়ের অনুরোধে আবার বহু বছর পর সুজিতের অনুসন্ধানে চলেছে সে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই হ্রদের ধারে একটা হোটেলে থাকতে আসে অতনু আর সুজিতের স্ত্রীর পরিচয়ে আসা একটি মেয়ে। সেখানেই সে আবিষ্কার করে সুজিতের স্ত্রী অ্যানার পরিচয়ে যে মেয়েটি তার সঙ্গে এসেছে, সে আসলে অ্যানার বোন ফ্রিডা। অ্যানাকে সুজিত হত্যা করে এই হ্রদের ধারেই পুঁতে দিয়েছে এবং নিজে নাম ভাঁড়িয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। পরে পুলিশের তৎপরতায় সুজিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অতনু মেয়ে মহলে পাত্তা পেত না এবং সুজিত বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো, সেই সুজিত আজ জেলের চার দেওয়ালের অন্ধকারে। আর অতনু জীবনের খাতায় ফুল মার্কস পাওয়া। বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুজিত কোনদিন মান্যতা দেয় নি। এমনকি দাম্পত্যের সম্পর্কও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তার দম্ভই তার পরিণতির কারণ।

'নিস্ফলা' গল্পটিতে দাম্পত্যের অন্য রসায়ন দেখি। সেখানে একজন লোক শূচিবায়ু-র দ্বারা আক্রান্ত। পাশাপাশি অহং বোধের কারণে নিজের প্রতি অন্ধ মোহ। যে কারণেই শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও, চাকরি ছাড়েন। সিদ্ধান্ত নেন, স্বাধীন ব্যবসা খোলার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। "দ্বিগুণ উৎসাহ ও ধৈর্যের সঙ্গে সে বাড়িটাকে শোধরাতে আরম্ভ করে দিল। তারপর ব্যবসার ইচ্ছে কেমন যেন তলিয়ে, হারিয়ে গেল মনের মধ্যে। আবার কে ব্যাঙ্কে যায়, জমি দেখে, মালপত্র কেনে।"[৭]চাকরি ছেড়ে বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পরেই তার মনে হয়, সংসারে সব কিছুই অগোছালো, অপরিষ্কার। সে লেগে যায়, সেই সব পরিষ্কারের ভিড়ে। বাড়ির শিশি বোতল পরিষ্কার করতে, জামা কাপড় ইস্ত্রি করতেই সময় চলে যায়। ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলের উপস্থিতি তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সংসারের মানুষগুলোর ছায়া এড়ানোর জন্য বাড়ির মাঝখানে দেওয়াল তুলে দেয়। এভাবেই একাকিত্বের গণ্ডিতে সে নিজেকে বেঁধে ফেলে এবং একদিন মারা যায়। মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মেয়ে এসে তার ঘরে যখন দেখে আলমারি ভর্তি থরে থরে সাজানো তাদের শাড়ি জামা ফ্রক, প্রত্যেকটি জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা, তখন সেই লোকটির প্রতি একটি সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। এখানে দাম্পত্য সম্পর্ক বা বাৎসল্য সম্পর্কের যে ছবি দেখানো হয়েছে, তাতে আধুনিক

মানুষের নিঃসঙ্গতা ও উত্তাপহীন সম্পর্ককেই তুলে ধরা হয়েছে। আসলে আধুনিক মানুষ এই সম্পর্কগুলোর বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে অপারগ। ঐ লোকটা বা তার স্ত্রী বা মেয়ে কেউই সম্পর্কের দায়কে স্বীকার করেনি। এর সবথেকে বড় কারণ হল অর্থনৈতিক। লোকটি চাকরি ছাড়ার পর তার স্ত্রী এক চাকরিতে ঢোকে, সংসারের পুরো খরচ সেখান থেকে না এলেও, বাকিটা আসত স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে। এই নির্ভরশীলতার জায়গাটা কোথাও যে বিচ্ছেদের পরিধিটিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যা, একটা নিস্ফলা সম্পর্কের জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল।

৩

"যদিদং হৃদয়ং মম,তদস্তু হৃদয়ং তব।।" হৃদয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবশ্য আইনের আশ্রয় রয়েছে। ফলে, সুমন্ত্র আর বুলবুলির বিছানায় যখন 'আচমকা মিলন' হলো না, তখন বিচ্ছেদের রাস্তা খোলাই ছিল। তাতে জটিলতা আসেনি ঠিকই, তবে আইন আর মন যে আলাদা পথের পথিক! 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি আইনি বিচ্ছেদের গল্প। সেই বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সম্ভাব্য মুক্তি। অর্থাৎ মুক্তি মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু অঙ্ক মিলল না। মুক্তির আনন্দকে ম্লান করে দিল বিচ্ছেদের চিনচিনে ব্যথা। একা সুমন্ত্র, ফাঁকা বাড়ি আর বুলবুলির স্পর্শের শ্রাবণী মেঘ – বিরহের উদ্দীপন বিভাব। বিচ্ছেদনামায় যে সম্পর্ক শেষ হয় না, সেটাই যেন সুমন্ত্রের অভিব্যক্তি দিয়ে লেখক বোঝাতে চাইছেন। বুলবুলির তানপুরাটা পরিষ্কার করে, সেটাকে ডিভানের ওপর রেখে 'চুপ করে যন্ত্রটার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল ডিভানে।' অথচ তাদের মধ্যে 'নিস্ফল মাথা খোঁড়াখুঁড়ি' করতে হয়নি। "এক জ্যোৎস্না রাতে তারা হঠাৎ পরস্পরকে আবিষ্কার করল— স্পর্শ-সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন অসহায়..."[৮]বয়ে বেড়ানো সম্পর্কের পরিবর্তে তাদের নতুন পরিচিতি। সুমন্ত্রের প্রশ্ন জাগে, সেকি এখন 'এলিজিবল ব্যাচেলার'? এরপর যদি কোন অবিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন কোন নারী তাকে কামনা করে, তাহলে সে আপত্তি করবে না, সাড়া দেবে। তবে, মনের বিচ্ছেদ বেদনার ঘা'য়ে জ্বালা বাড়াতে অভিমন্যু আর বুলবুলির কল্পিত মিলনের ছবি আক্ষেপের সুরকে জাগিয়ে তুলবে না কি? সুমন্ত্র ভাবনার গতি হারায়, সে ঘুম চায়। পাশে চায়, বুলবুলি না হোক তার তানপুরাটাই সই। গায়ের চাদরটা তানপুরার ওপর জড়াতেও ভোলে না। আধুনিক মানুষ, নিঃসঙ্গ, একা; আধুনিক মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করলেও তার স্বরূপ আত্মস্থ করতে পারে না।

বন্ধন, ক্ষেত্রে বিশেষে পিঞ্জর হয়। স্মৃতির পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা একবাক্স যৌবন নিয়ে কেশব পাড়ি দিয়েছিল অজানা উদ্দেশ্যে। সে-ই বা পিঞ্জর থেকে মুক্ত ছিল কবে! নিজের 'বিচ্ছিরি' চেহারার পাশে কিশোরীর 'অমন রূপ'! তাও, শুধুমাত্র রূপ হলেও চলত। এক দুর্বার আকর্ষণী শক্তি। সমস্ত পুরুষ মানুষের চোখই যেন কিশোরীতে আবদ্ধ। তবে কেশবের মনে এক প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল। এক আকর্ষণী 'স্ত্রী-ধন' তার রয়েছে, ঈর্ষণীয় বস্তু তো বটেই! কিন্তু মনের অবচেতনে গড়ে ওঠা হারিয়ে ফেলা ভয়, সেখান থেকেই সন্দেহ। এক আশঙ্কা আর ভয়ের জায়গা থেকেই অধিকারবোধের চেতনা গাঢ় হয়ে ওঠে। তাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখার এক অদম্য বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ্বাস বা ভালোবাসার ওপর আস্থা হারিয়ে এই মানুষটি নিজেই এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। পেশায় ছোট দোকানদার এই মানুষটি আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাঠ জানে না। তার কাছে স্ত্রী- ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মৃত্যুর পরও কিশোরীর দেহকে তাই দাহ করেনি। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিয়ের ক্ষেত্রে সে ভুল করেনি।" অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে কেশব প্রথম বুঝল সে কত নিশ্চিন্ত। কিশোরী তারই রইল, অন্নপূর্ণা তার হলই না। অন্নকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। পৃথিবীর লোভী চোখ থেকে তাকে বাঁচানোর কোনও দায় নেই কেশবের।"[৯] কারণ "অন্নপূর্ণা দেখতে খুব সাধারণ, বেঁটে ঢিলেঢালা গড়ন"[১০]ভালোবাসার জায়গা থেকে হারানোর ভয় এবং সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের সমাধি ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ – অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'পিঞ্জর' গভীর মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

'হ্রদ' গল্পটিতে অবশ্য সুজিত আর অ্যানার বিয়ে হয়নি। তারা একসাথে থাকতো। তবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এই 'থাকা'কেও বিয়ের নাম দিয়ে দেয় অচিরেই। আমরাও দম্পতির দলেই তাদেরকে ঢুকিয়ে দেবো। এই অ্যানাকে সুজিত মেরে ফেলে, কারণ বিশেষ জানা যায় না। সুজিত যে তার ওপর শারীরিক অত্যাচার চালাতো, সে খবর অ্যানার বোন ফ্রিডা জানিয়েছে। এই গল্পে সেই মৃত্যু এবং অপরাধজনিত বিষয়টার থেকেও সুজিতের চরিত্রটি বেশি ফুটে উঠেছে। স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকেই সুজিত ছাত্রমহলে বা বিশেষ করে ছাত্রীমহলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তার একমাত্র কারণ, তার দৈহিক সৌন্দর্য। তার মধ্যে এক উন্নাসিক ভাব, মারকুটে স্বভাব তখন থেকেই ছিল। তবুও তার বাহ্যিক আবরণ, তাকে প্রাধান্য দিত। শেষ পর্যন্ত সেই স্বভাবের বশেই খুনের মতো অপরাধ এবং গা-ঢাকা দেওয়া। অন্যদিকে কথক চরিত্রটি, যার নাম অতনু, তার মধ্যে একদ্বন্দ্ব কজ করেছে শৈশব থেকেই। সে

জানতো, সুজিতের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতায় পারবে না, তবুও বেঁটে শরীর আর 'সাতপুরু শ্যাওলার মত' গায়ের রঙ নিয়ে হীনমন্যতা ছিলই। তবে সেই হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠেছে সে। শ্যামলাকে নিয়ে যে প্রতিযোগিতার আসর তৈরি হয়েছিল, সেখানে অতনু জিতে গেছে। শ্যামলা, এখন অতনু স্ত্রী। কিন্তু আঠারো বছর পর আবার যখন সুজিত তার জীবনে ফিরে আসছে, তখন তার মনে আশঙ্কার কোন ছায়া নেমে আসছে কি? গল্পের শুরু থেকেই তার বিবাহিত জীবন, সফল কেরিয়ারের প্রসঙ্গ, সুজিতের মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের মহানুভবতার ভাবকে ঠাঁই দেওয়া – ইত্যাদি অংশগুলি কি তার অবচেতন মনের জটিলতাকে সন্দেহ মেশানো ভয়কে বাইরে আনে না? গল্পের শেষে সুজিতকে পুলিশের জিম্মায় তুলে দিয়ে অতনু কি নির্ভার হয় না! শেষ পর্যন্ত সেও ভাবতে বাধ্য হয় – "আমাদের কিছু নিজস্ব স্মৃতি আছে। সেগুলি ঘষে তুলে দিতে হবে। এক আততায়ী আমার আর শ্যামলার মাঝখানে কুঁজো, শীর্ণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তা হয় না। আমরা কোনও চাঁদের রাতে অলীক হ্রদের কিনারায় পরস্পরের মধ্যে মিশে এক হয়ে যাব।"[১১]

সম্পর্কের মধ্যে যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যায় তাহলে তা অচিরেই নিভে যেতে থাকে। আসলে একে অন্যের পাশে থাকাটাই সম্পর্ক, একে অন্যের ওপর বিশ্বাস রাখাটাই সম্পর্ক। 'নিস্ফলা' গল্পটি আসলে সেই বার্তাটাই দিতে চেয়েছে। এই গল্পের 'লোকটি' তার নিজস্ব সংকীর্ণতা নিয়ে গুটিয়ে গেলে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই সম্পর্কের দায় কাঁধে তুলে নেয় নি। তাদের কাছে সম্পর্ক আসলে প্রয়োজনের সম্পর্ক। যেই মুহূর্তে লোকটি চাকরি ছেড়ে বাড়িতে সময় কাটাতে লাগল, যেই মুহূর্ত থেকে সে সংসারের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল তখন থেকেই তার তৈরি করা সম্পর্কগুলো ফিকে হয়ে গেল। কিন্তু সেই লোকটির কাছে দাম্পত্য বা বাৎসল্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন লেনদেনের চাহিদা ছিল না। তাই তার মৃত্যুর পর যখন দেখা গেল আলমারিতে সমস্ত জামা-কাপড়, শাড়ি থরে থরে সাজানো রয়েছে, তখন তার সম্পর্কের প্রতি নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতার কথা জানা যায়। আসলে নিস্ফলা বলে পরিচিত মানুষটি সংসার জীবনে সম্পর্ক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মোটেই নিস্ফলা ছিল না।

৪

বিবাহ নামক একটা বন্ধন আর পরিবারতন্ত্রের অস্তিত্ব – এই নিয়েই দাম্পত্য সম্পর্কের অবতারণা। যেখানে পারস্পরিক প্রেম আর বিশ্বাসের আধার দিয়েই গড়ে ওঠে সম্পর্কের ওম। অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে আমরা দেখেছি, আধুনিক মানুষের মনের

অবচতেন স্তরে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে, কীভাবে একাকীত্বের কালো ছায়া তাদেরকে গ্রাস করে, কীভাবে মানুষে অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংস্র প্রবৃত্তি প্রাণনাশের নেশাকে জাগিয়ে তোলে। দাম্পত্য সম্পর্কের অভ্যন্তরে থাকা স্পর্শের ভিতর হিমশীতল বিচ্ছিন্নতা কোথাও বা হিংস্র আক্রমণ – অনিতা অগ্নিহোত্রীর এই গল্পগুলি দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল আখ্যানকে তুলে ধরেছে। সমাজের বৃহত্তর জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কের সূক্ষ্ম বুননের মেলবন্ধন – অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. জয় গোস্বামী, ‘পাগলী তোমার সঙ্গে’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ. - ৫৩

২. অন্নদাশঙ্কর রায়, ‘পারিবারিক নারী সমস্যা’, ‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’, কলকাতা, বাণীশিল্প, সেপ্টেম্বর ২০১১। পৃ. – ১৫৬-১৬০

৩. অনিতা অগ্নিহোত্রী, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯। পৃ. - ১০২

৪. তদেব। পৃ. - ৭৫

৫. তদেব। পৃ. - ৮৫

৬. তদেব। পৃ. - ৮৫

৭. তদেব। পৃ. - ৯৩

৮. তদেব। পৃ. - ১০৪

৯. তদেব। পৃ. - ৭৩

১০. তদেব। পৃ. - ৬৮

১১. তদেব। পৃ. – ৮৯

গল্প, উনিশ শতক এবং ছোটোগল্পের সম্পর্ক

সারমিন রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

এক.

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বাংলা ছোটোগল্পের রূপ নির্মিতিতে পাশ্চাত্যের short-story-র প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই বাংলা ছোটোগল্পের সঙ্গে গল্পের একটা বহু পুরাতন যোগ রয়েছে। গল্প-ছোটোগল্পের সেই সম্পর্ক স্থাপনে উনিশ শতকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গল্প, উনিশ শতক এবং ছোটোগল্পের সেই আন্তঃসম্পর্ককেই তুলে ধরতে চেয়েছি বর্তমান আলোচনায়।

একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, গল্প বলবার এবং শোনবার চাহিদা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর একটি। এমনকি গল্প সৃষ্টির ইচ্ছাটাও। তাই গল্পচর্চা নিরন্তর। সে নিরন্তরতার প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, জাতকের কাহিনি, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী ছাড়াও বিভিন্ন লোককথা, পশুকথা, নীতিকথা, রূপকথার গল্পগুলিতে। আর বাঙালির ভাঁড়ারে ঠাকু'মার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, টুনটুনির বইয়ের গল্প তো রয়েইছে। এ সকল বিচিত্র স্বাদের গল্পের উদ্ভব সম্পর্কেও রয়েছে মজার একটি গল্প। আর সে স্মৃতিমেদুর গল্পটিকে আওড়াতে দেখা যায়, 'পঁচিশ বছর' নামক গল্প সংকলনে কিন্নর রায়ের লেখা 'যদি বাঁচে স্বপ্নরা' শীর্ষক মুখবন্ধটিতে— তিন বন্ধু গ ল আর প এর গল্প। একদিন তিন বন্ধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি হল এক নদীর। নদী পেরোনোর তাগিদে গ তার লম্বা ঠ্যাং এ নদী পেরিয়ে আসে। আর ল নদী পেরোতে না পেরে চড়ে বসে প এর মাথায়। এরপর ল্প পার হয় নদী। এভাবে তৈরি হয় 'গল্প'— আমাদের সেই আদিম প্রবৃত্তি। গল্পের উদ্ভব সংক্রান্ত এ গল্পটি ভীষণ নস্ট্যালজিক বা শিশুতোষণমূলক হলেও আলোচনার মুখ্য প্রামাণ্য হতে পারে না। আর তাই গল্পের উদ্ভবের ভিন্ন ইতিহাসকেও করতে হয় আশ্রয়।

দুই.

ঠিক কখন থেকে গল্পের উদ্ভব— তা সাল-তারিখের গণনাতেও সঠিক নির্ধারণ অসম্ভব। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সৃষ্টির আদিলগ্নে আদিম মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের উদ্ভব। এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে বিভিন্ন সমালোচকদের বক্তব্যে—

> *"মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। বিবর্তনের অনেকগুলি পর্ব পার হয়ে প্রস্তর যুগের পাহাড়ের কালো গুহার ভিতর বড় বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে আমাদের শিকারজীবী পিতৃপুরুষেরা গোল হয়ে বসেছে একসঙ্গে; আগুনের রক্তাভ আলোয় শৈল-প্রাকারে তাদেরই আঁকা হরিণ ও বাইসন শিকারের বিচিত্র চিত্রকলা রচনা করেছে অপরূপ পরিবেশ। বাইরে ফার্ণজাতীয় দীর্ঘ তরুণ ঘন অরণ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করছে আর বনের কলরোলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে ক্ষুধাতুর নরখাদক হিংস্র জন্তুর গর্জন। সেই সময় ভিতরের ঘনীভূত নিরাপত্তার মধ্যে কথাকুশল প্রাজ্ঞেরা গল্প বলে চলেছে।"*[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমালোচনায় গল্পের উদ্ভব সংক্রান্ত গল্পটি গল্পাকারেই যেন ব্যক্ত হয়েছে। সমালোচক সুকুমার সেনও গল্পের আদিমতা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *"গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন। আদিকালের মানবের কল্পনাবৃত্তির উন্মেষে তখনকার দিনের গল্প-উপকথার গুরুত্ব নগণ্য ছিল না। চিরন্তন মানবশিশু গল্প-উপকথার মধ্য দিয়াই কল্পনার ও বুদ্ধির স্তন্য পান করিয়া আসিতেছে।"*[২]

বাস্তবিকই দেখা যায়, গল্পের উদ্ভব বহু প্রাচীন। সৃষ্টির সূচনালগ্নে যখন পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি, সেই সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির (যেমন— ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-ভূমিকম্প-খরা প্রভৃতি) যথাযথ যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে অসমর্থ আদিম মানুষেরা সেইসব অব্যাখ্যাত কার্য-কলাপের পশ্চাতে কল্পনা করেছে কোনো অলক্ষ সত্তা বা শক্তির। সে শক্তি তথা সত্তাকে তুষ্ট করতে আদিমেরা আয়োজন করেছে যাগ-যজ্ঞ, হোমের। কালক্রমে এসেছে দেবতা সম্পৃক্ত ভাবনা। আর এ সকল যাবতীয় কল্পনার জন্ম দিয়েছে নানা কাহিনির, অর্থাৎ নানা গল্পের। লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় সৃষ্টির আদিতে মানবমনের কল্পনাসম্পৃক্ত এ কাহিনি বা গল্পই হল 'মিথ' বা 'লোকপুরাণ'।[৩] আর কালের বিবর্তনে লোকপুরাণ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে

লোককথা, রূপকথা, উপকথা, পশুকথা, নীতিকথা ইত্যাদি। সমালোচক সুকুমার সেনের মন্তব্যখানিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—

> *“বহিঃপ্রকৃতির ভীম অথবা কমনীয় রূপ দেখিয়া তাহার মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তির লীলা কল্পনা করিয়া আদিম মানব আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। সকল দেশেই মানবের আদি সাহিত্য এইরূপে দেবপূজাত্মক ধর্মের অঙ্গরূপে উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তর্বৃত্তির সহিত অবিরত সংঘর্ষের ফলে আদিম মানবের মননশক্তির উৎকর্ষ দ্রুত বাড়িতে থাকে। সেইসঙ্গে ভাষার প্রকাশশক্তি ও শব্দসম্পদও বিশেষভাবে বাড়িতে থাকে এবং মননশক্তির ও কল্পনাবৃত্তির ত্বরিত উন্মেষ হইতে থাকে। মানবসভ্যতার এই অবস্থায় ছেলে ভুলাইতে অথবা শিক্ষা দিতে কিংবা আনন্দ কালহরণের নিমিত্ত বাস্তবঘটিত অথবা সম্পূর্ণ কল্পিত গল্পের চলন হইল।”*[৪]

গল্পের উদ্ভবের গল্প সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে এবং উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মানবজীবনে গল্পের তিনটি ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়—

ক) ছেলে ভুলানোর জন্য অর্থাৎ শিশুতোষণার্থে গল্পের উদ্ভাবন

খ) শিক্ষা প্রদানে গল্পের উদ্ভাবন

গ) আনন্দ তথা বিনোদনের নিমিত্ত গল্পের উদ্ভাবন।

এছাড়া গল্পের ধরন লক্ষ করা যাচ্ছে দু'রকম—

ক) বাস্তবঘটিত অথবা

খ) সম্পূর্ণ কল্পিত— এই বিশেষ লক্ষণগুলি আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ের মুখ্য পাথেয়।

তিন.

ছোটোগল্পের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে দেখতে হয় গল্পের সেসব প্রাচীন উৎস তথা ঐতিহ্যকে— যে ঐতিহ্যের পথ বেয়ে ছোটোগল্পের আবির্ভাব। গল্পের উদ্ভব অতি প্রাচীন হলেও ‘গল্প’ শব্দটি খুব পুরাতন নয়। তথ্যগতসূত্রে জানা যায়, ফারসী ‘গপ্’ শব্দটি থেকে ‘গল্প’ শব্দটি তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। আর কথ্যভাষার ‘গপ্প’ শব্দ থেকে ‘গল্প’ শব্দটির উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের কীর্তি। এছাড়াও ‘গল্প’ শব্দটির উদ্ভবের পশ্চাতে রয়েছে ‘জল্পি’, ‘জল্প’, বা ‘জল্পনা’। সমালোচক সুকুমার সেনের কথায়,

> *" "গল্প" কথাটি পুরানো নয়। (ফারসী 'গপ্' হইতে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই শব্দটি বানাইয়া লইয়াছি। কথ্যভাষার 'গপ্প' শব্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের হাতে 'গল্প' হইয়াছে।) তবে প্রায় সমধ্বনি "জল্পি" শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া গিয়াছে 'গল্পগুজব', 'নিন্দাবাদ' অর্থে। বৈদিক কবি সোমদেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহার নামে বাজে গুজব, অলীক কাহিনী প্রচলিত না হয় ("মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ)।"*[৫]

অপর এক সমালোচকের মন্তব্য— ". . . জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা-প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে কল্পনার নানা রঙে রাঙিয়ে মনোহারি করে তুলত। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির একটি।"[৬]

উপরোক্ত দুটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এটি লক্ষণীয় যে, 'জল্পনা' শব্দটির সঙ্গে জুড়ে আছে 'অলীক কাহিনী' বা 'কল্পনা' এই অর্থদুটি। তবে 'জল্প' বা 'জল্পনা' শব্দটির আভিধানিক অর্থও আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

ক. জল্প্ সক [ভ্বা, প-জল্পতি; সেট্; বৈদিক] জল্পন, কথন।

খ. জল্প[১] পুং [জল্প্+অ (ঘঞ্)-ভা] ১.জল্পন, কথন, ভাষণ। ২. সম্ভাষা ৩. অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ, গল্প। -ল্পনা বি (সং, ন) বৃথাভাষণ

গ. জল্প[২] অর্ম্ম [সং=জল্প>প্রা=জল্প; হি=জল্প] ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ করা। "যতশাস্ত্রে বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বোলে ভ. গ্র ২৩।[৭]

ঘ. জল্প, জল্পন, জল্পনা— কথাবার্তা। বাক্যব্যয়, বাচালতা।[৮]

ঙ. জল্প বি. ১ (ন্যায়) পরমত খণ্ডনের দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা; ২ বাক্যব্যয়; কথা বলা; ৩ বাচালতা। জল্পনা-কল্পনা বি.পরামর্শ, অনুমান, আলোচনা।[৯]

উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ সন্ধানে 'জল্প' শব্দটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা যায়, 'জল্প' শব্দটি থেকে 'জল্পনা' শব্দটির আবির্ভাব। 'জল্প' অর্থে প্রায় সবক্ষেত্রেই যে সাদৃশ্যবাচক অর্থ পাওয়া যায়, তা হল— কথন, কথাবার্তা, কথা বলা। আর 'জল্পনা'র সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'কল্পনা' জুড়ে 'জল্পনা-কল্পনা'র অর্থ দাঁড়ায় 'পরামর্শ বা অনুমান বা আলোচনা'। গল্প শব্দের উৎস হিসেবে দেখতে চাওয়া 'জল্প' শব্দটির একাধিক অর্থ মধ্যে উল্লিখিত অর্থসমূহ বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গল্পের যে উদ্ভবের ইতিহাস, তাতে জল্প শব্দের এহেন অর্থগুলির প্রতিটিই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। বলা চলে আমাদের আদিম

পূর্বপুরুষদের কথাবার্তা, পরামর্শ, অনুমান এবং আলোচনার নিরিখেই ‘জল্প’>‘জল্পনা’(কল্পনা)>‘গল্প’। এভাবে ‘গল্প’ এল। তবে গল্পের সঙ্গে জুড়ে এল আরও গল্প। আর এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুকুমার সেনের বক্তব্য আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে—

> *“অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পের অর্থে “কথানক”, “কথানিকা” শব্দ চলিত হইয়াছিল। অপভ্রংশের মধ্য দিয়া এই দুইটি শব্দ এখন হিন্দীতে “কহানা”, “কাহানী” হইয়াছে। আবার সংস্কৃতের ছদ্মসাজ পরিয়া বাঙ্গালায় হইয়াছে “কাহিনী”।”*[১০]

এ সূত্রেই দেখে নেওয়া যেতে পারে গল্পের আভিধানিক অর্থগুলিকে—

ক. গল্প বি [সং জল্প> ল্প (?); দ্র ‘গপ্প’]— ১. উপাখ্যান, উপকথা। ২. সর্থ ‘গপ্প’। [গল্প-কথা— গল্পের বিষয়, রচা কথা। গল্পসল্প, গল্প-গুজব।[১১]

খ. গল্প (গ্রা' গপ্প) . .ষ্য. (সং' জল্প; জ স্থানে গ। তু' স' গল্‌ভ—ধৃষ্ট। ফা' গপ)। ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা। গল্প-স্বল্প . . গল্প ও সু-অল্প কথা (সহচর শব্দ)। গল্প-গুজব . . . গল্প ও মিথ্যা সংবাদ।[১২]

গ. গল্প বি. ১. কাহিনি, উপকথা ২. কথাবার্তা, আলাপ ৩. অতিরঞ্জিত বর্ণনা, আতিশয্যমূলক বর্ণনা।[১৩]

লক্ষণীয়, গল্পের আভিধানিক অর্থে গল্পের বিশেষত্বগুলিও প্রতিভাত হয়। গল্পের এসকল যাবতীয় বিশেষত্ব পর্যালোচনার সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের নিবিড় সম্পর্কটি উঠে আসে। বাংলা ছোটোগল্পের জন্ম ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে। তাই ছোটোগল্পের জন্মলগ্ন এবং উৎস আলোচনায় পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপট সর্বদাই মুখ্যভাবে আলোচিত হলেও, অন্তত বাংলা গল্পের উৎস সন্ধানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সাহিত্য প্রেক্ষাপট মূলতম ভিত্তি বলা চলে। কেননা—

> *“শিক্ষামূলক গল্পের উৎকর্ষ ভারতবর্ষে যেমন হইয়াছিল এমন আর কোন দেশে নয়। মহাভারতের শান্তি পর্বে এবং অন্যত্রে, পঞ্চতন্ত্রে, বৌদ্ধ “জাতক” কাহিনীতে ও “অবদান” গ্রন্থে, জৈনদের “কথা”য় মানুষ ও পশুপক্ষিঘটিত এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট মনোরঞ্জক ও নীতিবেদক গল্প রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি গল্পের অনুবাদ ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীসে যে গল্পগুলি পৌঁছিয়াছিল তাহার কতকগুলি ঈশপের নামে প্রচলিত হইয়া এখন সর্বদেশের অধিকারভুক্ত। রোমান্টিক গল্প আর রূপকথাও কিছু*

পাওয়া যায় ভাঙ্গা সংস্কৃতে লেখা 'মহাবস্তু', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত "অবদান" গ্রন্থে, পালিতে লেখা জাতক-কাহিনীতে এবং জৈনদের সংগৃহীত অর্ধমাগধী-অপভ্রংশ-সংস্কৃতে লেখা নিবন্ধে। পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত গুণাঢ্যপ্রণীত 'বৃহৎকথা' কাব্যে সেকালের বহু বিচিত্র মনোরঞ্জক কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছিল। বৃহৎকথা অনেকদিন লুপ্ত তবে ইহার কাহিনীগুলি আর্যশূরের 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'— এই তিন গ্রন্থে অনূদিত এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গ্রন্থে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এই সকল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের অনেক কাহিনী পরবর্তীকালে ইরান আরব ও সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল। আধুনিক-কালের আরব্য-উপন্যাসের বহু আখ্যায়িকার মূল "অবদান" ও "জাতক" কাহিনীতে এবং কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।"[১৪]

উপরোক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে মেলে প্রাচীন ভারতীয় গল্পের উৎস। গল্পের উদ্ভবের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও জানা যায়।

চার.

তবে গল্পের এই যাবতীয় প্রাচীন উৎসের কথা প্রসঙ্গে উনিশ শতকেরও একটা নিবিড় যোগ রয়েছে— অন্তত বাঙালির ক্ষেত্রে। উনিশ শতকের মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত ভাষার মূল গ্রন্থকে বাঙালির কাছে পরিবেশন করেছে তার নিজের ভাষায়— বাংলা গদ্যে। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ বা পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি সবই মিলেছে বাংলা গদ্যে। সে সকল বাংলা গদ্যের নিদর্শনেও গল্পধারা রয়েছে অব্যাহত। আর সে বাংলা গদ্যের তো বটেই, বাংলা গল্পের বিকাশের ধারাতেও বাংলা গল্পের উৎস নির্ণয়ের একান্ত সহায়ক। যদিও তার প্রথম কৃতিত্বখানি একজন বিদেশীরই প্রাপ্য— উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত তাঁর 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) ছাড়াও তাঁরই উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কয়েক খণ্ডে কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয় (১৮০২)।

আপাতত বাংলা গল্পের প্রাচীন উৎস থেকে হঠাৎই আধুনিক যুগে পদার্পণের কারণ ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কিছু নিদর্শন তুলে ধরা। যেমন— পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বিরচিত পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশ গ্রন্থখানি। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্বে একাধিকবার হিতোপদেশের অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন—

১. গোলোকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০২)

২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০৮)

৩. রামকিশোর তর্কচূড়ামণি অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ইত্যাদি।

এছাড়াও বহু পরে রাজশেখর বসু ছোটোদের উপযোগী করে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেছিলেন 'হিতোপদেশের গল্প'। এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে— "এই অতি প্রাচীন গল্পগুলি হাজার বারো শ বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষ থেকে পারস্য আরব সিরিয়া এবং ইওরোপের নানা দেশে প্রচারিত হয়েছিল।"[১৫] এ গ্রন্থের 'বিষ্ণুশর্মার পাঠশালা' শীর্ষক গল্পে 'হিতোপদেশ'এর গল্পের সূত্রপাত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"ভাগীরথী নদীর তীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে। এখন তার নাম পাটনা। সেই নগরে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি শুনতে পেলেন একজন লোক এই কবিতাটি পড়ছে—

"বহু সংশয় যাতে দূর হয়,
যাতে জানা যায় অদেখা বিষয়,
যে জন শেখে না বিদ্যা এমন
চক্ষু থাকিতে অন্ধ সে জন।
অল্প বয়স আর বহু ধন,
প্রভুত্ব আর কুকাজেতে মন,
একটিতে এর হয় কত ক্ষতি,
চারটি থাকিলে ভয়ানক অতি।"[১৬]

রাজা এ সমস্ত কথা শুনে এবং চিন্তা করে ছেলেদের শিক্ষার ভার দিলেন ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মার উপর।

"বিষ্ণুশর্মা ভেবে দেখলেন, যদি এখনই রাজপুত্রদের লেখাপড়া শেখাতে যাই তবে তারা পালাবে। বরং প্রথমে কিছুদিন ভাল ভাল গল্প ব'লে তাদের বশে আনি।"[১৭] এরপর রাজপুত্রদের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা বললেন—

"বুদ্ধিমান ভাল ভাল নানা বই নিয়ে
আনন্দেতে সময় কাটায়।
খেলা বা ঝগড়া ক'রে অথবা ঘুমিয়ে
মূর্খদের দিন চলে যায়।।"[১৮]

এরপরে বিষ্ণুশর্মা আরও বলেন 'আমি একটি আশ্চর্য গল্প বলছি, কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে মিলে কেমন ক'রে বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিল তা শোন।' ছেলেরা বললে, 'আপনি গল্প আরম্ভ করুন।'[১৯] বিষ্ণুশর্মা গল্প আরম্ভ করলেন।

তবে যে কারণে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি, তা হল 'গল্প' শব্দের আভিধানিক অর্থে পাওয়া গেছে 'বাক্যব্যয়' বা 'বাচালতা'র মত অর্থও। যাতে অতিকথন রয়েছে, বর্ণনার আতিশয্য রয়েছে। তবে, হিতোপদেশ' এর গল্পগুলি প্রমাণ করে গল্পের বাক্যব্যয় বা বাচালতা আসলে প্রাঞ্জলতা, সহজাতবোধ। যে কারণে শিক্ষা তথা নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে গল্পকে করা হয়েছে অবলম্বন। শিশুপাঠের প্রথম পদক্ষেপে অক্ষরজ্ঞান বা বর্ণপরিচয় নয়, গল্পকে করা হয়েছে মুখ্য এবং বিষ্ণুশর্মা যখনই বলছেন 'একটি আশ্চর্য গল্প বলছি শোন', তখন ছাত্ররা সাগ্রহে বলছে 'গল্প আরম্ভ করুন। অর্থাৎ গল্পে একাধারে থাকছে শিক্ষা এবং আনন্দ বা বিনোদন। আর 'হিতোপদেশ' এর গল্পের চরিত্রেরা লক্ষণীয়— কাগ (কাক), পায়রা, ইঁদুর, কচ্ছপ, হরিণ, সিংহ, শেয়াল, রাজহাঁস, ময়ূর প্রভৃতি পশু-পক্ষী এবং মনুষ্য চরিত্র। বলা বাহুল্য, শুধু 'হিতোপদেশ'এই নয়, 'পঞ্চতন্ত্র' বা বিভিন্ন লোককথা অর্থাৎ পশুকথা, রূপকথা, নীতিকথা, উপকথাগুলিতেও পশু-পাখি এবং মনুষ্যচরিত্র উপস্থিত। আর এও লক্ষণীয়, এ সকল গল্পের মনুষ্যেতর প্রাণীরা কথা বলতে পারে মনুষ্য চরিত্রদের মতোই। এছাড়াও গল্পের যে স্থান-কাল-পাত্র তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল্পনিক। গল্পের যে আখ্যান বা ঘটনা সেটাও প্রায়শই কাল্পনিক।

তবে প্রশ্ন ওঠে গল্পে শুধু যদি কল্পনাই থাকে, তাহলে গল্পের প্রতি মানুষের কেন এই চিরন্তন আকর্ষণ? গল্প কি নিছক কল্পনা দিয়েই গড়া? বাস্তব কি গল্পে নেই? প্রসঙ্গতই বলতে হয় 'গল্পসল্প' এর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যখানি— "বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে।"[২০] তাছাড়া পূর্বোক্ত সমালোচক সুকুমার সেনের মন্তব্য থেকে দু'রকম গল্পের ধরন লক্ষ করা যাচ্ছিল— 'বাস্তবঘটিত' অথবা 'সম্পূর্ণ কাল্পনিক'। এক অর্থে পৃথিবীর সমস্ত গল্পই বাস্তবঘটিত। আদিম গুহামানবের গুহার দেওয়ালে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে যে গল্পের প্রকাশ, তাও বাস্তবঘটিত। চোখে দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কালক্রমে যুক্ত হয়েছে কল্পনা। একথা এত জোর দিয়ে বলা

সম্ভবপর কেননা মানুষই একমাত্র প্রাণী যার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটেছে এবং সম্ভব হয়েছে তাকে প্রকাশ করবারও। বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে আছে চিন্তন ক্ষমতা, নিজস্ব কিছু ভাববার ক্ষমতা। তাই চিন্তা-ভাবনা থেকেই কল্পনা মানুষের সৃষ্টিকে করেছে সমৃদ্ধ। গল্প যার অন্যতম নিদর্শন। পৃথিবীর আদি গল্প, যাকে আমরা 'আদি কাব্য' এর মর্যাদা দিয়ে থাকি তারও উত্থান বাস্তব থেকেই। প্রত্যক্ষ থেকেই। আগে ব্যাধ দ্বারা ক্রৌঞ্চমিথুন বধ দর্শন, অতঃপর সেই দেখা থেকে অনুভূতির কোন্ সূক্ষ্ম স্তরে 'শোক' নামক স্থায়ীভাবের উদ্গীরণ আর বাচ্যে তার প্রকাশ—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"[২১] (২।১৫)

এ অনুভূতির প্রকাশের গল্পই তো 'আদি গল্প'এরও দাবীদার, যার প্রকাশ ছন্দোবদ্ধতায়। তবে এও তো ব্যক্ত যে রামায়ণ কবিকল্পনার সৃষ্টি। আর এও তো হতে পারে রামায়ণ সৃষ্টির পূর্বতন এই ক্রৌঞ্চমিথুন বধের শোকের দ্বারা আহত হয়ে বাল্মীকির রামায়ণ রচনার সূত্রপাতের কাহিনিটিও কল্পনা। অর্থাৎ গল্প ছুঁয়ে আছে দুটি ক্ষেত্রকেই— বাস্তব এবং কল্পনা।

পাঁচ.

এবারে আলোচনার পর্যায় ছোটোগল্পের জন্য। গল্পের উদ্ভব, গল্প শব্দের উদ্ভব, গল্প শব্দের আভিধানিক অর্থ, গল্পের উদাহরণ সবটাই আলোচিত হয়েছে। গল্পের প্রকৃতিও আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত— গল্প বাস্তবঘটিত নাকি সম্পূর্ণটাই কাল্পনিক? বাস্তবতা রয়েছে এমন গল্পও অকুলান নয়, আবার সম্পূর্ণটাই কাল্পনিক এমন কথাও হলফ করে বলা সম্ভব নয়। কল্পনার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার যোগ থাকেই। তা নইলে মানুষের তৈরি গল্পে পশু চরিত্রেরা নয়, পশুদের তৈরি গল্পে মানুষের কথা থাকত হয়তো বা। গল্প শুধুই বাস্তব নাকি সম্পূর্ণ কাল্পনিক— এ দ্বন্দ্বটিকে আরও খানিকটা জিইয়ে রেখে ছোটোগল্পের আলোচনায় যাওয়া যাক।

'ছোটগল্প' বা 'ছোটোগল্প' সহজ অর্থে সাধারণভাবে যে গল্প ছোট তাই-ই তো ছোটোগল্প। এ নিয়ে তো বিতণ্ডা থাকতে পারে না। তবুও ছোটোগল্পের এ ছোটো পরিচয় বিপুল প্রশ্নাকীর্ণ। আকারে ছোটো গল্পই যদি ছোটোগল্প হবে, তবে 'ছোটগল্প' নামকরণটি উনিশ শতকেই করা হল কেন? কেন গল্পকেই 'ছোটগল্প' বলে অভিহিত করা হল না বা এখনও গল্প বলতে 'ছোটগল্প' কে বোঝানো হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর

অনেকটাই ধরা আছে ‘গল্প’ এবং ‘ছোটগল্প’এর জন্মক্ষণ বা উদ্ভবের প্রেক্ষিতে। যদিও ছোটগল্পের উদ্ভবকেও কেউ বা দেখতে চেয়েছেন ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই—

> *“মানব জাতির ইতিহাসের ঊষালগ্নে আমরা যদি তাহার শিল্পকর্মের খতিয়ান করি তবে দেখিতে পাইব যে, ছোটগল্পই তাহার একমাত্র নিদর্শন।... সভ্যতার যে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আজ ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণার সামগ্রী, সে বিবর্তনে মানব সভ্যতার প্রথম স্তর যখন শুরু হয় নাই তার পূর্বেই ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।... আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, বিভিন্ন দেশের রূপকথার গল্প, আরও পরবর্তীকালের জাতক সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারতের নানা উপকাহিনী, বাইবেলের প্যারাবলস্‌, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, তুতিনামা, হুমায়ুননামা, কথাকোষ, বিভিন্ন ‘ফেবল্‌স’, ইহাদের মাঝে ছোটগল্পের বীজ নিহিত আছে।”*[২২]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উনিশ শতক নয়, ‘ইতিহাসের ঊষালগ্ন’এই ছোটোগল্পের জন্মক্ষণ। বাস্তবিকই তো, ছোটোগল্প সাধারণ অর্থে যদি ‘ছোটো’ অর্থাৎ ক্ষুদ্র গল্পই হয়, তবে উদ্ধৃত সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থমালাগুলি ছোটোগল্পেরই উৎস। এককথায় ছোটোগল্পই বলা চলে। ছোটো শব্দটির সঙ্গে জুড়ে আছে আয়তনিক পরিসীমা। তেমনই স্বল্পাকৃতি গল্পের কিছু উদাহরণ—

মুনি আর ইঁদুরের গল্প

এক মুনি বনে বাস করতেন। একদিন তিনি দেখলেন, কাগের মুখ থেকে একটি ইঁদুর ছানা মাটিতে প'ড়ে গেছে। মুনি খুব দয়ালু ছিলেন, তিনি ইঁদুর ছানাটিকে পুষতে লাগলেন। খুব খেতে পেয়ে ইঁদুর ছানাটি মোটা হ'ল। একদিন একটা বেরাল তাকে ধরতে গেল, ইঁদুর তখনই মুনির কোলে গিয়ে উঠল। মুনি বললেন, ‘ভয় নেই, তুমিও বেরাল হয়ে যাও।’

মুনি এই কথা বলবামাত্র ইঁদুরটা বেরাল হয়ে গেল। একদিন একটা কুকুর তাকে তাড়া করলে। মুনি বললেন, ‘ভয় নেই, তুমিও কুকুর হও।’ তখন বেরালটা কুকুর হয়ে গেল।

তার পর একদিন একটা বাঘ কুকুরকে খেতে এল। মুনি বললেন, ‘ভয় নেই, তুমিও বাঘ হও।’ তখন কুকুরটা বাঘ হয়ে গেল।

সকলে বলতে লাগল, 'এই বাঘটা আগে ইঁদুর ছিল; মুনির দয়ায় ইঁদুর থেকে বেরাল, বেরাল থেকে কুকুর, এবং কুকুর থেকে বাঘ হয়েছে। মুনির কি আশ্চর্য ক্ষমতা ! বাঘ ভাবলে, 'যতদিন এই মুনি বেঁচে থাকবেন ততদিন সকলেই বলবেন যে আমি আগে ইঁদুর ছিলাম, মুনির দয়ায় বাঘ হয়েছি'। এই ভেবে সে মুনিকে তাড়া ক'রে মারতে গেল। তখন মুনি বললেন—

'ইঁদুর ছিলি, বেরাল হলি,
কুকুর হলি, বাঘ হলি,
আমার দয়া ভুলে গেলি,
আমাকেই মারতে এলি।
দয়ার যোগ্য তুমি নও,
আবার নেংটি-ইঁদুর হও।।'

মুনি এই কথা বলামাত্র বাঘ আবার ইঁদুর হয়ে গেল।[২৩]

উপরোক্ত গল্পটিতে ব্যবহৃত পদ্য ব্যতীত উনিশটি লাইনে গল্পটি সমাপ্ত। এমনই অজস্র গল্পের উদাহরণ দেওয়া যায়, যেগুলি এমনই সংখ্যক লাইনে বা তার অপেক্ষা একটু বেশি বা কম সংখ্যক লাইনে গল্পগুলি শেষ হয়ে গেছে। সেগুলি থেকে আয়তনিক পরিসীমা এ গল্পগুলিকে ছোটোগল্প এর তক্মা দিতে পারে। তবুও প্রশ্ন থাকে, উনিশ শতকের ছোটোগল্প আর এই ছোটোগল্প কি এক? এই ছোটোগল্পে পাঠক যা পায়, উনিশ শতকীয় ছোটোগল্পের থেকে সেই প্রাপ্তি কি এক? হ্যাঁ, আয়তনিক পরিমিতিবোধের দিক থেকে এগুলি নিশ্চয়ই ছোটোগল্প। তবুও গল্প, ছোটোগল্পের সমগোত্রীয় একটা বিষয় জোরপূর্বক এই ধারণাটিকে সমর্থন করা যাবে না কিছুতেই।

ছয়.

'ছোটগল্প', যা সমালোচকের ভাষায়, 'a peculiar product of nineteenth century' হিসেবেও পরিচিত। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে তার আবির্ভাব। দেবনির্ভরতার রেশ সাহিত্য ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতক থেকেই সম্পূর্ণত না হলেও প্রায় বিলুপ্তির পথে। এ বিলুপ্তির কারণ রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যায়,

> *"তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।... ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার।... য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত*

কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল,[২৪]

বাস্তবিকই ইংরেজ আগমনে আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত কতখানি প্রবল ছিল, তা তৎকালীন বাঙালির সাহিত্য চর্চাও প্রমাণ দেয়। একমুখী দেবনির্ভর মানসিকতা থেকে সরে এসে বাঙালি মানসে স্থান হল— 'কী' এবং 'কেন'র। মানুষের মনে এল অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা এবং যুক্তি। বাংলা সাহিত্যও রাখল তার প্রমাণ— তা নইলে চিরন্তন ভারতীয় সংস্কৃতির 'রামায়ণ'এর দুই চরিত্র (রাম-লক্ষ্মণ) গতানুগতিক ভাবনার বিপ্রতীপে গিয়ে দাঁড়াত না। সৃষ্টি হত না মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ'।

শুধু তাই নয়, উনিশ শতক ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগও বটে। গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তি 'আমি'র প্রাধান্য সেখানে অনেক বেশি। তার কারণও সে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট। কৃষিনির্ভর জীবন হয়ে উঠেছে শিল্পকেন্দ্রিক। জমিদারতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদের দিকে মানুষের যাত্রা হয়েছে শুরু। এর আভাসও মেলে বাংলা সাহিত্যেই। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর গল্পের শেষে মেয়ে আমিনার হাত ধরে চলে যেতে চাইছে শহরে, কারখানায় কাজ করবার তাগিদে। সাধারণ মানুষ পরিচিত হচ্ছে অফিস-আদালত-কাছারি-স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শব্দগুলির সাথে। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, অন্যদিকে বহুপ্রজ বাঙালি পরিবারের সন্তানেরা শুধুমাত্র জমির উপর নির্ভর করে থাকছে না। বাঙালি হয়ে উঠছে গ্রাম থেকে নগর অভিমুখী। আর জীবন মুখোমুখি হচ্ছে প্রখর বাস্তবতার। এমন একটা সময়ে 'আমি' সম্পর্কে সচেতন এবং স্ব-চেতন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আর এমন কালপ্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদে ব্যাধ কালকেতু রাজা কালকেতু হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত থাকলেও, কোনো দেব-দেবী নির্ভরতাই সাধারণ মানুষের জীবনে সেই সোনার কাঠির পরশ এনে দিতে পারত না— মানুষ তা বুঝেছিল। অতএব প্রেক্ষিত বাস্তব। যা কিছু ঘটছে, তা মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে। তবে তো মানস পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আর স্বাভাবিক বাংলা সাহিত্যের স্বাদ পরিবর্তনও। সেই স্বাদের ভিন্ন পরিবেশন ছোটোগল্প। কল্পনায় নয়, বাস্তবের ভিত্তিতে যার সৃষ্টি। কিন্তু গল্প? গল্পে তো কল্পনাও ছিল। বরং বলা চলে, কল্পনাও ছিল নয়, 'কল্পনা'ই ছিল। তবুও আবারও একটা পুরাতন প্রশ্ন উস্কে দিতে হয়— বাস্তব ছিল না? যদিও এর উত্তর আগেই খানিকটা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও গল্প ছোটোগল্পের সম্পর্কের সমীকরণের শেষ পর্যায়ে আবারও বলা যায়, বাস্তব ছিল— গল্পে বাস্তব ছিল। তবে যে সকল গল্পের উৎস প্রাচীন, তাতে বাস্তব অপেক্ষাও কল্পনা ছিল

বেশি। কেননা, মানুষ তখনও সবটা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অপারগ। কাজেই বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার জায়গা ছিল অনেক বেশি। তাই-ই হয়তো—

১. গল্পে পশু-পাখি অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীরা কথা বলে।

২. মনুষ্যেতর প্রাণীরাও গল্পের মুখ্য চরিত্রে থাকে।

৩. গল্পের স্থান-কাল-পাত্র হতে পারে কাল্পনিক।

৪. অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গল্পে বাস্তবতা থকলেও তা প্রত্যক্ষ নয় বা মুখ্য নয়, গল্পে নীতিশিক্ষা প্রদানই গল্পের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সুকুমার সেন ব্যতীতও অন্য সমালচকেরাও এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন—

> *"ঐ গল্পগুলি কেবল মাত্র ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। কেবল ধর্ম ও নীতি ব্যতীত সমাজ ও জীবনের অন্যান্য দিকের বিশেষ কোন সন্ধান এই গল্পগুলিতে পাওয়া যায় নাই।"*[২৫]

৫. এছাড়াও গল্পের নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতা থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা গোষ্ঠীমানুষের সম্মিলিত ভাবনার দ্বারা সৃষ্ট। এক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য একটি মন্তব্য তুলে ধরা হল—

> *". . . গল্প মানুষ মুখে মুখে রচনা করিয়াছে। মুখের কথা উপকথায় রূপান্তরিত হইয়া এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠী, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। . . . সে গল্পের চরিত্র অরণ্যের বিচিত্র জীবজন্তু, কখনও কখনও চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা প্রকৃতির দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিস্ময়কর শক্তিসমূহ— . . . এই সকল গল্পের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তরুণদের শিক্ষাদান। তাহাদিগকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা। পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অবসরকে আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া রাখা।"*[২৬]

৬. আর গল্প বিশেষ কোনো ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সৃষ্ট বলেই— আত্মকথনের ভঙ্গি গল্পে অনুপস্থিত। গল্প সর্বদাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে প্রথম পুরুষে।

গল্পের এ সকল বিশেষত্বের দিকে লক্ষ রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবনা ছোটোগল্পের সঙ্গে সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এবং এ উত্তরটিও মিলে যায়, কেন গল্পকে ছোটোগল্প বলতে চাওয়া হচ্ছে না।

প্রথমত, কল্পনা নয়, বাস্তবতা ছোটোগল্প সৃষ্টির মূল ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, মনুষ্যেতর প্রাণী নয়, মানুষ এবং মূলত মানুষই হবে ছোটোগল্পের মুখ্য চরিত্র।(মনুষ্যেতর প্রাণী থাকলেও তা মানুষের অনুষঙ্গ ব্যতীত মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না)

তৃতীয়ত, ছোটোগল্পে স্থান-কাল-পাত্র বাস্তবোচিত হওয়ার সম্ভাবনাই অনেকটা বেশি।

চতুর্থত, নীতিশিক্ষা দান ছোটোগল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না, বরং আনন্দ দান ছোটোগল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হয়। সর্বোপরি ছোটোগল্পের যেটা অন্যতম উদ্দেশ্য, তা পাঠককে ভাবনার মুখোমুখি করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ছোটোগল্প যেখানে শেষ, সেখানে পাঠকের ভাবনা বা প্রতিক্রিয়ার শুরু।

পঞ্চমত, ছোটোগল্পের একজন নির্দিষ্ট রচয়িতা থাকেই। তাছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্যক্তি 'আমি'র প্রকাশ ছোটোগল্পকে কোনো না কোনোভাবে করে তোলে গীতিকবিতা তথা কবিতার সমগোত্রীয়। আর ব্যক্তি 'আমি'র প্রকাশ করতে গিয়েই ছোটোগল্পের ভঙ্গিমাতেও তাই উঠে আসে আত্মকথন। উত্তমপুরুষে বর্ণনা ছোটোগল্পের অন্যতম বিশেষত্ব।

ষষ্ঠত, গল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষকে অভিজ্ঞ করে তোলা হলেও, ছোটোগল্পে অভিজ্ঞ করে তোলবার অপেক্ষা অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করবার প্রবণতা থাকে অনেক বেশি। এভাবেই গল্পের নিরিখে ছোটোগল্পের বিশেষত্বগুলিও প্রকট হয়ে পড়ে।

তবুও এ বক্তব্যখানি স্পষ্টতই প্রকাশ করছি যে— গল্প এবং ছোটোগল্পের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও গল্প থেকেও ছোটোগল্পের (যা উনিশ শতকে উদ্ভূত) রূপ প্রকাশের পথ বেশ খানিকটা সহযোগিতা করেছিল। সময়, অভিজ্ঞতা এবং পট পরিবর্তনের দরুন গল্পের বিশেষত্বগুলিকে পরিবর্তিত হয়ে ছোটোগল্পের চেহারায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সাত.

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদেশাগত তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার তাগিদে বাংলা গদ্যের পদযাত্রা শুরু হলেও, তা বাঙালির মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির রসদ যুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত আসে উইলিয়ম কেরির রচনার কথা, যা বাংলা ছোটোগল্পের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থের কিছু গদ্যনমুনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

চাকর ভাড়াকরণ

সাহেব শেলাম

শেলাম।

তুমি কেটা। তোমার বাটী কোথায়।

সাহেব আমার নাম রমজান। আমার বাটী কলিকাতায়।

কহ কি নিমিত্ত আসিয়াছ।

সাহেব আমি বেকার আছি চাকরির চেষ্টায় আসিয়াছি।

তুমি কি কার্য্যের চাকরি করহ।

সাহেব আমি সাহেবলোকের খানসামাগিরির কাজ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে খেদমতগার ছিলাম এখন খানসামাগিরি করি।

খানসামা কি কার্য্য করে।

সাহেব খানসামা সাহেবলোকের খানার আয়োজন করে এবং লওয়াজিমা সমস্ত সামগ্রী খানসামার জিম্বা থাকে আর ছোট চাকরলোক খানসামার নিচে।

তৎকথা

খানসামা সাহেবলোকের দরকারি কয়জন চাকর এবং তাহারদের পদবি কি কি।

সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন খানসামা খেদমতগার মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ধোবা হুকাবরদার বেহারা পেয়াদা চৌকিদার দরবান।

খানসামা এ সকল চাকরেই কি কি কায করে।

সাহেব আপন২ হুদ্দার কাজ আপনি আঞ্জাম করে।

খানসামা এ সকলের কাযের পৃথক২ কার কার কোন হুদ্দা বেওরা করিয়া কহ।

যে আজ্ঞে সাহেব।

সাহেবের হুকুম

পর দিবস সাহেব প্রাতে উঠিয়া হুকুম করিলেন।

খেদমতগার চিলম্‌চি ও পাত্র করিয়া জল আন। মুখ ধুইব।

সাহেব জল প্রস্তুত মুখ ধুন।

নাপিতকে ডাকহ ক্ষৌর হইব।

সাহেব নাপিত আসিয়াছে হাজামত হউন।

নাপিত কোথায় আমি চুল বান্ধাইব।

সাহেব এই যে আমি হাজির আছি।

বেহারা ধোপ বস্ত্র আনহ আমি কাপড় বদলাইব।
সারথিকে হুকুম দেহ। গাড়ি তৈয়ার করুক। আমি বেড়াইতে যাইব।
সারথি গাড়ি শীঘ্র তৈয়ার কর।
কোন গাড়ি তৌয়ার করিব চারি ঘোড়ার কি দুই ঘোড়ার।
চারি ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া যোড়।[২৭] (কথোপকথন)

এভাবেই কথোপকথনের ঢঙে কেরির লেখায় উঠে এসেছে পুরাতন বাংলা গদ্যের নমুনা। যে গদ্যে উঠে আসতে দেখা যায় জীবন বাস্তবতাকে। তবে কেরির মৌলিক কল্পনার পাশাপাশি ছিল ভিন্ন পুরাকথা এবং গল্প-কাহিনি। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> *"নামে 'ইতিহাসমালা' হলেও এতে বেশিরভাগ কাহিনি অনৈতিহাসিক গালগল্প মাত্র। এমনকি এতে চণ্ডীমঙ্গলের লহনা-খুল্লনার গল্প আছে। কেরী এতে যেমন ভারতীয় পুরাকথা ও গল্পকাহিনি সম্বন্ধে সরস উপাখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন তেমনি অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।"*[২৮]

এই 'ইতিহাসমালা'র প্রায় দেড়শত আখ্যানের মধ্যে 'রাক্ষসীর ধাঁধাঁ, পণ্ডিতের সমাধান' এ দেখা যায়, বিন্ধ্য দেশে বীরপুর নগরের রাজা বীরসিংহের রাজসভার সর্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত শ্রুতিধরের সুরঙ্গ নামক অন্যদেশে গমন। সেখানে সুরঙ্গ দেশের রাজা সুবাহুর রাজসভায় আগত এক রাক্ষসীকে বিদ্যাবলে শ্রুতিধরের বিতাড়ন এবং সবশেষে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা লাভ। আর এ আখ্যানটির সমাপ্তি এভাবে— "অতএব বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয়।।"[২৯] এ আখ্যানেও যেন নীতিশিক্ষার একটা উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়। অন্তত শেষতম বাক্যটিতে বিদ্যার উপকারিতার একটা বার্তা যেন বেশি করে প্রতিভাত হয়েছে। এছাড়াও 'ইতিহাসমালা'য় 'মনুষ্য-মাংসের স্বাদ', 'ব্রাহ্মণী গর্দভী, ভিক্ষুক নির্ধন?', 'পত্নী ও উপপত্নী', 'অন্তঃপুরে জ্যোতির্বিদের কাণ্ডজ্ঞান', 'হস্তীকে জীবনদান', 'কুবেরের বিচার', 'সিংহপত্নীর দত্তকপুত্র', 'শশকের বুদ্ধিবলে শৃগালের প্রাণনাশ', 'মৃগরূপী রাক্ষসবধ', 'মূষিকের গর্তে টাকা' প্রভৃতি বিচিত্র আখ্যান বা গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাছাড়া বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা পর্বেই তো প্রাচীন ভারতীয় গল্পের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়। সে সকল 'হিতোপদেশ' বা 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ঈশপের গল্প' এর অনুবাদের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি এসেছে মৌলিক গদ্যও। রামরাম বসু

রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮১২), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩ সালে প্রকাশিত), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) ইত্যাদি ব্যতীতও রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর গদ্যকে করে তুলেছিলেন যুক্তির বাহন। তারই পাশাপাশি রচিত হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', কিংবা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে ক্রম অগ্রসরতার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, বাংলা গদ্যে একাধারে যুক্তি-তর্ক, ধর্ম-সমাজ-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতি সবটাকেই করেছে আত্তীকরণ। তবে এও লক্ষণীয় সে যুক্তি-তর্ক-তত্ত্বে যে 'কাহিনী'র ধারা তথা আখ্যানের উপস্থিতি তা বাস্তবতার নিরিখে অন্যভাবে দানা বাঁধতে চেয়েছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কিংবা 'আলাল' অথবা 'হুতোম' সে বাস্তব আখ্যানের কখনো 'নভেলা', কখনো 'নক্শা', বা কখনো 'উপন্যাস' নামধারী সাহিত্য সৃষ্টির নতুন ধাপ বা প্রকরণ— যাদের পথ বেয়েই উনিশ শতকের নবতম এবং কনিষ্ঠতম প্রকরণ ছোটোগল্পের উদ্ভব। এমনকি গদ্য-প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের পরেও ছোটোগল্পের আবির্ভাব। উপন্যাস যদিও ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটের ফসল। তবে তারও আবির্ভাব এই বাংলা গদ্য বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই। সমালোচকের মতে, বাংলা গদ্যের ধারায়—

> *"রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তনের সূচনা করিলেন। . . . পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন।"*[৩০]

একদিকে হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ, অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের হিন্দু সংস্কৃতিকে আক্রমণ, তাতে আবার গোঁড়া রক্ষণশীলদের মানসিকতা— এসব কিছু প্রতিহত করতে রামমোহন অবলম্বন করলেন 'স্বাধীন চিন্তা', 'দৃঢ় যুক্তিবাদ' ও 'তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ'— এসবের সম্মিলিত অবস্থায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি পেল নতুন পথ এবং প্রকরণ। গদ্য ভাষার বাদানুবাদ জন্ম দিল উপন্যাসের। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রেক্ষিতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

"এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়— তথ্যবিচার সাহিত্যপদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকপৃষ্ঠ বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া উঠে— . . . সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কন উপন্যাস রচনার অব্যবহিত পূর্বস্তর।"[৩১]

এহেন যুক্তি-তর্ক দীপ্ত গদ্যভাষা কখনো হৃদয়াবেগের পথ ধরে উপন্যাসে উপনীত হয়েছে। আর উপরিউক্ত বক্তব্যে ধরা পড়েছে উপন্যাসের প্রস্তুতির প্রেক্ষপটটিও। তবে উপন্যাসের উদ্ভবের সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন সমালচকেরা, তেমনই ছোটোগল্পের উদ্ভবের সঙ্গেও সাময়িক পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকার করেছেন সমালোচকেরা— "সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে।"[৩২] আর ছোটোগল্প সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য, ". . . ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কারণে ছোটগল্পের রূপ ত্বরান্বিত হল তার অন্যতম কারণ হল অসংখ্য পত্রিকার উদ্ভব। . . . পত্রিকাগুলিই ছোটগল্প রচনার উৎসাহদাতা।"[৩৩] উপন্যাসে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাস্তবজীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলিই সংহত হয়ে উপন্যাসের সৃষ্টির সুযোগকে ত্বরান্বিত করেছে। যদিও উপন্যাস এবং ছোটোগল্প আলাদা দুটি প্রকরণ তবুও একথা অত্যুক্তি নয় যে, উপন্যাসও ছোটোগল্প তৈরির পথটাকে মসৃণ করে তুলেছিল। যদিও সে পথ একস্তরীয় ছিল না। চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা, নভেলা, উপন্যাসের পথ পেরিয়ে পাঠকের গল্পতৃষ্ণার কারণে ছোটোগল্পের দিকে ধাবিত হল। এ সকল স্তরের প্রাথমিক পরিচিতি ব্যতীত ছোটোগল্পে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

আট.

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ছোটোগল্পের বীজ কোথায়— তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ‘চূর্ণক’ নামক একপ্রকার লেখনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমেই। ‘চূর্ণক’গুলি ছিল ছোটগল্পের ইঙ্গিতবাহী। সমালোচকের মতে, “ . . . এর মধ্যে ছোট ছোট কাহিনী রচনা করার ইঙ্গিত ছিল। . . . এই চূর্ণকগুলিও ছোটগল্পের ইতিহাসের একটি স্তর।”[৩৪] এই ‘চূর্ণক’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যকে যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল ‘চূর্ণক’। চূর্ণককে সংস্কৃত অর্থানুযায়ী অল্পসমাসবিশিষ্ট গদ্যরচনা বলে গ্রহণ করা হয় নি। গ্রহণ করা হয়েছে ছোট ছোট ‘কাহিনী’ বা ‘গল্প’ হিসেবে, anecdote এর অনুকল্প হিসেবে। একটি ছোট বা অতি ছোট ঘটনা বা ‘কাহিনী’ যেন হঠাৎ বলা হয়। সমালোচকের মতে চূর্ণক আগাগোড়াই নিটোল এবং পূর্বপরিকল্পিত। যেন শেষটা আগে স্থির করে প্রথমটা তৈরি করা হয়।[৩৫] চূর্ণকের এমনই একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল—

১. কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন : বন্ধো তুমি কি নিদ্রিত আছ। শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেন ‘কেন’। সখা প্রার্থনা করিলেন, আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রত থাক তবে উঠিয়া আমায় তাহা কর্জ দিলে ভাল হয়। সে কহিল ‘তবে আমি ঘুমুচ্ছি।’[৩৬] (বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত)

এভাবেই চূর্ণকগুলিতে ছোটোগল্পের বীজ প্রোথিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া ছোটোগল্পের উৎস সন্ধানে যাকে গল্প বলা হয়েছে, সমালোচক সেগুলিকে ‘আখ্যানক’ বলেও চিহ্নিত এবং সম্বোধন করেছেন। এ সকল ‘আখ্যানক’ এর আদি উৎস বলা হয়েছে ভারতীয় গল্পলোককে (পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৌদ্ধজাতক, বৃহৎকথা, বৃহৎকথামঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি)। এরপর ছাপা বাংলায় ‘আখ্যানক’ এর কথা বলা হয়েছে, মূলত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের বিভিন্ন রচনাসমূহকে। আর তৃতীয় ধারার ‘আখ্যানক’ এর কথা বলা হয়েছে, যা এসেছে ইংরেজি থেকে, যেখানে বলা হয়েছে বাইবেলের অনুবাদ, ঈশপ ফেবলস্ এর অনুবাদ প্রভৃতির কথা।

তবে ছোটোগল্পের উৎস খুঁজতে গিয়ে সমালোচক শিশিরকুমার দাশ চূর্ণক, আখ্যানক ব্যতীত নক্সা এবং ‘নভেলা’তেও ছোটোগল্পের ‘হ’য়ে ওঠা’কে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। ‘নক্সা’ সম্পর্কে তাঁর অভিমত— “নক্সা কাহিনির কাঠামো মাত্র, তার মধ্যে কাহিনীর আভাস আছে। কিন্তু পূর্ণতা নেই। সাহিত্যিক নক্সামাত্রেই প্রধানত দুটি শ্রেণীর, একটি চরিত্র নক্সা, আর একটি ঘটনার নক্সা। নক্সাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হলে-হতে-

পারত গল্প। কিংবা যেন কোনো গল্পের শুরু কিংবা শেষ। কিংবা তার মধ্য। অর্থাৎ গল্পের আভাস ও সম্ভাবনা নিয়ে এদের জন্ম।"[৩৭] আর এক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরির 'কথোপকথন'কে তিনি এ ধরনের রচনার কৃতিত্ব দিয়েছেন। আর 'কথোপকথন'এর গল্পাভাসের কথা উদ্ধৃতি সহযোগে তো পূর্বেই স্বীকৃত। তবুও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এ সকল 'কথোপকথন' পাঠক চিত্তকে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে তুলেছে অনেক বেশি। আর এও স্বীকার্য যে, ". . . নক্সার ঘটনা অধিক পরিমাণে জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মিতার ফলে ভাষা ও বর্ণনায় প্রাত্যহিকতার পদক্ষেপ ঘটেছে।"[৩৮] আর চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সার পরবর্তী স্তর ছোটো ছোটো উপন্যাস বা নভেলা। নভেলা পূর্ববর্তী স্তরগুলির পরিণতি নয়, স্বতন্ত্র একটি ধারা। তবে ছোটোগল্পের ইতিহাসে নভেলার গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি ইতালী, স্পেন, ইংরাজী এবং ফরাসীতেও নভেলা বা ছোট ছোট উপন্যাস বা দীর্ঘকাহিনী থেকেই ছোটোগল্পের উৎপত্তি।[৩৯] নভেলার সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য শুধু আকারে। এমনকি "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূরী . . . নভেলা।"[৪০] তাই সমালোচকেরাও সেদিকে লক্ষ রেখে কখনো বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'কে বাংলা উপন্যাসের সার্থক পথিকৃৎ বলার পক্ষপাতী। তারপরে বঙ্কিমের হাতে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে করা হয়। আসলে 'নভেলা'র পরে পাঠকের গল্পতৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি পেল। চূর্ণক বা আখ্যানক বা নক্সা নয়, পাঠক চাইল উপন্যাসের সমগোত্রীয় গল্প। পাঠকের এই গল্পতৃষ্ণা নিবারণে পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। বাংলা সাহিত্যে 'গল্প' ছোটোগল্পের রূপ পরিগ্রহণের পথ প্রস্তুত করল। সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভবের ইতিহাসটিকে রেখাচিত্রে এভাবে দেখানো হল—

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে

সাময়িক পত্রে রচিত চূর্ণক

আখ্যানকের প্রকাশ

নক্সা

নভেলা (ছোটো ছোটো উপন্যাস)

উপন্যাস

গল্পতৃষ্ণার চাহিদায় ছোটোগল্পের রূপলাভের প্রচেষ্টা

বলা বাহুল্য, প্রতিটি প্রকরণের স্তর বিভাজন মাত্র দেখানো হল। তবে কোনো স্তরই পূর্ববর্তী স্তরের পরিণতি নয়। প্রতিটিই স্বতন্ত্র একটি ধারা (শুধুমাত্র নভেলা এবং উপন্যাস ব্যতীত)। এদের সঙ্গে যোগ ছোটোগল্পের morphology র, বিবর্তনের ধারায় এরা এক-একটি ধাপ মাত্র— অন্তত সমালোচকের তাই মতামত।

নয়.

বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ব্যতীত প্রকৃতি তথা লক্ষণ বা বিশেষত্বগুলিও আলোচনার দাবিদার। বলা বাহুল্য, বিশেষত্ব নিরূপণ করে ছোটোগল্পের আবির্ভাব নয়, বরং ছোটোগল্পের রচনার পরে তার বিশেষত্বগুলি স্বপ্রকাশিত এবং সমালোচকদের নজরে সেগুলি প্রতিভাত। সে বিশেষত্বে যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, নভেলা বা উপন্যাসে পাঠক গল্পের আস্বাদন পেলেও আবারও গল্পতৃষ্ণার চাহিদায় ছোটোগল্পের কী প্রয়োজন হয়ে পড়ল? তাছাড়া সমালোচক শিশিরকুমার দাশও বলেছেন— "ছোটগল্পে বাঙালির স্বাভাবিক স্ফূর্তি। উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই বাঙালি লেখক তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন অনেক বেশি।"[৪১] এ মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও উপন্যাস অপেক্ষা ছোটোগল্পের রচনার বা চাহিদার সঙ্গত একটা কারণ নিশ্চয়ই ছিল। তথ্যে জানা যায়, উপন্যাস প্রকাশের সমকালে 'বঙ্গদর্শন'এর দুটি উপন্যাস ও একটি নক্সা প্রসঙ্গে বলছেন যে, 'এখন এ সকলের বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহার বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই— কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প ও নক্সায় বিশেষ লাভ নাই।'[৪২] আরও জানা যায়, মাসিক পত্রিকার সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'আমাদের দেশীয় অধিকাংশ লোক গল্প শুনিতে বড় ব্যগ্র। মাসিক সমালোচকে কাহিনী থাকে না বলিয়া অনেকে আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করে।'[৪৩] তবে সদ্য আগত নভেলা বা উপন্যাস ছেড়ে চূর্ণক, আখ্যানক বা নক্সা নয়— মানুষ চাইছে পূর্ণাঙ্গ কাহিনি, যা দীর্ঘায়িত হবে না, আবার অতি সংক্ষিপ্তও হবে না। যা স্বল্পায়তনে গল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করবে, আবার স্বল্প সময়ে পাঠ করা যাবে। বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাঙালি পাঠক তার নিজের জীবনের প্রতিফলনকে দেখতে চেয়েছিল শুধু স্বল্পায়তনেই নয়, স্বল্প সময়েও। একটা উপন্যাস বা নভেলা পাঠের থেকে একটা ছোটোগল্পের পাঠের সময় লাগে অনেকটাই কম। যদিও তা পাঠকের পাঠের গতির উপর নির্ভরশীল। তবুও একথা অনস্বীকার্য নয় ছোটোগল্প জীবনের থেকে সময়ের দাবি রাখে কম— দান করে অনেক বেশি।

পাশ্চাত্য ছোটোগল্পের প্রথম উদ্‌গাতা এডগার অ্যালান পো'র মতেও— "the short prose narrative, requiring from a half hour to one or two hours in its perusal."[৪৪] আরো নির্দিষ্ট করে বলেছেন— "The ordinary novel is objectionable, from its length, for reasons already stated in substance. As it cannot be read at one sitting, . . . In the brief tale, however, the author is enabled to carry out the fullness of his intention, be it what it may. During the hour of perusal the soul of the reader is at the writer's control. There are not external or extrinsic influences— resulting from weariness or interruption."[৪৫]

একারণেই হয়তো ছোটোগল্পের চাহিদা এবং ছোটোগল্পে লেখক ও পাঠকের ঝোঁকটাও অপেক্ষাকৃত বেশি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ছোটোগল্পের পথচলা শুরু হয়ে যাওয়ার পর রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় জীবনে যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে ছোটোগল্পেও। যেকোনো বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও ছোটোগল্প পরিমিত সময়ে শুরু ও শেষ হয়ে যেতে পারে। আর উপন্যাসে তা ব্যাপ্ত। তাই বলার কথা বিপর্যস্ত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহাকাব্য বা উপন্যাস লেখা বা পাঠের জন্য লাগে ধৈর্য, স্থিতি, স্থিতাবস্থা— ছোটোগল্পেও এসব লাগলেও সময় সঞ্চয়ের দিক থেকে ছোটোগল্প অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এককথায়, উপন্যাস সময়সাপেক্ষ হলেও ছোটোগল্প তা নয়। প্রসঙ্গত ছোটোগল্প যে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলে বা চলতে পারে তেমনই একটি সমর্থনমূলক ছোটোগল্প সংকলনের সন্ধান মেলে— কল্যাণ মৈত্র সম্পাদিত 'গল্প ১৫ মিনিট'। যদিও তার প্রকাশকাল একবিংশ শতক। তবুও সম্পাদকের 'সম্পাদকীয়'র কিছু অংশ যেন আবহমান ছোটোগল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য—

> *" 'গল্প পনেরো মিনিট' তখন অনেকের কাছে মনে হয়েছিল একটি অদ্ভুত নামকরণ। এর মানে কী? পনেরো মিনিটের গল্প স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবির মতো? ঠিক তা নয়। একটা কনসেপ্টের ওপরে গল্পের সংকলন। যা পড়তে কম সময় লাগে অথচ মনে রেশ থেকে যায় দীর্ঘ বরষ, দীর্ঘ মাস। . . . ছোটোগল্প, ছোটো সময়— পাঠের বড় অভ্যাসের দোরগোড়ায় না হয় পনের মিনিটই . . ."*[৪৬]

দশ.

বাস্তবিকই একবিংশ শতাব্দীর এ মন্তব্য যেকোনো কালপর্বের ছোটোগল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য, যার রেশ চলছে এখনও— "এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[৪৭] ১৮৯১ এর 'দেনাপাওনা'র সে বক্তব্য আজও গুঞ্জরিত জীবনে এবং তা থেকে সংবাদপত্রে-টেলিভিশনে। অথবা 'পোস্টমাস্টার' এর সেই এক অমোঘ লাইন— "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি। পৃথিবীতে কে কাহার।"[৪৮]

১৮৯১ সালেই রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্পের সূচনা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা'। বাংলা সাহিত্যে 'ছোটগল্প' নামকরণটিও রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত। তবু ছোটোগল্পের আঙিনায় 'দেনাপাওনা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রচেষ্টা নয়। এর আগে ১৮৮৪ সালে 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথের তা নিয়ে দ্বিধা ছিল। ১৯০৭ এ এই দুটি রচনার স্থান হয় 'বিচিত্র প্রবন্ধ'এর মধ্যে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দেই গল্পদুটি প্রথম 'গল্পগুচ্ছ'এর অন্তর্ভূক্ত হয়—

> একথা পূর্বেও ব্যক্ত। ছোটোগল্পের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যা প্রত্যাশা করছিলেন, তা যেন পেয়ে উঠছিলেন না। 'ঘাটের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—
>
> *"যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। . . . তেমনই একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে।"*[৪৯]

এ বক্তব্য যেন পরোক্ষভাবে ছোটোগল্পকেই ইঙ্গিত করে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিনসঙ্গী'র 'ছোটোগল্প'এ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেন— "বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।"[৫০] আরও বলেন, "সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট এ 'ছোটগল্প' বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের পথপ্রদর্শক। তবে ছোটোগল্পের সার্থক সৃষ্টির কৃতিত্ব রয়েছে অনেকের মধ্যেই। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই

তার পদযাত্রা শুরু বলেও মনে করা হচ্ছে। তথ্যে জানা যায়, 'বঙ্গদর্শন'এ প্রকাশিত 'ইন্দিরা' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকেরা বলেছেন, 'ইন্দিরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা পরীক্ষার প্রথম ফল।[৫২] শিশিরকুমার দাশ যথার্থই বলেছেন— "বঙ্কিমের ঘটনাবহুল উপন্যাস থেকে এই ঘটনা বিরল, স্বল্প চরিত্রের কাহিনীগুলি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। বলাই বাহুল্য এই ধরনের ছোট ছোট কাহিনী রচনার পথ বঙ্কিমই উন্মুক্ত করলেন . . .।"[৫৩] পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের কাহিনি রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন'এ প্রকাশিত হয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' নামক দু'খানি গল্প। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা ছোটোগল্পের পথচলা আরম্ভ হয়ে গেছে। তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়ে লিখছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রমুখ। ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'নবজীবন' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় অজ্ঞাত লেখকের গল্প পাওয়া যায়, 'বড় গল্প নয়'। এছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পত্রিকায় 'গল্প', 'ক্ষুদ্র গল্প', 'ক্ষুদ্র কথা' প্রভৃতি নামাঙ্কিত গল্প লক্ষ করা যায়। 'ছোটগল্প' নামেই পাওয়া যায় অম্বিকাচরণ গুপ্তের একটি গল্পগ্রন্থ। স্বর্ণকুমারী দেবীও তাঁর গল্পের নামকরণ করেছিলেন 'নবকাহিনী' বা 'ছোট ছোট গল্প'। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য— "এই নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। 'নবকাহিনী'— স্বর্ণকুমারী যে নূতন ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন। দ্বিতীয়ত, এই কাহিনীর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকেও তিনি মনে রেখেছেন 'ছোট ছোট' কথাটির মধ্য দিয়ে।"[৫৪] তবে এর সম্পূর্ণত এবং পরিণত আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথেরই হাতে 'ছোটগল্প' নাম নিয়ে।

১৮৭২ থেকে প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বের ছোটোগল্পগুলি, এমনকি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ভিখারিনী', 'ঘাটের কথা' বা 'রাজপথের কথা'ও সার্থক ছোটোগল্প হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ তখনও পর্যন্ত ছোটোগল্পের গঠন রহস্য ছিল অনায়ত্ত। কোথায় তার শুরু, কোথায় শেষ— এই কৌশলটি তখনও পর্যন্ত ছিল অনায়ত্ত। তাই তো রবীন্দ্রনাথকে 'ঘাটের কাথা'য় কুসুমের জীবনের কথা বলতে একাধিক শব্দ এবং অতিকথনের আশ্রয় করতে হয়। অতিবর্ণনের পরেই বলতে হয়— "যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে।"[৫৫] এরপর গল্পের পরিসমাপ্তিটিও ঘটল কুসুমের বর্ণনায়, তার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। গল্পের শেষে ঘাট আত্মকথনে বলছে— "আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ

তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।”[৫৬] ‘ঘাটের কথা’র পাশাপাশি ‘দেনাপাওনা’ গল্পটিকে রেখে দেখা যায়, গল্পের সূচনাই স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল, নির্মেদ— “পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া নাম রাখিলেন নিরুপমা।”[৫৭] এরপর অতর্কিতেই গল্প এগিয়ে যায় নিরুপমার বিবাহ এবং পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে। নিরুপমা শিকার হয় পণপ্রথার সামাজিক ব্যাধিতে। অনাদরের নিরুপমার মৃতদেহ পায় চন্দন কাঠের সুবাস। তবে গল্প নিরুপমার মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না। বরং গল্পের শেষ হয় আরও একটা শুরু দিয়ে— “এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।”[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ এভাবেই অতিবর্ণনের পন্থা ছেড়ে তাঁর ‘বর্ণনা-বিরলতা’কে অস্ত্র করেই বাংলা ছোটোগল্পের রূপ নির্মাণ করলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন (পূর্ববর্তী ছোটগল্পকারেরা তো বটেই), তাঁর পরেও অজস্র ছোটোগল্পকার বাংলা ছোটোগল্পকে দিলেন রূপ, বিশেষত্ব আর সমৃদ্ধি। আর তাকে কেন্দ্র করে এল ছোটোগল্প সংক্রান্ত একাধিক লেখা-জোখা এবং গ্রন্থ। কোনো কোনো গ্রন্থ এবং গ্রন্থের লেখক নির্মাণ করতে চাইলেন ছোটোগল্পের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা। সে সংজ্ঞা থেকে কখনো নিরূপিত হল তার বিশেষত্ব, কখনো তার বিশেষত্ব থেকে নিরূপিত হল সংজ্ঞা। সে সকল সামগ্রিকতাকে একত্রিত করে বলা যায়—

ক. ছোটগল্পের চরিত্রসংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম— একটি বা দুটি

খ. ছোটগল্পের ঘটনাও কম— একটি বা দুটি।

গ. সবশেষে একটি চরিত্রেরই প্রাধান্য।

ঙ. একটি ঘটনা বা একটি মাত্র ভাবেরই প্রাধান্য, যা ছোটগল্পকে করে তোলে গীতিকবিতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

ব্র্যান্ডার ম্যাথিউজ এর বক্তব্যেও— “A true Short-story differs from the Novel chiefly in its essential unity of impression. In a far more exact and precise use of the word, a Short-story has unity as a Novel cannot have it. . . . A Short-story deals with a single event, a single emotion, or the series of emotions called forth by a single situation.”[৫৯]

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প শুধুমাত্র উনিশ শতকেরই দান। কেন, কী তার কারণ— সে বক্তব্য পূর্বেই আলোচিত। তবুও আবারও কিছু মন্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে। ইংরেজি ছোটোগল্পের প্রথম স্রষ্টা ছোটোগল্প সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন—

> *". . . the tale has a point of superiority even over the poem. In fact, while the rhythm of this latter is an essential aid in the development of the poem's highest idea— the idea of the Beautiful— the artificialities of this rhythm are an inseparable bar to the development of all points of thought or expression which have their basis in truth.*
>
> *But truth is often, and in very great degree, the aim of the tale. Some of the finest tales are ratiocination,"*[৬০]

অন্য আর এক সমালোচকের অভিমত— "The short story is a breath of life. Both dimension and basic function. Like the lungs expanding retracting. The circle of transbluesent spirit in and out connected like a wheel, a circle, how we go, our role."[৬১]

উপরোক্ত দুটি মন্তব্যের প্রথমটিতে ছোটোগল্প, যাকে অ্যালান বলেছেন 'tale', তাতে রয়েছে truth। শুধু তাই নয়, কিছু ভালো গল্পকে তিনি সঠিক যুক্তিসম্মত চিন্তন-প্রক্রিয়াজাত বলতে চেয়েছেন। আর পরবর্তী বক্তব্যে ছোটোগল্পকে জীবনের সঙ্গে অন্বিত করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ছোটোগল্পের সঙ্গে জীবন ওতপ্রোত। গল্প থেকে ছোটোগল্পের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং স্বতন্ত্রতাগুলি নির্ণয়ের সময়ে দেখানো হয়েছে, গল্প এবং ছোটোগল্পের মূল ফারাকটা। গল্পে মূলত ছিল কল্পনা। আর ছোটগল্পের মূল শর্ত ছিল বাস্তবতা। তবে ছোটোগল্পের আঙ্গিকগত পর্যালোচনা সূত্রে এ প্রশ্ন করা চলে, চর্যাগান বা প্রাচীন-মধ্যযুগীয় কাব্যগুলিতেও তো ছোটো আকারেই গল্প পরিবেশিত হয়েছে, তাও আবার বাস্তবতা সহযোগে। কল্পনা তার মূল ভিত্তি নয়, তবে কেন সেগুলিকে ছোটোগল্প বলে অভিহিত করতে চাওয়া হচ্ছে না? এর উত্তরে সমালোচকের এ মন্তব্যটি যুক্তিপূর্ণ দাবি রাখে— "ছোটগল্পের ক্ষুদ্রত্ব নিরূপিত হয় তার আন্তর- গঠনের দ্বারা।"[৬২] আর একই কারণে আকারে ছোটো 'গল্প'মাত্রই ছোটোগল্প

হয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়— "ছোটগল্প সন্ধান করছে একটি বিশেষ মুহূর্ত। সেখানে পৌঁছে গেলেই তার সিদ্ধি।"[৬৩] বলা বাহুল্য, সে সিদ্ধি প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাস্তবতা সমৃদ্ধ কোনো কাব্য বা উনিশ শতকীয় চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা, নভেলা বা উপন্যাস কোনোটাই দিতে পারে নি, যা পেরেছে উনিশ শতকের এই অদ্ভূত ফসলটি— ছোটোগল্প।

তবে গল্প-ছোটোগল্পের সম্পর্ক প্রসঙ্গে দীর্ঘায়ত এ আলোচনার শেষে একথা স্পষ্ট, গল্পের সঙ্গে ছোটোগল্পের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও পরোক্ষ যোগ অবশ্য রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় তথা বাংলা গল্প ভাঁড়ার বাংলা ছোটোগল্পের ঐতিহ্য এবং শেকড়স্বরূপ। যার পথ পেরিয়ে কাল এবং যুগমানসের প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটোগল্পের রূপ লাভ করেছে। আর উনিশ শতক এবং এ শতকের প্রবণতা ওই সকল প্রাচীন গল্প এবং ছোটোগল্পের মধ্যে একটা অদৃশ্য সম্পর্ক রচনা করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', প্রথম মিত্র ও ঘোষ সং, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলিকাতা, ১৪০৫, পৃ.৩

২. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড', ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ.৫০৫

৩. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সং, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১২৯

৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড', ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ.৫০৫

৫. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড', ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ.৫০৫

৬. বিজিত ঘোষ (সম্পা), 'বাংলার ছোটগল্প প্রথম খণ্ড', পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ.২

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়(সং), 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রথম খণ্ড, অষ্টম মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১১, পৃ.৯৩১-৯৩২

৮. রাজশেখর বসু (সং), 'চলন্তিকা' আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, নতুন সং, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি:, কলকাতা, ১৪২১, পৃ.২৫৬

৯. 'সংসদ বাংলা অভিধান', পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.৩১৯

১০. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড', ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ.৫০৬

১১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সং), 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রথম খণ্ড, অষ্টম মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১১, পৃ.৭৭৮

১২. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সং), 'বাঙ্গালা শব্দকোষ', পুনঃপ্রকাশ, ভূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ.২১৭

১৩. 'সংসদ বাংলা অভিধান', পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.২৪৪

১৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড', ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ.৫০৬-৫০৭

১৫. রাজশেখর বসু, 'হিতোপদেশের গল্প', মাঘ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭৪, পৃ.৩

১৬. তদেব, পৃ.৫

১৭. তদেব, পৃ.৬

১৮. তদেব, পৃ.৬

১৯. তদেব, পৃ.৭

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ সং, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ.৪৮৫

২১. রাজশেখর বসু কৃত 'বাল্মীকি রামায়ণ' সারানুবাদ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা, ১৪২০, পৃ.৪

২২. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'সাহিত্য ও পাঠক', পঞ্চম সং, হাউস অব বুকস্, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ.১৮৪-১৮৫

২৩. রাজশেখর বসু, 'হিতোপদেশের গল্প', মাঘ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ৩৫

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রকাশ অগ্রহায়ণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ.৫৮৭-৫৮৮

২৫. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'সাহিত্য ও পাঠক', পঞ্চম সং, হাউস অব বুকস্, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ.১৮৫

২৬. তদেব, পৃ.১৮৪

২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), 'পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন', দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.১৮৫-১৮৮

২৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’, নতুন সং, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৬-২০০৭, পৃ.২৫৭

২৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), ‘পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন’, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.২২৭

৩০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সং, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ.২১

৩১. তদেব, পৃ.২১-২২

৩২. তদেব, পৃ.২২

৩৩. শিশিরকুমার দাশ, ‘বাংলা ছোটগল্প’, ষষ্ঠ সং, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৫

৩৪. তদেব, পৃ.২৩

৩৫. তদেব, পৃ.২৩

৩৬. তদেব, পৃ.২০

৩৭. তদেব, পৃ.৩১

৩৮. তদেব, পৃ.৩৪

৩৯. তদেব, পৃ.৩৫

৪০. তদেব, পৃ.৩৬

৪১. তদেব, পৃ.৬

৪২. তদেব, পৃ.৩৬

৪৩. তদেব, পৃ.৩৬

৪৪. Edgar Allan Poe, ‘The Tale-Writer and his Art’, Stedman and Hutchinson, comps. A Library of American Literature : An Anthology in Eleven Volumes. 1891.Vols.6-8: Literature of the Republic, Part3., 1835-1860 (www.bartleby.com, visited this page on 16.02.2019)

৪৫. তদেব

৪৬. কল্যাণ মৈত্র (সম্পা), ‘গল্প ১৫ মিনিট’, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৯-১৪

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' নবম খণ্ড, 'দেনাপাওনা', প্রকাশ চৈত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ.২৬

৪৮. তদেব, 'পোস্টমাস্টার', পৃ.২৯

৪৯. তদেব, 'ঘাটের কথা', পৃ.২

৫০. তদেব, 'ছোটো গল্প', পৃ.৭৯১

৫১. তদেব, পৃ.৭৯১

৫২. শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প', ষষ্ঠ সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৩৬-৩৭

৫৩. তদেব, পৃ.৩৭-৩৮

৫৪. তদেব, পৃ.৬৭

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' নবম খণ্ড, প্রকাশ চৈত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ.২

৫৬. তদেব, 'ঘাটের কথা', পৃ.৬

৫৭. তদেব, 'দেনাপাওনা', পৃ.২২

৫৮. তদেব, পৃ.২৬

৫৯. Brander Matthews, 'The Philosophy of the Short-story', Reprinted, Longmans, Green and Co., New York, 1917, p.15-16

৬০. Edgar Allan Poe, 'The Tale-Writer and his Art', Stedman and Hutchinson, comps. A Library of American Literature : An Anthology in Eleven Volumes. 1891.Vols.6-8: Literature of the Republic, Part3., 1835-1860 (www.bartleby.com, visited this page on 16.02.2019)

৬১. Maurice A. Lee (editor), 'writers on writing The Art of the Short Story', Amiri Baraka, 'Short Story and Poetry', First Published, Praeger Publishers, United States of America, 2005, p.5

৬২. শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প', ষষ্ঠ সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৬৪

৬৩. তদেব, পৃ.৬৪

মৃণাল সেনের 'খারিজ' : চাকর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্কের বাস্তব চিত্রায়ণ

অলোক বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া

সারাংশ: *শহরের এক দারুন ঠান্ডা-রাতে পালান নামের এক বারো-তেরো বছরের কাজের ছেলে এক মধ্যবিত্ত বাড়ির রান্নাঘরে অদ্ভুতভাবে মারা যায়। গ্রামের ছেলে পালান। পুলিশ অনুসন্ধান করে আবিস্কার করে সিঁড়ির নীচে তার শোবার জায়গাটা অত্যাধিক ঠান্ডা হওয়ায় সে সেদিন রান্নাঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে শীতে রক্ষা পাওয়ার আশায় উনুনের পাশে শুয়েছিল। পোস্টমর্টেমে পালানের মৃত্যুর কারন হিসাবে বলা হয় কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া। ফলে পরিবারটি সমালোচনার মুখোমুখি হয়। যদিও পালানের বাবা তাদের বিরুদ্ধে এক নীরবতার মধ্যে থেকে গ্রামে ফিরে যায়। একটা ব্যবস্থা যার মধ্যে আমরা মধ্যবিত্তরা বাসকরি।যেখানে আমরা আমাদের আদর্শের কথা বলি, সেটা আসলে যে কতটা মিথ্যাচার- সেই ময়না তদন্তের নামই 'খারিজ'।*

সূচক শব্দ: *পরিচালক, চলচ্চিত্র, চাকর, মধ্যবিত্ত শ্রেনি, শোষণ, চিত্রায়ন*

'খারিজ' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৮২ খ্রিঃ । রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ' উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত। নগর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে এক শিশু ভৃত্যের মৃত্যু ও তার প্রতিক্রিয়া ছবির মূল বিষয়বস্ত। ছবিটির গল্প হল- পালান নামে ১০-১২ বছরের একটি ছেলে অজ্ঞন-মমতার বাড়িতে কাজ করে। কাজের বিনিময়ে সে মাইনে পায়। রাত্রিবেলা সে ঘুমাত সিঁড়ির নিচে। একদিন শীতের রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। রান্না ঘরে উনুনে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে সে জানালা -দরজা বন্ধ করে উনুনের পাশে শুয়ে পড়ে। ফলে কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় সে মারা যায়। তারপর থানা-পুলিশ, পোষ্টমর্টেম ইত্যাদি। ছেলেটির বাবা আসে। মৃত্যুর কারন ও জানে। তারপর ছেলেকে দাহ করে বাবা ও চলে যায় নিজের গ্রামে। অঞ্জন ও মমতাকে নমস্কার জানিয়ে।

এই ছবিতে পরিচালক মৃনাল সেন একজন চাকরের মৃতুকে কেন্দ্র করে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেনির সবার্থপরতা ও অমানবিক আচরণকে তুলে ধরেছেন। ছবির শুরুতে অঞ্জন মমতাকে প্রশ্ন করে সে কি চায়-"একটা ফ্ল্যাট, গাড়ি, শুধু শাড়ি, ফ্রিজ, একটি রেডিওগ্রাম, ব্যাঙ্কে একটি লকার ?"(১) তখন মমতা বলে যে আমার এসব কিছুই চাই

না, আমার আসলে এখন যা দরকার তা হচ্ছে একজন চাকর- যার বয়স হবে ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তখন অঞ্জন বলছে হ্যাঁ, মাইনে হবে কম, খাবে কম,। সেই চাকর কী কী কাজ করবে তার একটা ফিরিস্তিও দুজনে মিলে তৈরি করে ফেলে। সে কয়লা আনবে; স্টোভ ধরাবে; চা তৈরী করবে; দোকান থেকে সিগারেট ও দেশলাই আনবে; কেরোসিন আনার জন্যলাইনে দাঁড়াবে; ধোবিখানায় যাবে; তারা যখন অফিসে থাকবে তখন সে বাড়ির কাজ দেখাশোনা করবে এবং তাদের ছেলে পুপাইয়ের সাথে খেলা করবে; পুপাইকে স্কুলে নিয়ে যাবে এবং ফেরার পথে পুপাইকে বাড়িতে নিয়ে আসবে। তাহলে ছবিটা কী দাড়াল? তার মাইনে হবে কম; খাবে কম কিন্তু কাজ করবে বেশী।

পরের দৃশ্যে আমরা দেখি যে, পালানকে কাজের লোক হিসাবে রাখার জন্য মমতা তার বাবা হারানের সঙ্গে মাইনের বিষয়ে দরকষাকষি করছে । মমতা হারানকে জিঙ্গাসা করে যে তার ছেলে তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কিনা। উত্তরে হারান জানায় যে কেন পারবে না? "বাবুদের বাড়ি থাকবে তার আর কষ্ট কী।"(২) অর্থাৎ হারান আশা করেছিল তার ছেলে বাবুদের বাড়িতে ভালোই থাকবে। কিন্তু ছবিতে আমরা কী দেখতে পাই? রাত্রিবেলা ঘুমানোর জন্য তাকে কোনও আলাদা ঘর দেওয়া হয়নি। সে ঘুমাত সিঁড়ির নীচে,অথবা রান্নাঘরে। পালানের মৃত্যুর পর বাড়িতে যখন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারআসে তখন অঞ্জন তাদের বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। পালান কেন রান্নাঘরে ঘুমিয়েছিল? –পুলিশ অফিসারের এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানায় যে, আগে তাদের বাড়িতে যে সব কাজের ছেলেরা কাজ করত তারা বেশিদিন টিকতো না। তারা এইবসার ঘরেই ঘুমাত, কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা কিছু না কিছু চুরি করে পালিয়ে যেত। সেই থেকেই বসার ঘর তালাবন্ধই থাকত। চলচ্চিত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পালান প্রায় এক বছর অঞ্জন-মমতার বাড়িতে ছিল। এই এক বছরে পালান কোনো খারাপ আচরণ বা ছোটোখাটো চুরি করেছিল বলে ছবিতে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং অঞ্জন-মমতার প্রতিবেশীদের মুখে তার প্রশ্ংসাই শোনা যায়। শুধুমাত্র পালান মারা যাওয়ার আগের রাতে প্রতিবেশী শ্রীলার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা জানা যায়। মোটের ওপর পালান শান্ত ও বাধ্য স্বভাবের হলেও এক বছরের মধ্যে সে মনিবের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থহয়েছে এবং রাতে ঘুমাবার জন্য বসার ঘর ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার জন্য শুধুমাত্র পালান দায়ী ছিলনা। এর মূলে ছিল অঞ্জন-

মমতার অমানবিক আচরণ ও মানুষের ওপর আস্থাহীনতা- যা নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেনির স্বভাবের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পালানকে ঠিকমতো গায়ে দেওয়ার জামা-কাপড়ও দেওয়া হত না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মমতার একটি মন্তব্য থেকে। পালান মারা যাওয়ার পর মমতা কথা প্রসঙ্গে শ্রীলার কাছে অভিযোগ জানায় যে, "এই তো সেদিন, পাড়ার ওই বাড়িটা থেকে একটা প্যান্ট নিয়ে এসছে, বলছে ওই বাড়ির মাসিমা নাকি ওকে দিয়েছে। আজকাল যেন না চাইতেই কেউ হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে। যেন আমরা ওর জন্য কিছু করিনি। আমাদের যেন কোনও দায়িত্ব নেই।"(৩) এখানে মমতা যে দায়িত্ববোধের কথা বলেছেন, সেটা তারা ঠিকঠাক পালন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। কারন ১০-১২ বছরের একটা ছেলে অন্যের কাছ থেকে জামা-প্যান্ট চেয়ে রিলাক্স করবে এটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, পালানের কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য রান্নাঘরে ঘুমিয়েছিলো বলেই। রান্নাঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে উনুনের গরম আঁচের পাশে ঘুমিয়েছিলো বলেই কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই শীতের ঠান্ডায় যাকে একটা কম্বল দেওয়ার কথা মনে থাকে না, তাকে যে নিয়মিত জামা-কাপড় দেওয়া হত- এটা ভাবা একটু কষ্ট কল্পনা বলেই মনে হয়। পালানের বাবা হারান যে আশা করেছিলেন তার ছেলে বাবুদের বাড়ীতে ভালোই থাকবে, সেই হারানই কিন্তু পালান মারা যাবার পর বলতে বাধ্য হয় 'বড়ো আশা করে বাবুর বাড়ি দিয়েছিলাম, আমার কপালে সইল না বাবু।'(৪)

পালান যেদিন মারা যায় সেদিন রাত্রে হারান কোথায় শোবে এই বিষয়ে অঞ্জন-মমতা সমষ্যায় পড়ে যায়। কারন তাকে তো এখন আর সিঁড়ির তলায় বা রান্নাঘরে শোয়ার কথা বলা যায় না।পালান রান্নাঘরে মারা যাওয়ায় অঞ্জন-মমতার মধ্যে একটা মধ্যবিত্তসুলভ অনুশোচনা দেখা দেয়। শেষে অঞ্জন ঠিক করে যে বসার ঘরেই হারানের শোয়ার ব্যবস্থা করা হবে । তাই অঞ্জন বসার ঘরের তালা খুলে আসবাবপত্র সরিয়ে মেঝেতে জায়গা তৈরি করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তোষক ও কম্বল না থাকায়। তখন মমতা তাদের শোবার ঘরে গিয়ে খাটের বিছানা উল্টে দেখে যে মূল যে তোষক তার নীচে দ্বিতীয় আর একটা হাল্কা তোষক রয়েছে। সে অঞ্জনকে ডেকে সেটা দেখায়। তখন অঞ্জন মন্তব্য করে যে 'আরে, এটা ছিল, এটা এতদিন পালানকে দিইনি আমরা?'(৫) কাজের ছেলে বা চাকর বাকরদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে এই যে যে মনে

না থাকা - এটা হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেনীর সহজাত স্বভাব । বিষয়টিকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষন করেছেন। তিনি লিখছেন, "পালানের মৃত্যুর পর যখন ক্রমশই প্রকাশ পেতে থাকে যে তার মালিকেরা কোনো দিনই তার সম্পকে কোনো কিছুই জানতে আগ্রহী ছিলেন না, তখন বোঝা যায়, কেন মৃনাল বাবু পালানের পরিচারক জীবনকে তাঁর ছবির মধ্যে স্থানই দেন না। তাঁর ছবির দর্শকেরা এবং অঞ্জন-মমতা একই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। পালানের একবার তাদের সংসার যাত্রার অঙ্গ হয়ে গেলে তাদের আর লক্ষ করার দরকার পড়েনা; তারা কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন বড় রকমের অবাধ্যতা বা চুরি বা মৃত্যু আবার তাদের দিকে প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষন করে"।তখনই প্রথম ধরা পড়ে - যেমন 'খারিজ' -এ, - প্রভুরা দাসদের মানুষ হিসাবে কত অকিঞ্চিৎকরভেবেএসেছেন।"(৬)এইকারনেইপালানের বাড়ির ঠিকানা, এমনকি তার পুরো নামটা পর্য্যন্ত জানার প্রয়োজন বোধ করেনা এই মধ্যবিত্ত শ্রেনী।

নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেনীর স্বার্থপরতা এবং অমানবিক আচরণের আরেকটি দিক হল তাদের গা-বাচানো বা দোষস্থালনের প্রচেষ্টা। ছবিতে অঞ্জন-মমতা, বাড়ির মালিক প্রত্যেকেই পালানের মৃত্যুর দায় থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য নির্লজ্জ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। এই দোষস্থালন ও দোষারোপের প্রচেষ্টা কখনো অঞ্জন-মমতার পরস্পরের মধ্যে, কখন ও অঞ্জন-মমতার সঙ্গে প্রতিবেশীদের, কখনো আইন ও কর্তৃপক্ষের কাছে । সরাসরি একে অন্যকে দায়ী করার এক নির্মম ও নির্লজ্জ উদাহরণ আমরা দেখতে পাই এই ছবিতে।

অঞ্জন-মমতার পরস্পরের মধ্যে দোষস্থালন ও দোষারোপের প্রচেষ্টা নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকট ও গ্লানির চেহারাকেই প্রকট করে তোলে। অঞ্জন প্রায় সবকিছুর জন্যই মমতাকে দায়ী করে- পালানের ঠিকানা না রাখার জন্য; রান্নাঘরে উনুনের আঁচ গরম ছিল একথা পুলিশকে বলার জন্য; হারানকে চা না দেওয়ার জন্য এমনকি ক্যালেন্ডারের পেজ চেঞ্চ না করার জন্য। মমতা কিন্তু অঞ্জনের এই দোষারোপের প্রচেষ্টা নীরবে মেনে নেয়নি। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ সেই দৃশ্যটি যেখানে হরির আনা চা অঞ্জন নিয়ে ফেলবার পর মমতা প্রত্যাখ্যান করে, যেন অঞ্জনের উপর জিতে যায়, অঞ্জনকে অস্বস্তি ও গ্লানির মধ্যে ফেলে দেয়।(৭)

অঞ্জন-মমতার সঙ্গে প্রতিবেশীদের পারস্পরিক দোষস্থালন ও দোষারোপের চেষ্টাটি ও ভয়ঙ্কররূপে ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। অঞ্জন অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে পাড়ার একদল লুম্পেনকে ঘরে ডেকে এনে চা খাওয়ায়। তারা চলে যাওয়ার পর

বাড়িওয়ালা অঞ্জনকে বলে যে সে তো সদর দরজা থেকে ওদের বিদায় দিতে পারতো, বাড়ীতে ডেকে আনার দরকার ছিলনা। তখন অঞ্জন বাড়ীওয়ালাকে বলে যে সে ইচ্ছা করে তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসেনি, সে বাধ্য হয়ে একাজ করেছে। অঞ্জন বাড়িওয়ালাকে অভিযুক্ত করে এই বলে যে, বাড়িটার মালিক সে, তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তিনিও তো অঞ্জনের সঙ্গে নিচে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তখন বাড়িওয়ালা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জানায় যে সে একবার যখন বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে তখন তার আর কোনও দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ বাড়িওয়ালা নিজেকে বাঁচাবার জন্য সব দ্যায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। অনবরত অন্যের উপর দোষ চাপাবার এই সুযোগ সন্ধান প্রায় কুৎসিত হয়ে ওঠে যখন মমতা শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিনী শ্রীলাকেও হঠাত আক্রমণ করে বসে এই বলে যে, 'তুমি ওকে (টাকাটা) না দিলেই পারতে।'(৮) মধ্যবিত্ত শ্রেনির এই গা-বাচানো বা দোষস্থালনেরচেষ্টা অত্যন্ত অমানবিক হয়ে ওঠে শিববাবু যখন অঞ্জনকে উপদেশ দেন এই বলে যে, হারানকে যেভাবে হোক রাত্রিবেলাটা এখানে থাকতে বাধ্য করা, যাতে করে সে গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে এনে কোনও ঝামেলা করতে না পারে। তিনি বলেন, 'হারানকে চোখে চোখে রাখা দরকার ...কে কী বুদ্ধি দেবে; সে রকম লোকের তো অভাব নেই।'(৯) মনে রাখতে হবে যে ওই সময় হারান সদ্য পুত্রহারা একজন শোকার্ত বাবা।

আইনের দিক থেকে গা-বাঁচানোর জন্য অঞ্জন তার অভিবাবক শিববাবুর উকিল বন্ধু বিনয় সোমের কন্সাল্টিং রুম-এ গিয়ে হাজির হয়। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়।

বিনয় সোমঃ ব্যাপারটা হচ্ছে negligence একটি offence।

শিববাবুঃ ইনি আমার neighbour,neglect করতে একে আমি কখনো দেখি (অঞ্জনের প্রতি ঘুরে)কী?

অঞ্জনঃ আমরা ওকে... মানে... মানে... ও আমাদের বাড়ির লোকের মতোই ছিল।

বিনয় সোমঃ না না, ছিল না, ছিল না। থাকা সম্ভব না। আপনারা ওকে ভালোবাসতেন, ওইটুকুই, তার বেশী নয়। যতটা সুযোগ-সুবিধে আপনারা পান, মানে afford করতে পারেন, যা আপনার ছেলে পেয়েছে, তার কতটুকু ও পেয়েছে? বলুন? ওকে শোবার ঘর দিয়েছিলেন? দেননি। ও তো শুতে সিঁড়ির তলায়, রান্নাঘরে। আচ্ছা

এই যে কলকাতার উপর দিয়ে কয়দিন cold wave বয়ে গেল... । উপায় কী ? মাস মাস মাইনে পাবে আর ছেলেটা ও দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে।

অঞ্জনঃ কিন্তু আমাদের কী দোষ বলুন ? আমরা তো... মানে... আমরা...

বিনয় সোমঃ দেখুন, যেকোনও ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যদি দেখেন, বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সকলেই immoral। আর আমরা, এই যে সব বই পত্তর দেখছেন, এইগুলো দিয়ে ওইসব moral truth গুলোকে চাপা দিই। The Legal Lie Must Prevail over the Moraltruth. দেখা যাক, post-mortem-এর report টা তো আসুক।

অঞ্জনঃ জানেন, ওই রান্নাঘরে... ওই রান্নাঘরে যদি একটা ventilator থাকতো না... তাহলে হয়তো...

বিনয় সোমঃ উম, কথাটা আগে ও একবার আপনি বলেছেন। আপনি ও চাইছেন বাঁচতে, এদিকে দেখুন আপনার বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটিও হয়তো বসে নেই।(১০)

'আমরা' ও 'ওরা'-র এই বিভাজন স্বচ্ছল মধযবিত্ত শ্রেনির একটি মুল বৈশিষ্ট্য যেটা গোটা চলচ্চিত্র প্রাধ্যান্য বিস্তার করেছে। অঙজন-মমতার ছেলে পুপাইকে আমরা ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন রকম পোষাকে দেখতে পাই। এমনকি তার ঠান্ডা লাগবে বলে মমতা তাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছে। তারা নিজেরাও বিভিন্ন রকম শীতের পোষাক use করেছে। কিন্তু কাজের ছেলেটাকে একটা সোয়েটার বা ব্লাঙ্কেট দেওয়ার কথা তাদের মনে থাকছে না। অঞ্জন-মমতার শিক্ষিত, সুরুচিপূর্ণ, ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু অঞ্জন যখন গর্ব করে বলেন, 'ও আমাদের বাড়ির লোকের মতোই ছিল'- তখন বোঝা যায় সেখানেও বৈষম্য ও অনাদর অব্যাহত, এবং গৃহস্বামী নিজে যখন তার নির্মমতা বুঝতে ও পারেননা, তখন বোঝা যায়, এই সমর্পক ও তার অনুষাঙ্গিক মানসিকতা কত পাকাপোক্ত। (১১)

অঞ্জন পালানের মৃত্যুর দায় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বাড়িওয়ালার ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করে। সে উকিলকে জানায় যে রান্নাঘরে যদি একটা ভেন্টিলেটর থাকতো তাহলে হয়ত পালানের মৃত্যু হত না। অন্যদিকে বাড়িওয়ালা ও পালানের মৃত্যুর দায় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নির্লজ্জভাবে অঞ্জনের মুখের ওপর তার দায় অস্বীকার করলেও তার মনেও একটা ভয়ও দ্বিধা দেখা দেয়। এই ভয় ও মানসিক দ্বিধা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং সতর্কতামূলক মনোভাব থেকে তিনি এক ডাক্তারের চেম্বারে উপস্থিত হন। তিনি ডাক্তারের কাছে জানতে চান ভেন্টিলেটার না থাকার জন্য

পালানের মৃত্যু হতে পারে কিনা । অর্থাত বাড়িওয়ালা ও অঞ্জনের মতোই পালানের মৃত্যুর দায় যাতে নিজের ওপর না এসে পড়ে তার জন্য অতি সতর্ক ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

শবদাহের দৃশ্যে, মৃনাল সেন প্রথম দুই শেনির মেরুকরণকে সামনে নিয়ে আসেন- প্রভু এবং ভৃত্য। শবদাহের ব্যবস্থা চলাকালীন ক্যামেরা দেয়ালে লেখা 'সমীরণ, তোর হত্যার বদলা নেব' লেখার ওপর ফোকাস করে এবং 'বদলা' শব্দটি পর্দায় বার বার ফুটে ওঠে। অঞ্জন কিছুটা ভীত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। শ্লোগানগুলি নকশাল যুগে লেখা হয়েছিল। এ সময়ে শিববাবু এবং অঞ্জনের বাড়িওয়ালার ছেলে সমীর তার সাথে যোগ দেয়। সমীরের প্রথম মন্তব্যটি তাতপর্যপূর্ণ, 'কোনও ঝামেলা-টামেলা হয়নি তো?'(১২)শব্দাহের এই দৃশ্যে এ দুই শ্রেনি- সর্বহারা বা ভৃত্যের দল চিতা বেষ্টন করে বসেছিল, এবং উচ্চশ্রেনি-যার প্রতিনিধি ছিল অঞ্জন, শিববাবু এবং সমীর দাঁড়িয়েছিল কিছুটা দূরে পেছনে - এদের তিনজনরেই গায়ে ছিল দামি পোষাক। কয়েক মিনিটের প্রতিকী উপস্থিতির পর তারা বাড়ি চলে আসে; শবদাহের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার সময় বা ইচ্ছা কোনওটাই তাদের ছিলনা।(১৩)

আরো লক্ষণীয় বিষয় হল যে, অঞ্জন-মমতার সঙ্গে বাড়িওয়ালার ঝগড়া হলেও তিনি এবং তার ছেলে, অঞ্জনের প্রতিবেশী অভিভাবক শিববাবু, উকিল, পুলিশ প্রত্যেকেই তারা তাদের মধ্যবিত্তসুলভ শ্রেনি-অবস্থান থেকে অঙজন-মমতাকেই সমর্থন করে গেছেন। অর্থাত নৈতিকতা বা সত্যকে চাপা দেওয়ার যে কথা উকিলবাবু বলেছেন, ছবিতে আমরা সেটাই দেখতে পাই।

ছবির শেষ দৃশ্য এবং ছবির পরিণতি নিয়ে কোনও কোনও দর্শক পরিচালক মৃনাল সেনের সমালোচনা করেছেন। পালানের বাবা হারানের 'বাবু, আমি...মা,আসি...খোকা বাবু।'- এই রকম প্রতিবাদহীন পরিণতি অনেকের পচ্ছন্দ হয়নি। হারান অঞ্জনকে কষে একটা চড় মারবে-অনেকে এরকমই আশা করেছিলেন। কিন্তু মৃনাল সেন মনে করেন, 'চড় মারার দরকার ছিল না। পালানের বাবার নীরবতাই চড় মেরেছে সবাইকে'(১৪)। আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেনি তথা মালিক শ্রেনির বিবেক জাগ্রত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। শাস্তি দিয়ে ছবির পরিণামে যবনিকা টানতে চাননি, বরং ক্ষমা পাওয়ার মধ্যেই শাস্তির থেকেও বেশী কিছু বেদনাদায়ক ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছিলেন। তাই শেষ অবধি কারও শাস্তি হয় না।

চলচ্চিত্রটি কি মৃনাল সেনের টার্গেট যে মধ্যবিত্ত শ্রেনি-তাদের বিবেক জাগ্রত করতে পেরেছিল? এর উত্তর সম্ভবত না- কারন ছবিটি দেখায় পর দর্শকদের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।এক মহিলা, যিনি সম্ভবত একজন প্রবীন মার্ক্সবাদী নেত্রী ছিলেন, ছবিটি দেখার পর মন্তব্য করেন, 'Now, I have to go home and ask my maid to sit on my lap so that I can feed her.'(১৫) এছাড়া একজন প্রবীন বাঙ্গালি সাংবাদিক মুম্বাইয়ের থাকাকালীন কলকাতা থেকে অঞ্জনের মতোই একজন শিশু শ্রমিক নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ীর কাজ করানোর জন্য, তিনি টেলিভিশনে ছবিটি দেখার পর তার স্ত্রীকে জিঙ্গাসা করেন,' Have we given him a blanket?'(১৬) এ প্রশ্ন শুনে তাঁর স্ত্রী হাসতে শুরু করেন- কারন মুম্বাইয়ে শীতকালেও কেউ কম্বল ব্যবহার করে না। কিন্তু এ প্রশ্নে তাঁরও মনে উদ্বেগ ও অপরাধবোধ দানা বাঁধতে থাকে। অবশ্য দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। মৃনাল সেন লক্ষ করেন, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার যেদিন টেলিভিশনে রাত্রে 'খারিজ' ছবিটির টেলিকাষ্ট থাকতো সেদিন তারা তাদের কাজের লোকদের সন্ধ্যায় ছুটি দিয়ে দিত। কারন তারা তাদের চাকরবাকরদের সাথে নিয়ে ছবিটি দেখতে রাজী ছিল না।(১৭) শিলাদিত্য সেন তাঁর 'মৃনাল সেনের ফিল্মযাত্রা' বইয়ে লিখেছেন " সম্ভবত বাইশ বছরের ও আগে খারিজ দেখতে গিয়েছিলাম শেয়ালদার ছবিঘর-এ। শেষ হওয়ার পর হল থেকে বেরোচ্ছি, ধোপদূরস্ত এক বাঙালি পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন 'এরপর তো দেখছি, চাকরবাকরদেরও খাটে শুতে দিতে হবে।"(১৮)

ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও মনিব বা মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের বাড়ির কাজের লোকদের সুখ-সবাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে হয়তো খানিকটা সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। একটা সময় ছিল যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ ছিল সততার পক্ষে; বিবেকের দংশনে সে কাতর হত। কিন্তু এসবই আজ বদলে গেছে। বদলায়নি শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালির সুবিধাবাদী মানসিকতার। যা আজ আরও নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। তাই অঞ্জনরা যখনই বিপদে পড়বে, তখন পুলিশ-উকিল-ডাক্তার-বাড়িওয়ালা সকলে অঞ্জনের সাথে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবে আপতকালে । অন্যদিকে কিশোরটির বাবা এবং তার সঙ্গী সাথীরা কিশোরটিকে হারিয়ে আবার তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা আর বঞ্চনার মধ্যেই ফিরে যায়। তারা প্রতিবাদ করেনা, কারন প্রতিবাদের ভাষা তারা জানে না। তারা অর্থ বোঝে না আপাত মুখোশধারী মানুষগুলির কথার আড়ালে অন্য কিছু কঠিন সত্য-সঅসত্যের

গভীর ব্যবধানের। তাই সব হারানোর পরেও চিরকাল হাতজোড় আর মাথা নত করে নিজেদের শেষ শালীনতাটুকু প্রকাশ করতে ও আপত্তি করেনা। এভাবেই মধ্যবিত্ত ও তাদের গরীব চাকরেরা পাশাপাশি থেকে যায়-প্রভু-ভৃত্যের স্মপর্কের এক চিরন্তন সাক্ষর হিসাবে।

তথ্য নির্দেশ:

১. খারিজ,ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক, ডি টি এস ই এস, ডিজিটাল সারাউন্ড সাউন্ড।

২. পূর্বোল্লিখিত।

৩. পূর্বোল্লিখিত।

৪. পূর্বোল্লিখিত।

৫. পূর্বোল্লিখিত।

৬. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়,খারিজঃ রাজনৈতিক তাতপর্য, প্রলয় শূর সম্পা ,মৃনাল সেন, প্রথম প্রকাশ, বানীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ-৮০।

৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ-৮১

৮. পূর্বোল্লিখিত ।

৯. খারিজ, পূর্বোল্লিখিত।

১০. পূর্বোল্লিখিত।

১১. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ-৮০।

১২. খারিজ, পূর্বোল্লিখিত।

১৩. DipankarMukhopadhyay, Mrinal Sen: Sixty years in search of Cinema, Herper Collins Publishers, Noida, 2009, pp.159-160.

১৪. মৃনাল সেন, তৃতীয় ভুবন, প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৬৬

১৫. DipankarMukhopadhyay, op.cit, p-161

১৬. Op-cit.

১৭. Op-cit.

১৮. শিলাদিত্য সেন, মৃনাল সেনের ফিল্মযাত্রা, প্রথম প্রকাশ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০১৫,পৃ-১৪৫।

জল সংস্কৃতিঃ প্রসঙ্গ কোচরাজবংশী ব্রত

কৃষ্ণকান্ত রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবরী, আসাম

সারসংক্ষেপ (Abstract) : *সভ্যতার আরম্ভ থেকেই জলের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক। বলা হয় জলের আর এক নাম জীবন। শুধু মানুষ কেন সমস্ত প্রাণী জগতও জলের উপর নির্ভরশীল। জলের মধ্যেই পাওয়া যায় প্রাণীর অস্তিত্ব। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, জনজাতির মধ্যে জলসংক্রান্ত ব্রতকথা, লোকাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, জল উপাসনে বিশেষভাবে প্রতীয়মান। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সমস্ত কিছুর মধ্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তর জাতি কোচ-রাজবংশী সমাজ। নৃগোষ্ঠীগতভাবে কোচ রাজবংশী ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনজাতি সমাজের অন্তর্গত। পঞ্চদশ শতক থেকেই কোচ রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং কোচ থেকে রাজবংশীতে পরিণত হয়। আরও পরে বিশ শতকের গোড়ায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ ক্ষত্রীয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাই কোচ-রাজবংশী সমাজের ব্রত, পূজা-পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকদেব-দেবীর মধ্যে কৌম ভাবনা বিশেষভাবে প্রতীয়মান। লোকায়নের প্রতিটিতে মাত্রায় জলবাচকতা বিশেষ প্রাধাণ্য পেয়েছে।*

সূচক শব্দ (Keyword) : *মেচিনি ব্রত, ফাটামারা, চুমানী, পাথারিয়া, হুদুম, কালাম্যাঘ, পাটানি, জিতুয়া, ঘাটোব্রত, ঘাটেশ্বরী, শিরুয়া পাবনী।*

মূল আলোচনা (Discussion) :

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় জলে। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সভ্যতা ও তার বিকাশ। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় নগর সভ্যতার সূচনা হয় মুলত নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। ট্রাইগ্রিস ও ইউক্রোটিস নদীর ধারে গড়ে ওঠে মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া বা সুমেরু সভ্যতা। হোয়াং হো – ইয়াংসিকিয়াং নদীতীরে গড়ে ওঠে সভ্যতা আবার সিন্ধুনদ অববাহিকায় গড়ে ওঠে সিন্ধুসভ্যতা। সাম্প্রতিক বড়ো বড়ো শহর, নগর, বন্দর গড়ে উঠেছে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে। সভ্যতার বিকাশ, মানবজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জল বা নদী জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতভাবে। উত্তরপূর্ব ভারতের ভাওয়াইয়া আর পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালিগান আসলে নদী-জল জীবনগাঁথার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-

জনজাতির মধ্যে নদী বা জলকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, ব্রতকথা, যাদুবিশ্বাস, লোকবিশ্বাস, পূজাপার্বণ, জল উপাসনা নানাভাবে প্রতীয়মান।

উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুর, দার্জিলিং সমতল, উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলা) আসামের (গোয়ালপাড়া, ধুবরী, বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার, নলবাড়ি, বরপেটা জেলা) মেঘালয়ের দক্ষিণ গারোহিলস জেলা, বিহারের পূর্ণিয়া, নেপাল দেশের (ঝাপা, মোরঙ) বাংলাদেশের রংপুর - এই বৃহত্তর ভৌগলিক এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কোচরাজবংশী সমাজ। নৃ-গোষ্ঠীগতভাবে ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

এই বিশাল ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। এর মধ্যে পরিচিত - ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা, তোর্ষা, ডুডুয়া, ডিমডিমা, বিরকিটি, মুজনাই, ধরলা, সংকোশ, গদাধর, টিপকাই, গৌরাং, রায়ডাক, দুধনৈ, কৃষ্ণাই ইত্যাদি। শুধু নদীই নয়, অসংখ্য ঝোরা বিল, খাল, ডোবাও আছে। এলাকার নদীগুলির অধিকাংশ উত্তরের হিমালয়গলা জলে বা ঝোরা থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়ে সমতল অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। নদীগুলি নানা চড়াই উৎরাই-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বেশিরভাগ নদী শীতকালে শীর্ণ-স্বল্প জল নিয়ে বয়ে চলে আবার বর্ষার জল প্রবাহে উন্মত্তাও দেখা যায়।

এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকমননে, বিশ্বাসে ভয়ঙ্কর নদী-জলের 'কু-দৃষ্টি থেকে পরিত্রান লাভের জন্য 'স' দৃষ্টি বা কৃপা দৃষ্টির বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (Presiding deity) বা অপদেবতাকে তুষ্ট করার অনুষ্ঠান ও আচরণ বিধিকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানাধরণের নদীবাচক লৌকিক দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, নাচগান ও মন্ত্র।" [১]

জল ও নদী সমার্থক। জলবহমানতাই নদীর প্রাণ। তাই বলা হয় - "নদ থেকেই 'নদী' এসেছে। 'নদ' শব্দের অর্থও জল। 'ন' বা 'নই' [বা নাই] অষ্ট্রিক গোষ্ঠীতে নদী অর্থেই ব্যবহৃত। মূল শব্দ 'ন' জলেরই নাম। এর সঙ্গে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর [দাঃ>] 'দ' যুক্ত হয়ে নদ। 'ন' যে জল তার বড় কারণ হল 'ন' বা জলে যা বহন করে তা ন-বহ বা ন-বাহন। এর থেকে নব ও নাব্য শব্দ এসেছে।"[২] তাই সমস্ত কামনা, বাসনা, প্রার্থনা, প্রধানতম উপাস্য পরিভাষাগুলি বিভিন্ন ব্রত, পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার, গান-লোকায়নের উপাদানগুলি প্রতিভাত হয়ে নদী জলের বহুমাত্রিকতায়।

ব্রত সামাজিক অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্ব। 'ব্রত' শব্দটি 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রত শব্দ উৎপন্ন। যার অর্থ নিয়ম বা সংযম। "সাধারণত কোন কিছু কামনা করে দেবতার

কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচার পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যান কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম-সংযমের মধ্য দিয়ে কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।"(৩) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে বলেছেন- "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে আসছে তাকেই বলি ব্রত।"(৪) কোচরাজবংশী সমাজের বিভিন্ন ব্রতের মধ্যে পার্থিব কল্যান কামনার জন্য দশে মিলে সবাই অংশগ্রহণ করে। অধিকাংশ ব্রতের নিবিড় চর্চা করে চলেছেন নারীরা। নারীরাই ব্রতের ধারক বাহক, কোচ রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ব্রতগুলি মূলত লৌকিক ব্রত। লৌকক ব্রত পালিত হয় দু'ভাবে - পুরুষ ব্রত ও নারী ব্রত। পুরুষ ব্রত তেমন নেই, অধিকাংশ ব্রত পালন করে নারীরা। নারী ব্রত তিন রকমের - কুমারী মেয়েদের দ্বারা পালিত ব্রত, সধবা নারীদের দ্বারা পালিত ব্রত ও বিধবা নারীদের পালিত ব্রত। বিষয়টিকে ছকের সাহায্যে দেখানো হল –

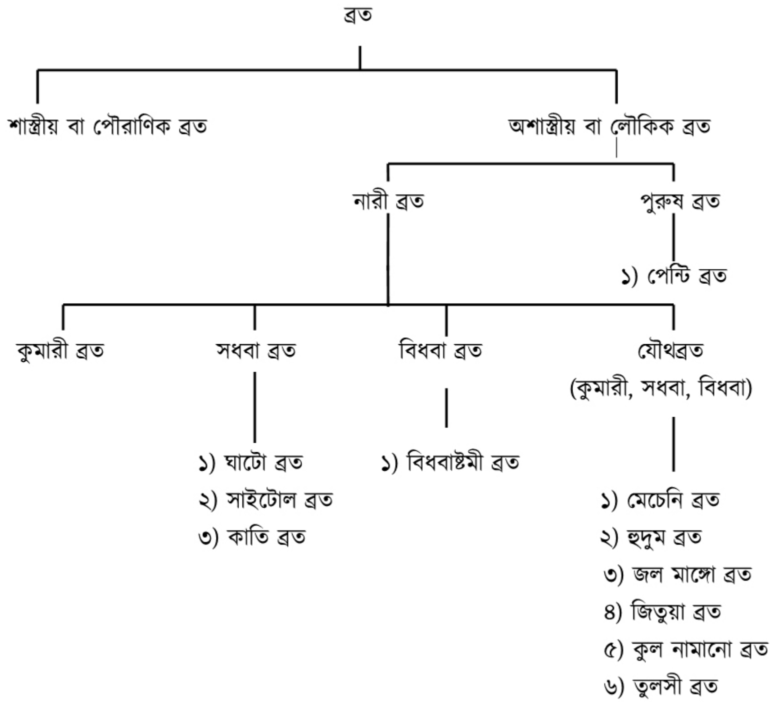

১) ঘাটোব্রতঃ- ঘাটো জলের দেবী ও নদীর পাড়ে ঘাটের স্থানই দেবীর স্থান। জলের মধ্যেই উপাচার পালিত হয়। সাধারণত নদীর ঘাটে মহিলারা দলবেঁধে এই ব্রত পালন করে। ব্রত পালনের সময় বৈশাখ মাস। কোন মন্ত্র নেই, কেবলমাত্র গান পরিবেশন করে পূজা পালিত হয়। গানের বিভিন্ন পর্ব থাকে। পর্বগুলি - নামানী, বসানী, চুমানী, পাথারিয়া, ভাসানী ইত্যাদি। যেমন বসানী পর্বে গাওয়া হয়—

কালা মাটি বান্ধানু পিড়া
গড় মাটি ছেচিনু পিড়া
সেইঠে বসি গেল ঢাট কাউয়া ভাইয়া
ঢাট কাউয়া ভাইয়া ডালি মারে
ঢাট কাউয়া ভাইয়া ভজন করে।

আবার 'চুমানী' পর্বে নারীরা সমবেত স্বরে গান করে—

নদীর বগলেরে গে আই
আই কিসের বাইজন বাজে গে
তোহোর সোয়ামী গে ময়না
দোয়ো সাদি করে গে আই।

নেপালের কোচ রাজবংশীরা ঘাটো পূজাকে বলে 'ঘাটোশ্বরী' পূজা। মূলত শিরুয়া পাবনী উপলক্ষে পূজা করে। মহিলারা বিকেলবেলা নদীর ঘাটে গিয়ে কলার পাতায় প্রসাদ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস - ঘাটো দেবী পঞ্চবইনি (পাঁচ বোন)। এই প্রসঙ্গে তিস্তা নদীর সঙ্গে এই ব্রতের সাজুয্য দেখা যায়। তিস্তাবুড়িরাও পাঁচ বোন - তিস্তাবুড়ি, গুচিলক্ষী, ডাকলক্ষী, অঘোন লক্ষী, পৌষ লক্ষী। 'তিস্তাবুড়ি' গানের মধ্যে যার বিবরণ পাওয়া যায়—

"তিস্তাবুড়ির নামান গে হৈসে
বড়য় তো হাউসালী
হাউস করিয়া নেও গে
তিস্তা বুড়ির পন্চ বইন।
গুচিলক্ষীর নামান গে হৈসে
বড়য় তো হাউসালী
ডাক লক্ষীর নামান গে হৈসে
বড়য় তো হাউসালী

অঘন লক্ষীর নামান হৈসে
বড়য় তো হাউসালী
পৌষ লক্ষীর নামান গে হৈসে
বড়য় তো হাউসালী।” (৫)

এই পাঁচ বোনের নাম স্মরণ করে ঘাটো ঠাকুরকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় মহিলারা ছিলকা বলে—

খালো না দালো গে
ফল খাই নদীত ভুটিয়া মরণ গে

ঘাটো ব্রতের মূল উদ্দেশ্য সন্তান কামনা। জলের সঙ্গে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

২) সাইটোল ব্রতঃ- উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুর, কোচবিহার জেলায় ব্রতটি এখনও প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে সাইটোল সম্রাজ্ঞী ফুলতি গিদালীর কথা বলা যায়- যে এই গানের ধারক ও বাহক, সাইটোল দেবীর বিভিন্ন নাম - ষাইটোল, সাইটোন পাওয়া যায়। সাইটোল দেবী আসলে বিষহরি দেবীর এক রূপ। ব্রত বিয়ে উপলক্ষেই পালিত হয়। ব্রতটির অন্যতম অঙ্গ কাহিনী ও গান। আখ্যান মূলক কাহিনী নিঃপুত্রীর পালা, সরজ্ঞাবান্দীর পালা, লীলাবান্ধির পালা, দুঃখিনী চম্পার পালা ইত্যাদি। ব্রতগানের বিভিন্ন পর্ব আছে - নামানী, চুমানী, বসানী, আখ্যান ও ভাসানী গান। যেমন, নামানী পর্বের একটি গান—

ও পারে দরিয়া এ পারে নদীয়া
মাঝ নদীতে থমকিসে ষাইটোল মাওর ডিঙ্গা
স্বর্গ হাতে নামুক ষাইটোল মাও
স্বর্গ হতে নামুক
মঞ্চে দেউক পাও।
কুত্তি গেলো গে মাড়েয়াগিরি
ধোওয়াও দুইখান পাও
কুত্তি গেলো গে মাড়েয়া গিরি
মুছাও দুইখান পাও।

এভাবেই পর্বানুযায়ী গিদালী ঢাকের তালে তালে নেচে নেচে গান ও আখ্যান পরিবেশন করে। গান ও পালা শেষে ব্রতিরা দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করে। মূলত নিঃসন্তান

সধবা নারী দেবীর কাছে কায় মনোবাক্যে বর প্রার্থনা করে। সর্বশেষে সাইটোল দেবীকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় 'ভাসানী' পর্বের গান গেয়ে—

"আজি যা যারে ষাইটোল মাও দরিয়ায় ভাসিয়া
ও মোর সোনার ঠাকুর রে।
আজি সারারাতি পোয়ালু মাও তুই জৈজোগারে
যাবারকালে গেলু মাও তুই দরিয়ায় ভাসিয়ারে।" (৬)

কাতিব্রতঃ- উত্তরবঙ্গের (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার), আসামের ধুবরী, কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া) জেলার কোচরাজবংশী নারীদের প্রিয় কাতি ব্রত। কাতি ঠাকুর মাটি ও শোলার হয়, হাতে থাকে তীর, ধনুক ও ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ঠ। ঠাকুরের মূলবেদীর চারদিক চারটি কলাগাছ থাকে। মন্ডপের ঘটে ধানের শিষ, চারকোনায় ধনুক থাকবে। এই মন্ডপের সামান্য দূরে রাখা থাকে পাকা কলার কাদি। ব্রত কথার সঙ্গে গিদালী গান পরিবেশন করে। মূলত শিবচন্ডীর বিবাহ, উভয়ের সহবাস, চন্ডীর গর্ভধারণ, কাতির জন্ম, নাড়ীছেন, কাতির রূপবর্ণনা ও শেষে বর প্রার্থনার পালা গাওয়া হয়। সন্তান প্রাপ্তি নারীকে কাতির মা সাজিয়ে তার কোলে দেয় কলা, পান, সুপারী, এগুলো সন্তানের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। প্রথম পর্ব শেষ হলে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে কোন একজন নারী পুরুষ সেজে লাঙল, জোঙাল দিয়ে হাল বায়, হালের গরু হয় দুজন নারী। এরপর ধানের চারা রোপন, ধানের আগ দেওয়া পর্ব চলে। এসময় চাষের জমিকে জলসিক্ত করার জন্য মন্ডপের চারদিকে জল ছিটিয়ে দেয়। সন্তান কামনাপ্রাপ্তি নারী মন্ডপে রাখা ধানের গুচ্ছ হাটু গেড়ে বসে শিষ কেটে কুলোয় ভরে ঠাকুর ঘরে রাখে। এই ব্রত আসলে বংশবৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদনের ঐকান্তিক কামনার জন্য করা হয়। এজন্য গাওয়া হয়—

"উঠো উঠো মাড়েয়ারে কত নিন্দে যাও
উঠো উঠো মাড়েয়ারে নেও কাতির বর।
হাজার টাকার কাতি যায় বনবাস
উঠো উঠো মাড়েয়ারে নেও গাভীর বর।
উঠো উঠো মাড়েয়ারে নেও ধানের বর
উঠো উঠো মাড়েয়ারে নেও পুত্রের বর।" (৭)

বিধবাষ্টমী ব্রতঃ- ব্রতটি পুরোপুরি নদী কেন্দ্রিক। অষ্টমী স্নানের দিন অথবা পরের দিন বিধবা মহিলারা উপোষ থেকে দল বেঁধে নদীতে যায়। নদীর জলে নেমে

স্নান ও সূর্য প্রনাম করে। ভেজা বস্ত্রেই কদম গাছের চারদিকে জল ঢেলে ঢেলে সাতপাক ঘুরে। সর্বশেষে সাদা সুতো গাছে বেঁধে দেয়। সুতো বাঁধার সময় ছড়ামূলক গান পরিবেশন করে। আসামের ধুবরী জেলার শান্তিপুর গ্রামের লসকা নদীতে ব্রতের ক্রিয়া দেখা যায়। আবার কোকরাঝার জেলার গোসাইগাঁও মহকুমার পলাশকান্দি বদলাগাঁও এলাকার বিধবা ঐদিন বিধবা অষ্টমী পালন করে গঙ্গিয়া নদীর পাড়ে। এসময় বিধবারা গঙ্গিয়া নদীর পাড়ে কাশিয়া বা কলার পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে ঘট ও শোলার পূজো দেয়। পূজা শেষে বিধবা মহিলারা নদীতে স্নান ও সূর্য প্রনাম করে। বিধবারা বিশ্বাস করে এই ব্রত করলে সবার মঙ্গল যেমন হয়, তেমনি মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সৎকামনাও করা হয়। আসলে নিঃসঙ্গ বিধবারা মৃত স্বামীকে স্মরণ করে বেঁচে থাকতে চায়। জীবনযুদ্ধের বহু স্মৃতি গাঁথা ছিল, সেই স্মৃতিকে মধুরতম করে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে।

১) মেচেনি ব্রতঃ- তিস্তাকে কেন্দ্র করে উভয় তীরের রাজবংশীসমাজ পালন করে মেচেনি ব্রত। মেচেনি ব্রতের সঙ্গে জলের গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ব্রতের দেবীই হল তিস্তাবুড়ি যেকিনা জলের দেবী। তিস্তার জলের বিপর্যয় মানুষ জ্ঞাত। তার সেই ভয়ংকরী মূর্তিকে শান্ত করার একমাত্র উপায় তাকে নতশীরে দেবীর আসনে বসিয়ে তুষ্ট কর। তাকে সন্তুষ্ট না করলে বিপদ নিশ্চিত। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান। মিথকথা ব্রত, নাচ-গান, সংস্কার বিশ্বাস। সাহিত্যের ভান্ডারকেও করেছে সমৃদ্ধ। এই তিস্তাবুড়িকে কেন্দ্র করে কোচ রাজবংশী সমাজের নারীরা পালন করে ব্রত। ব্রত কথা নেই কিন্তু ব্রতকে কেন্দ্র করে আছে নাচ ও গানের অপূর্ব সমারোহ। মেচেনি ব্রত গানের নানা পর্ব- ফাটামারা (জন্মখন্ড), নামানী, চুমানী, বাড়িকা, বসানী, জাগানী, পাথারিয়া, উঠানী, সাজিবদল, হাটঘুরানী, ভুরাভাসা আছে। প্রতিটি পর্বের গান ও নাচে এক বিশেষ ভঙ্গী আছে যা তাদের নিজস্বশৈলী ভাবনার প্রকাশ থাকে।

ফাটামারা পর্বের গানঃ-

তিস্তাবুড়ি আসিলেক মাও মোর
মেচেনি উপধরি
যায় করিবে আবহেলা ভাঙিতে ঘরবাড়ি
দেখিস মাও তুই তিস্তাবুড়ি।
নর না হয় নরে মাতা

মাতা বেড়ায় বাড়ি বাড়ি
বৈশাখ মাসে ঘুরিয়া মাও
বেড়াবে বিল্যাস করি। (৮)

তিস্তাবুড়ি স্বর্গের দেবীরূপে কল্পনা করে রাজবংশী সমাজ। সেক্ষেত্রে বলা যায় তিস্তাবুড়ি দেবী পার্বতীরই এটি রূপ। ব্রতীরা তিস্তাবুড়িকে স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসার আহ্বান করেন—

ভগা খাবার আইসো গে তিস্তাবুড়ি
ঐনা ভক্তের কোলাতে
আজিক্যানে ধুনার বাস উঠেরে
না জানি তিস্তাবুড়ি পূজা খাবার আইচ্চে রে।

মেচেনির দল বাড়িতে প্রবেশ করার আগে গৃহকর্তীকে জানিয়ে দেয় বাড়ি ঢুকা গান পরিবেশন করে –

আসিয়া নখমী মাও
দুয়ারে দিলেক পাও
আগে বাড়ি শুদ্ধ করো বিধু কাপো মাও
শুন মোর সাউদানী ও।

মেচেনি গানের দল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তী উঠোনে জল ঢেলে তিস্তাবুড়ির আসন পেতে দেন। এভাবেই নামানী, বসানী, ভাসানী, পাথারিয়া, সাজিবদল, বৈঠানী, হাটঘুরানী পর্ব গান করে বাড়ি বাড়ি মাগন সংগ্রহ করার পর বৈশাখ মাসের শেষ দিন জলাশয় বা নদীতে কলার ভেলায় মেচিনি বা বিস্তাবুড়ি দেবীকে স্থাপন করে এবং পূজা দেয়। পূজা শেষে কলার ভেলাটিকে নদীর ধারে নিয়ে নাচ গান করার পর ভেলাটি জলে ভাসিয়ে দেয়—

গন্ধ উঠিসে মাও মেচেনির গাওরে
ফল ধূপ ভুরাৎ সাজানুরে
কলতে বান্দিয়া ভাসাই ভুরারে
আজি ক্যানে ধূপের বাস উঠেরে
না জানি মেচেনি মাও মোর জলে ভাসি যাছে।

হুদুম ব্রতঃ কোচ রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যবাহী ব্রত হুদুম। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলি (সমতল), কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলা, আসামের ধুবরী,

কোকরাঝার, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, মেঘালয়ের উত্তর গারোপাহাড়ে অংশ, বাংলাদেশের রংপুর, নেপালের ঝাপা, মোরাং জেলা পর্যন্ত এর বিস্তার। এক বিশাল ভৌগলিক অঞ্চলে পূজারীতি, গান, সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত। অনাবৃষ্টির কারণে বৃষ্টি কামনায় গভীর রাতের অন্ধকারে নির্জন স্থানে নগ্ন হয়ে নারীরা নৃত্য ও গান করে। তাদের একান্ত বিশ্বাস হুদুম দ্যাওকে পূজা ও গানে তুষ্টি করতে পারলেই বৃষ্টি আসবেই। কেননা ব্রতটির মূল উদ্দেশ্যই হল বৃষ্টি কামনা। বৃষ্টি বা জল হলেই জমি চাষ হবে এবং ফসল ফলবে। ব্রতটি সম্পূর্ণরূপে কৃষিমূলক। এ কারণে নারীরা নকল ভূমিকর্ষণ, বিছন তোলা, রোপন করা বিষয়গুলি গান ও নৃত্যের তালে তালে পরিবেশন করে। হুদুম পূজায় পাঁচটি পর্বের গান গাওয়া হয়। যথা – জাগানী, বরণ, বৃষ্টির জন্য কাতর মিনতি, বিরহের গান ও ভাসানী।

হুদুম আসলে বরুনদেবতা। বরুন দেবতাকে কামনায় উত্তেজিত করে তুলতে পারলেই বৃষ্টি আসবে। একারণে হুদুমকে জাগিয়ে মর্তে আনার আহ্বান করা হয়—

জাগরে জাগরে হুদুম আজিকার রাতি
গৃহস্থির করে পূজা দিবা ধূপ চাইলন বাতি।
হুদুমদেও হুদুমদেও আমাক একটু পানী দেও
আমার দেশত পানী নাই জীবন নিয়া টানাটানি।
হুদুম হুদুমে কি কাজ করিলরে
হুদুমের ঘর সাত ভাই কারো খেতত পানী নাই
আছে পানী গাঙ্গেতে ঢালি দিম ভাসি যেতে।
কালা মাঘ, ধাওলা ম্যাঘ দেওয়া করি আয়রে পর্বত ধায়া
আয় আয়রে হাড়িয়া ম্যাথ আয় পর্বত ধায়া
কালা মাঘ ধওলা ম্যাঘে আয় সোদর ভাই
এক সিল্কা ঝরি দেও গাও ধুইয়া যাই। (৯)

হুদুমকে জাগিয়ে বরণ করার পর শুরু হয় কাতর মিনতির গান। নারীরা হুদুমকে প্রেমিক হিসাবে কল্পনা করে ব্যাকুল সুরে মিনতি জানায় বৃষ্টির জন্য। তাই তারা নিজের শরীর উলঙ্গ করে গানের মাধ্যমে হুদুমকে কামে উত্তেজিত করে তোলে। গান—

হিল হিলাছে শরীরটা মোর শিশিরাচে গাও
কুটে গেলে এলা হুদুমের নাগাল পাও

পাটানিখান পড়েছে খসিয়া আয়রে হুদুম দ্যাওয়া
তোরে বাদে মুই আছোং বসিয়া। (১০)

এভাবেই হুদুম দেবতাকে তুষ্ট করে নিজের সমস্ত শরীর উজার করে। এসময় বিছন তোলা, হল কর্ষণ করা, চারাগাছ রোপন করা নানারকম দৃশ্য পরিবেশন করে নারীরা।

জলমাঙ্গা ব্রতঃ- উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী নারীরা অনাবৃষ্টির কারণে জলমাঙ্গা ব্রত পালন করে। মহিলা দলের একটি অবিবাহিত মেয়ের কাছে থাকে জলসুদ্ধ ঘট ও ব্যাঙের বাচ্ছা, যা বালিকাটির মাথায় থাকবে - এজন্য তাকে ঘটধরী বলা হয়। মহিলার দল জলমাঙ্গার সময় ঘটধরী গৃহস্থের উঠানে গানের মাধ্যমে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থী জোকার দিয়ে বেড়িয়ে এসে ঘটধরীর মাথায় ঘটে ও ছাতায় জল দেবে। এর পর ঘট নামিয়ে উঠানে চাষের অভিনয় করে। ইন্দ্র দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নানা মতন অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য ও গান করে। জলমাঙ্গা ব্রত গানের নানা পর্ব আছে - আহ্বান, দুঃখ নিয়া বর্ষাগমন—

আইসা মেঘা বইস কাছে
খাও বাটং পান
তোমার জইন্যে বাটং পান
সাজাইয়া রাখিছি
বরসিয়া খাওরে

শেষ পর্বে তারা কল্পনা করে যে গান করে—

পানি আইলো পানি আইলো
বায়ে বাতাস পানি আইলো
ভিঙজা গেল ভিঙজা গেল
গানড়ির ঢাবলা ভিঙজা গেল
শুকাই গেলো শুকাই গেলো
গানড়ির ঢাবলা ওকাই গেলো। (১১)

জলমাঙ্গা ব্রতের সঙ্গে হুদুম ব্রতের বিশেষ মিল দেখা যায়। উভয় ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হল বৃষ্টি আনয়ণ রসোসক্ত করা। ধনী রসোসক্ত হলেই ফসল ফলতে ঘরে আসবে আনন্দ।

জিতুয়াঃ- জিতুয়া ব্রত কোচ রাজবংশী সমাজের এক বিশেষ ব্রতধারা। উত্তরবঙ্গের তরাই, উত্তর ও দক্ষিণদিনাজপুর, নেপালের ঝাপ, মোরং জেলায় এই ব্রতদেখা যায়। এই ব্রতের সঙ্গে জলের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে। জন্মাষ্টমির পর নতুন চাঁদ ওঠার দিনেই এই ব্রত পালনের সময়। দেবতা হিসাবে থাকে বিষ্ণু-মৎস অবতারের রূপ। এজন্য ঘরের উঠানে গর্ত করে পুকুর তৈরি করে জল দিয়ে দুটো মাগুর মাছ ছেড়ে দেয়। সারারাত ধরে রমনীরা পূজা ও গানের সঙ্গে পুকুরের জল দেখে। যখনি মাছ উঠবে তখনি তার গায়ে সিঁদুর মেখে দেবে। তাদের বিশ্বাস এই পূজা পালন করলে ছেলে মেয়ের ভালো বিয়ে হবে এবং সন্তান উৎপাদন ভালো হবে।

কুলনামানো ব্রতঃ- কৃষি যাদুবিদ্যা মূলক ব্রত। কোচ রাজবংশী মহিলারা অনাবৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রানের জন্য ব্রত পালন করে। তাদের বিশ্বাস কুল নামালে আকাশে মেঘ হবে ও বৃষ্টি পড়বে। মহিলার দল নিরামিশ খেয়ে বাড়ি বাড়ি ব্রতের গান ও নাচ করে। ব্রতীরা গৃহস্থ বাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পিড়ি পেতে দেবে। পিড়ির উপর কুল ও জলপূর্ণ ঘট, ধান, দুর্বা ও শস্যবীজ রাখে। এই কুলটি নিয়েই মহিলারা নাচ ও গান করে। শেষে ঘটের জল বাড়ির চারদিক ও ঘরে ছিটিয়ে দেয়। কুলনামানো ব্রতের একটি গান—

হ্যাদে লো বুন মেঘরানী, হাত পা ধুইয়া ফালাও পানী।
ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি, বড়ো ভুঁইতে হাটু পানী।।
মেঘের বানীর ঘরখানি পাথারের মাঝে
হেই বৃষ্টি নামলো ঝাঁকে ঝাঁকে।।
কাল্যা মেঘ ধল্যা মেঘ বাড়ি আছনি
গোলায় আছে বীজ ধান বুনতে পারিনি। [১২]

তুলসী ব্রত (যৌথ):- তুলসী ব্রত সধবা ও বিধবারা পালন করে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি, ধুবরী জেলায় তুলসী ব্রত বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই ব্রতের ব্রতীরা মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের। ব্রতটি চৈত্রসংক্রান্তির দিন তুলসী মঞ্চে ঝাড় দান বা ঝাড় দানের মাধ্যমে পালিত হয়। সধবা-বিধবা নারীরা সকাল সকাল স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে জল ঢেলে দেন ঝাড়ে। ঘটের ফুটো এমন ভাবে করা হয় যেন জল অনবরত চুঁয়ে চুঁয়ে তুলসী গাছে পড়ে। রাজবংশী সমাজে তুলসীতলা পবিত্রস্থান। তুলসী গাছকে বাস্তুঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতিরূপ বলেও মনে করেন। এহেন তুলসী গাছ যাতে চৈত্রের

দাবদাহে মরে না যায় সে জন্য এই ব্রত পালন করে থাকেন। তুলসী গাছ মরা তাদের বিশ্বাসে অমঙ্গল জনক।

পেন্টি ব্রতঃ- কোচ রাজবংশী সমাজের পুরুষেরা এই ব্রত পালন করে। মূলত বৃষ্টির দেবতাকে আহ্বান করে। সাধারণত দিনের বেলা ব্রত পালনের সময়। একদল পুরুষ লাঙল-জোয়াল কাধে ও হাতে পেন্টি নিয়ে মাঠে যায়। এদের মধ্যে কেউ গরু সাজে, কেউ হাল ধরে, কেউ মাঠে ধানের চারাগাছ রোপন করে, তাদের বিশ্বাস এরূপ ব্রত পালন করলে বৃষ্টি আসবেই।

আধুনিক বিজ্ঞান ও ডিজিটাল যুগের বিজ্ঞান মনস্ক মন হয়ত এর যথার্থতা বা সার্থকতা খুঁজে পাবে না। কিন্তু সংস্কৃতির অন্দর মহল থেকে আমরা কেউই বাইরের নই। কোন না কোনভাবে, আমরা যুক্ত হই। জল ও ব্রতের সম্পর্ক এখনোও গ্রামীণ লোক মননের জীবনের সঙ্গে এক সাথে গাঁথা। অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে হয়ত উত্তর সংস্কৃতির পরিবর্তিত হচ্ছে সময়ের চাহিদাকে মেনে। কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গভীর।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, সনৎকুমার, লোকসংস্কৃতি গবেষণা (জল ও সংস্কৃতি) বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০২, পৃ - ১৭৭।

২. তদেব, পৃ - ৫২।

৩. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত, পুস্তকবিপনি, প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮, পৃ - ২।

৪. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, ১৪৩২, পৃ - ৫।

৫. তথ্যদাতাঃ- শীতেশ্বরী বর্মণ (৬০), জটেশ্বর, আলিপুরদুয়ার, তাং ২০.০৭.২০১১।

৬. তথ্যদাতাঃ- ভারতী রায় (৬০), ফলিমারী, কোচবিহার, তাং - ১১.০৭.২০১১।

৭. তথ্যদাতাঃ- হাপোই রায় (৭৫), জয়পুর, বিলাসীপাড়া, ধুবরী, তাং ১৫.০৭.২০১১।

৮. তথ্যদাতাঃ- নমিতা রায় (৬৫), সেরফাংগুড়ি, কোকরাঝার, আসাম, তাং ২৯.০৭.২০১১।

৯. তথ্যদাতাঃ- হাপোই রায় (৭৫), জয়পুর, বিলাসীপাড়া, ধুবরী, তাং ১৫.০৭.২০১১।

১০. তথ্যদাতাঃ- হাপোই রায় (৭৫), জয়পুর, বিলাসীপাড়া, ধুবরী, তাং ১৫.০৭.২০১১।

১১. মজুমদার, শিশিরকুমার, উত্তর গ্রামচরিত, ২০০৮, পৃ - ৫।

১২. বসাক, ড. শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৮, পৃ - ১২৪।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ : মানবধর্ম ও ঔপনিষদিক সম্পর্কের আলোকে

অজয় কুমার দাস
বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়,
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

।। এক ।।

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"(১)

অপাংক্তেয়, ব্রাত্য-জাতিহীন-মন্ত্রহীন তিনি। অন্তরের মানুষের সন্ধানে পথে পথে ফেরেন। হাতে একতারা, ঠিক বাংলার বাউলের মত। কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশেষ দেবতাকে তিনি পূজা করেন নি। তাঁর সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয়ী তাপস। মহাপুরুষ তিনি, সত্যের পূজারী তিনি। লাভ করেছেন অমৃতের অধিকার। কোন শাস্ত্রীয় পুরোহিত এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়কে মান্যতা দেননি তিনি। সমস্ত রকম আবিলতা ও অশুচিতার উর্দ্ধে তিনি। সমস্ত মন্দিরের বাইরেই তাঁর পূজার মঙ্গলদীপ জ্বলেছে। পূজা হয়েছে শেষ। স্বর্গলোক থেকে মর্ত্য পৃথিবীতে জ্যোর্তিময় পুরুষের ভালবাসার অমৃত ঝরে পড়েছে। মানব বন্দনা দিয়ে ঈশ্বরের পূজা সাঙ্গ করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ প্রাচীন ভারতীয় ঋষির মুখনিঃসৃত বাণীর প্রেরণা প্রসূত। রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার অন্তরঙ্গ নির্যাস উপনিষদ। আর বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন কবির ধর্মবোধকে পুষ্ট করেছে। আর বাউল সাধনার তত্ত্ব কবির মনোরাজ্যে এমনভাবে প্রোথিত ছিল যে, তা রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের সঙ্গে আমৃত্যু ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্মাশ্রিত ভারতবর্ষের উদার প্রশস্ত চৈতি-ফাল্গুনী হাওয়া কবিকে ধ্যানলব্ধ প্রশান্ত ঋষির মতই সুউচ্চ মহানীয়তা দিয়েছিল। উপনিষদের দর্শন, উপনিষদের বিশ্বতত্ত্ব, সামগ্রিক কল্যাণ,

কর্মসাধনা, কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ, ব্রহ্মবাদ, শাশ্বত সত্য, আত্মা অমরত্ব, আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় ঋষিদের এমন সর্বোৎকৃষ্ট জীবন সাধনাকে কবিগুরু অন্তরে অন্তরে লালন করেছিলেন। সভ্যতার উন্মেষলগ্নেই বৈদিক ঋষিরা মানুষের জীবনক্ষেত্রকে পবিত্র আধ্যাত্মিকতার নির্মল প্রবাহে ধৌত করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ হেঁটেছে। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য তপস্যা করেছে। সে তপস্যা আজও সমাপ্ত হয়নি। কবে যে সে তপস্যা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না। মানবের ধর্মবোধ মানব সভ্যতাকে শীলিত করেছে। উপনিষদের পাশাপাশি ধর্মচিন্তক রবীন্দ্রনাথ বাউল সাধনার মনের মানুষকে অনুসন্ধান করেছেন। আর বৈষ্ণব সাধনার প্রেম ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সুরে বেঁধে দিয়েছিল। ধর্মপ্রাণ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদিক ভাবসত্তা উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে অশ্রুত ঝর্ণার মত কুলকুল করে বহমান বেদান্ত দর্শন, বাউল গান ও বৈষ্ণবীয় প্রেম মনস্তত্ত্ব। জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করেন। জ্ঞানী বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে জানেন। তখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। আত্মার জ্ঞান এবং একত্বের জ্ঞান দিয়েই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করেন –

"প্রতিবোধবিদিতং মতমম তত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম।।"[২]

বৈষ্ণব সাধনায় মানবীয় প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন প্রেমের অমৃত রসের সন্ধান। ঈশ্বরকে পেতে হলে চাই ত্যাগ, কঠিন সাধনা –

'চণ্ডীদাস কহে রসের সার।
পিয়ার পিরিতি আনন্দ পাথার।।'[৩]

আর লালনের গান তো কবির কণ্ঠহার। লালনের গানে কবি ধর্মকথা শুনেছেন। লোকধর্মের মধ্যে নিহিত ছিল মানবধর্মের মূলতত্ত্ব। লোকধর্ম সেই সোপান, যেখান থেকে কবি মানবধর্মের উদাত্ত সঙ্গীত শুনেছেন –

"মানুষ থুয়ে খোদা ভজ
এই মন্ত্রণা কে দিয়েছে।
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ
পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।।

....

মানুষের-ই ছবি আঁকো।
পায়ের ধূলি গায়ে মাখো
শরিয়তী সঙ্গে রাখো
তত্ত্ব বিষয় গোপন আছে।।"[৪]

।। দুই ।।

আর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পাতায় পাতায় মানব প্রেমের কথা। মানুষের মাঝে ঈশ্বর খোঁজা তো পরিশীলিত মানবপ্রেমের নবউন্মেষিত ভাবচেতনা। ভগবান বুদ্ধ, খ্রীষ্ট-মহম্মদ এবং জরথুস্ট্রের মানবধর্ম স্বামীজীর জীবন এবং কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের বৈশ্বিক মানব বন্দনার মিল তো স্বাভাবিক। বিবেকানন্দের ধর্মভাবনা তাত্ত্বিক শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা নয়। তাঁর ধর্মচিন্তার শেকড় মানব সমাজের গভীর স্তরে প্রোথিত।

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার ভিত্তি প্রাচীন ঋষিদের বৈদিক মন্ত্র ও উপনিষদ। পরিশীলিত শিক্ষার আবহে নরেন যথার্থই সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। আর রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে শিখিয়েছিলেন –

"ঈশ্বর অমৃতের সাগর।
ঈশ্বরলাভ হ'লে ভাবনা কি?
তখন আদেশও হবে লোকশিক্ষাও হবে।"[৫]

নরেন্দ্রকে গুরুদেব আরো বলেছেন-

"মা-কালী ব্রহ্ম –পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ
যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।[৬]

উপনিষদে দয়া করার কথা আছে, দান করার কথা আছে, ব্রহ্মলাভের কথা আছে। 'কঠ উপনিষদে' বলা হয়েছে –

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[৭]

ওঠ, জাগো, আচার্যের নিকট গমন করো, আত্মার সম্যক জ্ঞানলাভ করো। আত্মজ্ঞান লাভের পথ খুবই দুর্গম। বিবেকানন্দের ধর্মবোধের শক্ত সীমানা নিশ্চয়ই বেদান্ত দর্শন।

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তাকে পুষ্ট করেছিলেন পৃথিবীর মহত্তম আচার্য এবং মহাপুরুষেরা। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ গ্রন্থ থেকে তিনি ধর্মের সূত্র সন্ধান

করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসত্তা এবং ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। বেদান্ত দর্শন নিয়ে তাঁর অজস্র লেখালেখি লেখকের সৃষ্টি কুশলতাকে সপ্রমাণ করে। ধর্মের সারাৎসার তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বেদান্ত দর্শনের মধ্যেই। তাঁর ধর্মবিষয়ক লেখালেখি গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায় –

১) Vedic Religious ideals ২) The Vedanta Philosophy ৩) Reason and Religion ৪) Vedanta as a Factor in civilisation ৫) The spirit and influence of vedanta ৬) Vedanta and privilege ৭) Krishna ৮) Gita – I, Gita – II, Gita – III ৯) Mohammed ১০) Karma –Yoga ১১) Raja-Yoga ১২) Jnana – Yoga(Maya and Illusion, Maya and the Evolution of the conception of God, Maya and Freedom ; The Atman, The Atman :` Its bonding and freedom) ১৩) Practical Vedanta : part -I, part -II, part -III, part -Iv ১৪) A study of the Sankhya philosophy ১৫) Sankhya and Vedanta ১৬) Bhakti –Yoga (spiritual Realisation, The Aim of Bhakti-Yoga, The Need of Guru, The Mantra : OM : Word and Wisdom), ১৭) Para – Bhakti or Supreme Devotion (The Bhakta's Renunciation Results from love, Human Representations of the Divine Ideal of love), ১৮) Vedantism ১৯) The Mission of the Vedanta ২০) Vedanta in its application to Indian life ২১) The Sages of India ২২) The Vedanta in all its phases ২৩) Vedic Teaching in Theory and Practice ২৪) The vedanta ২৫) Vedantism ২৬) Sannyasa : its Ideal and Practice ২৭) Thoughts on the Gita ২৮) The Ramayana ২৯) The Maha-Bharate ৩০) The Great Teachers of The World ৩১) On Lord Buddha ৩২) Christ, The Messenger ৩৩) My Master ৩৪) Buddhism and Vedanta ৩৫) On the Vedanta philosophy ৩৬) The Vedanta philosophy and Christianity ৩৭) Notes on Vedanta ৩৮) Hinduism and Shri Ramakrishna ৩৯) On Sannyasa and Family life ৪০) Shri Ramakrishna : The Significance of his life and Teachings ৪১) On Shri Ramkrishna and his Views ৪২) Shri Ramakrishna : The Nation's ideal ৪৩) Buddhism, The Religion of the light of Asia ৪৪) Buddha's

Message to the World ৪৫) A Preface to the Imitation of christ ৪৬) Hindus and Christians ৪৭) Christianity in India ৪৮) Shiva in Ecstasy ৪৯) To Shri Krishna ৫০) A Hymn to Shri Ramakrishna ৫১) Pranayama ৫২) The claims of Vedanta on the Modern World ৫৩) The Mundaka Upanishad ৫৪) Christ's Message to the World ৫৫) Mohammed's Message to the World ৫৬) The Gita ৫৭) Gita Class ৫৮) Footnotes to the Imitation of Christ ৫৯) An Untitled Poem on Shri Ramakrishna – বোঝা যায়, ধর্মচিন্তক বিবেকানন্দের এসব রচনা তাঁর ধর্মবোধকে কতখানি ঋদ্ধ করেছিল। এগুলির মধ্যে বেদান্তই প্রধান। আমৃত্যু বেদান্ত চর্চা এবং অধ্যয়নে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বৈদান্তিক ঋষি। তাঁর জীবন ও কর্ম পরিবেষ্টিত ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, দর্শন শাস্ত্র, মহাপুরুষদের জীবনী চর্চায়। হিন্দুধর্ম ছাড়াও অন্য ধর্মের মহাপুরুষদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখিয়েছেন। অন্য ধর্মের মূল সত্যগুলি অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্য ধর্মের মানব কল্যাণমুখী দিকগুলিকে অজস্র লেখনীর মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাপী প্রচার এবং প্রসার লাভে সচেষ্ট হয়েছেন। পৃথিবীর মানব সমাজের মঙ্গলসাধনে সার্বজনীন মানবধর্মের উৎস সন্ধান স্বামী বিবেকানন্দের মহতী দান। অন্যান্য সমস্ত ধর্মের সমন্বয় এবং সর্ব ধর্মের মূল সত্যগুলিকে এক কেন্দ্রীভূত মহাসত্যের সন্ধানী দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের মধ্যে জাগতিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস তাঁর জীবন সাধনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানবসভ্যতা এজন্য স্বামীজীর কাছে ঋণী নিশ্চয়ই।

স্বভাবতই সমস্ত নদী- নদীর শাখা-প্রশাখা যেমন সমুদ্রে মেশে, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের মানবধর্মের সারসত্য একই মহাসমুদ্রে লীন হয়েছে। দুই স্রষ্টার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বেদান্ত দর্শন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ থেকে দুই স্রষ্টাই ধর্মের বীজ সন্ধান করেছেন। ভারতীয় সমাজ এবং লোকধর্ম থেকে সন্ধান করেছেন মানবধর্মের মূল সত্য। দুই স্রষ্টাই খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ – এই দুই মহত্তম মহাপুরুষের প্রতি পূজা-প্রণতি নিবেদন করেছেন। সার্বজনীন মানবধর্মের বৈশ্বিক রূপ দু'জনের চিন্তা-চেতনায় একইভাবে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়-

"সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমারি দুখানি নয়নে
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে।।"[৮]

।। তিন ।।

"বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা –
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।"[৯]

মানুষের ধর্ম নিহিত আছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত। দিন আর রাত্রি চিন্তাশীল মানুষ ধর্মের শীলিত পরিসরে নির্মল হয়ে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। ধর্মের প্রসারিত উদার হস্ত জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্রিয়া – কর্মে, দানে- ধ্যানে, কর্তব্যে- বিনয়ে, সেবায়, ত্যাগে, সহানুভূতিতে, মানবতায়, সমানাধিকারে, সাম্যে, মৈত্রীতে এবং স্বাধীনতাতে। ধর্ম আছে জীবনে- মৃত্যুতে-কর্মে। ধর্ম আছে শৈশবে, যৌবনে, বার্ধক্যে। ধর্ম আছে জাতকর্মে, বিবাহে-বৈরাগ্যে। ধর্ম আছে ভোজনে, আচারে-বিচারে। ধর্ম আছে সংস্কারে-বিশ্বাসে-বার-ব্রতে। ধর্ম আছে যাত্রা এবং অযাত্রায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে পূজা-পার্বণে। ধর্ম আছে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেব প্রতিষ্ঠা এবং শিব প্রতিষ্ঠায়। ধর্ম আছে পশু ও প্রাণের রক্ষায়। ধর্ম জীবনের ছন্দ, জীবনের গতি। ধর্ম আছে প্রেমে, মহত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন – "ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন-ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

"যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
যে যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।।"

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি"।[১০] রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন –

"একের আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না। ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী

হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে – ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে – দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থ সিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"[১১]

অপরপক্ষে বিবেকানন্দও বেদ-বেদান্তের প্রসঙ্গে বারবার ফিরে ফিরে এসেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগোর বক্তৃতায় 'Paper on Hinduism' প্রবন্ধে বলেছেন, বেদের কাছে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় অনেক। বেদ শিক্ষা দেয় – আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হয়ে আছে। এই বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙলেই আত্মার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঋষিরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মুক্তির কথা বলেন। এই মুক্তি – সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তি, দুঃখবোধ থেকে মুক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন – " The Vedas teach that the soul is divine, only held in the bondage of matter; perfection will be reached when this bond will burst, and the word they use for it is therefore, Mukti – freedom, freedom from the bonds of imperfection, freedom from death and misery".[১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মচিন্তায় বারবার ফিরে গেছেন উপনিষদের মন্ত্রে। উপনিষদের মন্ত্র অসত্য থেকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যায়। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থের 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে উপনিষদের এমন মন্ত্রের মধ্যে ধর্মের বীজ অনুসন্ধান করেছেন। কি আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত–

"তাহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই-

"অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
অবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে সপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ , তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।"[১৩] 'ধর্ম'

গ্রন্থের ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

বেদান্ত দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ লিখেছেন, বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থিত করেছে। বেদান্তের এই তত্ত্ব পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই রয়েছে। তত্ত্বটি এরকম মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। স্বামীজী তাঁর ‘The spirit and influence of Vedanta’ বক্তৃতায় লিখেছেন – “One principle it lays down – and that, the Vedanta claims, is to be found in every religion in the world – that man is divine, that all this which we see around us is the outcome of that consciousness of the divine.”[১৪]
আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে – সবই ঐশী চেতনা প্রসূত। স্বামীজী আরো লিখেছেন যে, মানুষ ক্ষুদ্র পরিখায় আবদ্ধ। অনেকটা স্প্রিং – এর মত। আমাদের এই চোখে দেখার জগৎ এবং সামাজিক ঘটনা প্রবাহ থেকে মুক্তি লাভের অনুগ ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়েছে বেদান্ত দর্শনে –

“Man is like an infinite spring, coiled up in a small box, and that spring is trying to unfold itself; and all the social phenomena that we see the result of this trying to unfold.”[১৫]
এই ব্রহ্মের উপস্থিতি সর্বত্র। সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ অনুভূত হয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ‘নববর্ষে’, ‘বর্ষশেষ’ –এ, উৎসবের দিনে ‘দুঃখ’ – এর মহতী উপলব্ধিতে এবং ‘আনন্দরূপে ধর্ম’ স্বপ্রকাশ। উপনিষদের ঋষির উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ধর্ম’ – গ্রন্থের ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধে বিশ্বাস মন্ত্র রূপে মান্যতা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – “যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন –

“ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা – কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে – এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে – অন্যের ধনে লোভ করিবে না।”[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ধর্মের মধ্যে মঙ্গল এবং কল্যাণকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মানবধর্ম। বিবেকানন্দের ধর্মও মানবধর্ম। স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতীয়দের

দারিদ্র্য গভীর থেকে গভীরতর। ভারতীয়রা অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জমান। তিনি বুঝেছিলেন লক্ষ লক্ষ ব্রাত্য ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। এমন অপাংক্তেয় অবহেলিত ব্রাত্য ভারতবাসীর জন্য উদার হস্ত প্রসারিত করা দরকার। তাদের জন্য সহায়তা করা দরকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করেছেন স্বামীজী। ১৮৯৭ সালের ১২ই নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত 'The Vedanta' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন – "But above all, let me once more remind you that here is need of practical work, and the first part of that is that you should go to the sinking millions of India, and take them by the hand, remembering the words of the Lord Krishna :

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।"

-Even in this life they have conquered relative existence whose minds are firm – fixed on the sameness of everything, for God is pure and the same to all ; therefore, such are said to be living in God."(১৭) যাঁদের মন সাম্যে স্থিত, তাঁরা বর্তমান মর্ত্যজীবনেই সংসার স্থিত হন। যেহেতু ব্রহ্ম দোষ বিযুক্ত এবং সর্বত্র বিরাজমান,সেই হেতু তাঁরা ব্রহ্মেই অবস্থিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দও বেদান্তের আলোকদীপ্ত জ্যোতিকে প্রতিটি গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান করেছেন। তিনি কামনা করেছেন, গৃহে গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুসারী জীবন সুগঠিত হোক। জীবাত্মায় যে ব্রহ্মত্ব নিহিত আছে, তা জাগরিত হোক। তবেই মানুষ সফল হবেন। ব্যক্তি তখনই সফল হবেন, যখন তিনি মহৎ কাজের জন্য জীবন যাপন করেন এবং মহৎ কাজেই নিজেকে আত্মদান করেন। এমন মহৎকাজ সম্পন্ন হলেই মানব জাতির কল্যাণ হয়।

সুতরাং বিবেকানন্দের ধর্ম মানব ধর্ম। মানুষের কল্যাণই এই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। স্বামীজী তাঁর 'The Mission of the Vedanta' বক্তৃতায় বলেছেন – "Carry the light and the life of the Vedanta to every door, and rouse up the divinity that is hidden within every soul. Then, whatever may be the measure of your success, you will have this satisfaction that you have lived, worked, and died for a great cause. In the success of

this cause, howsoever brought about, is centred the salvation of humanity here and hereafter."[১৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে মানুষের আত্মোপলব্ধি এবং বিশ্বজনীনতার কথা বলেছেন। মানুষের সাধনা অন্তহীন। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' শব্দটিকে স্বভাব অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাধনায় স্বভাবকে পাওয়া যায়। বাংলার বাউল কবিকে শিখিয়েছেন মনের মধ্যে মনের মানুষকে অন্বেষণ করতে। বিশুদ্ধ সত্যের মধ্যেই কবি বিশ্বমানব মনের অনুরণন উপলব্ধি করেন। 'মানুষের ধর্ম'-এর লেখক- কবি শত্রুকে ক্ষমার কথা বলেন। ক্ষমা অনির্ণেয়, পরিমাপহীন। মানুষ প্রতিনিয়তই নিজেকে প্রকাশ করেছেন নানারূপে – জ্ঞানে, প্রেমে, ত্যাগে। 'মানুষের ধর্ম' প্রকৃতপক্ষে মানবদেবতার পূজা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "সেই মানব দেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন –

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুস্য এক পুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।"[১৯] আর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানব সত্য' প্রবন্ধে কবি লিখলেন – "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেছে মনের মানুষ".[২০]

রবীন্দ্রনাথের মতে, ধর্ম কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, তা মানব সমাজ এবং মানুষের নিজস্ব কর্ষণ ক্ষেত্রের ফল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে লিখেছেন –"কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন – রসো বৈ সঃ – তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং – এষ্যেস্য পরম আনন্দঃ ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না।"[২১] আর কবিগুরু 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের অর্থ' প্রবন্ধে লিখেছেন – "কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময় – এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রসবণ। এইজন্য শাস্ত্রে বলে –

সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্।
যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা-কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ।

অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে – আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।"[২২] কবি আরো বলেছেন –"মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাঁহার ধর্ম।"[২৩] 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোকধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড় ত্যাগ করিতে থাকে – তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে।"[২৪] আর কবি 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে লিখেছেন – "মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম। অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে।"[২৫] এগুলি বেদান্ত-রসে ডুবে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের সারকথা। রবীন্দ্রজীবনে উপনিষদের প্রভাব কতখানি তা কবি লিখেছেন তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানবসত্য' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে"।[২৬] শিশুকাল থেকেই উপনিষদের শ্লোক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। কবির উপনয়নে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। সে মন্ত্রের অর্থ তিনি বুঝেছিলেন। তখন কবির বয়স বারো বৎসর।

অপরপক্ষে উপনিষদের মন্ত্রে ধৌত পবিত্র নির্মল স্বামীজীর অন্তরাত্মা ত্যাগ-বৈরাগ্যের বসন আচ্ছাদিত। উপনিষদ তাঁর জীবন মন্ত্র। আমৃত্যু বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শন প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধির কথা বলেছেন বিভিন্নভাবে। 'On the Vedanta philosophy' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। মানবধর্মের সার কথা বেদান্তেই নিহিত আছে – তা তিনি বলেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, বেদান্ত এক বৃহৎ পরিবার, ঠিক সমুদ্রের মত, যার উপর যুদ্ধ জাহাজ এবং ভেলা পাশাপাশি থাকতে পারে। বেদান্তও এক বিশাল মহাসমুদ্র, যেখানে এক যোগী, এক পৌত্তলিক এবং এক নাস্তিকও পাশাপাশি থাকতে পারেন। এছাড়া বেদান্তের মহাসমুদ্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসিক সকলেই এক। সকলেই মহাশক্তিমান ঈশ্বরের সন্ততি-

> *"Vendantism is an expansive ocean on the surface of which a man-of-war could be near a catamaran. So in the Vedantic ocean a real Yogi can be by the side*

of an idolater or even an atheist. What is more, in the Vedantic ocean, the Hindu, Mohammedan, Christian, an Parsee are all one, all children of the Almighty God". [২৭]

ধর্মবোধ বলতে স্বামীজী মনে করেছেন, মানব সমাজের মঙ্গল কামনা। ধর্ম যে কোন অবস্থায় সমানভাবে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে, তা দাসত্বে বা স্বাধীনতায় বা অধঃপাতে বা পবিত্রতায়। তাহলেই বেদান্তের থিয়োরি ধর্মের প্রকৃত আদর্শ হতে পারে। আত্ম-বিশ্বাসের এমন আদর্শই মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ করতে পারে। স্বামীজী তাঁর 'Practical Vedanta-part-1'- বক্তৃতায় বলেছেন- "Religion, to help mankind, must be ready and able to help him in whatever condition he is, in servitude or in freedom, in the depths of degradation or on the heights of purity; everywhere, equally it should be able to come to his aid. The principles of Vedanta, or the ideal of religion, or whatever you may call it, will be fulfilled by its capacity for performing this great function.
The ideal of faith in ourselves is of the greatest help to us". [২৮]

।।চার।।

"বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

....

অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি-
এনে দিক অজেয় আহ্বান"। [২৯]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা দুই মহামানবের পুণ্যতীর্থ-জলে পরিস্নাত। ভগবান বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের জীবনবৃক্ষ থেকে কবি ধর্মবোধের প্রশান্ত জ্যোতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পত্রপুট' কাব্যের 'ষোল' সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন -

-'আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,

যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা-মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'-
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী"। [৩০]
আর 'নবজাতক' কবিতায় কবি লিখেছেন-
"হিংসায়-উষ্মায় দারুণ অধীর-
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির-
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে"। [৩১]

'ধম্মপদং' বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ। স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ নিঃসৃত অমৃত উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মগ্রন্থ রূপে 'ধম্মপদং' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা যে এই গ্রন্থের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত ছিল তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

"জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে 'ধম্মপদং' তাহার একটি। [....] এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না"। [৩২]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে ভাবপুঞ্জ অনুসন্ধান করেছেন। আমাদের গার্হস্থ্য, সংসার, সন্ন্যাস, নিয়ম-সংযম, সমাজ এবং কর্মের ইতিহাস সবই এই ভাবপুঞ্জকে ভর করে দাঁড়িয়ে। স্বাভাবিকভাবে মানবজাতি ঐ গ্রন্থের কাছে ঋণী। অনুরূপ 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতায় হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে ভগবান বুদ্ধের মঙ্গল শঙ্খের সুডাক আহ্বান করেছেন-

"দেশ দেশ পরিল তিলক-রক্ত কলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ"। [৩৩]

অনুরূপ স্বামীজীর জীবন ও কর্মে ভগবান বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া। স্বামীজীর কাছে ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিবেকানন্দের ধর্ম চিন্তায় ভগবান বুদ্ধ বারবার এসেছেন। ভগবান বুদ্ধ নিজের চেষ্টার দ্বারা মুক্তির কথা বলেছেন। অন্য কেউই মুক্ত হতে সাহায্য করবে না। নিজের মুক্তি নিজেকেই কামনা করতে হয়। 'On Lord Buddha' নামের বক্তৃতায় স্বামীজী লিখেছেন- "None can help you; help yourself; work out your own salvation". He said about himself, "Buddha is the name of infinite knowledge, infinite as the sky; I, Gautama, have reached that state; you will all reach that too if you struggle for it". [৩৪]

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে স্বামীজী সাম্যকে খুঁজে পেয়েছেন। সব মানুষই এক। অসাম্যই যন্ত্রণার মূলে। ঈশ্বর বলে কিছু নেই। মানুষই সব। মানুষই ঈশ্বর।

বুদ্ধ সত্যকে প্রচার করেছিলেন। ধর্মের অতিশয়োক্তির মূলে কুঠারাঘাত করলেন তিনি। প্রচার করলেন মানব মানব মিলনের বাণী। সব মানুষ সমান। কারো নেই কোন বিশেষ অধিকার। সাম্যের মহত্তম আচার্য তিনি। তিনি বেদের সারাংশ প্রচার করেছিলেন। নরনারীর আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও আছে সমান অধিকার। বর্ণভেদ দূর করলেন তিনি। স্বামীজী তাঁর 'Buddha's Message' বক্তৃতায় বলেছেন-

> *"Buddha cut through all these excrescences. He preached the most tremendous truths. He taught the very gist of the philosophy of the Vedas to one and all without distinction, he taught it to the world at large, because one of his great messages was the equality of man. Men are all equal. No concession there to any body! Buddha was the great preacher of equality. Every man and woman has the same right to attain spirit-uality- that was his teaching. The difference between the priests and the other castes he abolished. [.....] We are all one. It is the delusion of separateness that is the root of misery. Nothing exists but the self; there is nothing else. Buddha's idea is that there is no God, only man himself. He*

repudiated the mentality which underlies the prevalent ideas of God. He found it made men weak and superstitious". [৩৫]

আর রবীন্দ্রনাথের কাছে খ্রীষ্টের মহত্ত্বকথা অবর্ণনীয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ইউরোপের আধ্যাত্মিক, ঐহিক এবং বস্তুগত প্রাণশক্তির ঈশ্বর যীশু। কবি তাঁর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন- "খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা"। [৩৬] শুধু তাই নয় কবিগুরুতো খ্রীষ্ট বিষয়ক একটি পুরো বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'খৃষ্ট'। 'খৃষ্ট'- গ্রন্থের 'যিশুচরিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন"। [৩৭] রবীন্দ্রনাথের মতে, খ্রীষ্টধর্ম কেবল খ্রীষ্টানের সম্পদ নয়, তা মানবের ধর্ম। 'খৃষ্টধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "আমরা খৃষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করার চেষ্টা করব- খৃষ্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে"। [৩৮] আর 'খৃষ্টোৎসব' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন- "এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাকে স্পর্শ করেছে"। [৩৯] আর 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃষ্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে"। [৪০] আর 'বড়োদিন' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন- "আজো তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে"। [৪১] রবীন্দ্রনাথ যীশুর মধ্যে মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখেছেন। মানব ইতিহাসে যীশু কল্যাণের দূত। মঙ্গলের তো বিচার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খৃষ্ট'প্রবন্ধে লিখেছেন- "মহাপুরুষেরা এই রকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান; তারা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তারা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে"। [৪২]

আর স্বামী বিবেকানন্দের কাছে যীশু পরম পূজ্যপাদ দেবতা। যীশু বলেছেন স্বর্গলোক খোঁজার দরকার নেই। স্বর্গ মানুষের আপন হৃদয়েই আছে। ব্যক্তির হৃদয়ের মলিনতা দূর করলেই স্বর্গলোক দেখা যাবে। যীশু মানব সমাজকে আর একটি শিক্ষা

দিয়েছেন, তা হল ত্যাগ। সমস্ত ধর্মের ভিত্তিই হল ত্যাগ। নানা অন্যায়ে পরিপূর্ণ এই মানব সমাজ। সমাজের এমন ধূলি মলিন আবর্জনাকে পরিষ্কার করা দরকার। স্বামীজী তাঁর 'Christ, The Messenger' বক্তৃতায় বলেছেন- "Various works which were not correct, which were not true, have covered the same spirit with the dust and dirt of the ignorance of ages. It is only necessary to clear away the dust and dirt, and then the spirit shines immediately. "Blessed are the pure in heart, for they shall see God". "The kingdom of Heaven is within you". Where goest thou to seek for the kingdom of God, asks Jesus of Nazareth, when it is there, within you? Cleanse the spirit, and it is there. It is already yours". [৪৩] স্বামীজী আরও লিখেছেন যে, যীশু মানব সমাজকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল ত্যাগ। ত্যাগ সকল ধর্মের ভিত্তিস্তম্ভ- "This is the great lesson of the Messenger, and another which is the basis of all religions, is renunciation". [৪৪] স্বামীজী ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, সমস্ত ধর্মের উপলব্ধির শেষ সীমানা হল, একটি আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি। তিনি আরও লিখেছেন, এই পৃথিবী পাপে পূর্ণ নয়, বরং ঈশ্বর ভাবনায় সম্পূর্ণ। আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি এবং সাহায্য করি। স্বামীজী তাঁর 'Christianity in India' বক্তৃতায় বলেছেন- "The furthest that all religions can see is the existence of a spiritual entity. [....] The whole world is full of God and not of sin. Let us help each other". [(৪৫)]

আর স্বামীজী মহম্মদকে বারবার তাঁর সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছেন। ঈশ্বর এক- একথা স্বামীজী মহম্মদের কাছ থেকে শুনেছেন। মহম্মদ ছিলেন যথার্থ সত্যের বাণীবাহক। তাঁর প্রথম মুখ নিঃসৃত বাণী হল সাম্য। আর তাঁর ধর্ম হল- প্রেম, একমাত্র। এই তো মানবধর্ম। স্বামীজী তাঁর 'Mohammed'- প্রবন্ধে লিখেছেন- "He is the messenger of truth. [...] Our God is one God. [Mohammedanism] came as a message for the masses. [...] The first message was equality". [৪৬] নিজে হিন্দু হয়েও সার্বজনীন মানবধর্মের উৎস সন্ধান করেছেন স্বামীজী। যিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভার প্রথম অধিবেশনে বলেছেন- সমস্ত ধর্মমতকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি- "We accept all religions as true".[৪৭]

।।পাঁচ।।

পরমত সহিষ্ণুতা, মানবকল্যাণ, আধ্যাত্মিকতা, সত্য অন্বেষণ, সাম্য, মানবতা- এগুলির স্রষ্টা সিদ্ধকাম ঋষি বা মহাপুরুষেরা। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ সাধনার উত্তরাধিকার রূপেই মানবধর্ম লাভ করেছিলেন। নানা স্থান থেকে বাহিত হয়ে নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, ঠিক তেমনি উভয়েই দুই পৃথক জগতের বাসিন্দা হয়েও একই মহাসত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। ধর্মক্ষেত্রের সমুদ্রসঙ্গমে দুই মহাস্রষ্টা মানবধর্ম এবং মানবপ্রেমের বাণী একইভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে অমল দইওয়ালার কাছ থেকে দই বেচা শিখতে চেয়েছিল। শিখতে চেয়েছিল দই বেচার চিরন্তনী সুর- 'দই, দই, দই' – 'ভাল দই'। সে সুর শেখানো যায় না, তা জ্যোৎস্না রাতে ঝরে পড়া হিমবর্ষী শিশিরের মত, অরণ্য আবৃত পাহাড় থেকে কুলু কুলু বয়ে যাওয়া ঝর্ণার মত, বুনো পাখির ডাকের মত উদাস মন কেমন করা – ঈশ্বরের প্রাসাদের মত। অমলের দই কিনে খাওয়ার পয়সা নেই। তবুও এক ভাঁড় দই পয়সা ছাড়াই অমলকে খাইয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছিল দইওয়ালা। দইওয়ালা অমলকে বলেছিল- "কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোন লোকশান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম" ।[(৪৮)]– এই তো মানব ধর্ম। রবীন্দ্র সৃষ্টির আনাচে কানাচে আঁকিবুকি করে। সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে মুক্তো উদ্ধারের মত তাকে খুঁজে নিতে হয়। আর স্বামীজী, বেদ মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি। সন্ন্যাসী তিনি। মানব মহিমার সমুন্নত বাণীরূপ তার কণ্ঠেই ভাষা পায়। সরস্বতীর বরপুত্র তিনি। উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করেন সহজে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে- আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির মত। মানবধর্মের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। এমন মঙ্গল দীপালোক তিনি পৌঁছে দেন প্রত্যন্ত মানুষের পাতার কুটীরে কুটীরে। উপনিষদের ঋষি-কবি বলেছেন, আমরা কান দিয়ে যেন কল্যাণ বাক্যই শুনি। আমরা চোখ দিয়ে যেন মঙ্গলকর বিষয়কেই দেখি। উপনিষদের শান্তিমন্ত্র ধ্বনিত হয় যুগ থেকে যুগান্তরে-

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"[৪৯]

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রপুট, পনেরো সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৩১

২. অতুলচন্দ্র সেন (সম্পা.), কেন উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩
৩. বিমানবিহারী মজুমদার, চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ.১১১
৪. এস এম লুৎফর রহমান, লালনশাহ জীবন ও গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪০২, পৃ.১৭৬,১৭৭
৫. শ্রী'ম (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০৯
৬. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৭
৭. অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য, কঠ উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড) সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.১১৩
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেম (৭০), গীতবিতান (অখণ্ড), সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ২৭৮
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্মমোহ, পরিশেষ, রবীন্দ্ররচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ.২০৬
১০. পূর্বোক্ত, মনুষ্যত্ব, ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৪৫৯
১১. পূর্বোক্ত, ধর্মের সরল আদর্শ, পৃ.৪৬৭
১২. Swami Vivekanande, Paper of Hinduism, At the parliament of religions, read Swami Vivekananda, on 19th Sep. 1993, The complete works of volume-1, Advaita Ashrama, 2009, P.12
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রার্থনা, ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৭৩
১৪. Swami Vivekananda, The spirit and influence of Vedanta (Delivered at the Twentieth Century club, Boston), The complete works of Swami Vivekananda, Volume-1, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, P. 388
১৫. ibid, P. 389
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্মপ্রচার, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৭৮

১৭. Swami Vivekananda, The Vedanta(Delivered at Lahore on 12th November, 1897), The complete works of Swami Vivekananda, volume-3, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, P. 433

১৮. ibid, The Mission of The Vedanta, Volume-3, P. 199

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৪৬

২০. পূর্বোক্ত, মানব সত্য, মানুষের ধর্ম, পৃ. ৬৫৯

২১. পূর্বোক্ত, ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৩২

২২. পূর্বোক্ত, ধর্মের অর্থ, সঞ্চয়, পৃ. ৫৩৮

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২

২৪. পূর্বোক্ত, ধর্মশিক্ষা, পৃ. ৫৪৪

২৫. পূর্বোক্ত, ধর্মের অধিকার, পৃ. ৫৫৮, ৫৫৯

২৬. পূর্বোক্ত, মানব সত্য, মানুষের ধর্ম, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৫৪

২৭. Swami Vivekananda, On the Vedanta philosophy, The complete works of Swami Vivekananda, volume-5, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, P. 286

২৮. ibid, Volume-II, practical vedanta-1 (Delivered in London, 10th November 1896), PP. 300, 301

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেবের প্রতি, পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২০৫

৩০. পূর্বোক্ত, পত্রপুট, 'ষোল' সংখ্যক কবিতা, দশম খণ্ড, পৃ. ১৩২

৩১. পূর্বোক্ত, বুদ্ধভক্তি, নবজাতক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১১০

৩২. পূর্বোক্ত, ধম্মপদং, ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫৪, ৭৫৮

৩৩. পূর্বোক্ত, বুদ্ধজন্মোৎসব, পরিশেষ, অষ্টম খণ্ড, পৃ.২১৫

৩৪. Swami Vivekananda, On Lord Buddha, The complete works Swami Vivekananda, volume-4, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, P. 136

৩৫. ibid, Buddha's Message (Delivered in San Francisco, on March 18, 1900), Volume-8, PP. 97, 98, 101

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৩৩
৩৭. পূর্বোক্ত, যীশুচরিত, খৃষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৩৯
৩৮. পূর্বোক্ত, খৃষ্টধর্ম, খৃষ্ট, পৃ. ৩৪১
৩৯. পূর্বোক্ত, খৃষ্টোৎসব, খৃষ্ট, পৃ. ৩৪৪
৪০. পূর্বোক্ত, মানবসম্বন্ধের দেবতা, খৃষ্ট, পৃ. ৩৪৭
৪১. পূর্বোক্ত, বড়োদিন, খৃষ্ট, পৃ. ৩৪৮
৪২. পূর্বোক্ত, খৃষ্ট, খৃষ্ট, পৃ. ৩৫০
৪৩. Swami Vivekananda, Christ, The Messenger (Delivered at Los Angeles, California, 1900), The Complete works of Swami Vivekananda, Volume-4, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, P. 149
৪৪. ibid
৪৫. ibid, Christianity in India (A lecture delivered at Detroit on March 11, 1894 and reported in the Detroit Free press), volume-8, PP. 218, 219
৪৬. ibid, Mohammed (Delivered on March 25, 1900, in the San Francisco Bay Area), Volume-1, PP. 482, 483
৪৭. ibid, Address at the parliament of Religions, Response to welcome, At the World's parliament of Religions, Chicago, 11th September, 1893, Volume-1, P.3
৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাকঘর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৫৯
৪৯. অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.) শান্তি পাঠ, মুণ্ডক উপনিষদ, উপনিষদ(অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২০৭

আদিম : নতুন সম্পর্কের আখ্যান

রচনা রায়
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অন্তপুরের কথাকার সাহিত্যিক আফসার আমেদ। প্রায় ৩০০টি ছোটগল্প এবং একাধিক কিসসা সহ অজস্র উপন্যাসের জনক আফসার আমেদের বিশেষত্ব তাঁর লেখনীর স্বতন্ত্রতা ও বিষয়বস্তুর অনন্যতা। প্রতিটি গল্প উপন্যাসে তিনি যে চমক স্থাপন করেন তাতে পাঠক বাকরুদ্ধ হয়ে যায় এবং পুনরায় তার গল্প পাঠে আগ্রহী হয়। আমাদের বর্তমান আলোচ্য গল্প 'আদিম'; নামকরণের ব্যঞ্জনায় গল্পের বিষয়বস্তু বা মর্মার্থের আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু সমগ্র গল্পটি পাঠ না করলে পাঠকের যথার্থ কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের অন্তর্গত আদিম প্রবৃত্তি সর্বদা খেলা করেতে থাকে, তার দমন-অবদমনের সাহিত্যিক রূপ 'আদিম' গল্পটি। প্রচার সর্বস্ব দুনিয়ায় আশ্চর্যরকম নীরব ব্যক্তিত্ব ছিলেন আফসার আমেদ। 'সেই নিখোঁজ মানুষটা-র জন্য ২০১৭ সালে তিনি পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার। পুরস্কার তাঁকে দাম্ভিক করেনি বরং আরো বেশি করে তিনি মুসলিম সমাজের অভাব-অভিযোগ, সংস্কার-কুসংস্কার, সুখ-দুঃখময় দিন যাপনের দিনলিপি রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। ফলে তাঁর রচনা বাস্তবতা ও অলৌকিকতার হাত ধরে চললেও বাস্তবতায় গল্পগুলি বড় বেশি জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। 'আদিম' গল্প প্রথম প্রকাশ পায় শারদীয় পরিচয় ১৯৮১ সালে। পরবর্তীতে সেটি সংকলিত হয় আফসার আমেদের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এ যেটি দে'জ পাবলিশিং এর উদ্যোগে প্রথম প্রকাশ পায় কলকাতা পুস্তকমেলায়, জানুয়ারির ১৯৯৯-তে। এক অন্যরকম সম্পর্কের বুনন গল্পটির বিশেষত্ব। আমাদের প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে এমন অনেক সম্পর্ক আছে যাকে পরিচিত কোন নাম দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা চলে না। কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ে অন্য রকম এক বোধের জন্ম দেয়। যার ফলে হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এক অকথিত, অব্যক্ত, অনুচ্চারণীয় অনুভূতি। 'আদিম' গল্পটি তেমনই একখানি গল্প।*

সূচক শব্দ : *অন্ধকার, জরুল, অতল ঘুম, আদিম*

মূল আলোচনা :

> *"আফসারের লেখার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ বা মাইক্রো অবজার্ভেশন। এই সূক্ষ্মতাই একটা রস সৃষ্টি করে। আফসারের লেখার একটা গুণ হল আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। আরও ভালো করে বলতে গেলে নিজেকে গোপন রাখা বা আন্ডারস্টক থাকা। কিছুতেই লেখক প্রকাশ হন না — যেটা বিরল গুণ। আর, আফসার খুব ছোট ব্যাপার যা প্রতীকায়িত হতে পারে সেটা আন্ডারলাইন করতে জানেন, আর বড় ব্যাপার সেটা কম কথায় ছেড়ে দিতে পারেন।"*[১]

— গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী এমন ভাবেই তাঁর সতীর্থ আর একজন গল্পকার আফসার আমেদের গল্পের বিচার করেছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা আফসার আমেদের একটি ছোটগল্প নিয়ে আলাপ আলোচনা করব, যেখানে গল্পকার সম্পর্কের এক জটিল গ্রন্থির সন্ধান করেছেন। 'বড় ব্যাপার সেটা কম কথায় ছেড়ে দিতে পারেন'— আফসার আমেদ সম্পর্কে এমন মন্তব্যের যথার্থ পরিচয় সম্ভবত আমাদের আলোচ্য গল্পখানি।

একালের একজন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮)। মুসলমান সমাজ তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। আধুনিকতার স্পর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি মূলত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। বাস্তববাদী লেখক কঠোর বাস্তবকে তুলে এনেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। চরিত্রগুলি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ভালোবাসা, প্রেম-কামনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-হিংসা, ক্রোধ-রিরংসা সমস্ত কিছু নিয়ে গল্পে উপস্থিত। বাংলা ছোটগল্প রচনায় আমেদ সাহেবের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ছোটগল্প রচনায় প্রচলিত ছককে অনেকাংশে ভেঙে চরিত্রের অন্তর রূপকে যেমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন, ঠিক তেমনি চরিত্রগুলি তাদের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ে ছোটগল্পে উপস্থিত। এই কারণে আমেদ সাহেবের গল্পগুলি পাঠকসমাজে একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এক কথায় আফসার আমেদ প্রচলিত প্রথায় গল্প রচনা করতে চাননি। তাঁর নিজের কথায় —

> *"আখ্যান রচনার প্রসিদ্ধও ভাঙতে চেয়েছি। চলতি লেখার ধরন নয়, একেবারে জন মানসের ভেতর থেকে রচিত হবার লক্ষন থাকবে যে লেখায়, সে লেখা লিখতে চেয়েছি। আমাদের প্রবহমান জীবনের*

ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত যে কাহিনি কথন আছে, তার ভিতর নিমজ্জিত হতে চেয়েছি। আর স্থানিকতাকে পরিহার করতে চেয়েছি। আঞ্চলিকতার যুগ আর নেই, মানবিকতার সন্ধান চেয়েছি।"

— বোঝা যাচ্ছে আমেদ সাহেব বাংলা পাঠককে এক ভিন্ন স্বাদের গল্প উপহার দিতে চেয়েছেন।

গদ্য শিল্পী আফসার আহমেদের শিল্প সার্থকতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো তার গদ্যের ভাষা ও রচনারীতি। গল্পকে গল্পের টানে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। সে নিজের মতো নিজস্ব পথে এগিয়ে গেছে। ঘটনার বর্ণনার মধ্যে উঠে এসেছে চরিত্রের অন্তরস্বর, কখনোবা চরিত্রের মানসিক অস্থিরতা; সব মিলিয়ে তাঁর ভাষা বর্ণনায় এমন এক অভিনবত্ব রয়েছে, যা তাঁর *লেখাকে নিজস্ব একটি শৈলী রূপ দান করেছে। বিষয়টিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্যিক হিল্লোল ভট্টাচার্য — "ঘটনার আপাত বর্ণনার মধ্য দিয়ে যে প্রতীকী বাস্তবতার ক্যানভাস তিনি রচনা করতেন, তা যেন গল্পগুলির মধ্যে অন্য এক বৃত্তান্তও হাজির করত। কিন্তু তা লেখা থাকত না, পাঠককে চলে যেতে হত তার পাঠক্রিয়ার মধ্যে। ফুটে উঠত ভিতরের বাস্তবতা। কাহিনি চলছে এক ধরনের, পাশাপাশি উঠে আসছে আরেক ধরনের কাহিনি"*[২]। একটি গল্পের মধ্যে এই 'আর এক ধরনের কাহিনি' রচনা আফসার আমেদের ছোটগল্পের বিশেষত্ব। আমাদের আলোচ্য 'আদিম' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

আফসার আমেদ দরদী কথাশিল্পী। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তিনি। অথচ তাঁর গল্পগুলিতে দারিদ্র নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। দরিদ্র, নিরক্ষর, হতভাগা মানুষের গল্প বলার সময় দারিদ্রকে যেন অনেকটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন লেখক। দরিদ্রকে মেনে নিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন সাজায়, স্বপ্ন দেখে, জীবনের সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক ওঠা পড়ায় চরিত্রগুলি জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ফরিদা, জিন্নাত বেগম, কায়েম আলি, শাকুরা ছোটগল্পের চরিত্র অপেক্ষা রক্তমাংসের সজীব আবেদনে পাঠকের দিন রাত্রি যাপনের পরিচিত জন হয়ে যায়। তবে এক নিমেষে গোগ্রাসে পাঠ করার মত সহজবোধ্য রচনা নয় আমেদের; বরং বেশ ধীরেসুস্থে প্রতিটি শব্দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাঠ করতে হয় তাঁর গল্পমালা। একটি বাক্যকে উপেক্ষা করার উপায় থাকে না। ফলে মস্তিষ্ক সচল হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে পাঠক এক কাহিনি পাঠ করতে করতে অন্য আরেকটি কাহিনির সমান্তরাল ছায়া দেখতে পান। কাহিনি চলতে থাকে দ্রুত লয়ে, কখনো ধীর লয়ে; কখনও থমকে থমকে, চমকে

চমকে। আমেদ সাহেব এমনভাবে তার গল্প জাল বিছিয়ে রাখেন যে, পাঠক একবার পড়তে শুরু করলে আর থামতে পারবেন না। সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আফসার আমেদের গল্পের পাঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলেছেন —

> *"আফসারের লেখা আমি পেলেই পড়ি না। পড়া সম্ভব নয়, বা পড়ার কোনো মানেই হয় না। ট্রেনে যেতে যেতে পড়া যায় না, সময় কাটানোর জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়। হাতে অল্প সময় আছে একটা গল্প টুক করে পড়ে নেওয়া যাক — এ রকম অভীপ্সায় পড়া সম্ভব নয়। গোগ্রাসে পড়া যায় না, দু' একটা লাইন বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে হপিং হয় না। সুতরাং আফসারের লেখা পেলেই পড়া হয় না। যখন মনে হয়, লেখাটির প্রতি সুবিচার করতে পারব, তখনই পড়া হয়।"*[৩]

— এই পাঠ অভিজ্ঞতা কমবেশি প্রায় সমস্ত পাঠকেরই।

আমেদ সাহেব তাঁর গল্পের জাল বুনেছেন সমাজের একেবারে নিম্নবর্গের জনজীবন নিয়ে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে অশিক্ষিত, অমার্জিত, গ্রাম্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন। বাস্তব জীবনের গল্প বলতে বলতে আমেদ সাহেব তাঁর পাঠককে নিয়ে গেছেন এমন এক অপরিচিত জনজীবনে, যেখানে আধুনিকতার লেশমাত্র নেই। তাঁর গল্পের হাত ধরে পাঠক পৌঁছে যায় মুসলমান সমাজ ও মুসলমান পরিবারের অন্দরমহলে। গ্রাম-শহরের প্রান্তিক মানুষজন ভিড় করে তাঁর গল্পে। বিচিত্র সব মানুষ ও মানবিক সম্পর্ক মূর্ত হয়ে ওঠে ছোটগল্পের পাতায় পাতায়। মানব মনের গলি ঘুপচিতে উঁকি মেরে লেখক তুলে এনেছেন কঠিন বাস্তবকে। তাঁর শক্তিশালী কলমে উঠে এসেছে ঘামঝরানো, দরিদ্র ক্লিষ্ট, রক্তমাংসের জীবন। 'আদিম' গল্পটিও তদৃশ একখানি গল্প। এক কথায় ছোটগল্পের দুনিয়ায় 'আদিম' একটি বিরল কাহিনির ছোটগল্প। গল্পটি পাঠকালে পাঠকের মনে পড়বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুধু নামকরণের জন্য নয়, কাহিনির বিষয়বস্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সমগোত্রীয়।

এ গল্প এমন এক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কাহিনি, যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। যেখানে বাল্যবিবাহ গর্বের সঙ্গে সমাজে স্বীকৃত। তাই অনায়াসে তিন বিবাহিত সন্তানের জনক ইজ্জত আলি স্ত্রীর মৃত্যুর মাস তিনেকের মধ্যে বিবাহ করে 'আজানগাছির খবির মল্লিকের সেজ বেটিকে', বয়সে সে এতই ছোট যে 'এখনো ভালো

করে শাড়ি পরতে পারে কি পারে না'। আরো আশ্চর্যের বিষয়, বাবা বিয়ে করেছে ছেলের বউয়ের বান্ধবীকে অর্থাৎ 'বাপ-বেটার একই গাঁয়ে বিয়ে'।

গল্পটি আগাগোড়া বর্ণনাধর্মী। এমন ভাষাশৈলী চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের সহায়ক যা চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে পাঠকের সামনে মেলে ধরতে সাহায্য করেছে। লেখক পরিস্থিতি, চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন কেবল। অর্থাৎ ভাষা এখানে হয়ে উঠেছে বিবরণের বাহন মাত্র। লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত বা আবেগ এতোটুকু প্রাধান্য পায় নি গল্পের কোথাও। কেবল চরিত্রগুলি তাদের আবেগ, অস্থিরতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্পে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। এই গল্পের চরিত্র সংখ্যা মাত্র চারটি। ইজ্জত আলি ও তার বউ সাবেরা এবং কায়েম আলি ও তার বউ হাফেজা বিবি। সাবেরা এবং হাফেজা ছোটবেলার বন্ধু। বৌমা-শাশুড়ির গভীর সখীত্ব বেশ অভিনব। লেখকের ভাষায় —

> *"দুজনের অনেক হাসাহাসির কথা হয়। কখনো হাফেজা কিল মারে ত নতুন বউ আঁচলের ফাঁকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খামচে দেয় যেখানে-সেখানে। আসলে দুটিতে আগে এরকমই ছিল। আজ রঙিনতায় উদ্ভটভাবে মুখোমুখির ফলে পিরিত আরো জমে উঠেছে।"*[৪]

— এই গল্পে বৌমার তুলনায় শাশুড়ি বেশি লজ্জাবতী। বিশেষত সৎ ছেলে কায়েম আলির কাছে সে আড়ষ্ট ও জড়বৎ। কায়েম আলির অবস্থাও তথৈবচ। মাতৃস্নেহের পরশের তুলনায় নতুন মায়ের প্রতি তার অনুভূতি অন্য রকম। ঠিক প্রকাশযোগ্য নয়। একই বাড়িতে তারা থাকে, যদিও তাদের হাঁড়ি আলাদা। তাই পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ তাদের মধ্যেই নেই। এক অদ্ভুত সম্পর্কে তারা একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ। কোন জটিল ঘটনাপ্রবাহে কাহিনি আবদ্ধ নয় বটে কিন্তু একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহে আবদ্ধ নতুন মা আর কায়েম আলি। একে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখাই তাদের প্রবল প্রচেষ্টা।

ছেলে, ছেলে বৌ আর নতুন বউ নিয়ে ইজ্জত আলির সংসার চলতে থাকে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে। বৌমার সঙ্গে স্ত্রীর সখ্যতায় বেশ খুশি ইজ্জত আলি। বৌমা আর স্ত্রীর হাসি ঠাট্টা মসকরায় তরতাজা থাকে পৌঢ় ইজ্জত আলি। কিন্তু সমস্যা হতে থাকে ছেলে কায়েম আলির। নতুন মাকে নিয়ে তার স্ত্রী হাফেজা আনন্দে থাকে দিন রাত। কি এক অস্বস্তিকর অথচ ভালোলাগার অনুভুতি ঘিরে ধরে কায়েমকে। আড়ালে-

আবডালে চোখা চোখি হয় দুজনের। একে অপরের প্রতি প্রবল কৌতূহলে মন আবিষ্ট থাকে। জোয়ান ছেলের কথা মনে পড়লে সাবেরার এক আলাদা অনুভূতি হয়। —

> *"সেয়ানা ছেলে যদি সামনে আসে তাহলে মরে যাবে। মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ধুলোয় কণা-কণা হয়ে মিশে যেতে চাইবে। এ এক বড় সমস্যা। লুকিয়ে-চুরিয়ে যদি সাজে যদি মনে পড়ে যায় জোয়ান ছেলের মুখ, বুঝি টিপটা গোল হবে না, কাজল টানতে লজ্জায় কেঁদে ফেলবে"।* [৫]

— না। গল্পটি বাঁধা পথে চলা অবৈধ প্রেমের কাহিনি নয়। যুবতী নতুন মায়ের সঙ্গে জোয়ান ছেলে কায়েম আলির দূরত্ব অনেক, কিন্তু একটা অদৃশ্য আকর্ষণ আছে পরস্পরের প্রতি। বিশেষত সাবেরার ঠোঁটের বাঁ দিকে অবস্থিত স্পর্শযোগ্য কালো কুচকুচে জরুলের প্রতি কায়েমের কৌতূহল প্রবল। স্ত্রী হাফেজার থুতনিতে একটি তিল আছে, অন্ধকারে হাতের অনুভূতিতে তার স্পর্শ পাওয়া যায় না অবশ্য। অথচ কায়েম আলি আলোহীন নিকষ অন্ধকারে স্ত্রীর থুতনির তিলটির স্পর্শানুভূতি পেতে চায়। হাফেজা তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বলে — "হাতে লাগবে নি। ই ত জরুল নয়"। তবু প্রতি রাতে একান্ত গোপনে স্ত্রীর থুতনির 'তিলটার অবয়ব স্পর্শ করার নেশায় পায় যেন' কায়েমকে।

সমগ্র গল্পটিকে লেখক বিবরণের পাশাপাশি সংলাপ ধর্মী করে রচনা করেছেন। অনেকটা নাটকের গতিতে গল্পটি চালিত। চারজন মানুষ বিশেষত শাশুড়ি পুত্রবধূ তথা দুই সই হাফিজা ও সাবেরার পারস্পরিক সংলাপ ও আচরণ কাহিনিতে গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। গল্পের অধিকাংশ শরীর জুড়ে দুই সই এর কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র গল্পটিতে কোন বিশেষ চমক নেই। আসলে গল্পকার গল্পের প্রকৃত চমক লুকিয়ে রেখেছেন একেবারে শেষ অংশে। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' এর দ্যোতনায় কাহিনি সমাপ্ত হয়। কাহিনি এগিয়ে চলে বাপ-বেটার গার্হস্থ্য জীবন যাত্রার বর্ণনা করতে করতে। দরিদ্র পরিবার তাদের, শোনা যায় তাদের ঘরে কেরোসিন নেই। এমনকি বাজারেও কেরোসিন নেই। ফলে 'ঘরে দম বন্ধ হওয়া অন্ধকার', কায়েমের অস্বস্তি হয়। রাতের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তে আলোতে কায়েম তার স্ত্রীকে দেখতে চায় — বিশেষত থুতনির সেই তিলটি। অতএব বাপ বেটায় দু'জনেই কাজের শেষে দুপুরবেলায় বাক্সির হাটে যায় কেরোসিন আনতে। এদিকে বাড়িতে 'রান্নাবান্না সেরে বাকুলে তেলাই

পেতে দুই সইএ কত কথা বলে তার হিসেব নেই।' দুই সই এর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বর্ণনায় পাঠক বুঁদ হয়ে যায়। লেখকের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক —

> *"আকাশের তলায় দুইজনে শুয়ে থাকে চুপচাপ। কখনো কথা বলে কি বলে না ।কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। গা ছুঁয়ে থাকে দুজনে দুজনের। দুটো মেয়ে মানুষ আকাশের তলায় শুয়ে আছে নিশ্চুপ। চারিদিকে অন্ধকার গাছগাছালিতে শানানো দাঁত নিয়ে ইরিস বিরিস কাটে। শুয়ে পড়লে দিক নির্ণয় করতে বিভ্রম লাগে। যে দিকটা রান্নাঘর ভাবে অথচ সে দিকে রান্না ঘরে শোবার ঘর। তন্দ্রা জড়ালে আরো কত ভুল হয়। তন্দ্রায় সাবেরার ভুলে সাবেরা চমকায়। মানুষ এমন দেয়া নেয়া ছবি দেখে নাকি? কত উদ্ভট ছায়াচিত্র পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাকে কাটাছেঁড়া করে"।* [৬]

— সমগ্র গল্পের এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তন্দ্রায় সব কিছু ওলট পালট হয়ে যায়। সাবেরা ঢুলতে ঢুলতে হাফেজার ঘরে গিয়ে ঘুমোয়। আর হাফেজা সাবেরার। অতল ঘুমে তারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অনেক রাতে বাপ বেটায় 'অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে' বাড়ি ফেরে এবং 'বাকুলে ঢুকে যে যার ঘরে চলে' যায়। মুহূর্তে পাঠক বুঝতে পারে কি অঘটন ঘটতে চলেছে। কিন্তু গল্পের চরিত্ররা জানে না। রাতের অন্ধকারে স্বামী স্ত্রীর কাঙ্খিত মিলন আবেগে কায়েম তৃপ্ততার পূর্ণতায় জড়িয়ে ধরে পাশে শুয়ে থাকা সাবেরাকে। স্ত্রীর থুতনির তিলের স্পর্শানুভূতি পাবার জন্য তার তর্জনী ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর হঠাৎই সে স্পর্শ পেয়ে যায় বাঁ দিকের ঠোঁটের পাশের জরুলটার। মুহূর্তে কায়েমের কাছে সব স্পষ্ট হয়। ভুল বুঝতে পারে সে । আর 'তারপর লাফ মেরে মেঝেয় নেমে আসে'। মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। কারণ কায়েম জানে — "অন্য ঘরে ও ত সেই একই অন্ধকার" অর্থাৎ একই ভুল। অথচ সকলেই নিষ্পাপ, নির্দোষ। কায়েম অস্থির হয়ে ওঠে। সকালের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে। অবশেষে সকাল হয়। সাবেরার ঘুম ভাঙ্গে। সমস্ত বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট হয়। লেখক এখানে কাউকে দোষারোপ করেন নি। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দেননি। বড় ব্যাপার কম কোথায় ছেড়ে দিলেন। আপন মতামতটুকু ব্যাখ্যা করলেন মাত্র —

> *" কারো কোন দোষ নেই। আসলে এই বসবাসই আদিম গুহা। আকাঙ্ক্ষা এখানে বদ্ধ হয়ে আছে। দরজা খুলে দাঁড়ালো কায়েম। আলো আসে গুহার ভেতর। কায়েম প্রেমে কাঁদে।"* [৭]

— কিন্তু কায়েম কার প্রেমে কাঁদে? স্ত্রী হাফিজার, নাকি সাবেরার? না নিজের? জীবন এখানে এক নিমেষে বহু ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সফল গল্পকারের মতো আফসার আমেদ গল্পের শেষে পাঠকের কৌতূহলের নিরসন করেও কৌতূহল বজায় রেখেছেন। আর এখানেই তাঁকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কঠিন বাস্তববাদী লেখক বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিক রচনার নতুনত্বে, সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় সর্বোপরি দুই সখীর বন্ধুত্ব বোঝাতে লেখক যে বর্ণনা গুলি দিয়েছেন তা এককথায় পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আর যে বিষয়টি পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করে তা হল এই গল্পের জটিল সম্পর্কের বুনন। কায়েম ও সাবেরার মাতা-পুত্রের মতো একটি সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকলেও, মনের জটিলতায় তাদের সম্পর্কের কোনো নাম দেওয়া যায় না। একে অপরের প্রতি যে গভীর কৌতূহল ও আকর্ষণ তারা অনুভব করেছে তা একান্তই স্বাভাবিক। যদিও সম্পর্কের বিচারে এই আকর্ষণ গর্হিত অপরাধ। কিন্তু মানবিকতার দিক থেকে বিশেষ বয়সের নর-নারীর একে অপরের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতি সিদ্ধ। লক্ষ্য করবো গল্পকার তাদের দুজনের সম্পর্ককে কোথাও অবৈধ বা গর্হিত সম্পর্কের তকমা দেননি, গল্পকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় রয়েছে তাদের এই একান্ত গোপন অনুভূতির প্রতি। এমনকি গল্পের শেষে যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে চরিত্রগুলি সেখানেও গল্পকার কাউকে কোনো দোষারোপ করেন নি। পরিস্থিতির বিচারে সকলেই এক গভীর অনতিক্রম্য সম্পর্কের জটিলতায় আবদ্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এমন জটিল সম্পর্ক বন্ধনের গল্প সম্ভবত আর একটিও নেই। আফসার আমেদের বিপুল ছোটগল্পের মধ্যে শুধু নয় বাংলা সাহিত্যে 'আদিম' একটি সার্থক সৃষ্টি হিসেবে রসজ্ঞ পাঠকের কাছে বিবেচ্য।

তথ্যসূত্র:

১. https://mangrovesahitya.com/?p=1688
২. iebangla, The Indian Express, August 5, 2018
৩. https://mangrovesahitya.com/?p=1688
৪. শ্রেষ্ঠ গল্প : আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, 'আদিম, পৃ:৩৯
৫. ঐ, পৃ:৪১
৬. ঐ, পৃ:৫০
৭. ঐ, পৃ:৫১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

আকাশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ,
বাগাটী, মগরা, হুগলী

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার [১]

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মনে রেখে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ? সম্ভবত না। কিন্তু গদ্যে যা লিখেছিলেন তা আদতে এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি বস্তুত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটির সঙ্গে আমাদের মতো সামান্যজনের পরিচিতি বস্তুত সর্বাধিক অর্থাৎ 'বিদ্যাসাগরচরিত' শীর্ষক রচনাটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মহাপ্রয়াণের চার বছর পর। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ 'অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশনে এমারল্ড্ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত' [২] হওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৯০৭-এ ' চারিত্রপূজা' বইটিতে এই প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে সংযুক্ত হয় আর-একটি লেখা ; যা 'ভারতী' পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮সালে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী-র 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' লেখাটির সূত্রেই উপরিউক্ত শেষ প্রবন্ধটির অবতারণা ঘটেছিল।[৩] কিন্তু এখানেও শেষ নয়, তাঁর আরও দু'টি লেখা আছে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে, তার মধ্যে একটি পরে 'রচনাবলী'তে 'চারিত্রপূজা'র অংশ হিসেবে সংকলিত হয়েছিল। আর সর্বশেষ লেখাটি ১৯৩৯ সালে পঠিত হয়েছিল মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে , যা 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর আগের বছর। লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায় জীবনের কত বিভিন্ন মুহূর্তে বিদ্যাসাগরকে কতভাবে – বারবার স্মরণ করেছেন তিনি ! এমনকি শুধু যে গদ্যে তাই নয়, কাব্যিক অক্ষরেও বিদ্যাসাগেরর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদনে বিরত রাখেননি নিজেকে। ২৪শে ভাদ্র ১৩৪৫(সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) –এ লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ (ডিসেম্বর

১৯৩৯) সংখ্যায়। ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’-এর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।

রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনে গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি !
ভাষার প্রাঙ্গনে তব আমি কবি তোমারি আতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।।

জানি না আর কোনো মহাপুরুষকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের চেয়ে বেশি লিখেছিলেন কি না রবীন্দ্রনাথ !

ব্যক্তিজীবনে তিনি যে অন্তত একবার বিদ্যাসাগরের দর্শন পেয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে ‘জীবনস্মৃতি’তে [৪]। ১৯৮২ সালে বাংলায় পরিভাষা তৈরি এবং ‘সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন’ [৫] -এর উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের একত্র করে একটি ‘পরিষৎ’ স্থাপনের উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তখনো পর্যন্ত বাংলা কবিতার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ না ঘটিয়ে ফেলতে পারা একুশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথকে করা হয় সম্পাদক। এবং তাঁরা যখন বিদ্যাসাগরকে এই সভার জন্য আহ্বান জানাতে যান, তখন সভার উদ্দ্যেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনে তিনি জানিয়েছিলেন : ‘ “ আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো --- ‘হোমরাচোমরা’দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।” ’ [৬] এটা যে কত বড়ো সুপরামর্শ

ছিল তা অবশ্য উদ্যোক্তারা বুঝতে পেরেছিলেন শীঘ্রই। কাজ যা হয়েছিল তা প্রধানত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-ই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কথায় : ‘ বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল --- হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।’ [৭]

বস্তুত ১৯২২ সালের যে লেখাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে সেটি আসলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন এবং পরে বক্তার দ্বারা সংসোধিত।বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করার জন্য এখানে এমন একটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ; সাগরের মতো ব্যাপ্ত মানুষটিকে একটি বিন্দুতে ব্যাখ্যা করতে হলে যে শব্দ বা শব্দবন্ধের কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া সম্ভবপর নয় : ‘যথার্থ মানুষ’[৮]। যার অন্তর্নিহিত উপাদান হল অবিকল্প আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই গুণটিই বিদ্যাসাগর আর রামমোহন রায়কে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বালক দেবেন্দ্রনাথের মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখা রামমোহনের মুখচ্ছবিতে একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়ার উল্লেখ করেছিলেন , তেমনি বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে জোর দিয়েছিলেন ‘দুঃসহ আঘাত সহ্য করা’ এবং ‘বেদনা বহন’ করার অপার শক্তির ওপর। এই দুই মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বে নিহিত বিষাদের ছাপটিকেও তিনি তাঁদের আধুনিকতার অভিজ্ঞান বলেই মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের ‘ ...প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। ... বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন ’ [৯] , কিন্তু তার আগেই তাঁর ‘অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য’-র প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেছিলেন, ‘ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া , হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন -- আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।’[১০]

ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলির একটিতে কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন ,এক বিজিত জাতির গাঢ় বিষাদের কথা , যখন তার পরিচিত পুরোনো জগৎ হারিয়ে গেছে কিন্তু কোনো নতুন বিবর্তনের দিশা সে পায়নি(মনে রাখতে হবে মার্কস মূলত ভারতের পরাধীনতার প্রথম পর্বের কথাই বলেছিলেন)। কিন্তু একটা সময়ের পর সব

পরিস্থিতিরই যেহেতু বিবর্তন ঘটতে বাধ্য, পরাজয়ের বিষাদ এবং হীনতাবোধে নিমগ্ন জাতিও নানা বিপরীত টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকলে একটা সময়ের পর যেমন স্বাভিমানের আলোকরেখা অবধারিত ভাবে জেগে ওঠে তার মধ্যে ; রবীন্দ্রনাথের মতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো দুই যুগন্ধর মণীষার জন্মও 'সেই বড়ো যুগে ...যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে , যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না' , এমন এক 'বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে তাঁদের জীবনের মিলন ঘটেছিল, যে গঙ্গায় অতীতের দিকে ভাটার টানের বিপ্রতীপে ভবিষ্যতের দিকে নতুন জোয়ারও লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং মরা গাঙে যে জোয়ারে কাণ্ডারীর কাজ করেছিলেন চিরপ্রণম্য দুই অনন্য ভারতপথিক। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিরা 'অতীতের বিধিনিষেধে আবদ্ধ' হয়ে থাকেননি , 'অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে' চালিত করার 'সারথি-স্বরূপ' ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিত্বে যে মহামহিম বিষাদ; রবীন্দ্রনাথের চোখে তা বিজিতের পুরোনো বিষাদ নয়, সমকালীন সমাজে এই বিবর্তনকে স্বীকৃতি দিতে যে ব্যাপক ভয়, নিষ্ক্রিয়তা এবং মননের সংকীর্ণতা ছিল , বারবার যার সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছিল , যা দেশের অগ্রগতিকে পদে-পদে রুখে দিচ্ছিল, নবযুগের এই দুই যুগনায়কের বিষাদের উৎস প্রোথিত ছিল সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেই।

হৃত কর্মের যোগ্যতার বিচারে রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি এ-কথা বলতে যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনায় 'এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।' [১১]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন , রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর দুজনেরই প্রথম শিক্ষা প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা ধরে , বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে সংস্কৃত এবং রামমোহনের বেলায় সংস্কৃত এবং ফার্সি ভাষায় বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দুজনেই পরে নিজেদের তাগিদেই আত্মস্থ করেন এবং যা কিছু পাশ্চাত্যের তাকে অশুচি বলে অপমান করার কথা কদাপি ভাবেননি। আর এর ফলেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবিদ্যার মধ্যে সেতুস্বরূপ হয়ে উঠতে পারা। বিদ্যাসাগর নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন , অথচ তিনিই ছিলেন ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করার পেছনে প্রধান উদ্‌যোগী পুরুষ। রামমোহন রায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে।

আবার সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের কাজকে 'ছোটো' করতে চেয়েছেন এই বলে যে, তিনি যেহেতু শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে খণ্ডন করেছেন , তাহলে তাঁর আধুনিকতাও এক অর্থে খণ্ডিত! রামমোহনকে নিয়েও একই বিতর্ক উঠেছে। আর এর উত্তরেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'শাস্ত্র উপলক্ষমাত্র ছিল ... তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন'।

বিদ্যাসাগরকে প্রথম লেখাটিতেও জেনেবুঝেই বারবার রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন মেদিনীপুরের সুদূর গ্রামাঞ্চলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে তাঁর প্রথম জীবন, তাঁর পিতা-মাতা এবং ঠাকুরদা'-র চরিত্রকাহিনির উপর। এর উদ্দেশ্যটা কী? আসলে বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা যে কোনো আকাশ থেকে আসেনি , যে জল-মাটি-হাওয়ায় তিনি বেড়ে উঠেছেন তার মধ্যেই যে তাঁর বিকাশের বীজ নিহিত ছিল –সেই কথাটিকেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরের পরবর্তীজীবনের শহর বাসের ইতিবৃত্ত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় সেই আদি আদলটিকেই বিকশিত করেছে অপরাপর উপাদানে সমৃদ্ধ করে। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা ধার-করা নয়, তা সম্পূর্ণ দেশজ(indigenous) আধুনিকতা। যে কারণে এই আধুনিকতাকে কখনো নতজানু হতে হয়নি বিদেশি শাসকের সামনে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ' ... রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর...একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। ...স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না ; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন ; অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।' [১২]

কিন্তু যেটা লক্ষ্যনীয় তা হল রবীন্দ্রনাথের বয়ানে বিদ্যাসাগরের পারিবারিক ইতিহাস আঙুল তুলে দেখায় যে দেশজ এমনকি গ্রামীণ ঐতিহ্যের মধ্যে সেদিন যেমন ছিল অন্ধ সংস্কার, আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানি ,জাতের বিচার, নারীকে হীন করে রাখা, তেমনই কিন্তু ছিল প্রতর্কমূলক চিন্তার পরম্পরা, মননের নির্ভীকতা, ইহবাদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। দেশজ সংস্কৃতির যে বহমান ধারাটিকে কেবল বিদেশি শাসকই নয় ,দেশীয় শাসকশ্রেণিও বরাবরই তাদের নিজেদের স্বার্থে চাপা দিয়ে রাখতেই চেয়েছে(আজও কী

দেশীয় সংস্কৃতি বলতে সংকীর্ণ হিন্দুয়ানির নামেই ঢাক পেটানো চলছে না সেই শ্রেণির স্বার্থে ?)।

বিশেষত ভগবতী দেবীর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে মুক্তবুদ্ধির ধারাটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশের এই নারীকে এখানে কেবল অশেষ দয়াবতী বলে দেখানো হয়নি , পদে-পদে যেভাবে তিনি গ্রামের দরিদ্রতম মানুষদের কাছে টেনেছেন , জাতপাতের সংস্কারগুলিকে খণ্ডন করেছেন , পুনর্বিবাহিতা বিধবাদের সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করেছেন ঘৃণার ঘেরাটোপ ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ; তাতে করে তাঁর মধ্যে নিজস্ব 'স্বভাবিক চিত্তশক্তি'র উদ্ভাস দেখতে পেয়েছেন ও দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দয়াও যে এই মুক্তবুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত এবং এর যে একটি পরম্পরা দেশীয় গ্রামসমাজের মধ্যেই উপ্ত ছিল—এটা সাব্যস্ত করাও যেন এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য বলেছিলেন যে, 'অভিমন্যু জননীজঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত ... মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।' [১৩]

১৮৯৫ সালে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে প্রথম লেখা এবং ১৯২২-এ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত ভাষণ --- এই দুই মুহূর্তের মাঝখানের যে সময়, তা ছিল আদতে রবীন্দ্রনাথের মনন এবং সৃজনশীলতার বিকাশের সময়। আবার আগের পর্বে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকালে রবীন্দ্রনাথ অতীতের থেকে ভবিষ্যতের দিকে যে গতিবেগ লক্ষ্য করেছিলেন , এই সময়ে , বিশেষত বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে ,তার ফলাফলগুলি দেশের ইতিহাসে দেখা দিচ্ছিল আরও স্পষ্ট করে। স্পষ্ট হচ্ছিল আগে থেকেই আধুনিকতার ধারণার মধ্যে যে তীব্র পরস্পরবিরোধী প্রবণতা ছিল তা-ও। আধুনিক ভারতবর্ষের বিকাশের জন্যই পরাধীনতা থেকে মুক্তি প্রয়োজন, এই বোধের বিস্তার ঘটার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের নামে স্রেফ অন্ধ সংস্কারকে লালন করা , অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া লালসা --- এই মুক্তির সংগ্রামে তৈরি করেছিল প্রবল প্রতিবন্ধকতা।

সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের প্রচলিত চারিত্রপূজার মধ্যে যে মেকি উন্মাদনা আছে তার সমালোচনা সূত্রে যাঁরা নিজের কালে এবং নিজের সমাজে সঠিকভাবে আদৃত হননি সেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করার প্রস্তাবের মাধ্যমে আসলে তাঁর নিজের সময়ের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে(যা বস্তুত পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ভাবধারারই

প্রতিফলন) দেশজ অতীত পর্যালোচনার অন্যরকম এক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রণোদনাও সম্ভবত তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল !

স্বজাতির ভবিষ্যতের প্রতি অনেক আশা নিয়েই সে-দিন তিনি বলেছিলেন : '...দয়া নহে , বিদ্যা নহে , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।'[১৪]

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৭ নং কবিতা', 'বলাকা' : রবীন্দ্ররচনাবলী-ষষ্ঠ খণ্ড , কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ (পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ. ২৫৬।
২. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত(১)' ,' চারিত্রপূজা ' : রবীন্দ্ররচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড , কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ(পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ. ৭৬৭।
৩. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' বিদ্যাসাগরচরিত(২)', 'চারিত্রপূজা' : রবীন্দ্ররচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড , কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ(পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ. ৭৮৩।
৪. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' রাজেন্দ্রলাল মিত্র' , ' জীবনস্মৃতি ' : রবীন্দ্ররচনাবলী- নবম খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ(পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ.৪৯৬।
৫. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' রাজেন্দ্রলাল মিত্র' , ' জীবনস্মৃতি ' : রবীন্দ্ররচনাবলী- নবম খণ্ড , কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ(পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ.৪৯৬।
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' বিদ্যাসাগরচরিত (১)' ,' চারিত্রপূজা ' : রবীন্দ্ররচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড , কলকাতা, বিশ্বভারতী,সুলভ সংস্করণ(পুণর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ. ৭৬৭।
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ , পৃ. ৭৬৮-৭৬৯।
১২. ঐ , পৃ. ৭৬৯।
১৩. ঐ , পৃ. ৭৭৩।
১৪. ঐ , পৃ. ৭৮২।

নাড়ির টান: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে সম্পর্কের এক আমোঘ বন্ধন

সোমা দাস (চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *'সম্পর্ক' অর্থাৎ 'সহিত যুক্ত হওয়া'। আর এই যোগ যদি নাড়ির যোগ হয় তবে সে বন্ধন যে অবিচ্ছেদ্য অমোঘ হবে তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বন্ধন একান্তভাবে মা ও সন্তানের। 'মা' শব্দটি বিশ্বজনীন। বিশ্বের প্রায় তেত্রিশটি ভাষায় 'মা' শব্দের অস্তিত্ব মেলে। 'মা' শব্দের প্রতিশব্দে এমন কিছু শব্দবন্ধ আছে যেখানে নাম-পরিচয়ে সন্তানের জন্মদানের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত প্রাধান্য পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, গর্ভধারিনী, জন্মদাত্রী, জনিকা, জননী, জনয়িত্রী, প্রসূতি, প্রজনিকা, প্রজায়িনী- প্রায় প্রতিটি শব্দবন্ধতেই মাতৃ-পরিচয় মূলত অপত্যকে ঘিরেই আবর্তিত। গর্ভধারণ নিতান্তই জৈবিক প্রক্রিয়া এবং একই সঙ্গে নারীর ব্যক্তি-ইচ্ছাধীন। অথচ একদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার, সেই সম্পদ রক্ষার এবং বংশ রক্ষার্থে উত্তরাধিকার উৎপাদনজনিত দায়ভারের সঙ্গে এই প্রক্রিয়াকে জুড়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য সন্তান শব্দটির বুৎপত্তিগত তাৎপর্য অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, সন্তান- সং+তন্ (বিস্তার করা)+অ অর্থাৎ যদ্বারা বংশ বিস্তার হয়। এক্ষেত্রে অপত্যের পরিচয় সম্বন্ধীয় শব্দবন্ধে মা তেমনভাবে সম্পৃক্ত রইলেন না। বরং বংশ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের ধারক হিসেবেই তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হলো। গর্ভস্থ শিশুর নাভি থেকে যে নাড়ি প্রসূতির গর্ভপুষ্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সেই যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করা হয় অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ির যোগ ছিন্ন করা হয়। সদ্যোজাত একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নিজের আত্মপ্রকাশকে ঘোষণা করে। অথচ মা সেই নাড়ির টান চিরকাল অলক্ষে শরীরে-মনে-আত্মায় লালন ও অনুভব করে চলে। বিশ শতকের সাতের দশকের কথাকার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে নিতান্ত ঘরোয়া ও সহজ আঙ্গিকে সুচারুভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের বহুধা অবয়ব স্পষ্টতা পেয়েছে। মূলত সেই সম্পর্কের আধার হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে পরিণত নারী-পুরুষ। তবে উক্ত আলোচনায় আমরা একটু অন্যভাবে তাঁর কলমের গতিবিধি*

আনুধাবনে প্রয়াসী হব। এক্ষেত্রে আমরা সম্পর্কের নিরিখে মা-সন্তানের সম্পর্কের ধারাকে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী। যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে সেই অমোঘ অচ্ছেদ্য বন্ধন অর্থাৎ নাড়ির টান। বিশ্লেষণের পরিসরগত সীমাবদ্ধায় আমাদের নির্বাচন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের চারটি ছোটগল্প- 'রূপকথার জন্ম', 'মানুষ যেমন', 'প্রতিবন্ধী' ও 'অবগাহণ'। তবে আমাদের আগ্রহ ও বিশ্লেষণের গতিরেখা একরৈখিক সিদ্ধান্তাভিমুখী নয়। কারণ এতদিনকার গতানুগতিক ধারণায় গড়ে ওঠা 'নাড়ির টান' শব্দবন্ধটি আমাদের একটি বড় প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। সত্যিই কি মা-সন্তানের সম্পর্কে নড়ির যোগ-ই শেষ কথা? নাকি ,নারী-স্বভাবের অভ্যন্তরীণ উপজ্ঞা (instinct)-ই এর মূলে বিধৃত? যাকে এককথায় বলা যায় মাতৃভাব।

সূচক শব্দ : *মা, সন্তান, নাড়ির টান, অমোঘ বন্ধন, উপজ্ঞা, মাতৃভাব।*

মূল আলোচনা :

"মাতৃ স্নেহই আমাদের এই মরজগতে ঈশ্বর প্রেমের নিকটতম প্রকাশ"[১]- স্বামীজীর এই অনুভববেদ্য বক্তব্য মাতৃসান্নিধ্যের যথার্থ ব্যাখ্যা। সন্তানের কাছে মা এক মমতাময়-স্নেহময় প্রশ্রয় এবং একই সঙ্গে পরম নিরাপদ-নিশ্চিন্তির আশ্রয়।

-'ওমা তুই কুথাএ চলি গেলি ?'

-'কুথাও ঝাইনি বাপধন। ইখেনেই আচি।'

-'কুথাএ আচিস? আমি ক্যান তোরে দেকতি পাইনি কো ?'

-'মাটির কোলে আছি বাপ। আকাশ হইয়ে আচি। গাচ হইয়ে আচি।'

-'ভালোই হইয়েচে। আর তোরে বাপের ঠেঙানি খেতি হবেনি।'

-'আমারে আর কেউ পাবেনি কো। আমি এখুন পিথিমি হইয়ে গেচি।'

... -'আমারেও কেন তুর কাচে লিয়ে যা না।...'[২]

গোরে শুয়ে থাকা মায়ের সঙ্গে এভাবেই কথোপকথন চালিয়ে যায় 'রূপকথার জন্ম' গল্পের বারো বছরের নূরি। মা-কে হারিয়ে সে বড্ড একা। সে চায় মায়ের মতো 'পিথিমি' হয়ে যেতে। অন্তরের গভীরে গোপনে চলে এই আকাঙ্ক্ষার লালন। আথচ তার পৃথিবী হওয়া হয় না। একসময় নূরির শরীর থেকে উঠতে থাকে 'কচুরিপানার গন্ধ'। যে শরীর সামাজিক বিধি মেনে দখল করে মঈদুল।'দিন নেই, রাত নেই যখন তখন মঈদুল খামচে ধরত তাকে। দোরের শিকল তুলত।'[৩]-সেই সঙ্গে সংসারের বেড়ি; হাঁপিয়ে ওঠে নূরি। আন্যদিকে 'পিথিমি' হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাও অস্থির করে তোলে তাকে। তাই মঈদুলের মেজাজ, মার কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে; সাহসে ভর করে

নূরি একদিন ঘোষণা করে তার তালাক চাই। মঙ্গীদুল তাকে তালাক দেয়নি, তবে নতুন বিবি এনেছে ঘরে। বাপের ঘরে ফিরে নূরি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তবে এই আপাত মুক্তি বেশি দিনের নয়। কারণ ভিতরে-ভিতরে সে অনুভব করে জৈবিক তাড়না। তাই স্টেশনের গায়ের চায়ের দোকানের জামালুদ্দিন আর মুন্নু শেখ দুজনের মধ্যে নূরি মুন্নু শেখকেই নির্বাচন করে।

> *"ঝকঝকে মজবুত শরীর। চওড়া কাঁধ। হাতে-বুকে থাক-থাক পেশি। ভরাট গলার স্বর। ... মুন্নুর পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে ঘন কালো লোম উঁকি মারে। আদিম অরণ্য হাতছানি দেয়। ..."*[৪]

সেই হাতছানি অগ্রাহ্য করতে পারেনি নূরি, শেখের চতুর্থ বিবি হয়ে উঠেছে গঞ্জের পাকা বাড়িতে। তবে অচিরেই গয়না-শাড়ি-আদর-সোহাগে অরুচি ধরেছে নূরির; দম বন্ধ হয়ে উঠেছে ইঁট-কাঠ-দেওয়াল-দরজার ঘেরাটোপে। অবশেষে সুযোগ আসে বাপের বাড়ি যাওয়ার। বহুদিন পরে সেই চেনা পথ-ঘাট-আকাশ-মাটি-গাছ-পাখি সবার সমবেত ডাক শুনতে পায় নূরি। 'পিথিমি' হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা আবার নতুন করে ভুড়ভুড়ি তোলে মনের মধ্যে।

> *"নূরির ইচ্ছে করে একছুটে বাদায় নেমে যায়। এঁটেলকাদায় গোড়ালি ডোবে। পেটের ভেতর খোকাটা নড়েচড়ে ওঠে।"*[৫]

ঈদের দশ দিন আগে নূরির কোলে আসে একটা রোগা-সোগা ছেলে। মুন্নু শেখের ফরমান সে জানে; ঈদের পরেই খোকা নিয়ে গঞ্জের কোঠায় ফিরতে হবে তাকে। মাঝে মাঝে চোখ ভিজে ওঠে; খোদার কাছে মনে-মনে দরবার করে নূরি- ' মেয়ে মাইনষরে কেন তালাক দিবার হক দাওনি খোদা ?'[৬]। সংসারের বাঁধন তার গলার ফাঁস। তাই মাঝে-মাঝে ' গভীর অনিচ্ছায় স্তন গুঁজে দেয় ছেলের ঠোঁটে '[৭]। শুধু একটাই সুযোগের অপেক্ষা। তাই যখন গভীর রাতে চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে তার চেনা মাটিতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ায়, তখন খুশিতে চলকে ওঠে তার শরীর, এবার সে 'পিথিমি' হয়ে যাবেই।

> *"নারকেল গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে নূরি একটানে খুলে ফেলে লাল ডুরে শাড়িখানা। ছুঁড়ে দেয় দূরের আগাছায়। আঃ, কী আরাম। কতদিন পর আবার কচুরিপানার গন্ধ উঠছে শরীর থেকে। চাঁদের সঙ্গে নূরির শরীরের ছায়া কেঁপেকেঁপে ওঠে সোঁদা গন্ধ ওঠা জলের আয়নায়।"*[৮]

চাঁদ, তারা, আকাশ, জল, গাছ, মাটির সমবেত আহ্বান নূরিকে উন্মাদ করে তোলে। ঠান্ডা নরম জলের বুকে শুধু একটা ঝাঁপ, আর তার পরেই সে পৃথিবী হয়ে যাবে। হাতের নাগালেই তার এতদিনের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। কিন্তু হঠাৎই থমকে যায় নূরি-

> *"বুক জুড়ে কটকটে যন্ত্রণা। স্তন ভেসে যায় দুধে। রাতবিরেতে খোকাটার বড় ক্ষিদে পায়। হয়তো এখন জেগে উঠেছে। চ্যাঁ-চ্যাঁ করছে শালিখছানার মতো। লাল কচি মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কষ।"*[৯]

না, ঠান্ডা নরম জলে নূরির আর ঝাঁপ দেওয়া হয় না। 'দুধ টসটস বুকের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে নূরি'[১০]। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে সে। এক অদৃশ্য অমোঘ বন্ধন-রজ্জু তাকে বেঁধে ফেলেছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। তাই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি তার অধরাই থেকে যায়; যে মুক্তি সে খুঁজেছিল আকাশ-বাতাস-জল-মাটি-চাঁদের আলোয় প্রকৃতির বুকে। আসলে 'পিথিমি' হতে চাওয়া নূরি জানেনা , কখন যেন সে নিজেই প্রকৃতি হয়ে গেছে। ' বুক বেয়ে গড়িয়ে আসা দুধ, জল, বাতাস, জ্যোৎস্না সব মিলেমিশে একাকার ' হয়ে গিয়ে সে অন্য নূরি হয়ে উঠেছে। অজানিত-অবচেতনে সে কখন যেন তুলে নিয়েছে নতুন প্রাণ সৃষ্টির ভার। পুরুষ সেখানে সহকারী মাত্র। মঈদুল, জামালুদ্দিন, মুন্নু শেখ – সবাই তাকে বাঁধতে চেয়েছে, নূরি সেই বাঁধন ছিন্ন করেছে স্বগত-তালাকে। কিন্তু রক্ত-মাংস-মজ্জায় গড়া আপন সৃষ্টির বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য তার নেই। তাই শেষ পর্যন্ত 'পিথিমি' নয়, নূরি প্রকৃতি (সৃষ্টির মূল তথা আদি কারণ) হয়ে উঠেছে। খোদার কাছে দরবার করে, তাঁর বিধানের অপেক্ষা না করেই স্বগত-তালাকের সাহসী ঘোষণায় সামাজিক বন্ধন নস্যাৎ করলেও; নাড়ির টান সেই আমোঘ বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেনি মা-নূরি।

যেমন অস্বীকার করতে পারেনি 'মানুষ যেমন' গল্পের নয়নতারা, তার প্রথম সন্তান শতদলকে। একসময় সুখের হাতছানি অগ্রাহ্য করতে পারেনি সে। সুখ-সচ্ছলতা ও নতুন পুরুষ- দুই-ই টেনেছিল তাকে। তাই আলটপকা-জ্বরে মরে যাওয়া স্বামীর শোক কাটতে-না-কাটতেই নয়নতারা পালিয়েছিল দালালপুরের কাপড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে। উত্তরোত্তর বর্তমান স্বামীর ব্যবসায়িক উন্নতিজনিত সুখ সচ্ছলতার ঝলক নয়নতারার শরীরে প্রতিবিম্বিত-

“সেই রোগাভোগা চেহারাই আর নেই নয়নতারার। ভরাট স্বাস্থ্যে টসটস করছে শরীর, গায়ের রং ফর্সা আগের থেকে। দেখলেই বোঝা যায় দিব্যি সচ্ছলতায় আছে,”[১১]

সুতরাং পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নয়নতারার যে নেই তা সহজেই বোঝা যায়। অথচ ছয় বছর পরে সেই নয়নতারাই ফিরে এসেছে, একমাত্র কারণ নাকি, ফেলে যাওয়া ছেলে শতদল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এতই যদি ছেলের জন্য ভাবনা তাহলে ঐ নিষ্ঠুরতা কেনো? সবে ঠোঁটে বুলি ফোটা একরত্তি জন্মান্ধ অসহায় ছেলেকে আরও অসহায় করে ফেলে পালিয়ে যাওয়া কেনো? আসলে জৈবিক চাহিদার তাড়নায় মানুষ কখনও কখনও নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নয়নতারার ক্ষেত্রে ,যেমন জৈবিক চাহিদা তেমনই নাড়ির টান--- দুই-ই সত্য হয়ে উঠেছে। তাই দুই সুস্থ ছেলের জন্ম দিয়েও ফেলে যাওয়া জন্মান্ধ ছেলের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারেনি, যে অস্তিত্বের শিকড় প্রথিত আছে তার মাতৃসত্তার গভীরে।

“অংশুপতি ভেবে পায় না যাকে ফেলে চলে যেতে একদিন বুক কাঁপেনি একটুও, তাকেই আবার ফিরে পেতে কেন এমন উতলা হয় মানুষ।”[১২]

অংশুপতির বিষয়ী ভাবনায় ও দৃষ্টিতে সত্যিই এর হিসেব মেলানো দুরূহ কর্ম। কারণ এই যোগ চোখে দেখা যায় না। এই যোগ নাড়ির যোগ , অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য-অমোঘ।

একইভাবে যেমন জড়বুদ্ধি ছেলে নেড়ুকে দূরে মায়ের কাছে রেখে এসেও সারারাত দু-চোখেরপাতা এক করতে পারেনি ‘প্রতিবন্ধী’ গল্পের চঞ্চলা। ‘ দরজা খোল মা। আমি এসেছি!’-সারারাত একই ক্ষুধার্ত শব্দের অনুরণন তাকে তাড়া করে বেরায়। স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রতিবন্ধী সন্তানের পেটভরা ভাতের এবং খানিকটা নিরাপত্তার আশায় অঙ্কুরকে বিয়ে করা। অথচ সেই নতুন গড়ে ওঠা দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নেড়ু। সম্পর্কের অনিশ্চয়তা ধীরে-ধীরে চঞ্চলাকে ভীত-শঙ্কিত করে তোলে,

“লোকটা যদি দুম করে তাদের ফেলে চলে যায়।! পুরুষমানুষের ভ্রমরার মন। ফুলে যদি মধুই না পেল, তবে সে ফুলে আর থাকা কেন ?”[১৩]

ভয়, আশঙ্কা, দুঃখ, যন্ত্রণা-বিধ্বস্ত চঞ্চলা সমস্ত রাগ উগরে দেয় প্রতিবন্ধী ছেলের উপর। মাসিক টাকা-সহায়তার শর্তে মায়ের কাছে রেখে আসে ছেলেকে। কিন্তু তাতেও কি সে

শান্তি পায় ? পায় না। প্রতিমুহূর্তে সেই সন্তানের অদৃশ্য অস্তিত্ব তাকে অসহায় করে তোলে। আসলে অঙ্কুরের সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো প্রেম বা মোহ নেই, আছে শুধুই এক অলিখিত চুক্তি। সামাজিক পরিসরে একা নারী শুধুই লোভনীয় শরীর। চঞ্চলা তাই সামাজিক স্বীকৃতির আওতায় পক্ষান্তরে সেই শরীরের বিনিময়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার সংস্থানকেই নিশ্চিত করতে চেয়েছে। মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে আসার অপরাধবোধ তাকে যতটা-না শঙ্কিত করে ,তার চেয়েও বেশি বিধ্বস্ত করে সেই শব্দময় উপস্থিতি- ‘দরজা খোল মা। আমি এসেছি!’। এই ক্ষুধার্ত শব্দিত অনুরণন চিরকাল বাজবে তারই গভীরে; কতটা গভীরে তা শুধুই বুঝবে মা-চঞ্চলা। কারণ নেড়ু যে তার ‘ সাত নয়,পাঁচ নয় একটাই নাড়িছেঁড়া ধন’।

চঞ্চলার এই আত্মত্যাগ সম্পর্কে মনে হতেই পারে, মা তার সন্তানের জন্য করবে এটাই তো স্বাভাবিক; হাজার হলেও ‘নাড়িছেঁড়া ধন’। আপন রক্ত-মাংস-মজ্জায় তিলে-তিলে শরীরের মধ্যে সযত্নে গড়ে তোলা আর একটি নতুন প্রাণ। যে প্রাণ তার জীবন-রস সংগ্রহ করে মায়েরই শরীর থেকে, তারই অভ্যন্তরে ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে স্বতন্ত্র অবয়বে। তারপরে ভূমিষ্ঠ হয়ে অভ্যন্তরীণ সেই যোগ ছিন্ন করে পৃথিবীর বুকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ঘটে নতুন প্রাণের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। মানব জীবন-চক্রের এ-এক অধ্যায়। নূরি, নয়নতারা, চঞ্চলা- প্রত্যেকেই বিবিধ আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, অসহায়তা, টানাপোড়েন নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে তাদের সন্তানদের সঙ্গে। কিন্তু ‘অবগাহন’ গল্পের স্মৃতিকণা ও হেমলতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। তাঁরা প্রত্যক্ষ মাতৃত্বের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। সন্তানের মুখ দেখার সুযোগ হয়নি স্মৃতিকণার। আর হেমলতার কোলে ছ’-ছ’বার সন্তান এসেও থাকেনি। প্রথমজন অকালে বিধবা হয়ে বাবা-ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসেছেন; আর দ্বিতীয়জন বংশ রক্ষার্থে উত্তরাধিকারী দিতে না পারায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে হয়েছে। তারপর একসময় ভাগের সংসার অসহ্য হয়ে উঠলে তাঁকেও বাবা-ভাইয়ের সংসারে ঠাঁই নিতে হয়েছে। কন্যা হয়ে যে পরিসর তাঁরা পেয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেছেন সে পরিসর আর তাঁদের জন্য সংরক্ষিত নেই। তাই, হয় ঝি নয় রাঁধুনি অথবা বিনা মাইনের আয়াতে পরিণত হতে হয়েছে তাঁদের। সংসারে বীতশ্রদ্ধ স্মৃতিকণা ও হেমলতা কেবল পরলোক গমনের দিন গোনেন। এই জগৎ-জীবন ও যুগের প্রতি তাদের আর আস্থা নেই। চারদিকের রং-ঢং, চাল-চলন, রীতি-নীতি তাঁদের স্তম্ভিত করে। গা রি-রি করে যখন জানতে পারেন মন্ডল বাড়ির যে মেয়েটা খদ্দের ধরতে ধর্মতলায় দাঁড়ায়, তাকে তার দাদা-ই ‘লাইনে’

নামিয়েছে। স্মৃতিকণা ও হেমলতা দু'জনেই নাক কুঁচকায় ঘৃণায়। তাঁদের মতে 'ও মেয়ের মরাই উচিত'। অথচ যেদিন মেয়েটা খারাপ রোগে সারা শরীরে দগদগে ঘা নিয়ে শয্যা নিয়েছে সেদিন দুই বুড়ি গুটি-গুটি এসে বসেছেন তার শিয়রে। সেই নষ্ট মেয়ের দগদগে ঘা-য়ে সযত্নে লাগিয়ে দিয়েছেন মলম। একে আমরা সম্পর্কের কোন অভিধায় ভূষিত করব? কী নাম দেব এই স্নেহ-লালনের? যে 'বেবুশ্যটার' মুখ দেখলে গা-গুলিয়ে উঠত স্মৃতিকণা আর হেমলতার, সেই তাঁরাই তার অসুস্থতার কথা শুনে চুপিসারে ছুটে এসেছেন। তাকেই মাতৃত্বের সযত্ন স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন। এও বুঝি অদৃশ্য নাড়ির টান, যার যোগ প্রত্যক্ষে না থেকেও পরোক্ষে আছে। প্রকৃত অর্থে এই বন্ধন নির্দিষ্ট কোনো এক সন্তানের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো এক মায়ের নয়, এই বন্ধন সর্বকালের অপত্যের সঙ্গে সর্বজনীন মাতৃত্বের চিরকালের বন্ধন। আর এই কারণেই অজানা বীর্যের অযাচিত সম্ভাবনাকে সাদর অভ্যর্থনায় তাঁরা দ্বিধাহীন-

> *"পেটেরটাকে বাঁচাতেই হবে রে। খবরদার ওটা যেন নষ্ট না হয়।"*[১৪]

আপাতভাবে গর্ভধারণ নিতান্তই এক জৈবিক প্রক্রিয়া। নতুন প্রাণের এই সৃষ্টিকর্মে যেখানে নারীর ব্যক্তি ইচ্ছা-অনিচ্ছারই প্রাধান্য থাকার কথা; সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-নির্ধারিত উত্তরাধিকারী উৎপাদনের বিধিবদ্ধ দায়ভারই অগ্রাধিকার পায়। ফলত সেক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা প্রশ্রয় পায় তা হয়তো ভিন্ন ও দীর্ঘ বিতর্কের বিষয়। তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে নারী ধারণ করে প্রাণ-বীজ; নাড়ির সংযোগ-পথে সংবাহিত আপন প্রাণরসে তাকে সেচন করে, এবং তিলে-তিলে গড়ে তোলে প্রাণময় এক নতুন অবয়ব। স্বাভাবিকভাবেই সেই অপত্যের প্রতি থাকে তার স্নেহ-মমতা-গভীর ভালোবাসা (ব্যতিক্রম ব্যতীত)। যার সঙ্গে সে জুড়ে থাকে চিরকাল এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে। কিন্তু যে নারী ধারণ করেন নি কোনো প্রাণ-বীজ, নতুন প্রাণের সৃষ্টিকর্মে যিনি কোনো দৃষ্টান্ত রাখেন নি, তিনিও অনাত্মীয় অপত্যে কেমন ভাবে স্নেহসুধা ঢেলে দিতে পারেন অবলীলায়? আসলে এই প্রবণতার নেপথ্যে থাকে নারী-স্বভাবের অভ্যন্তরীণ উপজ্ঞা (instinct)। যার আধার মাতৃসত্তা; যার প্রকাশ মাতৃভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের নারী-ভাবনায় নারীর জায়া অপেক্ষা জননী রূপই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য।

> *"ভারতের জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই ইহার শেষ কথা। ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব – সেই অপূর্ব, স্বার্থ শূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীল জননী।"*[১৫]

নাড়ির টান অমোঘ হয়েও অদৃশ্য। যার অস্তিত্ব শুধুই অনুভবে। আর সেই অনুভবঋদ্ধ মাতৃভাবে, সম্পর্কের অমোঘ বন্ধনে নূরি-নয়নতারা-চঞ্চলা-স্মৃতিকণা-হেমলাতারা সবাই একাকার হয়ে যায়।

আকরগ্রন্থ:

১. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গল্পসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬।

২. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বর্ণময়, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১৬।

সহায়ক:

১. ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড)

২. ভারতের নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খন্ড),

৩. https://bartamanpatrika.com

৪. https://blog.mukto-mona.com

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র(২য় খন্ড), ভারতের নারী, পৃষ্ঠা-৫৩৩

২. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গল্পসমগ্র ১, রূপকথার জন্ম, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৯।

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫০

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৪

৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৬

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৬

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৬

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৭

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৭

১০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫৭

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, মানুষ যেমন (গল্প), পৃষ্ঠা- ৭৪

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭৮

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রতিবন্ধী (গল্প), পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, অবগাহন (গল্প), পৃষ্ঠা-৮৪

১৫. ভারতের নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খন্ড), পৃষ্ঠা- ৩৩৫

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস : দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন

অচিন্ত্য দে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপন্যাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দাম্পত্য সম্পর্ক ঔপন্যাসিকদের কাছে একটা বিশেষ উপাদেয় বিষয়। সাধারণ ভাবে উপন্যাসকে পাঠকের কাছে গভীর অনুভববেদ্য করে তুলবার জন্য তারা যেসকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তার অনেকগুলিই কৌতূহলজনক এবং আকর্ষনীয় রূপে পাওয়াযায় । যেমন – এখানে নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকা সম্ভব , সম্ভব পারিবারিক সংকটতথা সামাজিক সংকট থাকা। এমনকী চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তন এবং ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শনও দাম্পত্য সম্পর্ক এবং সংকটের আলোকে তুলে ধরবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে । এই কারণেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন শ্রেনির উপন্যাসগুলির মধ্যে দাম্পত্য সংকটকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন । যেমন 'বিষবৃক্ষ' , 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'চন্দ্রশেখর' এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথেরও অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঘনীভূত হয়েছে দাম্পত্য সংকটকে আশ্রয় করে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে যার সূচনা , ক্রমান্বয়ে এসেছে 'ঘরে-বাইরে' , 'যোগাযোগ' , 'দুই বোন' , 'মালঞ্চ'। এদেরই পথ ধরে বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এবং তৎপরবর্তী ঔপন্যাসিকরা তাদের একাধিক রচনাতে দাম্পত্য জীবন-জটিলতাকে এনে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এই বিষয়ে একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন বলা যায় । এক্ষত্রে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' যেমন উদাহরণ হিসাবে আসতে পারে তেমনি আসতে পারে সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহে'র মতন উপন্যাস ।

তবে দাম্পত্য সম্পর্ক বহু উপন্যাসের উপজীব্য হলেও সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন বা সংকটের ধাঁচ একরকম এমন মনে করার কোন কারণ নেই । কোন উপন্যাসের মূল বিষয় স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারিক এবং আদর্শগত সংঘাত – যেমন 'যোগাযোগ' বা 'জতুগৃহ' । আবার কোন কোন উপন্যাসের সংকট এসেছে দম্পতির নিস্তরঙ্গ জীবনের মাঝে কোন পরনারীর আবির্ভাবের ফলে । যেমন – 'কৃষ্ণকান্তের উইল'- এ নগেন্দ্রনাথ- সূর্যমুখীর মাঝে এসেছে রোহিনী বা 'চোখেরবালি'তে বিনোদিনী

এসেছে মহেন্দ্র-আশালতার দাম্পত্যের মাঝে । আবার এর উল্টোরূপেও দেখাযায় কোন পরপুরুষের আবির্ভাব কোন দাম্পত্য সম্পর্ককে জটিল এবং সংকটময় করে তুলেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' বা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এইরকম দুটি উপন্যাস । চন্দ্রশেখর-শৈবালিনীর মাঝে প্রতাপ বা মহিম-অচলার মাঝে সুরেশ আসার ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে যে সংকট এসেছিল তাকে রসদ করেই তৈরী হয়েছে সেই উপন্যাসের শিল্প প্রতিমা । রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের দাম্পত্য সংকট এই ধারাতেই প্রবাহিত । অর্থাৎ স্বামী নিখিলেশ এবং স্ত্রী বিমলার নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনে ধুমকেতুর মতন আবির্ভূত নতুন পুরুষ সন্দীপ যে আন্দোলন তৈরী করেছে তা-ই এই উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি রূপে দেখা দিয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ তার এই উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক নির্মাণ করেছিলেন একটু অভিনব কায়দাতে । এইখানে সম্পর্কের প্রাথমিক পর্বে আর পাঁচটা উপন্যাসের মতন নির্বিবাদী , সুখ-শান্তিময় আবহ থাকলেও তা নিতান্তই বাহ্য দিক । অন্তর্গত ভাবে তাদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন সম্পর্কের সূচনাকাল থেকেই ছিল । চরিত্র দুটির আত্ম কথার সুযোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের সেই মনস্তত্ব শুরুতেই পাঠকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন । দেখা গেছে বিমলা পতিরূপে যাকে জীবনে পেয়েছে তার সঙ্গে তার স্বপ্নে গড়া রাজপুত্রের মিল ছিলো না ।

> *-'রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন কালের বাদ্‌শাহের আমলের সন্মান. ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি--- তখন থেকেই মনে একটা ছবি আঁকাছিলো ....স্বামীকে দেখলুম তার সঙ্গে ঠিক মেলে না । এমন-কি তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো।'*

তবেমিল না থাকলেও তাকে মনের দিক থেকে গ্রহণে তার অসুবিধা হয় নি । কারণ যাকে পেয়েছে তার আসল পরিচয় যাইহোক সে তার স্বামী । ছেলেবেলা থেকে সে জেনেছে এবং দেখেছে স্বামী হিসাবে যাকে জীবনে পাওয়াযায় তাকে সেবা করতে হয় , ভক্তি করতে হয় , তার পায়ে স্থান গ্রহণ করে আনন্দ পেতে হয়। তাই নিখিলকে সে গ্রহণ করেছে পরম পূজনীয় মানব আধার রূপে । তাকে সেবা করে , প্রণাম করে , পুজো করে সে তাদের দাম্পত্যকে অনুভব করে । সেখানে ভালোবাসা এবং পূজা তার কাছে সমার্থক । কিন্তু নিখিলেশের ভাবনা একেবারে আলাদা । সে দাম্পত্যের মধ্যে সেবা বা পূজাকে একেবারে স্থান দিতে চায় না । তার মতে ---

‘পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে ,
তাতে পূজারী এবং পূজিত উভয়েরই অপমানের একশেষ’

-- সে বিমলাকে আরও বোঝায় – ‘ স্ত্রী পুরুশের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ’ । কিন্তু বিমলার মন এই ভাবনাতে সায় দেয় না । কারণ তার মন বলে – ‘ ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাঁধা দেয়না । ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়’

তাদের ভাবনার এই পার্থক্যের সঙ্গে জরিয়ে ছিলো তাদের পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিতর্ক । বিমলা নিয়ম করে ভোরবেলায় স্বামীর পায়ের ধূলো নিয়ে দিন শুরু করত , কিন্তু নিখিল তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারত না । আবার নিখিল যখন নিজের রুচি , ইচ্ছা , বাসনার অনুপানে সংঘটিত পার্থিব অপার্থিব সর্বস্ব দিয়ে বিমলাকে ভরিয়ে তুলতে চায় তখন বিমলা তাতে যতটানা অভিভূত হয় কুণ্ঠিত হয় তারচেয়ে বেশি । এমনকী এই ক্ষেত্রে একটা অতৃপ্তিও তার মনের মধ্যে জমা হত । কারণ তার ‘পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার দরকার অনেক বেশি ছিল’। এবং তার দেওয়ার মতন সম্বল হল ওই সেবা ভক্তি টুকুই । অথচ পূজারী সেবিকা বুঝতে পারত দেবতা পূজা চান না । ফলে আকাঙ্ক্ষার এইরূপ অতৃপ্তি নিয়েই উভয়কে বহন করতে করতে হয়েছিল দাম্পত্য সম্পর্কের ভার ।

সুতরাং নির্বিবাদী দাম্পত্যের যে সুখাবেশ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সূচনাতে সাধারণ ভাবে থাকে , বিমলা-নিখিলের দাম্পত্যের মধ্যে তা বাহ্যত থাকলেও অন্তর্গত ভাবে এতটুকু ছিলো না । আবার এই না থাকাটা বিমলার দিক থেকে যতখানি স্পষ্ট নিখিলের দিক থেকে ততখানি নয় । অন্তত নিখিল তার ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের মধ্যে বিমলার মতন অতৃপ্ত মনের বিচলন বড় করে সেই সময় দেখায় নি । এর কারণ বিমলাকে নিখিল নির্ভেজাল নারী রূপেই দেখে নি । স্ত্রী হিসাবে পাওয়া বিমলাকে সে মনে মনে গড়ে তুলেছে নিজস্ব আইডিয়া দিয়ে । উপন্যাসের এক জায়গাতে এই উপলব্ধ সত্যকে সে স্বীকার করেছিলো এই ভাবে ---

‘... এতদিন কেবল আমি আমারই মনের কতগুলি দামী আইডিয়া দিয়ে বিমলাকে সাজিয়েছিলুম , আমার সেই মানসী মূর্তীর সঙ্গে সংসারে বিমলার সব জায়গায় যে মিল ছিলো তা নয় , কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।’

অথচ সে প্রথম দিকে বুঝতেই পারেনি তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠা এই কৃত্রিম নারী-প্রতিমার অবস্থান । ফলে একতরফা সেবা যত্ন ভালোবাসাকে বিমলার উপরে চাপানতো হয়েছিলই , উপরন্তু নিখিলের শিক্ষা , রুচি , মানব মূল্যবোধ এইগুলিও বিমলার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য চালানো হয়েছিল পরিকল্পিত আয়োজন । যেমন - মেম রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা , তাকে জুতো-জ্যাকেট পরিধানের বন্দোবস্ত করা , সাংসারিক কূটকাচালীর মধ্যে না থাকার পরামর্শ দেওয়া, সর্বোপরী তাকে কলকাতায় এনে সেখানকার আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করবার পরিকল্পনা করা ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য । কিন্তু বিমলার মনের সত্যিকারের অবস্থান ছিল এর বাইরে । যেখানে পতি-ভক্তি , পতি-সেবা ছাড়াও ছিল চার দেয়ালের ঘরোয়া জীবন , সংস্কার , কূটকাচালি ইত্যাদি । আর ছিলো পুরুষ সমাজের কাছে পুররোপুরি আত্ম সম্পর্পণ করে নিজেকে নিজের অনুগত করে রাখবার বাসনা। এমনকী সেখানে গঞ্জনা , লাঞ্ছনা , নির্যাতন সহ্য করতেও প্রস্তুত তার মন , নিখিল যাকে বলেছেন – ' উৎকটের প্রতি ভালোবাসা' এর কোনটাই বিমলা তার সংসারে পায় নি । ফলে বাহ্যিক দাম্পত্য সুখাবেশের মধ্যে গোপন এক শূন্যতা নিয়ে চলছিল বিমলা নিখিলের দাম্পত্য।

এইরকম অবস্থাতে তাদের জীবনে এল সন্দীপ । বিমলা তাদের বর্হিবাটিতে চিকের আড়াল থেকে যাকে বিস্মিত চেতনায় এবং বিস্ফোরিত নয়নে দেখেছিল সে নিছক ব্যক্তি সন্দীপ নয় , সে বিমলার বৈবাহিক জীবনে প্রথম দেখতে পাওয়া বাইরের যুব-পুরুষ । এমন পুরুষ যাকে এক ঝলকেই দেখে বোঝা যায় যে তার রূপ এবং প্রকৃতি নিখিলের বিপরীত । তার চেহারায় চটক আছে , শরিরী ভাষায় উদ্দামতা আছে , বাক্যবাণে চটুলতা আছে । নিখিলের মধ্যে এর কোনটাই নেই । ফলে এত দিন অতৃপ্ত মনে একঘেয়ে জীবনের মধ্যেচলা বিমলার অন্তরের মধ্যে সন্দীপের প্রতি একটাটান সূক্ষ ভাবে হলেও কাজ করতে থাকে । তার উপরে স্বদেশী যুগের বাতাস তার মনের মধ্যে এসে লেগেছিল। সন্দীপ কথার পাল খাটিয়ে সেই বাতাসকে কত বেগমান করতে তুলতে পারে তা বিমলা নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল । অতএব এমন ব্যক্তিকে দূরের থেকে দেখে সুখ নেই । নিমন্ত্রণের অজুহাত নিয়ে তার কাছাকাছি হতেই হল । এর পরের করণীয় দায়ীত্ত্ব বুঝেনিল নারী মন পটিয়সী সন্দীপ । বিমলাকে কথার তোড়ে ভাসিয়ে স্বাদেশিকতার আবেগে ভুলিয়ে তাকে যে জায়গাতে নিয়ে গেল , সেখানে নিখিলের কোন স্থান নেই । এতদিন নিজেকে সমর্পণের যে আকাঙ্খা নিয়ে বিমলা নিখিলের সংসারে ঘুর পাক খাচ্ছিল এবং পুরুষের ইচ্ছা শক্তির তীব্র

পেষণে নিজেকে নিংড়ে দেবার জন্য যে নারী-প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে রেখেছিল সন্দীপ তাকে সেই পরিসর ষোল আনার উপরে আঠার আনা দিয়ে দিল । সুতরাং বীমলার জীবনধারা গেল বদলে । এতদিনের সংসার সেখানে ব্রাত্য । স্বামীর সেবা-পূজা সেখানে গুরুত্বহীন । সেখানে জায়গা নিল সন্দীপের কথার জাদুতে তৈরী স্বাদেশীকতার মায়াক্ষেত্র। বিমলা সেখানকার মক্ষীরানি ।

এখান থেকেই শুরুহল বিমলা নিখিলের দাম্পত্য সম্পর্কের বাহ্যিক টানা পোড়েন। নিখিল বিমলার এই পরিবর্তন সম্পর্কে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না । যদিও সে চাইত বিমলা নিজের জীবনসঙ্গীকে বাইরের সম্পর্কের মধ্যে যাচাইকরে সত্য রূপে পাক –

'আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকেপাও, আমি তোমাকে পাই ।
ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে ।'

কিন্তু বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখল এই পরীক্ষায় সে বেশ পিছিয়ে রয়েছে । অথচ জোর করে প্রতিযোগিতায় জেতার মতন প্রকৃতিও তার নয় । তাই শূন্য সংসারে একাকী প্রতীক্ষার নীতি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল । অন্য দিকে বিমলাও নিজের এই পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে গেছে । সতীত্বের যেভাবকে সে হৃদয় মন্দিরে রেখে দিয়েছিল , তার কার্যকলাপ সেই সতীত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে । সুতরাং তার লজ্জিত হয়ে প্রায়শ্চিত্ব করার কথা , কিন্তু সন্দীপ আর স্বাদেশীকতার মোহে সে লজ্জা কবারও অবকাশ পায় নি । তার কথায় –

'নিজেকে দেখবার আমি এতটুকু সময় পাই নি । আমার দিনগুলো
রাতগুলো আমাকে নিয়ে একটা ঘূর্ণার মতন ঘুরছিল। তাই সেদিন
লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করার এতটুকুও ফাঁক পায় নি'

- এর ফলে এই অবস্থায় তাদের দাম্পত্য পর্যবসিত হয়েছে বিস্বাদ পথ্যের মতন , যাকে সংসার নামক শরীরকে টিকিয়ে রাখবারে জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে গলাদ্ধকরণ করতে হয় ।

যদিও চন্দ্রনাথ বাবুর পরামর্শে নিখিল খানিকটা নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাম্পত্যকে স্বাভাবিক করার একটা মৃদু উদ্যোগ নিয়েছিল সন্দীপকে রংপুর চলে যাবার কথা মনে করিয়ে । সন্দীপ চলে গেলে হয়ত বিমলার মোহ কেটে যেতে পারে ,চন্দ্রনাথবাবু এমনটাই ভেবেছিলেন । হয়ত নিখিলের মনের মধ্যেও এই ভাবনা কাজ

করেছিল। কিন্তু কাজ হয় নি । উক্ত পরামর্শ সন্দীপ প্রত্যাখ্যান করবার পূর্বেই বিমলা নিজের অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল এই বিষয়েতার আপত্তি –

> *'চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম তুমি রংপুর যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।'*

বিমলা চা-দানি থেকে চা ঢালছিল , এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল, সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষ মত্র চাইলে।'

- *এর পরেও দ্বিতীয় চেষ্টা এসেছিল নিখিলের দিক থেকে। চন্দ্রনাথ বাবুর পরামর্শ মতন সে বিমলাকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসতে চেয়েছিল । কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই বিমলাকে রাজি করা যায়নি । দুই বারই বাহ্যত যে কারণটা প্রকাশ্যে এসেছিল তা হল নিখিলের তির্যক ভাষায় ' –দেশের ক্ষতি হবার আশংকা ছিলআসলে বিমলা সন্দীপের মোহে এতটাই আবদ্ধ ছিল যে । ' দাম্পত্যকে প্রাধান্য দিয়ে সন্দীপের নৈকট্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায় নি।*

তবে শুধু সন্দীপের প্রতি মোহগ্রস্থতার জন্যই নয় , নির্ভেজাল স্বাদেশিকতার প্রশ্নেও বিমলা দাম্পত্যকে আবহেলা করেছে একাধিক বার । স্বামী নিখিল যে স্বাদেশিকতায় বিশ্বাস করত , যে স্বাদেশীকতার জন্য সে নিজের অর্থ , শ্রম , সময় ব্যয় করেছিল , এমনকী নিজের জীবন ধারার মধ্যেও যে স্বাদেশিকতাকে সে ধারণ করেছিল বিমলা তাকে কোনদিন মনের দিক থেকে মানে নি , সম্মানতো দূরের কথা । ফলে বিমলার ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে স্বদেশী উপাদান নিখিলের ইচ্ছা সত্ত্বেও (জোর ছিল না) সাধারণত থাকত না । এমনকী বাইরের লোকের কাছে সে নিখিলের এইরূপ স্বদেশী কার্যকলাপ নিয়ে কুণ্ঠিতই ছিল। উপরন্তু জীবনে সন্দীপের প্রভাব আসার পরে যে স্বাদেশিকতার নেশায় বিমলা আছন্ন হয়েছিল তা তাকে নীখিলের বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড়াতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। নিখিল যখন তর্কের আসরে বোঝাতে চাইত নেশার মধ্যে স্বাদেশিকতানেই , এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় আগে , তখন সন্দীপের পক্ষ নিয়ে বিমলা প্রতিক্রিয়া দিত এভাবে ---

> *'আমার স্বামীর এইরকম কথায় আমার ভারী রাগ হত । আমি তাকে বললুম তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দিপনা , একে বল একটা নেশা , কিন্তু নেশার কি শক্তিদেয় না।'*

নিখিল নিশ্চয়ই তখন বুঝতে পারে যে আদর্শে সে তার স্ত্রীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেই আদর্শের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে তার স্ত্রী । এখানেই প্রমান হয় দুটি ভিন্ন ভাবনায় গড়া এই দাম্পত্য কত বেমানান রূপে একটি পরিবারের মধ্যে বর্তমানে আবস্থান করছে ।

আবস্থানগত এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট এবং তীব্ররূপে প্রকাশ পেয়েছিল বিলিতি দ্রব্য বর্জন বা বয়ক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে । বিমলা প্রথম থেকেই স্বদেশী হুজুগের অনুগামী ছিল । সেই হুজুগ বসতই বিলিতি দ্রব্য বর্জনকে সে সমর্থন করত । এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে তার মতান্তর পূর্বেই ছিল । তার আত্ম কথার প্রথমাংশেই তার নির্দশন আছে—

> *'এই যুগের তুফান আমার রক্তে লাগল । আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, 'বিলিতি জিনিসে তৈরী আমার সমস্ত পোষাক পুড়িয়ে ফেলব।'*
>
> *স্বামী বললেন , 'পোড়াবে কেন ? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।''*
>
> *কী বলছ 'যতদিন খুশি! ইহ জীবনে আমি কখনো – '*
>
> *'বেশতো ইহ জীবনে তুমি না হয় ব্যবহার করলে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে'।*
>
> *'কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ ?'*
>
> *'আমি বলছি গড়ে তোলার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও - অনাবশ্যক বদলে ফেলার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা খরচ করতে নেই।'*

বিমলার এই ভাবনার মধ্যেযুক্ত হয়েছিল সন্দীপের প্ররোচনা। ফলে বিলিতি বয়কটের সমর্থনটা কেবল নিজের ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রাখতে পারে নি । বিষয়টিকে তার স্বাদেশিকতার অঙ্গ করে বাইরের সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়ে নিখিলের দরবারে এসে দাঁড়িয়েছে । সঙ্গে হাতিয়ার করেছিল নারীর রমনীয়-কমনীয় রূপ। কিন্তু নিখিলের আদর্শের শক্ত দেয়ালে বিমলার সেই ইচ্ছা এবং মনোহর রূপ তীব্র ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে । স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রত্যাখ্যান বিমলাকে দারুণ ভাবে আহত করে ছিল। তবে মধ্যে বিলিতি দ্রব্য বয়কটের অনুমোদন নাপাওয়ার গ্লানি যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল স্বামীর কাছে স্ত্রীর

অনুরোধ বা আবদার পূরণ না হবার অপমান । উলটো দিকে নিখিল তার কাছে দরবার করতে আসা স্ত্রীর কেশবিন্যাসের মধ্যে পুরুষকে টলাবার সস্তা কৌশল দেখে মনের মধ্যে অনুভব করল স্ত্রী সম্পর্কে অশ্রদ্ধা, এমনকি অনীহা । এই অবস্থায় দুইজনের একঘরে মুখোমুখি হবার মতন আর পরিবেশ থাকে নি । এইভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে বয়ে বেড়াবার বিড়াম্বনা দুইজনেই প্রবল ভাবে অনুভব করেছে। তাদের একছাদের তলার বিড়ম্বিত জীবনের স্বস্তিহীন দৃশ্য ধরা রয়েছে নিখিলের আত্মকথার এই জায়গাতে ---

> *'প্রাচীরের যে ধারটিতে গ্যালারির মত করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি , সেই পুষ্পিত সোপান শ্রেনির তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে । আমার বুকের মধ্যে ধরাস করে উঠল । আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল ।*
>
> *তার পর কি করা যায় আমি ভাবছি আমি এখান থেকে ফিরে যাব কিনা । বিমলাও নিশ্চয়ই ভাছিল সে উঠে যাবে কিনা । কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু একটা মনস্থির করবার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।'*

--- নিখিল নিজের আদর্শের জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই পরিস্থিতিকে বয়ে নিয়ে যাওয়াটা সঠিক বলে মনে করে নি । ফলে বিমলাকে রুগ্ন দাম্পত্য থেকে 'ছুটি' দিয়ে তাকে বন্ধন মুক্ত করতে চেয়েছিল । কিন্তু বিমলার দিক থেকে এই 'ছুটি'র মধ্যে মুক্তি ছিল না । বরং তা ছিল এক রকমের কঠিন পরিস্থিতির বাহক । তার একটা কারণ তার একলা চলার সাধ্য নেই , কেননা তার কথায় – ' মাছের মতন আমি চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি'। একলা চলার পাঠ তাকে কখনো নিতে হয় নি । দ্বিতীয়ত, সন্দীপের দ্বার তার জন্য অবারিত এমনটা সে কোন দিনই ভাবে নি । উপরুন্তু সন্দীপকে কেন্দ্র করে পরপুরুষ সংক্রান্ত একটা মজ্জাগত সংস্কারও ভেতর থেকে তাকে সব সময় টেনে ধরত । তাই সন্দীপের হাতে তার মনের বীণয় সুর উঠলেও , একই সঙ্গে মনে হত –' আমার মরে যাওয়াই ভাল'। সর্বোপরী স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপকে দেবার পরে একটা বিপরীতমুখী টান , একটা ভিন্নম সুর মনের মধ্যে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল। সন্দীপের কথার জাদু আর তার মধ্যে কাজ করছিল

না । এই সময় বিমলার অবস্থা হয়েছিল মাঝ দরিয়ায় নাবিক হারা তরণীর মত । ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার আর কোন জায়গা ছিল না –

> *‘একবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু! যা কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা বহন করতে পারছি নে, ত্যাগও করতে পারছি নে।’*

আসলে সে প্রভু রূপে স্মরণ করেছিল তার স্বামীকেই। এটাই ছিল তার এক মাত্র জায়গা – স্বামী পদাশ্রয়। নিখিলও শেষপর্যন্ত তার অপার স্নেহ এবং মানসিক ঔদার্য দিয়ে বিমলাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল । বিমলাও এতদিনের গ্লানির বোঝা নিখিলের পায়ে সমর্পন করে ফিরে পেয়েছিল তাদের দাম্পত্য । বস্তুত ‘গঘরে বাইরে’র দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন এই খানেই ইতি পেয়েছে। কিন্তু এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে , দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরে ফিরে আসা এই দাম্পত্য এবং পূর্বের দাম্পত্য এক । তা মোটেই নয় । যে সুকুমার সুরে বিমলা – নিখিল তাদের দাম্পত্য শুরু করে ছিল এতদিনের বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের সেই সুর অনিবার্য ভাবে বদলে গেছে । বিমলা যতই খেদ করে বলুক –‘ ... আজ ন বছর আগে যে নহবৎ বেজে ছিল সে আর ইহ জন্মে কোন দিন ঘটবে না’। এটাই বাস্তব । জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা তাদের অন্তরকে বদলে দিয়েছিল অনেকটাই। সেই বদলে যাওয়া দুটি হৃদয় আবার জুড়েছে। ফলে তাদের গড়ন অন্য রকম হবেই । এটাই সম্পর্কের বাস্তবতা । তবে এটাও ঠিক, সব সম্পর্ক সব সময় এই ভাবে পুনর্গঠনের পুরস্কার পায় না । ‘নষ্টনীড়’এর ভূপতি-চারুলতা পায়নি। ‘যোগাযোগ’এর মধুসূদন-কুমুদিনী পায়নি । ভাঙা মন নিয়ে তারা বয়ে বেড়িয়েছে তাদের সংসার । রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন মানব জীবনে দু’রকম দাম্পত্যেরই নিদর্শন রয়েছে । তাই সম্পর্কের সরণি ধরে এক এক রচনায় এক এক পরিণতিতে নিয়ে নিয়েছিলেন দাম্পত্যকে।

গ্রন্থ ঋণ:

১. ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্র রচনাবলী , চতুর্থ খন্ড, বিশভারতী প্রকাশনা)

২. রবীন্দ্র নাথ : কথা সাহিত্য – বুদ্ধদেব বসু

৩. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকৃষ্ণ রায় : নাট্যকার ও থিয়েটার মালিক

নিরুপম ব্যানার্জী
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *বাংলা থিয়েটার সাহিত্যে রাজকৃষ্ণ রায় এক বিস্মৃত নাম। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম উল্লেখিত হলেও বর্তমান পাঠকের কাছে পরিচিতি নেই। তাঁর প্রতিভার দিকে তাকিয়ে অনেক সমালোচক গুরুত্ব দিতে চাননি। নাট্যকার, গৌণকবি, পত্রিকা সম্পাদক ছাড়াও থিয়েটার মালিক এবং পরিচালক হিসাবেও তাঁর বেশকিছু সংযোজন থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যকর্ম হিসাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর অনেক ভুল বিচ্যুতি দেখানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের রাজকৃষ্ণের সমসাময়িক থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেইসময়টা ছিল থিয়েটারের শৈশব অবস্থা, জমি প্রস্তুত ছিল না, তাই রাজকৃষ্ণের মত থিয়েটারওয়ালাকে নিজের সারাজীবন আত্মাহুতি দিতে হয়েছে শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্যই। এই আত্মাহুতির বিনিময়ে আজকের সাবালক থিয়েটার আমরা পেয়েছি। তাই তাঁর অবদানকে অস্বীকার করলে আমাদের অপরাধী হতে হয়। তাই কালের প্রবহমাণতায় হারিয়ে যাওয়া রাজকৃষ্ণ রায়কে এই লেখায় স্থান দেওয়া এবং নবপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই লেখায় নাট্যকার এবং থিয়েটার মালিক রাজকৃষ্ণ রায়কে অতীত বিস্মৃতি থেকে সামান্য আলো ফেলে পুনরায় দেখে ফেলা যায়।*

সাংকেতিক শব্দ : *রাজকৃষ্ণ রায়, নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়, বীণা থিয়েটার, থিয়েটার মালিক রাজকৃষ্ণ রায়।*

ভূমিকা: সাহিত্যের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ রায়কে সাধারণত গৌণ কবি ও নাট্যকারের থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়না। অথচ স্বল্প জীবন পরিসরে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় রাজকৃষ্ণ রায় বিচিত্র সৃষ্টি কর্মের অবদান রেখেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, থিয়েটার নির্মাণ-সব ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত আমাদের অভিভূত করে। উনিশ শতকের শেষ পাদে রাজকৃষ্ণ অসামান্য জনপ্রিয়তা ও মঞ্চ সাফল্য লাভ করলেও গিরিশচন্দ্র–ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় রাজকৃষ্ণ রায় কিছুটা দূরে চলে যান। রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের থেকে কিছুটা ছোট হলেও সম্পূর্ণ নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন গিরিশের ঠিক

আগেই। এই সময় যে কয়জন নাট্যকারের নাটক সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হত তাঁরা হলেন –জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, অতুলকৃষ্ণ মৈত্র, অমৃতলাল বসু, প্রমুখ। রাজকৃষ্ণ রায় এঁদের অনুসরণে পৌরাণিক নাটক, সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে প্রহসন এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকে পূর্বসূরিদের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে কিছু বিচ্যুতি থাকলেও তাঁর রচনায়, সংলাপে, ভাষায়, অঙ্ক নির্দেশ, গানের প্রয়োগ, চিন্তা চেতনায় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে রাজকৃষ্ণ রায় বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ের নিরিখে বাংলা নাট্য সাহিত্যে তাঁকে কি স্মরণ করার জায়গা নেই? নাটকের সঙ্গে থিয়েটার মালিক হিসেবে তাঁর অবদান থিয়েটারের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখেছে তা দেখানোর প্রয়োজন আছে। নাহলে কিছুদিন পর রাজকৃষ্ণ রায়ের মত প্রতিভাবান মানুষ, পাঠক ও থিয়েটারপ্রেমীদের মন থেকে বিস্মৃত হবেন।

নাট্যকার হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায় -

উনিশ শতকের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে রাজকৃষ্ণ রায় নাটক লিখেছেন। তার কিছু আগে উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ নাটকের জন্য ১৮৭৬ খ্রিঃ ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন’ বলবৎ হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন রঙ্গমঞ্চকে শায়েস্তা করতে সরকারের হাত আরও শক্ত করে। জাতীয় নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গোড়াতেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দেশে স্বাদেশিকতার উন্মেষ এবং পরাধীনতার বেদনা থেকে মুক্তির যে শুভসূচনা রঙ্গালয়ে শুরু হয়েছিল, ইংরেজ সরকার অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করার জন্য এই আইনটি প্রবর্তন করে। এই অবস্থায় থিয়েটারের স্বার্থে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য যুগের প্রবর্তন হয়েছিল রাজকৃষ্ণের হাত ধরে। তাঁর প্রথম নাটকের গ্রন্থ- ‘পতিব্রতা’ একখানি পৌরাণিক নাট্যগীতি, ১৮৭৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ; তখনও গিরিশচন্দ্রের কোন নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাজকৃষ্ণকে রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য যুগের প্রবর্তক বলা যেতে পারে। রাজকৃষ্ণ রায় নাটক লিখেছেন মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। তাই তাঁকে দর্শকের কথা চিন্তা করতে হয়েছে, ভাবতে হয়েছে অভিনয় উপযোগিতার কথা। তাঁর নাটক বিচার করলে অনেক বিচ্যুতি নির্দেশ করা সম্ভব। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাট্যকর্মকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন করেছেন – “এককথায় বলতে গেলে নাট্য রচনায় রাজকৃষ্ণের কোন প্রেরণা ছিলনা, কেবল প্রয়োজনের তাগিদে তাহাকে নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। অন্তরের প্রেরণা না থাকিলে বাহিরের তাগিদে সাধরণত যে

বস্তু তৈরি হইয়া থাকে রাজকৃষ্ণের নাটকগুলো তাহাই হইয়াছে। ইহারা অন্তরের দিক দিয়া তো নাটক হয় নাই এমনকি বাহিরের দিক দিয়াও অনেক সময় নাটকের রূপ লাভ করিতে পারে নাই।”[১]

একথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায়না। রাজকৃষ্ণের সব নাটক যেমন সার্থক হয়নি একথা যেমন সত্য কোন নাট্যকারেরই সব নাটক সার্থক হয়না একথা তেমনি ভাবে সত্য। তাছাড়া বাইরের তাগিদ থেকেও অনেক নাটক সার্থক হতে পারে আবার অন্তরের প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও সব নাটক সফল হয়না। নিদর্শন হিসেবে আমরা দেখতে পাই –‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাটক হল ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’। ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ এর মঞ্চ সাফল্য দেখে এই চরিত্রকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র ছাড়াও মহেশ চন্দ্র দত্ত দে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা নাটক ও যাত্রাপালা লিখেছিলেন। ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বিষ্ণুর বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর আক্রোশ এবং তার প্রতিফল। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এই ক্রোধের কারণ উল্লিখিত না হওয়ায় চরিত্রটিকে দর্শকের সামান্যতম সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত থাকে। রাজকৃষ্ণের ভক্তি ছিল মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী থেকে উঠে আসা ভক্তি কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের ভক্তি। পৌরাণিক নাটকের ধারায় রাজকৃষ্ণ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে মঞ্চ সফল নাটক রচনা করেছিলেন - এক্ষেত্রে সংশয়ের কোন জায়গা নেই। আবার চরিত্র নির্মাণে গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রহ্লাদমাতা কয়াধূ দ্বন্দ্বহীনা চরিত্র। রাজকৃষ্ণ সৃষ্ট হরিপ্রিয় প্রহ্লাদ এবং হরি বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর মাঝখানে এই নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাটকের দাবি মিটিয়েছে।

প্রহসন রচনায় রাজকৃষ্ণ দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত হলেও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজকৃষ্ণের প্রহসনে কোথাও কৃত্তিমতা অথবা গ্রাম্যতা নেই তা নয়, সেগুলি আসলে তাঁর সংযত রচনা বা কোথাও উৎকৃষ্ট হাস্যরসের নিদর্শন। ১৮৮৮ সালে নিজেরই ’বীণা’ থিয়েটারে অভিনীত হয় ‘কলির প্রহ্লাদ’ নাটক। চরিত্র অনুযায়ী তিনি ভাষার ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষা প্রয়োগ যথেষ্ট প্রশংসা পেতে পারে। তবে তাঁর গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার কখনো কখনো শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা থেকে শব্দ যেমন তিনি যথেচ্ছ নিয়েছেন তেমনি প্রয়োজনে তিনি রচনা করেছেন সেই ভাষাতেই সংলাপ। পৌরাণিক চরিত্রকে নিয়ে তিনি প্রহসন রচনা করেছেন। প্রহসন রচনায় পৌরাণিক চরিত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে সমকালীন

বাস্তবতায় নামিয়ে এনেছেন। যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা পরম ভক্তির আশ্রয়স্থল বিষ্ণুর শিষ্য প্রহ্লাদকে দিয়ে সমাজের কদর্যতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাঁর অভিনব কৌশলের ইঙ্গিত দেয়। অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন - "মনোমোহন বসু গীতাভিনয়রূপ যে নাট্যধারার সূত্রপাত করেন তাহারই পরিণতি হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে। রাজকৃষ্ণ রায় বহু সংখ্যক নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"[২]

থিয়েটার মালিক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায় :

কলকাতার ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। রঙ্গমঞ্চের তাগিদে তাঁকে নাটক লিখতে হয়েছে। ছাপাখানা ও পত্রিকার নামানুসারে রঙ্গমঞ্চের নাম রাখেন বীণা থিয়েটার। অভিনেতা হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল উল্লেখযোগ্য। মাহেশে ও কলকাতায় তিনি বেশ কিছু অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কলকাতার নাট্য সমাজে তিনি নিজের নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় রঙ্গমঞ্চটি খুব সুদৃশ্য ভাবে গড়ে তোলা না গেলেও পরিপাটীর অভাব ছিল না। তিনি তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করেননি অথচ তখন কলকাতার সব মঞ্চেই অভিনেত্রীরাই নারীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছে। এই সিদ্ধান্ত কতটা প্রগতিশীলতার পরিপন্থী তা আমাদের আলোচনার বিচার্য নয় কিন্তু সময়ের প্রবাহে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮৮৭, রাজকৃষ্ণের লেখা 'চন্দ্রহাস' (দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটক দিয়ে 'বীণা' থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। পর পর কয়েক রাত্রি 'চন্দ্রহাস' অভিনয়ের পর 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (৩১ ডিসেম্বর), 'দুর্গেশনন্দিনী', 'ভণ্ড দলপতি দত্ত', অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চে রাজকৃষ্ণের লেখা 'চতুরালী' নাটকের "হায়-হায়, একি শুনি ভাই / আটক পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই" এবং চন্দ্রাবলী গীতিনাট্যের – "তুমি যে কতো ভালো / চিকন কালো / বলবো কতো একটি মুখে" গান দুটি রঙ্গমঞ্চে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে পত্রপত্রিকা উৎসাহিত করলেও দর্শক সমাগম ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

কয়েকমাস থিয়েটার চালিয়েই ঋণগ্রস্ত রাজকৃষ্ণ রায় দেনা শোধের আশায় বীণা থিয়েটার ভাড়া দিয়েছিলেন 'আর্য নাট্য সামাজ', 'নিউ ন্যাশানাল থিয়েটার' কে। ২০ জুলাই ১৮৮৯ সালে রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রচেষ্টায় বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। তাঁর লেখা 'মীরাবাঈ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখানে সম্ভবত তিনি মাইক্রোফোনে নেপথ্য

সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেছিলেন। থিয়েটারের দর্শনীমূল্য তিনি খুব কম ধার্য করেছিলেন, যাতে সাধারণ দর্শক অতি সহজেই তাঁর রঙ্গালয়ে নাটকগুলি দেখতে আসতে পারে। নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করে একাদশ শক্তিশালী শিল্পী গড়ে তুলেছিলেন তিনি যাদের অন্যতম হিঙ্গুল খাঁ। রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু বেঁচে ছিল নাটককে ঘিরেই। বাধা এসেছে প্রতিটি কাজেই, বারবার দল ভেঙে গেছে, ছেড়ে গেছে অনেকেই, তবুও তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন আন্তরিক ভাবেই। নাট্যপ্রীতি তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছে এক অসামান্য ট্রাজেডি। নিঃস্ব থেকে রিক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেছেন নাটকের ঢেউয়ে। তিনি শুধু নাটক রচনা কিংবা অভিনয় নয়, নিজস্ব থিয়েটার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত রাজকৃষ্ণ রায় সেই সময় কলকাতার ৩৮ নং মেছুয়া বাজার রোডে বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই পথটি কেশব সেন স্ট্রীট নামে পরিচিত এবং বীণা থিয়েটার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জহর সিনেমায় পর্যবসিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায় অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের যেসব কুরুচিপূর্ণ দিক রয়েছে তাই দূর করতে চেয়েছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর থিয়েটারে কোনো বারাঙ্গনাকে অভিনয়ে আনতেন না। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় পুরুষ অথবা কোনো বালকদের দ্বারাই করাতেন। অনুসন্ধান পত্রিকা এই প্রেক্ষিতে এক উক্তি করেছিল যে এটাই হচ্ছে এই থিয়েটারের নূতনত্ব। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা রাজকৃষ্ণ জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি আর্য নাট্যসমাজে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক অভিনয় কালে প্রথম দশটি অভিনয় সেইরূপ টিকিট বিক্রি না হওয়ায় কতৃপক্ষ আর তাঁর কাছ থেকে নাটক নিতে রাজি হননি। সেইজন্য তিনি নিজের নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার জন্য বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। বীণা থিয়েটারের প্রথম পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের পরিচালনায় ছটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদ চরিত্র (প্রথম অভিনয় ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৭), হরধনু ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী, ঘোড়ার ডিম (প্রথম অভিনয় ১ জানুয়ারি ১৮৮৮)। রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারে অভিনেতারা পারিশ্রমিক নিতেন না কিন্তু তাঁদের খাবারের আয়োজন এবং আতিথেয়তায় ভালোরকম অর্থ ব্যয় হত। এভাবে চলতে চলতে তিনি ঋণের পাঁকে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে বেশিদিন রঙ্গমঞ্চ চালানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মাস ছয়েক পর শেষ পর্যন্ত অভিনয় স্থগিত রাখতে হয়। এই প্রেক্ষিতে ক্ষোভে ও দুঃখে কাতর হয়ে তিনি লেখেন "অনেককাল চেষ্টা করিয়া বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে

হিমালয় এভারেস্ট শৃঙ্গে তুলিয়াছিল, কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা”।[৩] ঋণের দায়ে জর্জরিত রাজকৃষ্ণ আর্য নাট্যসামাজ এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে নিজের রঙ্গমঞ্চ দেন কিছু ভাড়ার বিনিময়ে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উপেন্দ্রনাথ দাস বিলেত থেকে এসে ‘নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার’ প্রবর্তন করেন এবং অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয় করান। এই উপলক্ষে ‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ’ লেখে –“তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন”।[৪]

বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সব আদর্শ ত্যাগ করে খ্যাতিমানা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীকে নিয়ে আসেন। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের বীণা থিয়েটার উদ্বোধন হয় ‘মীরাবাঈ’ নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। ১৮৮৯ সালে ‘লীলাবতী’, ‘শ্রী কৃষ্ণের অন্নভিক্ষা’, ’সধবার একাদশী’, ‘চমৎকার’, ‘ঘোষের পো’ অত্যন্ত সাবলীল ভাবে অভিনীত হয়। থিয়েটারের টিকিট মূল্য খুব কম রেখেছিলেন যাতে সাধারণ দর্শক অতি সহজেই নাটক দেখতে পারে। দর্শন চৌধুরীর কথায়-“এইভাবে তিনিই রঙ্গালয়ে প্রথম ‘চিপ থিয়েটারে’র প্রবর্তন করেন। এছাড়াও জনপ্রিয় নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।“[৫] থিয়েটার পরিচালনার বাস্তব বুদ্ধি, ব্যাবসায়িক মাথা, পেশাদারি দক্ষতা, কিছুই তাঁর ছিল না। ছিল শুধু আবেগ ও ভালবাসা। কিন্তু তা দিয়ে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে সাফল্য আসেনা। তথাপি সর্বস্বান্ত হয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

উপসংহার- পুরনো বইয়ের হলুদ পৃষ্ঠায় আজও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর নাম কিন্তু নাট্যচর্চা বা থিয়েটার চর্চার ইতিহাসে বিস্মৃত প্রায়, তিনি রাজকৃষ্ণ রায়। শেষপর্যন্ত রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যজগতে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বীণা থিয়েটার তাঁর জীবনে অন্ধকার নিয়ে এসেছিল। এইসব কারণে তিনি আত্মহননের পথ বাছতে গিয়েছেন অনেক সময়। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে। অমৃতলাল বসু তাঁকে স্টার থিয়েটারে নাট্যকারের কাজের সুযোগ করে দেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে সব নাট্যকারই প্রয়োজনের তাগিদে নাটক রচনা করেন, রাজকৃষ্ণ তাঁর ব্যতিক্রম নন। নাটকের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, মহাকালের স্রোতে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটকে আমরা ভুলতে বসেছি, তাই তাঁর অবদান বিস্মৃতির অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছে। নাটক ও থিয়েটার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। নাটক ছাড়া থিয়েটার চলে না। তাই থিয়েটারকে বাঁচাতে ১৯ শতকের শেষদিকে নাটক রচনার যে হিড়িক চলছিল তা নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদেই। রাজকৃষ্ণ রায় যেন নাটক ও থিয়েটারের অনিবার্য সেতু। এই দুই স্রোতকে তিনি কোথাও যেন এক পরিপূর্ণ সত্তায়

মিলিয়ে দিয়েছেন। থিয়েটার প্রেমী এই মানুষটি কালের গর্ভে তলিয়ে গেছেন থিয়েটারকে বাঁচাতেই। অতীত থেকে বর্তমানে থিয়েটারের যেটুকু পথ চলা, সব চেয়ে কঠিন সময়ে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে হেঁটে গেছেন রাজকৃষ্ণ। তাঁর প্রতি অবিচার আমরা যদি না করি তাহলে তাঁর নাটকের সঙ্গে থিয়েটার মালিক সত্তার বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে।

তথ্যসূত্র :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ,প্রথম খণ্ড , ১৯৬০, পৃঃ-৫০৪

২. অজিত কুমার ঘোষ,বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০, পৃঃ-১৪১

৩. 'দুখের কথা' ,হরিদাস ঠাকুর, শ্রাবণ ১২৯৫

৪. 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮

৫. দর্শন চৌধুরী , বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, ১৯৯৫, পৃঃ-২০৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী (প্রথম থেকে ষষ্ঠ ভাগ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

২. সাহিত্যসাধক চরিতমালা – চতুর্থ খণ্ড – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-(চতুর্থ খণ্ড) –সুকুমার সেন

৫. বাঙলা নাটকের ইতিহাস – অজিতকুমার ঘোষ

৬. বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব –প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য

৭. বাংলা পৌরাণিক নাটক – রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস –দর্শন চৌধুরী

৯. একশ বছরের বাংলা থিয়েটার –শিশির বসু

১০. কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী – শুক্লা দত্ত

রবির সত্য, সত্যর রবি : রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের পারস্পরিক সম্পর্কের খতিয়ান

স্বরূপ দত্ত
স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং গড়পারের রায় পরিবার – বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে এই দুই বংশের প্রভাব অপরিসীম। বস্তুত উভয়েই ধর্মমতের দিক থেকে ছিলেন ব্রাহ্ম। আর সেই সূত্রেই এই দুই পরিবারের যে সংযোগসেতু রচনা হয়েছিল প্রায়-সমবয়সী রবীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্বে, তাই-ই উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তেছিল তাঁর পুত্র সুকুমার হয়ে পৌত্র সত্যজিতে। তাই পারিবারিকসূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিতের সম্পর্ক ছিল নিতান্তই স্নেহের, ভালোবাসার। রবীন্দ্র-সত্যজিতের এই পারস্পারিক সম্পর্কেরই এক আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত রচিত হল এখানে।*
মূলশব্দ : *বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঠাকুরবাড়ি ও রায়বাড়ি – দুই পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক – রবীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার – রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ – সত্যজিতের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব।*

মূল প্রবন্ধ :

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে তখন একটি পরিবার খ্যাতির মধ্যগগন থেকে ক্রমশ অস্তাচলের দিকে এগিয়ে চলেছে, আরেকটি পরিবারের তখন খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণের কাল আসন্ন। উনিশ থেকে বিশ শতকে এক ঝাঁক নক্ষত্রের আবির্ভাব দুই ক্ষেত্রেই। বাঙালির সমাজমননে উভয়েরই বিপুল প্রভাব তাই। – হ্যাঁ, প্রথমটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, আর দ্বিতীয়টি গড়পারের রায় পরিবার। প্রথমটির কেন্দ্রীয় পুরুষ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের ধারাকে আত্মস্থ করে বেড়ে ওঠা মানিক – বিশ্বজনের সত্যজিৎ। বৈশ্বিক ক্ষেত্রে বাঙালির দুই আইকন।

সত্যজিতের যখন জন্ম (২রা মে, ১৯২১), রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট বছর। একজন সদ্য ভূমিষ্ট, অপরজন বার্ধক্যে উপনীত। স্বভাবতই দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সময় বা সুযোগ, কোনোটাই ছিল না। তবুও পারিবারিক সম্পর্কের

খাতিরে একটা স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল উভয়ের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনায় এই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্তে একটু চোখ রাখা নিতান্তই প্রয়োজন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং গড়পারের রায় পরিবার – উভয়ই আদি এবং অকৃত্রিমভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আগত – একদল সপ্তদশ শতাব্দীতে, আর অপরদল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন এবং এরই সূত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। কারণ ঠাকুরবাড়িও ছিল ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। স্বভাবতই প্রায়-সমবয়সী রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোরের (দু'জনের বয়সের ব্যবধান মাত্র দু'বছরের) মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক নিবিড় সখ্যতা, রবীন্দ্রনাথের যাতায়াতও শুরু হয়েছিল গড়পারের বাড়িতে, যার সাক্ষ্য উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইয়ে মেলে।

রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমারকেও স্নেহ করতেন খুব, সুকুমারের দিক থেকেও তার সারা ছিল ব্যাপকভাবে। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন –

> *উপেন্দ্রকিশোর জীবিত থাকাকালে রবীন্দ্রসম্পর্কের ধারা অটুট রাখেন পুত্র সুকুমার। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় এই প্রতিভাধর মানুষটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একজন। সেকালে প্রচণ্ড রবীন্দ্রবিরোধিতার মাঝখানে মুষ্ঠিমেয় যে কয়জন যুবক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সৌরজগতের সৃষ্টি করেছিলেন, সুকুমার ছিলেন তার অন্যতম উজ্জ্বল গ্রহ। ... এঁরা একাধারে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শিষ্য ভক্ত। সুকুমার রায় আরো বিশিষ্ট এই কারণে যে তিনি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র ঘরানার লোক হয়েও তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিন্দুমাত্র নেই।*[১]

সুকুমার রবীন্দ্রসান্নিধ্য পেয়েছেন দীর্ঘদিন, শান্তিনিকেতনে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। বহু রবীন্দ্রকবিতার ইংরাজি অনুবাদ এমনকি বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্যারোডিও করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের হৈ হৈ সঙ্ঘের বৈঠকে গাওয়ার জন্য সুকুমারের 'আবোল তাবোল'-এর সেই বিখ্যাত কবিতা 'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে'তে সুর দেন স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে যান, সে সময় মুদ্রণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সুকুমার রায় সেখানেই ছিলেন। লণ্ডনবাসী সেকালের বুদ্ধিজীবি মহলে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যকে পরিচিত করানোর ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল লক্ষ করার মতো। কবির সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যেমন ভ্রমণ করেছেন এসময়, তেমনি 'দি স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো বেশ কিছু বক্তৃতাও করেন তিনি। ১৯১৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ দেশে রওনা হলে, ওই একই জাহাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সুকুমার রায়ও। রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন সময়ে সুকুমারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন নানা বিষয়ে। শান্তিনিকেতনের প্রেসের একজন লোককে তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পাঠান প্রেসের কাজ যথাযথভাবে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর, ১৯১৩ সালেই সুকুমার রায়ের বিবাহ হয় সুপ্রভা দাসের সঙ্গে। ওই বিয়েতে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত থাকার জন্য উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার দু'জনেই বিশেষ অনুরোধ করেন। শিলাইদহে জমিদারির কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রাথমিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারবেন না জানালেও, স্নেহের টান এমনই যে সব কাজ ফেলে শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠিক উপস্থিত হন বিবাহ আসরে। এর বিস্তারিত ও মননঋদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন সীতাদেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' বইয়ে।

সত্যজিতের মা, সুকুমারের স্ত্রী সুপ্রভা দেবীও রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীতচর্চার সুযোগ যেমন তাঁর হয়েছিল, তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর বিষণ্ণ হৃদয়ের আশ্রয়রূপে বারবার তিনি বেছে নিয়েছেন শান্তিনিকেতনকেই।

সুকুমারের অসুস্থাবস্থায় ভালোবাসার টানে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই দেখতে এসেছেন তাঁকে। ১৯২৩-এ অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সুকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ আবারও আসেন, গানও শোনান। তাঁর মৃত্যুর পর শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'যুবক বন্ধু'র স্মৃতিতে শান্তিনিকেতনের উপাসনামন্দিরে একটি স্মরণসভারও আয়োজন করেন।

মৃত্যুর কয়েকবছর আগে সুকুমার রায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যখন ব্রাহ্ম যুব সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক, তখন তাঁরা দু'জনেই উদ্যোগী হন রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করার। কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রমুখ কয়েকজন গোঁড়া ব্রাহ্ম বাধা দিলে দু'জনে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের কথাও বলেন। 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' শিরোনামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন সুকুমার রায়। এতটাই সহৃদয় সম্পর্ক ছিল তাঁর কবির সঙ্গে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত

সকলে তাঁদের প্রস্তাব মেনে নেন এবং রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। পারিবারিক এই যে অন্তরঙ্গতার ইতিহাস এরই প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-মানিকের প্রায় কুড়ি বছরের দেখা-সাক্ষাৎ থেকে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতার একটি রূপরেখা অঙ্কন সম্ভব।

১৯২১-এ জন্মের কয়েকমাস পরেই শিশু সত্যজিতকে নিয়ে সুকুমার-সুপ্রভা শান্তিনিকেতনে যান। অর্থাৎ জন্মের পরে পরেই সত্যজিতের রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের শুরু। কিন্তু এই স্মৃতি সদ্যজাতের পক্ষে কোনোভাবেই মনে থাকা সম্ভব নয়। এরপর ১৯২৫-এ পিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের ডাকে মা-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সত্যজিতের শান্তিনিকেতন যাত্রা। এই মাত্র চার বছর বয়সের স্মৃতিকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘যখন ছোট ছিলাম’ গ্রন্থে –

> *প্রথমবার লখ্‌নৌ যাবার পরেই মা’র সঙ্গে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন। সেবার গিয়ে মাস তিনেক ছিলাম। তখন আমার খেলার সাথী ছিল রথীন্দ্রনাথের পালিত মেয়ে পুপে। দুজনের বয়স কাছাকাছি; রোজ সকালে পুপে চলে আসত, আমাদের ছোট কুটিরে ঘণ্টাখানেক খেলা করে চলে যেত। তখন শান্তিনিকেতনে চারিদিক খোলা। আশ্রম থেকে দক্ষিণে বেরোলেই সামনে দিগন্ত অবধি ছড়ানো খোয়াই। পূর্ণিমার রাতে খোয়াইতে যেতাম আর মা গলা ছেড়ে গান গাইতেন।*[২]

এবারে তাঁর নন্দলাল বসুর সঙ্গে একান্তালাপের স্মৃতিও উল্লিখিত আছে, কিন্তু রবীন্দ্রসান্নিধ্যের কোনো প্রসঙ্গ একেবারেই নেই। সত্যজিতের রবীন্দ্রস্মৃতি সর্বপ্রথম আট বছর বয়সে। ‘যখন ছোট ছিলাম’ বা ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’-এর অন্তর্গত ‘রবীন্দ্রনাথের কাছে’ অংশে এর উল্লেখ করেছেন স্বয়ং মানিক। ‘রবীন্দ্রনাথের কাছে’ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক –

> *রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম কখন কাছ থেকে দেখি তা আমার মনে নেই। যখনকার কথা মনে আছে তখন আমার বয়স সাত বছর। মা’র সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম পৌষের মেলায়। সঙ্গে হোয়াইটওয়ে লেডল-র দোকান থেকে কেনা নতুন অটোগ্রাফের খাতা। রবিবাবু নাকি খাতা দিলেই তখন তখন কবিতা লিখে দেন, তাই ভারী শখ আমার খাতার প্রথম পাতায় তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেব।*

উত্তরায়ণে গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। জানালার দিকে পিঠ করে চেয়ারে বসে আছেন, সামনে টেবিলের উপর বই খাতা চিঠিপত্রের বিরাট অগোছাল স্তূপ। আমি তখন দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট জমাতে শুরু করেছি আর এখানে চোখের সামনে দেখছি রংবেরঙের টিকিট লাগানো বিদেশি চিঠির খামগুলো এখান-সেখান থেকে উঁকি মারছে। মনে মনে ভাবলাম আমার যদি বিদেশ থেকে এত চিঠি আসত তা হলে টিকিটের জন্য আর অন্যের কাছে হাত পাততে হত না। অটোগ্রাফের খাতাটা আমি এগিয়ে দিলেও, কবিতার ফরমাশটা এল মা'র কাছ থেকেই। আমি ছিলাম বেজায় মুখচোরা, বিশেষ করে রবিবাবুর সামনে তো বটেই। কিন্তু কই – তখন-তখন তো লিখলেন না কবিতা। তাতে যে একটু নিরাশও হয়েছিলাম সেটাও মনে আছে। বললেন, 'কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।'

গেলাম পরদিন সকালে। বুকের ভিতরে ঢিপঢিপ করছে; এত কাজের মধ্যে আমার খাতায় কবিতা লেখার কথা কি আর মনে থাকবে ? বললেন, 'লেখা হয়ে গেছে, তবে খাতাটা কোথায় রেখেছি সেটাই হল প্রশ্ন।' মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজি করে ছোট্ট বেগুনি খাতাটা বেরোল একরাশ বই আর খাতার নীচ থেকে। সেই খাতা প্রথম পাতায় খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মানে আরেকটু বড় হলে বুঝবে।' দেখলাম খাতার পাতায় লেখা একটা আট লাইনের কবিতা। সেটা সেইদিন থেকে প্রায় বারো বছর অবধি ছিল আমার একার জিনিস। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেটা পত্রিকা আর বইয়ের পাতায় ছাপা হওয়ার ফলে হয়ে গেল সকলের।[৩]

সেই বহুবিখ্যাত কবিতাটা আজ সকলেরই জানা –

বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

: *ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া*
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।।

যাইহোক, দু'টো বিষয়ে এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবো। পূর্বোদ্ধৃত অংশ থেকে মনে হয় 'এর মানে আরেকটু বড় হলে বুঝবে' – রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা স্বয়ং সত্যজিৎকেই বলেছেন। কিন্তু 'যখন ছোট ছিলাম' বইতে স্পষ্টতই বলা আছে –

মিনিট তিনেক হাতড়ানোর পরে বেরোল খাতাটা। সেটা আমায় দিয়ে মা'র দিকে চেয়ে বললেন, 'এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে।[৪]

এই দ্বন্দ্ব কেন? শৈশবস্মৃতি বলে ভুলে গেছেন ! খাতা খোঁজা প্রসঙ্গে তিন মিনিট আর দশ মিনিট-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এগুলি যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, তবুও একটা তথ্যগত ভ্রান্তি আছে এর মধ্যে, সেটা সত্যজিৎ কীভাবে করলেন ? 'রবীন্দ্রনাথের কাছে' প্রবন্ধে বলেছেন এ ঘটনা তাঁর সাত বছর বয়সের, অন্যদিকে 'যখন ছোট ছিলাম'-এ আছে দশ বছর বয়স। অরূপ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও বলেছেন তখন তাঁর বয়স সাত/আট বছর। কিন্তু সত্যজিতের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখে নামসই-এর সঙ্গে যে দিনাঙ্কের উল্লেখ করেছেন, তা ৭ই পৌষ ১৩৩৬। ইংরাজি মতে দিনটি ছিল ২২শে ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার। সত্যজিতের বয়স তখন প্রায় সাড়ে ৮ বছর। এই অসঙ্গতির সদুত্তর পাওয়া বোধহয় আজ আর সম্ভব নয়।

যাই হোক, পূর্বোল্লিখিত ঘটনার মাস দেড়েক আগের কথা। ৬ই নভেম্বর ১৯২৯, জোড়াসাঁকোর তেতালায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ এবং উমা দেবী প্ল্যানচেটে সুকুমার রায়কে আনিয়েছেন, মিডিয়াম উমা দেবীর ডান হাত। এসময় রবীন্দ্রনাথ-সুকুমারের দীর্ঘ কথোপকথনের সত্যজিৎ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাক। –

–... আচ্ছা, আমার ছেলেকে (সত্যজিৎ রায়) আপনার আশ্রমে নিতে পারেন ?

তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।

– তাঁকেও বলুন না।

তাকে পেলে আমিও খুব খুশি হব। ও কিছুকাল ধরে শান্তি খুঁজছিল।

– জানি, কর্মহীন মন বড় অশান্ত হয়। কাজ তো কতই করবার আছে। আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।

– আচ্ছা।[৫]

কবির কাছে সব শুনে সুপ্রভা দেবী পুত্র সত্যজিৎকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সত্যজিৎ নিজেই রাজি ছিলেন না। স্মৃতিচারণ করে সত্যজিৎ লিখেছেন –

> *১৯৪০ সালে কলকাতায় পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে যাই কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতে। এর কয়েক বছর আগে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম পাইকপাড়ার সিংহদের বাড়িতে একটা সাহিত্যসভায়। সভা ভাঙবার পর এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বললেন, 'আমার আশ্রমে চলে এস না কিছুদিনের জন্য।' মা'র কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নাকি অনেক দিনের ইচ্ছে আমি কিছুদিন গিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকি। আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কারণ কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকি এটা ভাবতে ভাল লাগত না। যাই হোক, শেষটায় তো গিয়ে হাজির হলাম শান্তিনিকেতনে। মাকে বলেই রেখেছিলাম যে ভাল না লাগলে চলে আসব।*[৬]

প্রথম দিন শান্তিনিকেতনে গিয়েই সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান উদীচিতে। তখন এক বিখ্যাত বাঙালি ভাস্করকে রবীন্দ্রনাথ সিটিং দিচ্ছিলেন তাঁর মূর্তি নির্মাণের জন্য। ফলে খুশি হলেও তা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি, ঘাড় না ফিরিয়েই কয়েকটা কথা বলেছিলেন বলে সত্যজিৎ উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন –

> *তারপর শিল্পী প্রস্থান করলে পর হাঁফ ছেড়ে মৃদু স্বরে বললেন, 'জ্বালাতন।' সেইসঙ্গে বিলেতের বিখ্যাত ভাস্কর এপস্টাইন পাথরে তাঁর মূর্তি গড়ার সময় কেমন অঙ্গভঙ্গি আর হাঁসফাঁস করতেন সেটাও একটু অভিনয় করিয়ে দেখিয়ে দিলেন।*[৭]

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার অনেক সুযোগ থাকলেও সত্যজিৎ সেই অর্থে খুব বেশি সাক্ষাৎ করেননি, তার প্রধান কারণ তাঁর আজন্মের মুখচোরা ভাব। তাই সেখানে পড়ার সময়ে সত্যজিতের প্রথম গল্প

'Abstraction' প্রকাশিত হলেও তা তিনি দেখাতে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি, কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা সংকোচে।

এর কিছু দিন পরেই রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জন্মদিন, সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ। সবাই জানি, তারপর আর রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন বাঁচেননি। যে দিন শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন, 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত তার স্মৃতিচারণে সত্যজিৎ লিখেছেন –

> *... রবীন্দ্রনাথ যেদিন (শান্তিনিকেতন থেকে) চলে যাচ্ছেন সেটা খুব টাচিং। অনেকে বললো – আমরা অতো কাছে যেতে পারিনি – অনেকে বললো, ওঁর চোখে জল দেখলাম। কেউ কখনো ওঁর চোখে জল দেখেনি।*[৮]

এরপর কবির অসুস্থতা বৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে যখন সত্যজিৎ আর দিনকর কৌশিক শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসেন, হাওড়া স্টেশনে নেমে খবর পান কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হেঁটে জোড়াসাঁকো এসে দেখেন সেখানে জনসমুদ্র, শান্তিনিকেতনের এক শিক্ষকের সহায়তায় ঠাকুরবাড়ির ভিতরে ঢোকেন। তারপর সাক্ষী থাকেন শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে কবির নশ্বর দেহের নিমতলা মহাশ্মশানে যাত্রার দৃশ্যের, যেখানে কবির চুল-দাড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার দৃশ্য দারুণভাবে ব্যথিতও করে তাঁকে। যে দৃশ্য দিয়েই শুরু ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্র।

একথা ঠিক, উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, সত্যজিতের সঙ্গে তার নামমাত্রও গড়ে ওঠে নি। বয়সের বিরাট ব্যবধান ছাড়াও তার প্রধান কারণ ছিল বোধহয় সত্যজিতের জন্ম আর রবীন্দ্রনাথের চিরবিদায়ের মধ্যে মাত্র কুড়ি বছরের অন্তর। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুলগ্নে সত্যজিৎ তখনও সেই অর্থে পরিণত নন। ফলে সান্নিধ্যের সুযোগ তেমন ছিল না, বা যেটুকুও ছিল তাও সেভাবে সত্যজিৎ কাজে লাগাতে পারেননি। তবুও আজীবন গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। তার অদ্বিতীয় সাক্ষ্য সত্যজিতের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের বক্তব্যগুলি, তাঁর 'তিন কন্যা' (১৯৬১), 'চারুলতা' (১৯৬৪), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪) – রবীন্দ্রকাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রগুলি। যেকোনো নিষ্ঠ দর্শকমাত্রেই বুঝতে পারেন, এগুলি কেবল সত্যজিতের রবীন্দ্র-অনুসরণের ফসল নয়, বরং তাঁকে আত্মীকরণের সম্পদ।

তথ্যসূত্র:

১. অমিতাভ চৌধুরী : 'সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ', 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ', ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ৫-৬
২. সত্যজিৎ রায় : 'যখন ছোট ছিলাম', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ৪৬
৩. সত্যজিৎ রায় : 'রবীন্দ্রনাথের কাছে', 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩০৭
৪. সত্যজিৎ রায় : 'যখন ছোট ছিলাম', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ৩৬
৫. অমিতাভ চৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা', 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ', ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ৪৯
৬. সত্যজিৎ রায় : 'রবীন্দ্রনাথের কাছে', 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩০৮
৭. তদেব, পৃ. ৩০৮
৮. অরূপ মুখোপাধ্যায় : 'সত্যজিৎ রায় : বিশ্বজয়ী প্রতিভার বর্ণময় জীবন', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৬১

গ্রন্থপঞ্জী:

১. সত্যজিৎ রায় : 'যখন ছোট ছিলাম', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৪২১
২. সত্যজিৎ রায় : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩. সন্দীপ রায় (সম্পাদিত): 'সত্যজিৎ রায় : সাক্ষাৎকার সমগ্র', পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২০
৪. মঞ্জিল সেন : 'অদ্বিতীয় সত্যজিৎ', সম্পাদনা ও টীকা : সমন্ত্যক চট্টোপাধ্যায়, বুক ফার্ম, কলকাতা, মে ২০২০
৫. অরূপ মুখোপাধ্যায় : 'সত্যজিৎ রায় : বিশ্বজয়ী প্রতিভার বর্ণময় জীবন', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৮
৬. অমিতাভ চৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা', 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ', ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
৭. অমিতাভ চৌধুরী : 'সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ', 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ', ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২২

বাংলায় বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নরহরি সরকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের সম্পর্ক

পুরঞ্জয় তন্তুবায়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

১

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সম্প্রদায়গত বিভাজন রেখা ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল। তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের স্বতন্ত্রতায় ধর্ম-আচরণ প্রণালীর বিভিন্নতা আভাসে ইঙ্গিতে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমভক্তির স্রোতোধারাকে বহুমুখী করে তুলেছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারাকে ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ প্রেমভক্তি ও শাস্ত্রসম্মত বিধিপর্যায়কে নিজ নিজ মতবাদে সর্বোচ্চ মান্যতা দিয়েও বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্যে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং দ্বান্দ্বিক পটভূমি যেন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থকে সামনে রেখে চারটি উপসম্প্রদায়ের ধারণা দিয়েছেন। সেগুলি হল --- গৌরনাগরবাদীগণ, অদ্বৈত-সম্প্রদায়, গদাধর-সম্প্রদায় এবং নিত্যানন্দবিদ্বেষী সম্প্রদায়।[১] প্রসঙ্গত,নিত্যানন্দের প্রতি যে কিছু বৈষ্ণবের বিদ্বেষ জন্মেছিল এবং তার সম্ভাব্য কিছু কারণও ছিল তা জীবনীগ্রন্থগুলিতে আছে। কিন্তু এরূপ আলাদা কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। সে হলেও বিমানবিহারী মজুমদার এখানে নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ করেননি। নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করে তার বিরোধী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা অবান্তর। রমাকান্ত চক্রবর্তীও বেশ কিছু দল-উপদলের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ---- "বহুকাল পর্যন্ত চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের কোনও সুস্পষ্ট সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রচারিত হয়নি। স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়।"[২] তিনি যে দল-উপদলের কথা জানিয়েছেন সেগুলি হল ---- ১. অদ্বৈত আচার্যের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী ২.নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী ৩.শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরবাদী বৈষ্ণবগোষ্ঠী ৪.গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী 'গদাই-গৌরাঙ্গ' বৈষ্ণবগোষ্ঠী ৫.চৈতন্যপূজক 'গৌরপারম্যবাদী' সম্প্রদায় ৬.বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভক্তগোষ্ঠী ৭.সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

অতএব বাংলায় মতাদর্শের ভিন্নতা ও প্রাচুর্য চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব-সংস্কৃতিকে কোন অভাবনীয় সম্ভাবনার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়। গুরুসরণীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন ধারায় বৈষ্ণবধর্মের আবহও অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চৈতন্যের অন্যতম পরিকর অদ্বৈত আচার্য্যের সম্প্রদায়ও দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় তার উল্লেখ করেছেন ----

" প্রথমে ত একমত আচার্য্যের গণ।

পরে দুই মত হইল দৈবের কারণ।।

কেহ ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র।

স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।।" [৩]

এই যে নানা দল-উপদল,তার সাথে সহজিয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠীর প্রভাববৃদ্ধি বৈষ্ণবধর্মের মূলধারাকে অবদমিত ও শিথিল করেছিল অনেকটাই। ফলত,চৈতন্য-পরবর্তীকালে এমন একজন সংগঠকের প্রয়োজন ছিল, যার নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্ম পুনরায় একটা পরিশীলিত রূপ লাভ করবে এবং যিনি পরিমার্জন ও সংস্করণের দ্বারা নতুন উদ্যমে বৈষ্ণবধর্মের গৌরবান্বিত অধ্যায়কে নবরূপ দান করবেন। যাঁরা এটা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য --- শ্রীনিবাস আচার্য,নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ। এঁদের মধ্যে শ্রীনিবাসই হলেন সকলের প্রধান। শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবধর্মকেন্দ্রিক নানা কর্মপন্থায় নরহরি সরকারের অবদান ছিল। দুজনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২

ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখে মনে হয় শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবীয় আদর্শের সম্ভাবনাকে চৈতন্যের অন্যতম পরিকর শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিলেন। সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে নরহরির অবস্থানটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামে নারায়ণ দাসের তিনপুত্রের মধ্যে নরহরি ছিলেন একজন (বাকি দুই পুত্র মুকুন্দ ও মাধব)। জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। রাজসভায় এই বৈদ্যবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ভাই মুকুন্দ বৈদ্যশাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু নরহরির ক্ষেত্রে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হল তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও তাঁর নবদ্বীপলীলার সঙ্গী। সম্ভবত তিনি চৈতন্যদেবের চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়ো ছিলেন। পদকর্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বেশকিছু পদ নানা পদাবলী-সংকলনে সংকলিত হয়েছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তিনি 'মধুমতী'র অবতার বলে উল্লিখিত। পুরীর রথযাত্রায়

নরহরির নেতৃত্বে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় গিয়েছিলেন। গৌড়ের অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণবরাও সেখানে মিলিত হতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কীর্তনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব কীভাবে এক-এক সম্প্রদায়কে সাজিয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে ----

" খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।।....
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।।"[৪]

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ছাড়া অন্যান্য চৈতন্যজীবনীকাব্যে নরহরির বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও, যেটুকু উল্লেখ রয়েছে তাতে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

চৈতন্যের জীবিতাবস্থাতেই বিশেষ কয়েকজন পার্ষদের মধ্যস্থতায় গৌরপারম্যবাদের তাত্ত্বিক প্রচার শুরু হয়। নরহরি এই পারম্যবাদের তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন,গ্রহণও করেছিলেন। গৌরাঙ্গই পরম ও গৌরাঙ্গই চরম ---- অর্থাৎ চৈতন্যদেবকেই পরমতত্ত্ব রূপে গ্রহণের যে ইচ্ছা,তা-ই গৌরপারম্যবাদ। প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্বের উদ্ভাবক কে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। খুব স্পষ্টভাবে যে এই তত্ত্বের প্রচার হয়েছিল তা মনে হয় না। শিবানন্দ, নরহরি, মুরারি গুপ্ত,প্রবোধানন্দ,বাসু ঘোষ,গোবিন্দ ঘোষ,মাধব ঘোষ প্রমুখ তৎকালে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক যে পদ রচনা করেন তাতে সে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকে পারম্যবাদের উদ্ভাবক হিসেবে শিবানন্দকে মনে করেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপূর তাঁর অবতারনির্ণয় পুস্তক 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শিবানন্দকে ব্রজের 'বীরাদূতী'র অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। বীরাদূতী,যিনি গোপীদেরকে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে যেতেন। তাহলে কি চৈতন্যের গৌড়লীলায় শিবানন্দের কাজ বীরাদূতীর অনুরূপ ছিল? নাগরভাবের সাধনার প্রথম নির্দেশক কি শিবানন্দই? হতে পারে। তবে এ কেবলই অনুমানসাপেক্ষ। শিবানন্দ রচিত পারম্যবাদের একটি পদ উল্লেখ করা হল ----

" জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্যগুণ গাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি।।
গৌরগত প্রাণ যাহে কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে।।

গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর।।
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌরগদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে।।"[৫]

গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যের এহেন অন্তরঙ্গতা কাল্পনিক নয়। তিনি নিজে 'রাধার অবতার' বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই নরহরি ও অন্যান্য পারম্যবাদীদের সাথে গদাধরের গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কারণ মনে হয় গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী রূপের চেয়ে 'চাঁচর-চিকুরধারী' রূপই ছিল তাঁদের কাছে অধিক আকর্ষণের। উল্লিখিত পদটি পারম্যবাদের একটি উদাহরণ। "ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে"--- কিন্তু গদাধর পণ্ডিত কৃষ্ণসেবা ছেড়েছিলেন বলে মনে হয় না। তবে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের ওপরে স্থান দেওয়ার যে অভিপ্রায় তার ইঙ্গিত হিসেবে ধরা যেতে পারে।

উপরে উল্লিখিত অন্যান্য পদকর্তার পদেও এইধরনের পারম্যবাদী তত্ত্ব প্রকাশিত। নরহরি সরকারের ভণিতায় এরকম একটি পদ আছে। ----

"গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে।।
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার।।
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভবসাগরে এমন দয়াল
না দেখি যে একজন।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।

নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে।।[৬]

এই পদটি গৌরপারম্যবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ উল্লেখ আছে যে রায় রামানন্দ জগন্নাথ দর্শনের পূর্বেই নীলাচলে চৈতন্যের দর্শন করেছিলেন এবং তারজন্য চৈতন্যের কাছে তিরস্কৃতও হয়েছিলেন ----

" প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম করিলে।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলে।।
রায় কহে চরণ রথ হৃদয়-সারথী।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী।।[৭]

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে পারম্যবাদীদের কাছে গৌরাঙ্গের স্থান ক্রমশ কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নরহরি সরকার ও তাঁর সম্প্রদায় পারম্যবাদকে ভীষণভাবে সমর্থন করেছিলেন।

গৌরনাগরীভাবের সাধনা এই পারম্যবাদের গর্ভেই নিহিত ছিল। আসলে গৌরনাগরীভাব গৌরপারম্যবাদেরই একটি বৈশিষ্ট্য। অনেকেই এর উদ্ভাবক নরহরি সরকারকে মনে করেন। কিন্তু নরহরি কেবল নাগরীভাবকে অবলম্বন করে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায় নাগরীভাবকেই চৈতন্য-আরাধনার মূল উপাদান হিসেবে নিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গকে নাগর হিসেবে কল্পনা করে এই গোষ্ঠীর সাধনপ্রণালী চলত। নরহরি যে অন্যান্য বৈষ্ণবগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তার মূলে ছিল এই নাগরীভাবের সাধনা। গৌড়ের বিশেষ বৈষ্ণবসমাজ তাঁর এই সাধনপ্রণালীর সঙ্গে একমত ছিলেন না। 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস নাগরীবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নরহরির কোনো উল্লেখ করেননি বলেই মনে করা হয়। সেখানে উল্লেখ আছে ----

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণ না করিলা বিদিত সংসারে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে।।[৮]

খড়দহ ও শান্তিপুরের সম্প্রদায়ও নরহরির নাগরীভাবনাকে সমর্থন করতেন না।

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নরহরির প্রতি লোচনের আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে। লোচন নরহরির শিষ্য এবং নাগরীভাবের একজন বড়ো সমর্থক ছিলেন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আছে ---

" আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
গোরাগুণ মাধুরীতে বড়ো লাগে সাধ।।"[৯]

রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়'-এ লোচনের সঙ্গে নরহরির সম্পর্কের প্রগাঢ়তার আভাস আছে। এছাড়াও সেখানে নরহরি ও রঘুনন্দনের শাখাবর্ণনায় শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের বিস্তার কিছুটা অনুমান করা যায়। নরহরি ও তাঁর সম্প্রদায় সমর্থিত ও প্রচারিত নাগরীভাবের যে পদাবলী পাওয়া যাচ্ছে তাতে বেশ কিছু পদে আদিরসের মিশেল রয়েছে। তান্ত্রিকতার ছোঁয়া প্রকট বলে ইতিপূর্বে গবেষকগণ তা প্রমাণ করার চেষ্টাও করেছেন। রমাকান্ত চক্রবর্তী শ্রীখণ্ডের শিষ্যের সাধনসঙ্গিনী গ্রহণের সংবাদ দিয়েছেন। সেখানে রঘুনন্দনের শিষ্য কবি রায়শেখর তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দুর্গাদাসী নামে সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করেন।[১০]

নরহরি নাগরীভাবকে খুব বেশি যে প্রচার করতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না। শ্রীখণ্ড তার প্রধানকেন্দ্র হলেও নবদ্বীপেও বেশ কিছুজন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে তা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। আবার নরহরির সম্প্রদায়ের বাইরেও অনেকে নাগরীভাবনাকে সমর্থন করতেন। বাসু ঘোষ,গোবিন্দ ঘোষ,মাধব ঘোষ এরা নরহরির সম্প্রদায়ের ছিলেন না,কিন্তু তাঁরা নাগরীভাবের সাধক ছিলেন বলে মনে হয়। সহজিয়া মতাদর্শের গাঢ় প্রভাব ছিল বলে নাগরীভাবনার বিরুদ্ধাচারণও হয়েছিল খুব বেশি। কিন্তু তা হলেও চৈতন্যের প্রিয়-পরিকর ছিলেন বলে নরহরির অবস্থানকে সহজে কেউ সংকুচিত করতে পারেননি। কিন্তু সংকুচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়'-এ আছে ----

"নরহরিকে কহে লোকে নরহরি-চৈতন্য।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কহে তারে অন্য।।"[১১]

বোঝা যাচ্ছে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের ভালোরকম আনুগত্য ছিল নরহরির প্রতি। নরহরিকে চৈতন্যের পাশেই স্থান দেওয়ার অথবা চৈতন্যের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়েছিল। অন্যদিকে গৌড়ীয় পরিমণ্ডলে তাঁর বিরোধিতাও হয়েছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবনের পুরোধা পুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিশেষ মূল্যায়নের প্রয়োজন মনে করেছিলেন পারম্যবাদীগোষ্ঠী। যে কারণে চৈতন্যতত্ত্বের একটা

পরিকাঠামোর আবশ্যকতা ছিল। অতএব যাঁরা চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা থেকে শুরু করে অন্যান্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের একটা গোষ্ঠী চৈতন্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চৈতন্যতত্ত্বের ধারণাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। নরহরির পারম্যবাদ সমর্থনের এটাও একটা কারণ বলে ধরতে অসুবিধা হয় না। অচিন্ত্য বিশ্বাসের মতামতকে এখানে সমর্থন করা যায় ---- "তিনিই(নরহরি সরকার) সসর্বপ্রথম চৈতন্যের জীবনের ইতিহাস-সম্মত সন্ধানের চেষ্টা ও বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।"[১২] পদাবলীতে তার প্রকাশ কিছুটা হয়েছিল। নাগরীভাবের সাধনায় গদাধরের প্রকৃতি ভাব নরহরিকে সহায়তা করেছিল। গদাধরকে বিষ্ণুশক্তির আধার বলে তিনি ধরেছিলেন এবং গৌর-গদাই যুগল উপাসনার শুরুও করেছিলেন। নরহরিকে বিরোধিতার মূলে এই কারণটিও ছিল। কেননা প্রায় কাছাকাছি সময়ে গৌর-নিতাই পূজার প্রচলন হয় নিত্যানন্দ অনুরাগীদের উদ্যোগে। ফলে একটা দ্বান্দ্বিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল সন্দেহ নেই। গদাধরের সঙ্গে নরহরির অন্তরঙ্গতা ছিল। গদাধরের প্রকৃতিভাবের স্বীকৃতি চৈতন্যতত্ত্বকে সম্ভবত পরিপুষ্ট করেছিল। নরহরি রচিত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্'-এ গদাধরের অবস্থান বিশেষভাবে আলোচিত। যেমন সেখানে আছে ---- "শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্তু,যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সর্বাবতার প্রকাশভূমিস্তথা সকল বৈভবময় স্ত্রীসমূহ প্রধানভূত"।[১৩] অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য যেমন সর্বাবতারের প্রকাশভূমি,তেমনি সকল বৈভবময় স্ত্রীসমূহের প্রধানাভূত হলেন পণ্ডিত গদাধর। নাগরীভাবের উপাসনায় গদাধরের প্রকৃতিভাব এক্ষেত্রে নরহরির কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এছাড়া শাস্ত্রীয় রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষাদানের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে দীক্ষাদানের প্রচলন নরহরির এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে এ নিয়ে শাস্ত্রসম্মত তর্কবিতর্ক চরমে উঠেছিল।[১৪]

শ্রীখণ্ডে নরহরির ভাবধারার উপযুক্ত সহযোগী ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন। নরহরি-পরবর্তী শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন প্রধান। নাগরীভাবের সাধনায় বামাচারী তান্ত্রিকতার ছোঁয়া থাকা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু তবুও চৈতন্যপূজনের গুরুত্বই নরহরি ও তাঁর সম্প্রদায়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। চৈতন্যের পরবর্তী সময়ে উপাসনাগত বৈষম্য বৈষ্ণবধর্মকে ক্রমশ সংকুচিত করেছিল। শ্রীনিবাস সেই সময় নরহরির স্নেহধন্য হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের নবমূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

৩

এতদূর পর্যন্ত নরহরি সরকারের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে মতাদর্শগত অবস্থানের আলোচনার চেষ্টা করা হল। শ্রীনিবাস আচার্য্য নরহরি সরকারের জীবনের দ্বিতীয় ভাগের

বৈষ্ণব ধর্মাচরণের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে শ্রীনিবাস বৈষ্ণবধর্মের সংস্করণে যে স্বতন্ত্র পন্থা নির্ণয় করে এগিয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব-উপাসনা পদ্ধতিকে যে পরিমার্জিত রূপদানে সফল হয়েছিলেন এবার সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রীনিবাসের দুই শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ও কর্ণপুর কবিরাজের রচনায় এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেহেতু তাঁরা শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন,তাই তাঁদের রচনা অধিক নির্ভরযোগ্য। এছাড়া মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী',যদুনন্দন দাসের 'কর্ণামৃত', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে শ্রীনিবাস সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। যদিও তা সবই যে প্রামাণিক এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

ভাগীরথী তীরবর্তী চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে এক বিপ্র বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী হলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গাধর চৈতন্যের চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড়ো ছিলেন। চৈতন্যের প্রতি অনুরাগের প্রগাঢ়তার জন্য পরবর্তীকালে তিনি 'চৈতন্যদাস' নামেই পরিচিত হন। কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তে চৈতন্যশাখায় অবশ্য এনার নাম নেই। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তথা চৈতন্যদাসের পুত্রই হলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের চৈতন্য-সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে এটা বোঝা যায় যে জন্ম থেকেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারে বৈষ্ণবসুলভ মনোভাবের আবহাওয়া ছিল। পিতা গঙ্গাধর প্রেমভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন। কিন্তু তা হলেও গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবসুলভ মনোভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেন না। কারণ বৈষ্ণববিরোধীবাদীদের ভয় ছিল। এমন কথা ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে ---- গৌরাঙ্গের প্রভাব যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তাঁর গুণগানে মুগ্ধ হয়ে গঙ্গাধর নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভাবেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের জন্য তা হয়ে ওঠে না ----

"দিনে দিনে প্রভুলীলা শুনি চমৎকার।
সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার।।
দুষ্টসঙ্গ মতে তথা যাইতে না পারি।
তা সবার অহংকার সহিতেও নারি।।" [১৫]

অবশ্য এমন আশঙ্কা অসম্ভব নয়। কারণ তখন সবে গৌরাঙ্গের নেতৃত্বে গৌড়ের বৈষ্ণবধর্ম পুনর্গঠনের প্রথম পর্যায়।

মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও পিতা গঙ্গাধর শ্রীনিবাসের জন্মের আগে নীলাচলে গিয়েছিলেন চৈতন্যের সাথে দেখা করতে। তখন চৈতন্যের নীলাচলে বসবাসের শুরুর দিক। চৈতন্যসহ অন্যান্য পরিকরদের সাথে তাঁরা সাক্ষাত করেছেন। অতএব চৈতন্যের ভক্তিধর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল এই দম্পতির মনে। শ্রীনিবাসের বাল্যকালে পিতা-মাতা উভয়ই শ্রীনিবাসকে চৈতন্যসহ তাঁর অন্যান্য পরিকরদের নামের সাথে পরিচয় করিয়ে তাঁদের মহিমা বর্ণনা করতেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত, যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের কার্যক্রমে কাজে লেগেছিল। টোলে বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীনিবাস নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হন। সাথে বৈষ্ণবসুলভ আচরণে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর শিক্ষাগুরুর নাম ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি। বিদ্যার্জনে পারদর্শীতার কথা অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ করা হয়েছে ----

“পৌগণ্ডে আরম্ভে বিদ্যা কথোক দিবসে।
ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারেতে প্রবেশে।।
অতি অনির্বচনীয় মেধার মাধুরী।
সকৃৎ পড়িলে মাত্র কণ্ঠগত করি।।” [১৬]

ভক্তিরত্নাকরে একথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

চৈতন্যদেব ও অন্যান্য পরিকরদের সাথে সাথে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সক্রিয়তা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও শ্রীনিবাস জেনেছিলেন তাঁর পিতা-মাতার কাছেই। পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হলে মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে তিনি মাতুলালয় যাজিগ্রামে এসে বসবাস করেন এবং সেখানে আরও নানা ভক্তগোষ্ঠীর কাছে চৈতন্যলীলা শুনে চৈতন্যের দর্শনলাভে অস্থির হয়ে ওঠেন। পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য যেহেতু চৈতন্যের প্রিয় পাত্র ছিলেন, তাই চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মাচরণ সম্পর্কে তাঁর কৌতুহল থাকবে এটা স্বাভাবিক। নীলাচলে যখন যান তখন চৈতন্য লীলা সংগোপন করেছেন। ফলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি শ্রীনিবাসের। নীলাচলে পণ্ডিত গদাধরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে ভাগবত অধ্যয়নের ইচ্ছাও হয়েছিল। কর্ণপূর কবিরাজের 'গুণলেশসূচকম্' গ্রন্থে শ্রীনিবাসের গদাধরের নিকট ভাগবত অধ্যয়নের ইচ্ছার কথা আছে।[১৭] কিন্তু একমাত্র গদাধরের কাছেই কেন তাঁর ভাগবত অধ্যয়নের এই ইচ্ছা জেগেছিল? শ্রীনিবাস যে সময় নীলাচলে চৈতন্যসমীপে যাবার জন্য প্রস্তুত হন,সেটা চৈতন্য-তিরোধানের সামান্য

আগে। তারও আগে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,নরহরির নেতৃত্বে সম্প্রদায়ের বিভাজন প্রায় হয়ে গেছে। দলাদলি শুরু এবং তা ক্রমশ চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মূলধারাকে ব্যহত করছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত সংঘাতের ফলে শ্রীনিবাসের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জীমূতবাহন রায়ের মতামতটি এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন ---- "চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ শ্রীনিবাসকে আরও বিভ্রান্ত করে থাকবে যার জন্য তিনি চৈতন্যদেবের মনোমত ভাগবত ব্যাখ্যা শোনার জন্য গদাধর পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হলেন।"[১৮] প্রসঙ্গত গদাধর রাধাভাবের সাধক এবং চৈতন্যের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। সুতরাং গদাধরের কাছে ভাগবত ব্যাখ্যা শোনার ইচ্ছায় গভীর কারণ থাকতে পারে। কিন্তু শ্রীনিবাসের সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। কেন পূর্ণ হয়নি তার কারণ অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। ভাগবতের পুথিটি মহাপ্রভু যখন পড়তেন তখন প্রেমাবেশে তাঁর অশ্রুপাতের ফলে পুথির অনেক অক্ষর লুপ্ত হয়ে পুথিটি সামগ্রিক পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। গদাধরের কাছে মহাপ্রভু পঠিত ঐ একমাত্র পুথিটি ছিল। গদাধর তাই শ্রীনিবাসকে ভাগবত পড়ে শোনাতে পারেননি ----

"ডোর খুলে দেখিলেন পত্রে পত্রে যুক্ত।
মধ্যে মধ্যে দেখয়ে অক্ষর সব লুপ্ত।।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে পুস্তক দেখে।
নিরন্তর অশ্রু পুঁথি উপরি বরিখে।।
তাহাতে লাগিল পত্র মুছিল লিখন।
পণ্ডিত কহয়ে দেখ করিয়া চিন্তন।।" [১৯]

ভক্তিরত্নাকরেও একই কথার পুনরাবৃত্তি আছে। ভাগবতের ব্যাখ্যা শোনা না হলেও মনে হয় এইসময় গদাধর শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ত্বগত কিছুদিক জানিয়ে থাকবেন। ফলে বৃন্দাবনীভাষ্যের বিশেষ কিছু ধারণা এখানে তাঁর হয়ে থাকলেও থাকতে পারে।

গদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাসকে গৌড়ে ফিরে গিয়ে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দেন। গদাধর দাস,নরহরি সরকার প্রমুখ শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাবার নির্দেশ দেন। সম্ভবত তারা শ্রীনিবাসের সাংগঠনিক প্রতিভাকে বুঝতে পেরেছিলেন। বৃন্দাবন গমনের পথে তিনি চৈতন্যপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, অদ্বৈতপত্নী সীতা ও নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা এবং তৎপুত্র বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বীরলোক কৃষ্ণনগরে অভিরাম

ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং অভিরাম শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবীয় বৈরাগ্য পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। অভিরাম ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের কথা কর্ণপুর কবিরাজের 'গুণলেশসূচকম্'-এ আছে, কিন্তু বাকিদের প্রসঙ্গ নেই। বৃন্দাবনে যখন পৌঁছান তখন রূপ-সনাতন অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাসের জীবনে বৃন্দাবনপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বৈষ্ণবধর্মের বৃন্দাবনীভাষ্য সম্পর্কে এখানেই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার অধিকারী হন। যা পরবর্তীকালে গৌড়ের বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে সংগঠিত করার কাজে ভীষণ প্রয়োজন হয়েছিল। গবেষক জীমূতবাহন রায় তাঁর বৃন্দাবনপর্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমভাগে তাঁর বৃন্দাবন প্রবেশ, দ্বিতীয়ভাগে সেখানকার তৎকালীন বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার, দীক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন ও আচার্য্য উপাধি লাভ এবং তৃতীয়ভাগে তাঁর গৌড় প্রত্যাবর্তন।[২০] এই বিভাগ যথার্থ বলেই মনে করি। বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হলে শ্রীনিবাসের সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য জীব গোস্বামী তাঁকে 'আচার্য্য' উপাধি দেন। এরপর গোপালভট্টের নিকট শ্রীনিবাসের দীক্ষাগ্রহণ সুসম্পন্ন হয়। এখানে জীব ও গোপালভট্ট ছাড়াও যাঁদের সঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন। বৃন্দাবনে বিগ্রহসেবা, অধ্যয়ন ইত্যাদিতে তখন তাঁদের গভীর প্রভাব ছিল। শ্রীনিবাস এখানে আরও এমন দুজনকে সঙ্গে পেলেন যাঁরা পরবর্তীকালে গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম একত্রিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই দু'জন হলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে এইসময় শ্রীনিবাসের প্রগাঢ় ধারণা হয়েছিল।

বৃন্দাবনপর্বে শ্রীনিবাসকে শ্রীজীব গোস্বামীই সম্ভবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব শিখিয়েছিলেন। বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের দলাদলির সংবাদ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা জানতেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রবেশ করলে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবসুলভ আচরণে গোস্বামীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর বৃন্দাবনের পুথিসমূহ গৌড়ে পাঠিয়ে তার প্রচারকার্যের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মের নতুন রূপরেখা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। কর্ণপুর কবিরাজের রচনায় জীবগোস্বামীই এই পরিকল্পনা করেন বলে উল্লেখ আছে। পরে তা গোপালভট্ট, লোকনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমর্থন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ের দলাদলির কথা জানতেন। তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তে এই প্রসঙ্গে আভাস-ইঙ্গিত রয়েছে। যাইহোক, গৌড়ে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারের এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের গুরুদায়িত্ব পেলেন শ্রীনিবাস। সঙ্গে ছিলেন দু'জন উপযুক্ত ব্যক্তি --- নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। এই দু'জন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীনিবাস গাড়িভর্তি পুথি নিয়ে পৌঁছালেন

গৌড়ে। সম্ভবত এতে রূপ-সনাতনের রচনাবলীও ছিল। বনবিষ্ণুপুরের নিকট ডাকাতরা গাড়িতে থাকা গ্রন্থসামগ্রী লুঠ করে। শ্রীনিবাস মল্লভূমের রাজা বীরহাম্বিরের দরবারে সেইসব গ্রন্থ উদ্ধার করেন। বীরহাম্বির শ্রীনিবাসের অনুগত হন এবং তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মল্লভূমে শ্রীনিবাসের খ্যাতি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং রীতিমতো বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠও শুরু হয়। মল্লভূমে বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্য্য (ইনি মল্লরাজদরবারের ভাগবতপাঠক) প্রমুখের কাছে শ্রীনিবাসের প্রভাব বৈষ্ণবধর্ম সংগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। খেতুরির মহোৎসবে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে শ্রীনিবাসের সর্বোচ্চ উদ্যোগ ও সাফল্য খেতুরির মহোৎসবে। কিন্তু খেতুরির বৈষ্ণব-সম্মিলনের আগে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীনিবাস বিশেষ কারণে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গমন করেন। তার কিছু সময় আগে গৌড়ের অন্যতম প্রধান চৈতন্যপূজক গদাধর দাস এবং নরহরি সরকার অপ্রকট হন। নীলাচল থেকেও চৈতন্যের কোনো কোনো পার্ষদের অপ্রকটবার্তা শ্রীনিবাসের নিকট পৌঁছাতে থাকে। গৌড়ে নরহরি ও গদাধরের পর গৌড়ের বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে প্রভাবশালী নেতৃত্বের অভাব বোঝা যায়। এই অবস্থায় শ্রীনিবাস কিঞ্চিত চিন্তিত হয়ে থাকবেন। কারণ তখন গৌড়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদের একটা বাতাবরণ আরো পোক্ত হবার আশঙ্কা ছিল। তাই পরবর্তী কর্মসূচীর পরিকল্পনা নির্ণয়ের এক প্রয়োজনীয়তা থেকে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন মনে হয়। এদিকে গৌড়ে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনজনিত অনুপস্থিতিতে কিছু গোলমালের ইঙ্গিত ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত। যার জন্য রঘুনন্দন শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন শ্রীনিবাসকে অতিশীঘ্র গৌড়ে ফিরিয়ে আনার জন্য ----

"একদিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন।
রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন।।
হইল সকল শূন্য কহিতে কি আর।
বৃন্দাবনে যাহ শীঘ্র এ কার্য্য তোমার।।...
শ্রী আচার্য্য বিনা সব হইল অন্ধকার।।
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।" [২১]

রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্যামানন্দও সেখানে মিলিত হন। সম্ভবত এসময় জীব গোস্বামীর পরামর্শে গৌড়ে বৈষ্ণব-সমাবেশের জন্য আলোচনা হয়েছিল এবং মহোৎসব সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ণয়ের কথাও হয়েছিল।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে দুটি মহোৎসবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীনিবাস। খেতুরি মহোৎসবের পূর্বে এই দুই মহোৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম মহোৎসবটি কাটোয়ায় গদাধর দাসের তিরোধান-দিবস উপলক্ষ্যে এবং দ্বিতীয় মহোৎসব শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোধান-দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পরপরই এই দুই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাটোয়ায় অনেক বৈষ্ণব এসে মিলিত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রও এখানে ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখে দেখা যাচ্ছে এখানে নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ একত্রিত হন এবং প্রধানত নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এরপরই শ্রীখণ্ডে নরহরির তিরোধান-দিবস উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব হয় সেখানেও সমস্ত বৈষ্ণব মিলিত হয়েছিলেন। এই মহোৎসবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে শ্রীনিবাস এখানে ভাগবত পাঠ করেন -- "শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস।"[২২] গৌড়ের নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের এখানে ভাগবত পাঠের ঘটনা অর্থবহ। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই প্রথম ভাগবতের বৃন্দাবনী ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ হয়। তাই শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনী ব্যাখ্যায় ভাগবত পাঠ এবং বৈষ্ণব মহান্তদের তা সানন্দে গ্রহণ।

দুটো মহোৎসবের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দ্বারা এটা স্পষ্ট যে এই দুই মহোৎসব পরবর্তী খেতুরির মহোৎসবের প্রস্তুতি পর্ব ছিল। এই প্রস্তুতি পর্ব যথার্থভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। শ্রীনিবাসের সর্বোচ্চ উদ্যোগ খেতুরির মহোৎসব। এই উৎসবের আয়োজন ছিল ব্যাপক,উদ্দেশ্য ছিল সুচিন্তিত। নানাপ্রান্তের বৈষ্ণব এতে যোগদান করেন। বিশিষ্ট বৈষ্ণবদের মধ্যে ছিলেন খড়দহ সম্প্রদায়ের নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবী,বৃন্দাবন দাস,জ্ঞানদাস,কৃষ্ণদাস সরখেল। শান্তিপুর সম্প্রদায়ের অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপাল। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে শ্রীকানু পণ্ডিত,নারায়ণ দাস,বিষ্ণুদাস আচার্য্য ও আরোও অনেকে। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে রঘুনন্দন ও অন্যান্যরা। খেতুরির মহোৎসবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ,যেমন ----

ক। শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রীনিবাস নতুনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা রচনা করার নির্দেশ দেন। এই রচনার মধ্যে শুদ্ধ পরকীয়ার প্রকাশ ঘটিয়ে প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়। কারণ সমাজে পরকীয়াকে কেন্দ্র করে যে বিকৃত ধর্মচর্চা চলছিল তার গতিরোধ করার প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে পরকীয়াকে অস্বীকার করাও যাবে না। তাই পরকীয়ালীলাকে কেবলমাত্র ব্রজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা ছিল,যা

সাধারণ জনসাধারণের জন্য নয়। কর্ণানন্দে বলা হয়েছে নরোত্তম গোবিন্দদাসের এই গ্রন্থের পদ আস্বাদ করে প্রেমের তরঙ্গে ভাসতেন ----

"খেতরি মধ্যে ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে।
পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে।।" [২৩]

অনুমিত এর দ্বারা প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-পদাবলীর রীতির রদবদল করা হয়েছিল। খেতুরিতে যা ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

খ। খেতুরির উৎসবের আগে বুধরি গ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজের বাসায় শ্রীনিবাস অবস্থান করেছিলেন। সেখানে উৎসবকেন্দ্রিক নানা পরিকল্পনা চলছিল। এইসময় খেতুরি থেকে দুর্গাদাস নামে এক বিপ্র আসেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। নরোত্তমের কিছু সংবাদ তিনি এখানে নিয়ে আসেন। কারণ নরোত্তমও এই উৎসবের একজন সহকর্মী ও উদ্যোক্তা। দুর্গাদাসের সংবাদে জানতে পারা যায় নরোত্তম নীলাচল থেকে ফিরে এসে খেতুরিতে ভক্তিধর্ম প্রচারের কাজে লেগেছেন এবং প্রিয়াসহ কৃষ্ণের পঞ্চবিগ্রহ ও প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। নরোত্তমের শিষ্য রাজা সন্তোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ করিয়ে মোট ছয়টি বিগ্রহের স্থাপনে সহায়তা করেন। কিন্তু বিগ্রহের অভিষেকাদি কর্মের জন্য শ্রীনিবাসের আগমনের অপেক্ষা ছিল। মহোৎসবের সময় শ্রীনিবাস প্রিয়াসহ কৃষ্ণের পঞ্চবিগ্রহ এবং বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের বিগ্রহের অভিষেক সম্পন্ন করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধারণের মধ্যে স্বকীয়া মতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং প্রিয়াসহ কৃষ্ণের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্রজের পরকীয়া মতবাদকে গ্রহণ করা হয়। ছয়টি বিগ্রহ হল --- গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ।[২৪] পরকীয়া মতকে অবলম্বন করে বৈষ্ণবধর্মে যে বিকৃতির রূপ প্রকট হচ্ছিল এখানে তা অস্বীকৃত হয়। পরকীয়া মতকে কেবলমাত্র ব্রজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। আগের বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত গোবিন্দদাসের রচনায় 'শুদ্ধ পরকীয়া' বলতে যা বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণের মধ্যে স্বকীয়া মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ বলেছেন ----

"পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।" [২৫]

অতএব খেতুরিতে স্বকীয়া ও পরকীয়া দুটো তত্ত্বকেই মান্যতা দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু পরকীয়ালীলাকে ব্রজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে বৈষ্ণবধর্মের পরিমার্জন এই উৎসবের অন্যতম বড়ো পদক্ষেপ।

গ। বিগ্রহ অভিষেকের পর ভোগ সমর্পণ, তাম্বুল ভক্ষণ ইত্যাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদী শ্রীমালাচন্দন অর্পণ ক্রিয়ানুষ্ঠান হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ সেই মালাচন্দন গ্রহণ করে বৈষ্ণবধর্মের নতুন বিধিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। যাতে বোঝা যায় যে,সম্প্রদায়ের একত্রিকরণের যে প্রচেষ্টা চলছিল তা অনেকাংশে সফল হয়। কিন্তু সেই একত্রিকরণ যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা বলা যাবে না। দার্শনিক মতভেদ খেতুরির উৎসবের পরেও ছিল। তবে সাময়িকভাবে বৈষ্ণবধর্মের নবনির্মিত বিধির সমর্থন করেছিলেন প্রত্যেকেই,অন্তত যাঁরা খেতুরির মহোৎসবে ছিলেন। খেতুরি মহোৎসবের এটাও এক সাফল্য।

ঘ। সমস্ত ক্রিয়াকর্মাদি শেষে নব-উদ্যমে শুরু হয় সংকীর্ত্তন। গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা রচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। প্রথমে রাধাভাবে মগ্ন গৌরাঙ্গের গীত দিয়ে সংকীর্ত্তনের সূচনা হয় এবং তারপরে শুরু হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-কীর্ত্তন। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণবিলাসের সাথে গৌরাঙ্গের রাধাভাবের মগ্নতার যোগসূত্র সাধিত হয় এই কীর্ত্তনের মাধ্যমে। এছাড়া গৌরাঙ্গের জন্মাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় কৃষ্ণের জন্মতিথির বিধান অনুযায়ী। ফলে গৌরাঙ্গ-সমকালে কৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গের ভেদাভেদকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তা আর রইল না। গৌরপারম্যবাদের অবসান হল ----

"কৃষ্ণ জন্মতিথির বিধান যৈছে হয়।
তৈছে গৌরচন্দ্র জন্মাভিষেক করয়।।
গৌর কৃষ্ণ এক ইথে ভেদবুদ্ধি যার।
যমযন্ত্রণায় তার নাহিক নিস্তার।।"[২৬]

শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও খড়দহের সম্প্রদায়ের প্রধান বৈষ্ণবরা এখানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শ্রীখণ্ডের মুখপাত্র রঘুনন্দনও। এঁরা এই তত্ত্বকে সমর্থন করলেন। তাই বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়কে একত্রিকরণের ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

৪

নরহরি সরকার ও শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবধর্মাচরণের মোটামুটি আলোচনা করা হল। প্রথমজন চৈতন্য-পার্ষদ্ এবং দ্বিতীয়জন চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব আচার্য্য। ফলে চৈতন্য-সমকাল থেকে চৈতন্যোত্তর কালপর্বের বৈষ্ণবধর্মের দর্শন ও বিধিপর্যায়ের কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া গেল। নরহরির সঙ্গে শ্রীনিবাসের যে সংযোগ গড়ে উঠেছিল তা শ্রীনিবাসের জীবনাদর্শে ও কর্মপন্থায় সর্বোপরি বৈষ্ণবধর্মের সংগঠনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। শ্রীনিবাসের জীবনীগ্রন্থগুলিতে দু'জনের সম্পর্কের যেসব তথ্য পাওয়া যায়,তার ভিত্তিতে তাঁদের সংযোগের চিত্রটি ঠিক কেমন এবং তা শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবধর্মাচরণে কতটা পরিপূরক ছিল তা বিচার করে দেখা যেতে পারে

ক। শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরহরির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তিনি যখন মাতুলালয় যাজিগ্রামের পথে যাচ্ছিলেন। নরহরি সরকার সেইসময় গঙ্গাস্নানে আসছিলেন। বলাবাহুল্য এই সাক্ষাতের সময় শ্রীনিবাস নিতান্তই বালক। ভক্তিরত্নাকর অনুযায়ী উভয়ই উভয়কে দেখে আনন্দিত হন। নরহরি শ্রীনিবাসের কোনো সংবাদ এর আগে কি জানতেন? ভক্তিরত্নাকরে নরহরির উক্তিতে আছে ----

“শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন।
তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র মন।।
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে।
এত কহি হস্ত পদ্ম বুলায় অঙ্গেতে।।”[২৭]

শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাস চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন বলে নীলাচলে চৈতন্যের আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন পুত্রকামনার হেতু। এ সংবাদ অনেকে জানতেন। শ্রীনিবাসের জন্মের পর সেই খবর চৈতন্য পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই,তবে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই সূত্রে শ্রীনিবাসের জন্মের খবর চৈতন্যভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। নরহরি সরাসরি চৈতন্যদাসের থেকে শ্রীনিবাসের জন্মের খবর না জানলেও কোনো না কোনোভাবে জানতেন বোধহয়। কিন্তু শ্রীনিবাসের নরহরির সংবাদ সাক্ষাতের আগে থেকেই জানা অসম্ভব নয়। পূর্বে উল্লিখিত যে,বালক শ্রীনিবাসকে তাঁর মাতা চৈতন্যসহ অন্যান্য পরিকরদের নাম ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি নরহরির নামও জানিয়ে থাকতে পারেন শ্রীনিবাসকে। যেহেতু নরহরি চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার অন্যতম প্রধান সঙ্গী ছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে দু'জনের প্রথম সাক্ষাতের আর বিশেষ কিছু বর্ণনা নেই। তবে মনে হয় নরহরি শ্রীনিবাসকে এখানে চৈতন্যপ্রীতির কথা শুনিয়ে থাকবেন। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'-এ দু'জনের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ কিছু ভিন্ন। সেখানে উল্লেখ আছে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র নরহরিকে বলেছেন তিনি যেন শীঘ্রই শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন ----

"বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহ্নবা সাক্ষাতে।
বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস পাঠাহ ত্বরিতে।।" [২৮]

এত অল্প বয়সে বৃন্দাবন গমনের প্রসঙ্গ অবান্তর। জীমূতবাহন রায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন শ্রীনিবাস তখন অতি শিশু এবং বীরচন্দ্রও কুড়ি-একুশ বছর বয়সের। বীরচন্দ্র নরহরিকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন-সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাই এক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য। প্রেমবিলাসে বীরচন্দ্র ও জাহ্নবাদেবীর উল্লেখে জীমূতবাহন রায়ের মন্তব্যটি সমর্থনযোগ্য --- "প্রেমবিলাসের এই দুই ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস-নরহরি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিশেষ মনোভাব লক্ষ্য করার বিষয়। উভয়ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসের সঙ্গে জাহ্নবাদেবী ও বীরচন্দ্রের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করেছেন মাত্র। শ্রীনিবাসের উপর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের প্রভাবের ঘটনা সর্বজনবিদিত। কাজেই তাঁকে গ্রন্থকার একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। কিন্তু মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য হল শ্রীনিবাসাচার্য্যের উপর নিত্যানন্দগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখানো।"[২৯] এই মতামত যুক্তিযুক্ত।

খ। শ্রীনিবাসের পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তিনি মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে মাতুলালয় যাজিগ্রামে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এইসময় রীতিমতো অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে ভক্তগোষ্ঠীর কাছে তিনি চৈতন্যলীলা শুনে নীলাচলে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হন এবং এই মনোবাঞ্ছা নিয়ে শ্রীখণ্ডে নরহরির কাছে যান। নরহরি তখন শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতৃত্ব। যাজিগ্রাম সমীপে যে ভক্তগোষ্ঠীর কাছে শ্রীনিবাস চৈতন্যলীলা শুনেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের যোগ থাকতে পারে। মূলত নরহরিই সেখানকার সবচেয়ে বড়ো চৈতন্যপূজক। নরহরির কাছে যাওয়ার পর ----

"ঠাকুর শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে।
শ্রীভুজ পসারি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে।।"[৩০]

শ্রীনিবাস নরহরিকে নীলাচল গমনের ইচ্ছার কথা বলেছিলেন এবং ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত যে শ্রীনিবাস নরহরির কাছে নীলাচল গমনের জন্য অনুমতিও চেয়েছিলেন। নরহরি অনুমতি দিয়েছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজের 'গুণলেশসূচকম্' এবং মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাসের নীলাচল গমন-সংক্রান্ত নরহরির কার্যকলাপের উল্লেখ নেই। কিন্তু শ্রীনিবাস যেহেতু গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠের ইচ্ছা নরহরিকে প্রকাশ করেছিলেন তাই শ্রীনিবাসকে নরহরির নীলাচলে গমনের অনুমতি দেওয়া অসম্ভব নয়। কারণ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে নরহরির যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়। প্রেমবিলাসে দেখা যাচ্ছে নীলাচলে শ্রীনিবাস গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠ করতে চাইলে পুথির অবস্থা ভালো ছিল না বলে তা সম্ভব হয়নি। শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফেরার সময় গদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাসের হাত দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন যে নরহরি যেন একটি ভাগবত গ্রন্থ গদাধরের নিকট পাঠিয়ে দেন ----"আমার লিখন দিহ নরহরি হাতে। / নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে।।"[৩১] যদি এ বর্ণনা সঠিক হয় তাহলে নরহরি ও গদাধর ভাগবতের একই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। তাই উভয়ের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। অতএব নরহরি যে শ্রীনিবাসকে নীলাচল গমনের নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন তা অসম্ভব কিছু নয়।

গ। নীলাচল থেকে ফিরে এসে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে নরহরির কাছে আসেন। চৈতন্যের তিরোধানের পর নীলাচলের ভক্তদের মানসিক অবস্থা সম্ভবত শ্রীনিবাস মারফৎ এখানে নরহরি জেনেছিলেন বিস্তারিত। এরপর গদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হলে শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে যায় এবং নবদ্বীপ গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াসহ অন্যান্য চৈতন্যভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বৃন্দাবন যাবার জন্য মনস্থির করেন। শ্রীখণ্ডে এসে বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা তিনি নরহরিকে জানান এবং নরহরি অনুমতি দেন। রঘুনন্দন এসময় নরহরির প্রধান সহচর ----

"ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন।।" [৩২]

বৃন্দাবন গমনের জন্য শ্রীনিবাস যে নরহরি সরকারের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন কর্ণপুর কবিরাজের 'গুণলেশসূচকম্' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।[৩৩] অতএব এ ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করা যায়।

ঘ। বৃন্দাবন থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মন্দিরাদি ভ্রমণের দীর্ঘদিন পরে শ্রীনিবাস ফিরে আসেন গৌড়ে। শ্রীখণ্ডে নরহরির কাছে যান দেখা করতে। এসময় নরহরির

অবস্থা -- "মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি"। শ্রীখণ্ডে গিয়ে রঘুনন্দনের সাথে দেখা হলে রঘুনন্দন তাঁকে নরহরির কাছে নিয়ে যান। সম্ভবত বৃন্দাবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি নরহরিকে জানিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকর মতে নরহরি এখানে শ্রীনিবাসকে যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা এরকম ----

" চিরায়ু হইয়া কর ভক্তি উপার্জন।
ভক্তিগ্রন্থ সর্বত্র করহ বিতরণ।।
হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম।
না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম।।
এসব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তি বলে।
গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে।।" [৩৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে নরহরি শ্রীনিবাসকে নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে নিয়ে ভবিষ্যৎ-চিত্রটিও অনুমান করেছেন। ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী এখানে নরহরি সরকারের যে ভবিষ্যৎবাণীর কথা উল্লেখ করেছেন তা অমূলক নয়। হরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত নরহরি সরকারের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্' গ্রন্থে একথা আছে। সেখানে ৩ ও ৪ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র অপ্রকট হবার পর কলিযুগে সকল বৈষ্ণব প্রতিদিন উদ্বিগ্ন হতে থাকবে এবং উত্তম-মহত্তম-কণিষ্ঠ বিচারে প্রায় সন্দিগ্ধ হৃদয় হয়ে উঠবে।[৩৫] অর্থাৎ চৈতন্য-নিত্যানন্দের পরে উপযুক্ত বৈষ্ণব নেতৃত্বের অভাব নরহরি অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নেতৃত্বের অভাবে বৈষ্ণবধর্মের বিকৃতির আভাসও পেয়েছিলেন। চৈতন্য অপ্রকট হলে বৈষ্ণবধর্মে নেতৃত্বদানের অভাবে কিছু যে বিকৃতি দেখা গিয়েছিল 'অনুরাগবল্লী'তে সে আভাস আছে। বৃন্দাবন গমনের পূর্বে শ্রীনিবাসের সঙ্গে অভিরাম ঠাকুরের সাক্ষাতের সময় অভিরাম ঠাকুর বলেছেন ----

"চৈতন্যের কালে হেন বৈরাগ্য দেখিল।
আজি হো আছয়ে তাথে আশ্চর্য্য মানিল।।
মুই কহোঁ সব লঞা গেল সেই চোরা।
এ নিমিত্তে পোড়য়ে সতত চিত্ত মোরা।।" [৩৬]

অর্থাৎ চৈতন্যের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছিল যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। নরহরির ভবিষ্যৎবাণীর ভিত্তি আছে। কারণ তিনি চৈতন্য-সমসাময়িক এবং বৈষ্ণবসমাজের চৈতন্য-পরবর্তী সামাজিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ্য

করেছিলেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য এবং সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তাতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাবে তিনি শেষ বয়সে আশাবাদী হয়েছিলেন বলে অনুমিত।

শ্রীনিবাসের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম গুরু হলেন নরহরি সরকার। অনুমান করি চৈতন্যতত্ত্বের প্রকৃত ধারণা শ্রীনিবাস পেয়েছিলেন নরহরি-গদাধর পণ্ডিত-রঘুনন্দন প্রমুখের কাছে। বৈষ্ণবধর্মের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভাগবতের বৃন্দাবনী ভাষ্যের পাশাপাশি চৈতন্যতত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক ছিল। নরহরি-গদাধর পণ্ডিত-রঘুনন্দন এঁরা ছিলেন সে সময় সবচেয়ে বড়ো চৈতন্যপূজক। ছোটবেলা থেকেই নরহরির সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। চৈতন্যপূজনের গভীরতার দিকটির দ্বারা শ্রীনিবাস বৈষ্ণবসাধনার অন্তস্থলের ভক্তিপ্রাণতা নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। নরহরির প্রতি গাঢ় অনুরাগবশত তিনি রচনা করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমন্নরহরিঠাকুরাষ্টকম্'। এই অষ্টকে নরহরির প্রতি শ্রীনিবাসের আন্তরিকতা সহজেই বোঝা যায়। নরহরি বিশেষ মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ননীগোপাল গোস্বামী তাঁর গবেষণায় বলেছেন --- "নরহরি-রঘুনন্দনের গৌরনাগর মতবাদ এক শ্রেণির বৈষ্ণবের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও শ্রীনিবাস-নরোত্তম এবং শান্তিপুর-খড়দহ সম্প্রদায় তা সমর্থন করতেন না।"[৩৭] শ্রীনিবাস নরহরির মতবাদের তাত্ত্বিক দিক গভীরে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যা পরবর্তীতে শ্রীনিবাসের সাংগঠনিক চিন্তাধারায় খুব কাজে হয়তো লাগেনি,কিন্তু শ্রীনিবাসের আধ্যাত্মিক জীবনাচরণে প্রভাব ফেলেছিল অবশ্যই।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার : *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা: ১৯১ (এরপর শুধু গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে)

২. রমাকান্ত চক্রবর্তী : *বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম,* প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ: ৮৩

৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত,* সম্পাদক- সুকুমার সেন, পঞ্চম মূদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি,২০০৯, পৃ: ২২-২৩ (এরপর শুধু 'চৈতন্যচরিতামৃত' বলে উল্লেখ থাকবে)

৪. *চৈতন্যচরিতামৃত,* পৃ: ১০০

৫. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): *বৈষ্ণবপদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, ১৩৫৩, পৃ: ২৩২

৬. তদেব, পৃ: ১৪০

৭. *চৈতন্যচরিতামৃত,* পৃ: ৮৮

৮. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত,* সম্পাদক – সুকুমার সেন, তৃতীয় মূদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৩, পৃ: ৬০

৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস : *লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র,* প্রথম প্রকাশ, নিউ বইপত্র,২০০৯, পৃ: ২১০ (এরপর শুধু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হবে)

১০. তদেব, পৃ: ৫৩

১১. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *রামগোপাল দাস বিরচিত রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ: ২১০

১২. *লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র,* পৃ: ৪৬

১৩. নরহরি সরকার, *শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্,* শ্রী হরিদাস শাস্ত্রী (সম্পাদিত),দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈতন্য-সংস্কৃতি সেবাসংঘ, বৃন্দাবন,মথুরা, ১৮৮৪, পৃ: ২৭

১৪. *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান,* পৃ: ৪৩৫

১৫. নরহরি চক্রবর্তী : *ভক্তিরত্নাকর,* রাধারমণ যন্ত্রে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত, বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ, চৈতন্যাব্দ - ৪০২,পৃ: ৭৮ (এরপর কেবল 'ভক্তিরত্নাকর' বলে উল্লেখ করা হবে)

১৬. মনোহর দাস : *অনুরাগবল্লী,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২০ নং বাগবাজার স্ট্রীট পত্রিকা প্রেস, গৌরাব্দ-৪২৪,পৃ: ১৭ (এরপর শুধু 'অনুরাগবল্লী' বলা হবে)

১৭. শ্রী হরিদাস দাস(সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা,* পৃ:৪১ (আমি যে গ্রন্থ ব্যবহার করেছি তাতে প্রকাশক ও প্রকাশসাল উল্লেখ নেই)

১৮. জীমূতবাহন রায় : *শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ,* বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি,১৯৮৪, পৃ: ২২৪ (এরপর শুধু গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে)

১৯. *অনুরাগবল্লী* : পৃ: ২০

২০. *শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ,* পৃ: ৯০

২১. *ভক্তিরত্নাকর* : পৃ: ৫৭০-৫৭১

২২. *ভক্তিরত্নাকর* : পৃ: ৫৯৭

২৩. শ্রী যদুনন্দন দাস : *কর্ণানন্দ*, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত, চৈতন্যাব্দ-৪০৬, পৃ: ৯৩

২৪. *ভক্তিরত্নাকর :* পৃ: ৬৩৯-৬৪০

২৫. *চৈতন্যচরিতামৃত* : পৃ: ৫

২৬. *ভক্তিরত্নাকর* : পৃ: ৬৫১

২৭. *ভক্তিরত্নাকর :* পৃ: ২০

২৮. শ্রী নিত্যানন্দ দাস : *প্রেমবিলাস*, যশোদালাল তালুকদার দ্বারা প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৬

২৯. *শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ*, পৃ: ৪০

৩০. *ভক্তিরত্নাকর :* পৃ: ৯৮

৩১. *প্রেমবিলাস :* প্রাগুক্ত, পৃ : ২০

৩২. *ভক্তিরত্নাকর* : পৃ: ১৩০

৩৩. *শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা*, পৃ: ৪২

৩৪. *ভক্তিরত্নাকর :* পৃ:৫২৪

৩৫. শ্রী হরিদাস শাস্ত্রী (সম্পাদিত) : *শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্*, প্রাগুক্ত,পৃ: ১

৩৬. *অনুরাগবল্লী* : পৃ: ৩৬

৩৭. ডঃ ননীগোপাল গোস্বামী : চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, পৃ: ১৬৩-১৬৪

আলোক সরকারের কবিতা ও কাব্যভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কবির বিশিষ্টতার পর্যালোচনা

শৌভিক পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই বাংলা কবিতার জগতে কবি আলোক সরকারের (১৯৩১-২০১৬) আবির্ভাব 'উতল নির্জন' (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে। আত্মমগ্ন, নিভৃতচারী এই কবি বাংলা কবিতার জন্য রেখে গেছেন মৌলিক কাব্যভাবনা, অভূতপূর্ব কাব্যভাষা, অনন্য নির্মাণশৈলী। অজস্র কবিতা লেখার পাশাপাশি, একাধিক গদ্যে তিনি নিজের কাব্যভাবনাকে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছেন। গদ্যগুলি তাঁর কবিতার সারবস্তু ও প্রবণতাকে বুঝতে সহায়তা করে। কলাকৈবল্যবাদী কবি আলোক সরকারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। ২০০৯ সালে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও সাহিত্য অকাদেমির যৌথ পুরস্কার 'টেগোর লিটারেচার অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। 'শোনো জবাফুল' কাব্যগ্রন্থের জন্য ২০১৫ সালে 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। পুরস্কার, সম্মাননা অর্জন করা সত্ত্বেও নিভৃতচারী এই কবি সারাজীবন খ্যাতি-জনপ্রিয়তার আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেছেন। জনগণের জন্য কবিতা লেখায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। আত্মময় নিবিষ্ট চৈতন্য তাঁর কবিতায় সর্বক্ষণ অপ্রতিহত থেকেছে। কোথাও তাঁর এতটুকু স্বরচ্যুতি ঘটেনি। তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল কবিতার কাছে এবং তাঁর কবিতা নিজস্ব উচ্চারণের কাছে, কাব্যভাবনার কাছে সৎ। এদিক থেকে তিনি বাংলা কবিতার জগতে এক দুর্লভ সাধক তো বটেই। তাঁর সমসাময়িক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার ভিতর আলোক সরকারের 'সচ্চরিত্রতা'-কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সশ্রদ্ধ থেকেছেন তাঁর 'অখণ্ডবীক্ষা'-র প্রতি। কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কাছে আলোক সরকারের দৃষ্টি এক সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি। কবি কালীকৃষ্ণ গুহ তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন কবি সমাজের 'মহাঅতিথি' হিসেবে।*

পূর্বপরিকল্পনা মেনে কবিতা লেখাকে অধিকাংশ কবিই স্বীকৃতি দেন না। কবি আলোক সরকারও দেননি। কিন্তু প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব কাব্যভাবনা থাকে এবং সেই কাব্যভাবনা যে কবির অবচেতনে কবিতার দিকনির্দেশ করে—এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ তেমন নেই। কবি যেমন কবিতার ভাষা বদলান, এক নির্মাণশৈলী ভেঙে সন্ধান

করেন কবিতার নতুন নির্মাণের, সেই সঙ্গে কবির কাব্যভাবনাও ক্রমশ পরিণত রূপ পেতে থাকে। কবিতার সঙ্গে কাব্যভাবনার সম্পর্ক অভিভাবক ও সন্তানের মতো। তবে কে কার অভিভাবক, তা নির্দিষ্ট নয়। কাব্যভাবনা যেমন কবির অবচেতনে কবিতার দিকনির্দেশ করে, আবার কবিতা কাব্যভাবনার সীমা অতিক্রম করে স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতায় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কবির কাব্যভাবনা তখন সেই স্বাধীন, স্বতন্ত্র কবিতাকে অনুসরণ করে। কবিমাত্রই চান যে তাঁর কবিতাকে পাঠক নিজের মতো করে বুঝুক, স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করুক কবিতার অন্তর্গত অর্থ। তা সত্ত্বেও কবিরা কেন তাঁদের কাব্যভাবনাকে লিখিত রূপ দিয়ে যান? রবীন্দ্রনাথ লিখে যান তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব, জীবনানন্দ লেখেন 'কবিতার কথা', সুধীন্দ্রনাথ লেখেন 'কাব্যের মুক্তি', আর পঞ্চাশের কবি আলোক সরকারও কবিতা বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধে বুঝিয়ে যান তাঁর কাব্যভাবনার স্বরূপ। কবিতা যেমন কবির সৃষ্টি, কাব্যভাবনাও কবির নিজস্ব। এই দুই-এর বিচ্ছিন্নতায় পাঠক বিপথগামী হোক—হয়তো কোনো কবিই তা চাইবেন না। তাই কবিতার পাশাপাশি, কাব্যভাবনাকেও রূপায়িত করার একটা প্রবণতা কবিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। কবির নিজস্ব কাব্যভাবনা পাঠকের কাছে কবিতা পড়ার বা বোঝার শেষকথা না হলেও, সহায়ক এবং দিক নির্দেশক অবশ্যই। কবি আলোক সরকারের কবিতা ও কাব্যভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর বিশিষ্টতার অন্বেষণ বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: *আলোক সরকারের কবিতা, কাব্যভাবনা, বিশুদ্ধ চৈতন্য, সচেতন নির্মাণ, সম্পূর্ণতা, 'মিথ্যার সাধনা', স্তব্ধতা, 'ছন্দোময় ছন্দোহীনতা', স্থিরকেন্দ্র।*

মূল আলোচনা:

"আসলে, আমার মনে হয় আমার জীবনের একটা বড়ো অভিশাপ অতিরিক্ত সেরিয়াসনেস। এই অতিগুরু ঐকান্তিকতা আমাকে সহজ সরল জীবনের কাছে পৌঁছোতে দেয়নি, ইন্দ্রিয়উদ্বেল আবেগী জীবনের কাছে, বাস্তব জীবনের পাওয়া না-পাওয়া ব্যর্থতা আনন্দগুলির কাছে। সাধারণ জীবন আবেগময় জীবন, সেই আবেগেরও একটা রঙ আছে তা স্বীকার করতে হয়, কিন্তু আমার অতিরিক্ত সচেতনতা আবেগের ভিতর সেই কৃত্রিমতা চিনেছিল যা ব্যক্তির বিশুদ্ধ সত্তার পরিপন্থী।"[১] পাঠক হিসেবে কবির উপলব্ধ এই অভিশাপটিকে মেনে নিতে না পারলে কোনো পাঠক আলোক সরকারের কবিতাকে 'দুর্বোধ্য' ভেবে মুখ ফেরাতে পারেন, আবার কোনো পাঠক আলোক সরকারের কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো বলতে পারেন 'এসব কবিতায়

যৌবনের উত্তাপ কোথায়?'[২] কিন্তু প্রথম থেকেই আলোক সরকারের কবিতা আবেগ-নিরপেক্ষ সচেতনতার জায়গা থেকে উঠে আসেনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উতল নির্জন' পড়ে জীবনানন্দ দাশ এক চিঠিতে কবিকে জানিয়েছিলেন—"আপনার লেখায় এত আবেগ কেন? Wordsworth বলেছেন, emotion recollected in tranquility. কবিতা অনেক সংহত হওয়া দরকার।"[৩] যত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে নিজস্ব ভাবনা, কাব্যদর্শন অবলম্বনে আলোক সরকার কবিতাকে এক সংহতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। কবিতার সংহতি অর্জন করার জন্য কবি নির্বাচন করলেন বিশুদ্ধ চৈতন্যের পথ। কবিতার বিশুদ্ধতা বলতে তিনি চৈতন্যের বিশুদ্ধতার কথা বলতে চাইলেন—যা তাঁর কবিতাকে ক্রমশ সংহত, সুন্দর, শৈল্পিক করে তুলেছে। বিশুদ্ধ চৈতন্য দিয়ে বিশুদ্ধ কবিতা লেখার কাজে উৎসর্গ করলেন তাঁর জীবনধর্ম তথা কবিধর্ম—"এই বিশুদ্ধতাকে অর্জন করার তাগিদেই কবিতা রচনাকে আমি একটি নির্মাণ কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই নির্মাণ কর্ম বলতে কেউ কেউ ভাবতে পারেন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প এবং নির্মিত শিল্পের ভিতর শেষেরটির প্রতিই আমার পক্ষপাত। সে ভাবনা অংশত সত্য। নির্মিত শিল্প বলতে আমি কেবল কবিতার গঠনগত দিকটিই বুঝি না, নির্মিত শিল্প সেই সচেতন শিল্প যেখানে আবেগ বা প্রেরণা কোনো জরুরি ভূমিকা পালন করে না, আবেগ এবং প্রেরণার বদলে অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার বিন্যাসই প্রধান কর্তব্য করে।"[৪]

কবির অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার বিন্যাস সাধারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার থেকে স্বতন্ত্র। "নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করি অন্যমন।/ হাওয়ার দুপুরে পথে এত লোক ব্যস্ত চলে যায়/ তার থেকে ঢের দূরে অসীম স্বাতন্ত্র্যে নিরালায়/ সুদূর নির্জন আলো বেজে যায় ঘনিষ্ঠ গহন ('বিবিক্ত': সূর্যাবর্ত)।" অভিজ্ঞতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখলে অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। দূরত্ব কবির কাঙ্ক্ষিত বিষয়, বিচ্ছিন্নতা অভিপ্রেত—অভিজ্ঞতাকে সমগ্রতায় অর্জন করার জন্য। অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে—আলোক সরকার সমাজ-বিবিক্ত কবি, তাঁর কবিতায় মানুষের স্থান নেই, মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতার স্থান নেই, আবেগেরও জায়গা নেই। এই অভিযোগ মিথ্যে নয়। তবে অভিযোগটির ভিতর একটি বড় মিথ্যে থেকে যাবে যদি না আমরা বোঝার চেষ্টা করি মানুষের প্রতি, সামাজিক ঘটনা-অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিক আবেগের প্রতি আলোক সরকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি। কবি লিখছেন—"মনে হতে পারে ঘটনাকে, বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে আমি ঘটনার নির্যাস, জীবনের অমূর্ত তাৎপর্যকেই গ্রহণ করতে চেয়েছি। এই ধরণের ভাবনায় সত্য আছে, পুরো সত্য নেই।

অমূর্ত ভাবময়তাকে স্পর্শ করাই আমার লক্ষ্য, কিন্তু সেই ভাবময়তা কোনো অপার্থিব শূন্যসঞ্জাত বস্তু নয়। সেই ভাবময়তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে ঘটনার কাছেই যেতে হবে, জীবনের কাছে, ঘটনাকে জীবনকে চিরে চিরে দেখতে হবে, যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে সচেতনভাবে জীবন, জীবনের তাৎপর্যময় ঘটনার অন্তঃসারের কাছে যেতে হবে।”[৫]

অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সচেতন নির্মাণের দ্বারা কবিতা নামক শিল্পটিকে অর্জন করে নেওয়া। ঘটনা বাইরের বিষয়, ঘটনার অভিঘাতে চেতনায় অর্জিত বোধ কবিতার অবলম্বন। আবেগ প্রকৃতিগত—সকলের মধ্যে কম-বেশি একইরকমভাবে কাজ করে। আবেগের ভিতর ব্যক্তিত্বের স্বকীয় উন্মোচন নেই। বিশুদ্ধ চৈতন্যের কাছে পৌঁছাতে গেলে সামাজিক-প্রাকৃতিক-শারীরিক যে-কোনো পূর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে কবিকে—“প্রকৃতি তো একটি স্বভাব তুমি আজও অন্তরালের শুভ্র স্বভাবে (‘হেমন্ত’: আলোকিত সমন্বয়)।” ইন্দ্রিয়সংবেদের সীমা অতিক্রম করে আরও গভীর কিছুর সন্ধান প্রয়াসী আলোক সরকার। যা নেই তার নির্মাণ প্রয়াসী—“নির্মাণ চলেছে মূক দিকে-দিকে। প্রতিমুহূর্তেই/ পরিবর্তিত আলো। প্রতিমুহূর্তেই/ গোলাপ অপর কারুকাজ।” (‘তোমার বাড়িটি শুধু’: মেঘনিবেশ)

দুই

আলোক সরকারের কবিতাকে বলা যেতে পারে আত্মমুক্তির কবিতা। আত্মমুক্তি তো বলা হল, কিন্তু আত্মমুক্তি বলতে আমরা কী বুঝব? নিজের মুক্তি, নাকি নিজের থেকে মুক্তি? দু’টি বিষয়ের অর্থগত সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও অর্থ দু’টি পরস্পর বিরোধী নয়। প্রকৃত মুক্ত হতে গেলে নিজের থেকেও তো মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ‘আপন হতে বাহির হয়ে’ বাইরে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে যে-মুক্তির সন্ধান সেই মুক্তির স্বরূপ ব্যক্তিভেদে আলাদা। আর, কবিভেদে সেই আত্মমুক্তির অনুভূতি-দর্শন-অভিব্যক্তি যেন এক একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ। কারণ নিজের থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতি, সংসার-জগতের সঙ্গে কবির হার্দিক-বৌদ্ধিক যোগ আসলে নতুন এক আত্ম-আবিষ্কার। আলোক সরকার লিখলেন—“কোনোদিক থেকেই/ ডাক আসছে না/ এইরকম মুক্তি।/ এদিক থেকে ডাক আসছে না/ ওদিক থেকে ডাক আসছে না/ মুক্তি-ধুলোরঙের চতুর্দিক পেয়েছে।/ ধুলো রঙের পরিত্যাগ/ ধুলো রঙের হাহাকার/ ধুলো রঙের নিরর্থক (‘৫৩’: শোনো জবাফুল)।” আলোক সরকার যে-মুক্তির খোঁজে বেরিয়েছেন তা ধুলোরঙের। অর্থাৎ বিবর্ণতা, উদাসীনতা, অর্থহীনতা, শূন্যতা, সর্বোপরি আনন্দ-নির্বেদ। কিশোর বয়স থেকেই কবির

ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত এক বোধ কাজ করত—পরিণত বয়সে যে-বোধ সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন। আত্মজীবনী 'জ্বালানি কাঠ, জ্বলো'-তে কবি সে-কথা জানিয়েছেন আমাদের—"বিকেলবেলা পথ চলতে চলতে আমার মনে হত, আমি চলেছি চলেছি...কতকাল ধরে চলেছি...এ চলার কোনো শীতও নেই, কোনো উষ্ণতাও নেই, কেবল অস্পষ্ট টের পাওয়া একটা দহন, কোথায় কাকে ঘিরে দহন তারও কোনো বোধ নেই, প্রদাহ নেই, কেবল একটা শীতল দহন, একটা নির্বিশেষ শেষ হয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, আর সেই শান্তিজল শান্তিমন্ত্র—জ্বালানি-কাঠ, জ্বলো।"[৬] কিশোর বয়সের এই বোধ কবির পরিণত বয়সেও কবিতার ভিতরে কাজ করেছে।

অভীষ্ট আর পথের প্যারাডক্স আলোক সরকারের কবিতাযাপনকে অনন্য করেছে। মুক্তি ধুলো-রঙের বিবর্ণ, কিন্তু তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে রঙের বিচিত্র ব্যবহার আমাদের স্তম্ভিত করে। "বর্ণের মাধ্যমে সব মনে রাখি। প্রেমিকার চলে-যাওয়া/ পীতবর্ণ। দুপুরবেলার পাতা-ঝরা/ ধূসরাভ ('পদ্ম': মেঘনিবেশ)।" মুক্তি বড়ই উদাসীন। অথচ বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি কবির সহানুভূতিপূর্ণ কী অখণ্ড মনোযোগ! "শোনো জবাফুল/ তোমার মাটি সরস আছে তো?/ তোমার গায়ে/ রোদ্দুরের কাপড় আছে তো?/ তোমার জন্যে আমাদের খুব/ ভাবনা হয়—/ মাটি সরস না হলে/ গায়ে রোদ্দুরের কাপড় না থাকলে/ কেমন করে অত সুন্দর হবে তুমি ('১': শোনো জবাফুল)!" অর্থহীনতা মুক্তির স্বরূপ অথচ কবিকে প্রতি মুহূর্ত জেগে থাকতে হয় উন্মুক্ত চেতনার ভিতর—"...জাগ্রত চেতনা চাই, প্রতি মুহূর্তের সতর্কতা।/ নোংরা উঠোন ভাবি, হাওয়ার চিৎকার ভাবি, কোনখানে চাবি—/ সারাদিন উন্মুখ চেতনা জাগে একা একা, পরিব্যাপ্ত সম্পূর্ণ আলোক ('প্রতি মুহূর্তের সতর্কতা': স্তব্ধলোক)।" অভীষ্ট এবং পথের বিপ্রতীপ ধর্ম নিয়ে গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণতার জগৎ, যে-সম্পূর্ণতা আলোক সরকারের কবিতার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অভিজ্ঞান। খণ্ডিত অনুভব নয়, অখণ্ডবীক্ষা কবির অন্বিষ্ট। একটি কবিতায় ('প্রাসাদ') সম্পূর্ণতার বিষয়টি তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন: "ছবিটা সম্পূর্ণ শুধু মনে আছে/ আমি কোনো রেখা/ বলতে পারি না।/ আমি কোনো রঙ/ ভাবতে পারি না/...যেমন সুরের কেন্দ্রে বাঁশি ছিল এখনো বুঝিনি/ যেমন ফুলের মধ্যে ক-টি পাপড়ির সমন্বয়/ যেমন প্রেমের মধ্যে নারী।" কবির দৃষ্টি এভাবে দৃশ্যকে তার সম্পূর্তায় দেখে। দৃশ্যের কিংবা কোনো ঘটনার নেপথ্যে যে-দ্রষ্টা—তার ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, ভালোলাগা, মন্দলাগা—অভিজ্ঞতার রূপায়ণে এসবের প্রভাবের বাইরে গিয়ে তিনি বিষয়কে সম্পূর্ণতায় পেতে চান। সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পীর প্রধান আকাঙ্ক্ষা

বলে মনে করেন—“সম্পূর্ণতার প্রশ্নটাই জরুরি, শিল্পের প্রসঙ্গে আর সবই অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতি এক সম্পূর্ণতাকে চায়, মানবিক চৈতন্য অন্য এক সম্পূর্ণতাকে, কিন্তু উৎকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দু’টি ক্ষেত্রেই সমান একাগ্র। যে উৎকাঙ্ক্ষায় ফলটা সম্পূর্ণ ফল হতে চাইছে, সেই উৎকাঙ্ক্ষাতেই কবিতা সম্পূর্ণ কবিতা। এই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠাটাই একমাত্র—এরই জন্য বৃক্ষ মাটির অন্ধকারে শিকড় প্রোথিত করে রস আহরণ করছে, পত্রপল্লবকে স্নান করাচ্ছে সূর্যালোকে, এরই জন্য কবিতা স্নান করছে অভাবিতের, কল্পনার, সজ্জিত হচ্ছে অলৌকিক রূপ নির্মাণের আভরণে।”[৭]

আলোক সরকার সম্পর্কে দু’টি বিষয়ে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। একজন কবি কিভাবে খ্যাতি-জনপ্রিয়তা-পুরস্কারের তোয়াক্কা না করে কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের অভীষ্টে অটল থাকতে পারেন—কবিতা সম্পর্কে নিজের ভাবনায়, বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারেন! এ প্রসঙ্গে কবি মণীন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য স্মরণীয়—“নিজের কবিতা চিন্তাকে ব্যখ্যা করার জন্য, বোঝাবার জন্য আলোক সরকার যখনই প্রশ্ন উঠেছে উত্তর দিয়েছেন, লিখেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর নিজের প্রত্যয় অত্যন্ত দ্বিধাহীন। অবলীলায় আসা স্রোতের মতো এত যে কবিতা—তারা স্থির এবং সত্য হয়ে আছে কবির ঐ নিজস্ব বিশ্বাসের শক্তিতেই। আর সে শক্তি হয়তো আধ্যাত্মিকতারই নামান্তর। নিজেকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলেছেন বলেই আলোক সরকার আধ্যাত্মিক নন, নিজের কবিতায় বিশ্বাস এত অবিচল বলেও তিনি আধ্যাত্মিক।”[৮] দ্বিতীয় বিস্ময়, তাঁর আবিষ্কৃত সরল ভাষা (জটিল ভাষান্তর থেকে কবি ক্রমশ সরে এসেছেন সরল ভাষার দিকে)। ভাষার অন্তর্নিহিত করুণা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা ভাষাকে আরও সংবেদনশীল করেছে—যার সংস্পর্শে আসা মাত্র পাঠকের হৃদয় আলোড়িত হয়। কিন্তু এই আলোড়নে কবিতা ফুরিয়ে যায় না, পাঠককে ভাসিয়ে দেয় না করুণার আবেগ। বরং নিমগ্ন করে গভীর জীবনবোধে। বিস্ময়-প্রেমের সেতু পেরিয়ে পাঠক গিয়ে দাঁড়ায় গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার সামনে। এই দার্শনিকতাই তাঁর কবিতার আধেয়, বাকি বিষয়গুলি আধার।

আলোক সরকার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতোই কবিতায় শব্দবিন্যাসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন ‘উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য’, আলোক সরকারও তাঁর শেষদিকের কাব্যগ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি পোষণ করেছেন। তবে ভাববস্তুর প্রতি যত্নে কোনো অভাব রাখতে চাননি। কবির নিজের কথায়, “শব্দ অর্থ আর ধ্বনির সমন্বয়। বিন্যাসের নৈপুণ্যে তা অপার্থিব ভাবময়তায় উজ্জীবন ঘটায়। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন এবং

এটা অনেকেরই জানা 'শব্দ ও ছন্দ উভয়ের পরজীবী।'...আমার শেষদিকের কবিতাগুলো অংশত আশ্রয় করেছিল শব্দের পরজীবী আর তরল চরিত্রকে, শব্দবিন্যাস যার পটভূমিতে image বা অমলেন্দু বসুর কথায় 'বাকপ্রতিমা' রচিত হয় সেটা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল অবশ্যই।...শেষদিকের কবিতায় ভাষার পাশাপাশি শব্দবিন্যাস, ছন্দবিন্যাস, আর সম্পূর্ণতা এই তিনটিই আমার লক্ষ্য ছিল।”[৯] আলোক সরকারের প্রথম দিকের জটিল ভাষান্তরের কবিতায় সাংগীতিক ধর্ম রয়েছে, যা শ্রুতিগ্রাহ্য। অন্যদিকে সরল ভাষার কবিতায় রয়েছে ধ্বনিময়তা, যা অনুভববেদ্য। দু'টি দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রেখে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যাবর্ত'-এর 'অধ্যাস' কবিতা—এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে জমাট শব্দবিন্যাসে অনুপ্রাসের ঝংকার লক্ষণীয়: “বলিষ্ঠ বৈশাখী দীপ্ত। এখন সে কোন পথে যাবে?/ সম্মুখে পিছনে তার বার্তাহীন অন্ধকার। দৃষ্টি/ তার মুছে যায়। চিন্তা—অভিব্যক্তি তার অবক্ষয়ী ইন্দ্রধনু।” অন্যদিকে সরল ভাষার কবিতায় ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় কোমল, নিবিড় অনুভূতি: “একটা শব্দের পাশে / আর একটা শব্দ বসাতে/ ভয় করে।/ চারিদিক কেমন থমথমে হয়েছে দেখেছ।/ আজ দুপুর যেন শেষই হবে না।/ আজ দুপুর অরণ্য পার হয়ে যাচ্ছে, পাহাড় পার হয়ে যাচ্ছে (ভূমিকা কবিতা, শ্রেষ্ঠ কবিতা)।” জটিল ভাষা যেন কবির চেতন মনের ভাষা, সেখানে প্রতিটি শব্দ সচেতন চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে সরল ভাষার মাধ্যমে তিনি অবচেতন মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাই সরল ভাষা হয়ে উঠেছে অবচেতন মনের ভাষা। ফরাসি দার্শনিক জাক লাকাঁ তো বলেই গেছেন যে আমাদের অবচেতন মনের গঠন ভাষার গঠনের মতোই। কবি কালীকৃষ্ণ গুহ লিখছেন, “আলোক সরকারের কবিতায় দুটি সার্থকতাই রয়েছে আশ্চর্যভাবে—অবচেতনায় অর্জিত ধ্বনিময়তা, অপর্যাপ্ত চিত্র-নির্মাণ এবং চেতনায় অর্জিত জ্ঞান, বিশ্লেষণ, নিরাবরণ বিষাদ। এই চেতন-অচেতন সম্মিলিত জগতই আলোক সরকারের কবিতার জগৎ—সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, ব্যক্তিগত।”[১০]

তিন

আলোক সরকারের কবিতায় বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে আসি। প্রসঙ্গটি পুনরায় উত্থাপন করতে হল কারণ কবিতায় বিশুদ্ধতার ভাবনার উপর নির্ভর করছে আলোক সরকারের মৌলিক কাব্যভাবনার আরও নানা দিক। তরুণ কবির মনে কবিতার একটি পংক্তি বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির মতো হঠাৎ এসে পড়েছিল—“আমি তা নেব বা কেন আমার যা নয়?”[১১] এই প্রশ্ন কবিকে আজীবন ভাবিয়েছে। আমরা সাধারণভাবে

ততটুকুই দেখি—প্রকৃতি আমাদের যতটুকু দেখায়। নিত্যদিনের ভাবনাগুলোও অধিকাংশ প্রবৃত্তিতাড়িত, আর প্রবৃত্তির রূপ সকলের ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম। তাই আমাদের দেখা এবং ভাবনার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফূরণ, অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে না, অথচ কবি কিংবা শিল্পীর জন্য আবশ্যিক ব্যক্তিত্বের স্বকীয় উন্মোচন। কবি সত্তার এই আবশ্যিক ধর্মের প্রাথমিক বিকাশের সূত্রপাত ঘটে প্রকৃতির বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে। পরিণত বয়সে আলোক সরকার লিখলেন অসামান্য সব লাইন, যেখানে কবিতায় বিশুদ্ধতার উৎস-প্রেরণা চিহ্নিত হয়েছে—"অন্ধকারে আমি কোনো ছবিই দেখি না। আমি একদিন/ অন্ধকারে গোলাপফুলের ছবি দেখবো। নিবিড়/ অশথগাছের ছবি।/ ভোরের আলোর মধ্যে গোলাপ ভোরের। বৃষ্টির আলোর/ ভিতরে গোলাপ শুধু বৃষ্টির মলিন।/ আমি কোনোদিন/ গোলাপ দেখিনি তার নিজস্ব আলোয় ('গজমোতিমালা': মেঘনিবেশ)।" কিন্তু প্রাকৃতিক শর্তগুলিকে অতিক্রম করে গোলাপকে কি কখনো তার নিজস্ব রঙে দেখা সম্ভব? অন্ধকারে একজন কিভাবে গোলাপ দেখতে পারেন? বিষয়টি অলীক শোনাচ্ছে। কবি বলবেন 'অলৌকিক গজমোতিমালা'। কবি সেই অলৌকিককে আবিষ্কার করেন কল্পনা এবং মননের আশ্রয়ে। কল্পনা এবং মননই একমাত্র পথ, যা দৃশ্যকে অচেনা বিন্যাস দিতে পারে, ঘটনা-অভিজ্ঞতাকে নতুন অর্থময়তা। কবি ক্রমশ অনস্তিত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন। যা নেই তাকে নির্মাণ করে নেওয়াই শিল্প: "যা নেই/ তার প্রণাম মন্ত্র/ উচ্চারণ কর ('নিরক্ষবৃত্ত': আলস্যরঞ্জিতা)।" শিল্প আগাগোড়া এক নির্মিত বস্তু—এই ধারণায় ভর করে কবি একসময় নিজেকে ঘোষণা করেন 'মিথ্যার সাধক' হিসেবে। এক সাক্ষাৎকারে কবি জানাচ্ছেন, "শিল্পের সাধনা মিথ্যার সাধনাই...মিথ্যা বলতে যা আরো বেশি সত্য...অর্থাৎ আমরা ব্যবহারিক জীবনে যাকে দেখি...সাধারণ সংস্কারলালিত চৈতন্য দিয়ে তাকে আমরা সত্য বলে মানি...তা তো সত্য নয়...তা তো আমার দেখা নয়—সেটাই তো মিথ্যে। মানুষ যা হতে চায় সেটাই তো মানুষের সত্য পরিচয়, মানুষ যা হয়েছে সেটা তো তার সত্যকার পরিচয় হতে পারে না। বস্তুকে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে-ভাবে পাই সেটা তো তার সত্য পরিচয় না, সেটা নিশ্চয়ই আপাত সত্য, সত্য বুঝতে হলে বস্তুর কেন্দ্রে যেতে হবে।"[১২]

চার

আলোক সরকারকে আমরা স্তব্ধতার কবি বলতে পারি। বহিঃপ্রকৃতি-অন্তঃপ্রকৃতি জুড়ে যে বিশাল শূন্য—তার নৈঃশব্দ্য, স্তব্ধতাকে কবি ছুঁয়ে দেখেছেন। স্তব্ধতাকে বাঙ্ময় করে উপহার দিয়েছেন পাঠককে। কয়েকটি কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করা হল যেখানে আমরা

কবির অনুভূত স্তব্ধতাকে, শূন্যের নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে পারব—ক) "বাঁশবনের শেষে হঠাৎ আলোর দিঘি/ বাঁশি-বাজানো নীরব এপার থেকে ওপার বিকেল যখন নামে।" ('পথ': তমঃশঙ্খ) খ) "সোনালি রঙের প্যাঁচা বসে আছে স্তব্ধতায়। চারদিকে অমাবস্যার কৌতুক।/ কতো দীর্ঘদিনের বসে-থাকা কতো দিনের এই কৌতুক, ভাবনা শুরু করলে/ আরো বেশি কৌতুক।" ('কৌতুক': অমূলসম্ভব রাত্রি) গ) "নিমগাছের পাতায় থেমে গিয়ে/ সুন্দর কারুকাজের একটা ছবি/ বাগানের মাঝখানে/ তৈরি করেছে চাঁদের আলো।" ('৪', শোনো জবাফুল) ঘ) "একলা একটা ফুলের দুলে ওঠা/ কত কষ্টের ভেবে দেখেছ? কত চুপচাপ!" ('অভিযোগ': স্তব্ধতার চলাফেরা)

কবি লিখলেন "দু'হাতের ওপর মাথা রেখে/ চোখ বন্ধ করে এই যে নিস্তব্ধ/ তাকে কিছুতেই স্বপ্ননিবেশ বলা/ যাবে না ('তীর্থ সরোবর': তালকুঞ্জ, নারিকেল বীথি)।" অর্থাৎ স্তব্ধতা তাঁর কাছে এক 'জাগ্রত অভিনিবেশ'। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'উতল নির্জন', 'সূর্যাবর্ত', 'আলোকিত সমন্বয়' থেকে শুরু করে শেষের দিকের কাব্যগ্রন্থ 'শোনো জবাফুল', 'সবকটি দিন আম্রকুঞ্জের দিকে', 'স্তব্ধতার চলাফেরা' ইত্যাদি পর্যন্ত তিনি স্তব্ধতাকে ছুঁয়ে থেকেছেন। তবে একইরকমভাবে নয়। নিসর্গের চেনা কিছু উপাদান (যেমন বাড়ি, পথ, আমগাছ, জবাফুল, বিকেলবেলা) সহযোগে বিস্ময়কর চিত্রকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্তব্ধতার নানা রূপ তুলে ধরেছেন। প্রথমদিকের কবিতায় স্তব্ধতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল ভয়, উদাসীনতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা। কিন্তু এই সংযোগ ক্রমশ বদলে গিয়ে কবি স্তব্ধতার ভিতর খুঁজে নিলেন শান্তি, স্থিরতার কেন্দ্র। যে-স্তব্ধতা ছিল ভয়ের, রিক্ততার, কখনো বা কৌতুকের সেই স্তব্ধতার ভিতর কবি খুঁজে নিলেন কাঙ্ক্ষিত 'আশ্রয় নিবাস' যা শান্তির, আনন্দের—"...ভয় কখনোই নয় স্তব্ধতার ভয়/ শূন্যময় স্তব্ধতা সমাচ্ছন্ন অন্ধকার আমার নয় কখনোই।/ জেগে উঠেছে নীলোৎপল পাপড়ি দুলছে অসংশয়িত ('নীলপদ্ম': নিশীথ বৃক্ষ)।" স্তব্ধতার ভিতর নির্জন শান্তির স্বরূপকে আবিষ্কার করে কবির অসংশয়িত উচ্চারণ—"...জল নেমেছে/ ভিজে-যাওয়া নেই।/ শান্তি আছে।/ ঠাণ্ডা শান্তি।/ শান্তি অশান্তির/ প্রতিপক্ষ নয়।" ('যখনই পথে নামি': স্তব্ধতার চলাফেরা)

স্তব্ধতার পাশাপাশি আলোক সরকারের কবিতায় আরেকটি স্থিরকেন্দ্র ঈশ্বর। তাঁর কবিতায় ঈশ্বরচেতনার বিশ্লেষণে যাবার আগে 'স্থিরকেন্দ্র' সম্পর্কে কবির ধারণাকে স্বচ্ছভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি। একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানাচ্ছেন—"সবকিছু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। স্থির বলে কিছু নেই। এটা যতটা সত্য ঠিক ততটাই সত্য

যে ভেতরে একটা স্থির কেন্দ্র আছে। একটা স্তব্ধতা আছে। সেই স্তব্ধতার উপর পা রাখতে হবে আমাকে। পা রাখাটাই দরকার। আমি জানি সেটাই আমার মাটি।”[১৩] স্থিরতার এই কেন্দ্রে কবি কখনো পেয়েছেন ঈশ্বরকে, কখনো স্তব্ধতাকে, কখনো বা বিমূর্ত কোনো ধ্বনি বা রং। আলোক সরকার ঘোষিতভাবেই ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি। পঞ্চাশের আরেকজন কবির ঈশ্বরবিশ্বাস বাংলা কবিতার জগতে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল—তিনি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন—“বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;/ তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে/ আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?” তাঁরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখছেন, আস্থা রাখছেন—যখন যুক্তিবাদের জয়ডঙ্কা ক্রমশ মুছে ফেলতে চাইছে অদেখা, অপ্রমাণ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব। তবে অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে আলোক সরকারের ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রকৃতিগত বিরাট ফারাক। অলোকরঞ্জনের কবিতায় এসেছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ। কবি যেন বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়ানো এক অভিমানী সত্তা। তিনি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে চান, কিন্তু জীবনের সকল প্রেক্ষিতে বিশ্বাসের জায়গা থেকে ঠিক মতো সাড়া পান না বলে ঈশ্বরের প্রতিই অভিমানী হয়ে ওঠেন—“এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে/ না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দলে/ চলে যাও, তাহলে ঈশ্বর/ বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর বলে। (‘বন্ধুরা বিদ্রুপ করে’: যৌবনবাউল)।” আলোক সরকারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বর তাঁর স্থির কেন্দ্র—স্তব্ধতার কেন্দ্র, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাছে কোনো স্থির সত্তা নয়। “ঈশ্বর ক্রমপরিণত। নীল আমগাছটার তলায়/ অমল শিশুর কণ্ঠ, অমল আমাদের সাহজিক/ অনির্দিষ্ট ভ্রমণ (‘ঈশ্বর’: হিমপ্রহর)।” ঈশ্বরের ক্রমপরিণতির সমান্তরালে কবি নিজের সত্তার বিবর্তন অনুভব করেছেন, মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন এই দুই সত্তাকে। “ঈশ্বর, তোমার মতো একা, অন্যমন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস/ বিকশিত হয়ে আছি।” কিংবা “ঈশ্বর তোমার মতো আমিও নন্দিত, উদ্ভাসিত একটি দিঘির।” (‘অনিকেত’: অন্ধকার উৎসব)।” তবে কি আলোক সরকার সবসময়ে ঈশ্বরের সাড়া পান? তা, নয়—“ঈশ্বর বলেন কথা মাঝে-মাঝে”, কিন্তু সাড়া না-পাওয়ার সময়ে তিনি ঈশ্বরের প্রতি অভিমান করেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর স্থির প্রত্যয়। তাই, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা না-হওয়ার সময়ে প্রকৃতির রূপের মধ্যে খুঁজে নেন তাঁর স্পর্শ—“ঈশ্বরের ঘর ওই দূরে আলো-জ্বালা।/...ঈশ্বরের আলো নয় কিন্তু লাল ঝুমকোলতা দোলে (‘সারাদিন’:

অন্ধকার উৎসব”, “...জানি এখন ঈশ্বর/ দুই জানলার মাঝে আবহমান হেমন্ত (‘আবহমান হেমন্ত’)।” ঈশ্বরের অনুপস্থিতি কবিকে অবিশ্বাসী করার পরিবর্তে আরও সূক্ষ্ম ঈশ্বরবোধের দিকে নিয়ে গেছে। ‘ঈশ্বর ক্রমপরিণত’ এবং এই পরিণতি চরমে এসে স্তব্ধতার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তখন কেবলমাত্র অস্তিত্বে নয়, অনস্তিত্বেও ঈশ্বরের নিঃশব্দ উপস্থিতি অনুভব করেন কবি—“ঘটে টলমল করছে জল/ একবার তাকাই/ ফুল ছড়িয়ে আছে।/ পাতা ছড়িয়ে আছে।/ কোথাও একটা শব্দ নেই/ তারপর/ একটাও শব্দ নেই (‘৭০’, শোনো জবাফুল)।” কবি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন—“এতদিনে বুঝতে পেরেছি/ ভগবানের চলায় কোনো শব্দ নেই।/ খুব বড়ো একটা/ এপার-ওপার আছে।” (‘৭৩’, শোনো জবাফুল)

কবিতাকে কবি যেমন চেতনার বিশুদ্ধতায়, সম্পূর্ণতায় পেতে চেয়েছেন—কবিতার পথে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছেন, তেমনি ঈশ্বরকেও দেখতে চেয়েছেন চৈতন্যের সম্পূর্ণতার রূপে—“ঈশ্বরের কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই, যেমন ধর্মের। সব ঈশ্বরই ক্রমবিকশিত, ক্রমপরিণত। মানুষের চেতনার অন্তর্লীন সম্পূর্ণতার, ভাবময় নিশ্চয়ের দিকে যাওয়া, ঈশ্বরের দিকে যাওয়া।”[১৪] ধর্ম, শাস্ত্র, আচার, প্রথাগত বিশ্বাসের অনেক দূরে থেকে আলোক সরকার ঈশ্বরের ধর্মকে কবিতার ধর্মে মিলিয়েছেন, আর এখানেই তার ঈশ্বরভাবনা এক আধুনিক মাত্রা পায়—“ঈশ্বরের কোনো দেশ নেই, কাল নেই, বিন্যাস নেই। তা ঠিক সেইরকম অনুরাগী তাকে যে রকম রচনা করেছে। কবিতার কোনো দেশ নেই, কাল নেই, অনিবার্য বিন্যাস নেই। তা ঠিক সেই রকম কবিতা পাঠক তাকে যে রকম রচনা করেছে।”[১৫]

পাঁচ

আলোক সরকারের কবিতার ছন্দ ও তাঁর ছন্দোভাবনা প্রসঙ্গে আসি। আলোক সরকার ছন্দ বলতে ভাষার বিন্যাসকেই বুঝতেন—“ভাষার বিন্যাসের ভিতর দিয়েই ছন্দের মূল তৎপর্যকে স্পর্শ করা যায়।”[১৬] দীর্ঘ কাব্যসাধনার পথে তিনি ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সব ধরণের ছন্দেই কবিতা লিখেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দকে নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ছন্দের উপস্থিতি কবিতায় কখনো যান্ত্রিকভাবে ঘোষিত হয়নি। তা কবিতার ভাববস্তুকে অনুসরণ করেছে। পরিচিত ছন্দের কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল—

ক) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, মূল পর্ব আট মাত্রা:

আমি আরো দূরে যাবো। তেপান্তর পার হয়ে।। গহিন জ্যোৎস্নায় (৮+৮+৬)

সাদা শাড়ি-পরা মেয়ে। যেখানে লুটিয়ে আছে।। মরুময় প্রান্তের বুকে (৮+৮+৯)

('রূপকাহিনী': অন্ধকার উৎসব)

খ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, মূল পর্ব ছয় মাত্রা:

তুমি সব জেনে। অন্ধকারের—।। বন্ধ দুয়ার (৬+৬+৬)

হারিয়েছে তাও। যা ছিল একদা।। সুচির সুধার (৬+৬+৬)

('হাওয়ার পাখায়': সূর্যাবর্ত)

খ) স্বরবৃত্ত ছন্দ, মূল পর্ব চার মাত্রা:

থেকে থেকে। বৃষ্টি হচ্ছে।। বৃষ্টি থামছে (৪+৪+৪)

বৃষ্টি থামলে। ঝলক দিচ্ছে।। সোনালি রোদ (৪+৪+৪)

('আঁচল বলছে': খেলার সময়)

মাত্রাবিন্যাসের প্রথাগত ছন্দ থেকে সরে এসে তিনি ভাবের স্পন্দনকে কাজে লাগালেন কবিতায়। যতির পরিবর্তে ছেদ প্রাধান্য পেল। এক্ষেত্রে পর্বের মাত্রাবিন্যাস হয়তো সবক্ষেত্রে সমান নয় কিন্তু আমরা সহজেই ভাবনার স্পন্দন অনুভব করতে পারি:

তিনি কোনো। মন্ত্রপাঠ। শুনছেন না

মন্ত্রপাঠ। করছে না কেউ। পূজামণ্ডপ

প্রসারিত হচ্ছে। স্তব্ধ। পূজামণ্ডপ

গ্রাস করছে। আকাশ। পূজামণ্ডপ

গ্রাস করছে। সমুদ্র। আনন্দপবন।

('পূজামণ্ডপ': তালকুঞ্জ, নারিকেল বীথি)

কবি-বন্ধু, ছান্দসিক দীপংকর দাশগুপ্ত আলোক সরকারের কবিতার ছন্দের যে-মূল্যায়ন করেছেন, তা যথার্থ—"গদ্যের স্বাভাবিক পাঠ যে-স্বাভাবিক ছন্দের দ্বারা খণ্ডিত, সেই খণ্ডিত অংশগুলো জড় নয়, স্পন্দিত, এবং এই স্বাভাবিক ছেদের স্পন্দনকেই কবি তাঁর কাজে লাগিয়েছেন, প্রচলিত গদ্য কবিতার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, এই কবিতাগুলির ছন্দ অস্ফুট নয়, প্রায় পদ্যছন্দের মতোই প্রস্ফুট।"[১৭]

আলোক সরকার ছন্দ প্রসঙ্গে অভিনব এক ধারণার অবতারণা করলেন—'ছন্দোময় ছন্দোহীনতা'-র ধারণা। নির্দিষ্ট কতগুলি ছন্দের নিয়মনিষ্ঠ যান্ত্রিকতায় কবিতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা প্রকৃত ছন্দের উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত ছন্দের তাৎপর্য ছন্দোহীনতায়। আলোক সরকার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে—"'ছন্দ' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য ছন্দোহীনতা। পর্ব-বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা চরণের যে সুশৃঙ্খল

বিন্যাসকে পাই, সেই শৃঙ্খলা সামাজিক ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিকতাকে অমান্য করে, ছন্দকে ‘ছন্দোহীন’ করে। কেবল কবিতার ছন্দ নয়, গদ্যও এক ধরণের পর্ব-বিন্যাসের দোলার ভিতর অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, ভাঙতে পারে সাকল্যিক ভাষাব্যবহারের রূপ-রীতিকে।...সামাজিক স্বাভাবিকতা, বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে সে (ছন্দ) তার সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ভিতরে এনে বারবার করে তোলে অস্বাভাবিক, করে তোলে বিশৃঙ্খল, করে তোলে ছন্দোহীন।”[১৮] গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে কবির ছন্দোভাবনার কেন্দ্রে তার মূল দর্শন-চিন্তা কাজ করেছে। যা নেই, তার নির্মাণ। স্বাভাবিক ভাষাব্যবহারের নিয়মকে ভেঙে নতুন নিয়মের প্রতিষ্ঠা। আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শিল্পের শৃঙ্খলাকে খুঁজে নেওয়া।

ছয়

কবি আলোক সরকার পঁয়ষট্টি বছরের বেশি সময় ধরে কবিতার ঘরে বাস করেছেন। কবিতা লেখার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর, সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নিয়ে কবিতা লেখেননি। তাঁর কাছে “কবিতা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, ব্যক্তিমানুষের নিভৃতলোকের রাত্রিদিন, ব্যক্তিত্বের স্রোতধ্বনি, শৈলধ্বনি।”[১৯] কবিতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিভৃতির ফসল বলে মনে করেন, যার ভিতরে ব্যক্তিত্ব এবং কবিতা একই সঙ্গে হয়ে ওঠার দিকে যাত্রা করছে, পৌঁছাতে চাইছে নবীনতায়, বিশুদ্ধতায়, অন্তর্লোকের একক উদ্ভাসে। কবিতাকে অন্তর থেকে যেভাবে অর্জন করতে চেয়েছেন— সেই চাওয়ার নিজস্বতাকে বাইরের কোনো কিছুর দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হতে দেননি। অত্যন্ত সচেতনভাবে নির্মাণ করেছেন কবিতাকে দেখার দৃষ্টি, নিজের কাব্যভাবনা। তাঁর কাব্যভাবনা বিষয়ক গদ্যগুলির দার্শনিকতা ও ভাষাগত বিশিষ্টতার কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কবি কোনো দীর্ঘ কবিতার পথ অতিক্রম করে আত্মিক সম্পূর্ণতাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, পেরেছেনও। সারাজীবন ধরে একটিই কবিতা লিখে চলেছেন— এই ছিল আলোক সরকারের বিশ্বাস, তাই অবিরাম অজস্র কবিতা লিখে চলা, নিরবচ্ছিন্ন কবিতা যাপন। সকল দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে কবিতাকে ‘কবিতা’ করে তোলার দিকে তাঁর জীবনব্যাপী অভিনিবেশ, একান্ত সার্থকতাও সেখানে। পুরস্কার, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠার মোহ তাঁকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি, কবিতাকে শিল্পের অবস্থান থেকে কখনো নামিয়ে আনেননি জনপ্রিয় হওয়ার তাগিদে। আত্মগত নিভৃতে তাঁর লেখা নির্জনতার কবিতা, স্তব্ধতার কবিতা, জীবনের স্থিরকেন্দ্রের কবিতাগুলিকে আগামী সময়ে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন বাংলা সাহিত্যের পাঠক, গবেষকেরা—নিশ্চিতভাবে চিনে

নেবেন এক বিশুদ্ধ শিল্পীর, সৎ ও মহৎ কবির স্বতন্ত্র জীবনবীক্ষা, অমূল্য শিল্পবোধ, কাব্যভাবনা। আলোক সরকারের কবিতা পড়লে, তাঁর কাব্যভাবনার সঙ্গে পরিচিত হলে এই আশা এবং নিশ্চিত বিশ্বাস খুব স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়ে যায় পাঠকচিত্তে। কবির একটি কবিতা দিয়ে বর্তমান আলোচনায় ইতি টানা যাক: "কবিতা ছাড়া আর যা কিছু দিয়েই/ কবিতা লেখা হোক/ সেদিকে আমার খোঁজখবর নেই।/ কবিতার বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না।/ ওই কবিতার থাকা।/ কবিতা আছে, কবিতা নেই ('২৯': শোনো জবাফুল)।"

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ১৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩. সরকার, আলোক, (২০২০, মার্চ), স্মৃতিচিত্র: কবি জীবনানন্দ দাশ, *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা,* পৃ. ৭৮-৮৩
৪. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ১৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১১১
৮. গুপ্ত, মণীন্দ্র, (২০২০, মার্চ), আলোক সরকারের কবিতার জগৎ, *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা,* পৃ. ১৯০-১৯২
৯. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ৬২
১০. গুহ, কালীকৃষ্ণ, (২০২০, মার্চ), আলোক সরকারের কবিতা, *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা,* পৃ. ১৯৭-২০৬
১১. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ২৩৪
১২. দাশ, প্রকাশ (সম্পা.) (২০২০, মার্চ), *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা,* পৃ. ৩৬
১৩. ঘোষ, সাতকর্ণী (সংকলক), (২০১৬, সেপ্টেম্বর), *কথাবার্তা: কবি আলোক সরকার-এর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের সংকলন,* হাওড়া: সারঙ্গ প্রকাশনী, পৃ. ১০৭

১৪. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ৮৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১৭. দাশগুপ্ত, দীপংকর, (২০২০, মার্চ), আলোক সরকারের কবিতার ছন্দ, *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা,* পৃ. ১৫২-১৫৩
১৮. সরকার, আলোক, (১৪২২, বৈশাখ), *আমার কবিতা জীবন,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ১১৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, সাতকর্ণী (সংকলক)। (২০১৬, সেপ্টেম্বর)। *কথাবার্তা: কবি আলোক সরকার-এর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের সংকলন।* হাওড়া: সারঙ্গ প্রকাশনী।
২. দাশ, প্রকাশ (সম্পা.)। (২০২০, মার্চ)। *স্বকাল: কবি আলোক সরকার সম্মাননা সংখ্যা।*
৩. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। (২০০৫, জানুয়ারি)। *কবিতা সংগ্রহ (১ম খণ্ড)।* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
৪. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। (২০১৬, ডিসেম্বর)। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস (২য় সং)।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। (২০১৫,জানুয়ারি)। *কাব্যের মুক্তি ও তারপর (১ম সং)।* কলকাতা: প্রতিভাস।
৬. সরকার, আলোক। (১৪২২, বৈশাখ)।*আমার কবিতা জীবন।* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স।
৭. সরকার, আলোক। (২০১০, আগস্ট)। *কাব্যসমগ্র (১ম খণ্ড)।* কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন।
৮. সরকার, আলোক। (২০১২, এপ্রিল)। *কাব্যসমগ্র (২য় খণ্ড)।* কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন।
৯. সরকার, আলোক। (২০১৬, ফেব্রুয়ারি)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা (২য় সং)।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১০. সরকার, আলোক। (২০১৩,জানুয়ারি)। *শোনো জবাফুল।* কলকাতা: অভিযান।
১১. সরকার, আলোক। (২০১৪, ডিসেম্বর)। *স্তব্ধতার চলাফেরা।* নদীয়া: আদম।

বাংলা শিশু সাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্ব

সুমন্ত চন্দ
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: *গবেষক এই প্রবন্ধে বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার শুরু এবং ক্রমবিকাশের দিকটিকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাপেক্ষেতুলে ধরেছেন। আর রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত শিশু চরিত্রগুলির মানসিকতা, তাদের চিন্তার জগত, ভাবনার বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।*

মূল শব্দ: *শিশু সাহিত্য, রবীন্দ্র সাহিত্য, শিশু মনস্তত্ত্ব*

মূল আলোচনা:

ভিক্টোরিয়ান যুগে ইউরোপে এক মহিলা কবি Alice Meynell (1850-1922) তার 'children' নামক একটি বইতে মন্তব্য করেছিলেন, যেসমস্ত কবি, চিত্রকর ও ভাস্কর তাদের স্মৃতির মধ্যে কৈশোরের রোমাঞ্চকে ধরে রাখতে পেরেছেন তারা হলেন 'great boys'। রবীন্দ্রনাথ শিশু বিষয়ে শিশুর জন্য নিজের শৈশব স্মৃতিকে এত অসংখ্য লেখার মধ্যে এমন তুলনাহীন দক্ষতায় ধরে রেখেছেন যে তাকে আমরা নিঃসন্দেহে 'great boys' দের পংক্তিতে বসিয়ে দিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'শিশু' (১৯০৩) বইটি প্রকাশের আগে তিনি Alice এর 'children' বইটি কেনার জন্য আগ্রহী হয়ে প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখেছিলেন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে। তার বেশ কিছু বছর পরে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের নিয়ে নিয়মিত কবিতা লিখতে থাকেন। তবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, তার প্রায় ১৫ বছর আগে থেকেই ঠাকুরবাড়ি কেন্দ্রিক শিশুসাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

এক

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুর মিশন কতৃক 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটিতে শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনে কিছু অংশ লেখা হতো, পরবর্তী সময়ে শিশুপাঠ্য নানাবিধ আলোচনাও পাওয়া যায়। এটিকে কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। পত্রিকাটি সচিত্র ছিলনা। এতে ভূগোল, কৃষিকথা, প্রাণীতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী, ইতিহাস লিখিত ছিল। তখন বাংলা গদ্যের

শৈশব, তবুও এই পত্রিকা বেশ সহজ সরল ভাষায় লেখা হতো ‘চুম্বক পাথর সম্বন্ধে বর্ণনা’, ‘চীন দেশের মহাপ্রাচীর বিষয়ে’এবং ‘হিন্দুস্থানের ইতিহাস’ ইত্যাদি অনেক তথ্য পাওয়া যেত। আবার পুস্তিকার শেষে শব্দার্থ অভিধান দেওয়া থাকত। এই পত্রিকায় সুকুমারমতি ছাত্রগণকে বিজ্ঞান, ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর ভাষাতে বাক্যের শেষে অনেক ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন থাকতনা।

‘দিকদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশের চার বছর পর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ‘পশ্বাবলী’ নামে একটি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। সোসাইটি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ৪ঠা জুলাইপ্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকে বাংলা শিশুসাহিত্য এদেরই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সমৃদ্ধ লাভ করে। ‘পশ্বাবলী’ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের কাহিনীগুলি ইংরেজি থেকে সংগ্রহ করে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ পেত, পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবজন্তু বিষয়ক মাসিক পত্রিকা রূপ লাভ করে।‘পশ্বাবলী’কেই বাংলা দ্বিতীয় শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলা যেতে পারে, তবে তাঁর বিষয় ছিল মাত্র একটি। কয়েক বছর পর তার সাময়িক পত্রের রূপ আর ছিল না। প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ ছিল তার উদ্দেশ্য।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ৩১ শে ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্র ‘জ্ঞানোদয়’ নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তাতে নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোলের কাহিনী প্রকাশিত হত। তবে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি। মোট কয়টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। চীন দেশের বিবরণ, গ্রীস দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

পরবর্তীকালে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা শিশুসাহিত্য ও কবিতার ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ ক্রমবিকাশ ঘটে। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ঈশ্বরগুপ্তের কাল রূপে চিহ্নিত হলেও এই সময় তিনি সুকুমার মতি পাঠকগণের জন্য কোন কবিতা রচনা করেন নি। তবে গুপ্ত কবির প্রতিভা ছিল অসাধারণ । তিনি মনে করলে তাঁর পক্ষে শিশু পাঠকের জন্য কবিতা রচনার কিছুমাত্র কঠিন হতো না।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কয়েক বছর বাংলা শিশুসাহিত্য কিভাবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছিল সেই সময়কার নতুন কোন গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়ায় আমরা জানতে পারিনা। তবে এইটুকু জানতে পারা যায় সেই সময়ে কোন মৌলিক রচনা সৃষ্টি না হলেও তারপর প্রায় ২৫ বছর বাংলা শিশুসাহিত্যপ্রধান ছিল অনুবাদ সর্বস্ব। পরে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত থেকে বিবিধ বিষয় সংযোজন হতে থাকে। তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে জড়তামুক্ত করে প্রাণবন্ত করে তোলেন। আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়।

স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলের ইতিহাসে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে জড়িত। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের থেকে তিন বছরের বড় হলেও তার প্রিয় সুহৃদ ও সহপাঠী ছিলেন। শিশুশিক্ষা প্রথমভাগেই তর্কালঙ্কারের লেখনি এমনই একটি কবিতা কুসুমের সৃষ্টি যা অমলিন-

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।" [১]

কবিতাটি প্রভাতের মত নির্মল, প্রভাতী সুরে স্নিগ্ধ। শতাব্দীর শিশুসাহিত্যে এটি আদি মৌলিক কবিতা।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্মকার এর 'বালকবোধকেতিহাস' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির 'প্রথম ভাগ' এ মোট সতেরোটি কাহিনী প্রধান ঘটনা বা গল্পের উল্লেখ আছে, আবার প্রতিটি গল্পের শিরোনামে একটি করে ছন্দবদ্ধ উপদেশ আছে-

"বল হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জানি বা নিশ্চয়ই
বলের অসাধ্য বুদ্ধি প্রভাবে হয়।।" [২]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বালক বালিকাদের জন্য কয়েকটি নীতিমূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি রচনা করেন না কেন, সেগুলি উনিশ শতকের বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। মাইকেলের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে –

> *"নীতি মূলক কবিতা গুলি মাইকেল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন।......নীতি মূলক কবিতা গুলি ঈশপস্ ফেবলস এর আদর্শ বঙ্গালা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থাভাব ক্লেশদূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য হইবার জন্য, মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার অনেকগুলি সুন্দর। বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছে।"* [৩]

তার সর্বাপেক্ষা পরিচিত শিশুপাঠ্য কবিতা ‘রসাল ও স্বর্ণলতিকা’, তার ‘মেঘ ও চাতক’ কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য ---

“উড়লো আকাশে মেঘ গর্জন ভৈরবে
ভানু পালাইলো ত্রাসে
তা দেখি তড়িৎ হাসে;
বহিলো নিঃশ্বাস ঝড়ে;”[৪]

মাইকেলের এই কবিতাগুলি রচনা আর দু’বছর পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের একটি সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি বাংলা শিশুসাহিত্যে ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতাটির কিছু অংশ এই-

“রাত পোহালো ফর্সা হলো
ফুটলো কত ফুল
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুটিল অলিকুল।”[৫]

তর্কালঙ্কারের প্রভাত বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলেই মিল ও পার্থক্য ধরা পড়বে। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায়।

বিদ্যাসাগর-উত্তর যুগ বাংলা শিশুসাহিত্যে কবিতা ও গল্পের যুগ। আর এই যুগের প্রারম্ভ যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত ‘হাসি ও খেলা’ (১৮৯১) গ্রন্থখানি। তখনকার বালক-বালিকা পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা কেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে যোগীন্দ্রনাথগ্রন্থে কবিতা, ছড়া, জীবজন্তুর বিবরণ সম্বলিত প্রবন্ধ, গল্প, ধাঁধা, গণিত ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হতো। আর সেই সঙ্গে থাকত একরঙ্গা মোটা রেখায় আঁকা কতগুলি ছবি। উনিশশতকে শিশুপাঠ্য সামরিক পত্রিকাগুলি তার পথ সুগম ও ক্ষেত্র রচনা করেছিল। সেই জন্য তিনি বিদ্যাসাগরউত্তর যুগের অন্যতম পথিকৃৎ। এই গ্রন্থে উপেন্দ্রকিশোর, প্রমদাচরণ, রাজকৃষ্ণ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর গদ্য ও পদ্য রচনা আছে। সেগুলির কয়েকটি আজও বালক-বালিকাগন সানন্দেপাঠ করে।

এ তো গেল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা শিশুসাহিত্যের কথা, কিন্তু ইউরোপে শিশুসাহিত্যের জন্ম তার অনেক আগে থেকে। Wordsworth এর ‘We are seven’ কবিতায় দেখি একটি শিশুচরিত্রকে। কবিতাকে জিজ্ঞাসা করেছেন- কোথায় থাকো, ক’ভাই বোন?

শিশুটি উত্তর দিয়েছিল তারাসাতজন।দু'জন সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে, দু'জন বাড়িতে এবং দু'জন কবরে শুয়ে আছে। একথা শুনে কবি বললেন তাহলে তোমরা পাঁচজন। শিশুটি বলল- না।আমরা সাতজন। "O sir we are seven"

মৃত্যু বোধ ও জীবন বোধ তার কাছে জীবনের প্রাণময় অনুভূতিতে একই। এর যোগ বিয়োগের অভিজ্ঞতা তাকে এক সরলীকরণ এনে দিয়েছে।

১৩১০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা 'কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চিরকালের শিশুমনের একটি পরম কৌতুহলকে মানুষের মনোভাবনায় সঞ্চারিত করে দিয়েছেন-

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে-
'এলাম আমি কোথা থেকে,
কোনখেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।" [৬]

রবীন্দ্রনাথের শিশু কিশোর চরিত্রের এক অনবদ্য মানববিশ্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

দুই

প্রীতি (Affection) হলো শিশুর জীবনে একমাত্র প্রকাশ্য অনুভূতি। আর এই প্রীতির বিকাশ ধরে রাখার ফলে তার সামাজিকতার উন্মেষ হয়ে থাকে। সমাজের মধ্যে শিশুর স্নেহ প্রীতির আবহে বেড়ে ওঠে সাধারণত পিতা-মাতার মধ্যে, কখনো কখনো অন্যের স্নেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মনের ইচ্ছা ঘোরাফেরা করে খেলার জগতে, তুচ্ছ তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেই তার বিচিত্র আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়। আর স্নেহ ও অহংতৃপ্তিরউপাদান মিশ্রিত আকর্ষণে সহজেই ধরা দেয়। প্রীতির অভাব না থাকা সত্বেও পরিবারের সংকীর্ণ পরিবেশে প্রায় সংকুচিত থাকে তার ব্যক্তিত্ব, তাই নতুন কোনো স্নেহ আশ্রয় পেলে তাকে বেষ্টন করে সে সুস্থ ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত হয়। আবার পিতা-মাতার স্নেহ সত্বেও কোন কারনে বঞ্চনার বোধ থেকেও তার অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়।

'পলাতকা' কাব্যের 'ভোলা' কবিতায় প্রতিবেশী বালক ভোলা। হঠাৎ যেন মাটি কাঁপে ঝড়ের বেগে এসে পরে সদ্য সন্তানহারা বক্তার বুকের মধ্যে' আমি ভোলা' এইটুকুতেই তার চরিত্রের জন্য সব পরিচয় প্রকাশিত হয়। ঠিক তেমনই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নবীনের সাত বছরের ছেলে হাবলুর কথা মনে আসে। স্বামী গৃহে নতুন কুমুর সঙ্গে তার মা, নিস্তারিণী ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলে হাবলু এসে বলে 'জ্যাঠাইমা'। কুমু

তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে তার পিতৃদত্ত পুরো নামটা বল। তাকে 'গোপাল' বলে সম্বোধন করা হলে তার কানে এক নতুন সুর বেজে ওঠে। এমনকি কুম দাদার কাছে চলে গেলে তার দুঃখের পরিসীমা থাকেনা।

এখানে হাবলু, শিশু চরিত্রটি তার পিতা-মাতার স্নেহ বা প্রীতি থেকে বঞ্চিত নয়। তবুও চরিত্রটি পিতা মাতার কৃতি থেকে সরে এসে নবাগত বধু কুমুর প্রীতির স্পর্শে মিলিত হয়েছে।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের শৈলজার দু বছরের কন্যা উর্মির প্রথম দর্শনেই কমলাকে সে মাসিবলে অভিহিত করে। বিশেষ বয়সের যে কোন মেয়েকে অপ্রিয় বোধ না হলেই সে এইভাবে সম্বোধন করত।

উপরের আলোচিত কয়েকটি শিশু চরিত্র পারিবারিক অবরোধের মধ্যে নবাগত কারো প্রীতির স্পর্শে পরিবেশের দীনতা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিত্বের জাগরণ, শিশুসুলভ লুব্ধতা, চঞ্চলতা, সরলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের গুনে উজ্জল। এই চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক স্নেহ বঞ্চিত নয়, মোটামুটি ভাবে প্রীতির পরিবেশে পালিত বলেই তাদের সামাজিকতার বিকাশ হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের এই আধুনিক সমীক্ষার সঙ্গেকবির সৃষ্টি এখানে মিলিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি আধুনিক প্রতিবেদনেও তা সমর্থিত।

অন্যদিকে বলা যায় স্নেহশীল পরিবেশে শিশুর মন অনেকটা সংকুচিত অবস্থায় থাকে। শিশুর স্নেহ বা প্রীতি লাভের সাধারণ ক্ষেত্র হলো তার পিতা-মাতা। কিন্তু পিতামাতার কাছ থেকে তার স্নেহবা প্রীতি ব্যাহত হলে, তখন শিশু প্রীতি অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। তারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল-

> *'জীবিত ও মৃত' গল্পে জমিদার শারদাশঙ্করের শিশুপুত্র সতীশ এর জন্মের পর থেকে সে তার কাকিমা কাদম্বিনীর কাছে পালিত হয়। একদিন হঠাৎ কাদম্বিনীর মৃত্যু হয়েছে মনে করে তাকে দাহের জন্য প্রেরিত করে শ্মশান ভূমিতে, কিন্তু সে প্রাণ ফিরে পায়। পরে এদিকে সতীশ এর জ্বর হলে এবং একদিন কাদম্বিনী ফিরে এলে রোগাশীর্ণখোকা জ্বরের প্রলাপে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলে ওঠে, "কাকিমার জল দে"[৭]। ঘুমের ঘোরে চির অভ্যাসের মত কাকিমার কাছে জল খেল সে। পরে মুখচুম্বনে তার ঘুম ভেঙে গেল*

কাদম্বিনীকে জড়িয়ে ধরে বলে, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?....
আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস?" [৮]

গল্পটিতে সতীশ শৈশবে তার পিতা মাতার স্নেহ থেকে অনেক অংশে বঞ্চিত, কারন তার মা চিরঅসুস্থ। আবার পিতা জমিদার, সেই জন্য স্নেহশীল পরিবেশ থেকে শিশুর মন অনেকটা সংকুচিত। তেমনি কাকিমা, কাদম্বিনী অপুত্রক থাকার জন্য সতীশ এর উপর সন্তান রূপ স্নেহ ও প্রীতি বেশি দেখা যায়।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের হরিদাস শৈশবে পিতৃহীন। সে পরিবারের একমাত্র সন্তান এবং সর্বদা রক্ষক দ্বারা পরিবৃত। পিতৃহীন এই শিশু স্নেহ প্রীতি পেয়েছে অন্য এক পুরুষের কাছ থেকে। আবার পিতা-মাতারবর্তমানেও কারো কারো আংশিক বা সম্পূর্ণ স্নেহ আসে বাইরে থেকে, কারণ শুধুমাত্র পিতা-মাতার সান্নিধ্যের মধ্যেই শিশুর পক্ষে যথাযথ ভালোবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি চরিত্রটি এই পর্যায়ে পড়ে বলে মনে হয়। মিনি অনর্গল কথা বলে, এতে তাকে গম্ভীর প্রকৃতির মা তাকে ধমক দিয়ে কথা বলা বন্ধ করতে চাই। অপরদিকে পিতা নভেল লেখায় ব্যস্ত থাকার কারণে সে টেবিলের নিচে 'আগডুম বাগডুম' বকতে থাকে। হঠাৎ একদিন কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অবশেষে পেস্তাবাদাম ঘুষ পেয়ে তার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়। এখানে মিনি কাবুলিওয়ালার মত ধৈর্যশীল শ্রোতা সে আগে কখনো পাইনি।

এই চরিত্রটির মধ্যে শিশুমনের আতঙ্ক, সর্বদা মাতার শাসন, স্বাভাবিক পিতৃপ্রীতিও না পাওয়ার নিঃসঙ্গতা বোধ, খাদ্যের প্রতি লোভ, শিশুমনের মুক্তি অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া 'মেঘ ও রৌদ্র'গল্পের গিরিবালা এবং 'পলাতকা' কাব্যের 'চিরদিনের দাগ' কবিতায় শৈলবালা চরিত্রে যথাক্রমে প্রতিবেশী যুবক এবং প্রতিবেশীর বৃদ্ধের কাছে স্নেহধন্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সকল শিশু চরিত্র অঙ্কন করেছেন তারা শুধু শিশু মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, এক একটি চরিত্র যেন পরিণত মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের দেখেছেন বড়দের খুঁত ধরা দৃষ্টি দিয়ে নয়, একান্ত বেক্তিগত স্নেহে, সহৃদয় তার সঙ্গে। এরকম একটি চরিত্র হল 'খাতা' গল্পের উমা। ওমা বালিকাসুলভ চরিত্র নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি গল্পকার রবীন্দ্রনাথ। কবি নিজের বাল্য জীবনের কথা স্মরণ করে বলেছেন-

"লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাকা লাইন কাটিয়া বড় বড় অক্ষরেকেবলই লিখিতেছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।"[৯] তারপর আবার দুষ্টুমির সীমা ছিল না, উমা "বাড়ির সর্বদা ব্যবহার্য নতুন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথি নক্ষত্র খুব বড় বড় অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে"। আবার বলা যেতে পারে "উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালি কলম লইয়া সেই প্রবন্ধটি উপরে বড় বড় করিয়া লিখিল-গোপাল বড় ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়"। [১০]

এই লেখার জন্য সে দাদার কাছে মার খেলো ঠিকই কিন্তু পরে দাদা ব্যথিত হয়ে তাকে একটি লাইন টানা খাতা উপহার দিল। এই সাত বছরের শিশু মনের মধ্যে যে সহজতা, সরলতা তা যেন রবীন্দ্র লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাকে আমাদের প্রতিবেশী কোন এক শিশু ভাবতে মনে বিরূপতার সৃষ্টি হয় না।

তবে সর্বদা উমাকে আমরাশিশু চরিত্র রুপে দেখিতে পাই না, কারণ উমারশ্বশুরবাড়ি যাত্রা, সেখানে কবিতা লেখার নিষিদ্ধহলেও সে কবিতা লেখা চালিয়ে যায়। গল্পকারের কথায় বলাযায় "তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই স্বরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই"[১১]। ফলে এক নতুন পরিবেশে তাকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সন্ধ্যার সময় উমার স্বামী প্যারীমোহন এসে তাকে খুব উপহাস করেন, কিন্তু উমার লেখা সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও তার লেখা থেমে থাকেনি। শরৎকালের আগমনী গান শুনে উমা পূর্বের সমস্ত অপমানের কথা ভুলে গিয়ে গানটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে গোপনে। কিন্তু গান লেখা গোপন করলেও ননদিনীদের মারফতপ্যারীমোহন খাতাটি নিয়ে বালিকার লেখাগুলি উচ্চস্বরে পড়তে থাকে; "শুনিয়াউ মা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল এবং অপর তিনটি বালিকা শ্রোতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল"।[১২]

রবীন্দ্র সাহিত্যের এইরকম বেশকিছু শিশু চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক চরিত্রই এখানে আলোচিত হয়নি, তবে কবির লেখনীতে যে শিশু মনের একটি জগত ধরা পড়েছে তা বাস্তব থেকে উঠে আসা, যেন আমাদের চেনা-জানা কোন এক প্রতিবেশী বলে মনে হয়। রবীন্দ্রকাব্যে, গল্পে, গানে, নাটকে এবং উপন্যাসে এই সমস্ত শিশু দলকে দেখে মনে হয়, রবীন্দ্র সৃষ্টিতে এরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র। অর্থাৎ শিশু

চরিত্র বিহণে প্রায় কোন রচনায় সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে শিশু, সমাজ সংসারে আকাঙ্ক্ষিত ও সমাদৃত কিন্তু কবির ক্ষেত্রে তাদের দাবিটা ছিল কিছু অধিক। তার কারণ হয়তো শিশুকালে 'অনাদৃত' রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারিহয়ে সাহিত্যের শিশু চরিত্র সৃষ্টি করে তার শৈশবের সব আকাঙ্ক্ষাকে কল্পনায়, ভাবনায় সার্থক করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র

১. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, শতাব্দী শিশুসাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ.৬৪
২. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, শতাব্দী শিশুসাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ.৬৭
৩. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, শতাব্দী শিশুসাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ.১০৩
৪. তদেব
৫. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, শতাব্দী শিশুসাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ.১০৫
৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, জন্মকথা কবিতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ পৌষ, পৃ.৭
৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশিত, ভাদ্র ১৪১৮, পৃ.৯০
৮. তদেব
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪১৮, পৃ. ১৮২
১০. তদেব
১১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪১৮, পৃ. ১৮৪
১২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪১৮, পৃ. ১৮৫

সহায়ক গ্রন্থ

১. খাঁ আব্দুল লতিব, 'মেঘ ও রৌদ্র : চিরবিশ্ব'প্রবন্ধ, 'সম্পর্ক' পত্রিকা, সম্পাদক চন্দন খাঁ, ষষ্ঠবর্ষ সংখ্যা, ফাগুন ১৪১৭
২. ঘোষ তপোব্রত, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পুনর্মুদ্রণ: বাইশে শ্রাবণ ১৪১৭
৩. চট্টোপাধ্যায় হীরণ, সাহিত্য প্রকরণ (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, ১৪০৭

৪. চৌধুরীভূদেব, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০০
৫. চৌধুরী শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি, পঞ্চম প্রকাশ, ২০০৩
৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৮, চৈত্র ১৩৫৭, আষাঢ় ১৩৭৬ ও ফাগুন ১৩৯৪
৭. ঠাকুররবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, জন্মকথা কবিতা, বিশ্বভারতী প্রকাশিত, পৌষ ১৩৯৪
৮. মজুমদার উজ্জলকুমার, গল্প পাঠকের ডাইরি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫
৯. মিত্রখগেন্দ্রনাথ, শতাব্দীর শিশুসাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯
১০. রায়চৌধুরী রেখা, রবীন্দ্র চেতনায় শৈশব, দীপায়ন, জানুয়ারি ১৯৯৪
১১. সিংহরায় গোপীমোহন, রবীন্দ্রসাহিত্যের নর-নারী (আলোচনা: শিশু), ভারবি, প্রথম প্রকাশ: দীপাবলি ১৪০২

মা ও সন্তান সম্পর্ক : প্রসঙ্গ মনোজ মিত্রের নাটক

চন্দন কুমার সাউ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার:
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলা নাটকের ধারায় মনোজ মিত্র অন্যতম নাম। তাঁর নাটক মানেই সে যেন বহু চরিত্রের উপস্থিতিতে এক চরিত্র চিত্রশালা। বিচিত্র নর-নারী ভিড় করে এসেছে মনোজ মিত্রের সৃষ্টিজুড়ে। আর সেই চরিত্রদের ভিড়ে আলাদা করে আমাদের নজর কেড়ে নেয় তাঁর নারীচরিত্রগুলি তাদের মাতৃত্বের আবেদনে। মা ও সন্তান সম্পর্কের নানা মাত্রাকে ধরতে চেয়েছেন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে। ঈশ্বর নারীর মধ্যে যে স্নেহ-ভালোবাসার মতো গুণগুলি সঞ্চার করে দিয়েছেন, যার জন্য একজন নারী হয়ে ওঠেন মা—সেই মাতৃত্বের বিচিত্র আবেদন উঠে এসেছে মনোজ মিত্রের একের পর এক নাটকে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মনোজ মিত্রের কিছু নির্বাচিত নাটকের প্রেক্ষিতে তাঁর নাটকে উঠে আসা মাতৃত্বের বিচিত্র আবেদন তথা মা ও সন্তান সম্পর্কের দিকটিকে অনুসন্ধান করা। যা আমাদের বুঝে নিতে সাহায্য করবে মনোজের মা সম্পর্কিত ভাবনার স্বরূপটিকে।

সূচক শব্দ: *মনোজ মিত্র, মাতৃত্ব, সম্পর্ক, সন্তান, বিচিত্র আবেদন*

মূল প্রবন্ধ:

মানবজীবনের বিচিত্র সম্পর্কগুলোকে নিয়েই সাহিত্যের পথচলা। আর সেই সম্পর্কগুলির মধ্যে আদি ও অকৃত্রিম সম্পর্কটিই বোধহয় সন্তানের সাথে মায়ের স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কটি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলা নাটককারদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাম মনোজ মিত্রের কলমেও এই মাতৃত্বের বিচিত্র আবেদনকে আমরা উঠে আসতে দেখি। বস্তুত, হাসি বা হাস্যরস মনোজের নাটকের অবলম্বন হলেও হাস্যরসের আধারেই তিনি ছুঁতে চেয়েছেন কঠিন কঠোর সমাজবাস্তবতাকে, গভীরতর জীবনসত্যকে। আর সেই অন্বেষণের মধ্যে আমরা দেখেছি নারীপরিসর একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। আর সেই নারীভাবনা বা নারীপরিসরকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে মাতৃত্বের বিচিত্র আবেদনকে ছুঁয়ে থাকা নাটকগুলি। আসলে কেনই বা আসবেনা তাঁর লেখায় মায়ের কথা, আজ আমরা যে মনোজ মিত্রকে চিনি, তাঁর এই মনোজ মিত্র হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের তরফে একমাত্র যে মানুষটার সমর্থন তিনি

পেয়েছিলেন, তিনি তাঁর মা। তাঁর ‘ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষে’র মতো জীবনী গ্রন্থের পাতায় একটু চোখ বুলোলেই আমরা দেখতে পাব, প্রথম জীবনের সেই গল্প লেখা থেকে শুরু করে পরে নাটকে অভিনয় কিংবা সেই সূত্রে নাটক লেখার জগতে প্রবেশে পরিবারের কারোর সমর্থন তিনি পাননি, বিশেষত এব্যাপারে পিতা অশোক মিত্রের ঘোর বিরোধিতাই ছিল। একমাত্র তাঁর মা রাধারাণী দেবীর কাছেই তিনি পেয়েছিলেন এক অনুচ্চারিত সমর্থন। ফলে স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির সেই মায়ের কথা নানা প্রসঙ্গেই ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর স্মৃতিচারণায়। আর নাটক লিখতে বসে মানবিক সম্পর্কের নানা মাত্রাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যে মাতৃত্বের বিচিত্র আবেদনের দিকটিকেও ছুঁয়ে যাবেন তা বলাইবাহুল্য। আমরা মনোজ মিত্রের কয়েকটি নাটকের প্রেক্ষিতে দেখে নেবার চেষ্টা করব মনোজ মিত্রের নাটকের সেই মাতৃত্বের পরিসর, জননী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ভাবনার স্বরূপটিকে।

মাতৃত্বের এক অনন্য রূপ ধরা পড়েছে মনোজ মিত্রের ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’(১৯৮৯) নাটকে অলকানন্দা চরিত্রে। এই নাটকের প্রেক্ষাপট যদিও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন, তবু আমরা বলব এ নাটক নিছক নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা হয়ে থাকে নি। সন্তানহীনা অলকানন্দার মাতৃহৃদয়ের দাবিই এই নাটকের মূল আবেদন, যার কাছে এই নাটকের নাট্যঘটনার সমস্ত ঝড় ঝাপটা, আশাভঙ্গ তুচ্ছ হয়ে যায়--- শেষপর্যন্তও আমাদের এক বিশ্বাসের জগতে স্থিত রাখেন নাটককার। অলকানন্দা তার মাতৃহৃদয়ের দাবিতে দুজন অনাথ ছেলে মেয়েকে মানুষ করেন, মেয়েটির বিবাহ দেন এবং ছেলেটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করেন, তারাই তাঁর জীবনের সর্বস্ব। তাদের নিজের সন্তান ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেন না তিনি—

> *“কেন বার বার পুষ্যি পুষ্যি করো! ভাবতে পারো না ওরা আমার...আমার পেটের সন্তান...এটুকু মেনে নিতে জটিলতা কেন হয় তোমাদের!”* ১

সন্তানের ক্ষেত্রে পেটের সন্তান, পালন সন্তানের পার্থক্য দেখে না অলকানন্দার মাতৃহৃদয়। অথচ সেই ছেলে শুভ, আজ কলেজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাথে অসৎ সঙ্গে পড়ে যখন মায়ের কাছে টাকা দাবি করে পায় না, তখন ছুটে যায় বাদুড়বাগানে তার নিজের ধনবান পিতার কাছে। এক মুহূর্তে তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় তার মায়ের সমস্ত ত্যাগ, ভূমিকা—বড়ো হয়ে ওঠে স্বার্থ আর সুবিধাবাদী মানসিকতা। অন্যদিকে বিবাহিত মেয়ে তার স্বামীর অত্যাচারে জর্জজরিত হয়েও আজ প্রত্যাশা করে না তার এই পালক

মায়ের কোন সাহায্য। তাই তাকে ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশা নিয়ে বসে থেকে অলকানন্দার মাতৃহৃদয় শুধু একরাশ শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতারই মুখোমুখি দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত বন্ধুদের র‍্যাগিং'এর শিকার মানসিক ভারসম্যহারা শুভকে অলকানন্দারই চোখের সামনে দিয়ে অ্যাসাইলেমে নিয়ে যাওয়া হয় পশুর মতো হাত পা বেঁধে। আর এই সব কিছুর জন্য যখন তাঁর দাদা থেকে শুরু করে ভাইপো পার্থ সবাই তাকে দোষ দেয়, কেন সে অযথা নিজের ঘরে বিপদ ডেকে আনে, কে বলেছিলে তাকে এভাবে পরের সন্তানদের বুকে তুলে নিতে! কিন্তু এসবই তুচ্ছ অলকানন্দার মাতৃত্বের কাছে, পালন করা সন্তানদের থেকে আঘাত পেয়েও তাঁর শূন্য মাতৃহৃদয় আবারো নতুন করে আশা দেখে পাশের ঘরের দেবাহুতির ফেলে রেখে যাওয়া সন্তানটিকে ঘিরে। তাকে আঁকড়েই আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে তাঁর মাতৃহৃদয়।

এই নাটকেই মাতৃত্বের আরেক রূপ আমরা খুঁজে পাই দেবাহুতি চরিত্রকে ঘিরে, যা আমাদের মা সম্পর্কে চিরন্তন বিশ্বাস আর ভাবনাগুলিকেই যেন ভেঙে দেয়। একদিকে যখন অলকানন্দার মতো নারী সন্তানকে গর্ভে ধারন না করেও স্নেহে-ভালোবাসায়-কর্তব্যে হয়ে উঠেছেন যথার্থ একজন মা, তখন সন্তানের জন্ম দিয়েও সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্বকে দিনের পর দিন অস্বীকার করেছে দেবাহুতি। বারে বারে সে তার কোলের সন্তানকে অলকানন্দার কাছে ফেলে রেখে সারাদিন বাইরে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে কাটিয়ে মদ্যপ অবস্থায় রাত করে বাড়ি ফিরে এসেছে। এবং নাটকের শেষে চিরতরেই সে নিজের সন্তানকে ফেলে রেখে গেছে অলকানন্দার উপর ভরসা করে। বস্তুত, আধুনিকতার উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী রূপটিকে মনোজ মিত্র কখনোই সমর্থন করেন নি। বারে বারে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাঁর এই অন্তঃসারশূন্য উদ্ধত আধুনিকতার প্রতি বিরূপ মনোভাবের দিকটি। এই নাটকে দেবাহুতির মতো মায়ের চরিত্র অঙ্কনে যেন তারই ছায়া আমরা লক্ষ করি। যেখানে আধুনিক স্বেচ্ছাচারী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবাহুতির মতো নারীরা অস্বীকার করতে পারে নিজেদের সন্তানকে, নিজেদের মাতৃত্বের দাবিকে। আর এই চিত্র তো কাল্পনিক নয়, আজকের দিনে যখন বারে বারে আমরা দেখি আমাদের চারপাশে কত মা তার সন্তানকে ফেলে রেখে যাচ্ছে, গলাটিপে হত্যা করছে নিষ্পাপ সদ্যজাতকে--- তখন তো দেবাহুতির কথায় আমাদের মনে পড়ে যায়। আসলে আজকের ভোগসর্বস্ব জীবনের হাতছানি কেমন করে নারীর মাতৃত্বকেও টালমাটাল করে তোলে, সময়ের

গভীরতর অসুখ যে আজ একজন নারীর মাতৃত্বের ঘরেও বাসা বাঁধছে----সেই গভীরতর সমাজবাস্তবতার দিকটাকেই তো মনোজ মিত্র ছুঁতে চেয়েছেন এই নাটকে।

অন্যদিকে মাতৃত্বের আরেক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে রচিত জনপ্রিয় নাটক 'চাক ভাঙা মধু'র(১৯৬৯) বাদামী চরিত্রে। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার যন্ত্রণা যে পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে, যেখানে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে ঘরের দাওয়ায় অপেক্ষা করে থাকে বাদামী তার পিতা মাতলা ওঝার ফিরে আসার জন্য এবং শূন্য হাতে ফিরে আসলে যে মেয়ে তার পিতাকে ক্ষুধার তাড়নায় খামচে দিতে যায়---সেই বাদামীই আজ বাদে কাল সন্তানের জন্ম দেবে। স্বামী পরিত্যক্তা বাদামীর জীবনের সব আশা এই সন্তানটিকে ঘিরেই। কিন্তু তার মাতৃহৃদয় যেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন আশা খুঁজে পায় না। এই অবস্থায় মহাজন অঘোর ঘোষের সাপে কাটা দেহ মাতলা ওঝার বাড়ির দাওয়ায় নিয়ে আসা হলে মাতলা কিংবা তার কাকা জটা যখন বিষ ঝাড়াতে রাজি হয়না নিজেদের নিরাপত্তার কারণে, তখন বাদামীর সংলাপটুকু লক্ষণীয়--

"বাপ! (বাদামীর গলার স্বরে সবাই মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল) এট্টা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচতি লেগেছো!" [২]

মনোজের নাটকের যে মানবিক আবেদন, সেখানে এই সংলাপটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ নিছক নিঃস্বার্থ মানবিক উচ্চারণ নয়, এর মধ্যে তার মাতৃহৃদয়ের আশা আকাঙ্খাও যেন অনেক খানি মিশে আছে। আসলে বাদামীর মনে হয়েছে অঘোর ঘোষ প্রাণ ফিরে পেলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিশ্চয় তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে, তাদের আর অভাব থাকবেনা। বিশেষত অভাবের সংসারে সন্তান-সম্ভবা বাদামীর মাতৃহৃদয় যেন এক্ষেত্রে সন্তানের ভবিষ্যৎ ব্যাপারে একটা আশা খোঁজে। এই অবস্থায় অঘোর ঘোষ যখন প্রাণ ফিরে পেয়ে তাদের থেকে সুদের দাবি করে, হিংস্র পশুর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বাদামীকে দেখে---তখন তার এই বিরুদ্ধ আচরণের প্রেক্ষিতে বাদামীর রণংদেহী মূর্তির কার্যকারণটুকুও আমাদের কাছে আর অর্থহীন কিংবা আরোপিত ঠেকে না। আসলে এ তো শুধু মহাজনের শোষণে শাসনে জর্জরিত গ্রাম সমাজের একজন হয়ে বাদামীর প্রতিবাদ নয়, কিংবা তার নারীত্বের শুধু অসম্মান নয়----এর মধ্যে অনেক খানি মিশে আছে তার অপমানিত, আশাভঙ্গে উদ্ধত মাতৃহৃদয়ের প্রতিবাদী রূপটি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে রচিত মনোজ মিত্রের 'নেকড়ে'(১৯৬৮) নাটকটির নীহার চরিত্রটির কথাও। মাতৃত্বের একই

প্রতিবাদী, দৃঢ়চেতা রূপকে আমরা খুঁজে পাই এই নারী চরিত্রেও। মহাজন কংসারির বিরুদ্ধে বাদা অঞ্চলের সমস্ত শোষিত বঞ্চিত মানুষদের যে সংগ্রামের পথে সে ডাক দিয়েছে নাটকের শেষে, সেখানে আপন সন্তানের সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়, তথা মহাজন কর্তৃক আপন পুত্রের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধস্পৃহার একটা বড় ভূমিকা আছে। ক্ষমতার জোরে মহাজন কংসারি নীহারকে তার স্বামীর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়ে ছিল, কিন্তু নীহারের গর্ভের সন্তানকে সে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং মা হিসাবে আপন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যখন নীহার মহাজনের কাছে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে নিজের সন্তানকে দাবি করে, তখন নিষ্ঠুর মহাজন নৃশংসভাবে সেই সন্তানকে হত্যা করে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও আপন সন্তানের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি নীহারের মাতৃহৃদয়। ফলে এই নাটকে মনোজ একদিকে আদিবাসী কৃষকদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা আর তার থেকে মুক্তির জন্য সম্মিলিত প্রতিবাদী চেতনা এবং অন্যদিকে আপন সন্তানের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একজন মায়ের প্রতিবাদী মূর্তি—এই দুই ধারাকে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। আসলে নীহারের অন্তরের মাতৃহৃদয়ের যে প্রতিবাদী জ্বালাময়ী রূপ, যে প্রতিশোধস্পৃহা তাই যেন তাকে প্ররোচিত করেছে একটি বঞ্চিত অসহায় শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের পথে অগ্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে।

বস্তুত মনোজের নাটক সম্পর্কে চন্দন সেন লিখেছেন—

> *“কিন্তু জটিল মানবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বাস্তব ভূমিতে দাঁড়িয়ে মনোজ মিত্রের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, শ্রেণীসংগ্রামের পুরনো নাটকগুলোও ...এখনো মঞ্চে সরস সজীব হয়ে ওঠে। কারণ মনোজ মিত্র চরিত্র সৃজনের আগে শ্রেণীকে ভাবেননা, মানুষকে ভাবেন...”*[৩]

ফলে তাঁর শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকগুলিও একটা হৃদয়ানুভূতির রসে আর্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। কারণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রচলিত ছক ভেঙে অনেকক্ষেত্রেই তিনি সম্মিলিত প্রতিবাদের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন একক মানুষের প্রতিবাদের ঢঙটিকে। আর সেখানে নারীর অবস্থানটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যার প্রতিবাদী রূপটি নিছক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য শোষিত মানুষের একজন হিসাবে প্রতিবাদ নয়, বরং তাতে মিশে আছে নারীর মাতৃহৃদয়ের প্রতিবাদী রূপটি---তা সে ‘চাকভাঙা মধু’র বাদামী হোক, কিংবা ‘নেকড়ে’ গল্পের নীহার হোক।

মাতৃত্বের আরেক রূপ আমরা পাই মনোজের 'নরক গুলজার'(১৯৭৪) নাটকে ফুল্লরার মধ্যে। প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে ক্ষণিকের জন্য একজন নারীর মাতৃত্বের টালমাটাল রূপ, দোলাচলতা এবং ঘটনাচক্রে আবার সেই নারীর নিজের মাতৃত্বের স্বমহিমায় ফিরে আসার এক খণ্ড চিত্রকেই যেন আমরা ফুল্লরা চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করি। যেখানে দেখি মানিকের সঙ্গে সংসার করবে বলে বেরিয়ে ফুল্লরার ভাগ্যে ঘর তো দূরের কথা দুবেলা খাবার পর্যন্ত জোটে না, ঠাঁই হয় শহরের ফুটপাথে। এই ঘৃণ্য জীবন থেকে ফুল্লরা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, আর তাই সে শুধু মানিককে নয়, ফেলে রেখে যেতে চেয়েছে নিজের কোলের সন্তানটিকে পর্যন্ত। বস্তুত, ফুল্লরার এই সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে মা সম্পর্কে আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসকেই যেন আঘাত হানে। কারণ কখনো কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই একজন মা তার সন্তানকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাই তো ফুল্লরার এই কঠিন সিদ্ধান্তে যেন পাঠকের হয়েই মানিককে আমরা প্রশ্ন করতে শুনি---

> *"ফুলি! তুই মা হয়ে...*
> *ফুল্লরা// মা! থু! চলে যাব গঙ্গার পাড়ে...বাবুরা গান শোনবে...নাচ দেখবে...পান খাওয়াবে...তোর ঘরে...তোর সোমসারে থুঃ থুঃ---*
> *[ফুল্লরা বেরিয়ে যায়]"* [৪]

কিন্তু যে মুহূর্তে সে দূরে যমরাজের ছায়া দেখতে পেয়েছে, সেই মুহূর্তে সন্তানের বিপদের আশংকায় তার মাতৃহৃদয় আঁতকে উঠেছে, ছুটে গিয়ে সে কোলে তুলে নিয়েছে নিজের সন্তানকে। আসলে এখানেই নাটককার আবার দেখিয়ে দিলেন মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন রূপটিকে। প্রতিকূল পরিবেশ আর পরিস্থিতির সাথে নিত্য যুঝতে যুঝতে ফুল্লরা এই জীবন সম্পর্কে ধিক্কার জন্মেছে, তাই একটু ভালোভাবে বাঁচতে সে এই জীবনের সবকিছুকে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। এমনকি কোলের সন্তানের বাঁধনটিকেও পর্যন্ত অস্বীকার করার মতো চরম হৃদয়হীন কথাও তার মুখে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু এ যে তার হৃদয়ের কথা নয়, তারই প্রমাণ মেলে সেই সন্তানকেই যখন সে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছে----

> *"মা! মা! ......ও সোনা তোমায় ফেলে কুথায় যাচ্ছিলাম! ও সোনা আমি চলে গেলে তোমার গায়ে আঁচলটা টেনে দেবে কেডা!"* [৫]

এরপরও আমরা দেখেছি, মানিকের মৃত্যুর পর উপায়ান্তর না পেয়ে গাছতলায় নিজের সন্তানকে শুইয়ে বাবুদের কাছে দেহ বিক্রি করে সে অর্থ উপার্জন করেছে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। আসলে মাতৃত্বের এক অনন্য রূপই যেন উঠে এসেছে

ফুল্লরার আধারে। নারীর মাতৃত্বই সেই সম্পদ, যা বোধহয় বাইরের ঝড় ঝাপটার মধ্যেও তার বাঁচার রসদ। একজন নারীর বাইরের পরিচয়ে কলঙ্কের দাগ লাগলেও, তার মাতৃহৃদয়ে যে কখনো কলঙ্ক লাগে না ---ফুল্লরা যেন সেই সত্যকেই আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। সন্তানের জন্য তার মাতৃহৃদয়ের দাবির কাছে যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে তথাকথিত দেহের শুচিতা সম্পর্কিত যাবতীয় সমাজসংস্কারের প্রসঙ্গ।

মাতৃত্বের আরেক ভিন্নতর রূপ ধরা পড়েছে মনোজ মিত্রের ‘রঙের হাট’(২০০৪) নাটকে শান্তা চরিত্রে। যদিও এই মাতৃত্বের আবেদন কোন পেটের সন্তান কিংবা অলকানন্দার মতো তা রক্তের সম্পর্কহীন অন্য কারো সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়নি --- বরং তা আবর্তিত হয়েছে একটি পোষ্য ছাগল ছানাকে ঘিরে, যার নাম ফুটু। এই নাটকের শান্তা পেশায় একজন পতিতা। সে তার সন্তান সম ফুটুকে জনৈক বাবুর মন রক্ষা করতে কসায়খানায় সন্যাসী ঠাকুরের কাছে বিক্রি করে দেয়। কারণ বাবু তার ছাগল ছানাটিকে পছন্দ করতেন না এবং তিনি বলেছিলেন ফুটুকে যে দামে সে বিক্রি করতে পারবে তাকে সে তার কয়েকগুণ বেশি টাকা দেবে। এই অবস্থায় শান্তার মনে এক আশার সঞ্চার ঘটে, ওই টাকা নিয়ে সে পতিতা জীবনের অসম্মান থেকে বেরিয়ে আর পাঁচজনের মত সম্মানের সাথে বাঁচার কোথা ভাবে। কিন্তু নিজের মাতৃত্বের দাবিকে এভাবে বিসর্জন দিয়ে যে ভালোভাবে বাঁচা যায়না, তা সে বুঝতে ভুল করেছিল। ফুটু তার কাছে নিজের পেটের সন্তানের থেকে কোন অংশেই কম ছিল না, ফুটুকুকে হারিয়ে সেকথা শান্তাকে উপলবদ্ধি করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত ঘটনাচক্রে যখন সে আবার ফুটুকে ফিরে পায়, হা্রিয়ে যাওয়া কোলের সন্তানকে ফিরে পেয়ে একজন মা যেমন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন পরম মমতায়, ঠিক তেমনি ভাবেই পরম মাতৃস্নেহে তাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। কারণ ফুটুর জন্য যে ভালোবাসা, দরদ, মমতা তার অন্তরে রয়েছে—তাকে সে বিক্রি করতে পারে নি। আর এই প্রসঙ্গেই ফজলুর কথায় ধরা পড়েছে এক গভীর জীবনসত্য---

> *“দ্যাখো বহিন, বাজারে দেহ-র কোন দাম নেই......ওই খালপাড়ে জন্মেও দেখেছি, এপারে এসেও দেখেছি... ।গরু-ছাগলেরও দাম নেই আমার মা-বহিনেরও কোন দাম নেই! দাম যেটুকু যা আছে তা ঐ খোদাতালা তোমার কলজে ভরে যা দিয়েছেন, ঐ মায়া মমতা ভালবাসা--ঐ যে মণিমুক্তাগুলো----ঐগুলোরই দাম।”* [৬]

ফজলুর কথাতেই উঠে এসেছে শান্তার মাতৃহৃদয়ের স্বীকৃতি। বস্তুত মনোজ মিত্র এই নাটকে আমাদের এই গোটা সমাজটাকেই আজ একটা খোলা বাজারের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে সব কিছুই আজ একটা নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি হচ্ছে, সেখানে নারীর দেহেরও নির্দিষ্ট ক্রয়মূল্য আছে। কিন্তু যার কোন ক্রয়মূল্য থাকতে পারে না, তা বোধহয় নারীর অন্তরের অন্তস্থলে থাকা স্নেহ ভালোবাসার মতো উপাদানগুলো--যা তার নারী পরিচয়কে মাতৃত্বে উন্নীত করে। মনোজ মিত্রের নারীভাবনার স্বরূপটিও যেন এখানে আমাদের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না, যা অনেকটা শরৎচন্দ্রের ভাবনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নারী বাইরে যতই পতিতা হোক, কিংবা কুলটা হোক—তার অন্তরে ঈশ্বর যে স্নেহ ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছেন, যে মাতৃহৃদয় তার মধ্যে ভরে দিয়েছেন তাতে কখনো কলঙ্কের দাগ পড়ে না। তাই তো ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে পিয়ারী বাইজী তথা রাজলক্ষ্মী শেষপর্যন্ত বঙ্কুর প্রতি নিজের মাতৃত্বের দাবিকেই বড় করে দেখেছে, তাকে আঁকড়েই বাঁচতে চেয়েছে। আসলে একজন নারী অর্থের প্রয়োজনে, অস্তিত্বের তাগিদে নিজের দেহটাকেই পসরা করে বসে, কিন্তু তার মাতৃত্বকে সে কখনো বিক্রি করে দিতে পারেনা। শান্তা সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল বুঝতে পারে। মনোজের আরো বেশ কিছু নাটকেই আমরা দেখেছি পতিতা জীবনের মাঝেও একজন নারীর এই মাতৃহৃদয় কিভাবে নানা প্রসঙ্গে উঁকি দিয়েছে। তার প্রমাণ তাঁর ‘কিনু কাহারের থেটারে’র উদাসিনী, তার প্রমাণ আমাদের আলোচ্য ‘রঙের হাট’ নাটকের শান্তা। বস্তুত, পতিতাবৃত্তিকে একটি পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে লড়াই করে যাওয়া কোস্টারিকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম সদস্য ক্যারিনা ভেস উইজিকের একটি মন্তব্য এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যা থেকে পতিতাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যার দিক উঠে আসে----

> *“আমি দীর্ঘ বছর ধরে যৌনকর্মীদের নিয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ওদের চিন্তাভাবনার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। ওরা বিনা শ্রমে রোজগার করে এতই আয়েসি হয়ে পড়েছে যে এখন ওদের পক্ষে পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণ অসম্ভব।”* [৭]

কিন্তু এই নাটকের শেষে পতিতা শান্তার অসম্মানের জীবন থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে, আর সেই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে তার মাতৃহৃদয়ের দাবিকে সম্বল করেই। নাটকের শেষে তাই দেখি শান্তা আর ফিরে যায় নি খালপাড়ের ওপারের পতিতাপল্লীর জীবনে।

তার যাত্রা এবার ভিন্ন পথের অভিমুখে, আর সেই পথে সন্তানতুল্য ফুটুই হয়েছে তার একমাত্র সম্বল।

রক্তের সম্পর্কের বাইরে নারীর মাতৃত্বের আরেক মধুর আবেদনকে আমরা খুঁজে পাই মনোজের 'হ্যালো মাম'(২০১৪) একাঙ্কটিতে। আজকের এই আধুনিক শিক্ষা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে দাঁড়িয়ে যখন পুরুষের সাথে সমান তালে বেশির ভাগ বাড়ির মেয়েরাও নিজেদের কর্মক্ষেত্র নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই সব পরিবারের সন্তানেরা দিনের একটা বড় সময় মাতৃস্নেহ তথা মায়ের সাহচর্য ছাড়াই কাটাতে বাধ্য হয়। যে সমস্যার দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ----

> *"অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের জীবন বর্তমান সমাজে পিতৃমাতৃত্বের নিবিড় সান্নিধ্য ও স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। পাশ্চাত্য সমাজবিদরা একে 'পেরেন্টাইল ডিপ্রাইভেসান' এর সমস্যা বলেছেন। বিশেষকরে মাতৃস্নেহের উপরই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। গৃহের আকর্ষণ প্রধানত মাতৃকেন্দ্রিক। সেই মা যদি দিনের প্রথম প্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে কর্মব্যস্ত থাকেন এবং সন্ধ্যায় দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন তাহলে তাঁর পক্ষে মাতৃত্বের প্রাথমিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয় না।"*[৮]

আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটটিকেই 'হ্যালো মাম' একাঙ্কটিতে ব্যবহার করেছেন নাটককার। এই নাটকেও দেখি পনের বছরের অসুস্থ অয়নের মধ্যে নিজের মাকে কাছে পাবার জন্য, তাঁর সান্নিধ্যের জন্য প্রবল আকুতি—যা এই নাটকের অন্তিম ব্যঞ্জনা হয়ে উঠেছে। অয়ন যেন আজকের দিনের এমন শত শত পরিবারের সেই হতভাগ্য সন্তানদের প্রতিভূ, যারা তাদের ছোটবেলা থেকেই মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, মানুষ হয়েছে রক্তের সম্পর্কের বাইরের কোন অনাত্মীয় কাজের লোকের কাছে।

আমরা নাটকের শুরু থেকেই দেখেছি অয়ন একটা খেলনা মোবাইল কানে দিয়ে মায়ের সাথে কথা বলেছে, তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে, মাকে তারাতারি ফিরে আসার জন্য বার বার বলছে—

> *"হ্যালো মাম, আর কখন আসবে তুমি! সাড়ে সাতটা বেজে গেল! ......বাজে কথা বলবে না ......এখনো তোমার নাইট ডিউটি চলছে!*

...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব বুঝি বুঝলে ......থোড়াই আমার কথা মনে আছে তোমার!......খালি টাকার গন্ধ তোমার গায়ে!”[৯]

কিন্তু নাট্যঘটনা সূত্রে আমরা জানতে পারি বছর দুই আগে অফিস থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তার মা মারা যায়। এই অবস্থায় অয়নের পিতাও তাকে সময় দিতে পারে না, আর মা যখন ছিলেন তিনিও যে নিজের কর্মক্ষেত্রেই ব্যস্ত থাকতেন—তার প্রমাণ অয়নের ফোনে অবিরত মাকে ফিরে আস্তে বলার মধ্যেই ধরা পড়ে। বোঝা যায় শুধু শারীরিক নয় মানসিক দিক থেকেও আজ অয়ন কিছুটা বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় অয়নের আজ দু বছর ইঞ্জেকসান চলছে, আজও সেই ইঞ্জেকসন দিতে আসেন পৌঢ়া নার্স ললিতা দেবী। আর নাটকের মূল আবেদনের জায়গাটা ব্যঞ্জিত হয়েছে এই ললিতা দেবীকে ঘিরেই। বস্তুত, মনোজের নাটকে আমরা বার বার দেখি, যখন রক্তের সম্পর্কের মধ্যে দানা বাঁধে স্বার্থ আর সুবিধাবাদের বীজ—তখন রক্তের সম্পর্কের বাইরের লোকেরাও কেমন করে আপন হয়ে যায়। আর নাটকের শেষে নাটককার একটি অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী দৃশ্য আমাদের সামনে হাজির করেছেন, যেখানে নিজের মায়ের ফেরার অপেক্ষায় থাকা অয়ন শেষপর্যন্ত ললিতা দেবীকেই নিজের মা বলে ডেকে উঠেছে, আর ললিতা দেবীও পারেননি তার সেই আকুতি ভরা মধুর মা ডাককে উপেক্ষা করতে। বড় হৃদয়স্পর্শী নাটকের এই অন্তিম মুহূর্তটুকু---

“ অয়ন// মাম!

[আঁচলে টান পড়েছে। ললিতা চমকে ঘুরে দেখে সেটা অয়নের মুঠোয়।]

ললিতা// আমায়? আমায় ডাকলি বাবা?

অয়ন// (শক্ত মুঠোয় আঁচলটা টানে) যেও না...... যেও না মাম!

[শিথিল শরীরে বিছানায় বসে পড়ে ললিতা। অয়ন খাটের পাশ থেকে টিফিনবাক্সটা টেনে এনে ললিতার মুখের সামনে খুলে লাল টুকটুকে আপেলটা বাড়িয়ে ধরে ললিতার দিকে।]

খাও মাম!

ললিতা// (কাঁপা কাঁপা গলায়) মাম!

[বিমূঢ় ললিতা টুকটুকে আপেলটা মুখে তোলে।]”[১০]

আসলে সন্তান, সে ছোট হোক কিংবা বড়ো, অসুস্থতার সময় যার সাহচর্য, স্নেহের ছায়াটুকু তার কাছে বিশল্যকরণীর মতোই কাজ করে, সে একমাত্র মা। সেই জায়গা

একজন পিতাও নিতে পারেন না। আর রক্তের সম্পর্কের বাঁধন না থাকলেও দিনের পর দিন অয়নের জীবনে একটু একটু করে সেই জায়গাটা তো নিতে শুরু করেছিলেন ললিতা দেবীই। তাই বড় মধুর নাটকের অন্তিম অংশটি, যা একজন মা ও তার সন্তানের স্নেহ ভালোবাসার অমলিন সম্পর্কের পরিসরটিকেই যেন তুলে ধরেছে।

তবে সেই সঙ্গে সমাজমনস্ক নাটককার, এই নাটকে বোধহয় আমাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। সন্তানকে শুধু জন্ম দিলেই হয় না, তার প্রতি মায়ের দায়িত্বও পালন করতে হয়। সন্তানদের কাছে মায়ের থেকে বড় আশ্রয় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আজকের এই আত্মপ্রিষ্ঠার যুগে যেন আমরা ক্রমেই সেকথা ভুলতে বসেছি কিংবা ভুলতে বাধ্য হচ্ছি।

এভাবেই মনোজের নাটকে আমরা নানা প্রসঙ্গেই উঠে আসতে দেখি মাতৃত্বের বিচিত্র রূপ। কখনো সেই মা স্নেহময়ী জননী, আবার কখনো বা সন্তানের জন্য সেই মা রণংদেহী মূর্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেও জানে। বস্তুত আজকের সমাজবাস্তবতার অভিজ্ঞতার সাথেই জড়িয়ে সেই মাতৃমূর্তি ভাবনা। সেইসঙ্গে অবশ্যই আছে তাঁর নিজস্ব কল্পনা, মা সম্পর্কিত আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস আর সংস্কারের মাটি। বস্তুত মানবিক সম্পর্কের নানা রূপ সন্ধান করতে গিয়ে তিনি এভাবেই বিভিন্ন নাটকে বারে বারে ছুঁয়ে গেছেন মাতৃহৃদয়ের স্বরূপটিকে। একদিকে তিনি যেমন দেখিয়েছেন এই আধুনিক সময়ে সমস্ত সম্পর্কগুলোই আজ দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাবের উপর, তখন আরেকদিকে সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালোবাসার খণ্ড চিত্রগুলি যেন আমাদের কাছে হীরকদ্যুতির উজ্জ্বলতা নিয়েই ধরা দেয়। বিশেষত আমাদের এই সমাজে যখন রক্তের সম্পর্ক দানা বাঁধে না, তখন তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে একজন নিঃসন্তান নারী পারে অন্যের সন্তানকে আপন সন্তানের মতো কাছে টেনে নিতে। তাঁর এই মাতৃত্বের রূপ যেন এই আশাভঙ্গের সময়েও এক পরম বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি রচনা করে। আসলে নাটককার যেন বিশ্বাস করেন, শুধু মাত্র সন্তানের জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। বরং ‘মা’ বা ‘জননী’ শব্দটির সাথে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন স্নেহ, ভালোবাসা, মমত্ব, দায়িত্বের মতো কিছু গুণকে। যে গুণের কারণে সন্তানকে পেটে ধারণ না করেও অলকানন্দা হতে পেরেছেন যথার্থ একজন মা, আর যে গুণের অভাবে সন্তানকে জন্ম দিয়েও দেবাহুতী আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত।

তথ্যসূত্র:

১. মনোজ মিত্র, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, নাটকসমগ্র(১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০০, পৃ.১৭৬

২. মনোজ মিত্র, চাকভাঙা মধু, নাটকসমগ্র(১ম খণ্ড), পৃ.১২

৩. চন্দন সেন, নাটককার মনোজ মিত্র ৪৮ বছরের জমি জিরেত আর আকাশ, মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্রের(৫ম খণ্ড) ভুমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রন : আষাঢ় ১৪২১, পৃ.৭

৪. মনোজ মিত্র, নরক গুলজার, নাটকসমগ্র(৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রন, ভাদ্র ১৪২২,পৃ.৭৯

৫. ঐ, পৃ.৮২

৬. মনোজ মিত্র, রঙের হাট, নাটকসমগ্র(৫ম খণ্ড), পৃ.১৩৫

৭. প্রবীর ঘোষ, স্বাধীনতার পরে, ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০,পৃ.৭০

৮. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ.১২০

৯. মনোজ মিত্র, হ্যালো মাম, নয় নয় করে নয়(নয়টিছোট নাটকের সংকলন), কলাভৃৎ পাবলিশার্স, কলকাতা,প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ.৪৬

১০. ঐ, পৃ.৬২

দুই বিশ্ব নাগরিক এবং তাঁদের শিক্ষা ভাবনা পারস্পরিকতা ও প্রতি তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই

পঞ্চানন দেওয়াশী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *আজকের বিশ্বায়িত গ্রামের দুই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ এবং জন ডিউই এর শিক্ষা ভাবনা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ডিউই লক্ষ্য করেছিলেন পাশ্চাত্য আধুনিক ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছেন একমাত্রিক শিল্পায়িত ও বাণিজ্যিক সংস্কৃতির দাপটে। তিনি তাই কল্পমানসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক নতুন মানবকে, যিনি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতা খুঁজে পাবেন পরিপূর্ণ এক গোষ্ঠীর মধ্যে, যার ভিত্তি স্থাপিত তাঁর গণতান্ত্রিক ভাবনায় ও শিক্ষা দর্শনে। অন্যদিকে প্রাচ্যের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের সৌধ সম্প্রীতি এবং সমগ্রতায় আধারিত ভারতের যে চিরাচরিত দর্শন তার ওপর রচিত। আন্তর্জাতিক শিক্ষার প্রেক্ষিত অভিসৃত হয়েছিল আত্মউপলব্ধির মধ্যে। আলোচ্য প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ এবং জন ডিউই-এর শিক্ষা দর্শনের মধ্যে প্রতি তুলনা করে এবং একই সাথে নির্দেশ করে যে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক শিক্ষা ভাবনার প্রেক্ষিতটি ডিউই-এর সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতান্তিক ধ্যান ধারণার সাথে সংযুক্ত এবং তাঁদের উভয়ের সম্মিলিত শিক্ষা ভাবনা আমাদের সমসাময়িক শিক্ষা চেতনার উপর গভীর প্রভাব রেখে যায়।*

সূচক শব্দ: *গণতান্ত্রিক শিক্ষা, আন্তর্জাতিক শিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতাবাদ, প্রয়োগবাদ, ভাববাদ।*

উনবিংশ শতকে বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই শতকে একই সাথে বলা হয় গণতন্ত্রের আদর্শ ও তার প্রয়োগগত প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগ। ফ্রিডম্যান বলেছেন আজকে আগমন ঘটেছে Computers, broadband connectivity, network, teleconferencing, এবং গ্রাম। এই বিশ্বায়িত গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গণতান্ত্রিক দেশের দুই অসামান্য শিক্ষাবিদ আমেরিকার জন ডিউই এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক শিক্ষার অবস্থান ডিউই এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ধারণার সম্পূরক এবং তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কিত

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় তাঁদের গণতান্ত্রিক এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কিত সম্ভাবনায়। দ্বিতীয়তঃ তদনুসারে চিত্রিত হয়েছে কিভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিসৃতি ও অপসৃতি একে অপরের সম্পূরক এবং এর নিহিতার্থ সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নমুখিন করে, নবতর ভাবনার উন্মেষ ও উত্তরণের সন্ধান দেয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য দুনিয়া বহুপ্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত ছিল না, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নোবেল প্রাপ্তি ও প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবী মহল এর স্বীকৃতি কবিকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের শিরোপা এনে দেয়। নিজের জীবনের ওপর আলোকপাত করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা সৃজন করেন, এর প্রসার ও পদ্ধতিগত রূপরেখা তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি ছিল তাঁর দার্শনিক দূরদর্শিতার-জীবনের ঐকতানে ও পূর্ণতায়। প্রকৃতি ও মানব জাতির মধ্যে পারস্পারিক সংগতি এবং নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রবক্তা এই মানুষটি তাঁর সামূহিক ক্রিয়া ও সম্পূর্ণ সত্তা এতেই জীবন ভর নিয়োজিত রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতঅনুযায়ী (১৯৮৭) শিক্ষা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার বিকাশকে সুগম করে, সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে এবং আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ সাধিত করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিদ্যালয় এক আনন্দময় স্থান যেখানে মানুষ (এখানে মানব শিশুর কথা বলেছেন) স্বতন্ত্র শিক্ষায় আনন্দ খুঁজে পায়। যদিও রবীন্দ্রনাথের শৈশবের অভিজ্ঞতা ভিন্ন সুর শোনায় সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি তাঁর শৈশবের অসহ অভিজ্ঞতার সাথে সাদৃশ্য পেয়েছিলেন, আর তাই চেয়ে ছিলেন এমন এক পরিসর তৈরি করতে যেখানে জ্ঞানের বিচরণ অবাধ, অসীম, শেখার আনন্দে পরিপূর্ণ। আর এই পরিপূর্ণতা তখনই সম্ভব যখন সামাজিক স্বাতন্ত্র্যতা সমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সর্বজনীন শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনে অন্তর্দৃষ্টি সন্ধান করতে সুদূর মানবীয় সম্পর্কে এবং ধর্ম-জাতিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে, বিশ্ব মানবের সম্প্রীতিতে।

স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম ও পড়াশুনোর ছক বাঁধা জীবন তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। তাই তাঁর শিক্ষা চিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, শিক্ষা তত্ত্বের মধ্যে কল্পনাবিলাস এর বিশেষ কোন স্থান ছিলনা। তিনি শিক্ষাকে ‘অশক্তকে শক্তি দেবার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন’। উপনিষদীয় চিন্তা ধারায় প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ এর

ধারণা ছিল যে, সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি, এই শক্তি সৃষ্টির মধ্যেই সতত প্রকাশমান। তাই তাঁর জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য হল- 'বিশ্ব বৈচিত্রের মাঝে তার ঐক্যের যে নিয়ম, সেই নিয়মকে জেনে আনন্দ রূপে তাকে লাভ করাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা'।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের মূল কথা হল-"আমরা কিঞ্চিত পরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকি এবং কিঞ্চিত পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহে সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করলে চলবে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, তা না হলে আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়"।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষার অবস্থা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ শিশুর জীবনে অনৈক্য গ্রহণ করেনি। শিশুদের একান্ত নিবন্ধ রাখলেই কখনোই তাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তে পারে না। শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠ না মেলালে ছেলে ভালো করে মানুষ হতে পারে না, বয়স প্রাপ্ত হলেও বুদ্ধি বৃত্তি সম্বন্ধে সে অনকটা বালক থেকে যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের দ্বন্দ্বের যুগ সন্ধিক্ষণে পরিব্যাপ্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও কর্মজীবন। এই সময় ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনে একদল শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্যের শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও ভাবধারার সমর্থন করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথমে বাঙালি ও পরে সমগ্র ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই জাতীয় আন্দোলন চলাকালে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব রাখেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা দর্শনে বলেছেন- "যদি বাংলা শিখত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারতো যদি কিছুই না শিখত তবে খেলা করবার অবসর থাকত, গাছে চড়ে, জলে ঝাঁপিয়ে, ফুল ছিড়ে প্রকৃতি জননীর উপর সাহস্য দৌরাত্ম্য করে শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্য প্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারত"। আর ইংরেজি শিখতে গিয়ে না হল শিক্ষা,না হল খেলা। প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করার ও অবকাশ থাকল না। সাহিত্যের কল্পনা রাজ্য বিচরণের দ্বার বন্ধ থাকল। অন্তরে ও বাইরে যে দুটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহার ক্ষেত্র আছে, মানুষ্য যেখান থেকে জীবনবল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চার করে, যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বৈচিত্র গতি এবং গীত, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হয়ে আমাদের সর্বাঙ্গ সচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করে তোলে। যার মধ্যে জীবন নেই, আনন্দ নেই, অবকাশ নেই, নবীনতা নেই, নড়ে চড়ে বসার একতিল স্থান নেই, সেই শিক্ষা ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি,

চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। সেই শিক্ষা এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, চিন্তা শক্তি এবং কল্পনা শক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক তাতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষাদর্শন ও লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ভাববাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি স্বভাববাদী বা প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে"।

আমাদের নিরস শিক্ষায় জীবনের সেই মহেন্দ্রক্ষণ অতীত হয়ে যায়। আমরা বাল্য হতে কৈশোর এবং কৈশোর হতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতগুলো কথার বোঝা টেনে। স্বরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবল মজুরি করে মরি, পৃষ্ঠের মেরুদন্ড বেঁকে যায়, কিন্ত মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজী ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করতে পারিনা, যদি বা ভাব গুলোকে একরূপ বুঝতে পারি, কিন্ত সে গুলোকে মর্মস্থলে আকর্ষণীয় করে নিতে পারি না। বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্ত জীবনের কার্যে পরিণত করতে পরি না।

জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুটি আবশ্যক শক্তি হল চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি তাতে সন্দেহ নেই, যদি মানুষের মতো মানুষ হতে হয় তবে এই দুটি পদার্থ জীবন থেকে বাদ দিলে চলবে না। বাল্যকাল হতে চিন্তা ও কল্পনা চর্চা না করলে কাজের সময় যে তাকে হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। কিন্ত আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ এক প্রকার রুদ্ধ। আমাদের বহুকাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। ক্লাসে বড়ো বড়ো পুথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরে দেওয়া হয়-তখন সেগুলো ভালোকরে আয়ত্ত করবার সময় নেই শক্তিও নেই- সবগুলো মিলিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো তাল পাকিয়ে একেবারে এক এক গ্রাসে গিলে ফেলতে হয়।

শিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতা

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের উপায়- সে শিক্ষা মানসিক ও সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা কোন বিশেষ দেশকালের গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। 'তপোবন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ইন্দ্রিয়গুলোকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে। কিন্ত ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি, আর বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ঈশ্বর, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়,

বুদ্ধি শিক্ষাকে আমাদের প্রধান স্থান দিতে হবে। স্বদেশ আমাদের কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই তার সর্ব প্রধান কর্মী। অন্যের অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করবে, আমাদের সচেষ্টার

কঠোরতাকে যতই খর্ব করবে, ততই আমাদের বঞ্চিত করে কাপুরুষ করে তুলবে-এ কথা যখন নিশংসয়ে বুঝব তখন আর কথা বোঝার সময় হবে না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ইচ্ছা যেখানে , পথ সেখানেই আছে।

শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিদ্যালয় হল 'জেলের মত'। তাঁর শৈশবে দেশজ শিক্ষা পদ্ধতিকে ঔপনিবেশিক সরকারের পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি গ্রাস করেছিল। যেখানে জনগণের আগ্রহ ছিল শুধুমাত্র কলমচি-কর্মচারী তৈরি করা। যারা তোষামোদ করবে ঔপনিবেশিক সরকারকে এবং নজর আবদ্ধ থাকবে উৎপাদন শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি কেবল মুখস্থ করিয়ে দেয়, পেষণকরে অথচ প্রেরণা দেয় না, স্বাধীন-স্বকীয় চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে না, কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে হৃদয়ঙ্গম করা এবং জ্ঞান অর্জনকে আনন্দময় করে তোলে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমাজের উন্নয়নের জন্য সার্বিক, সম্পূর্ণতার শিক্ষা। আর তাই অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে পৃথক ছিল তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষা ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে আপনাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরব বোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানে তুলনা করে আমরা পদে-পদে লজ্জিত ও হতাশ হয়ে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয় এর সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয়ের মিলিয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় যেটুকু মেলে সেটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হয়ে যায়। কিন্ত এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে খাটে। আজ আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা নির্জীব ব্যাপার নয়-আমরা প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি। শিক্ষার লক্ষ্য জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "আজ আমি ছাত্র দিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো- সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো-ইহাকে কোনদিন একটা স্কুল মাত্র বলিয়া ভ্রম ও করিও না ভারতের নিজস্ব সাধনা ত্যাগের সাধনা"। তিনি বলেছেন বিদ্যা স্রোত আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন এই চারটি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রীতে এর উদ্ভব।

জন ডিউই এর শিক্ষা চিন্তা

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষা জগতে যার অবদান অপরিসীম তিনি হলেন আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) আধুনিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ডিউই শিক্ষাকে এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তা আধুনিককালে পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর শিক্ষা চিন্তা যেমন আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে, তেমন যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমতা রেখে তা সংগঠিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা চিন্তা পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই শিক্ষার বিকাশে সহায়তা করেছে, জন ডিউই এর শিক্ষা চিন্তায় দুই উপাদানের সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, যথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতায় ও গণতন্ত্রে, জন ডিউই তাঁর শিক্ষা চিন্তার উপর আলোকপাত করার জন্য শুধু তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করেনি, পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

জন ডিউই এর জীবন দর্শনে আমরা তিন ধরনের চিন্তা ধারার সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। তিনি প্রকৃতিবাদ এবং ভাববাদকে একদিকে যেমন সমন্বয় সাধন করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে তাদের সঙ্গে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। এর ফলে উইলিয়াম জেমস এর প্রয়োগবাদকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে কেবলমাত্র প্রয়োগবাদ না বলে, পরীক্ষামূলক প্রয়োগবাদ বলা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন 'বিশ্বজগৎ চির গঠনশীল এবং এই জগতে জীবন ও সদ্য পরিবর্তনশীল। জীবনেরও চিরন্তন নির্দিষ্ট কোন মান বা লক্ষ্য নেই। জীবনের লক্ষ্য ও মানের স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তন হয়। মানুষ নিজেই জীবনাদর্শন নির্ণয় করে’।

ডিউই অনুভব করেছিলেন শিক্ষণ প্রণালী শিশু মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিদ্যা নির্ভর। তিনি বলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ ব্যবহৃত হয়। সামান্য পরিমাণ অভিজ্ঞতা অধিক তথ্যের থেকে সরল, কারণ শুধু অভিজ্ঞতা যে কোন তথ্যের অপরিহার্য। ডিউই তাঁর বিদ্যালয় পরীক্ষাগারে পেশাগত কার্যপ্রণালী ব্যবহার করেন এবং উদাহরণ স্বরূপ রান্নাবান্না, সেলাই, বাগান তৈরি এবং কাঠের মিস্ত্রির কথা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশাগত শিক্ষা প্রণালী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎপাদনের মিশ্রিত অভিজ্ঞতা এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সংহতি ও শিক্ষার সামাজিকীকরণে কার্যকারী

করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে জন ডিউই বলেছেন আত্মোপলব্ধি পরিবেশের জন্য অন্তঃক্রিয়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং জনগোষঠীর একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা সম্ভব হয়। এই বিস্তারকে নিছক ভ্রান্ত আন্ত পরিপূর্ণ সংকীর্ণ প্রত্যয় বিবেচনা করা হয়।

জন ডিউই কর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি, 'কর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার চেয়ে বড় করে দেখেছেন'। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ও কর্ম একত্রে সমন্বিত হলে তাদের যৌগিক ফল জ্ঞানকে সার্থক রূপ দান করবে। তাঁর চিন্তা ধারার মূল কথা হল ধর্ম, ভাষা, বর্ণ এবং রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ এক বিশ্বসমাজ গড়ে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই এর তুলনা

রবীন্দ্রনাথ এবং জন ডিউই বেড়ে উঠেছিলেন আলাদা জনগোষ্ঠী ও দেশে, গ্লোবের দুই দিকে। তাঁদের শিক্ষা দীক্ষার প্রসঙ্গ এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য ছিল। একই সময়ে তাদের কিছু অভিব্যক্তি যেমন সাদৃশ্য অথবা সম্পূরক ছিল, তেমনি পরস্পর থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই উভয়েই তাঁদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ এবং ব্যক্তির কর্মজীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে হাতের কাজ, কুটির শিল্প ও গ্রামোন্নয়ন মূলক কাজ প্রধান। তিনি বলেছেন,"আমাদের শিক্ষার কেন্দ্র শুধু বুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র নয়-এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও স্থান দিতে হবে"। এই লক্ষ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপের সাথে সাথে লেখাপড়া, অঙ্ককষা, গান ও অভিনয় শেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বোধের অনুশীলন যাতে চলতে পারে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার সাথে জন ডিউই এর অনৈতিক ভাবনায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন 'শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও চিন্তার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন কর্ম। কর্মনিপুণতার মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ মানুষ তৈরি হয়। ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়'।

এভারমন্ডে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে বেড়ে ওঠা জন ডিউই তার প্রতিবেশ ও বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে গণতন্ত্র, শিল্পায়ন এবং নাগরিকায়ন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা আরহন করেন এবং শিক্ষা ভাবনায় তা সংযুক্ত ও সম্প্রসারণ করেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক ভারতে। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা উদ্ভাবনার ভিত্তি ছিল ভারতীয় দর্শন চিন্তা এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর

আন্তর্জাতিকতার অভিমুখে সম্প্রসারিত করা। ডিউই এর মতে, পরিবেশের সাথে পূর্ণাঙ্গ আন্তঃক্রিয়া প্রসূত, যা রবীন্দ্রনাথের মতে, আগাগোড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আবেগময় প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত। ডিউই এর ধারণায় শিক্ষার বিস্তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং সামাজিক রীতিনীতিকে অধিকাংশ দৃষ্টিগ্রাহ্য করে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষা সম্প্রসারণে অভিমুখ ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ ও কিয়দংশ প্রাচ্যীয় অতীন্দ্রিয়বাদী/মরমিয়া চেতনায়। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষা হল ধারাবাহিক সামাজিক পদ্ধতি এবং তা অবশ্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ডিউই উপস্থাপন করেন তাঁর বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে জনগোষ্ঠীর যথাযোগ্য ছবি। ডিউই এর হৃদয়ে গণতন্ত্র এবং সামাজিক চেতনা দুটি বিষয়ই খুবই সমীপবর্তী, আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার ভিত্তি ছিল সামাজিক স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক আন্তঃক্রিয়ায় উদ্ভূত ধারণায়।

যদিও গণতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়, যতটা ডিউই এর কাছে কারণ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বছর পরে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে, আর তাই তিনি চিন্তাদীর্ণ ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ জুগিয়ে ছিলেন, প্রত্যয়ি ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের ও শিক্ষায় ঐক্যমত স্থাপনে। রবীন্দ্রনাথ ডিউই এর মতো সংকীর্ণতা মুক্ত গণতন্ত্র এবং শিক্ষার গভীরতা অন্বেষণ করেননি। যদিও একই সময়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারণা এবং আন্তর্জাতিকতার অভিমুখে এর সম্প্রসারণ ডিউই এর ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্ভাবনার সম্পূরক।

ডিউই নিজেই ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। ডিউই এর সামাজিক প্রত্যয় জাতীয় সীমানাকে অতিক্রম করে যায়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর গুরুত্ব তুলে ধরেন। ডিউই স্বীকার করেছেন যে "আন্তর্জাতিকতাবাদ কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন আবেগগত ধারণা নয়, পাশাপাশি মানসিক ক্ষমতারও দ্যেতক"। যদিও তিনি সাওয়াল করেছেন প্রয়োজনে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম করে আরও অগ্রসর কোনো ভাবনার অভিমুখে আগুয়ান হওয়ার। আন্তর্জাতিক শিক্ষা তাঁর দার্শনিক শিক্ষার থেকে বৃহৎ প্রতিফলন নয়। রবীন্দ্রনাথ ও ডিউই বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা ছাড়া সমাজে গণতান্ত্রিক জীবন অসম্ভব, যা তারা খুঁজেছিলেন তাদের নিজেদের বিদ্যালয় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ডিউই এর পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় ছিল প্লেটোর শিক্ষা ধারণা সম্পূর্ণত বিরোধী, এক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যা কান্ট, ফিকটে এবং হেগেলের মতো

আধুনিক চিন্তকদের মননজাত অভিব্যক্তি এবং প্রতয়ের সাথে মেলে। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষায় প্রয়োগবাদ এবং গণতান্ত্রিকতার বিস্তার ঘটাতে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শান্তিনিকেতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশী দ্রোহের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক, যা ব্রিটিশ শাসন এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পের প্রয়োজনে ভারতীয়দের প্রশিক্ষনের পরিকল্পনার সম্পূর্ণত বিরোধী। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত স্বকীয়তায় ও সক্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ বিদ্যালয় পদ্ধতি শৃংখল ভাঙার যে প্রয়াস নেন তার দুরকল্পী ভিত্তিতে নিহিত ছিল। উত্তর উপনিবেশিক ভারতে শিক্ষাদান ও সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎমুখীন রূপরেখা।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পরীক্ষা নির্ভর ছিল না, বরং এক বৃহত্তর জীবনচর্চাকে তুলে ধরে। ডিউই এর বিদ্যালয়টি প্রতিতুলনায় ছিল এক পরীক্ষাগারের মতো। ডিউই চাইলে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার বিদ্যালয় প্রকল্প ত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা চাইলেও পারতেন না কারণ তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে নিহিত ছিল। আর ঠিক এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষার মাধ্যমে, সামাজিক সেবা এবং সমূহের মুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে, আর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার লক্ষ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ও ডিউ মতে অভিজ্ঞতা হল শিশুর শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। জানা এবং শেখার প্রক্রিয়ায় শিশু কোনো নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয়, বরং সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী। তাঁরা উভয়ই শিক্ষাবিদ্যাকে প্রাপ্ত বয়স্কের নয়, বরং শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের ধারণায় শিক্ষা পারস্পারিক আদান-প্রদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মাত্রাগুলিকে সমন্বিত করে। ডিউই এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ই কোনো সহজলভ্য পাঠক্রমে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রণীত পাঠ্যক্রমের রুপরেখা ছিল, যা একই সাথে ছিল নমনীয় এবং উন্মুক্ত। চিরাচরিত বিষয়ের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ডিউই উভয়ের অধিকতর কিছু তাদের পাঠক্রমে সন্ধান করেছেন।জন ডিউই পাঠক্রমেই যেন জীবন, যা শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক মাত্রাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রমে শুধু চিরাচরিত বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পাশাপাশি ঠাই পায় জীবনের অন্য অন্যান্য অপঠিত দিক যথা সৃজনশীল, অনুসন্ধান, সমাজ সেবা, উৎসব, লোকাচার সহ অন্যান্য পাঠক্রম বহির্ভূত দিকগুলি। এর সাথে যুক্ত হয় প্রকৃতির সাথে যুথবদ্ধতা, ব্যক্তি উন্নতি এবং সমূহের

অগ্রগতি। বলা যেতে পারে ডিউই এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শ্রেণীকক্ষের বাইরে তাঁদের পাঠক্রমকে প্রসারিত করেছেন, এবং জীবনকেই পাঠ্যক্রম রূপে দেখেছেন।

ডিউই গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তবমুখী, বিজ্ঞান ভিত্তিক, অভিব্যক্তির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর পাঠ্যক্রম ছিল বিজ্ঞান ও প্রয়োগবাদের সমকক্ষ। জীবন সমস্যায়, তাঁর সমাধানও আছে, সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রকৃতিসর্বস্ব ভালোবাসার প্রতিফলন ছিল পাঠ্যক্রমে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর শিশুরা বিশ্ব প্রকৃতিতে পাবে সম্মান এবং ভালোবাসার শিক্ষা। বিজ্ঞানবাদ অথবা প্রয়োগবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল ধারণামাত্র ছিল না, বরং তা ছিল শৈল্পিক, দার্শনিক এবং অতীন্দ্রিয় জীবন পথ উত্তরণ। রবীন্দ্রনাথ ও ডিউই এর শিক্ষা দর্শনের কিছু মৌলিক সমালোচনা থাকলেও রয়েছে তাদের শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা পরিকল্পনা ও এর রূপায়ণ বহুলাংশে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সমিপবর্তী। ডিউই এর মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং সামাজিকীকরণের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্যতাই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা। এই দুটি শিক্ষা মাত্রা অনেকাংশেই প্রতিফলিত হয়েছিল ডিউই এর শিক্ষা বিজ্ঞানে এবং পাঠ্যক্রমে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং শিক্ষার সামাজিকীকরণ, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার অভিমুখে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

সমসাময়িক শিক্ষায় প্রয়োগ

এই আলোচনায় ডিউই এর সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষার ধারনার তাৎপর্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক শিক্ষা ধারণার ব্যাখ্যা এবং সমসাময়িক শিক্ষায় উভয়ের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। ডিউই এর সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার ধারণা নিহিতার্থ এবং রবীন্দ্রনাথের সমাজের জন্য ।স্বতন্ত্রতার ঝোঁক দুইটি চরম একনায়কতন্ত্র এবং পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতিকে ধারাবাহিক করে। ধারাবাহিক পর্যালোচনাও গভীরতর মনোনিবেশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষার পদ্ধতিগত প্রয়োগ, সামাজিক তাৎপর্য, তাদের সম্পর্কের পারস্পরিকতা সম্পর্কে সম্যক অবহিতি হতে পারেন, যা একই সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের ভূমিকা ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করে। শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে স্বনিন্ত্রণের মাধ্যমে মানব জাতির উন্নয়নে সকলের সমষ্টিগত অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য হল গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিচালনায় সমষ্টিগত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এটাই গণতান্ত্রিক জীবনে শিক্ষিতদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। ছাত্রপ্রশাসনের দুরকল্পী লক্ষ্য হল শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অধিক দায়িত্বশীল করে তোলে। গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম জনসমাজের কণ্ঠস্বর এবং জনসমাজের চাহিদাও প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়া কাম্য এবং তাঁর রচনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ প্রশাসক অভিভাবক সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

শিক্ষাদর্শনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি ও রবীন্দ্রনাথ এবং ডিউই তাদের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত থেকে পরস্পর ভিন্নতার পথে চলেছিলেন তবুও তাদের ধারণা একই বিন্দুতে সম্মিলিত হয়েছিল এবং শিক্ষা ভাবনায়, তাঁরা একে অপরের পরিপূরক। যেমন আন্তর্জাতিক শিক্ষার সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর যে কল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল ডিউই পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই এর শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি যে গণতান্ত্রিক জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী খুবই প্রাসঙ্গিক তা সমসাময়িক শিক্ষাদর্শনের ও অনুশীলনে লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. Francis A. Samul-Educational Visions from Tow Continents: what Tagore adds to the Deweyan Perspective. Philosophy and Theory. Vol. 43 lssue 10. 2011, pp.1161-1174.

২. রবীন্দ্র রচনাবলী- ষষ্ঠখন্ড; বিশ্বভারতী প্রকাশনী; পৌষ ১৪১০ বঙ্গাব্দ; শিক্ষা প্রবন্ধে; শিক্ষা সংস্কার ১৩১৩ বঙ্গাব্দ পৃ:৫৭৩

৩. বিশী প্রমথনাথ-রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, শ্রী পুলিন বিহারী সেন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

৪. Tagore R, Reminiscences' Madras, Macmillan Indian Limited PP.114-115

৫. Tagore R, ‘Personality’ Madras, Macmillan Indian Limited, 1987.p.116

৬. রায় সুশীল- শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন কলিকাতা, সোমা বুক এজেন্সী, ২০০১ পৃ: ১৩২-১৩

৭. Reminiscences.P.117.119

৮. Dewey . j Democracy and Education, new y Tork ,Capricom Books, 1966,P.87

৯. Hook, S jhon Dewey ,new York ,The john Dey Company.1939. P .12,

১০. Relational Qualities between and selves and Communities pp.293-297.

১১. Rabindranath Tagore:His impact on India education,p 87-95

প্রচলিত বাংলা প্রাইমার ও মুসলমানি বাংলা প্রাইমার : সম্পর্কের (অ)মিল

রাকিব
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সংক্ষিপ্তসার : *শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক পাঠ্য পুস্তক হল 'প্রাইমার'। যার 'শুরুয়াত' উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা প্রাইমার রচনার সূচনা হলেও সময়ের কালক্রমে শিশুর ভাষা শিক্ষার জন্য প্রাইমারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার প্রাইমারের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯), 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫), 'হাসিখুসি' (১৮৯৭), 'সহজপাঠ' (১৯৩০)--- এগুলিই বাংলা প্রাইমারের প্রাচীন মূল্যবোধ। প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বিপ্রতীপে উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমার রচিত হতে থাকে। এবং সেই ধারা আজও অব্যাহত। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটের কালে এই প্রাইমার রচনা ছিল খুবই জরুরি। আমরা এই নিবন্ধে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের সঙ্গে 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমারের মধ্যকার মিল-অমিলের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। সেখানে আলোচিত হবে, প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্যগত মিল-অমিলের জায়গা, পাশাপাশি প্রাইমারের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেগুলির মধে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি-না তাও আলোচনা করা হবে এই নিবন্ধে।*

সূচক শব্দ : *বাংলা প্রাইমার, 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমার, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট, প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্যগত মিল-অমিলের জায়গা, প্রাইমারের উপস্থাপন রীতি।*

মূল প্রবন্ধ

শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক পাঠ্য পুস্তক হল 'প্রাইমার'। আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনামে, 'প্রচলিত বাংলা প্রাইমার' ও 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার'-এর উল্লেখ থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ভাষা শিক্ষার পাঠ দিতে তৈরি প্রাইমারগুলির এই বিভাজনের উদ্দেশ্য এবং ভিত্তি কী? সেক্ষেত্রে আমাদের পিছনে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনার 'শুরুয়াত' শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে। তারাই প্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য প্রাইমারের প্রচলন করেন। অবশ্য

সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে (খৃস্টান ধর্ম প্রচার) মিশনারিরা বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাদের এই প্রয়াস দেখিয়েছিলেন। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক রচিত 'লিপিধারা' হল প্রথম বাংলা প্রাইমার। সমকালীন সময়ে শিশুর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুল বা পাঠশালাগুলির নিজস্ব প্রাইমার ছিল। প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে বাঙালির প্রবেশ ঘটে ১৮৩৫ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র বসুর লেখা 'শব্দসার' (১৮৩৫), হল প্রথম বাঙালি লিখিত বাংলা প্রাইমার। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান লেখক রচিত প্রথম বাংলা প্রাইমার হল, মহ. জুহুরুদ্দিন প্রণীত 'জ্ঞানশিক্ষা-১' (১৮৬৯)। উপরিল্লিখিত প্রাইমারগুলির নামকরণের ('লিপিমালা', 'শব্দসার', 'জ্ঞানশিক্ষা-১') দিক থেকে ধর্মীয় কোন ভাব পরিস্ফূট না হলেও বাংলা প্রাইমারের বাজারে ধর্মীয় অনুষঙ্গের বিষয়টি ঢুকে গিয়েছিল এর পর থেকেই। 'মুসলমানি' বা 'ইসলামি বাংলা প্রাইমার' নামে সেই যাত্রাপথ শুরু হলেও তার অন্তরালে ছিল এক গভীর সমাজ-মনস্তত্ত্বের বোধ; যা আজও ইসলামী বাংলা প্রাইমার রচনার খোরাক যুগিয়ে চলেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষার প্রাইমারের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে — 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯), 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫), 'হাসিখুসি' (১৮৯৭), 'সহজপাঠ' (১৯৩০)--- এগুলিই বাংলা প্রাইমারের প্রাচীন মূল্যবোধ। যার কোনটি সার্ধোশতবর্ষ অতিক্রান্ত করেছে, আবার কোনটি শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই সময় ধরে বাঙালি শিশুর মনে ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সিংহদ্বারের ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের ব্যবধানে, বাংলা প্রাইমার রচনার ৫৩ বছর ও বাঙালি রচিত বাংলা প্রাইমার রচনার ৩৪ বছর পর, মুসলমান লেখকদের 'মুসলমানি' বা 'ইসলামি' বাংলা প্রাইমার ('জ্ঞানশিক্ষা-১', ১৮৬৯) রচনার প্রয়োজন আলাদা করে হলো কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে, আমাদেরকে আবার উনিশ শতকে ফিরে যেতে হবে। উনিশ শতকের শেষের দিকেই বাঙালি মুসলমানের সামনে এক দ্বন্দ্বের কাল শুরু হয়েছিল। যাকে পোশাকী ভাষায় 'আত্মপরিচয়ের সংকট' বলা হয়। অর্থাৎ জাতিগত পরিচয়, নাকি ধর্মীয় পরিচয় – বাঙালি মুসলমান কোন পরিচিতিকে প্রাধান্য দেবে? সরকারী চাকরির প্রয়োজনে ইংরাজি এবং ধর্মীয় তাড়নায় আরবি শিক্ষা না হয় বাধ্যতামূলক হল! কিন্তু বাংলা চর্চা! এই নিয়ে বাঙালি মুসলমানের সংকট পরিণত হয় দ্বন্দ্বে। বর্তমান আলোচনার পরিসরে তার চুল চেরা বিশ্লেষণ এখানে মুলতবি রাখা হল। তবে এটুকু বলার, বিশ শতকের প্রথম দিকেই সেই দ্বন্দ্বের কিছুটা অবসান ঘটেছিল। বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা ভাষা চর্চার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিশুকে বাংলা শিক্ষা দিতে গেলে বইয়ের

প্রয়োজন। আমাদের মনে হতে পারে 'বর্ণপরিচয়', 'শিশুশিক্ষা', 'হাসিখুশি' – এই বইগুলো তো রয়েছে। তাহলে? সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল, ধর্মীয় মানসিকতার। মুসলমান শিশু যে বাংলা পড়বে তা 'মুসলমানী বাংলা' অর্থাৎ সেখানে আরবি-ফারসি ভাষার ঝলক থাকবে, নবি-রসুলদের নাম থাকবে, কোরান-হাদিসের প্রসঙ্গ থাকবে। তবেই না মুসলমানের বাংলা পড়া সম্পূর্ণ হবে! শুরু হল, বাঙালি মুসলমান শিশুর জন্য 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার' রচনা। এবং তার ধারা বর্তমান সময়েও অব্যাহত।

মসলমানি বাংলা প্রাইমার রচনার প্রয়োজন হলো কেনো –তা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখা যেতে পারে— মীর মশার্‌রফ হোসেন তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে উল্লেখ করছেন—

> *"এতদিন পড়িলাম— আল্লা রসুলের নাম কোনো স্থানে পাইলাম না। কাহারও মুখে শুনিলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরেজী কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। তিনের পাক সাফ্ পবিত্রতার নাম গন্ধ পাইলাম না। ... আল্লাহ্ রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী, দূর্গা বানর শূকর কুকুর শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।"*[১]

আসলে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যখন শিক্ষা এবং মননের চর্চা শুরু হল তখন আরবি-ফার্সি-উর্দু ও বাংলা ভাষায় বিস্তর ধর্মচর্চা করলেও নিজের বাড়ির শিশুর পড়ার জন্য শিশুতোষ কোনও পাঠ তারা তাদের সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারেন নি। মীর মশার্‌রফ হোসেন বাল্যকালের স্মৃতি মনের মধ্যে পোষণ করেছিলেন। তাই এই 'সংকট', 'সর্বনাশ' থেকে মুসলমান সমাজকে বাঁচাতে শিশুতোষ প্রাইমার রচনায় হাত লাগিয়েছেন। রচনা করলেন—'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা প্রথম ভাগ' (১৯০৩) ও মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা প্রথম ভাগের প্রথম অংশ' (১৯০৭)।[২] মীর মশার্‌রফ হোসেনের মতো এই সংকট অনুভব করেছিলেন তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতগণ। সুতরাং, উপরের দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা মুসলমানি বাংলা প্রাইমার রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুমান করতে পারছি।

প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে, 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার' রচনার জরুরি হয়েছিল— একদিকে আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব তথা সংকট আবার বাড়ির শিশুর হাতে শিশুতোষ ইসলামি আদর্শ, রীতি-নীতি, নিয়ম কানুন সম্বলিত শিশু পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এমন সংকটের মুহূর্তে মুসলমান বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতগণ, মুসলমান লেখকগণ বাংলার

মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন। এমনকি, শিশুদের জন্যও বাংলা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পাঠ প্রদান করতে প্রাইমার রচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। আর তাঁরা এর সঙ্গে যোগ করেন ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ—আরবি-ফারসি ভাষায় প্রসঙ্গ, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গ থেকে শিশুদের জন্য রচিত প্রারম্ভিক পাঠ্যপুস্তক বা প্রাইমারও বাদ যায় নি। আর তা ধর্মীয় সংস্রবের বশবর্তী হয়ে রচিত হয়েছে। বিশ শতকেও এমন বহু শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। আর বর্তমানকালেও এমন শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা হয়েছে, হচ্ছে, হয়তো আরো হবে।

এবার আমরা দেখতে পারি, সেদিন শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ এদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখে বাংলা প্রাইমার 'লিপিধারা' (১৮১৬) রচনায় হাত জুগিয়েছিল। আবার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর পশ্চাত্যে রয়েছে উপনিবেশিক শক্তির প্রশাসনিক সুবিধা। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশীয় ভাষার শিক্ষা প্রদানের আনুষ্ঠানিক সূচনা। আবার বাঙালি শিশুর ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙালি শিশুর জন্য সর্বজনীন এবং জনপ্রিয় প্রাইমার লিখলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। আর মুসলমান বাঙালি শিশুর ভাষা শিক্ষার জন্য 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার' রচনায় অগ্রসর হলেন, মহ জুহুরুদ্দিন (জ্ঞানশিক্ষা-১, ১৮৬৯), মুন্‌সি কাজিমুদ্দিন (প্রথমশিক্ষা, ১৮৮৫), মজহরুল্লা কাজি (প্রথম ভাগ বর্ণবোধ, ২য় সং ১৮৮৬), মহ আবদুল মজিদ সরদার (বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ, ১৮৮৮), ফতে মণ্ডল (অক্ষর পরিচয়-১, ১৮৮৮; অক্ষর পরিচয়-২, ১৮৮৯), ওয়াজুদ্দিন আহমেদ (সরল শিক্ষা, ১৮৮৯), রহিমুদ্দিন সরকার (নব বর্ণপরিচয়, ১৮৮৯), মালেকউদ্দিন আহমেদ (নব শিশুশিক্ষা, ১৮৯৩), মুন্‌সি জমারত হুসেন (সচিত্র শিশুশিক্ষা-১/২, ১৮৯৭), অর্পণ-উল-মুন্‌সি (নব বর্ণশিক্ষা, ১৮৯৭) প্রমুখ বাঙালি মুসলমান লেখকগণ।[৩] তালিকা দেখেই অনুমান করা যায়, সেদিন বহু শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিত্ব 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমার রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানে এই প্রাইমারগুলি হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতির অতল গহ্বরে, মুসলমান বাঙালির মানসপটে সেদিন এগুলিই আশার সঞ্চার করেছিল। জনপ্রিয়তার নিরিখে এই

প্রাইমারগুলি হয়তো প্রচলিত জনপ্রিয় বাংলা প্রাইমারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠেনি, কিন্তু এই 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমারগুলি সেদিন যে ধারার শুভ সূচনা করেছিল, তা উনিশ-বিশ শতক অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান। 'মুসলমান' বাংলা প্রাইমারগুলি সময়ের ব্যবধানে আজও শিশুর ভাষা শিক্ষা তথা প্রাইমার রচনার ধারার বিপ্রতীপে একটি বিকল্প বয়ান বা কণ্ঠস্বর। সেদিক থেকে প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে সঙ্গে 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্যগত দিক থেকে একটা সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলা লিপির স্ট্যাণ্ডারাইজেশান এবং বাংলা ভাষার প্রাইমার রচনার ফলে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা স্থিতি (stability) এসেছে। এর ফলে শিশুকে ভাষাশিক্ষা দেবার একটা পথ পাওয়া গেল সত্য, কিন্তু শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী মডেল পেলাম, এমন বলা যায় না। এগুলি প্রাণালীবদ্ধভাবে রচিত হওয়ায় আঞ্চলিক ও সামাজিক কোনো ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও ধর্মীয় সংস্রব (religious) বা প্রভাবমুক্ত নয়। যার জন্য, আমরা উনিশ শতকে বাঙালি লেখক রচিত প্রাইমারগুলিতে এমন ধর্মীয় সংস্রবের দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। ধর্মীয় সংস্রবের ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলি হিন্দু শাস্ত্র, আচার, হিন্দুত্ব- ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বর প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। অন্যদিকে 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমারগুলি' ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান বাঙালি শিশুকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যই রচিত। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে বিষয়বস্তু তথা শব্দ, বাক্য, পদ্য-গদ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব দেখা গিয়েছিল। যদিও প্রথম ধর্মীয় সংস্রবের বাইরে বেরিয়ে প্রাইমার রচনা করেন বিদ্যাসাগর। তবে তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়'ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাঁর রচিত প্রাইমারে গোপাল-রাখাল-যাদব-গিরিশ এর নাম পাওয়া গেলেও রহিম-করিম-সালাম-জাব্বার জাতীয় কোনো নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের আত্মপরিচয়ের সংকটের কালে 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমারগুলি ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক তথা শব্দ (আরবি-ফারসি), বাক্য (গঠনগতভাবে বাংলা ভাষার গঠনরীতিতে বাক্য গঠিত, তবে বাক্য মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য), পদ্য-গদ্য ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়বস্তু ভিত্তিক রচনার শুরুয়াত করলেও, একালে রচিত 'মুসলমানি' বাংলা প্রাইমারগুলিতেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। একালের প্রচলিত বাংলা প্রাইমার রচয়িতাগণ ধর্মীয় সংস্রব থেকে বাইরে এসে প্রাইমার রচনা করেছেন। তবে সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেকথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সুতরাং উভয় প্রাইমারের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিন্ন ভিন্ন

ধর্মীয় সংস্রবকে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মিল-অমিলের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

প্রাইমার রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শিশুকে ভাষা শিক্ষা দান আর পাশাপাশি নীতিশিক্ষা প্রদান। কেননা, একটি শিশু তার শৈশবে যা শেখে-দেখে-জানে, তা তার ক্রমবর্ধমান ও বিবর্তনমান জীবনে আদর্শ গঠনে সহায়তা করে। এবং শিশুরা সেই আদর্শের পথ ধরে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, আদর্শের চ্যুতি যে ঘটে না, তা কিন্তু নয়। নীতিশিক্ষার বিষয়বস্তুকে সম্পর্কের বিচারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক নীতিশিক্ষার পাশাপাশি 'ধর্মীয়' বা 'ধর্ম ভিত্তিক নীতিশিক্ষা' পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পড়াশুনা করা, মারামারি না করা, চুরি না করা, গুরুজনকে মান্য করা ইত্যাদি 'do or don't do' এর শিক্ষাই প্রাইমারগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণভাবে প্রাইমারের ক্ষেত্রেও নীতিশিক্ষার বিষয় হিসেবে এগুলিই আবশ্যিকভাবে এসেছে। 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমারে' ধর্মীয় নীতিশিক্ষার বিষয়টি অন্যমাত্রা নিয়েছে। এখানে বিচারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক নীতিশিক্ষার পাশাপাশি 'ধর্মীয় বা 'ধর্ম ভিত্তিক নীতিশিক্ষার বিষয়গুলি ইসলাম ধর্মাবলম্বী কেন্দ্রিক। যেমন—

> *"আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই মুসলমানদের কাজ। খাঁটি মুসলমান হইতে হইলে আমাদিগকে রীতিমতো নামায-রোজা করিতে হইবে, ভালো কাজ করিতে হইবে, পরের উপকার করিতে হইবে, জ্ঞানী হইতে হইবে, বড়ো কাজ করিয়া এই দুনিয়াই বড়ো হইতে হইবে। আশা করি, তোমরা সকলেই খাঁটি মুসলমান হইবে।"* [৪]

এতো গেলো প্রাইমার রচনার সাধারণ উদ্দেশ্যগত মিল-অমিলের আলোচনা। এবার এবার দেখা যেতে পারে প্রাইমার রচনার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উভয় প্রাইমারের মিল-অমিল সম্পর্ক। প্রাইমার উপস্থাপনের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে বর্ণ পরিচয়ের শিক্ষা। সেখানে উভয় প্রাইমারেই প্রথম বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে স্বরবর্ণ এবং তার পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা। বর্ণ পরিচয়ের শিক্ষার পরে রয়েছে অ-কার, আ-কার, ই-কার যোগে শব্দ গঠন, বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগে শব্দ গঠন, শব্দ যোগে বাক্যগঠন, পদ্য ও গদ্য শিক্ষার পাঠ। প্রাইমারের উপস্থাপনায় উভয় শ্রেণির প্রাইমারগুলিতে এই ক্রম অনুসারে প্রাইমার রচনা করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার 'ভাষা দেশ কাল' গ্রন্থে

প্রাইমার রচনার পদ্ধতিগতদিক ও কতকগুলি চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] যেমন— প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক (alphabetic), ধ্বনিমূলক (phonetic/phonic), শব্দানুক্রমিক (whole-word বা lexical), বাক্যানুক্রমিক (sentential), গাল্পিক (story) ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে একই প্রাইমারে এক বা একাধিক পন্থাও অবলম্বন করা হয়। আবার, প্রাইমারগুলিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার প্রয়োজনে, পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বর্ণানুক্রমিক (alphabetic) ভাবে বর্ণের পাঠ দেবার পাশাপাশি শব্দানুক্রমিক (whole-word বা lexical) শব্দ এবং তা চিত্রসহযোগে (photograph) শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা থাকতে পারে। প্রচলিত বাংলা প্রাইমার ও 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার' উভয় ক্ষেত্রেই পবিত্র সরকার উল্লেখিত পদ্ধতি ও চাহিদাগুলি পরলিক্ষিত হয়েছে। উদাহরণ সহকারে দেখা যেতে পারে—

প্রচলিত বাংলা প্রাইমার			মুসলমানি বাংলা প্রাইমার	
প্রাইমার/ বর্ণ	বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয়	যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত হাসিখুশি	আব্দুল্লাহ্ সালাফী'র নব সালাফী বর্ণবোধ	মোঃ নুরুল ইসলাম রচিত রহমানী বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ সংকলনে
অ	অজগর	অজগর আসছে তেড়ে	অযু	অজু কর ধীরে ধীরে
আ	আনারস	আমটি আমি খাব পেড়ে	আল্লাহ্	আল্লাহ বল মধুর সুরে
ই	ইঁদুর	ইঁদুর-ছানা ভয়ে মরে	ইসলাম	ইসলামকে আঁকড়ে ধর
ঈ	ঈগল	ঈগল পাখি পাছে ধরে	ঈমান	ঈমান রশি দৃঢ় কর
ক	কুকুর	কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি	কুরআন	কুরআন হল জীবন বিধান
খ	খরগোশ	খেঁকশিয়ালি	খেলা	খতিব করেন খোৎবা

		পালায় ছুটি		দান
গ	গাধা (গরু)	গোরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে	গোসাল	গরীব তরে দয়া কর
ঘ	ঘোড়া	ঘুঘু পাখি ডাকছে গাছে	ঘর	ঘরে সুন্নত কায়েম কর

প্রাইমারগুলিকে সরস আর চিত্তাকর্ষক করার ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণির প্রাইমারেই ছবির ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই ছবির আবির্ভাব এবং ক্রম বিবর্তনের একটা ধারা সম্পর্কেও আশিস খাস্তগীর 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৬] অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে প্রাইমারে আর হাতে আঁকা ছবি বা ইলাস্ট্রেশানের কোন ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। পরিবর্তে, ক্যামেরাতে তোলা ছবি, ফটোশপের কারিগরি এবং মুনাফার একচেটিয়া রমরমার জোয়ার, যেখানে শিশুর মনোজগৎ উপেক্ষিত। এবং তা উভয় শ্রেণির প্রাইমারেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়— একালের প্রচলিত প্রাইমারগুলিতে যেখানে ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলে, প্রয়োজন মতো ফটোশপ করে, কিংবা ইন্টারনেট থেকে সহজে ডাউনলোড (নামিয়ে/সংগ্রহ) করে, কোনো কোনো প্রাইমারে দেশি-বিদেশি কার্টুন (যেমন— ছোটা ভীম, পু-বেয়ার, মিকি মাউস ইত্যাদি) ব্যবহার দেখা যায়, সেখানে 'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার'গুলিতে ধর্মীয় অনুসঙ্গ কেন্দ্রিক ছবি ব্যবহারের প্রধান্য দেখা যায়। 'অ' এর পরিচিতি 'অযু'র মাধ্যমে করানোর ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রাইমারে ভিন্ন ভিন্ন ছবি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

> 'ইসলামী নতুন পাঠ' (হায়দার আলী): একজন ব্যক্তিকে অযু করতে দেখা যাচ্ছে।
>
> 'ইসলামি সহজ পাঠ' (সিরাজুল ইসলাম): এখানে 'অযু' শব্দের সঙ্গে পরিচয় করানো হলেও এখানে একটি 'মসজিদের' ছবি দেওয়া হয়েছে।
>
> 'রহমানী বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ সংকলনে' (নুরুল ইসলাম): একটি ঘটি জাতীয় পাত্রের ছবি রয়েছে।

> ‘শিশুকথা’ (জামান মুস্তাফিজুর রহমান): এখানে আরবি হরফে ‘বিসমিল্লাহ’ লেখা ছবি আছে।
>
> ‘সালাফী বর্ণ পরিচয়’ (শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী): এখানেও একটি ঘটি জাতীয় পাত্রের ছবি রয়েছে।’

ছবির ক্ষেত্র থেকে সরে এসে যদি শব্দ, বাক্য বা পদ্য-গদ্য পাঠের দিকে তাকাই সেখানেও মিল-অমিল লক্ষ্য করা যায়। পদ্য-গদ্য পাঠের উদ্দেশ্য শিশুদের শব্দ ও বাক্য গঠনের প্রায়োগিকদিক শিক্ষা দেওয়া। এরকম একটি গদ্য পাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে বিদ্যাসাগরের সরাসরি প্রভাব রয়েছে—
বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’-এর ১৪ নং পাঠে রয়েছে-

> *“আর রাতি নাই। ভোর হয়েছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি।”* [৭]

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বিদ্যালয় যাওয়ার বর্ণনা নুরুল ইসলাম রচিত ‘রহমানী বর্ণ-পরিচয়’-এর ১ম পাঠে পাই—

> *“ভোর হয়েছে। মোরগ বার বার ডাকছে। মোয়াযযেন আযান দিয়েছেন। আর ঘুমায়ো না। তাড়াতাড়ি উঠে পেশাব-পায়খানা সেরে নাও। তারপর অযু করে মসজিদে যাও। ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার পর কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর। তারপর কিছু নাসতা করে মকতবে গিয়ে বই পড়বে।”* [৮]

বিদ্যাসাগর রচিত ‘বর্ণপরিচয়’-এর পাঠের সঙ্গে যেমন ‘রহমানী বর্ণ-পরিচয়’- এর পাঠের মিল পাই তেমনি নামের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে।

প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের সঙ্গে ‘মুসলমানি বাংলা প্রাইমার’গুলির বিষয়গত যেমন প্রভাব বা মিল পাই, তেমনি প্রাইমার-নামের ক্ষেত্রেও মিল দেখতে পাই। যেমন—বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় এর সঙ্গে নামগত মিল/প্রভাব পাই— সামিম আহমেদ রচিত ‘ছোটোদের রহমানী বর্ণপরিচয়’ ; মোঃ নুরুল ইসলাম রচিত ‘রহমানী বর্ণ-পরিচয়’ ; এম. ইসলাম রচিত ‘শিশুর বর্ণপরিচয়’ ; মহাঃ সাফ্ওয়ান রচিত ‘শিশুদের রহমানী বর্ণবোধ ও আদর্শ লিপি’; শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী রচিত ‘সালাফী বর্ণ পরিচয়’ ইত্যাদি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত ‘শিশুশিক্ষা’ এর সঙ্গে নামগত মিল/প্রভাব পাই— জামান মুস্তাফিজুর রহমান রচিত ‘শিশুকথা’ প্রাইমারের

সঙ্গে। কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘সহজপাঠ’ এর সঙ্গে সিরাজুল ইসলাম রচিত ‘ইসলামি সহজ পাঠ’ প্রাইমারের নামগত মিল/প্রভাব পাই।

সর্বশেষে বলতে হয়, বাংলা প্রাইমার রচনার মূল উদ্দেশ্য বাঙালি শিশুকে বাংলা ভাষার শিক্ষা দেওয়া। সেখানে প্রচলিত বাংলা প্রাইমার হোক কিংবা ‘মুসলমানি’ বাংলা প্রাইমার— উভয় প্রাইমার রচয়িতা সেই উদ্দেশ্য পালনে যথার্থভাবেই নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন/করে চলেছেন। সেক্ষেত্রে প্রচলিত প্রাইমার রচয়িতাগণ ধর্মীয় সংস্রবের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাইমার রচনা করেছেন। আর ‘মুসলমানি’ বাংলা প্রাইমার রচয়িতাগণ ধর্ম কেন্দ্রিক এবং ধর্মীয় আচার-সংস্কারমূলক ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। সেখানে শিশুকে ভাষা শিক্ষার পাঠ দেওয়া ছাড়াও ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞানশিক্ষা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলি থেকে মুসলমান শিশু ইসলামি আদব-কায়দা থেকে দূরে চলে যাবে। এই উদ্বেগ ও সংকটের ভাবনা ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচয়িতাদের মধ্যে চালিত হয়েছিল। ফলে লোপ পেতে চলা দৈনন্দিন এবং ধর্মীয় জীবনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ, সংকটের মুখে পড়া ইসলামী আদব-কায়দা এবং আত্মসত্ত্বা নির্মাণে ধর্মীয় মানদণ্ডের আধারে ইসলামী বাংলা প্রাইমারগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং পথাচলা অব্যাহত রেখেছে। তবে ধর্মীয় সংস্রবের বাইরে উভয় প্রাইমার রচয়িতাগণ প্রাইমারের মৌলিক কর্তব্যগুলি পূরণ করেছেন। সেখানে মিল-অমিলের সম্পর্ক রয়েছে। যা আসলে বাংলা-বাঙালি-বাঙালিয়ানার সংস্কৃতিকেই বহন করে।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. মীর মশাররফ হোসেন, ‘আমার জীবন’, ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭। পৃ.-১৭৮

২. প্রথম শিশুপাঠ্য বইটি কলিকাতা—টালিগঞ্জ হইতে শ্রী মীর এব্রাহিম হোসেন দ্বারা প্রকাশিত এবং ২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত। আর দ্বিতীয় শিশুপাঠ্য বইটি ১৬ নং ওয়লেসলী স্কোয়ার হইতে এম. এব্রাহিম এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত। এবং বই এর বিজ্ঞাপন অংশে লেখক স্থান ও তারিখ দিয়েছেন— ১৩১৩ সাল ১২ই ফাল্গুন, ৩৬ নং গোরাচাঁদ রোড কলিকাতা।

সাধারণত পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে খ্রীস্টাব্দের প্রথম মাস শুরু হয়। সে অনুসারে বইটি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে প্রকাশিত বলে ধরা যেতে পারে।

সূত্র:— মীর মশাররফ হোসেন, 'মশাররফ রচনা-সম্ভার', কাজী আবদুল মান্নান (সম্পা.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫। ভূমিকা অংশ, পৃ.- বিশ

৩. আশিস খাস্তগীর (সম্পা.), 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০৬। পৃ.-২১

৪. মোঃ আনিকুল ইসলাম ও মোঃ গোলাম মোস্তাফা (সম্পা.), 'ছোটদের রহমাণী বর্ণ পরিচয়' (প্রথম ভাগ), মুর্শিদাবাদ, চিলড্রেন বুক হাউস। পৃ.- ৩৭

৫. পবিত্র সরকার, 'ভাষা, দেশ, কাল', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯। পৃ.- ১০৭-০৮

৬. আশিস খাস্তগীর (সম্পা.), 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬। পৃ.- ১৮-১৯

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বর্ণপরিচয়' (প্রথম ভাগ: অসংযুক্ত বর্ণ), কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ফাল্গুন ১৩৯১। পৃ.- ২৬

৮. মোঃ নুরুল ইসলাম, 'রহমানী বর্ণ-পরিচয়' (প্রথম ভাগ সংকলনে), মুর্শিদাবাদ, হাফেজ আবুল কাশেম (প্রকাশক), অক্টোবর ২০০৩। পৃ.- ২৬

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বনাম স্থানীয়ঃ পারস্পারিক সম্পর্ক ও আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস

সঙ্ঘমিত্রা দাস
গবেষক, ইতিহাস, বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *দেশভাগ এবং দেশান্তর একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে নানান পারস্পারিক সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়া। ১৯৪৭ সালে একদিকে দেশ স্বাধীন হয় এবং অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ সমগ্র ইতিহাসে এক ভয়ানক ও ব্যতিক্রমী ঘটনা রূপে রূপায়িত হয়। পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু অভিবাসন, একদিকে যেমন উদ্বাস্তুদের জীবন কে প্রভাবিত করেছিল- একইভাবে এই অভিবাসন পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বা আঞ্চলিকদের জীবনেও পরিবর্তন এনেছিল, যে পরিবর্তনের জন্য দুপক্ষই প্রস্তুত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুরা নিজেদের মাথা গোজার স্থান সন্ধান করতে শুরু করেন। কখনো সরকারী ক্যাম্পে, কখনো জবরদখল কলোনি গড়ে তুলে, আবার কখনো সরকার থেকে দেওয়া জমিতে- নানান ভাবে, নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষেরা উদ্বাস্তুদের দিকে নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও, সময়ের সাথে সাথে উদ্বাস্তুদের সাথে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন হতে শুরু করে। কেন এইরূপ পরিবর্তন বা উভয়ের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্কের নানান দিক নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা প্রয়োজন।*

সূচক শব্দ: *দেশভাগ, দেশবিভাজন, উদ্বাস্তু, অভিবাসন, সম্পর্ক*

সম্পর্ক এমন একটি শব্দ যার অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে একাধিক অর্থ। ‘সম্পর্ক’ শব্দটি আমাদের সমাজে চলার পথে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই শব্দের সাথে মিশে রয়েছে আন্তরিকতা, মায়া, মমতা, ভালবাসা। তবে একথাও ঠিক যে বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে ‘সম্পর্ক’ নামের শব্দটি, সম্পর্কের সূতো ধরে টান দিলে লক্ষ, কোটি সম্পর্ক আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নানান রঙে, সুরে বেসুরে, অস্পষ্ট আলোয়, ধূসর দূরত্বে, অসীম গভীরে, আড়ালে সংগোপনে। সম্পর্কের কোনো প্রকৃত বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয়না। সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলি ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা হলেও এরই মধ্যে সূক্ষভাবে লুকায়িত থাকে ‘স্বার্থ’ শব্দটি।[১] নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে গিয়ে খুব সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ

করলে, মানুষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। জীবনের নানান পর্যায়ে, নানান ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে বহু মানুষের সাথে মিলিত হওয়ায়– নানান সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলি যে আজীবন স্থায়ী হয়-তা নয়, অনেকসময়ই দেখা যায় যেকোন কারণেই সম্পর্কে ভাঙ্গন অনীবার্য হয়ে ওঠে – গতকালও যে পরম বন্ধু, আত্মীয় বা সহমর্মী বন্ধু - পরক্ষণেই সেই আবার চরমশত্রুতে পরিণত হচ্ছে। এই যে এরূপ পরিবর্তন হয় তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে মনস্তাত্বিক চিন্তা ভাবনা কাজ করে –যে মনস্তাত্বিক চিন্তাই কখনো বন্ধুকে শত্রু করে আবার শত্রুকে বন্ধু করে, আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনে এরূপ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাই- অনেকাংশেই এই পরিবর্তন স্বাভাবিক- এরকম ভাবেই গড়ে ওঠা একটি ভিন্ন ধরণের সম্পর্ক হল পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু- যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলন, তাঁদের সাথে পশ্চিমবাংলার আঞ্চলিক মানুষদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেমন ছিল বা কীভাবে উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পারিক সম্পর্কের রসায়ন নির্মিত হয়েছিল বা হয়নি – সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা প্রয়োজন, যার বীজ রোপিত হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের উষালগ্নে। মানুষ যখন মনে করে সে শারীরিক বা মানসিক ভাবে বিপন্ন, তখনই সে বাস্তু ত্যাগ করে।[২] বসতহারা এই মানুষজনই তখন উদ্বাস্তু বা রিফিউজি। রিফিউজি শব্দটির দুটি প্রতিশব্দ প্রথম- শরণার্থী। আক্ষরিক অর্থে, এমন কেউ যিনি আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। অন্যটি-উদ্বাস্তু, যার অর্থ গৃহহীন। বাংলায় ‘বাস্তু’ শব্দটিকে ভিটা বা ভিটে শব্দের সঙ্গে জুড়ে উল্লেখ করা হয়। ‘উৎ’ উপসর্গের অর্থ উৎখাত হওয়া বা সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ উদ্বাস্তু তিনিই, যাঁকে ভিটে বা ভিত্তিভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশকালের প্রেক্ষিতে, ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাতের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গৃহহারা মানুষের যন্ত্রণা আর স্মৃতিকাতরতার কাহিনি সব দেশে সব কালে এক সূত্রে গাঁথা।[৩]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী সময়ের ইতিহাস শুধু ওপার থেকে এপারে চলে আসার ইতিহাস নয়,লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের ভাল থাকা, মন্দ থাকা, রূপ-রূপান্তর ও জীবন-যাপনের কাহিনি। দেশভাগে একদিকে যেমন স্বাধীনতার শঙ্খ বেজেছিল সমগ্র দেশজুড়ে, ঠিক একইভাবে একটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জীবনে ধ্বংসের স্মারক রূপে রূপায়িত হয়েছিল। অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে, পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা তাঁদের সর্বস্ব হারিয়ে একটি দ্বিতীয় জীবনের সত্তাকে অবলম্বন করে, প্রবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু একদিকে সরকারী নির্যাতন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে

বসবাসকারী আঞ্চলিকদের বিরূপ মনোভাব উদ্বাস্তুদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানান সমস্যার মুখোমুখি করে, বদলাতে শুরু করেছিল পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন, যাঁরা এলেন, যাদের কাছে এলেন, এ বদল উভয় পক্ষের। বদলে গিয়েছে পরিবারের গড়ন, সদর-অন্দরের ব্যবধান, ঘর গেরস্থালির ধরণ ধারণ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদি। উদ্বাস্তুদের সামাজিক অবস্থান, রুচি-পছন্দ, আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষাগত মান, কাজের জগৎ ছিল অনেকটাই আলাদা। অনেক সামাজিক ওঠাপড়া ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল সে দিনের মানুষকে। তাঁরা যে শুধু তাঁদের নিজ ভূখন্ড থেকে উৎপাটিত হয়েছিল তা নয়, একটা গোটা জীবনবৃত্ত পিছনে ফেলে রেখে এখানে এসে তাঁদের আবার নতুন করে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। উথাল পাথাল দিনগুলি পেরোতে গিয়ে শিকড়বাকড় ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে হয়েছে। এত দিনের অভ্যস্ত জীবনে, আজন্মলালিত সংস্কারের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল নতুন সংস্কারের, নতুন জীবনবোধের, নতুন সম্পর্কের।[৪] উদ্বাস্তুদের আগমনে এই পরিবর্তন ছিল স্বাভাবিক ও অনীবার্য। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বাসিন্দারা এই জনস্রোতের ও এরূপ একাধিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সমস্যাবহুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, কর্মক্ষেত্রে সংকুচিত সুযোগের মুখে নতুন প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রবল ধৈর্য ও মনোবলকে নিজেদের জীবনযুদ্ধে, অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে তাঁরা নতুন জীবন শুরু করেছেন, তাঁদের এই জীবনে চলার পথে তাঁরা আঞ্চলিক মানুষদের সাথে একটা অভিনব সম্পর্কের ধারা কে বয়ে নিয়ে গিয়েছেন। যে সম্পর্কের সাথে যুক্ত স্বার্থ ও হিংসা, যাকে মাথায় রেখে সম্পর্কের রসায়নকে নানান ভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়। আশীস নন্দী যেমন বলেছেন, ‘হিংসার স্বরূপকে যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে নিজেদের দিকে, যাচিয়ে নিতে হবে আমাদের পরিপোষিত নৈতিকতা আর আদর্শের বিচারমান গুলিকে।’[৫] এই হিংসার কথা স্মরণে আনতে বা আলোচনা করতে আমরা যে ঠিক স্বস্তিবোধ করি না, তার একটা কারণ তো এই নয় যে, এই হিংসা আমাদের ন্যায় নীতির জগৎটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয় । অধ্যাপক নন্দী যাকে বলেছিলেন,- ‘কোলাপ্স অফ দ্য মরাল ইউনিভার্স’।[৬] এই মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাকে যদি একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক মানুষদের সাথে উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচার করা যায়, তাহলে এটা উপলব্ধী করা সহজ হবে বিভিন্ন সময়ে বা আলাদা আলাদা

পরিস্থিতিতে কেন উদ্বাস্তুদের প্রতি তাদের আচরণের বা সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে। যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই আচরণ কে স্বাভাবিক মনে হবে। আর তাই প্রথম দিকে(১৯৫০ এর দশকে) দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিকরা উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ালেও পরবর্তীকালে (১৯৬০ ও তার পরবর্তী সমরকাল)যখন উদ্বাস্তুরা নিজেদের অধিকারের জন্য সচেতন হতে শুরু করেন, তখন তারাই আবার উদ্বাস্তুদের প্রতি নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, এখন প্রশ্ন হল কেন এই আচরণগত পরিবর্তন? উত্তর - সেই ব্যাক্তি স্বার্থে আঘাত পড়া, বা আঘাত পড়েছে তাদের অধিকারবোধের জায়গায়। মূল বিষয় হল 'স্বার্থ' -এই শব্দটাই আমাদের এমনভাবে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, আমরা অনেক সময়ই আমাদের মানবিক চরিত্রের হনন করে ফেলি, একইভাবে পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুখ ফিরিয়ে থাকাও তাদের স্বার্থান্বেষী চরিত্র কে সামনে নিয়ে আসে- আর এই স্বার্থই বাধ্য করেছে মুখ ফিরিয়ে থাকতে- এই স্বার্থই পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের, পূর্ববঙ্গের মানুষদের পাশে থাকতে দেয়নি।

উদ্বাস্তুরা যখন এদেশে আসতে শুরু করলেন, তখন কংগ্রেসী নেতারা ও এদেশের মানুষ ঘৃণাভরে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই সময় ন্যায্যমূল্যে উদ্বৃত জমির পুনর্বন্টনের আন্দোলন- যে আন্দোলনে, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন মানুষও শরিক হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যদি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত, তাহলে উদ্বাস্তু আন্দোলন আর পশ্চিমবঙ্গের সমাজবর্হিভূত কয়েক লক্ষ অবজ্ঞেয় মানুষের আন্দোলন হিসেবে তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে থাকত না। উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দূর্দশা নিয়ে 'ছিন্নমূল' নামে একটি ছবি কলকাতার বিভিন্ন সিনেমাহলে দেখানো হত। এই ছবি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এলিট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হয়তো বুদ্ধিজীবীদের মনে কিছুটা সহানুভূতির সঞ্চার করেছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে এই মানুষ কীটদের দিকে এরা তাকিয়ে দেখেনি।[৭] অন্যদিকে উদ্বাস্তুরা একাধিক আন্দোলন, মিটিং মিছিল করেছিলেন, কলকাতাকে এক মহুর্ত ভুলতে দেয়নি যে তাঁরা আছে । স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৬৬ সালের আন্দোলনে কিশোরদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জন্মায়, কিন্তু ১০ থেকে ১৫ বছরের কিশোররা কীভাবে এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কায়েম করেছিল তা ভাবা প্রয়োজন। দক্ষিণ কলকাতার ১০ বছরের একটি ছেলেকে জীঞ্জাসা করা হয় 'হরতালের দিন কেন তুমি রাস্তা অবরোধ

করতে গেলে?' প্রতি উত্তরে সে জানায়, 'কারণ আমাদের খাবার নেই' জীবনের মায়া তুচ্ছ করে, অস্থায়ী কুঁড়েঘর থেকেই এরা বেরিয়ে এসে বিক্ষোভে , আন্দোলনে- সরকারের নিপীড়নমূলক প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল , কিন্তু শুধু উদ্বাস্তুদের সমর্থনেই এই সংগ্রামে সফল হওয়া ছিল অসম্ভব , সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক মানুষদের সমর্থন আবশ্যিক ছিল।[৮] সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থন যাতে পাওয়া যায় এবং সম্পর্ক তৈরী করা যায়-সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সচেতন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক মানুষদের মনে, কলোনির উদ্ভট বাঙ্গালদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা জবরদখল কলোনির আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে জমা হচ্ছিল। বড় জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের পতিত ও অনাবাদি জমি ছিল- যা মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী দরিদ্র মানুষের যুক্ত আন্দোলনে পরিণত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনার কথা ভাবা হয়েছিল।কারণ তাঁরা জানতেন যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সক্রিয় সমর্থন ছাড়া প্রশাসনের পক্ষে কোনোভাবেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনি থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে না। উদ্বাস্তুদের চাতুর্য, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও ক্ষমতা ব্যবহারের দক্ষতা পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনীতিতে তাঁদের কুশলী খেলোয়াড়ে পরিণত করেছিল। এক প্রকারের বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁদের দেহ মনে- প্রাণে সংক্রামিত হয়েছিল। এই সময় সাধারণ নির্বাচন আকস্মিকভাবে তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে দেশের সমাজ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না, সেই সমাজ দূর্ভেদ্য নয়, বরং অনায়াসভেদ্য। নির্বাচন তাঁদের এই সমাজকে ভেদ করার সুযোগই এনে দিয়েছিল। রাজনৈতিক দল তথা ইউ সি আর সি ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিল। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার কথা যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমনভাবেই কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষ দের সাথে উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক নির্মাণ করা যায় তা নিয়েও ভেবেছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই ধারণা জন্ম দিয়েছিল যে উদ্বাস্তু পঙ্গপাল চলে আসায় স্থানীয় মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে। অন্যদিকে কর্মসমিতির আশা ছিল যে, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য হাজার হাজার উদ্বাস্তুর জেলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখে কলকাতাবাসীর মনে কিছুটা করুণার সঞ্চার হবে, যদিও বাস্তবে তা হয়নি। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই আন্দোলন সফল হবে না, ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এক মাস ব্যাপী সত্যাগ্রহে প্রায় তিরিশ হাজার উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার বরণ করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও এঁরা

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহানুভূতি লাভে অক্ষম হন। কীভাবে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে উপড়ে ফেলে, দন্ডকারণ্যে নিয়ে ফেলা যায় তাই তৎকালীন নেতাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিদ্বন্ধী রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার লড়াইয়ে এঁরা বোড়ের ন্যায় ব্যবহার হয়েছেন কিন্তু কলকাতার মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পাররেননি। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসনের ব্যর্থতা একটি নতুন ধরণের মানবগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল - যাঁদেরকে বলা হয়েছে ‘প্রান্তিক মানব’।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন বামদলগুলিকে নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। তৎকালীন বামপন্থীদলগুলি তাদের শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য একটা সংগ্রামের সুযোগ খুঁজছিল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তাদের ক্ষমতার পরিমাপ করতে চেয়েছিল। তাদের এই চাওয়ার ক্ষেত্রে তারা উদ্বাস্তুদেরকে ব্যবহার করেছে। খাদ্য সমস্যা একটি স্বতন্ত্র সমস্যা যা উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, বেকার সমস্যা যদিও একটি সাধারণ সমস্যা তবুও উদ্বাস্তু আগমণের ফলে এই সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের চড়া দাম সকলকেই বিপর্যস্ত করেছিল। বামপন্থীদের কাছে এটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের খাদ্য সংকটজনিত পরিস্থিতিই পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণির মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে। রাজ্য সরাকার ব্যার্থ হয় সমস্যা সমাধানে।[৯]

বামপন্থীরা অনায়াসেই এবং অতি দ্রুত উদ্বাস্তুদের আন্দোলনে সামিল হতে পারত। ষাটের দশকে উদ্বাস্তু আন্দোলন বাম ও গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে এক হয়ে যায়। হতাশাগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোপ্রকারের সহানুভূতি ছিল না, এমনকি তাঁদের অস্তিত্বকে বারবার অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে, কংগ্রেসী নেতাদের ধারণা ছিল যে এই বাঙ্গাল উদ্বাস্তুরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং তাদের সন্তানসন্ততিদের জীবনে সংকট নিয়ে আসবে। ঠিক এই সময়েই তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং তারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথে এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা এবং উদ্বাস্তুদের জীবনজীবিকার স্বার্থে বামপন্থী দলগুলির সরকারবিরোধী আন্দোলন উদ্বাস্তুদের মনে বামপন্থার প্রতি আনুগত্যের সৃষ্টি করে।সেই আনুগত্য এবং শ্রমজীবী মানুষদের অকুন্ঠ সমর্থন কে কাজে লাগিয়েই পরবর্তী কালে(১৯৭৭)নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে নিজের ক্ষমতাসম্পন্ন স্থান তৈরী করতে সফল হয়। উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ানোর পশ্চাতে

এই উদ্দেশ্যটি অবশ্যই একটি অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের পেছনে ছিল শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রায় ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তু। বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলার পেছনে এদের অবদান অনস্বীকার্য, ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে এরাই ছিল মূলশক্তি। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই এই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের কাজের সাথে যুক্ত করেনি। তারা উদ্বাস্তুদের সাথে নির্মিত পারস্পারিক সম্পর্ককে কেবল ও কেবলমাত্র ব্যবহার করেছে ক্ষমতা দখলের হাতিয়াররূপে।খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থী মতবাদের প্রসার সি পি আই এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।বলাবাহুল্য, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে উদ্বাস্তুদের সমর্থনে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও পরবর্তী সময়ে তারা কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পথেই হেঁটেছে।[১০]

আমরা যদি একটু ‘স্বার্থ’ নামক এই চারিত্রিক বিষক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমাদের চারপাশটা বদলে যেত এবং পারস্পারিক সম্পর্কের বুনন কে আরো মজবুত করে নির্মাণ করা যেত, কিন্তু তা সম্ভব হয়না, ঠিক যেমন ভাবে স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু অভিবাসনের এত বছর পরেও উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক মানুষদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক, যা আজও সহজ সরল ও স্বাভাবিক হতে পারেনি পুরোপুরিভাবে। একই পাড়ায়, এমনকি একই বাড়িতে বসবাস করার পরেও মনে মনে উদ্বাস্তুরা আজও ফিরে যেতে চেয়েছেন নিজেদের পূর্ববাংলার বাড়িতে-মনে প্রাণে তাঁরা বিশ্বাস করেন পূর্ববঙ্গে ফিরে গেলেই ভালো হতো, শিকড়ের টান আজও তাঁদের ব্যথিত করে-এখন প্রশ্ন হল, কেন করে? কেন এই তাগিদ –তাহলে কি তাঁরা আজও ভালো নেই? আজও কি তাঁরা তাঁদের চলার পথে সেই স্বার্থন্বেষী মানুষদের সাথেই পথ চলেছেন যারা আজও ‘ঘটি’-‘বাঙ্গাল’ বিচ্ছেদকে প্রতি মুহুর্তে মাথায় রেখেছে- তা না হলে এত বছর পরেও কেন- উদ্বাস্তু জীবনগুলি উদ্বাস্তু জীবন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে চায়? কেন, এর কারন কি?এটা আমার কাছে একটা বিশেষ প্রশ্ন যা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। ‘এদেশীয় দের সাথে বনে না’, ‘ ওরা তো ওপার বাংলার-রেফেউজী’, ‘পাত্র বা পাত্রী ঘটি নাকি বাঙ্গাল?’ এমন সব প্রশ্ন গুলি আজও আমরা আমাদের চারপাশে শুনতে পারি, যা আমাকে বিদ্ধ করে আর ভাবিয়ে তোলে ।

তবে একথাও ঠিক উভয়ের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক দৃঢ় না হলেও বা হৃদয়ের মেলবন্ধন না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারস্পারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রসায়ন অবশ্যই গড়ে উঠেছে।যেমন পশ্চিমবংলার 'ঘটি' মানুষেরা তাদের খাদ্য তালিকায় যোগ করেছে –পদ্মার ইলিশ, কলমী শাক, নটে শাক- আবার পূর্ববঙ্গের বাঙ্গাল উদ্বাস্তুরাও একইভাবে নিজেদের খাদ্য তালিকায় রেখেছেন চিংড়ী মাছের মালাইকারী, ইচোর চিংড়ী- একে অপরের খাদ্যাভ্যাস কে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনিভাবে বাঙ্গালদের আটপৌড়ে শাড়ি পড়ার বিশেষ ধরণ হয়ে উঠেছে নতুন ফ্যাশান অথবা শেষ পাতে নিয়েছে পানের আস্বাদ।ঘটিদের প্রিয় মাছের টক ঝোল অম্বলের স্বাদ উপভোগ করেছেন বাঙালরাও। কিন্তু পরিশেষে সেই পারস্পারিক মনোমালিণ্যই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বৈপরীত্য এতটাই যে, বাঙ্গাল হয়েও কথায় কথায় বাঙ্গাল কথা বলার বিশেষ ধরণকে বদলাতে হয়েছে। প্রশ্ন সেইখানেই কেন এই বদল, এরূপ বদলের প্রয়োজন কেন?সামান্য বাক্য ব্যাবহার এও কেন নেই স্বাধীনতা। বাঙ্গাল কথা বলতে ভালো লাগে, কিন্তু বাঙ্গাল কথা বললেই পাশে থাকা লোকেরা আজও প্রশ্ন করে- 'তুমি কি বাঙ্গাল, উদ্বাস্তু?' কেন এরূপ প্রশ্ন বা এরূপ প্রশ্নের অর্থই বা কী?আমি এই প্রশ্নের উত্তরে গর্ববোধ করে বলি-হ্যা, আমি বাঙ্গাল- আমি উদ্বাস্তু –আমি তৃতীয় প্রজন্মের সন্তান হয়েও , কোনদিনও বাংলা দেশ না গিয়েও নিজ শিকড়ের সাথে যেমন একটা সম্পর্ক রয়েছে আবার ঠিক একইভাবে সম্পর্ক রয়েছে পশ্চিমবাংলার সকলের সাথেও। বাঙ্গাল পরিবারে, বাংলাদেশের নানান গল্প শুনে আমার বেড়ে ওঠা।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরূপ অনুভব প্রকাশ করলে, ঘটিরা বলে- তারা কেন বাঙ্গালদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, যে বাঙ্গালরা এত বছর পরেও মনে-প্রানে নিজেদের সংস্কৃতিকে নিয়েই গর্ববোধ করে-পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না? কিন্তু কেন পারেনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাঙ্গাল উদ্বাস্তুদের মন থেকে পূর্ববাংলার স্মৃতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষরূপে পরিণত করতে বা পারস্পারিক আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করতে—পারেনি? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই পারতে চায়নি কারণ ভয় ও স্বার্থ তাদের তা করতে দেয়নি।

তথ্যসূত্র:

১.	সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়ঃ দেশভাগ-স্মৃতি আর সত্তা (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃঃ১৮

২. আশীস হীরাঃ উদ্বাস্তুঃ ইতিহাসে ও আখ্যানে (কলকাতা, গাংচিল, ২০১৯), পৃঃ ১১

৩. তদেব, পৃঃ ১৮

৪. তদেব, পৃঃ ২৬

৫. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীঃ প্রান্তিক মানব (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃঃ ৪৫-৪৭

৬. হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ঃ উদ্বাস্তু (কলকাতা, সাহিত্য সমসদ, ১৯৭০) পৃঃ ২২

৭. অভিজিৎ দাশগুপ্তঃ বিস্থাপন ও নির্বাসনঃ ভারতে রাষ্ট্র- উদ্বাস্তু সম্পর্ক (কলকাতা, কে পি বাগচী আন্ড কোম্পানী, ২০১৮)

৮. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ১২৭

৯. তদেব,পৃঃ১৪৩-১৪৪

১০. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭-২৯

বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ

অহিন রায়চৌধুরী
পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশঃ *বর্তমান সময়ে এক নব জাতীয়তাবোধের স্পৃহা জনমানসে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে এ বলাই বাহুল্য ঠিক একই সাথে বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের নানা দিক থেকে ক্ষুদ্র আকারে পরস্পর বিরোধী মতবাদও উঠে আসছে। ঠিক এই যুগ সন্ধিক্ষণে গেরুয়া বসনধারী এক সন্ন্যাসীর জীবন চর্চা ও চর্যা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠছে। যে মানুষটি জীবনভর দারিদ্র-পীড়িত- পদদলিত মানুষের সমানাধিকারের জন্য আপামর দেশবাসীকে দিয়েছেন নবদিশা- উদ্বুদ্ধ করেছেন 'জীবসেবায়'- মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন জাতপাত ভুলে সাম্য-মৈত্রী ও ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা। তিনি ভারতের যুগাবতার- কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় জাতিকে কর্মযোগের পথ-প্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির জীবনদর্শন ও কর্মপদ্ধতি ভারতীয় যুবদের জন্য অনুকরণীয়। যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই গড়বে দেশ, বদলাবে সমাজ। চারিদিকে বিদ্বেষের ঘনঘটা। যুব সমাজকে বিপথে চালিত করার ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। ফলে ক্ষীয়মান আদর্শবোধের পুনরুদ্ধারে বিবেকানন্দই হতে পারেন পথপ্রর্দক। কেননা তিনিই বলতে পেরেছিলেন- হে ভারত ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত-তোমার ভাই। স্বামীজিই বলতে পারেন- 'আমিই ভারত, ভারতবাসী আমার ভাই আমার রক্ত আমার প্রাণ।' ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ধরে নানা কারণে সামাজিক স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল। গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়েই আবির্ভাব এই মহামানবের। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দুধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে বাস্তবায়ন করতে সফল হয়েছিলেন তাঁরই দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্য স্বামী বিবেকাননন্দ।*

সূচক শব্দঃ *ভারতীয় সমাজ, ঐতিহ্য-আধুনিকতা, বহুত্ববাদ, জাতীয়তাবোধ, বিবেকানন্দ।*

পৃথিবীর যেকোন সমাজ তথা দেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের সঙ্গে সেই দেশের দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশাত্মবোধক সাহিত্যের বিকাশ ভারত ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মনীষীরা তাদের লেখার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার লেখা দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'বর্তমান ভারত'। স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি ১৯০৫ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের ভারত দর্শন এবং ভারত সম্পর্কে তাঁর দার্শনিকতত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে যা জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন দিক খুলে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে বৈদিক ঋষিদের দ্বারা সমাজ শাসনকাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে ভারতবাসীর মুক্তির প্রয়োজন। কারণ জাতীয় ঐতিহ্য প্রকৃত জাতীয়তাবোধের উৎস। বিবেকানন্দ বলেন, সমাজের উঁচুতলার মানুষের দ্বারা শত শত বছর ধরে শোষিত শূদ্র শ্রেণির মানুষ একসময় সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তারা দেশ শাসন করবে। সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে এবং শুরু হবে প্রকৃত মানুষের গণজাগরণ। বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত' গ্রন্থে দেশপ্রেম জাগরিত হয়েছে। তিনি ভারতীয় সমাজকে 'আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী' বলে বর্ণনা করে প্রত্যেক ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে বলেছেন। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে বিবেকানন্দ দেশমাতৃকার মুক্তির ডাক দিয়েছেন। তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। সমাজের প্রতিটি স্তরে যে ভাবে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে, তা কারও অজানা নয়। পাল্টা দিয়ে চলেছে ধর্ম-বিদ্বেষের রাজনীতি। স্বামী বিবেকানন্দ এই সমস্যা প্রসঙ্গে আগেই সতর্ক করেছিলেন—"ধর্মের সংহতি-স্থাপনই ভবিষ্যৎ ভারত গড়িবার প্রথম সোপান। সেই মূল ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের এবং জাতির কল্যাণের জন্য পরস্পরের সর্ববিধ মতভেদ ও অকিঞ্চিৎকর কলহ আমাদের বর্জন করিবার সময় আসিয়াছে। বহু দিকে বিকীর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সম্মিলন দ্বারাই ভারতে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" বিবেকানন্দ কথিত এই ধর্মের সঙ্গে প্রচলিত সম্প্রদায়গত ধর্মের কোনও যোগ নেই। যোগ একমাত্র হৃদয়ে। অনেকেই আবার বিবেকানন্দের এই 'জাতি' শব্দটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "অন্যান্য দেশের

সমস্যাসমূহ অপেক্ষা এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত।” ফলে সম্প্রদায়গত ধর্মের নামে যে জাতি সৃষ্টির কথা বর্তমানে প্রচলিত, তা যে নিছক একটি ভ্রম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এখানেই চলে 'আমরা-ওরা'-র রাজনীতি, যার শিকার সাধারণ মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ একবার ১৮৯৯ সাল নাগাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে বলেছিলেন, “আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি-মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে-সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও আমার আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে, মুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে।”[১] স্বামিজী ছেয়েছিলেন দেশবাসীকে জাগাতে, বিশেষ করে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে দেশপ্রেমে। তাদের মধ্যে রুদ্রের প্রকাশ হোক এই ছিল তাঁর কামনা। রুদ্রস্তুতিটি স্বামিজীর তাই খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই তা আবৃত্তি করতেন। আদর্শভ্রষ্ট ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরনে মত্ত তাঁর দেশের যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, “হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরন, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ, দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?” স্বামিজীর প্রভাব কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা জাগিয়ে তুলেছিল তা দেখতে পাওয়া যায় বিবেকানন্দ যখন শিকাগো ধর্মসভা থেকে ভারতে এলেন, সশরীরে নয় সংবাদের রথে চড়ে এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরনে। ঐ সংবাদগুলো পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল-আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না। ভারতীয় সমাজের দোষের চেহারাটা দেশী-বিদেশী সকলের কল্যানে বে-আব্রু হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি, রোগের নিদান কাগজপত্রে লিখিত হয়ে, বক্তৃতামঞ্চে কথিত হয়ে ভারতভূমিকে আছন্ন করে ফেলেছিল- আত্মাবমাননার এই বিপুল আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্যাদাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করেছিলেন, আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'- জাতিপ্রান সহর্ষে তখন সাড়া দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুষটির যিনি লজ্জিত করতে আসেননি, উদ্বুদ্ধ করতে এসেছেন, ক্ষুণ্ণ করতে আসেননি, এসেছেন পূর্ণ করতে।[২] এদেশের যুবচিত্তকে স্বামীজী কীভাবে জাগিয়েছিলেন সেকথা লিখেছেন তাঁর সমকালীন রবীন্দ্রনাথও, “আধুনিক

কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচরণগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,-দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বানীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগ ফেলেছে। তাঁর বানী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোকা নয়, তা কোনো দৈহিক পক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রানমনকে বিচিত্রভাবে প্রানবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে বিবেকানন্দের সেই বানী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে।”[৩]

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের ওপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গন্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনিষীগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেকে মিলাইয়া কর্ম করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করে করিতে চাহিয়াছেন; ইহারা বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীতে যে দেশেই যেকেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন- তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন- তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রই ধন্য।[৪] রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ন স্বামী ইহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[৫] একজন তথাকথিত অশিক্ষিত হিন্দু যোগী, যার মধ্যে বিদেশী শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছিল না ভারতীয় জাতীয় সংহতির প্রবক্তা তিনি স্বয়ং। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের জাতীয়তা বিকাশের স্থায়ী ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণই গড়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো প্রথাগত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষা ছিল না। প্রথাগত প্রাচ্যের কোনো শিক্ষার আঙ্গিকে তিনি কখনো প্রবেশ করেন নি। অথচ সেই মানুষটিই, প্রচলিত বোধের ওপর দাঁড়িয়ে, প্রবাহিত ভারতবর্ষের আধ্যাত্বিক চিন্তা-চেতনার এমন একটি সহজ-সরল-অনাড়ম্বর-মানবিক দ্যোতনা উপস্থাপিত করেছিলেন, যা একদিকে

অতিসাধারণ মানুষকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, অপরপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজন ও তাঁর চিন্তাচেতনার দ্বারা নিজেদের মননলোককে অত্যন্ত সজাগভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনচর্চা উপদেশাবলী ভেতর দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কিভাবে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে আলগা করে দিচ্ছে, লোকায়ত ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে সেটি প্রকাশ করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মত শ্রীরামকৃষ্ণের কথার ভঙ্গিতে কখনও কোনো অবস্থাতেই ঔপনিবেশিকতার প্রতি বিদ্বেষ, কিংবা রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ঝরে পড়েনি। তা সত্বেও যুক্তিবোধের আধিক্যের ভেতর দিয়ে, উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের মানবিক চিন্তা চেতনার ধারাকে কতখানি ওলট-পালট করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শ্রীরামকৃষ্ণ পিছপা হন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্যবোধ অপেক্ষা, প্রাচ্যের বহুত্ববাদী, সমন্বয়ী, ধর্মনিরপেক্ষ, সম্প্রীতির মানসিকতাসম্পন্ন মূল্যবোধ যে মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক, সেই ভাবনা-চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গোটা জীবনব্যাপী যাপন চিত্র, উপদেশাবলী ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। একঘেয়ে জীবন চর্চার পরিবর্তে মানুষের জীবনে বৈচিত্রের ভেতর দিয়ে কিভাবে ঐক্যের সাধনা সাধিত হয়, তার যেন একটা দিশা তিনি তাঁর গোটা জীবনের চর্চার ভেতর দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে পাশ্চাত্যের যুক্তিবোধের করা নিয়মাবলী এবং সার্বিক আঙ্গিক, প্রাচ্যের জীবনধারার সঙ্গে কোথায় সাযুজ্যের অভাব তৈরি করছে, তার দিক নির্দেশ করে, জীবন চর্চা কে একটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে, পরমত সহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা প্রকাশের যে শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গিয়েছেন, তার ভেতর দিয়ে কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা নয়, গোটা ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জীবনবোধের একটি নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছিল।এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করেছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সকল ধর্মই একই সর্বশক্তিমান বিধাতার চরণতলে সম্মিলিত হয়। সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রেমের ভিত্তিতে ভারতের সকল ধর্মের সমন্বয়- ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিকাশের স্থায়ী ভিত্তিমূল গড়ে তুলবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একযোগে না দেখলে স্বামীজীকে যথার্থ ভাবে বিচার করা সম্ভব হবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্যে দিয়েই মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হতে হয়, তবে তাকে হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের বিশেষ

আবাসভূমি হলে চলবে না। তাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রানিত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হতে হবে। রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের যে বাণী, ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ তা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে।[৬] পোশাকি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বর্তমান ভারতের রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অথচ ধর্মকে সরিয়ে রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে কোনও দিনই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা পায়নি, পেতে পারে না। বিবেকানন্দ স্পষ্ট বলেছেন, “রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে-কখনও ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবেও না।” তবে রাজনীতিক বা সামাজিক- সব বিষয়ে সাফল্যলাভের মূল ভিত্তি যে মানুষের সততা, সে কথাও বারবার উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর কাছে এই সততা বা মনুষ্যত্ববোধই মানব ধর্ম। আপন চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনেই এই ধর্মের পালন করা যায়। এ কারণেই তিনি আবার বলেছেন, “আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই-যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে!” গান্ধী যে ভাবে ‘সর্বোদয়’ ভাবনার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন, কার্ল মাক্স ভেবেছিলেন ‘সাম্যবাদ’ সমাজব্যবস্থার কথা, স্বামী বিবেকানন্দও তেমন সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন। তবে তাঁর পরিকল্পনায় মাত্রা পেয়েছিল ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। আর তা সম্ভব জনসাধারণকে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে। ১৮৯৪ সালের ২০জুন আমেরিকা থেকে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, “জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।” এই প্রসঙ্গেই স্বামী শুদ্ধানন্দকে লেখা ১৮৯৭ সালের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে বিবেকানন্দ লিখেছেন, “জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।” ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। নূতন প্রণালী হলো নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি-সাধন।” দেশের সার্বিক উন্নতিতে বিবেকানন্দ কথিত এ সব প্রাথমিক জ্ঞান ও পরিকল্পনাগুলি অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব। কারণ, তা না হলে এই পরিকল্পনার বাস্তব ও পরিপূর্ণ

রূপায়ণ অসম্ভব। যে নৈরাজ্যের বাতাবরণে দেশের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে, তা ভেঙে ফেলতে জাতীয় জীবনে আত্মশক্তি ও সততার প্রয়োজন। বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায় ব্যক্তির সেই সততা তথা মানুষ হওয়ার পদ্ধতির পরিচয় মেলে।

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও বহুত্ববাদী চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে স্বামিজী জাতীয় সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহন করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়। ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতার সংস্কৃতি পাশ্চাত্যে গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় ভাষায় তখনও গড়ে ওঠেনি তেমন করে। প্রাগাধুনিক ভারতভূমে কথকতা ছিল, মরমিয়া সাধকদের গীত-কীর্তন-নৃত্য ছিল। কিন্তু বাগ্মিতার নিদর্শন কোথায়? ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি বলেই তো কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতারা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন। বিবেকানন্দ কিন্তু ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ভাবপ্রবাহ বিস্তারে আগ্রহী। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন, ‘কাল এখানে (আলমোড়ায়) ইংরেজ-মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী— হিন্দিতে যে বক্তব্য করতে পারবো তা তো আগে জানতাম না।’ ভারতীয় ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে নিজের ভাব পৌঁছে দিতে পেরে বিবেকানন্দ অনেক বেশি আনন্দিত, ইংরেজিতে যে বক্তৃতা ভালই করা যায়, আমেরিকা-ইংল্যান্ড ফেরত এই সন্ন্যাসী ভালই জানেন। ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার গুরুত্ব আলাদা। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, ‘ভাষার ভেতর ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস? ঐরূপে ভাবের চেহারা দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্য বাঙলায় ভাল বক্তব্য দেওয়া যায় না।’ বাংলা ভাষায় বলা ও লেখার মাধ্যমে কীভাবে গণসংযোগকারী চিন্তাতরঙ্গ সৃষ্টি করা যায় তা বিবেকানন্দের অন্যতম অনুসন্ধানের বিষয়। এ জন্যই তাঁর লেখায় বাকসংস্কৃতির নানা ছাঁদ চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের লেখার ভাষাকে উদ্বোধন সম্পাদক ত্রিগুণাতীতানন্দ ‘উচ্চবিমিশ্র’ ভাষা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর লেখায় কথ্য ভাষা আর তৎসম শব্দ মিলেমিশে থাকে। উদ্দেশ্য শ্রোতা-পাঠকের চিত্তে দোলা দেওয়া। শুধু সাধু বা শুধু চলিতে তা হওয়ার জো নেই। বিবেকানন্দের সুপরিচিত বাংলাভাষার ‘বাণীগুলি’ খেয়াল করলেই দেখা যাবে সেগুলিতে সাধু-চলিত মিলে মিশে আছে। ‘হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমার নীরব অনবরতনিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া,

ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য; আর তুমি?– কে ভাবে এ কথা।' (বিলাতযাত্রীর পত্র) হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই' (বর্তমান ভারত) পড়লে মনে হয় নিতান্ত লেখা নয়, বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন।[৭] বিশ শতকে পরাধীন বঙ্গদেশে সমাজ ও রাজনীতির সচেতন চিন্তকরা অনেকেই বিবেকানন্দের এই বাক-দর্শন খেয়াল করেছিলেন। যেমন, গোপাল হালদার, সুভাষচন্দ্র বসু, নজরুল ইসলাম। গোপাল হালদার তাঁর স্মৃতিকথা রূপনারানের কূলে বইতে লিখেছিলেন, 'বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ-আগুনের পরশমণি।' নজরুল বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন উনিশ শতকের বিশের দশকে। 'সৈনিক' নজরুলের মনে হয়েছে, 'কিন্তু সেনাপতি কই? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।' আর সুভাষের বিবেকানন্দ প্রীতি তো সুপরিচিত। দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিকথা পড়লে জানা যায় বক্তা হিসেবে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছিলেন সুভাষ। শুধু ইংরেজি ভাষায় নয়, ভারতীয় ভাষাতেও সুভাষ তাঁর বাক সঞ্চার করতে চান। সুভাষের এই ভাবনায় বিবেকানন্দের আদর্শ নিহিত আছে। আজ একুশ শতকে এসে কয়েকটি কথা মনে হয়। উনিশ-বিশ শতকে পরাধীন ভারতে দেশজাগানিয়া বাকসংস্কৃতির গুরুত্ব ছিল খুবই গভীর। তবে কথা ফাঁদও হয়ে উঠতে পারে, তাই সংশয় হয়, বিবেকানন্দকে আমরা বাণীময় করেই রাখলাম না তো!

ভারতবর্ষ তথা এই উপমহাদেশ নারীজাতির প্রতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। বেদের যুগে এই উপমহাদেশ নারীর প্রতি যে সম্মান জ্ঞাপন করত তা ছিল পূজার যোগ্য। পরবর্তীকালে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নারী জাতির অবস্থার অবনতি ঘটে। বর্তমানকালে নারী জাগরণে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন উনিশ শতকের নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়। সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রচলন করলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত দেবীচৌধুরানী চরিত্র মানসিক দৃঢ়তায় ও সাহসিকতায় পুরুষের তৈরি গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সাহস দেখালেন। মানবদরদী শরৎচন্দ্র তাঁর নারী চরিত্রগুলির মানসিক উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হলেন। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরেই নারী আন্দোলন তার সার্বিক রূপ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের একটি বিশেষ

অবদান হল নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আত্মনির্ভর করে তোলা। তাঁর এই নারী জাগরণের সূচনা শৈশবকালে কামারপুকুর থেকেই। শাস্ত্রীয় আলোচনা, ভক্তিগীতি, যাত্রা, কবিগান সবকিছুর মাধ্যমে পল্লীর নারীজাতিকে তিনি আত্মসচেতন করে তুলেছিলেন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তুচ্ছ করেছিলেন জাতিভেদ প্রথাকে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছিলেন ধনী কামারনীকে ভিক্ষে মা'র আসনে অধিষ্ঠিত করার মধ্যে। তাঁরই পবিত্র অধ্যাত্মশক্তির ছোঁয়ায় নটী বিনোদিনীর চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। এছাড়া নিজের স্ত্রীকে ষোড়শী পূজা করে তিনি ভারতীয় নারীত্বের অতি উচ্চ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামীজি তাঁর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে একবার বলেন, 'মাতৃশক্তিই হচ্ছে সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। এই শক্তিরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে এই দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক। দেখছ না শ্রীশ্রীমা সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য এসেছেন। এ তো সবে শুরু, সমস্ত পৃথিবীতে এই মাতৃশক্তি কালে এক বিরাট রূপ নেবে।' 'স্বামীজির চোখে পতিতা নারীও ছিলেন মহামায়ার অংশ স্বরূপিণী। তাঁর সমস্ত উপদেশের মূলমন্ত্র হল আত্মতত্ব বা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উদ্বোধন। তিনি বিশ্বাস করতেন নারী ও পুরুষ দুজনেরই এই আত্মজ্ঞান লাভ করার সমান অধিকার আছে। তিনি বলেছেন, অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হতে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তার প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।' নারী জাতির মধ্যে এই আদর্শের পূর্ণত্বের চরম বিকাশ হল মাতৃত্ব এবং সতীত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ নারীর জায়া রূপকে অস্বীকার করেননি কিন্তু জননী রূপকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য সর্বংসহা নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।' তিনি পাশ্চাত্য নারীর শক্তিরূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন ভারতের স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং ভারতীয় নারীর শক্তিরূপ কীভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হয়ে উঠতে পারে। 'হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' সীতা সহিষ্ণুতার প্রতীক। সাবিত্রী সাহসিকতার প্রতীক, কারণ তিনি মৃত্যু দেবতার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। আর দময়ন্তী মানবতার প্রতীক—তাঁর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে একজন মানুষকে তিনি বরণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশীয় নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা, গুণাবলী, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মানসিক উদারতা ইত্যাদি স্বামীজিকে মুগ্ধ করে। নিঃসম্বল, নিঃসহায় অবস্থায় যখন তিনি আমেরিকায়

উপস্থিত হন তখন সেখানকার মহিলাগণ যেভাবে তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা স্বামীজি আজীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাঁর এক ভক্ত হরিপদ মিত্রকে তিনি লেখেন, 'এ দেশের (আমেরিকার) স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎ পুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়ই কম। এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না। এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ থেকে ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত!' এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা! এইরকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব। ভারতীয় স্ত্রী জাতির শিক্ষিকা ও পথপ্রদর্শকরূপে স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতাকে ১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'ভারতের জন্য বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহিণীর প্রয়োজন।' তাঁর এই আন্তরিক আহ্বান নিবেদিতার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাই তো স্বদেশ, স্বজন, প্রতিষ্ঠা সব বিসর্জন দিয়ে তিনি ভারতের স্ত্রী জাতির উন্নয়নকল্পে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজের মঙ্গলের জন্য নারীর ভূমিকাকে পুরুষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন স্বামীজি। তিনি মনে করতেন নারী শক্তির সার্থক উদ্বোধনের উপরই সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতি নির্ভরশীল। স্বামীজি বলেছেন ভারতীয় নারীর সব সমস্যার সমাধান সম্ভব শিক্ষা-নামক শব্দের সেই মন্ত্রটির সাহায্যে। আশ্রমবাসিনী নারীদের শিক্ষার কথায় তিনি বলেছিলেন, মেয়েরা নিজেদের ভাবনাকে মূর্তিরূপ দিক।' আরও বললেন, 'কালীকে যে সব সময় একই ভঙ্গীতে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। তাঁকে নতুন নতুন ভাবে আঁকার কথা ভাবতে তোমার মেয়েদের উৎসাহ দাও, সরস্বতীর একশ রূপ কল্পনা কর।' একই সঙ্গে স্বামীজি চেয়েছিলেন নারীরা আত্মনির্ভরশীলা হবে। সে জন্যও প্রয়োজন শিক্ষা এবং হাতের কাজ অথবা বিভিন্নরকম শিল্পকর্ম-শিক্ষা, লক্ষ্য রাখ প্রত্যেকটি মেয়ে যেন এমন কিছু জানে যাতে দরকার হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।' ভবিষ্যৎ যুগের আদর্শ নারী কেমন হবে সেই সম্বন্ধে

বিবেকানন্দের কল্পনার একটি সার্থক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন স্বামীজির সুযোগ্যা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর *The Master As I saw Him* বইটিতে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.২০৭.

২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,* ১ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.১১৮.

৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিশ্ববিবেক,* বাক-সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ.১৭৯.

৬. *উদ্বোধন পত্রিকা,* ৩৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ.৭০.

৭. বিশ্বজিৎ রায়, *মন দিয়ে তাঁকে পড়া দরকার,* আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী ২০১৮.

‘অমৃত’ পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের সাথে সমকালের বিশিষ্ট মনীষীগণের সম্পর্ক

সন্ধ্যা মন্ডল
পি এইচ ডি গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

[*রবীন্দ্রনাথের মতো কালজয়ী মানবের সমকালে তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, রোম্যাঁ রোলাঁ প্রভৃতি মনীষীগণের যে সম্পর্কের নির্মাণ ঘটেছিল, তা স্বভাবতই একটি সারস্বত ইতিহাস রচনা করে। ‘অমৃত’ সাহিত্য পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকগণের এই সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করে। রচনাটিতে এটিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিধৃত হয়েছে।*]

১৩৬৮ থেকে ১৩৮৮ (১৯৬১-১৯৮১), মাত্র কুড়ি বছর আয়ু একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার। সময়টি বাঙালি জীবনের ক্রান্তিকাল। বামপন্থী ও পরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যেও বাঙালি পাঠক মনে হয় একটি সারস্বত আশ্রয় খুঁজছিল। রাজনীতির সাথে সাথেই চলচ্চিত্র ও নাট্য, বিজ্ঞান-ক্লাব ও সাহিত্য আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়ে বাঙালির সমাজ জীবনে। জ্ঞানস্পৃহা ও জাতির সাংস্কৃতিক ভাবনাই ‘অমৃত’-র মতো একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের জন্ম দেয়।

সাপ্তাহিক ‘অমৃত’-এর প্রকাশ ১৩৬৮ সালের ২৯ বৈশাখ। সেটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষের বছর। ‘অমৃত’ পত্রিকাতেও রবীন্দ্র-সমকালের বিভিন্ন মনীষীগণের সঙ্গে বিশ্বকবির সম্পর্কের একটি অন্বেষণ শুরু হয়। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে রবীন্দ্র-সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভুবনও। সমসাময়িক এই মনীষীগণের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথও নানাভাবে ঋদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর মানসলোক সৃষ্টির নব নব প্রেরণায় প্রসারিত হয়েছে। তাই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বহুমাত্রিক ও বিশ্বমানবিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে, সেটিই আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ :

‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৬২ সালের ৯ মার্চ সংখ্যায় নরেন্দ্র দেবের ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৯৬১) দুবছর পরেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

প্রাবন্ধিক এই দুই মহামানবের আদর্শ ও কর্মকান্ড নিয়ে বিশদে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, বহুবিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও প্রবল প্রভেদও ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে দেশপ্রেমের চেতনা পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে বিবেকানন্দের জীবন গড়ে ওঠে প্রবল আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে। স্বদেশকে মুক্তি করে পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি ত্যাগ ও সেবাকেই ভারতের জাতীয় আদর্শ বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় উন্নতি তথা আধ্যাত্মিক প্রগতিলাভের পক্ষে এইটিকেই একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে পারেননি। তাই কবি ঘোষণা করেছিলেন —

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। ..." [১]

রবীন্দ্রনাথের সাথে বিবেকানন্দের ভাবনায়, কর্মপদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও, স্বামীজির সম্পর্কে কবির লেখালিখিও খুব একটা কম নয়। স্বামীজির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন বারবার। কিন্তু বিবেকানন্দ কবিগুরু সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেছিলেন কিনা, জানা যায় না।

১৯৬৩ সালের ১০ মে সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' শিরোনামে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বহু আলোচিত পত্রের প্রতিলিপি 'অমৃত'-এ মুদ্রিত হয়েছে। জাতিকে দেশপ্রেমের ব্যাপারে পরিচালিত করার ব্যাপারে গান্ধীজির সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজি স্বদেশী ভাবনায় অহিংস আন্দোলনের পথটিকেই নিদিষ্ট করেন। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেশের মানুষের তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করার কথা বলেন। তাই চরকা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ রবীন্দ্রনাথের কাছে অর্থহীন মনে হয়। কারণ তিনি বলেন এটা ক্রমে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে বুদ্ধিকে ম্লান করে দেবে। চরকা কাটার মধ্যে মানুষের পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। রবীন্দ্রনাথের পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথটিকেই সঠিক বলে চিহ্নিত হয়েছে। —

"বস্তুত চরকা কাটা একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই। ... আধুনিককালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে

ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্রত্যাগে ফলেচে।”[২]

‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের ‘বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রভাব মনীষীদের উপর নানা ভাবে পড়েছিল। বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে বহুমুখী মানবিক জীবন-ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল। এবং সেই ভাবনা তাঁর অগ্রজ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই মনীষীত্রয়ের ভাবধারাতে এক অভূতপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে।

লেখক বলছেন, স্বদেশানুরাগ এবং স্বদেশপ্রীতির দিক থেকে তিনজনের ভাবনাতে এক গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের অধীনে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী হলেও পরিণত জীবন-ভাবনায় তিনি দেশানুরাগকে মানুষের মহত্তম ধর্ম বলতে কুণ্ঠিত হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই জলন্ত স্বদেশপ্রেম পরবর্তীকালে কত স্বদেশানুরাগী যুবককে মুক্তিযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল সক্রিয় স্বদেশপ্রেম। আত্মনির্ভরতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে তিনি পরনির্ভর জড় জাতিকে জাগাতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনের পথ ও অভিপ্রায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখছেন —

“বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেমে অন্তর্গূঢ় জ্বালা ও যন্ত্রণা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে স্থিতধী মনীষীর অভ্রান্ত পথনির্দেশ, আর বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমে নিদ্রোত্থিত ক্ষুধার্ত সিংহের গর্জন। সে গর্জনে শৃঙ্খলিত বাঙালি তরুণ-তরুণীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। স্বদেশের মুক্তিকামনায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তিলে তিলে আত্মবিসর্জন করতেও তারা দ্বিধা করেনি।”[৩]

‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৭৯ সালের ২৪ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য-এর ‘রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি’ শীর্ষক বহু আলোচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সাথে ঠাকুর পরিবারের সরলা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

স্বামীজি এবং মিশনের আদর্শের উপর সরলাদেবীর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনাতেও কোন রকম গোঁড়ামির স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বামীজি প্রায় নীরব থেকেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের এই নীরবতায় রবীন্দ্রনাথের দায় কতটা সে নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রাবন্ধিক এই আলোচনায় দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠার অনেক সুযোগ ঘটেছিল। অথচ কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই দুই মহামানবের সম্পর্ক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। লেখকের বক্তব্যে স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ স্বামীজির বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং মেশার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের দিক থেকে সেভাবে সাড়া মেলেনি। অথচ একসময় স্বামীজিই চেয়েছিলেন নিবেদিতাকে ব্রাহ্মদের সাথে পরিচয় করাতে। যার কারণে **১৮৯৯** সালের **২৭** জানুয়ারি-তে ঐতিহাসিক চা-পানের সভার আয়োজন হয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন —

> *"চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একেবারেই কিছুই আলোচনা হয়নি—এটি যেন একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার। কারণ রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই যথেষ্ট আলাপী মানুষ ছিলেন। ... রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে চাইবেন কেন, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে যখন এই চায়ের আসরের আয়োজন করেন। তবে আশ্চর্য লাগছে এই জন্যে যে এতবড় একটি ঐতিহাসিক চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে কি ভগিনী নিবেদিতা, কি রবীন্দ্রনাথ, কি স্বামী বিবেকোনন্দ কেউই কিছু জানাননি।"* [৪]

রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে নরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং যথেষ্ট আগ্রহীও ছিলেন। তার প্রমাণও পাওয়া যায়। দেখা গেছে স্বামীজির কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এসে যেত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মঠের জীবনেও রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। তাঁর 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে বহু রবীন্দ্রসংগীত অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে সেই স্বামী বিবেকানন্দ আবার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর রচনারীতিকে বিদ্রুপও করেছেন।

অন্যদিকে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা প্রায়শই প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে। স্বামীজির দেহত্যাগের পর একটি স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ডঃ সরসীলাল সরকারের একটি চিঠির

প্রত্যুত্তরে, স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত পত্রে, রোমাঁ রোলাঁর সাথে আলাপে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠেছে। স্বামীজির প্রয়াণের দুবছর পরে ১৯০৫ সালে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে আয়োজিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেছিলেন। এমনকি তাঁর 'গোরা' উপন্যাসেও স্বামীজির প্রভাব পড়েছে।

সমগ্র আলোচনাতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের একজন উৎসাহী শ্রোতা ও গায়ক হয়েও এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন কোন এক রহস্যময় কারণে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকে গেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বলেই স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরে অনুষ্ঠিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ নিজে সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় আলোচনায় এই প্রবন্ধটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবনার অবতারণা করেছিল।

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৮০ সালের ৪ জানুয়ারি সংখ্যায় তাপসকুমার ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথই মেশেননি, মিশতে চাননি' প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছে। ১৩৮৬ সালে ৭ ভাদ্র থেকে ২১ ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' প্রবন্ধটির সমালোচনা করে এই প্রবন্ধটি রচিত। প্রাবন্ধিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সাথে মিশতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেই একটা অদ্ভুত শীতলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

লেখক আলোচনায় দেখিয়েছেন স্বামীজি সন্ন্যাস গ্রহণের আগে ও পরে বহুবার জোঁড়াসাকোয় ঠাকুরবাড়িতে যান। এমনকি বিবেকানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে রবীন্দ্রনাথের গান সংকলিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বিবেকানন্দ গাইতেন। বাংলার বাইরে কাশীতে রবীন্দ্রনাথের নাম ও রবীন্দ্র-গানের প্রচার বিবেকানন্দই প্রথম করেন। সাক্ষী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। নিবেদিতাকে চায়ের আসরের জন্য স্বামীজিই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন —

> *"চায়ের আসরটি বিবেকানন্দই আয়োজন করেছিলেন, বিবেকানন্দেরই ইচ্ছায় ও আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন ও তিনটি গান গেয়েছিলেন এবং স্বামীজী অপূর্বভাবে কথা বলেছিলেন, তাহলে বিবেকানন্দ নিশ্চুপ রইলেন কোন হিসাবে। এবং এটাই কি প্রমাণিত হল না, বিবেকানন্দই চাইতেন সর্বদা রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথই এড়িয়ে চলতেন।"*[৫]

এছাড়াও লেখক দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ রবীন্দ্ররচনার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮২সাল-১৮৮৬সাল) পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনার সাথে স্বামীজির খুব ভালোভাবে পরিচয় ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনী পাঠে জানা যায় ১৮৮৭ সাল থেকে স্বামীজির জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে। রবীন্দ্ররচনা পড়ার মতো সময় ও রুচিও তাঁর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল নেহেরু :

অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬১ সালের ২৬ মে সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নেহেরু' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতে নেহেরু রবীন্দ্রনাথকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ঠাকুর পরিবারের বংশোদ্ভূত রবীন্দ্রনাথ অন্য সকল সদস্যের থেকে ঊর্ধ্বে। তিনি রাজনীতিক না হয়েও স্বদেশী আন্দোলন তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর গঠনাত্মক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এর ভাবধারার মিলন ঘটিয়েছেন। সমগ্র প্রবন্ধে জওহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথের জয়গান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাথে নেহেরুর সম্পর্কের উজ্জ্বলতর দিক নিয়ে আরও একটি রচনা 'অমৃত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ২৯ মে সংখ্যাটিতে 'নেহেরু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত নেহেরু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা এখানে পুনঃপ্রকাশিত প্রকাশিত হয়েছে। জওহরলাল নেহেরুর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক মনোভাব পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতে তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট — কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা।"[৬] এছাড়াও তাঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন পলিটিকসের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে তিনি নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেননি। জীবনের ক্ষেত্রে যা সত্য তাকেই গ্রহণ করেছেন।

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ৫ জুন সংখ্যায় জওহরলাল নেহেরুর 'রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সময়' শীর্ষক প্রবন্ধটি অনেকটা স্মৃতিকথার মতো। রচনাটি অনুবাদ করেন রাম বসু।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎকারের স্মৃতি সেভাবে নেহেরুর মনে না থাকলেও উপলব্ধি

করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের সাথে মিলিত হবার পর কবির চিন্তা, রচনা, ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। গান্ধীজির সাথে তিনি সবসময়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মনের মিল খুঁজে পেতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গান্ধীজি যেমন অতি সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তুলতে পারতেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সর্বব্যাপী। তাঁর সাথে অতি সাধারণ স্তরের মানুষেরও অন্তরের যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ সম্পর্কে জওহরলাল বলেছেন —

> *"রবীন্দ্রনাথকে যদি বুঝতে হয় তবে আমাদের বুঝতে হবে সেই যন্ত্রণাও যার ভিতর তাঁকে আসতে হয়েছিল। বিশ্বের সমগ্র যন্ত্রণাকে তিনি যেমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন আমাদেরও সেইভাবে অনুভব করতে হবে।"*[৭]

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি :

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬৩ সালের ৮ ফেব্রুরারি সংখ্যায় সমকালীন সাহিত্য সংখ্যায় অভয়ঙ্কর-এর 'গুরুদেব ও গান্ধীজী' নামে একটি ছোট্ট রচনা প্রকাশিত হয়। ১৩৬৯ সালের ২৫ মাঘ সংখ্যায় 'সমকালীন সাহিত্য' নামের কলমে অভয়ঙ্কর ছদ্মনামে লেখক "Truth called Them Differently: Tegore-Gandhi Controversy" পুস্তকটির সমালোচনা করেছেন। ভারতের দুই অনন্যসাধারণ পুরুষ পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তারপরেও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল অনেক। এই দুই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের বাদানুবাদ নিয়ে আলোচিত গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর :

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ১০ জুলাই এবং ১৭ জুলাই সংখ্যায় কমল চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম আর রামেন্দ্রসুন্দর গোঁড়া হিন্দু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উভয়ের সাথে আলাপ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী এই ঘনিষ্ঠ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল।

বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পরিষদ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে রূপায়িত হয়। এই পরিষদকে কেন্দ্র করেই এই দুই মনীষীর যোগাযোগ ঘটে। সংস্থা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।

এমনকি এই পরিষদের নানা কর্তব্য বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর জোড়াসাঁকোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে আলোচনা করতেন। অসুস্থতার কারণে তিনি পরিষদের সাথে আর পরে যুক্ত থাকতে পারেননি। ১৩২১ সালের ৫ ভাদ্র-এ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে এক সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্ধনা জানান হয়। সেই প্রেক্ষিতে সি এফ এনড্রুজকে সাথে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে কলকাতায় আসেন। এবং একটি দীর্ঘ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সেখানে কবি তাঁর সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছিলেন —

> *"যখন তুমি নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে পৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত।"*[৮]

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের সাথে শেষদিন পর্যন্ত যোগাযোগ রেখে গেছেন। প্রাবন্ধিক তাই এই প্রসঙ্গে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে চিঠি লেখেন। এই খবর 'বসুমতি'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর এই সংবাদ অবগত হয়ে তাঁর কনিষ্ঠকে দিয়ে রবিবাবুকে বলে পাঠান, তাঁর উত্থান শক্তিরহিত হওয়ার কারণে যেতে না পারায় কবি যেন স্বয়ং এসে একবার তাঁর পায়ের ধুলো দিয়ে যান। কবি সেই আশা পূরণ করেছিলেন। ভিন্ন মানসিকতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল :

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কমল চৌধুরীর 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে প্রজ্জ্বলিত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতায় এক বিস্ময়কর মনীষা। সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা ভারত ও ইউরোপীয় দর্শনকে এক নতুন সত্যের পথ দেখিয়েছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান, তাঁকে কখনও আত্মগর্বী ও উদ্ধত করে তোলেনি। প্রাবন্ধিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন —

> *"জ্ঞানরাজ্যের এক অসীমলোকে তাঁর স্থান। ... বিশ্বমানবতার এই মহান যোদ্ধা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক এবং মহান মানবপ্রেমিক।"*[৯]

রবীন্দ্রনাথের সাথে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। নানা সময়ে তাঁদের মধ্যে পত্রালাপে আলোচনা হতে দেখা যায়। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হলে, উদ্বোধন উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে মনোনীত করেন। ১৯৩৫ সালে ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বিসপ্ততিবর্ষ (৭২ বর্ষ) জন্মদিন উপলক্ষে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। এটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকতে না পারলেও, স্বরচিত একটি প্রশস্তিবাণী পাঠিয়ে দেন। সেটি এই রচনায় পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র :

'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ২২ জানুয়ারি সংখ্যায় শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রমানসে সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। একবার সুভাষচন্দ্র স্বদেশসেবা সম্পর্কিত উপদেশ নিতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। কবি তাঁদের বলেছিলেন দেশসেবায় দীক্ষিত হতে হলে প্রথমে পল্লীসংগঠনে মন দিতে হবে। সেদিন এই নীরস পল্লীসংগঠনের কথা তাঁদের ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করতে সুভাষচন্দ্রের বেশ সময় লেগেছিল।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসা ছিল। সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জনমানসে নতুন যে প্রাণসঞ্চার করার ব্রত নেন, কবি সেটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত কবির সাথে সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎ হয়। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তরুণের আশা ও আদর্শের প্রতীক। তাঁকেই উদ্দেশ করে কবি 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করলেন। ১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা উৎসর্গপত্রে তিনি লিখলেন:

> *"কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"*[১০]

১৩৪৩ সালের ২৩ চৈত্রে কারাবাস থেকে মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রকে দেশবাসী অভিনন্দিত করার দিনে কবিও তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণে ভূষিত করেন। এছাড়াও সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির(!) পদ ত্যাগ করার পরেও কবি 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি লিখে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। ১৯৪০ সালের ১ জুলাই-এ রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং থেকে

ফিরলে সুভাষচন্দ্র কবির সাথে দেখা করতে আসেন। পরের দিন ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ কবির যে বিবৃতিটি পাওয়া যায়, প্রাবন্ধিক সেটি তুলে ধরেছেন এইভাবে —

> *"ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি। তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন। এবং দেশবিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন সেই জন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, ... তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।"*[১১]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সুভাষচন্দ্রের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। নানা সময়ে সুভাষচন্দ্র কবির কাছে পরামর্শ নিয়েছেন। আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। কবির একবার আহ্বানেই তিনি সাড়া দিয়েছেন। সাক্ষাৎ করে বহু বিষয়ে আলোচনা করে ঋদ্ধ হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অনেক বক্তৃতাতেই কবির প্রসঙ্গ তুলে ধরে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিই এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির মূল কথা।

<u>রবীন্দ্রনাথ ও 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :</u>

'অমৃত' পত্রিকায় **১৯৬৫** সালের ২৮ মে সংখ্যায় কমল চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ-এর বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘ, গভীর ও শ্রদ্ধার। আমৃত্যু তা অক্ষুন্ন ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতানুযায়ী রামানন্দই হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর মতো আর কেউ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার নানারূপ প্রচার করেননি। বস্তুত রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রজীবনের আলোচনা 'প্রবাসী', 'মর্ডান রিভিউ'র সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্পূর্ণ থাকত।

১৮৯২ সালের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে রামানন্দের সম্পাদনায় 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এবং সম্ভবত তিনি এই পত্রিকার গ্রাহকও ছিলেন। **১৮৯৬** সালের অক্টোবরে রামানন্দ এই পত্রিকার সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। **১৮৯৭** সালের ডিসেম্বরে রামানন্দের সম্পাদনায় 'প্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ছিলেন এর নিয়মিত লেখক।

এরপর রামানন্দ দায়িত্ব নেন 'প্রবাসী' পত্রিকার। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন —

"রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের অর্থে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের যাবতীয় খরচ চালাতেন। তাই রামানন্দ আশ্রমের সেবা এবং বন্ধুকে সহায়তার জন্য সাধ্যাতীত ভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখার পারিশ্রমিক দিতেন।"[১২]

রামানন্দ যেমন রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশ করেছিলেন, 'প্রবাসী'-র জন্যও কবির বিরাট ভূমিকা ছিল। একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায় আবদ্ধ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেন :

১৯৬৬ সালের ৭ অক্টোবর সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় কমল চৌধুরীর 'রবীন্দ্রসুহৃদ প্রিয়নাথ সেন' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ সালের পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। প্রিয়নাথ ছিলেন নানা ভাষায় পারদর্শী। দেশ-বিদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করে পরিশীলিত মনন ও সীমাহীন পান্ডিত্যের অধিকারী। কাব্য সমালোচনায় প্রিয়নাথের ছিল একটি স্বতন্ত্র ধারা। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখছেন —

"রবীন্দ্র সাহিত্যের সার্থক প্রথম সমালোচক বলা যায় প্রিয়নাথ সেনকে। কবি এবং কাব্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিপুণভাবে। রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রিয়নাথের রসজ্ঞ মনের পরিচয় সব থেকে বেশি সুস্পষ্ট। ... তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও গভীর রসানুভূতি রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ... বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থানকে সুদৃঢ় করতে প্রিয়নাথের অবদান সব থেকে বেশি।"[১৩]

প্রিয়নাথ সেন কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চাতেই আবিষ্ট থাকেন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কতখানি অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি থেকে জানা যায়। সুখে দুঃখে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকেই বারবার কাছে পেতে চেয়েছেন। এমনকি আর্থিক অনটনেও কবি তাঁকেই স্মরণ করেছেন। এই সম্পর্ক যে কতটা গভীরে ছিল, তা এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যাঁ রোলাঁ :

'অমৃত'-এ ১৯৭৩ সালের ১১ মে সংখ্যায় রোম্যাঁ রোলাঁর 'রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রোম্যাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে ফ্রান্সে যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তারই বর্ণনা হল প্রবন্ধটির বিষয়। প্রথম সাক্ষাতে সৌম্যকান্তি রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল দৃষ্টি, ঋষিতুল্য পৌরুষের মহিমাময় বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এইভাবে —

> *"প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হই যখন, নিজের অগোচরেই মন বলে ওঠে যেন গীর্জায় এলাম, কণ্ঠস্বর হয়ে আসে স্তিমিত। তারও পরে, কাছ থেকে এই মুখমন্ডলের উন্নত ও সূক্ষ্ম পার্শ্বরেখা পরিদর্শনের সুযোগ যখন আসে, প্রতি আঁচড়ের শান্তি ও সংগীতের আড়ালে নজরে পড়ে সংহত কত না শোকের ছাপ, মোহবিমুক্ত দৃষ্টি, পৌরুষদৃপ্ত বুদ্ধি যা জীবনের সমস্ত সংগ্রামেই সম্মুখীন হয় দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ চিত্তকে তার আবিলতা থেকে দূরে রেখে।"*[১৪]

রচনাটিতে রোম্যাঁ রোলাঁর বন্ধু সি.এফ.এন্ড্রুজ-এর কথাও উঠে এসেছে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম। তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ এবং অন্তরের যোগাযোগটিও এখানে বর্ণিত।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮০, এই সময়টি 'অমৃত'-র প্রকাশকাল। নানা সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়কালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন মনীষীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাও বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণায় এই রচনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে রচিত লেখাগুলিও 'অমৃত'-কে নব নব ভাবনায় ঋদ্ধ করেছে। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও উক্ত মনীষীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক রচনাগুলি সাহিত্যমহলে ও বিদগ্ধসমাজে সন্দেহাতীতভাবে একটি নতুন ও ব্যাপ্ত দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

তথ্যপঞ্জী:

১. নৈবেদ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১২৫ বছর), পৃ: ৯৭৫

২. অমৃত, ১০ মে, ১৯৬৩ সাল, 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি'

৩. অমৃত, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ সাল, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ', পৃ: ১০

৪. অমৃত, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ সাল, তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি', পৃ: ৩৮

৫. অমৃত, ৪ জানুয়ারি, ১৯৮০ সাল, তাপসকুমার ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথই মেশেননি, মিশতে চাননি', পৃ: ১৪

৬. অমৃত, ২৯ মে, ১৯৬৪ সাল, 'নেহেরু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'

৭. অমৃত, ৫ জুন, ১৯৬৪ সাল, জওহরলাল নেহেরু, 'রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সময়', পৃ: ৩৫৫

৮. অমৃত, ১৭ জুলাই, ১৯৬৪ সাল, কমল চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ: ৮৫৩

৯. অমৃত, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সাল, কমল চৌধুরী, 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল', পৃ: ৪৯৮

১০. মাঘ, ১৩৪৫ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উৎসর্গপত্র, 'তাসের দেশ'

১১. অমৃত, ২২ জানুয়ারি, ১৯৬৫ সাল, শিবানী চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রমানসে সুভাষচন্দ্র', পৃ: ৯১৬

১২. অমৃত, ২৮ মে, ১৯৬৫ সাল, কমল চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ', পৃ: ২৬৮

১৩. অমৃত, ৭ অক্টোবর, ১৯৬৬ সাল, কমল চৌধুরী, 'রবীন্দ্রসুহৃদ প্রিয়নাথ সেন', পৃ: ৭৮৪

১৪. অমৃত, ১১ মে, ১৯৭৩ সাল, রোম্যাঁ রোলাঁ, 'রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে'

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকসংস্কৃতিতে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক

ধীমান মণ্ডল
গবেষক, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : *লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীনতম শাখা হল ছড়া। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শাখাগুলির মধ্যে আছে প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি। একসময় গ্রামে গঞ্জে এইসব ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি লোকমুখে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এগুলি জনপ্রিয়ও ছিল। কিন্তু বর্তমানে লোকসমাজে প্রবাদের ব্যবহার দেখা গেলেও ধাঁধা ও ছড়ার ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বা প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া ছড়া ও ধাঁধার ব্যবহার খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এই সমস্ত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদগুলি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত। তাই এগুলির মধ্যে আঞ্চলিক মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, কাজকর্ম প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে। তাই এগুলির মধ্যে আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত কৃষি সম্পর্কিত ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কৃষিকাজ এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা। এই কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে থেকে বিভিন্ন ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।*

সূচক শব্দ : *ছেঁচা - জলসেচন, রুয়ে - রোপন করে, গেরস্ত - গৃহস্থ, কিষান - কৃষক, থোয়া - রাখা, ন্যাংটো - উলঙ্গ, চাপি - চাপ দেওয়া, ঝোলে - ঝুলন্ত অবস্থায়, কাড়া - কর্ষণ করা, ডাগর গুছি - মোটা গোছা, কুটি - খড়কুটো।*

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হল কৃষি সভ্যতা। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি আদিম যুগের মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে নদী তীরবর্তী অঞ্চল, অরণ্যাবৃত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল খাদ্য ও বাসস্থানের আশায়। পরে এই বনভূমি কেটে নিজেরাই ফসল উৎপাদন শুরু করে। সেই সময় থেকে সূত্রপাত ঘটে কৃষি কেন্দ্রিক সভ্যতার।

গবেষকগণ যদিও কৃষি সভ্যতার শুরুর সঠিক দিনক্ষণ আজও আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই কৃষি সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব আট হাজার বা নয় হাজার বছরে ইসরায়েল এবং জর্ডনের একটি গ্রামে খনন কার্যের ফলে

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ গম, যব ও বিভিন্ন ফসলের দানার সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণায় জানা গিয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায় বুনো গমের চাষ ছিল। কৃষি গবেষক কঁদেলের গবেষণা থেকে জানা যায় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ অব্দে ভারতবর্ষের নিম্নগাঙ্গেয় ভূমিতে উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও সুগন্ধী ধানের চাষ হত। পরবর্তী সময়ে সেই ধান ভারতবর্ষ থেকে চীনে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ভারতবর্ষ, ফিলিপাইন, চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলকে পৃথিবীর আদি ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

সিন্ধু সভ্যতা বিষয়ক গবেষণায় জানা যায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে তিল, গম, মটরশুটি, তুলো প্রভৃতির চাষ হতো। প্রাগ-আর্য যুগে বাংলাদেশে অনার্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই প্রথম কৃষিকার্যের প্রচলন করেন। প্রথমে আস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ ও পরে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষেরাই এ ব্যাপারে যুক্ত ছিল। ধান, পান, সুপুরি, কলা প্রভৃতির চাষ করত তারা। কৃষিকার্য বিষয়ক বহু শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। এছাড়া ঋগ্বেদ, অথর্ববেদেও প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষিকার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারতেও কৃষিকার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সীতা' শব্দের অর্থ হল হলকর্ষণ রেখা। রাবণের সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার মধ্যে রূপকের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দেশে কৃষি বিস্তারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণ কাহিনির মধ্যে কৃষি সভ্যতা বিস্তারের প্রসঙ্গ রূপকের মাধ্যমে বলা হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কবে থেকে কৃষিকার্য প্রবর্তন বা শুরু হয় সে সম্পর্কে একেবারে সঠিক তথ্য আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি, তবে গবেষকদের মতে এ অঞ্চলের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এরূপ অনুমান কথা হয় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল কৃষিকে নির্ভর করে। নরোত্তম হালদারের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি পুন্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ অংশই হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে দক্ষিণ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনের সীমানা ছিল। এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ধান এখানকার প্রধান ফসল। তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রধানত কৃষি নির্ভর দেশ। বহু প্রাচীন কাল ধরে মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে কৃষিকাজ করে আসছে। এখানকার বেশীরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। এখানকার কৃষকরা কৃষিকাজ তো করেই থাকে এছাড়াও অন্যান্য বৃত্তির মানুষেরা বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে কৃষিকাজও করে থাকে। এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে আছে ধান, আম, কাঁঠাল, আখ, খেজুর, সুপুরী, পান, কলা, খেজুর ইত্যাদি। তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে

একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি। কৃষি সভ্যতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আচার আচরণ, লোকবিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা, ব্রত প্রভৃতি। এখানকার প্রচলিত লোককথা, প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া প্রভৃতিতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামে গঞ্জে ঘুরলে বা ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে লোকমুখে বিভিন্ন কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, লোককথা প্রভৃতির উল্লেখ আমরা পাই। এগুলি এখানকার লোকগোষ্ঠীর মুখে বহুকাল ধরে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ কৃষি ও চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেগুলিই আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচ্য। কৃষিকাজের সঙ্গে এখানকার সাধারণ মানুষ গভীরভাবে যুক্ত। তবে শুধুমাত্র কৃষক বা কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি নয় এমনকি সাধারণ মানুষের মুখেও এই সমস্তা ছড়া, প্রবাদ ধাঁধাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার সমস্ত মানুষেরই কৃষি বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে কারণ কৃষিই এখানকার প্রধান জীবিকা। তাই কৃষি বিষয়ক প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া সমগ্র লোক সমাজের ফসল। তাই এগুলির বৈচিত্র্য ও গভীরতাও অনেক। এছাড়া এগুলি জীবনরসে সমৃদ্ধ। এগুলি থেকে এ অঞ্চলে কৃষিকাজ সাধারণ লোক সমাজের জীবনচর্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আমরা জানতে পারি।

এই সমস্ত ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়াগুলির জন্ম কীভাবে কখন হয়েছিল তার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। এগুলির কোন লিখিত রূপ নেই। লোকসমাজের মুখে মুখেই এগুলির জন্ম ও বিবর্তন। নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই এগুলির ধারক ও বাহক। আসলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও লোকসমাজের স্বভাব কবিত্বের উপর নির্ভর করেই এগুলি জন্মলাভ করেছে এবং লোক জীবনের পটভূমিতে এগুলির বিকাশ ও বিস্তৃতি। বহুকাল ধরে এদেশের মাটিতে এগুলি লালিত ও প্রচলিত। শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে নয় গ্রামের হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, মজলিশে, পূজা-পার্বণে, বৈঠকখানায় এমনকি বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মেও এগুলি বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলি এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সম্পদ। হাস্যরস যেমন আছে এগুলির মধ্যে তেমনি মঙ্গলকর দিক, সমাজের করণীয়-অকরণীয় বিভিন্ন প্রসঙ্গ এর মধ্যে উঠে এসেছে। বিশেষ করে কৃষিকর্ম বিষয়ক বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, মঙ্গল-অমঙ্গল, চাষের পদ্ধতি এগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া আছে যেগুলি কৃষি বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ডাক ও খনার বচন একসময় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এদেশে কৃষক সম্প্রদায় এগুলি দারুণভাবে মেনে চলত ও চাষের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাত। বর্তমানে এগুলির ব্যবহার কমে গেলেও কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এখনও ডাক ও খনার বচনের ব্যবহার দেখা যায় এ অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে এগুলি এ অঞ্চলের মাটিতে চর্চিত হতে হতে এ অঞ্চলের লোক সমাজের মনে, সংস্কারে, আচার-আচরণে, বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে গ্রোথিত হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির বিবর্তনও ঘটে। তাই কোথাও কোথাও এগুলির বিবর্তিত রূপও খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কিছু ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

প্রবাদ :

প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত সরস প্রকাশ। প্রবাদ শব্দের অর্থ হল পরম্পরাগত বাক্য, জনশ্রুতি, জনরব। আর্চার টেলর-এর মতে- "A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one."[১] দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত কৃষি সম্পর্কিত প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে এখানকার কৃষি পদ্ধতি, কৃষি সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, সমস্যা, উপায় প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এগুলি এ অঞ্চলের লোক সমাজের দলিল স্বরূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত কৃষি বিষয়ক প্রবাদের প্রবচনের কিছু উদাহরণ হল-

বামন গেল ঘর
লাঙল তুলে ধর।[২]

জন-মাহিন্দারদের মালিকের অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা এখানে ধরা পড়েছে। এছাড়াও ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরলাম। সুন্দরবন নিবাসী পরিমল মহাজনের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রবাদে দেখি-

আশায় মরে চাষা।[৩]

নোনা জমির চাষ।
চাষার সর্বনাশ।[৪]

অর্থাৎ সঠিক জমিতে চাষ না করলে যে কৃষকের ক্ষতি সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

আউশের চাষ
লাগে তিন মাস।[৫]

আউশ ধান চাষের সময় সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। ইন্দ্রনীল মন্ডল মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রবাদে দেখি-

ছেঁচা দিয়ে করে চাষ
শাক-সবজী বারো মাস।[৬]

চাষে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রবাদটিতে।

তিন'শ ষাট কলা রুয়ে
থাকগে গেরস্ত ঘরে শুয়ে।
লাগিয়ে কলা না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।[৭]

কলা চাষের নিয়ম ও পদ্ধতির কথা এখানে বলা হয়েছে।

বোশেখে কাড়ান আষাঢ়ে রোয়া
কিষান বলে জায়গা হয় না ধান থোয়া।[৮]

প্রবাদটিতে ধান চাষের সঠিক সময় সম্পর্কে কৃষককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধাঁধা :

ধাঁধা লোকসাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধাঁধা শব্দের অর্থ কৌতুহলজনক বুদ্ধি-বিভ্রমকারী প্রশ্ন। "ধাঁধা শুধু ধন্দ লাগায় না, দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করে। বস্তুত ধাঁধা একটি জটিল জিজ্ঞাসা, দুরূহ প্রশ্ন, আবার সমস্যাও।"[৯] ধাঁধা লোকসমাজে বুদ্ধি বিভ্রম করা ছাড়াও নির্মল আনন্দ দান ও অবসর বিনোদনও করে থাকে। কৃষি বিষয়ক ধাঁধা গুলিতে আমরা দেখি কৃষিকাজ, কৃষি সম্পর্কিত নানা উপদেশ, নির্দেশ, সমস্যা প্রভৃতি উঠে আসে বিভিন্ন রূপকের মধ্যে। এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত কৃষি সম্পর্কিত বেশ কিছু ধাঁধার পরিচয় তুলে ধরা হল।

কোন গাছের আগে বীজ পরে ফুল।[১০]
ধাঁধাটির উত্তর ধান গাছ।
রাঙা বিবি জামা গায়।
কাট্‌লে বিবি দু-খান হয়।[১১]

ধাঁধাটির উত্তর মুসুর ডাল।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় সুন্দরবনের কুমিরমারি অঞ্চলের দেবু মণ্ডল মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ধাঁধা আমরা পাই –

গাছের ডালে দোল খায়।

ন্যাংটো হয়ে হাটে যায়।[১২]

ধাঁধাটির উত্তর তেঁতুল। খোসা ছাড়িয়ে তেঁতুল হাটে বিক্রি হয়।

ফুল নেই ফল নেই পাতায় ভরা।[১৩]

উত্তর হল পান গাছ।

দেখে এলাম বঙ্গের মাঠে।
উপুড় হয়ে পিছনে হাঁটে।[১৪]

ধাঁধাটির উত্তর হল ধান রোয়া।

একটু খানি মামা।
তার গা বোঝাই জামা।[১৫]

উত্তর হল পেঁয়াজ।

এক যে ছিল হুমো।
তার গায় ডুমো ডুমো।[১৬]

ধাঁধাটির উত্তর হল কাঁঠাল। কাঁঠালের গায়ে কাঁটাকে বোঝানো হয়েছে।

এ পারেতে বুড়ী মরে, ও পারেতে গন্ধ ছাড়ে।[১৭]

এ ধাঁধাটির উত্তরও কাঁঠাল। কাঁঠালের গন্ধ যে অতি তীব্র সে কথাই এখানে ব্যক্ত। সাতজেলিয়ার প্রসেনজিৎ মণ্ডল মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ধাঁধা-

হাপি হাপি হাপি
দু পা দে চাপি।[১৮]

চাষের জমিতে মই দেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে।

এখান থেকে দিলাম দৃষ্টি।
গাছটা হল বড় মিষ্টি।[১৯]

এটির উত্তর হল আখ গাছ।

একটুখানি ডালে।
কেষ্ট ঠাকুর ঝোলে।[২০]

ধাঁধাটির উত্তর হল বেগুন।

ছোট বেলা জামা গায়।
বড় হলে ন্যাংটা হয়।[২১]

ধাঁধাটির উত্তর বাঁশগাছ। এরকম বহু ধাঁধা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

ছড়া :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত কৃষি সম্পর্কিত ছড়াগুলির মধ্যে চাষের পদ্ধতি, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা, জমি প্রস্তুত করা, কৃষিকাজের উন্নতি প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। এখানে এ অঞ্চলে প্রচলিত বেশি কিছু কৃষি বিষয়ক ছড়ার উল্লেখ করা হল ছোটমোল্লাখালির সঞ্জয় জোতদারের কাছ তেকে সংগৃহীত কয়েকটি ছড়া-

পাটনাই ভাতের রাজা।
জামাই নাড়ুতে মুড়ি।।
কনকচূড়ে খই ভাল।
দুধের সর খায় বুড়ি।।[২২]

ছড়াটিতে বিভিন্ন প্রকারের ধান ও তাদের গুণাগুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

বোশেখ-জ্যৈষ্ঠে জমি কাড়াও
জমির মাটিতে তাত লাগাও
আলের কোলে কাট মাটি
চাষ হবে পরিপাটি।।[২৩]

এখানে চাষের জমি তৈরি ও চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সার জোলা সমান কর।
তিনটে কালা ক্ষেপে ধর।।
কোল পাতলা ডাগর গুছি।
লক্ষ্মী বলে সেথায় আচি।।[২৪]

এখানে ধান রোয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমতলির দীনেশ দাস মহাশয়ে কাছ থেকে সগৃহীত দুটি ছড়া-

মুঠো জোরে চেপে ধর
নাঙলের ফাল জোরে পোর।
খাটো নাঙল ধইচে ইশ
চাষার ধানে বড়ো শীষ।।[২৫]

এখানে লাঙল দিয়ে কীভাবে জমি চাষ করা হবে তার পদ্ধতি সম্পর্কে চাষিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওলে কুটি মানে ছাই।
এর বড়ো চাষ নাই।।[২৬]

ছড়াটিতে ওল চাষে খড় এবং মানকচু চাষে ছাইয়ের ব্যবহারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এরকম কৃষি বিষয়ক বহু ছড়ার উল্লেখ আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করলে পাই। এখনো গ্রামীণ লোকসমাজ চাষবাসের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা গুলি মেনে থাকে।

ছড়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। "ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি। সেটিকে নারী বা পুরুষ আপনাপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছেন – তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার রচনাগত ভঙ্গিটি প্রায় এক এবং অবিকৃতই আছে।"[২৭] ছড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) আনুষ্ঠানিক ছড়া (Functional, Ritualistic), ২) অনানুষ্ঠানিক ছড়া (Non-Funtional, non-ritualistic)। আনুষ্ঠানিক ছড়ার মধ্যে আছে কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন, মানবজীবন ও জগৎ, বর্ষ পরিক্রমা বিষয়ক ছড়াগুলি। আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলি আনুষ্ঠানিক ছড়ার অন্তর্গত।

সূত্রনির্দেশ:

১. Archer Taylor, SDFML, edited by maria Leach, New York, 1984, p. 902

২. সুদেষ্ণা বসাক, বাংলার প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৩৩৪

৩. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্র সমীক্ষা : নাম-পরিমল মহাজন, বয়স – ৫২ বছর, পেশা – চাষি, শিক্ষাগত যোগ্যতা – তৃতীয় শ্রেণি উত্তীর্ণ, আর্থিক স্তর – মধ্যবিত্ত, ঠিকানা – চণ্ডীবন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ – ২৫.০২.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – চণ্ডীবন।

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্রসমীক্ষা : নাম – ইন্দ্রনীল মণ্ডল, বয়স – ৬৫ বছর, পেশা – অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, আর্থিক স্তর – মধ্যবিত্ত, ঠিকানা – জয়নগর, দক্ষিণ ২৪

পরগণা, তারিখ – ২১.০১.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – জয়নগর।

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. শীলা বসাক, বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, পৃ. ২

১০. তদেব, পৃ. ৮২

১১. তদেব, পৃ. ৩০৩

১২. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্র সমীক্ষা : নাম – দেবু মণ্ডল, বয়স – ৪৫ বছর, পেশা – চাষি, শিক্ষাগত যোগ্যতা – নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ, আর্থিক স্তর – মধ্যবিত্ত, ঠিকানা – কুমিরমারি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ – ২০.০২.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – কুমিরমারি।

১৩. ঐ

১৪. ঐ

১৫. ঐ

১৬. ঐ

১৭. শীলা বসাক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৭

১৮. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্র সমীক্ষা : নাম – প্রসেনজিৎ মণ্ডল, বয়স – ৫৫ বছর, পেশা – জেলে ও কৃষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা – চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ, আর্থিক স্তর – নিম্নবিত্ত, ঠিকানা – সাতজেলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ – ২১.০২.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – সাতজেলিয়া।

১৯. ঐ

২০. ঐ

২১. ঐ

২২. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্র সমীক্ষা : নাম – সঞ্জয় জোতদার, বয়স – ৪২ বছর, পেশা – চাষি, শিক্ষাগত যোগ্যতা – চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ, আর্থিক স্তর – নিম্ন মধ্যবিত্ত, ঠিকানা – ছোটমোল্লাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ – ০২.০২.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – ছোটমোল্লাখালি।

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. সাক্ষাৎকার / ক্ষেত্র সমীক্ষা : নাম – দীনেশ দাস, বয়স – ৪৫ বছর (আনু.), পেশা – কৃষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা – স্বাক্ষর, আর্থিক স্তর – নিম্ন মধ্যবিত্ত, ঠিকানা – আমতলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ – ০৬.০২.২০২০, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – ধীমান মণ্ডল, স্থান – আমতলি।

২৬. ঐ

২৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে বুক স্টোর, ২০১৬, পৃ. ১৮৪

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ভাবনা

রেখা মণ্ডল

গ্রন্থাগারিকা, ফকিরচাঁদ কালেজ, দঃ ২৪ পরগণা

সারাংশ : *প্রফুল্লচন্দ্র শৈশব থেকে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত প্রতিটি মূহুর্তে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি বারবার একই কথা বলেছেন উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ছাপ না থাকলেও হবে। একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন আমাদের দেশে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন যারা ডিগ্রিধারী নন কিন্তু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করিয়া জ্ঞানবান হইয়াছেন। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর গ্রন্থাগার ভাবনা বিস্মায়াভূত করেছে। তিনি নির্লোভ, পরোপকারী, জ্ঞানবিস্তারে এবং শিক্ষাবিস্তারে এক নিবেদিত প্রাণ।*

সূচকশব্দ : *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিক্ষা, অধ্যাপনা, গবেষণা, গ্রন্থ, গ্রন্থাগার, দেশপ্রেম, সম্মান, আবিষ্কার, লাইব্রেরী।*

ভূমিকা:

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পরোপকারী, নির্লোভ, শিক্ষাবিস্তারে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ। যেখানেই মানুষের দুর্ভোগ, সেখানেই তিনি। তাই স্বাধীনতাসংগ্রামী হোক আর ঝড়-বন্যায় দুর্যোগগ্রস্থ মানুষ হোক, সবারই সহায় হয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এই মহান কর্মযোগী মানুষটি আর কেউ নন- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, যাকে এ.পি.সি. রায় নামে আমরা চিনি। ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট, অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশে) রাড়ুলি গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মা ভূবণমোহিনী দেবী এবং পিতা ছিলেন হরিশচন্দ্র রায়, যিনি স্থানীয় জমিদার ছিলেন তাঁর পরিবার ছিল বনিয়াদি। ছোটবেলা থেকেই প্রফুল্ল চন্দ্র অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম.ই.স্কুলে। গ্রামে থাকার এই সময়টা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। বাবার গ্রন্থাগারে প্রচুর বই পান তিনি এবং বই পাঠ তাঁর জ্ঞানমানসের বিকাশসাধনে প্রভূত সহযোগিতা করে। তিনি একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানশিক্ষক, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারক।

শিক্ষাজীবন:

১৮৭২ সালে তিনি কোলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য আবার গ্রামে ফিরে যান। ১৮৭৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে এসে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে সেখান থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এস.সি পাশ করেন এবং ডি.এস.সি ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার সেই গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণীর সম্মিলিত সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ (A Study of Isomorphism Mixtures and Molecular Combination Conjugated Sulphate of Copper Magnesium Group)। তিনি দুই বছর কঠোর সাধণার মাধ্যমে গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং পি.এইচ.ডি ও ডি.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন। এমনকি তাঁর এই পত্রটি শ্রেষ্ঠ মনোনীত হওয়ায় তাঁকে হোপ প্রাইজে ভূষিত করা হয়। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ১৮৮৫ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে (The Sepoy Mutiny India Before and After) এবং ভারত বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ লিখে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

কর্মজীবন:

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৮৮৮ সালে আচার্য রায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। অধ্যাপনাকালে তাঁর প্রিয় বিষয় নিয়ে তিনি নিত্য নতুন অনেক গবেষণাও চালিয়ে যান। তার উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব গবেষণার থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯০১ সালে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর নতুন নাম রাখা হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। সেক্সপিয়ার ছিলেন প্রিয় নাট্যকার। হ্যামলেট নাটক গোটাটা তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। এই সময় বহিরাগত ছাত্র হিসাবে

যেতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, সেখানে অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেলডারের ক্লাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি রসায়নের গবেষক হবার সিদ্ধান্ত নেন।[২]

১৮৮২ সালে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি পড়তে যান এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৮৭ সালে পান ডি.এস.সি. ডিগ্রি। ১৮৮১ সালে দেশে ফেরার পর শুরু হয় রসায়নের অধ্যাপনা, গবেষণা ও বিভিন্ন সামাজিক কাজ। ঘি, সরষের তেল ও বিভিন্ন ভেষজ উপাদান নিয়েই তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর প্রথম গবেষণা পত্রের নাম ছিল – "অন দি ক্যামিকাল একজামিনেশান অফ সার্টেন ইন্ডিয়ান ফুড স্টফস, পার্ট ওয়ান, ফ্যাটস অ্যান্ড ওয়েলস"। পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল নাইট্রাইট যৌগ নিয়ে কাজ, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃতির অন্যতম ক্ষেত্র 'নেচার' পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে আচার্য্য প্রফুল্ল রায় নিজের ল্যাবরেটরিতে ব্রিটিশ কোম্পানি ফিম্রাকোপিয়ার একটি ঔষধ তৈরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ও উৎসাহী আরও কয়েকজনকে নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কারখানা স্থাপন করেন যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পায়নে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজ কর্ম বেড়ে যাওয়াতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় ১৯০১ সালে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন এর নতুন নাম হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। এছাড়া পারদ-সংক্রান্ত ১১টি মিশ্র ধাতু আবিষ্কার করে তিনি রসায়নজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। গবাদিপশুর হাড় পুড়িয়ে তাতে সালফিউরিক এ্যাসিড যোগ করে তিনি সুপার ফসফেট অফ লাইম তৈরী করেন।

গবেষণায় প্রফুল্লচন্দ্র:

এডিনবার্গ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বি এস সি পাশ করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'অন পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশান অফ এলিমেন্টস'। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা পত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১০০ পাউন্ড 'হোপ প্রাইজ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পরও তিনি আরও এক বছর 'অন এ্যানালিসিস অফ ডাবল সালফেটস এন্ড দেয়ার কৃষ্টাল বিহেবিয়ার' বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৮৮৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর বিজ্ঞানের স্যার পি সি রায়ের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯৮৫

সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারের ফলে সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তার স্বীকৃতি মেলে।[৩] এরপর ১২ টি যৌগিক লবন ও ৫ টি থায়োষ্টার আবিষ্কার এবং ১৪৫ টি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ডাচ একাডেমী লন্ডনের রসায়ন সমিতি তাঁকে অনারারী ফেলো নির্বাচিত করেন।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখে স্যার পি সি রায় ১২০০ শতাব্দী এবং তারও পূর্বের ভারতবর্ষের রসায়ন চর্চার ইতিহাস তুলে ধরে প্রমান করেন যখন ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ গাছের ছাল বা বাকল পরে লজ্জা নিবারন করতো, তখন ভারতবর্ষের মানুষ পারদের ব্যবহার এবং সাতন সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[৪]

স্যার পি সি রায় ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্টা করেন যা পরবর্তীতে 'বেঙ্গল কেমিকেল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড নামে ১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল এটি আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে নিজ জেলা খুলনার মানুষের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে সমবায় ভিত্তিক 'প্রফুল্ল চন্দ্র কটন টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষকতায় প্রফুল্লচন্দ্র:

পড়াশুনা শেষ করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দেশে ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরবর্তীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক এবং ১৯৩৭ সাল থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমৃত্যু (Emeritus Professor) এমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫]

শিক্ষক হিসাবে পড়ানোর সময় উদ্দীপক উপাক্ষান বর্ণনার মত করে সাহিত্যের প্রাঞ্জল ভাষায় রসায়নের বিষয়গুলি তিনি ছাত্রদের নিকট তুলে ধরতেন। আত্মচরিতে তিনি বলেছেন 'প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ২৭ বছর অধ্যাপনা জীবনে আমি সচেতনভাবে প্রধানতঃ নিচের ক্লাসেই পড়াতাম। কুমোর যেমন কাদার ডেলাকে তার পছন্দ মত আকার দিতে পারে তাই স্কুল থেকে সদ্য কলেজে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তেমনি সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। আমি কখন ও কোন নির্বাচিত পাঠ্য বই অনুসরন করে পাঠদান দিতাম না। শিক্ষক হিসেবে তিনি বলতেন 'সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে'।

শিক্ষক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতা ও ধর্ম বিষয়ে উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে কুদরত-ই-খুদা (একমাত্র মুসলিম ছাত্র) এম.এস.সি-তে (রসায়ন) প্রথম শ্রেণী পাওয়ায় কয়েকজন হিন্দু শিক্ষক তাঁকে অনুরোধ করেন প্রথম শ্রেণী না দেওয়ার

জন্য, কিন্তু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রাজী না হওয়ায় তারা প্রস্তাব দেন একজন হিন্দু ছাত্রকে ব্রাকেটে প্রথম শ্রেণী দেওয়ার জন্য, তিনি সে প্রস্তাবে রাজী হন নি।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একই প্রতিষ্ঠানের, একই সময়কার শিক্ষক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু স্যার পি.সি.রায়ের ছাত্ররাই পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে কারনেই স্যার পি.সি.রায়কে 'বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী' বলা হত। তাঁর কৃতি ছাত্রদের মধ্যে ডঃ মেঘনাথ সাহা, হেমেন্দ্র কুমার সেন, বিমান বিহারী দে, ডঃ কুদরত-ই-খুদা, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, অসীমা চ্যাটার্জী প্রমূখ।

প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর দেশপ্রেম:

প্রফুল্লচন্দ্রের দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। দেশে এসেও তিনি তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। বাংলা ভাষা তাঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল অসাধারন যার দ্বারা তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিতেন খুব সহজেই। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন উদারপন্থী। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে পর পর দু'বছর অনাবৃষ্টির কারনে সমগ্র খুলনা (বর্তমান খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা) জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অজন্মার কারনে তখনকার সাতক্ষীরা মহাকুমাজুড়ে এবং পাইকগাছা ও দাকোপ থানা এলাকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯২১ সালে চতুর্থবার বিলেত থেকে আসার পর গরমের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে এসে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেন। বহু মানুষ ততদিনে মারা গেছেন, তাই মানুষকে বাঁচাতে এই মহান ব্যক্তির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে রিলিফ কমিটি। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যা হলে সেখানেও ছুটে যান তিনি। সেখানকার মানুষকে রক্ষায় গঠিত ত্রান কমিটির ও সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।[৬] ভারতে বিধিবদ্ধ সমবায় আইন চালু হয় ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে তিনি রাড়ুলি এবং এর আশপাশের গ্রামের মানুষকে জড়ো করে ৪১ টি কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। ১৯০৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র এবং নলিনীকান্ত রায়চৌধুরীর চেষ্টায় সমবায় সমিতিগুলো নিয়ে রাড়ুলি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

স্যার পি.সি.রায় ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' নামে ১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে নিজের জেলা খুলনার মানুষের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে সমবায় ভিত্তিক 'প্রফুল্লচন্দ্র কটন

টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে গান্ধীজি মহামতি গোখলের সাথে কলিকাতায় আসলে, তিনি তাঁর সাথে স্যার পি.সি.রায়ের পরিচয় করিয়ে দেন। গান্ধীজির মুখে প্রবাসী ভারতীয়দের দুখঃ-দুর্দশার কথা শুনে কলিকাতাবাসীদের এবিষয়ে জানানোর জন্য ১৯০২ সালের ১৯ জানুয়ারী কলিকাতার আলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) এক সভার ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে এই সভা এতই সফল হয়েছিল কলিকাতার সংবাদপত্র এ বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গান্ধীজি অনাড়ম্বরপূর্ন জীবন ও মানুষের জন্য তাঁর মমত্ববোধ স্যার পি.সি.রায়ের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো বলেই তিনি নিজেকে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন।[৭]

১৯২৫ সালের জুনে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার তালার সৈয়দ উদ্দীন হাসেমী ও ডুমুরিয়া মাওলানা আহম্মদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে গান্ধীজি খুলনায় আসলে স্যার পিসিরায় স্টিমার ঘাটে তাদের স্বাগত জানান। স্যার পিসিরায় ছিলেন সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি। ১৯২৫ সালে কোকনাদ কংগ্রেসের কনফারেন্সে সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আলী অনুপস্থিতিতে কিছু সময় তিনি সভাপতিত্ব করেন। একই সময় পাইকগাছা উপজেলার কাটিপাড়ায় ‘ভারত সেবাশ্রম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজ জন্মভুমির এলাকার মানুষকে চরকায় সুতা কাটার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় একটা চরকা স্থাপন করে তিনি নিজেও সুতা কাটতেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের লবন আইন অমান্য আন্দোলনের খুলনা জেলার স্থান হিসেবে পি.সি.রায়ের নিজের গ্রাম রাড়ুলিকে নির্বাচন করেন।

১৯০৩ সালে পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামের বিদ্যূৎসাহী ব্যক্তিদের এক সভা থেকে আর.কে.বি কে হরিশচন্দ্র ইনষ্টিটিউট নামকরন করেন। ১৯১৮ সালে বাগেরহাটে তার অর্থানুকুল্যে বাগেরহাট কলেজ স্থাপিত হয় যা পরে ফজলুল হকের প্রস্তাবে পি.সি.কলেজ নামে পরিচিতি পায়।[৮]

গ্রন্থ রচনা:

জীবনে তিনি অনেক প্রচ্ছদ রচনা করেছেন, অনেক বই লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি হল:-

আত্মচরিত

সরল প্রাণী বিজ্ঞান

বাঙালী মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার
India: Before and After the Sepoy Mutiny (ভারতঃ সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে)
হিন্দু রসায়ন বিদ্যা
Life and Experience of a Bengali Chemist
তাঁর মোট গবেষণার সংখ্যা ১৪৫ টি।

সম্মান:

সি আই ইঃ ১৯১১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে তৃতীয় বারের মত তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং সেখান থেকেই সি আই ই লাভ করেন।

সম্মান সূচক ডক্টরেটঃ ১৯১১ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এই ডিগ্রি দেয়। এছাড়া ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট উপাধী পান।

নাইটঃ ১৯১৯ সালে তিনি নাইট উপাধী লাভ করেন।

অবদান:

নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন। তাঁর এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষকে শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ বলা যায় বিংশশতাব্দীর দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পোন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর নিজের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনুভব করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের বই পড়ার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিলো মাত্র ৮ বছর বয়সে যখন গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন তখন থেকে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে বই পড়ার নেশা ধরে গিয়েছিল অর্থাৎ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য পিতার গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন।

নয় বছর বয়সে সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে হল উচ্চ শিক্ষার জন্য। বিদ্যুৎসাহী পিতা হেয়ার স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন, সেই সময় তিনি তাঁর বাবার গ্রন্থাগারের অসংখ্য বই পড়ে ফেলেছিলেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। পরবর্তীকালেও জীবনের বহু সময় তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাটিয়েছেন। তিনি চাইতেন প্রত্যেকে আরো বেশি করে বই পড়ুক, পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠুক। মানুষকে ভালবাসা

ও বড়দের শ্রদ্ধা করতে শেখাতেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তাঁর আদর্শে ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে আমাদের। শুধু বই সংগ্রহ করলেই হবে না, তা পড়তে হবে নিয়মিত।

স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর পুস্তক ভান্ডার তাঁর পিতার গ্রন্থাগার আর প্রেসিডেন্সিতে পাঠরত তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতার সংগৃহীত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে একটি লাতিন ভাষা শিক্ষার বই হাতে পান। তিনি নিজেই তা মোটামোটি শিখে ফেলেন এবং তাঁর এই শেখা ভবিষ্যত জীবনের নতুন অধ্যায় প্রবেশের দ্বার খুলে দিয়েছিল।[৯]

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের গ্রন্থাগার ভাবনা:

গ্রন্থাগার কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত মানুষের জ্ঞানপিপাশা মেটাবার কেন্দ্র নয়। সকল মানুষের জ্ঞান সঞ্চয় করার উপযুক্ত জায়গা। তিনি বলেছেন-

- লাইব্রেরী সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমে বলতে হয় যেভালো বই সংগ্রহ করা , বটে কিন্তু আসল জিনিস হল পড়া। আগেকার দিনে পড়িয়া ও পড়াইয়া পন্ডিতেরা অর্জন -জ্ঞান ,জ্ঞান বিস্তার করিতেন। কিন্তু আজকাল লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোনো নির্ ,করার জন্যদিষ্ট সময় ও কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিনতা ঢেকে রাখার আবরণ মাত্র। ডিগ্রিধারীর অজ্ঞা , বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই জ্ঞান সঞ্চয় করা যেতে পারে।[১০]
- তিনি বলেছেন মেকেল বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসার পথে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসতে বহু সময় লেগে যেতদীর্ঘ সময়ে ঐ , জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত। গিবন অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তার মত জ্ঞানী কয় জনতিনি ? অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান অর্জন করেছেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেনঃ' -রোমান সাম্রাজ্যর পতনের ইতিহাস -'এক অতি অপুর্ব জিনিস।
- বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দুবেলা তাঁর আহার জুটত না। একদিন তাঁর পুস্তক প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন - ' -নীচে সই করেছিলেনখাদ্যহীনপড়ে জ্ঞানবান এই জনসন লাইব্রেরীতে পড়ে ।' হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করার তাঁর সংগতি ছিল না।
- মহাপন্ডিত কার্লই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বললেন' -একমাত্র গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নেইতবু ও তিনি ।'

খুব ভাল একটা এডিনবরায় ,তার কারন হচ্ছে এই যে ,এডিনবারে রইলেন লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালিয়ান ,কেল্ট ও জার্মান ভাষা শিখেছিলেন।

- আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হইসেটাও আমাদের দা ,স মনোভাবের ফল। আসল জিনিস হচ্ছে জ্ঞানস্পৃহা-। পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতে ও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতায় ইমপেরিয়াল লাইব্রেরী ও ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী থেকে আমি বছরে অন্তত এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়িএ এগজ.যেন রাত পোহালে আমার এম ,নোট করি ,ামিনেশন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না।[১১]
- আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটা প্রকাণ্ড বাধা এই যেআগে ইংরাজী ভাষা , কি ,শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরাজী শিখতে কি কম সময় নষ্ট তোমাকে আগে জা ,পরিশ্রম। কোনো ইংরেজকে যদি বলা হয় যের্মান ভাষা মারফত অপর যা কিছু শিখতে হবেতবে সে ওই কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে , শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব ভাববে। অথচ এই শেখা যায়।
- প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুঘন্টা করে বই পড়লে বছরে প্রায় একটা সাধারন - নিজের ।লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারের মানুষে ,পরের সাহায্য আবশ্যক হয় না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে , মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে ,সঙ্গী দেখলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি ' পড়া দরকার। যাকে বলে ,চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছেWell-informed' তাই হওয়া দরকার। 'Well-informed' না হতে পারলে লেখাপড়া শেখার কোনো সার্থকতা নেই।

উপসংহার:

১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ও কৃতিসন্তান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অমৃতলোকে যাত্রা করেন। তাঁর কার্যকারিতা ও অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর উপদেশ ও বাণী আজও ধ্রুব সত্য। প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা দেশের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিরাজমান ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে গ্রন্থাগার ভাবনা ও চিন্তা এতখানি উৎকৃষ্টমানের তা গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত সকল

মানুষের কাছে তা শিক্ষনীয় বিষয়। এর থেকে বোঝাযায় যে, গ্রন্থাগারের সহিত তাঁর সাম্পর্ক ছিল নিবিড়তম।

তথ্যসূত্র:

১. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, 'আত্মচরিত', পৃষ্ঠা - ৪৪৮।
২. যাঁদের জেনে বড়ো হলো : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সন্তোষ কুমার ঘোড়ই সম্পাদিত, প্রত্যয়, পৃষ্ঠা - ১৫২।
৩. বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী, শ্যামল চক্রবর্তী, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭৯-৮১।
৪. সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২৯৫।
৫. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, দেবীপদ ভট্টাচার্য ও কানাইলাল দত্ত সম্পাদিত, পৃষ্ঠা - ৪৩।
৬. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভূমিকা, শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৬-৭।
৭. যাঁদের জেনে বড়ো হলো : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সন্তোষ কুমার ঘোড়ই সম্পাদিত, প্রত্যয়, পৃষ্ঠা - ১৫২।
৮. বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী, শ্যামল চক্রবর্তী, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭৯-৮১।
৯. সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২৯৬।
১০. আলোর ঠিকানা, অসিতাভ দাস, প্রভা প্রকাশনি, পৃষ্ঠা - ২৮-৩০।
১১. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, 'পাঠাগারের ব্যবহার', পৃষ্ঠা - ৭৫১-৫৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, মনোরঞ্জন। *আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।* কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা) : রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১৯০৯।
২. ঘোড়ই, সন্তোষ কুমার (সম্পা.)। *যাঁদের জেনে বড়ো হলো : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।* কলকাতা : প্রত্যয়, ১৯৯৫।
৩. চক্রবর্তী, শ্যামল। *বিশ্ব সেরা বিজ্ঞানী।* কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯।

৪. ভট্টাচার্য, দেবীপদ ও দত্ত, কানাইলাল (সম্পা.)। *আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা) : রামমোহন লাইব্রেরী, ১৯৮৩।

৫. রামমোহন লাইব্রেরী এন্ড ফ্রী রিডিং রুম (শতবার্ষিকী গ্রন্থ)। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা) : রামমোহন লাইব্রেরী, ২০০৪।

৬. রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র (সম্পা.)। *আত্মচরিত*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা) : চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কো., ১৯৩৭।

৭. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও বসু, অঞ্জলি (সম্পা.)। *সংসদ বাঙালি-চরিতাবিধান*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা) : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

লোকসংস্কৃতির আলোয় লৌকিক দেবদেবী, পার্বণ-গ্রামীণ মেলা, টেরাকোটা শিল্প : পারস্পারিক সম্পর্ক ভিত্তিক আলোচনা

জয়ন্ত মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : *রাঢ়ের মধ্যমণি নামে পরিচিত বাঁকুড়া জেলা লোকসংস্কৃতির রত্নগর্ভা। সমগ্র বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লোকসংস্কৃতির উপাদানের মধ্যে লৌকিক দেবদেবী ও গ্রামীণ মেলা, উৎসব-পার্বণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লৌকিক দেবদেবীরা খোলা আকাশের নিচে বছরের নির্দিষ্ট দিনে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনগণ দ্বারা পূজিত। এইসব লৌকিক দেবদেবীর যাদের নির্দিষ্ট মূর্তি নেই সেখানে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াকে মূর্তি হিসাবে পূজা করা হয়। লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রয়োজনে মকর সমক্রান্তিতে প্রচুর টেরাকোটার হাতি-ঘোড়া মূর্তি ও পূজার উপরকরণ বিক্রি হয়। লৌকিক দেবদেবীদের পূজা উপলক্ষ্যে থান সংলগ্ন অঞ্চলে মেলা বসে। পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান রূপে লৌকিক দেবদেবীর পূজা, গ্রামীণ মেলা, উৎসব-পার্বণ, লোকজ টেরাকোটা শিল্প বাঁকুড়ার লোকায়ত জীবনযাত্রাকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ সমৃদ্ধ করে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।*

সূচক শব্দ : *সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক দেবদেবী, গ্রামীণ মেলা, উৎসব-পার্বণ, পরস্পর, লোকায়ত।*

মূল আলোচনা:

'সম্পর্ক' মানবজীবনের একটি বিশেষ ধারা। পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে কোনো প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। মহাবিশ্ব তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পারস্পারিক যোগাযোগের গভীরতার উপর নির্ভর করে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরস্পরের আচার-আচরণ, চরিত্র, সংস্কারবিধি সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। পরস্পর বিরোধী চিন্তা চেতনা, আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি সম্পর্কের অন্তরায়। মহাবিশ্বের একটি বৃহৎ অংশ লোকায়ত জগৎ যেখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান লালিত পালিত হয়ে আসছে আবহমানকাল ধরে। বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত লোকজীবনের প্রতিটি বিষয়েই পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন

সম্পর্কের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয় লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি। বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিও পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার চিত্র প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির মধ্যে। সংস্কৃতিকে সাধারণ ভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা – (১) উচ্চ বর্ণীয় সংস্কৃতি বা মার্গীয় সংস্কৃতি যা সর্বসাধারণের কাছে এলিট ক্লাসের সংস্কৃতি নামে পরিচিত। মার্গীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি বৃহত্তর লোকায়ত সমাজের মধ্যে বিরাজমান নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি বা প্রান্তজনের সংস্কৃতি যা সাধারণ খেটে খাওয়া লোকজনের সংস্কৃতি নামে পরিচিত। লোকসংস্কৃতি গ্রামীণ কৃষি জীবনকে কেন্দ্র করে বিকশিত। লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে পরিব্যক্ত হয় লোকায়ত জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ। জনগণের পারস্পারিক সংযোগ ও সংহতির ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতি উদ্ভূত। লোকসংস্কৃতি লৌকিক সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্চা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি যা স্বতন্ত্র, ঐতিহ্যশালী ও বাক্‌ভাষা-অঙ্গভাষা, কারুকলা-চারুকলা, মেলা, উৎসব, পূজা-পার্বণ, ব্রত, ক্রীড়া, অভিনয়, আচার-বিচার-সংস্কার ইত্যাদি অভিব্যক্ত। লোকসংস্কৃতি যে কেবলমাত্র গ্রামীণ জনগণের সংস্কৃতি তা নয়। দৃশ্য-শ্রাব্য-মুদ্রণ ইত্যাদি মাধ্যমে প্রকাশিত শহুরে প্রান্তিক জনের সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। তবে এই সংস্কৃতি গ্রামীণ অভিভাসিত সংস্কৃতির একটা রূপ। কালীঘাটের পটচিত্র, শহরের শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কৃষ্ণযাত্রা, চড়ক উৎসব, হরিনাম সংকীর্তন, রাধানাম, রামপ্রসাদী গান, ষষ্ঠী পূজা ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির মূল উৎস গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির মধ্যেই গ্রামীণ ও শহুরে লোকজনের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১] বাঁকুড়ার সংস্কৃতির মধ্যে লোক ও মার্গীয় এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লোক ও মার্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিবাদ, বিরোধ ও অবশেষে পারস্পারিক সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংমিশ্রণের প্রয়াস।[২]

লোকসংস্কতির পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয় লোকায়ত জীবন যাত্রায়। লোকসংস্কৃতি বিকাশ ও প্রতিফলের একটি মাধ্যম হল লৌকিক দেবদেবী ও গ্রামীণ পূজা-পার্বণ-মেলা পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসাবে লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা ও গ্রামীণ পূজা-পার্বণ-মেলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকজনের জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ। এইসব লোকজ উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে লোকায়ত জনগণের ভাব ও আচার-বিচার ও সংস্কারের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে।

সারা বছর ধরেই চলে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর আরধনা। লৌকিক দেবদেবীর পূজার জনসমাগমকে কেন্দ্র করে বসে গ্রামীণ মেলা। ক্রেতারা নানা লোকজ সামগ্রীর পসরা নিয়ে হাজির হয়। মেলাতে বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের পাশাপাশি চলে ছৌ, টুসু, হরিনাম সংকীর্তনের মতো লুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের আসর। লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব মেলার মধ্যে লোকসংস্কৃতি তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। জাদু, অলৌকিক ক্ষমতা, দৈবীসত্তা ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূজা-পার্বণ সংক্রান্ত অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীন কতকগুলি ধর্মের ধারা বা কাল্ট যেগুলি লোকধর্ম নামে পরিচিত। পূজা-পার্বণ হল এক বা একাধিক কাল্ট বা লোকধর্মের লব্ধ ফল। অনেক সময় দেখা যায় কাল্টগুলি পরস্পরের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। গাছ, ফুল, ফল, পাতা, পাহাড়, নদী, অরণ্য, পাথর,টিলা, আকাশ, বাতাস, জল, আগুন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নানা বস্তুর মধ্যে দেবদেবীর দৈবী বা অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে কল্পনা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে এইসব বস্তুগুলিকেই জনগণের ভাল-মন্দ নির্ধারণের চালিকা শক্তি বলে মনে করা হত।পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এরাই হয়েছে দেবতা, এদেরকেই নিয়েই শুরু হয়েছে ধর্মাচার এবং তা থেকেই বিবর্তিত হয়ে সূচনা হয়েছে পরব-পার্বণ-মেলার। লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা, পরব-পার্বণ মেলার উৎসরূপে পরিচিত কাল্টের মূল ধারাগুলি যথা,-মাতৃকা-উপাসনা, উর্বরতা-তন্ত্র, যৌন-প্রতীকোপসনা ও পূর্ব পুরুষের স্মৃতিপূজা ইত্যাদি পরস্পরের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।[৩]

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার মধ্যে অন্যতম প্রান্তিক জেলা রুক্ষ শুষ্ক বাঁকুড়া। এখানকার অধিকাংশ লোকজনই গ্রামীণ কৃষিজীবী। রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য বাঁকুড়া রাঢ়ের মধ্যমণি রূপে পরিচিত। বাঁকুড়া জেলা লোকসংস্কৃতির রত্নগর্ভা। সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকজ সংস্কৃতির নানান উপাদান। এই উপাদানগুলি আবহমান কাল থেকে বাঁকুড়ার সভ্যতা ও সস্কৃতিতে পুষ্ট করে আসছে। লাল মাটি বাঁকুড়ার তৃণহীন উপলবন্ধুর প্রান্তর, রক্তমুখী মাঠ, আদিম অরণ্যের দিগন্তবন্দী মিছিলে এখানকার লোকায়ত জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানকার লোকজ সংস্কৃতি অরণ্য প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের মতই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে

তোলার ক্ষেত্রে প্রোটো অস্ট্রেলয়েড ভুক্ত আদিম অধিবাসীদের অবদান অপরিসীম। কংসাবতী নদীর নিম্ন অববাহিকা যুক্ত অঞ্চল রাইপুর নিকটবর্তী সিজুয়াতে পাওয়া গেছে এক মানব কঙ্কাল যা হরপ্পা পূর্ববর্তী। সুতরাং বাঁকুড়াতে হরপ্পার'ও প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও এ বিষয়ে প্রয়োজন যথার্থ উৎখনন ও অনুসন্ধান। এই আদিম অধিবাসীদের শক্তি, সাহস, শৌর্য, বীর্যের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইমারত। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আদিম সংস্কৃতির উপর আধিপত্য ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি গ্রাস করতে থাকে আদিম লোকজ সংস্কৃতিকে। এক সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্য ও আদিম তথা লোকজ সংস্কৃতির পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে থাকে বাঁকুড়ার জনগণের সভ্যতা-সংস্কৃতির চাকা।[৪]

নদী, অরণ্য, পাহাড়-টিলা-ডুংরি বেষ্টিত গহন অরণ্য আচ্ছাদিত রাঢ় বাঁকুড়াতে নানা সম্প্রদায়ের জনজাতির বসবাস। অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, শবর প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। গ্রামগুলির বসবাসকারী জনগণের মধ্যে বাউরী, বাগদী, হাড়ি, ডোম,মুচি, যাদব ও নবশাখ সম্প্রদায়ের বসবাস। এইসব জনজাতিরগুলির কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মাঝেই আবর্তিত হয় লোকজ সংস্কৃতির ধারাগুলি।[৫]

পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদন রূপে বিবেচিত লৌকিক দেবদেবীর পূজা-আরাধনা ও একে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলা-উৎসব-পার্বণ বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রায় সারা বছর ধরে চলে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা। কোনো লৌকিক দেবদেবী নিত্য পূজিত আবার অনেক লৌকিক দেবদেবী বছরে একদিনেই পূজিত। লৌকিক দেবদেবীদের আরাধনাকে কেন্দ্র করে লোকায়ত জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। সৃষ্টির সূচালগ্নে মানুষ ছিল প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা, বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা, ভালো শিকার পাওয়া, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি নানা কারণে তাঁরা দৈবশক্তির শরণাপন্ন হয়ে শিলা, ঢিবি, গাছ, আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্রকে আরাধনা করতে শুরু করে। বাঁকুড়া জেলার লোকজনও বছরের বিভিন্ন সময়ে লৌকিক দেবদেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় বাঁকুড়া জেলায় একাধিক লৌকিক দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব লৌকিক দেবদেবীদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত।

পূজারীরা দোআশী, লায়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। লৌকিক দেবদেবীরা কোন মন্দির বা বদ্ধ ঘরের মধ্যে অবস্থান করেন না। তারা খোলা আকাশের নিচে, বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল ইত্যাদি পুরাতন বৃক্ষের নিচে, ঝোপঝাড়ের মাঝখানে, গ্রামের একপ্রান্তে, চৌরাস্তার পাশে, কৃষিজমির পাশে, নদীর ধারে অবস্থান করে। পূজার পদ্ধতি সহজ, সরল। লায়া বা পূজারীরা উপবাস করে ধূপ, চিঁড়া, মন্ডা-মিঠাই, আমপাতা, বেলপাতা সহযোগে পূজা সম্পন্ন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূজার মন্ত্র বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পূজারীকে দেবদেবী ভর করে। তখন সে অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ও গ্রামীর জনগণের বিভিন্ন সমস্যা থেকে সমাধানের পথ দেখান। আঞ্চলিক দেবদেবীদের মধ্যে বিশেষত মা মহামায়া, মা মনসা, মা রঙ্কিণী, মা অম্বিকার নির্দিষ্ট মূর্তি দেখা গেলেও বহু গ্রাম্য দেবদেবী ও সিনি ঠাকুরের নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। কোথাও একখণ্ড পাথর, কোথাও বা উঁই ঢিপিকে দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করা হচ্ছে। গ্রাম্য দেবদেবী ও সিনি ঠাকুরের থানে থাকে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াকে সিঁদুরে লেপনের মাধ্যমে পূজা করা হয়। বর্তমানে বহু লৌকিক দেবদেবীদের থান সিমেন্টের দ্বারা বাঁধানো হয়েছে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী লৌকিক দেবদেবীর বাহন হাতি ও ঘোড়া। তারা সর্বদা হাতি ঘোড়ায় চড়ে গ্রাম পরিক্রমার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের ভালো মন্দের খবর রাখেন। বিপদে, আপেদে, বিশেষত রোগ-জ্বালা, শোক, মহামারীতে তিনি গ্রামীণ জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদান করেন।

বাঁকুড়া জেলার লৌকিক দেবদেবীদের বিভিন্ন আগে বিভক্ত করা যায়। গ্রাম্য দেবদেবীরা নির্দিষ্ট গ্রামেই পূজিত হন। অন্য কোথাও তিনি আর পূজিত হন না। লোকায়ত জীবনযাত্রায় গ্রাম্য দেবদেবী নির্দিষ্ট গ্রামের ভালো মন্দের স্রষ্টা। তিনি সর্বদা গ্রামবাসীদের বিপদ আপদ থেরে রক্ষা করে মঙ্গল সাধন করেন। গ্রাম্য দেবদেবীদের পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।

গ্রাম দেবদেবী বা আঞ্চলিক দেবদেবী যাই হোক না কেন তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁরা লৌকিক দেবদেবী। লোকসমাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম। নীহাররঞ্জন রায় এই লোক দেবদেবী প্রসঙ্গে বলেন – তিনি যে নামে বা বিষয়ে পরিচিত হোন না কেন, পুরুষ বা প্রকৃতি তন্ত্রেরই হউন নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম দেবতাদের প্রতি আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি স্বাগত বা শ্রদ্ধা জানায় নি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গ্রাম্য দেবতার পূজা ছিল নিষিদ্ধ। মনু এই সব লৌকিক

দেবদেবীদের পতিত বলেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে অতীত ও বর্তমানে এদের পূজা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং লোকসমাজে ক্রমাগত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়ে লোকমানসের হৃদয়ে মননে স্থান করে নিয়েছে এই লৌকিক দেবদেবী। এদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আবার শীতলা, মনসা, বিভিন্ন রকমের চণ্ডী, ষষ্ঠী, বনদুর্গা, শ্মশানচারী কালী-শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী, মনসা প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৬] বাঁকুড়া জেলায় অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

রঙ্কিণী : বাঁকুড়া জেলার অন্যতম লৌকিক দেবী হলেন রঙ্কিণী। বাঁকুড়ার জেলার খাতড়া শহরে ও লক্ষ্মীসাগর গ্রামে দেবী রঙ্কিণীর থান অবস্থিত। খাতড়া শহর থেকে দক্ষিণ দিকে কংসাবতী গামী রাস্তার উপরেই দেবী রঙ্কিণীর থান থানসংলগ্ন এলাকাটি রঙ্কিণীতড়া নামেই পরিচিত। এখানে দেবী খোলা আকাশের নিচে বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত দেবীর থানে পূজা দেয়। খাতড়া রাজপরিবারের কুলদেবী হলেন রঙ্কিণী। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রাজ পরিবার থেকে খোলা আকাশের নিচে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা বছর খাতড়ায় মা রঙ্কিণীর থানে ভিড় লেগেই থাকে। বিশেষ তিথিতে ভিড় বেশী হয়। দেবীর থান সংলগ্ন অঞ্চল মেলার আকার ধারণ করে। এছাড়া রঙ্কিণী দেবীর থান সংলগ্ন অঞ্চলে দুর্গাপূজা ও কালীপূজাতে মেলা বসে। রঙ্কিণী দেবীর থান জনজোয়ারের আকার ধারণ করে। লৌকিক দেবী ও গ্রামীন মেলার পারস্পারিক সম্পর্ক লোকসংস্কৃতির ইতিহাস এক অন্যমাত্র দেয়। দেবী রঙ্কিণীকে কেন্দ্র করে রঙ্কিণীর থান সংলগ্ন অঞ্চলে শারদীয়া ও দীপাবলীর মেলাতে জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লৌকিক দেবা ও গ্রামীণ সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগর গ্রামের দেবী রঙ্কিণীও লোকসমাজে জনপ্রিয় ও জাগ্রত দেবী হিসাবে দেখা দেয়। পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের মেলা বসে। দেবী রঙ্কিণীর পূজা দেওয়া, প্রতিমা দর্শন ও মেলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে লোকসমাজে লোকসংস্কৃতির ধারাগুলিকে বজায় রাখে।[৭]

মা মহামায়া : বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার কংসাবতী নদী তীরস্থ চাঁদুডাঙ্গা গ্রামের লৌকিক দেবী মহামায়া। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের বংশধর রাজা ধরম সিংহদেবের পুত্র কৃষ্ণ সিংহদেব মা মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী খোলা আকাশের নিচে নয় মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। শারদীয়ার সময় মা মহামায়ার

বিশেষ পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম হয় ও দেবীর থান সংলগ্ন অঞ্চলে দুদিনের মেলা বসে। লৌকিক দেবী মা মহামায়ার পূজাকে কেন্দ্র কের মেলা যা লোকায়ত জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে ভাতৃত্বের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করেছে।[৮]

মহাদানা : বাঁকুড়া জেলার অন্যতম লৌকিক দেবতা হলেন মহাদানা। তিনি মাদানা ঠাকুর নামেও পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার কংসাবতী তীরবর্তী কেলাতি আশ্রমের পাশে কাঁকড়াদাড়া-কল্যাণসায়ের গ্রামের শেষ সীমায় ফাঁকা মাঠের একপ্রান্তে পুকুরের পাশে গাছের নিচে অবস্থান করছেন মহাদানা ঠাকুর। এই ঠাকুরের পূজা হয় বছরে একবার এখ্যানের পরদিন। থানটি বিভিন্ন গাছপালা পরিবেষ্টিত। বর্তমানে থানাটি ইট সিমেন্ট দ্বারা বাঁধানো হয়েছে। মহাদানার পূজা করেন গোপালপুর গ্রামের নিম্নবর্গীয় খয়রা সম্প্রদায়ের লোকজন। মহাদানা ঠাকুর দেশী মদ ও দেশী মুরগীর মাংস ছাড়া সন্তুষ্ট হন না। সে কারণে পূজার নৈবিদ্য হিসাবে মহাদানা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দেশী মদ ও মাংস প্রদান করা হয়। মহাদানা ঠাকুরের নিকট অনেকে মানত করে। মনোবাসনা পূরণ হলে ভক্তরা দেশী মুরগী, দেশী মদ ও পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া অর্পণ করে মানত পরিশোধ করে। কংসাবতী নদী তীরবর্তী থানের পাশাপাশি আছে অনেক ইট ভাটা। ইট ভাটা তৈরির পূর্বে ভালো ইট উৎপাদণের আশায় ভাটা মালিকরাও মহাদানার থানে পূজার পর ভাটার কাজ শুরু করে। মহাদানা ঠাকুরের জনপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে মহাদানা ঠাকুরের থান সংলগ্ন সুবিশাল মাঠে কল্যাণসায়ের প্রগতি সংঘের পরিচালনায় মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এখ্যানের পরিদন একদিনের মেলা বসে যা মহাদানার মেলা নামে পরিচিত। মেলাতে স্থানীয় লোকজন ভিড় জমায়। পাশাপাশি শিকরাবাদ, হেত্যাশোল, ঝরিয়া, ভেদুয়া, বেনেবাইদ, কাঁকড়াদাড়া, মশড়া, গোপালপুর, ভগড়া গ্রামগুলির লোকজন মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমায়। বিভিন্ন লোকজ পণ্যের কেনাবেচার পাশাপাশি সারা রাত ধরে চলে প্রতিযোগিতামূলক টুসু নাচ ও গানের আসর। লৌকিক দেবতা মহাদানার পূজা ও তাকে কেন্দ্র করে মেলার মধ্যে পারস্পারিক সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।[৯]

মা পার্বতী : বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার রানীবাঁধ থানা হলুদকনালী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্থ ধডাঙ্গা গ্রামের লৌকিক দেবী মা পার্বতী। দেবী খোলা আকাশের নিচে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া পরিবেষ্টিত থানের মাঝে অবস্থান করছেন। একসময় দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মহিষ বলি হত। লোকবিশ্বাস যে, পশুর রক্তে দেবী সন্তুষ্ট হন। শেষ দুবছর

প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞায় মহিল বলি বন্ধ আছে। মনস্কামনা পূরণের আশায় বহু মানুষ মানত করে। মকরের পর এখ্যান দিন দেবীর বিশেষ পূজা হয় ও সেখানে ভক্তরা মানত পরিশোধ করে। এখ্যান দিন মা পাবর্তীর থান সংলগ্ন মাঠে মেলা বসে। সন্ধ্যা অতিক্রম করে মেলা চলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। ধডাঙ্গা, বারকাডাঙ্গা, মোলচাঁড়র, তুংচাঁড়র, পুরানপানি, ঘোড়াধরা, হলুদকানালী, কেশে, পিঁড়রা প্রভৃতি গ্রামগুলির লোকজন ভিড় জমায় মেলাপ্রাঙ্গণে। বিভিন্ন লোকজ দ্রব্যের বেচাকেনা চলে। লৌকিক দেবী মা পাবর্তীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ লোকজনের উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো যা মা পার্বতী ও তাঁকে কেন্দ্র করে মেলার গভীর সম্পর্কের প্রমাণ দেয়।[১০]

দন্ডেশ্বরী : কোতুলপুর থানার লাউগ্রামে পঞ্চরত্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবীর অবস্থান। লৌকিক দেবী দন্ডেশ্বরী লোকসমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে জগদ্ধাত্রী, চামুন্ডা, মনসা, দুর্গা, চন্ডী, শীতলা রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। দেবীর থানে অনুষ্ঠিত সয়লা উৎসবে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে।

কালুবুড়ি : দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে অযোধ্যা গ্রামে দেবী 'মনসা' কালুবুড়ি নামে পূজিত। দশহারা উৎসবকে কেন্দ্র করে অযোধ্যা গ্রামে মেলা বসে ও তাতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।[১১]

এছাড়াও বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন নামযুক্ত সিনি ঠাকুরের পূজা সম্পন্ন হয় এখ্যান দিনে। এখ্যান দিনে গ্রামীণ দেবদেবীদের মতোই এর কোন সুনির্দিষ্ট মূর্তি থাকে না। পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াকেই মূর্তি হিসাবে পূজা করা হয়। বাঁকুড়ার অনেক সিনি ঠাকুর আছে যাদের আরাধনাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। বাঁকুড়ার অন্যতম লৌকিক দেব-দেবী রূপেই সিনি ঠাকুর প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়ার উল্লেখযোগ্য মেলা বসে যা বামনিসিনির মেলা নামে পরিচিত। স্থানীয় জনগণ মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমায়।

বাবা কুমারসিনি : রাইপুর থানার কুমারমোহন গ্রামের উত্তর কংসাবতী নদীর তীরে শষ্যক্ষেত্রের মাঝখানে খোলা আকাশের নিচে প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় বাবা কুমারসিনির থান। বর্তমানে এর পূজারী নির্মল কুমার বিশুই, বয়স ৫৫, গ্রাম-বান্দরবনি, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর। এখ্যানের দিন বিশেষ পূজাকে কেন্দ্র করে থান সংলগ্ন অঞ্চলে মেলা বসে।

চন্দ্রসিনি : রাইপুর-আঁখখুটা-খাতড়া রোডে রাইপুর নিকটস্থ মূল রাস্তার পাশেই চন্দ্রসিনির থান। এখ্যান দিন পূজা হয় ও মেলা বসে। মেলার মূল আকর্ষণ মোরগ লড়াই ও টুসু নাচ ও গান।[১২]

বাকরাজসিনি : পেয়ারাবাগান নিকটস্থ খাতড়া-বাঁকুড়া মূল রাস্তার পাশে সোনামেলা গ্রামের সীমানায় একটি পুরাতন বৃক্ষের নিচে বাকরাজসিনির থান। এখ্যান দিন পূজা হয় ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নরনারায়ণ সেবাকে কেন্দ্র করে বাকরাজসিনির থান সংলগ্ন অঞ্চল মেলার আকার ধারণ করে।[১৩]

লৌকিক দেবদেবী ও লোকশিল্প টেরাকোটার পারস্পরিক সম্পর্ক :

লোকসংস্কৃতির আঁতুড়ঘর রূপে পরিচিত সমগ্র বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী যারা বছরের পর বছর খোলা আকোশের নিচে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে সমাজের নিম্নবর্গীয় বাগদী, বাউরী, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হাতে পূজিত হয়ে আসছে। এইসব লৌকিক দেবদেবীদের নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই। তারা পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াকেই দেব-দেবীর মূর্তি হিসাবে পূজা করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে বাঁকুড়া জেলার বহু লৌকিক দেবদেবীর থানে বছরের পর বছর পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া জমা হয়ে স্তুপের আকার ধারণ করেছে। বাঁকুড়া জেলার লৌকিক দেবদেবীর পূজার সাথে টেরাকোটা শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মাটিকে বিশেষ পদ্ধতিতে আগুনে পুড়িয়ে মূর্তি তৈরির পদ্ধতিকে বলা হয় টেরাকোটা। লৌকিক দেবদেবীর থানে পোড়ামাটির যে হাতি ঘোড়া দেখা যায় তা টেরাকোটাই। হাতি ঘোড়ার পাশাপাশি পূজার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয় ঘট, ভাঁড়, ধূপদানী, হাঁড়ি, মনসার চালি সহ নানা উপকরণ। বাঁকুড়া জেলা টেরাকোট শিল্পের জন্য বিখ্যাত পাঁচমুড়া। বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ দেবদেবীর টেরাকোটার মূর্তি হাতি ঘোড়া সহ পূজার উপরকরণ পাঁচমুড়া থেকে বিক্রি হয়। অনেক সময় স্থানীয় দোকানদাররা পাঁচমুড়া থেকে টেরাকোটা সামগ্রী পাইকারী দামে কিনে বিক্রি করে। লৌকিক দেবদেবী পূজার উপরে নির্ভর করে টেরাকোটার হাতি-ঘোড়ার বিক্রির পরিমাণ। পাঁচমুড়া ছাড়াও বিবড়দা, পাঁপড়া, কালাপাথর, কেয়াবতী, সেঁদার টেরাকোটা শিল্প বিখ্যাত। বাঁকুড়ার প্রতিটি গ্রামেই আছে লৌকিক দেবদেবীর থান যেখানে পুজোর সময় প্রয়োজন হয় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া। টেরাকোটা শিল্পীদের জীবন ও জীবিকা অনেকটাই লৌকিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণের উপর নির্ভর করে। ভক্তরা মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবদেবীর থানে বড় হাতি-ঘোড়া মানত করে। টেরাকোটা সামগ্রী সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় বছরের মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পৌষ পার্বণের সময়। মকরের পরদিন বাঁকুড়া বাসীর কাছে এখ্যান পরব নামে পরিচিত। এই এখ্যানের দিনেই বাঁকুড়ার গ্রামগুলিরপ অধিকাংশ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হয়। পৌষ পার্বণের সময়কালে বিভিন্ন গ্রামীণ লৌকিক দেবদেবীর

পূজাকে কেন্দ্র করে লোকশিল্প রূপে পরিচিত টেরাকোটা সামগ্রী ভালো বিক্রি হয়। পৌষ মাসের শেষে ও মাঘ মাসের সূচনালগ্নে বাঁকুড়ায় অসংখ্য গরাম, সিনি ঠাকুরের পূজা হয় ও সেই উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ টেরাকোটার হাতি ঘোড়া বিক্রি হয়।

'পৌষপার্বণ' টেরাকোটা শিল্পীদের কাছে সোনার সময়। হাতি, ঘোড়া সহ প্রচুর টেরাকোটা সামগ্রী বিক্রি হয়। শিল্পীদের হাতে টাকা আসে। এতে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম হয়। লৌকিক দেবদেবীদের পূজা ছাড়াও পৌষ, মাঘ মাসে বসে একাধিক গ্রামীণ মেলা যেখানে টেরাকোটা শিল্পীরা নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। পৌষ পার্বণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও সেই উপলক্ষ্যে গ্রামীণ মেলাগুলি বাঁকুড়ার টেরাকোটাসহ বিভিন্ন লোকজ শিল্পীদের বিপনন ক্ষেত্র। শিল্পী বাঁচলে শিল্প বাঁচে। লোকপার্বণ, লৌকিক দেবদেবীদের পূজা, গ্রামীণ মেলা, লোকজ শিল্পের সম্ভারকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করে লোকজ শিল্প পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াকে লৌকিক দেবদেবীর থানে মূর্তি হিসাবে পূজার কারণ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন – অরণ্যাবৃত ছোটনাগপুর অঞ্চলে একসময় বন্য হাতির উপদ্রব ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর গ্রাম বাংলা জনশূন্য হয়ে পড়লেও ছোটনাগপুরের বুনো হাতি বীরভূম-মল্লভূম অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াত। হাতির পাশাপাশি বাঘ, ভল্লুক, ঘোড়া, সাপ সহ নানা জীবজন্তুর উপদ্রব ছিল। আদিবাসীরা বন্য জীবজন্তুদের পূজা করত। জীবজন্তুর পূজা আদিমতম পূজার মধ্যে অন্যতম। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পোড়া মাটির ঘোড়ার পূজা দেখা যায়। মেজর হেনভেলে তাঁর রচনায় ভীল সম্প্রদায়ের দেবস্থানে পাথর আর মাটির ঘোড়া দেখা যায়। কোথাও ভীলরা সন্ধ্যার সময় মাটির ঘোড়ার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখত। হাতি-গোড়া টোটেম রূপে পূজিত হত।[১৪]

এভাবে দেখা যায় যে, লোকসংস্কৃতির আকরভূমি বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসাবে পরিচিত লৌকিক দেবদেবী, গ্রামীণ মেলা, উৎসব-পার্বণ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। লোকায়ত উপাদানগুলি পরস্পরের সাথে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে লোকসংস্কৃতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, তুষার – লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ১০, ৪৬

২. Banerjee, Samanta – The parlour and the Streets : Elite and Popular Culture in Nineteenth-Century, Calkcutta, Seagull.

৩. সেনগুপ্ত, পল্লব – পূজা পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপনী, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬,৭

৪. ভট্টাচার্য,তরুণদেব – পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩, ৫

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪, ১৮

৬. রায়, নীহাররঞ্জন – বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, অষ্টম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪২২, পৃষ্ঠা- ৬১৩

৭. ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ সাক্ষাৎকার :
সুহাস চন্দ্র মণ্ডল, বয়স – ৬০, পেশা – স্কুল শিক্ষক, বাড়ি – খাতড়া, তারিখ – ১১.০৪.২০২১

৮. সাক্ষাৎকার :
সজল সেনগুপ্ত, বয়স – ৩৫, পেশা – কলেজ শিক্ষক, বাড়ি – রাইপুর, তারিখ – ১০.০৪.২০২১

৯. ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ সাক্ষাৎকার :
গণেশ দুলে, বয়স – ৩৮, গ্রাম – শিকরাবাদ, তারিখ – ০৭.০২.২০২১

১০. ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ সাক্ষাৎকার :
গৌতম মাহাত, বয়স – ৩৮, বাড়ি – হলুদকানালী, তারিখ – ০৬.০২.২০২১

১১. কৃশানু চ্যাটার্জী, বয়স – ৩২, পেশা – কলেজ শিক্ষক, বাড়ি – অযোধ্যা, তারিখ – ০৬.০২.২০২১

১২. প্রদীপ মুনিয়া, গ্রাম – কুমার মোহন, থানা – রাইপুর, পেশা – প্রাইভেট টিউটর, তারিখ – ০১.০২.২০২১

১৩. সুভদ্রা ঘোষ, গ্রাম – সোনামেলা, গৃহবধূ, তারিখ – ০২.০২.২০২১

১৪. ঘোষ, বিনয় – পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০, পৃষ্ঠা- ৬৭৭, ৬৭৮

সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক

জয়দেব বেরা
এম. এ., সোসিওলজি, এম.এস.ডব্লু,
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সামাজিক বিজ্ঞানই স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কোন সামাজিক বিজ্ঞানই তার অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে পারে না। এর মূল কারণ হল, সকল সামাজিক বিজ্ঞানেরই আলোচনার ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ। আলোচ্য বিষয়বস্তুর মৌলিক সাদৃশ্য হেতু বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক নিতান্তই স্বাভাবিক। সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। একে অপরের পরিপূরক। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একথা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে (ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, দর্শন, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম প্রভৃতি) বিভিন্ন বিষয়ে সমাজতত্ত্বের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মূলক সম্পর্ক বর্তমান। তাই সমাজতত্ত্বের সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যথার্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক **ম্যাকাইভার (R.M.MacIver) বলেছেন,** “Social sciences have the sphere within sociology just as association have the sphere within community. The specific social sciences are sciences of association forms of life and therefore can never see and the throne reserved for sociology a throne, tenantless until she enters her kingdom.” [১]

এছাড়াও এই প্রসঙ্গে **জর্জ সিম্পসন** **(George Simpson)** তাঁর **‘Man in Society’** শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন-- “Social science is a unity but is not a fictitions unity; it is a dynamic unity of operating parts, and each part is indispensable to each and all of others.”[২]

যাইহোক একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। সেই অনুযায়ী বলা যায়, সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজকর্মেরও এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান।

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজকর্ম বা সোশ্যাল ওয়ার্কের নিবিড় সম্পর্ক (সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মূলক) আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদেরকে সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল --

- **সমাজতত্ত্বের সাধারণ পরিচিতি (General Introduction to Sociology) :**
- **ধারণা এবং সংজ্ঞা (Concepts and Definitions) :**

সমাজতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Sociology'।এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Socious' এবং গ্রিক শব্দ 'Logos' এই দুটি শব্দের মিলনে তৈরি। 'Socious' কথাটির অর্থ হল 'সমাজ' (Society) ও 'Logos' কথাটির অর্থ হল অধ্যয়ন বা বিজ্ঞান (Study or Science)।সুতরাং সমাজতত্ত্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society)।

সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা ব্যক্তি ও সমাজ, মানুষের সাথে মানুষের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক আচার-আচরণ , ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক কাঠামো ও সংগঠনসমূহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক পরিবর্তন --- এককথায় যাবতীয় সামাজিক বিষয়াদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে, তাকেই বলে সমাজতত্ত্ব। **অগাস্ট কোঁতের ভাষায় সমাজতত্ত্ব হল "সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের রানী" বা Queen of Social Sciences."**[৩]

সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের মতামত ও সংজ্ঞা নিম্নে আলোচনা করিলাম --

- **অগাস্ট কোঁতের মতে**, Sociology as the science of social phenomena "Subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation."[৪]
- **ম্যাক্স ওয়েবারের মতে**, "Sociology is the science which attempts the interpretative understanding of social action in order to arrive at a causal explanation of its course and effects."[৫]
- **এমিল ডুরখেইম বলেছেন**, সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান (Science of social institutions)।
- **অগবার্ন ও নিমকফ এর মতে**, সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক জীবন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা। (Sociology is the scientific study of social life)

◆ **সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি** (Nature of Sociology) :-

রবার্ট বিয়ারস্টেড (Robert Bierstedt) তাঁর 'The Social Order' শীর্ষক গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল --

(1) সমাজতত্ত্ব একটি স্বাধীন বিষয়।

(2) এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

(3) সমাজতত্ত্ব একটি মূল্যবান নিরপেক্ষ আলোচনা।

(4) সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।

(5) সমাজতত্ত্ব সামান্যীকরণের বিজ্ঞান।

(6) সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ সামাজিক বিজ্ঞান, বিশেষ সামাজিক বিজ্ঞান নয়।

(7) সমাজতত্ত্ব একটি যুক্তিনির্ভর ও প্রায়োগিক বিষয়।

◆ **সমাজতত্ত্বের পরিধি** (Scope of Sociology) :

সমাজতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে যে দুটি মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল - বিশ্লেষাত্মক মতবাদ (The Specialisticবা Formalistic School) এবং সংশ্লেষাত্মক মতবাদ (The Synthetic School)

● **বিশ্লেষাত্মক মতবাদ:** এই মতবাদের সমর্থিত তাত্ত্বিকরা হলেন -- জর্জ সিমেল, ফিয়ারকান্ড, ম্যাক্স ওয়েবার, ভন উইজে, স্মল, টনিজ প্রমুখ। এই তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, সমাজজীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু।

● **সংশ্লেষাত্মক মতবাদ:** এই মতবাদের সমর্থিত তাত্ত্বিকেরা হলেন- ডুরখেইম, হবহাউস, জিনসবার্গ, সরোকিন প্রমুখ। এই তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান যেসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

● **সমাজতত্ত্বের শাখা সমূহ** (Branches of Sociology) :

সমাজতত্ত্বের বহু শাখা রয়েছে। এগুলি হল ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব, আইনের সমাজতত্ত্ব, গ্রামীন সমাজতত্ত্ব, নগর সমাজতত্ত্ব, শিল্প সমাজতত্ত্ব, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব, ধর্মের সমাজতত্ত্ব, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, পেশার সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিক সমাজতত্ত্ব, ব্যবহারিক সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য ও শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব এবং চিকিৎসার সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি।

● **সমাজতত্ত্বের গবেষণা পদ্ধতি সমূহ** (Research Methods of Sociology)

সমাজতত্ত্বের গবেষণা পদ্ধতি গুলি হল -- ঐতিহাসিক পদ্ধতি, গবেষণামূলক পদ্ধতি, দার্শনিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি, সামাজিক নিরীক্ষণ পদ্ধতি, কর্মনির্বাহী পদ্ধতি, আদর্শ নমুনা পদ্ধতি, ভেরেস্তেহেন পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রভৃতি। এছাড়াও সমাজতত্ত্বে সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে পদ্ধতিগুলি রয়েছে সেগুলি হল -- প্রশ্নমালা পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, নজির সমীক্ষা পদ্ধতি, ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি, সর্বেক্ষণ পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি প্রভৃতি।

● **সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব** (Importance of sociology)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে এবং সমাজে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব খুবই অনস্বীকার্য। তাইতো অনেকে সমাজতত্ত্বকে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের জননী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক বিজ্ঞান এত বেশি মানবিক সমস্যাকে বিষয়ীভূত করে না। এই কারণে সমাজতত্ত্বকে প্রধান মানবিক বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়। মানবসমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক আচার-আচরণই হল সমাজতত্ত্বের উপজীব্য বিষয়। সম্প্রতিকালে সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের পরিবারে সমাজতত্ত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে মর্যাদামণ্ডিত।

● **সমাজতত্ত্বের জনক ও বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকের নাম** (The Father of sociology and the Names of various sociologist)

সমাজতত্ত্বের জনক হলেন অগাস্ট কোঁত। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের নাম গুলি হল - এমিল ডুরখেইম, ম্যাক্স ওয়েবার, হার্বাট স্পেনসার, কার্ল মার্ক্স, জর্জ সিমেল, অগবার্ন ও নিমকফ, জি.এস.ঘুরে, এ.আর.দেশাই, রাধাকমল মুখার্জী, ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী, এম.এন.শ্রীনিবাস, ট্যালকট পারসন্স, ডাহরেনর্ডফ, লুইজ কোজার, হার্বাট মীড, কুলি, ম্যানফোর্ড কুন, গারফিংক্যাল, ফুকো প্রমুখ।

◆ **সমাজকর্মের সাধারণ পরিচিতি** (General Introduction to Social Work)

● **ধারণা এবং সংজ্ঞা** (Concepts and Definitions) :

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে মানুষ বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় উঠে। সমাজকর্মকে Empowering পেশা হিসেবে অভিহিত করা

হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজকর্ম হচ্ছে একটি পেশাগত প্রক্রিয়া, যা মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন, মানবীয় শক্তি সামর্থ্য বাড়ানো ও পুনরুদ্ধার করা এবং এক্ষেত্রে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলে সাহায্যার্থীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা লাভে সহায়তা করে। সুতরাং, সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া ও পেশা, যা কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের সমস্যার গভীরভাবে সমাধান করে ও ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম করে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

সমাজকর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর মতামত নিম্নে আলোচনা করা হল --

- **আমেরিকার** National Association of Social Workers (NASW) এমন এক প্রকাশিত সমাজকর্মের অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী "সমাজকর্ম হল ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মকান্ড, যা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে এবং সামাজিক পরিবেশকে এই লক্ষ্যের উপযোগী করে গড়ে তোলে।"[৬]
- **ওয়াল্টার এ.ফ্রিডল্যান্ডার** (Walter A.Friedlander) (১৯৯৬) তাঁর "Introduction to Social Welfare" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "Social work is a professional service, based upon scientific knowledge and skills in human relations, which assists individuals, alone or in groups, to obtain social and personal satisfaction and independence."[৭]
- **আরমান্ডো টি.মোরেলস এবং ব্রাড ফোর্ড ডব্লিউ শেফর** তাঁদের "Social Work : A Profession of Many Faces" গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজকর্ম ক্রমবর্ধমান সমাজের জটিলরূপ ধারণাকারী সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা যে সমাজের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে তাদের চাহিদা পূরণকে জটিল করে তোলে।"[৮]
- **সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Goals and Objectives of Social Work) :

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হল সমাজে প্রতিটি স্তরের মানুষকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন এবং সমষ্টিকে কর্মসম্পাদন, দারিদ্র বিমোচন, প্রতিরোধ ও সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং শক্তিশালীকরণ করা।

● সমাজকর্মের প্রকৃতি (Nature of Social Work) :

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্ভর বিজ্ঞান, কলা ও পেশাদার সেবাকর্ম। অন্যান্য পেশা যেমন - আইন সহায়তা, চিকিৎসা ও শিক্ষকতার ন্যায় সমাজকর্মেরও সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করেছে। সমাজকর্ম একটি গতিশীল ও প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়।

জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক জরিপের ভিত্তিতে সমাজকর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেগুলি হল --

(১) সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সাহায্যকারী কার্যক্রম।

(২) সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সামাজিক কার্যক্রম, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য; মুনাফা অর্জনের জন্য নয়।

(৩) সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সংযোগকারী কার্যক্রম, যার মাধ্যমে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি ও দল তাদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টির সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। ৯

● সমাজকর্মের পরিধি (Scope of Social Work) :

সমাজকর্মের পরিধি বলতে সাধারণত সমাজকর্মের অনুশীলন বা প্রয়োগক্ষেত্রকে বোঝায়। সমাজকর্মের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিক নিয়েই এর পরিধি নির্ধারিত হয়। এপ্রসঙ্গে R.A.Skidmoreএবং M.G.Thackerayবলেছেন, “Social work, in a board sense, encompasses the well being and interests of large number emotional, spiritual and economic needs.”[১০]

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত Encyclopedia of social work এ সমাজকর্মের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল --

(১) মাদকাশক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা, (২) বয়স্ক সেবা, (৩) শিশু ও পরিবারকল্যাণ সেবা, (৪) অপরাধ ও কিশোর অপরাধী সংশোধন করা, (৫) পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকল্পনা, (৬) সমষ্টির কল্যাণ ও মানবসেবা পরিকল্পনা প্রভৃতি সহ আরও একাধিক ক্ষেত্রসমূহ।

● **সমাজকর্মের গুরুত্ব** (Importance of Social Work)

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল সমাজের সমস্যার সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজকর্মের পরিধি ও প্রয়োগমাত্রা বিশ্লেষণ করলেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। সমাজকর্মের গুরুত্ব প্রসঙ্গে NASW এর অভিমত হল --

> *"Social Work is based on humanitarian, democratic ideals. Professional social working are dedicated to service for the welfare of mankind, to the disciplined use of a recognized body of knowledge about human beings and their interactions, and to the marshaling of community resources to promote the well-being of all without discrimination."* [১১]

● **সমাজকর্মের শাখা সমূহ** (Branches of Social Work) :

সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এগুলি হল -- চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইক্রিয়াট্রিক সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, গ্রামীন সমাজকর্ম, আসক্তি সমাজকর্ম, জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রভৃতি।

● **সমাজকর্মের গবেষণা পদ্ধতি সমূহ** (Research methods of Social Work) :

সমাজকর্মের মূলত ছয় ধরনের গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। এগুলি হল -- Case work, Group work, Community organization, Social action, Social welfare administration এবং Social work research প্রভৃতি।

● **সমাজকর্মের জনক ও বিভিন্ন সমাজকর্মীর নাম** (The Father of social work and the Names of various social workers) :

সমাজকর্মের জনক হলেন জন অ্যাডামস। কয়েকজন সমাজকর্মী ও সমাজবিজ্ঞানীর নাম হল -- ম্যারী এ্যালেন্ড রিচমন্ড, উইলিয়াম হ্যানরি, বিভারিজ, ডব্লিউ.এ.ফ্রিডল্যান্ডার প্রমুখ।

◆ **সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক** (Relationship between Sociology and Social Work) :

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে কিছু সম্পর্ক ও সাদৃশ্য আমরা খুঁজে পাই। এই সম্পর্ক ও সাদৃশ্য গুলি হল --

(১) সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সমাজতত্ত্ব থেকে সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা হয়, অপরদিকে সমাজকর্ম সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ অর্জনে প্রয়াসী হয়।

(২) সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজকর্মের বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সমাজতত্ত্বে সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে সমাজকর্ম সামাজিক কাঠামোর সকল স্তরে অবস্থিত মানুষকে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

(৩) সমাজতত্ত্বে সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয় ; ঠিক তেমনি সমাজকর্মেরও অন্যতম লক্ষ্য হল সামাজিক সমস্যা সমাধান করা। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৪) উৎপত্তিগত দিক নিয়ে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজকর্মের এক গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্ম উভয় বিষয়ের উৎপত্তি ও বিকাশ কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর সংগঠিত হয়েছিল।

(৫) অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান যেমন কোনো একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন - রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কেবলমাত্র সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মই সমাজের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

(৬) সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা হল চিকিৎসার সমাজতত্ত্ব। এই শাখায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের কথা আলোচনা করা হয়। বর্তমান সময়ে সমাজতত্ত্বেও কাউন্সেলিং বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। অন্যদিকে সমাজতত্ত্বের মতো সমাজকর্মেরও একটি বিশেষ শাখা হল -- চিকিৎসার সমাজকর্ম। এই শাখায়ও মানুষের শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের কথা আলোচনা করা হয়। এবং সমাজকর্মেও কাউন্সেলিং বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

(৭) সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের পেশাগুলো মূলত একই ধরনের ও একই সেক্টরে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে NGO, সমাজকল্যাণ দপ্তর, কাউন্সেলিং সেন্টার, ফিল্ড গবেষণামূলক কাজ, বিভিন্ন হোম, ব্লক এছাড়াও রয়েছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষকতার কাজ প্রভৃতির কথা বলা যায়। অর্থাৎ পেশাগত দিক দিয়ে উভয় বিষয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান।

● বৈসাদৃশ্য :

সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই দুই বিষয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল --

(১) সমাজতত্ত্ব একটি মৌলিক বিজ্ঞান ; অন্যদিকে সমাজকর্ম একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

(২) সমাজতত্ত্বের পরিধি ব্যাপক। কিন্তু অন্যদিকে সমাজকর্মের পরিধি অপেক্ষাকৃত কম।

(৩) সমাজতত্ত্ব একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ; অপরপক্ষে সমাজকর্ম হল একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

(৪) সমাজতত্ত্বের জ্ঞান সমাজকর্মীদের জন্য অপরিহার্য ; অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিকদের জন্য কিন্তু সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োজন হলেও অপরিহার্য নয়।

(৫) সমাজতত্ত্ব দর্শন ও সমাজকর্ম দর্শন কল্যাণমুখী চিন্তাধারা এক নয়।

● সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব (The importance of Sociology in Social Work) :

সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। কারণ, সমাজকর্মের লক্ষ্য হল মানুষ -- যে মানুষ কোন না কোন পরিবার, গোষ্ঠী, সমিতি, সমষ্টির সদস্য। সে নানারকম সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ। তার সামাজিকীকরণও হয় উপরোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে। তার সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক জীবন আবর্তিত হয় ওইগুলির মধ্যেই। মানুষের সমস্যা এবং সম্ভাবনা, হতাশা এবং উদ্দীপনা সবকিছুই সৃষ্টি হয় ঐ পরিবার, গোষ্ঠী, সমিতি বা সমষ্টির মধ্যে। তাই সমাজকর্ম করতে গেলে উপরিউক্ত উপাদানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সমষ্টি সংগঠন (Community Organization), গোষ্ঠী কর্ম (Group Work) বা ব্যক্তি কর্ম (Case Work) যাই করি না কেন পরিবার, গোষ্ঠী সমষ্টির কাঠামো, গতিপ্রকৃতি, বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। সমাজতত্ত্ব এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সমাজতত্ত্বের সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে উপরিউক্ত উপাদানগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সুবিধা হয়। এবং সেক্ষেত্রে সমাজকর্মের যেকোন উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাই সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন সীমাহীন।[১২]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোপরি একথা বলা যায়, সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান। এ সম্পর্ক কেবলমাত্র সাদৃশ্য তা নয় বৈসাদৃশ্য মূলকও হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের এই দুই বিষয় একে অপরের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ক এতটাই গভীর যে মনে হয় একই পরিবারের পিতা-পুত্রের নির্ভরশীলতার সম্পর্কের মতো।যাইহোক,বলা যায় উভয় বিষয়ের সাথে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরের সঙ্গে পরিপূরক।একটি জ্ঞান আহরণ করে অপরটি মানবকল্যাণে তা প্রয়োগ করে।তাই বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্কের অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তথ্য সূত্র:

১. মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১৫); বিষয় সমাজতত্ত্ব প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৯।

২. তদেব,পৃষ্ঠা-৮০।

৩. প্রধান, অরুণাংশু (২০১০); সূচনা-সংকেতে সমাজতত্ত্ব, রাজকৃষ্ণ পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬।

৪. তদেব,পৃষ্ঠা-৪।

৫. তদেব,পৃষ্ঠা-৪।

৬. দে, শিল্পীরানী (২০১৬); "সমাজকর্ম: প্রকৃতি ও পরিধি (ইউনিট-১)", ড.মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'সমাজকর্ম' (প্রথমপত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২-৩।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা-১০।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।

১২. আলম,বসু এবং মজুমদার (২০১৭); "মানুষ ও সমাজ (ইউনিট-৪:MSW)", পতি, ভট্টাচার্য এবং বসু সম্পাদিত, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা, পৃষ্ঠা:২৪৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:- (Bibliography)

ইংরেজি

1. Ahuja,Ram(1992); Social Problems In India, Rawat Publication, New Delhi.
2. Ahuja, Ram (2006); Indian Social System, Rawat Publication, Jaipur, New Delhi.
3. Ahuja, Ram (2012); Society In India, Rawat Publication, Jaipur, New Delhi.
4. Apple, Michael W. , Ball, Stephen J., Gandin ,Luis Armando (2009); The Routledg International Handbooks of the Sociology of education, Routledge , London,New York.
5. Baren, RobertA., Byrne ,Donn and Branscombe , Nyla R. (2008); Social psychology, Prentice Hall of India private Limited, New Delhi.
6. Castells, Manuel (2010); The Rise of the Network Society, Blackwell publishing , U.K.
7. Dube, S.C.(1990); Indian Society, National Books Trust, India, New Delhi.
8. Desai, A.R.(1995); Social Background Of Indian Nationalism, Popularprokashan, Bombay.
9. Denzin,Norman k. And Lincoln,yvonna s.(2013); collecting and Interpreting Qualitative Materials, SAGE publications, New Delhi.
10. Denzin, Norman k. And Lincoln,yvonna s.(2018); The Sage Handbook of Qualitative Research, SAGE publications, New Delhi.
11. Elliott, Anthony and Lemart, Charles (2014); Introduction to contemporary Social Theory, Routledge, London,New York.

12. Fletcher ,Ronald (2000);The Making of Sociology, Rawat publications, New Delhi.
13. Goode, William j. and Hatt,paul k.(1952); Methods in social Research, McGRAM - HILL BOOK COMPANY, INC, London.
14. Howe, David(2009); A Brief Introduction to Social Work Theory, palgrave Macmillan publication,U.K.
15. Johnson, Doyele Paul (2008); Contemporary Sociological Theory, Springer, New York.
16. Kumar, Ranjit (2011); Research Methodology, SAGE Publication Ltd, New Delhi.
17. Kothari, C.R. (2004); Research Methodology Methods & Techniques, New Age International Publishers, New Delhi.
18. Lune, Howard and Berg,Bruce L. (2017); Qualitative Research Methods for the Social Sciences,Pearson,New Delhi.
19. Marvasti, Amir B.(2004); Qualitative Research in sociology, SAGE Publication, New Delhi.
20. Mellor, J.R. (2007); Urban Sociology In an Urbanized Society, Routledge, London, New York.
21. Mitra, Dr.Somnath (2015); "Crime and Correctional Administration", Ajitkumar Pati (Editing), paper-MSW-12,NSOU.
22. Nagla, B.K. (2008); Indian Socio logical Thought, Rawat publication, New Delhi.
23. Population, Society And Environment (P.G. Diploma In NGO Management- DDE)-Annamalai University.
24. Pati,Ajit Kumar -- Editing(2017); "Community Development (Rural, urban)& Contemporary Social Problems " , paper-M.S.W.-11,NSOU.
25. Rawat,H.K.(2014); Sociology,Rawat publication, New Delhi.

26. Sharma, Rajendra k.(1997); Demography and Population Problems, Atlantic publishers,New Delhi.
27. Scott, John (2006); Sociology the key Concepts, Routledge, London, New York.
28. Sidell, Nancy L. (2011); Social work Documentation:A Guide to Strengthening your case Recording,NASWPress,United States.
29. Turner, Jonathan H (2014); Theoretical Sociology, SAGE Publication, New Delhi.
30. Wallace,Ruth A and Wolf,Alison(2008); Contemporary Sociological Theory, Prentice Hall of India private Limited, New Delhi.

বাংলা

১. ঘোষ, শান্তনু (১৯৯৮) ; সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা-- ১ম ও 2য় খণ্ড, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা।
২. চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস (সম্পাদিত) (২০০৮); সমাজবিজ্ঞান : তত্ত্বনির্মাণ, লেভান্ত বুকস, কলকাতা।
৩. দে, পার্থসারথি (২০১১); সমাজতত্ত্বের ইতিবৃত্ত, পিয়ারসন, দিল্লী।
৪. দাশগুপ্ত, সমীর (২০১১); অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, পিয়ারসন, দিল্লী।
৫. ঘোষ, হিমাংশু (২০০১); সমাজতত্ত্ব এন্থনি গিডেন্স, ভ্রাতৃসংঘ, বাঁকুড়া।
৬. চ্যাটার্জি, শুভ্রজিৎ (২০১৯); গ্রামীন সমাজতত্ত্ব : ভারতীয় প্রেক্ষাপট, লেভান্ত বুকস, কলকাতা।
৭. গাঙ্গুলী, রামানুজ (২০১৪); সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, পিয়ারসন, দিল্লী।
৮. মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১৫); সমকালীন সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
৯. মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১৬); ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
১০. চট্টোপাধ্যায়, ড. কৌশিক এবং ঘোষ, ড. অরিত্র (২০২০); প্রারম্ভিক সমাজতত্ত্ব: তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, কল্যাণী পাবলিশার্স, কলকাতা।

১১. মঈনুদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল হাফিজ এবং দাস, প্রণয় কান্তি (২০২১); রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, কল্যাণী পাবলিশার্স, কলকাতা।

১২. ইন্দু,কমল (২০১০); প্রশ্ন অধিকোষ ভারতীয় সমাজ(তৃতীয় খন্ড),বাণী প্রকাশন, কলকাতা।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (১৯৯১); সমাজবিজ্ঞানের শব্দপরিচয়,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

১৪. চ্যাটার্জী, ড.সুব্রত (২০১৫); সমাজতত্ত্বের অভিধান (প্রথম খন্ড), Horizon Research Foundation, কলকাতা।

১৫. চৌধুরী, অনিরুদ্ধ (২০০৭); ভারতের প্রসঙ্গে,চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৬. চ্যাটার্জী, শুভ্রজিৎ (২০১৮); সমাজতত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার আলোকে ভারতীয় সমাজচর্চা, লেভান্ত বুকস, কলকাতা।

১৭. চ্যাটার্জী, শুভ্রজিৎ (২০১৪); বিশ্বায়ন ও প্রান্তিয়করণ: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, IJHSSS, ISSN : 2349-6711 (print), Scholar publication, Assam.

১৮. সেন, সুদর্শনা (২০১২); "মাইসোর নরসিমাচর শ্রীনিবাস", ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ' ভারতের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা' লেভান্ত বুকস,কলকাতা।

১৯. ভদ্র, গৌতম (সম্পাদনা) (১৯৯৮); নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, কলকাতা।

২০. রহমান, চৌধুরী, জাহান, আকবর (২০১১); "সমাজবিজ্ঞান", ড.রঙ্গলাল সেন সম্পাদিত, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

কুসুমকুমারী দাস : অধ্যাত্মসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত এক কবি

উত্তম বিশ্বাস
সহশিক্ষক, মালোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় আলোকে আসন পেতে কুসুমকুমারী দাস কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মানসভাবনার পরিসরে পরমেশ্বরের নিত্য আনাগোনা। ফলে তাঁর কবিতার দ্যুতিতে সহজাত তরঙ্গে ঈশ্বরের স্নিগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। নিত্যধ্যেয় ঈশ্বরের পরম সৌরভে আমোদিত হয়ে তিনি সংসারকে অপাঙ্‌তেও মনে করেছেন। বস্তুসর্বস্বময় জীবনযাপনকে দূরে সরিয়ে একনিষ্ঠ সাধকের মত তিনি পরমেশ্বরকে পরমারাধ্য করেছেন যা তাঁর নানা কবিতায় ভক্তিরসধারার স্রোত সৃষ্টি করেছে। আধ্যাত্মভাবনায় অনুরঞ্জিত তাঁর কবিতা পড়ে আমরা আত্মিকতার উন্নত স্তরে উপনীত হই।*

মূল শব্দ: *অমৃতময়, পরমেশ্বর, মহাজ্ঞান, ত্রিপিদ-আলোক, মঙ্গলস্রোত, অগ্নিগর্ভভস্ম, অধ্যাত্ম-আলোক-দ্যুতি, লোকত্তর, চিন্ময়ীরূপ*

মূল আলোচনা :

'ব্রক্ষবাদী' পত্রিকার হাত ধরে নিজের কবিত্বশক্তির পরিধি যিনি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন সেই কুসুমকুমারী দাস আপন প্রতিভাবলে কাব্যজগতে একফালি পলিসমৃদ্ধ জমি নির্মাণ করেছিলেন। সংসার-পিঞ্জরার বিহঙ্গী হয়েও তিনি আপন মানবসত্তাটিকে নীলাকাশের আলোকধারায় অনুরঞ্জিত করেছিলেন। সেই মানসধারার ক্রমপরিণাম রূপটিকে তিনি কবিতার পড়তে পড়তে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখা অধিকাংশ কবিতা 'ব্রক্ষবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও 'প্রবাসী', 'মুকুল', 'বামাবোধিনী' পত্রিকার হাত ধরে তাঁর কিছু কবিতা প্রকাশলাভ করেছিল। একজন বৃহৎ কবির সার্বিক সংবেগের ব্যাপ্তি তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান না হলেও এক বিশেষ ধরনের যে ঋজুতা আছে তা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো আমাদের মনে অনাবিল পরপূর্ণতার আস্বাদ এনে দেয়। তিনি বাইরে শালীনতা, সততা, নির্ভীকতা, নম্রতার পরিবেষ্টন তৈরী করেছিলেন আর অন্তরে পরিপূর্ণতার এক আদর্শ মাহেশ্বরী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

১.

মধ্যযুগের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে যে সব কবি উনিশ শতকে চলমান ছিলেন কুসুমকুমারী দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি অন্তর্জগতের এক আনন্দময় আদর্শ স্বপ্নলোকে বাস করতেন। তিনি নিজ জীবনাদর্শ লালিত আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে কাব্যের আঙিনায় এনে একটা সর্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি আস্তিক্যবোধের অনুভূত সত্যের আলোকে একদিকে তিনি যেমন আপন চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি সেই আন্তরসত্যকে সুভাষিতরূপে কবিতায় তুলে ধরেছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে সর্বদা এক বিশ্বাসবোধ ছিল। তিনি পরিপূর্ণ শুদ্ধতায় বিভোরভাবে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তখন স্বতোৎসারিত মুক্তির আনন্দে তিনি বিশ্ব তারের সঙ্গে নিজ হৃদয়ের ছন্দকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমের সর্বব্যাপী রূপে তিনি তাঁকে নিজের প্রেমিক বলে মনে করেছেন। তাঁর প্রেমের মোহন মন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। জীবনের বলিষ্ঠ স্তব মন্ত্রে সেই পরমেশ্বর প্রেমিকের স্তুতি করে 'প্রেমিক' কবিতায় লিখেছেন—

"নিঃস্বার্থ, নিঃসঙ্গ তবু প্রেমিক প্রবর
সবারে বিলায় স্নেহ নাহি আত্মা পর!
নয়নে অন্তর-জ্যোতি উছলিয়া পড়ে
সুবিমল দিব্যহাসি ফুটিছে অধরে।"

'প্রেমিক'

২.

সংসারে অবগাহন করে প্রথমাবস্তায় তিনি জড়-জাগতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিজ জীবনের সঙ্গে বর্তমান এই জড় চেতনায় তাঁর মন ইন্দ্রিয়সুখ দাত্রী ভোগ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল। এহেন জীবনে সুখ ও আনন্দের প্রতিশ্রুতি থাকলেও চরমে তা গভীর দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়। একসময় তিনি হৃদয়াঙ্গম করলেন ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখতে পারলেই দুঃখ-দুর্দশাময় এই দেহকেন্দ্রিক জড় জীবন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই তিনি ঈশ্বরভাবনার অমৃতময় পন্থা অবলম্বন করে অন্তহীন অশ্বত্থ বৃক্ষরূপী জড় অস্তিত্বের মূল ছেদন করতে সচেষ্ট হলেন। সেই পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি ও গভীর অনুভূতি গঙ্গা ধারায় প্রবাহিত হয়ে অধ্যাত্মকরুণমালার রূপ নিয়েছ। হৃদয়াবেগের ভাবোচ্ছ্বাসে কবিতাগুলি অধ্যাত্মভাবনার আকর হয়ে উঠেছে--

"কত পাপ, অপরাধ মোহের ঘোর
তোমারে দেখাতে চাই সব শূন্য মোর।
জানি আমি জানি ওই মঙ্গল-পরশ-
বিরস পরান মোর করিবে সরস।"

'তোমারে চাই'

পার্থিব কোন স্নেহ, ভালোবাসা কবির অন্তরের তৃষ্ণা নিবারন করতে পারেনি। তাই কবি তাঁকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাঁর স্নেহধারায়, করুণাধারায় স্নাত হতে চেয়েছেন।

তিনি জানেন ঈশ্বরের অপার কল্যাণে এই ধরাতলে সমস্ত জীবকুল বেঁচে আছে। সেই আনুগত্যে তিনি হৃদয়ের গভীর অরণ্যতল থেকে কুঁড়িয়ে আনা পুষ্পদল দিয়ে তাঁকে বরণ করে আপন করে নিয়েছেন। ঈশ্বরের পূত আশীর্বাদেই কবি মনে জেগে ওঠা বেদনার মাহেশ্বরী মূর্তী দূরীভূত হয়েছে। যথার্থই তাঁর প্রসন্নচিত্তের অমৃতধারায় এ জগতের সকল সন্তাপ দুর্দিন ধুয়ে মুছে যায়। এই পৃথিবীর সমস্ত মায়া ছিন্ন করে কবি যেদিন অনন্ত পথে যাত্রা করবেন তখন অন্তরমাঝে শুধুই ঈশ্বরকে জাগিয়ে রাখবেন। তখন এই পৃথিবীর বেদনার তীব্রতাপ কবিকে কোনভাবেই দহন করতে পারবে না।

৩.

প্রকৃতির বৃক্ষ, নদীতীর, বিজন অরণ্য, পবিত্র জাহ্নবী এসব মানুষকে শান্তি প্রদান করলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে মুক্তির দ্বারে নিয়ে যেতে পারে না। মানুষ তার নিজেরই ভ্রমবশত সম্পদ, সুখ, গৌরব, পরিজনের মোহে আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি জীবনের যথার্থতাকে উপলব্ধি করে সহস্র ভক্তের ভক্তি-তরঙ্গে নিজের ভক্তি মিলিয়ে বিশ্বশ্বরের মন্দির দ্বারে প্রণত হলেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি সেই মহাজ্ঞানের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন—

"ধূলিমাঝে আছাড়িয়া পড়েছি যখন,
যতনে তুলেছ মোরে, সেই পরশন,
জুড়াইয়া সর্ব ব্যথা,- সকল সন্তাপ,
সব অপরাধ হতে রেখেছ নিষ্পাপ।
সে স্মৃতি পরমা তৃপ্তি জীবনে আমার,
পথভ্রষ্ট হয়ে যেন না ভুলি আবার।"

'অন্তরে না এলে'

আপন অন্তরে তিনি বিশ্বজননীর বলিষ্ঠ মূর্তী নির্মাণ করেছেন। তাঁকে তিনি 'কল্যাণী মূর্তী' বলেছেন। কারণ তাঁর আগমনে বিশ্বের সর্ব অকল্যাণ দূর হয়। চিন্ময়ীরূপে যে অজ্ঞাতলোকেই অবস্থান করুণ না কেন মানুষ রোগে-তাপে-শোকে বিমূঢ় হলে ত্রিপিদ-আলোক দীপ্ত হয়ে তিনি অমৃত পরশ দেন। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই কবি 'মাতৃ মূর্তি' কবিতায় লিখেছেন--

"কোন্ ব্যবধানে তুমি রহিবে অন্তর?
দেশে, কালে, প্রাণে তুমি আছ নিরন্তর,
সকাল হারায়ে যদি হই সর্বহারা
যাবে না হারায়ে তুমি ওগো ধ্রুবতারা।"

'মাতৃ মূর্তি'

৪.

আপন মনন ও দার্শনিক জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি 'আসা –যাওয়া' কবিতায় মানবজীবন ও জীবনাতীত জীবনের যাওয়া আসার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে এই ক্ষণিক জীবনকে ধন্য করে তুলতে চান। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে মানুষের জীবনে কখনো আকস্মিকভাবেই আবার কখনো অনিবার্য গতিতেই মৃত্যু তার করাল রূপ নিয়ে হাজির হয়। এ জীবনের আকুল পিপাসা নিবারিত হবার পূর্বেই মুহূর্তে অনাদি-অনন্তকালে পাড়ি দিতে হয়। অথচ মানুষ তার সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। কিন্তু কালের বুকে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। ঈশ্বর নিরন্তর জীর্ণ-জরাকে সরিয়ে নূতনের জন্য নব পথ নির্মাণ করে চলেছেন। সেই ধারার অনুবর্তনেই ইহজগতের সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করে দেবতার চরণে আশ্রয় নেন। ইহজগতে আসা-যাওয়া-মৃত্যু সম্পর্কিত এই জীবনবোধ তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে। সত্যবোধের আলোকে সৃষ্টির বুকে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন। জীবনাভূতির সেই অমর তীর্থে পৌঁছে তিনি 'আসা-যাওয়া' কবিতায় লিখেছেন—

"আসে যায় নাহি চায়, কারো মুখপানে
যে দেবতা বসে ওই মহা সিংহাসনে।
এক যে পরম মুক্তি যে চরণ-ছায়,
মরণ অমৃতময় হতেছে যেথায়।"

'আসা-যাওয়া'

মৃত্যুকে তিনি ঋষিসুলভ বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখেছেন। মৃত্যুতে প্রিয়জনকে হারানোর শোক হৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে। তা জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার ক্ষত সৃষ্টি করে। এই দুঃখ-হতাশা থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই মানবাত্মার ধ্রুব লক্ষ্য। তাই তিনি বেদনাপ্রীতির মনোভাব নিয়েও মৃত্যুকে 'অমৃতময়' বলেছেন।

৫.

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সেই যে অনাদিকাল থেকে বহমান তা বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। মানুষ সেই আপনত্ব বিস্মৃত হয়ে সংসারের সাথে একাত্ম হয়ে যান। এই একাত্মতার কামনায় মানুষ বিনাশশীল বস্তুসমূহের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। একটি কামনাপূর্তি সম্পন্ন হলে একাধিক কামনা জন্ম নেয়। নিজস্ব জীবনচেতনার আলোকে আলোকিত হয়ে কবি নিজেকে সঙ্কীর্ণ জীবনগন্ডী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর ভাবনার প্রাণবিন্দুতে দাঁড় করালেন। চিনতে পারলেন সমস্ত আবেগ ও চিন্তার আড়ালে অধিষ্টিত প্রাণেশ্বরকে। তাঁর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে কবি মধুস্বাদ আস্বাদন করেছেন। আপন হৃদয়ানুরাগের আন্তরিকতায় তিনি উচ্চারণ করলেন—

"নিশার আঁধার যবে আসে ঘনাইয়া
সুপ্তি মাঝে কে আমায় দেয় জাগাইয়া,
সচেতন হই কোন্ মঙ্গল-পরশে
ছিল সে লুকায়ে এই অন্তর-আবাসে।"

'আমাতে তুমি'

দীর্ঘদিনের সংসার যাত্রার ভাবনায় ভুল বুঝতে পেরে আজ কবিমনে অমরাবতীর অমৃতরস পান করার নিগূঢ় আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে এতদিনের বিরহ-ব্যবধানের অবসান ঘটিয়ে মিলনের প্রাণান্তকর চেষ্টায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মোহের আবর্তে আত্মপরিক্রমারত কবি আজ ঈশ্বরের কূলপ্লাবিত করুণাসুধায় মোহিত হয়েছেন। ভোগসর্বস্ব পরচর্চাকাতর জীবনকে ধিক্কার দিয়ে অনুভবের গভীরতায় ঈশ্বরের স্পর্শে মর্মমূলে তিনি পরমচেতন লাভ করেছেন। এভাবে বাসনালিপ্ত ধূসর গর্ভ থেকে তিনি উত্তরণের পথ খুঁজে নিয়েছেন। পর্যবেক্ষণের সততায় তিনি উপলব্ধি করেছেন পরমেশ্বরের অবস্থান কোন তীর্থে নয়, সতত আমাদের অন্তরমাঝে বিরাজমান।

৬.

মহানচেতা যীশুখ্রীষ্ট, গৌতম বুদ্ধ, শ্রী চৈতন্যদেব যে প্রেমমন্ত্রে কোটি কোটি মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন কবি সেই প্রেমবাণীর অমীয়ধারায় স্নাত হয়েছেন। এ যে চাঁদের

থেকে অমৃতময় জ্যোৎস্নাকে মেখে নেওয়া। তাঁদের শান্তি-বাণীতে যুগে যুগে মানুষের সর্ব দুঃখ অন্তরীন হয়েছে। সেই নিখিল প্রাণের মন্ত্র কবি সুসম্বন্ধ ও সুসম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত জগৎবাসীকে শোনাতে চেয়েছেন। তাতে ভারতভূমি মঙ্গলময়ী সূচকের শীর্ষে অবস্থান করবে। স্বোপার্জিত সেই আশা নিয়ে তিনি 'নিবেদন' কবিতায় লিখেছেন—

"জাগাও জাগাও দেব, অন্তর সবার।
অপরাধ, অমলিন, অকল্যাণ হতে
কর মুক্ত, ধর্মশুদ্ধ, পবিত্র ভারতে।
কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হোক্ তব নাম
শুনিব জগৎ ভরি তব জয় গান।"

'নিবেদন'

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-নম্রভাব কবি অন্তরে সদা বিরাজমান। জীবনধারায় তিনি ক্রমশ ঈশ্বরানুরাগী ও তাতেই নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। হৃদয়ের নীরব ভাষায় হৃদয়েশ্বরের যে বিচিত্র সুর বাজে, বিশ্বের অন্তর হতে যে বাণী ভগবদ চরণের জন্য নির্গত হয় কবি তার সঙ্গে আপন সুর মিলিয়ে নিয়েছেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সাযুজ্যে সদ্য তাঁকে কাছে পাবার নিগূঢ় আকাঙ্খা পোষণ করেছেন। অন্তরের পরিপূর্ণতার আদর্শে তিনি শুদ্ধ হতে চান। ত্রিভুবনব্যাপী মঙ্গলস্রোতের মাঝে অবস্থানরত পরমেশ্বরকে তিনি নিজ অন্তরের পদ্মাসনে স্থান দিয়েছেন। অথচ সেই পরমারাধ্যা থেকে তিনি দীর্ঘদিন বিযুক্ত ছিলেন। জীবনের স্বপ্নরঙীন মায়াজাল সরিয়ে অসিবার ব্রতে দীক্ষা নিয়ে তিনি 'ভক্তের আশা' কবিতায় লিখেছেন—

"তোমারি ভাবনা-স্বর্গ অন্তরে আমার রবে নিরন্তর,
সংসারের ধন-মান যশ স্নেহমোহে হব না কাতর।
যে তুমি এনেছ মোরে সুন্দর ধরায় পরম সুন্দর,
যাত্রাপথে সেই তুমি একান্ত আমার কাছে স্থিরভর।

... ...

বিজয়ী বীরের মতো তোমারি সন্ধানে যাব একা চলি।
মরণে রবে না ভয়, হে অমৃয়ময়, তোমারি সন্তান
যে মন্ত্র পেয়েছে, ব্যর্থ হবে না তা কভু, জয় ভগবান্।"

'ভক্তের আশা'

স্রষ্টা যেমন করে তার সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করেন দেবতাও তেমনি তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে বর্তমান। হৃদয়কে ভক্তির সাথে দ্রবীভূত করলেই তাঁকে অনুধাবন করা যায়। ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণের তীব্র বাসনা নিয়ে নিজেকে সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করে তিনি তাঁর সঙ্গে লীন হতে চান। ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেওয়ার এই ঐকান্তিক আবেদন তাঁর নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

৭.

তিনি অন্তরের অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধিতেই ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। তারই বাণীপ্রকাশ তাঁর অধিকাংশ কবিতার আশ্রয় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী 'কুসুমকুমারী দাসের কবিতা' গ্রন্থের সম্পাদনা সূত্রে লিখেছেন-

> *"ঈশ্বরের কাছে সার্বিক আত্মনিবেদনই ব্রাহ্মধর্মের মূল ও প্রায় একমাত্র সুর। কুসুমকুমারীর কবিতাতেও এই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও ঈস্বরের প্রতি তাঁর প্রার্থনা ও আবাহন খুবই সরল ভাষায় উচ্চারিত। ভাবনাও সহজ ও সুবোধ্য। যখন বিপন্নতা ও অসহায়তা, তখন তিনি স্মরণ করেছেন ঈশ্বরকে;"*[১]

বাহ্যিক জীবনযাত্রার অন্তরালে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের নিগূঢ় সম্পর্ককে তিনি একদিকে যেমন নিজ জীবনে আত্মিকতার সঙ্গে অনুভব করেছেন তেমনি কবিতার জাগ্রত ভুবনে তাকে সজীব করে তুলেছেন। তাঁর কর্মপ্রেরণা দেবরাধনায় সমাহিত হয়েছে। নিজের ভক্তিপ্রণত চিত্তকে ঈশ্বরসেবায় তিনি এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যেখান থেকে সংসারকে অগ্নিগর্ভভস্ম বলে মনে করেছেন। মনের সেই স্বরূপকে প্রকাশ করে তিনি 'শেষ দিনে' কবিতায় লিখেছেন—

> *"সংসার যাক্ সরে বহুদূর,*
> *অন্তর আজ কর ভরপুর,*
> *অনিত্যের মাঝে হে নিত্য মধুর!*
> *তোমাতে ডুবাও প্রাণ।"*
>
> *'শেষ দিনে'*

৮.

বিশ্বজগতে অনন্তকাল ধরে প্রবাহমান অধ্যাত্মবোধ কুসুমকুমারী দাসের কবিতার এক বৃহত্তর ঐশ্বর্য্য। অথচ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও শিশুসাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে কুসুমকুমারী দাসের কাব্যের বিশিষ্টতা নিরূপণ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র দুটি

কথা ব্যয় করে দায় সম্পন্ন করেছেন। যদিও সেই দুই লাইনের কথনে কুসুমকুমারী দাসের আধ্যাত্মিক জীবনভাবনার স্বীকৃতি স্পষ্ট—

*"কবি কুসুমকুমারী ছিলেন ধর্মপরায়ণা একান্ত ভক্তিমতী মহিলা। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।"*২

তাঁর কবিতা-শরীর থেকে নির্গত আধ্যাত্মিক সৌরভ আমাদের অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা, সংশয়ের ঘনীভূত আবর্ত থেকে মুক্তি দেয়। আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মসর্বস্বতায় আচ্ছন্ন থেকে আমরা ক্রমশ নৈরাশ্য ও অবসাদের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হই। তার সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা তাঁর কবিতায় আশ্রয় খুঁজে নিতে পারি। প্রকাশভাবনার সরলতার কারণে সমাজের সব স্তরের মানুষ খুব সহজেই তাঁর কবিতার যথার্থতা, উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে পারে। তাঁর অধ্যাত্মভাবনা বিষয়ক কবিতাগুলি লৌকিক ও লোকত্তর জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। নিরাভরণ সৌন্দর্য ও সরলতার বিশিষ্টতায় তাঁর কবিতাগুলি অসাধারণত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাঁর কবিতাধারার বাঁকে বাঁকে সজ্জিত অধ্যাত্মআলোক-দ্যুতি আমাদেরকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। সেই বিস্ময়াবেশে আমরা বুঝে নিতে পারি ঈশ্বরের সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা।

তথ্যসুত্র:

১. সুমিতা চক্রবর্তী, কুসুমকুমারী দাসের কবিতা, সম্পাদক-সুমিতা চক্রবর্তী, ভারবী, ২০০১, কোলকাতা-৭৩, পৃঃ ২০
২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃঃ ২৩৫

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, ভারবী, ২০১৯, কোলকাতা-৭৩
২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, কোলকাতা-৭৩
৩. বাসন্তী চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা-৭০০০০৭
৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬, কোলকাতা-৭৩
৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, কোলকাতা-৭৩
৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, কোলকাতা-৭৩

ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা

কস্তুরী কর
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ: *সময়ের হাত ধরে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে সেই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের বিস্তর দ্বন্দ্ব ছিল। যেহেতু উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বাংলাকে বেশি স্পর্শ করেছিল তাই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা বড় বেশি ছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। যিনি শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মেলবন্ধনে যে শিক্ষা তার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ভারসাম্যের ধারণা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।*

সূচক শব্দ: *ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা, আধুনিকীকরণ*

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে কিভাবে বর্তমান রূপ ধারণ করলো এবং তাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কি ভূমিকা বুঝতে হলে আমাদের কিছুটা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে হবে যে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠেছিল। গবেষকদের কাছে এটা একটা মৌলিক বিষয় হয়ে রয়েছে যে সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষজন তাদের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কি প্রয়োজন মত সেইরকমই শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলে। এ চাহিদাগুলো নানাবিধ আকার ধারণ করিতে পারে যথা, খাদ্য উৎপাদন, মনোরঞ্জন,আত্মরক্ষা, ধর্মসংক্রান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সবসময় সমাজের প্রয়োজন পূরণের উপায় হয়ে থেকেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রাজতান্ত্রিক ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষা ও তার সঙ্গে পশ্চিমী শিক্ষার যে সংঘাত সেই প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও তৎকালীন

মনীষীদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তবে তার আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিভাবে ভারতীয় শিক্ষা প্রণালী পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল জানার জন্য খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ধী শক্তি বৃদ্ধি। যার প্রমাণ গায়ত্রী মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক শিক্ষার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল গুরু শিষ্য পরম্পরা। শতপথ ব্রাহ্মণে উপনয়নের যে বর্ণনা আছে তা পরবর্তীকালে গৃহ্য সূত্র সমুহের বর্ণিত উপনয়নের বিস্তৃত বিবরণের সংক্ষিপ্ত প্রাচীনতর রূপ। উপনয়নের মূল কথা হচ্ছে ছাত্র শিক্ষা লাভার্থে গুরুর সম্মুখে উপনীত হবে এবং গুরু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। শিষ্যকে সত্যবাদী ব্রতধারী আচার্যের প্রতি সেবাপরায়ণ, সৌজন্য ও আতিথেয়তাবোধ প্রভৃতি গুনে ভূষিত হতে হবে।[১] উপনিষদ সমূহের তৎকালীন যে পাঠক্রম বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে পাঠ্য বিষয় হিসাবে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, লক্ষণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছিল। এছাড়া পরলোক সংক্রান্ত জ্ঞান, শব্দার্থতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং নৃত্যগীত শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গণ্য হত। এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ হিসাবে ছয়টি শাখার বিকাশ হয়েছিল যথা শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ, প্রাথমিকভাবে সেই সকল বিষয়ই উপনিষদের যুগে ছাত্র পাঠ্য ছিল।[২] এই মৌখিক পাঠের ঐতিহ্যই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে এবং ছাত্রদের পাঠ যাতে নির্ভুল হয় এবং উচ্চারণ যাতে বিশুদ্ধ হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হতো।

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলত ধর্মীয় রীতিনীতির মোড়কে সে সময়ের সামাজিক চাহিদাগুলি জোগান দেওয়ার জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইভাবে শিক্ষিত করা হতো যাতে তারা একই সাথে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের সাথে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ পূরণ করতে পারে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে এই প্রথা গুলো ছিল বৈদিক ও প্রাক্ বৈদিক যুগের ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। উদাহরণস্বরূপ এটা ধরে নেওয়া কষ্টকর যে যুদ্ধবিদ্যা প্রাক্ আর্য সভ্যতায় শিক্ষার একটা অংশ ছিল যেরকম আর্য সভ্যতায় কারুকার্য খচিত মাটির পাত্র তৈরি করা এবং অলংকার শিল্পের উৎকর্ষতার শিক্ষাও খানিকটা অসম্ভব ছিল। সমাজ,ধর্ম,

আচার ও চাহিদার প্রেক্ষিতে আর্য ও প্রাক্ আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে একটা নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল সময়ের সাথে পা মিলিয়ে চলার জন্য।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিহার গুলিকে কেন্দ্র করে নুতন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে নালন্দার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের জৈনবিহার গুলিও বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুরুকুল আশ্রম এবং বিহারের মধ্যে পার্থক্য ছিল যে বিহারগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশ বিশেষ। আশ্রম তা ছিল না। আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। তাই এক একটি আশ্রমে শিষ্যর সংখ্যা খুবই পরিমিত হত। অন্যদিকে বিহারের সংগঠন হত অনেক ব্যাপক। বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী সেখানে সমষ্টিগত ভাবে জীবনযাপন করতো এবং তাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। আশ্রম ছিল গৃহের প্রতিরূপ। আবার মৌর্য ও মৌর্য পরবর্তী যুগের গিল্ড গুলো করিগরী শিক্ষাদানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। খনিবিদ্যায়, ধাতুবিদ্যায়, বয়ন ও রঞ্জন শিল্পে এবং সূত্রধরের কাজে উন্নতি তখন গিল্ড গুলির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রে যে দর্শনীয় অগ্রগতি হয়েছিল তার পরিচয় তৎকালীন মুদ্রা এবং মৌর্য যুগের স্তম্ভ সমূহে পাওয়া যায় । পরবর্তী কুষান ও গুপ্ত যুগে ধাতুবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদির আরো উন্নতি ঘটেছিল।

ইসলামিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষা মক্তবের মাধ্যমে এবং উচ্চশিক্ষা মাদ্রাসার মাধ্যমে দেওয়া হত। শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষকে ধর্ম মনস্ক করা। ইসলামীয় শিক্ষার প্রচারের সাথে সাথে বস্তুগত সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য।

ইসলামিক যুগের শেষের দিকে জাতিগত উত্তেজনা, ধর্মান্তকরণের হুমকি এবং বেন্থামপন্থী শাসকদের সমাজ সংস্কারে প্রবল উৎসাহ ইত্যাদি ভারতীয়দের বাধ্য করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। এরই পরিনামে বার্নাড কোনের ভাষায় সংস্কৃতির "নৈর্ব্যক্তিকরণের" (অবজেস্টফিকেশন) প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের সংস্কৃতিকে একটি অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে সহজেই নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রদর্শন করা যায়, তুলনা করা যায়, উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই নতুন চিন্তা ভাবনা ঊনিশ শতকের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে অংশত প্রকাশ পেয়েছিল।[৩]

বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের মানসিকতায় উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সাংস্কৃতিক hedgemony বা কর্তৃত্ব, একধরনের দোদুল্যমানতার জন্ম দিয়েছিল। যে ইংরেজ এই বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবককে পাশ্চাত্য উদারনীতির তত্ত্বে শিক্ষিত করেছে, শেলী ও বায়রনের কাব্যে দীক্ষিত করেছে, সেই ইংরেজই চাকুরী ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত বাঙালিরদের দৈনন্দিন অপমানিত করছে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। এই ইংরেজেরই আনুকূল্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত করে খাচ্ছে; অথচ অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। এই অসংগতিবোধ উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের মননে পীড়াদায়ক ছিল।[৪] যদিও এক অর্থে ইংরেজি শিক্ষা নতুন নতুন পেশার দৌলতে মূলত উচ্চ শ্রেণী ও পুরোহিত শ্রেণী সেই একই সব প্রাধান্য কারী শ্রেণি গুলির প্রাধান্যের ক্ষেত্রকেই আরো বিস্তৃত করেছিল।

রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণে ভারতীয় সভ্যতাকে নতুন করে পুনরায় আবিষ্কার করা এবং তাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা হয়, যাতে ভারতীয় সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, একেশ্বরবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও যুক্তিবাদী ইউরোপীয় আদর্শের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে কোন অংশে কম নয় বরং আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেটা প্রমান করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংস্কৃতি অনুসন্ধানের সাক্ষ্য মেলে মারাঠি, তামিল, তেলেগু হিন্দি ইত্যাদি মাতৃভাষা সাহিত্যের বিকাশে, নতুন চিত্র শিল্পের বিকাশে এবং নারীবাদী নতুন আদর্শ নির্মাণে।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রচার শুরু করে দেয় যে শিক্ষা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অবাধ্যতা সৃষ্টি করছে। এটা শুনে সরকার ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মার্চ বাংলায় শিক্ষার খরচ কমাবার প্রস্তাব পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে জন শিক্ষা উন্নয়নে সেই টাকা খরচের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে শিক্ষিত ভারতীয়রা ভীত ও আশাহত হয় এ মর্মে যে করবৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষা খাতে খরচ কমানোর ব্যাপারটি এমন একটি সময় ঘটেছিল যখন সরকার সেনা বিভাগে, সাম্রাজ্যের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে সামাজিক কাজে এবং হোম চার্জেস খাতে অতিরিক্ত পরিমাণে খরচ করতেই থাকে।[৫]

প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল কারণ " এলিট", যারা ঔপনিবেশিক রাজত্বে নিজেদের পেশার অগ্রগতির জন্য দক্ষ হতে চেয়েছিলেন, তারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল কারণ তারা ভাবতো এর মাধ্যমে

সমাজে অগ্রগতি ঘটবে। ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকরা যাদের মধ্যে অন্যতম লর্ড মেকলে প্রাচ্য সংস্কৃতিকে নিচু চোখে দেখতেন সেহেতু এরা চেয়ে ছিলেন এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে যারা সমস্ত দিক থেকে পাশ্চাত্য মনস্ক হবে শুধু মাত্র চেহারা ছাড়া। ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রের কর্মী যারা হবেন তারা শাসকদের ভাষা বলবে কারণ সেটা সেই সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খ্রিস্টান মিশনারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারে অন্যতম উদ্যেগী ছিল কারণ তাদের ধারণা ছিল যে এর মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় ভারতবর্ষ জন্ম নেবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সেটা ছিল ভিন্ন যেটা পথপ্রদর্শক কারীরা আশা করেছিল তার ফলশ্রুতি থেকে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এটা একটা অনুঘটকের কাজ করেছিল, যা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ভারতবর্ষ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল না বরং এই যে নতুন যুক্তিবাদী পথ খুঁজে পাবার ফলে হিন্দুদের যেমন তাদের প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা এবং রীতি নীতির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তেমনি খ্রিষ্টীয় ধর্ম মতের বিরুদ্ধেও তারা বিদ্রোহ করা শিখেছিল। উচ্চশিক্ষার সংস্থাগুলি একদিকে যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন বিশেষ গুণ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত থাকলেও অন্যদিকে মুক্ত সমতাবাদী গণতান্ত্রিক আদর্শগুলো তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল বৃটেনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে। এর প্রভাব এতটাই বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল যে সে সময়কার শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রশাসকরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসকে ভারতীয় স্কুল ও কলেজের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া যায় কিনা।[৬]

ভারতীয়দের মধ্যে এই সংস্কৃতি সচেতনতা পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার রাজনৈতিক বিন্যাস অনেক সময়ই সামাজিক প্রতিক্রিয়াতে ধরা দিয়েছিল নতুন ধারণার জন্ম হয়ে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক মিলনের ফলে এক নতুন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় যা শিখিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষের মাটি সর্ব সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসকে একত্রে ধারণ করে সঙ্গে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। এবং তারা যতোই একে অপরের থেকে পৃথক হোক প্রত্যেকেই ভারতের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহাই ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের মূল কাঠামো হতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে এক ধরনের নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, যারা ভারতের ইতিহাস সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চায়, সেহেতু

অতীতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে তারা নতুন করে ভারতীয় পরিচয় গড়ার চেষ্টা করে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন এদের মধ্যে একজন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল বাংলা যেহেতু ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার পীঠস্থান ছিল সেহেতু বাংলা থেকেই বিপুল পরিমাণে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এই ধরনের একটা সন্ধিক্ষণে রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান-ধারণা একটা অনিশ্চিত মুহূর্তের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল যেখানে সংস্কৃতির আত্তীকরণ এবং একাধিক ধ্যান-ধারণার একত্রীকরণ ঘটে। সেটা ছিল মুক্ত বাণিজ্যের যুগ এবং সময়ের সরণিতে এই ধরনের দৃশ্য আবারও আমাদের সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান ধারণা যে বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে তৈরী তা অকেজো তো নয়ই বরং আজকের আলোচনাতেও তার চিন্তাভাবনার অন্তর্দর্শন নতুন করে আমাদের ভাবায়। রামেন্দ্রসুন্দরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ভারতীয় মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভারতীয় সম্পর্কে তাদের সচেতন করে এবং তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এতদিনের নিষ্ক্রিয়তায় নাড়া দিয়ে যৌক্তিকতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণা জাগায়। রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা সবসময় অতীতের গৌরব ও আধুনিক ভারতের মধ্যে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটানোর চেষ্টা করে যেটা আজও এই বর্তমান সময়ের পক্ষে উপযুক্ত।

রামেন্দ্রসুন্দরের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণের করতে হলে সেই সময়ের বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি বুঝতে হবে। ত্রিবেদীর সময়টা ছিল উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক, যে সময়টা মূলত একটা রূপান্তরের সময়, যেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাদের ঐতিহ্য কে অস্বীকার না করে একটা নতুন শতাব্দীর সূচনা করতে চাইছিল। কাজেই ত্রিবেদীর ওই সময়টায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা "ত্রিবেদীয়ান সিন্থেসিস" কে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি তখন সেটাকে ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচী বলা যায়না বরং তা ছিল সেই সময়কার প্রভাবশালী আধিপত্যকামী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রিপন কলেজের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক হন পরে তিনি সেখানের অধ্যক্ষও হন। যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন সেহেতু জগতের রহস্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে রামেন্দ্রের যে ভ্রান্তি নিরসন সেক্ষেত্রে এটা মনে রাখা দরকার যে সেই সময়কার বাঙ্গালীদের মধ্যে যে নির্দিষ্ট মানসিকতা ছিল তাতে তারা এই ধারণার বশবর্তী

ছিল যে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব এগুলোই চরম সত্য যার বিবর্তন সম্ভব নয় এবং এটার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের জাতিগত সংস্কৃতি, প্রথা, তত্ত্ব, অভ্যাস এগুলো অনাদিকাল থেকে স্থবির।

অপরপক্ষে আমরা দেখি রামেন্দ্রসুন্দর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে কিন্তু তিনি পশ্চিমি সভ্যতার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা গুলির ক্ষেত্রে মুক্ত উদার ছিলেন। যদিও তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন নি তবুও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং তিনি তার দেশকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেখতে চেয়ে ছিলেন। সেই কারণেই তিনি সে সময়ের অন্য বুদ্ধিজীবীদের মত পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয় বা একজনকে তার শেকড় থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করার পক্ষপাতি ছিলেন না, এই ধরনের ধারনার প্রতিধ্বনী সেসময়কার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়। যে কারণে গান্ধী বলছেন যে তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত জানালা খুলে রেখেছেন যাতে সমস্ত জায়গার হাওয়া তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু সেই হাওয়াতে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন না। ত্রিবেদী ছিল এই আন্দোলনের প্রধান অংশ দাতা। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে বারবার বিদেশি আক্রমণ এবং ভারতীয়দের পরাজয় এবং বিদেশি শাসনকে গ্রহণ দেখেছেন। এবং তিনি জাতীয় ক্ষেত্রে একতার যে আশু প্রয়োজন তা অনুভব করে ভারতীয় জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা একই ধরনের উদ্দীপনা জাগ্রত করার দরকার মনে করে ছিলেন, এবং তিনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং ভারতকে একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে তিনি তাদের একতা ও সংহতির ওপর জোর দেন। এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুপক্ষই যাতে কাছাকাছি আসে সে চেষ্টা করেন। তার মতে সহযোগিতা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় ভারতীয় জাতিসত্তার ক্ষেত্রে। যেকোন আন্দোলন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের সমর্থন না পায় তাহলে তা সফল হতে পারেনা।

ইউরোপ সম্পর্কে ত্রিবেদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি যে তিনি দেখেছেন পার্থিব বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা অনেক বেশি সচেতন এবং এক্ষেত্রে তাদের একটা সক্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব রয়েছে যার ফলে তাদের সমাজে পার্থিব সমৃদ্ধি ঘটেছে। এবং তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তত হয়েছে। ইউরোপ শুধু যে পার্থিব উন্নতি করেছে তা নয় সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। নিজের একটা মহিমান্বিত ছবি তুলে ধরেছে যা ইতিহাসে অতুলনীয়। ভারতীয় ও পশ্চিমী সমাজের মানুষদের মনোভাবের মূল পার্থক্য

ত্রিবেদীর ভাষায়, ইওরোপীয়দের সক্রিয়তা তাদের সম্পদ, যা তাদের জ্ঞান ও গৌরব অর্জন করতে শিখিয়েছে যেখানে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সাধু সন্তদের মত শান্তি আত্মতুষ্টি এবং অনাসক্তি মানাসিকতার জন্য তারা সমৃদ্ধতা, জ্ঞান এবং গৌরব বিসর্জন দিয়েছিল।

ভারতীয়দের যে আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা তা মুছে ফেলতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণ দেন। যাদের দুজনের ধারণা ভারতীয় সমাজকে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। মনে হতে পারে যে ত্রিবেদী হয়তো কিছু পরিমাণে আধুনিক শিক্ষার বিরোধী ছিল, আসলে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তার বিরোধিতা ছিল। স্যাডলার কমিশন কে তিনি বলেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত হয়েছে সেটা সব মিলিয়ে একটা বিদেশী গাছ লাগানোর চেষ্টা, যেটা বিদেশী মাটিতে বড় করার প্রচেষ্টা চলছে। ত্রিবেদী এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনে পুরোপুরি অন্ধতা এবং বর্তমান সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে যা প্রাচীন ভারতের প্রাত্যাহিক জীবনে এত দিন ধরে জড়িত তার দ্বন্ধের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা অর্থ দেবে এবং শিক্ষকরা যেন শিক্ষা বিক্রি করবেন এবং ছাত্ররা যেটা কিনবে তার একটা বাজারী মূল্য থাকবে। অন্যভাবে এই-শিক্ষা যেটা অর্থ ও শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করবে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়ক হবে না।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত প্রয়োজন পূরণের উপায় মাত্র। যা ব্যাক্তির সার্বিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে উপেক্ষা করেছিল। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইস্কুল বলতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাস্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয় ,মাস্টারের কলও তখন মুখ বন্ধ করে। ছাত্ররা দুই চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পরিয়া যায়।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিবেশকে তপোবনের সেই আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের সাহচর্যে অবস্থান করবে, যে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিশুরা প্রকৃতি-পরিবেশের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবে শিক্ষার্থীর অনাবিল আনন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় সহজ-সরল বিদ্যালয় পরিবেশ ছিল একটি

বিশেষ দিক। কারণ সহজ-সরল পরিবেশেই সৃজনশীলতার আদর্শ স্ফুরণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার হেরফের ও শিক্ষার বাহন এই দুটি প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ও তার সার্থকতা তুলে ধরেন। সে সময় রামেন্দ্রসুন্দরের মত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ ঘটানোর কথা ভাবেন যেখানে একজন তার ভারতীয়ত্ব বা নিজস্বতাকে বিসর্জন দেবে না এবং এটাই ত্রিবেদী কে একইসাথে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদের তকমা দিয়েছিল।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রামেন্দ্র সুন্দরের ধ্যানধারণার নিচের এই অংশটি পড়লে আমাদের কাছে আরও পরিস্কার হবে। "এই বাংলাদেশে চাষার ছেলে অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়াই যে গুরুর নিকট বিদ্যা লাভে প্রেরিত হয়, তাহার মত সদ্ গুরু জগতে নাই। নিসর্গ দেবতা স্বয়ং গুরুগিরিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। রাতি পোহানর সঙ্গে যখন পাখি সব কলরব করিয়া উঠে ও কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে তখন বালগোপাল রাখাল বেশে সাজিয়া গরুর পাল সঙ্গে মাঠে বাহির হইয়া থাকে, এবং এই গোপাল লীলার অবসরে সে যাহা অর্জন করে, তাহার সহিত সদাশয় বাঙ্গলা গভর্মেন্টের স্থাপিত কিন্ডারগার্টেন প্রণালী মার্জিত গুরু মহাশয়ের পরিচালিত কোন প্রাইমারি স্কুলের টেক্সটবুক কমিটির অনুমোদিত গ্রন্থ রাশির গলাধঃকরণে যে বিদ্যা অর্জিত হয়, তাহার তুলনা চলে না । খোলা মাঠের মুক্ত হওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, গাছের ডালে বসিয়া ঝুলনবাজি, এ ডাল হইতে ও ডালে লাফ, নদী-নালার এপার-ওপারে সাঁতার, ক্রীড়া, কৌতুক, মারামার, হাস্য কলরব স্মরণে আনিয়া এই বৃদ্ধ লেখকেরও হৃদপিন্ডের স্পন্দন উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে জড় জগতের সহিত যেরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ ঘটে, কোনো বোধোদায় বা বিজ্ঞান পাঠের সাহায্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। আকস্মিক ঝড়, বৃষ্টি,বান, তুফান হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা – সেই চেষ্টা সফল দেখিয়া যে শক্তিবৃদ্ধি, সম্মান বৃদ্ধি, মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে ভূগোল বিবরণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিলেও তাহার তুল্য হয় না। আট বৎসরের বালক যাহার উপর কৃষক পরিবারের সর্বস্ব ধন গাভী গুলির রক্ষাকার্য্য সমর্পিত আছে, সেই গাভীগুলিকে খোলা মাঠে ছাড়িয়া দিয়া, গাছের ডগার উপর হইতে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখিয়া তাহাদের গায়ের রঙ ও গলার ডাকের সহিত পরিচয় হইয়া, ঝড়, জল ও বাঘের মুখের উপস্থিত বিপদ হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়া দিনান্তে আপন ঘরে ফিরিয়া আসা- এই বৃহৎ কার্য্য

সুসম্পন্ন করিয়া, এই বৃহৎ দায়িত্ব দিনের-পর-দিন বহন করিয়া, তাহার মনুষ্যত্ব যে বলাধান হয়, তাহার আত্মমর্যাদা যেমন ফুটিয়া ওঠে, তাহার কর্তব্যবুদ্ধি মধ্যে যেরূপ জাগ্রত হইয়া ওঠে, কোন্ পাঠশালা কোন্ শিক্ষা তাহার নিকট পৌছাইতে পারে। বর্তমান কালের প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া, বামন কায়েতর ছেলে, সঙ্গগতি থাকিলে পড়িতে যায় ও শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের একটা সঙ্গতি হয়। কিন্তু চাষার ছেলে, তাঁতির ছেলে, মুদির ছেলে, যাদের জন্য মুখ্যত এই লোকশিক্ষা, তাহাদের পরিণামটা একবার চিন্তনীয়। প্রাইমারী ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া অর্থাভাবে তাহারা ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করতে পারে না, এদিকে চাষার ছেলে লাঙল ধরিতে,তাঁতীর ছেলে তাঁতে বসিতে, মুদির ছেলের তুলাদাঁড়ি হাতে লইতে লজ্জাবোধ করে। এগজামিন পাশ করিয়া তাহারা ভদ্রলোকে পরিণত হইয়াছে: জুতা জামা, ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া "ইতর" কাজে হাত দিতে পারে না। অগত্যা তাহারা উকিল মহাশয়ের মুহুরী বা আদালতের পেয়াদা হইয়া জামা, জুতা, ছাতার কড়ি যোগাইবার জন্য ঘুষ খায় এবং ঘুষের পয়সায় মদ খাইতে ধরে। যাদের এই কর্ম্মও না জুটে, সে নিতান্তই অকর্মা হইয়া যাত্রার দল করে ও গাঁজা খায়। অধিকাংশ ছেলের প্রাইমারী ইস্কুলে অর্জিত বিদ্যার এই পরিণাম। ফলে, শিক্ষার সহিত আমার বিরোধ নাই, শিক্ষা প্রনালীর সহিত আমার বিরোধ; শিক্ষা বিড়ম্বনার সহিত আমার বিরোধ।"[৮]

আজকের ভারতের ত্রিবেদীর দৃষ্টিভঙ্গির আশু প্রয়োজন যেহেতু আজ আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন একদিকে আমরা দেখছি রাজনৈতিক নেতারা বিভেদমূলক রাজনীতি চালাচ্ছে। এবং সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকে হাতিয়ার করে ১৯৪৭ এর মতো আজও ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর মানুষরা সবসময় জাতীয় দৃশ্যতে উপেক্ষিত এবং তাদের সংস্কৃতিও উপেক্ষিত। একটা সাধারণ উদাহরণই যথেষ্ট এখানে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য গুলোর ইতিহাস আধুনিক ভারতের ইতিহাস সেভাবে কতটুকু স্থান পেয়েছে। ইতিহাসে বেশিরভাগই পড়ানো হয় দরবারী ইতিহাস যার সাথে সাধারণ মানুষ নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। এটা এমন নয় যে এই লোকেদের কোন নিজস্ব ইতিহাস নেই কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে সমানে এদের উপেক্ষিত করে রাখা হয়েছে এবং এ ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ নেতিবাচক ও বিভাজন মূলক মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। এবং এখানেই ত্রিবেদীর চিন্তাধারা ভীষণ "হ্যান্ডি" ।এই অবহেলিত জনতার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া যেটা সংখ্যাতত্ত্বের "জাগলারি" নয় বরং একটা গৌরব ও একাত্মতার

অনুভূতি তার মাধ্যমেই আমরা কিন্তু আমাদের জাতীয় সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা কেবলমাত্র যতোটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না, একি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়। তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজী শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকরী দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্র গুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।[৯] কোভিড ১৯ এর প্রেক্ষপটে বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দের সেই উক্তি গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা উত্তম যেন আবার মনে করতে হচ্ছে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া, দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখা এইগুলো যেমন সত্যি এবং দৈহিক ভাবে সুস্থ থাকলে মানসিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্ত থাকা যায় । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীর শিক্ষা বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে ভেবে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন আঙ্গিকে শিক্ষাদানের বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

বর্তমান পাঠদানের পদ্ধতিতে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ, আধুনিক নেট যুক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে শিক্ষা, অনেক পরিবারের কাছেই বিলাসিতার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভেদাভেদ দূর করে পাঠদান প্রক্রিয়া চালু রাখা শিক্ষাব্যবস্থার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখানেই বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নতি, প্রতিটি হীনবল মানুষকে সবল করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা রামেন্দ্র সুন্দরেরও স্বপ্ন ছিল যদিও তা আজও অধরা।

প্রান্তটীকা:

১. ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ: প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১, পৃষ্ঠা, ৪৫।

২. তদেব, পৃষ্ঠা, ৪৭।

৩. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪, পৃষ্ঠা, ২৫৩।

৪. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত: উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ১৩৩।

৫. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা,২৫৭।

৬. রায়চৌধুরি, তপন: Europe Reconsidered, "perception of the west in 19th century Bengal" O.U.P 2000, Page. 2।

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০। পৃষ্ঠা, ৩২৪।

৮. ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সম্পাদনা): রামেন্দ্র সুন্দর রচনা সমগ্র, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা, ৯।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০, পৃষ্ঠা, ৩৯২।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ: প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১।

২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

৩. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪।

৪. সরকার, সুমিত: আধুনিক ভারত, কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০।

৬. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত: উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, ২০০৮।

৭. Mahajan, V. D: India since 1526, S. Chand and Company Limited, 1984.

৮. বিবেকানন্দ,স্বামী: বর্তমান ভারত, কলকাতা, ১৯০৫।

৯. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চন্দ্র: রামমোহন প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৪৭।

১০. Metcalf, Thomas, R: Ideologies of the Raj, Cambridge University Press, 1994.

১১. Majumdar, Dipika: Ramendra Sundar Tribedi, study of his social and political ideas, Star printers, Kolkata 1988.

১২. Bhattacharya,Dr.Buddhadeb (ed): Ramendra Sundar Rachanasamagra Kolkata, 1976.

১৩. Bajpayee, Ashutosh: Ramendra Sundar Jivan Katha, Kolkata.

১৪. Paninikar. K. M: Asian Western Dominance, George Allen and Unwin Limited, London. 1959.

১৫. Pramanik, Prahlad, Kumar edited: Charit Katha, Ramendra ১৬. Sundar Trivedi, Orient Book Company Kolkata 1980.

১৭. Roy, Dhirendra Narayan: Ghare Baire Ramendrasundar, Kolkata, 1881.

১৮. Sarkar, Ramatosh: Ramendra Sundar Tribedi Kolkata, 1993.

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রান্তিক জীবন-সম্পর্কের অনন্য আখ্যান

প্রসেনজিৎ রায়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সংক্ষিপ্তসার : *বাংলা সাহিত্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে ছোটগল্পগুলি যেন তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সাহিত্য রচনায় তিনি কখনই নিজেকে একটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। প্রতিনিয়ত নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তার ফলে নতুন নতুন বিষয় তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। প্রান্তিক জীবনচর্চা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়, বিশেষ করে এই শ্রেণির মানুষের জীবন- সম্পর্ক। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের সম্পর্ক যে একমুখী নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের কলমে এই জীবন- সম্পর্কের কথা এসেছে ঠিকই, কিন্তু গল্পকার সাধন এই সম্পর্কের এক ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। সময় ও পরিসর পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা কীভাবে বদলে যাচ্ছে তার পরিচয় পেতে গেলে তাঁর গল্পপাঠ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রান্তিক মানুষের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বরং; তাদের জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে আর সেই জটিল গ্রন্থিবিন্দুতে সম্পর্কের দুচ্ছেদ্য রেখাও যে বক্র হয়ে যাচ্ছে সাধনবাবু সেই দিক গুলিকে গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।*

সূচক শব্দ : *সাধন চট্টোপাধ্যায় , প্রান্তিক জীবন- সম্পর্ক, পরিবর্তন, সময়, পরিসর।*

মূল পাঠ

মহাবিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই সম্পর্ক রয়েছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল, আর এই নির্ভরশীলতা তৈরি করে সম্পর্ক। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' গ্রন্থে বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যেই সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই কারণেই সব কিছুরই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। মানব সভ্যতা গড়ার পেছনে সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একা মানুষ কোনও কিছুই করতে পারত না বলে একে অপরের সাথে গড়ে তুলেছে সম্পর্ক; আর সেই সম্পর্কের বীজ ধীরে ধীরে

বিকশিত হয়েছে গোষ্ঠী- রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু জীবন যত জটিল হয়েছে সম্পর্ক ততই পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ সময় ও পরিসর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কেরও বদল ঘটছে। তাই সম্পর্ক ধারণাটাই আপেক্ষিক। ইদানীং সম্পর্ক সংকট একটা বড় সমস্যা। বাঙালি জাতির মধ্যে থেকে সম্পর্ক গুলো প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্বামীর কাছে স্ত্রীর ভাইয়ের সম্পর্ক 'শালা', কিন্তু আধুনিকতা কিংবা ভদ্রতার খাতিরে সেই শব্দ আর উচ্চারিত হচ্ছে না পরিবর্তে স্ত্রীর ভাই হিসেবে সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছে ইত্যাদি। আমার আলোচনার বিষয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন-সম্পর্ক ও তার বদল।

সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী লেখক। শক্তিশালী বলছি তার কারণ তাঁর রচনার এত বৈচিত্র্য, উপস্থাপন রীতি ও সময়-পরিসর নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম লেখকই করেছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শোলনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের কারণে খুব অল্প বয়সেই সব ছেড়ে দিয়ে আসতে হয় এদেশে। তারপর নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন,স্বপ্ন দেখতেন গবেষণাগারে গবেষণা করবেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি ঠিকই, কিন্তু সেই গবেষক মন হারিয়ে যায়নি। সাহিত্যে সেই মন অনায়াসেই জায়গা করে নিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, তারপর শুরু হয় দীর্ঘ পথচলা। তিনি কখনও একটি বিষয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। একই বিষয়ের মধ্যে থাকা বিভিন্নতাকে দ্রষ্টার মতো সর্বদা অন্বেষণ করে চলেছেন, তুলে ধরতে চেয়েছেন তার বহুমাত্রিক সম্ভাবনাকে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন যেমন তাঁর রচনায় এসেছে, পাশাপাশি সেই পরিবর্তনের ফলে মাটি ঘেঁষা মানুষের জীবন-সম্পর্কের কথাও এসেছে। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্প যেন সেই প্রান্তিক জীবন- সম্পর্কের এক বিচিত্র খতিয়ান। আসলে গল্পকার বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হতে গেলে কেবল বিদেশি সাহিত্য পাঠ নয়, সেই সঙ্গে শিকড়কে জানতে হয়। আর সেই শিকড়ের সন্ধানে তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন প্রভৃতি জায়গার প্রান্তিক মানুষের সাথে দীর্ঘদিন থেকেছেন, খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাদের জীবনচর্যাকে, বিশেষ করে তাদের জীবন সম্পর্ককে। এই সম্পর্ক যে একরৈখিক নয়, সেখানেও রয়েছে বহুমাত্রিকতা। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ধর্মের ও

যুগ ইত্যাদির সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কের ফলে চরিত্রের পরিবর্তন ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর ছোটগল্পে অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে। আপাত সময়ের মধ্যে থেকে প্রতীয়মান বিষয়ের বা চরিত্রের সম্পর্কের নবনির্মাণের মধ্যে দিয়ে তিনি পৌঁছোতে চেয়েছেন প্রকৃত সময়ে। উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষের নানা প্রবণতা কীভাবে প্রান্তিক জীবন ও সেই জীবনকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানান সম্পর্ককে বদলে দিচ্ছে তাকে সাধনবাবু দ্রষ্টার মতো অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্পে সেই অনুসন্ধানকে তুলে ধরা হল।

১.

'ঢোলসমুদ্র' গল্পে প্রান্তিক জীবনের এক অন্য পরিচয় পাই। গল্পটি ১৯৭২ সালে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পে প্রহ্লাদ চরিত্রের আত্মনির্মাণের কাহিনি আছে ঠিকই, সেই সঙ্গে প্রান্তিক শ্রেণির জীবনযাত্রার এক বিচিত্র সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের রকমফের, তার ফলে চরিত্রের পরিবর্তনের কথা পাই এই গল্পে। প্রান্তিক শ্রেণি মানুষদের নির্দিষ্ট কোনও আত্মপরিচয় নেই, নেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য অন্যের দাসীবৃত্তি প্রধান জীবিকা। সর্দার, প্রহ্লাদ, গুণিন, বড়পাল প্রমুখেরা তাই করেছে। তাদের মালিক যুগল দাস। মালিকের সাথে এদের সম্পর্কের কোনও ইঙ্গিত না থাকলেও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সময় ও পরিসর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এক সম্পর্ক কীভাবে ভেঙে দিচ্ছে আরেক সম্পর্ককে। এদের দলের প্রধান হল সর্দার। তার সাথে প্রহ্লাদের সম্পর্ক স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে দ্রুত পালটাতে থাকে। তারা একপাল শুয়োর নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছায় বাঁকুড়ার লাল মাটিতে। সেখানে তারা দেখে তাদেরই মতো কিছু অসহায় মানুষদের। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মালা নামক এক মেয়ের সাথে প্রহ্লাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং সেই সম্পর্কের জেরে প্রহ্লাদ সর্দারের গায়ে হাত তোলে। সর্দার, প্রহ্লাদ ও মালা এরা এক শ্রেণির অন্তর্গত; অথচ সম্পর্ক পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে চরিত্রও। গল্পটির অভিনবত্ব এক সময় প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হককেও বিস্মিত করেছিল। এই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আর সেই সম্পর্কের জেরে চরিত্রের বদল 'মহসমুদ্র' গল্পের মধ্যেও লক্ষ করি। মূলত গিরিরাজ বৈতুল, দুধি, পটাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পের শরীর। গিরিরাজ, অনন্ত ও বৈতুল এরা সারাদিন নদীতে জাল ফেলে শত আবর্জনার মধ্যে মাছ খুঁজে বেড়ায়। চামড়া পোড়া রোদ, হলদেটে দাঁত ও ঠোঁটে ঘা এই

নিয়ে চলে তাদের জীবন। গিরিরাজ বৈতুল পাড়ার সম্মাননীয় ব্যক্তি। সে নৌকা মিস্ত্রি ছিরু নায়েকের মেয়ে দুধিকে বিয়ে করে। কিন্তু সতিনের জ্বালায় দুধি বেশিদিন টিকতে পারেনি। তাই সে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু দুধির প্রতি গিরিরাজের জৈবিক সম্পর্কের কথা সবাই জানে, এমনকি সেই বন ঝাউ গাছের শিকড়টি যেটা তাদের কাছে একটা বিরাটকায় পাখি যে কিনা এখনই উড়বে। দুধির একটা ছেলে আছে তার নাম পটা, কিন্তু গিরিরাজের বিশ্বাস সে দুধিকে গর্ভ করেনি। অথচ পটা তাকে পিতা বলে ডাকে। গিরিরাজ যতই ভাবে সে দুধির সাথে সহবাস করেনি; কিন্তু কোথাও যেন সব সত্য মিথ্যা হয়ে যায়। পিতা- পুত্রের এই সম্পর্কের রাগে গিরিরাজের মনে হতে থাকে তাদের দুজনকেই মেরে বালি চাপা দেবে। এভাবে চরিত্রটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। গিরিরাজ শুধু চেয়েছিল দুধির সাথে জৈবিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে; কিন্তু সেই সম্পর্ক যে আরও কত নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করে সেসবকে মানতে চায়নি। সম্পর্ক স্বীকার- অস্বীকারের দোলাচলতায় শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে।

২.

‘পাতক’ গল্পে ব্যক্তির সাথে ধর্মের সম্পর্কের এক বিচিত্র পরিচয় পাই। গল্পে আছে ধাওয়া পাড়ার দুর্দশার কথা। সেখানকার মানুষেরা কলাগাছের শুকনো পাতা ও খোল পুড়িয়ে দাঁত মাজার মশলা তৈরি করে কোনওরকমে পেট চালায়। পগা এই অসহ্য কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে চায়, দুবেলা একটু পেট পুরে খেতে চায়। সেজন্য ধর্মের সাথে সে এক আপাত সম্পর্ক গড়ে তোলে, যোগ দেয় গাজন সন্ন্যাসীর দলে। গাজন উৎসবের চারদিন পেট পুরে খাওয়া সঙ্গে নতুন গামছা ও ধুতি পাবে এটা তার কাছে যেন স্বর্গসুখ। ধুতি পেলে সে তার বাবাকে দেবে যাতে অর্ধনগ্ন হয়ে বাজারে যেতে না হয় ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই ভাবে। কিন্তু তা পাওয়া অত সহজ নয়। তা পেতে গেলে সন্ন্যাসীদের মতো তাকেও ঝাঁপ দিতে হবে দোতলা সমান উঁচু বাঁশ থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা করতে পারেনি। বাঁশে উঠে নীচের গন্য মান্য মানুষগুলোকে দেখে মনে পড়ে অতীতের নানা বঞ্চনার কথা, মনে পড়ে পাপবোধের কথা। ধর্মের সাথে তার কেবল খাওয়ার সম্পর্ক, এই পাপ বোধে শেষে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল কে পাতক? পেট পুরে খাওয়ার জন্য ধর্মের সাথে সহজে সম্পর্ক তৈরি করে নেয় পগার মতো মানুষেরা, নাকি সেইসব মানুষেরা যারা ধর্মের সাথে সম্পর্ক গড়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়? গল্পটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে উঠে আসে এ ধরনের নানা ভাষ্য।

৩.

প্রান্তিক জীবনে মিথ- পুরাণ গভীরভাবে জড়িত। মিথ- পুরাণের সাথে এদের সম্পর্ক যেন আজন্মলালিত। ‘ঢোলসমুদ্র’ গল্পে এই সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। সর্দার,গুণিন প্রহ্লাদ প্রমুখরা যখন বাঁকুড়ার লাল মাটিতে পৌঁছায় তখন তারা তাদের মতই অসহায় মানুষদের দেখতে পায়। তাদের প্রচণ্ড অভাব। বিশেষ করে নারীদের, যাদের সম্বল একটি মাত্র কাপড়, যেটা ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে নদীতে স্নান করে। এমনকি তাদের নিজেদের পেট চালানোর জন্য রাতে অভিসারে বেরোতে হয়, কেননা পুরুষেরা বড় দুর্বল, তারা তাদের পুরুষত্বকে হারিয়ে ফেলেছে। দরিদ্রতা তাদের সব কেড়ে নিলেও হাসিটুকু নিতে পারেনি। প্রহ্লাদ একজনের কাছে এই উলঙ্গ হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে হেসে চমৎকার ভাবে বলে- “আমরা সব যে গোপিনী বাবা...কালা- চোরা যে আমাদের বস্ত্র হরণ করেছিল।”[১] দরিদ্রতাকে ঢাকতে পৌরাণিক অনুষঙ্গের এহেন প্রয়োগ বাংলা ছোটগল্পে এক অভিনব লক্ষণ। মিথ প্রহ্লাদের দলের মধ্যেও রয়েছে সেটা হল ঢোল সমুদ্রের সেই তাবিজ, যেটা পড়লে মানুষ হয়ে ওঠে সর্বশক্তিমান। এই তাবিজ ধারণ করেছে প্রহ্লাদ। ‘মহাসমুদ্র’ গল্পের মধ্যেও এই মিথ- পুরাণ সম্পর্ক রয়েছে। গিরিরাজ স্বয়ং গুহ্য সাধনা জানে আর তার দ্বারা সে অনেক কিছুই করতে পারে। এছাড়া গল্পের শেষে গিরিরাজ যখন মারা যায়, তার মৃত্যু বৈতুল পাড়ার লোকের কাছে এক মিথে পরিণত হয়।

৪.

নতুন যুগের সাথে পুরনো যুগের সম্পর্ক এবং তার ফলে চরিত্রের পরিবর্তন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ‘মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন’ ও ‘চব্বিশ ফুট’ গল্পে এই আখ্যানই পাওয়া যায়। ‘মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন’ গল্পটির ভৌগোলিক অবস্থান কোচবিহার। কোচবিহার যখন ভারত সরকারের অধীনে চলে আসে, মহারাজার শাসন শেষ, নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন এই প্রেক্ষাপটে নিম্নশ্রেণীর জীবন সম্পর্ক কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে গল্পে তা তুলে ধরা হয়েছে। মহারাজা নেই তার শাসনও নেই, রয়েছে তার পোষা হাতি দেবিকারাণী, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন শাসন ও শোষণব্যবস্থা এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সুন্দর পাখুয়া। সে একসময় মহারাজার পাখা টানত, তাই নাম পাখুয়া। কিন্তু এখন তার কাজ নেই। একসময় সে তামাক চাষ করত, বিষহরি পালাগান করত, কিন্তু এখন সে অসহায়। বয়স যথেষ্ট, গল্পকার

লিখছেন- "দাঁত ফোকলা, ভুরু ঝরা, ফোলা চোখজোড়া ধূসর, কাঁপা হাঁটু, মুখের চামড়ায় অসংখ্য জালি- জাফরি।"[২]

বাড়িতে তার মেয়ে অপুষ্টির শিকার, ঘরের ছাউনি ভেঙে গেছে, চৈত্র- বৈশাখ মাস থেকে তাদের ভাত জোটেনা, চালগুঁড়ো ও লাফাশাক খেয়ে দিন কাটাতে হয়। এই অবস্থা থেকে একটু সুরাহা পাবার জন্য সে মহারাজার স্থানে আসে। কিন্তু দেখে সব বদলে গেছে। পরিচয় হয় মহারাজার হাতির নতুন মাহুত রঙ্গুয়া বর্মণের সাথে। দুজনেই প্রান্তিক শ্রেণির তাই পাখুয়া তার সাথে সেভাবেই সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু নতুন যুগে যে সব বদলে গেছে, এমনকি রঙ্গুয়াও। একটা শাল কাঠের জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায় রঙ্গুয়ার পিছু। কিন্তু শেষে কিছুই পায়নি এমনকি একটি বিড়ি পর্যন্ত না। এভাবে পালটে যেতে থাকে পারস্পারিক সম্পর্ক।

'চব্বিশফুট' গল্পেও একই পরিসরে সময়ের সাথে সাথে চরিত্র ও সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ত্রিলোক যাদব যে কিনা পিতা মণিময় ও পুত্র বরেন এই দুই সময়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিলোক যাদবের বাড়ি ভাগলপুর জেলার নৌটুরিয়ায়। সে কাটনির কাজ করত, কিন্তু দেশভাগের পর তার কাজ চলে যায়। তখন আশ্রয় দিয়েছিল এই মণিময়বাবু। তারপর থেকে সে মাটির কাজ করত। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর সে এসেছে তার আশ্রয়দাতার সাথে দেখা করতে। কিন্তু সব কিছুই বদলে গেছে, এমনকি বরেনও, যাকে একসময় পিঠে চড়িয়ে ছিল ত্রিলোক। সে এখন যুবক। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে বড়োদের প্রতি সম্ভ্রমও ঘুচে গেছে। ত্রিলকি যেন এখন বরেনের স্কচ-ভদকার পার্টনার।

৫.

শাসক- শোষিতের সম্পর্ককে সাধনবাবু খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শাসক বা মালিকশ্রেণির সাথে এই শ্রেণির মানুষের সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়। মালিকপক্ষ এই শ্রেণিকে ভুলে গেলেও এরা তাদের মনে রাখে চিরকাল। আপাত সময়ের মধ্যেও এরা গড়ে তোলে প্রকৃত সম্পর্ক। 'মেহগনি', 'মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন', 'চব্বিশ ফুট' গল্পে আমরা তা লক্ষ করি। 'মেহগনি' গল্পের প্রধান চরিত্র বুধান মুসাহার। সে জঙ্গল ও তার মধ্যে থাকা একটি বাড়ি পাহারা দেয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সে এই কাজ করে আসছে। তার পরিবার বলতে তার এক কালো বোবা বউ, যে কিনা সারাদিন বিড়ি বাঁধে আর কয়েকটা ছেলেমেয়ে। জল তাদের সহজলভ্য নয়। দীর্ঘ দুমাইল পথ

অতিক্রম করে ইঁদারা থেকে জল আনতে হয়। এভাবেই শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে তাদের জীবন। বুধানের এই নিস্তরঙ্গ, নিরুপদ্রব জীবনে আসে দারোগা পাণ্ডে। সে বুধানের কাছ থেকে একটা মেহগনি গাছ চায়। কিন্তু বুধান তা দিতে পারবেনা কারণ সেটা কলকাতার এক বাবুর। সে বাবুই তাকে পাহারা দেবার কাজটি দিয়েছে। তাই মালিকের বিরুদ্ধে কোনও কাজ সে করবেনা। দারোগা পাণ্ডে তাকে নানা হুমকি দেয়, মুসাহার পাড়ায় অত্যাচার করে; কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। শেষে পাণ্ডের বদলি হয় অন্য স্থানে। কিন্তু বুধান সেই একইরকম ভাবে তার কাজ করে যায়। কলকাতার বাবুর সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে বুধান ভাঙতে পারবেনা কেননা সে বিশ্বাস করে 'ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে' অর্থাৎ পাপ করলে শাস্তি পেতে হয়। 'মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন' গল্পে সুন্দর পাখুয়া ভুলতে পারেনি তার অন্নদাতাকে। সবকিছু পালটে গেলেও মহারাজার সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক পালটায় নি। তাই কেউ না চাইলে সে চাইছে মহারাজা যেন দীর্ঘজীবী হয়। 'চব্বিশ ফুট' গল্পেও ত্রিলোক যাদব ভুলতে পারেনি তার আশ্রয়দাতা মণিময় বাবুকে। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসকের পরিবর্তন ঘটে, উচ্চ শ্রেণির লোকেরা উঁচুতে থাকেন বলে এদের সহজেই ভুলে যান ঠিকই; কিন্তু এই সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষেরা কোনও দিনও ভোলেনা তাদের, ফাটল ধরে না তাদের বিশ্বাসের দ্বারা তৈরি সম্পর্কের।

সাধনবাবু কেবল সত্যের এক পিঠকে দেখেননি সত্যের অপর পিঠকেও দেখিয়েছেন। শ্রমিক – মালিক সম্পর্কে মালিক বা শাসকশ্রেণির অবস্থান কোথায় সে চিত্রকেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই শ্রেণির মানুষের সাথে শাসক কিংবা মালিকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই বিশেষ করে কর্পোরেটাইজেশনের ফলে এই সম্পর্ক যেন 'যার শিল তার-ই নোড়া তার-ই ভাঙি দাঁতের গোড়া'-য় দাঁড়িয়েছে। 'মাংসখেকো ঘোড়া' গল্পটি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গল্পে বিজু অর্থাৎ বিজলিপদ পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে কোম্পানির হোর্ডিং লাগাতে গিয়ে তার এক হাত কাটা পড়ে। হাত কাটা গেছে তাতে মালিক চিন্তিত নয়, তার চিন্তা বীমার টাকা নিয়ে। কীভাবে সেই টাকার হাত থেকে বাঁচা যায় এই নিয়ে নানা যুক্তিজাল বানাতে ব্যস্ত। পঞ্চা, নীলু, যাদব এদের মুখ দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে হাতটা খোয়া গেছে সেই হাতটা দরকার কারণ বীমার টাকার জন্য সেটা হবে সাক্ষী। এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। অপরদিকে 'কুদবানের উপস্থিতি' গল্পে শাসকের মনঃপূত না হওয়ায় শ্রমিককে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হয়েছে।

৬.

সম্পর্কের রাজনীতি প্রান্তিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহির্বিশ্বে ঘটে যাওয়া রাজনীতির সঙ্গে এরা তেমন পরিচিত নয় ঠিকই; কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যেকার যে পারস্পারিক সম্পর্ক তাকে খুব গভীরভাবে পাঠ করলে উঠে আসে রাজনীতির এক ভিন্ন আখ্যান। অবশ্যই সেই রাজনীতি তাদের মানসিকতা অনুযায়ী তৈরি। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই সম্পর্কের জন্ম দেয়। 'অতিক্রমণ' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গল্পের একদিকে আছে আবু তালেবর অপরদিকে খোদা বক্স। আবু দীন দরিদ্র, আগামী দিন নিয়ে কোনও রকম চিন্তাভাবনা নেই, সামান্য ভালো খেতে পাওয়াকে স্বর্গসুখ মনে করে। পরনে তার ছেঁড়া লুঙ্গি, ময়লা গেঞ্জি। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> "আবু দীন দরিদ্র মানুষ, সবার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝিয়াই চলে, গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যায়না।"[৩] অপরদিকে খোদা বক্স কর্মসূত্রে সে একজন ফিটার মিস্ত্রি ,অর্থনৈতিক দিক থেকে আবুর থেকে একটু সচ্ছল। এরা দুজনেই একই শ্রেণির; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতা এদের সম্পর্কের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান তৈরি করেছে। তাই খোদাবক্স তাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছে। আবুকে সে টিটাগড়ে কাজ করতে যায়। ফেরার পথে পরটা ও মাংস খাওয়ায়। কিন্তু কোনও টাকা পয়সা দেয়না। আবুও জানে তার সাথে খোদার সম্পর্ক কেবল কাজের, আর "ব্যাটার দুনিয়া কেবল নিজেকে নিয়েই; গাঁয়ের লোক কি এমনিতেই ওকে বাঁকা চোখে দেখে?"[৪]

এরপর গল্পে আবুর মর্মান্তিক পরিণতি ও খোদার পরিবর্তনের কথা আছে। 'মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন' গল্পে রঙ্গুয়া বর্মণও পাখুয়াকে কেবল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। সারাদিন পাখুয়া তার পেছন পেছন ঘুরেছে, কথা বলে রঙ্গুয়া তার সময় কাটিয়েছে কিন্তু কোনও কিছু দেয়নি; এমনকি একটি বিড়ি পর্যন্ত। প্রান্তিক শ্রেণি মানুষের দুমুঠো অন্নের জন্য সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, রাজনীতির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাদের সম্পর্কে রয়েছে রাজনীতির এক কূটাভাস।

বৃক্ষের সাথে গুচ্ছমূলের মধ্যে পার্থক্য এই যে একটা মাটির ওপরে থাকে, আরেকটা মাটির নীচে। কিন্তু গুচ্ছমূল মাটির নীচে থাকলেও সেখানে রয়ছে নানা পার্থক্য। ধরা যাক আলু আর পিঁয়াজ মাটির তলায় থাকলেও এরা অসমসত্ব। প্রান্তিক জীবনও ঠিক তাই। মাটি ঘেঁষে থাকলেও এদের জীবনের মধ্যেও আছে নানান আখ্যান।

বিশেষ করে তাদের জীবন সম্পর্ক; যে সম্পর্ক প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিসকোর্স তৈরি করছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প যেন এই ডিসকোর্স বা ভাষ্যেরই এক অভিনব প্রতিবেদন।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায় সাধন, 'তৃণভূমি' (তিন দশকের নির্বাচিত গল্প), অক্ষর পাবলিকেশনস, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ২০০৩, পৃ-১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৬।

২. রায় জ্যোতিপ্রসাদ, কথাসাহিত্যঃ কথাশিল্প, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

আন্তর্জালিক সম্পর্ক:

১. জীবন এবং সাহিত্যের কথা, সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, সঞ্চালক- বিশ্বজিৎ পাণ্ডা।

২. https://youtu.be/me_YUYqxPQg

সম্পর্কের উত্তরণে পাঞ্চালী যখন পাণ্ডবপ্রিয়া (মূল ও কাশীদাসী মহাভারত প্রেক্ষিতে)

সৌমিতা মুখার্জ্জী
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: *নারী বহুসত্তায় প্রকটমান। সমাজসংসারের বিচিত্রলীলায় প্রধান অনুঘটক সে। সম্পর্কের বেড়াজাল অতিক্রমের আজীবন প্রয়াসে সে ক্লান্ত হয়ে হাপিয়ে ওঠে; ক্ষুদ্র সম্পর্ক বৃহৎ সম্পর্কে জ্বলে ওঠে তেজময়ী রূপে মহীয়সীরূপে। দ্রৌপদী পঞ্চসতীর অন্যতমা, পবিত্রতার পরম প্রতিমূর্তি। জীবন সম্পর্ক তাকে এনে ফেলে চরম বাস্তবতার আঙিনায়; তখন সে আর কন্যারত্ন কিংবা পাণ্ডবপ্রিয়া নয় বরং মোহ-রিরংসা-শূন্যতা-হৃদয়ার্তির গ্রাসে জাজ্বল্যমান ভিন্ন নারীসত্তা। যাজ্ঞসেনী পাঞ্চালী অপরূপা, জন্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্' ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করার নিমিত্তে। রত্নসম নারীলাভে কঠিন স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের বিজয় অভিলাস, পঞ্চভ্রাতা 'মা' নামক শ্রদ্ধায় রূপবতী যৌবনবতীকে পঞ্চভাগে বণ্টন করলে অর্জুনপ্রিয়া পাণ্ডবপ্রিয়ায় পর্যবেসিত হয়। সম্পর্কের বিবর্তনে হৃদয়বৃত্তির জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ পাঞ্চালী তখন পঞ্চপ্রিয়া। কৌরব সভায় কুলবধূর সতীত্বহরণ কৃষ্ণপ্রয়াসে নিষ্ফল, ধর্ম অদৃশ্য বন্ধনে নিরুপায় নাকি পাণ্ডব, কৌরব প্রধান ভীষ্ম প্রমুখ নাকি নিরব দর্শক। পাঞ্চালী তখন হৃদয়ভারে কালিমালিপ্ত ইতিহাসের প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্তা। কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণার স্বয়ংবর সভায় বহুবীর মধ্যে কর্ণের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে কৃষ্ণের কূটনীতিতে। ভীমার্জুনের ধিক্কারে ক্রন্দনরতা দ্রৌপদী কৃষ্ণ আশিসে চিরসতী, নারীচরিত্রে এক ব্যতীক্রমী রূপ প্রলেপ। কাশীদাসী হিড়িম্বার সঙ্গে কলহে নারীর হীনবৃত্তি দ্রৌপদীতে প্রকট হয়েছে। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর বরে পঞ্চপুত্রের জননী রূপে পরিতৃপ্ত। মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বহু হত্যালীলার মূলে দ্রৌপদীর প্রতিশোধ। অধর্মের লীলাভূমিতে ধর্মপ্রতিষ্ঠার বলিদানের যজ্ঞভূমি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যসাধিত হলে নারীললাটে পঞ্চপুত্রের মৃত্যু লিখনে স্থবির দ্রৌপদী। প্রেমিকা-পত্নী-মাতা কোন সম্পর্কে নেই তার জয়গাথা অথচ বিশাল মহাভারতের সকল কালিমার ধারণকারিণী সে। সম্পর্কের শাখা প্রশাখা ভাগ্যবিড়ম্বিত দুর্ভাগ্যপীড়িত হতাশার হুতাশে জ্বলতে জ্বলতে নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তি দ্রৌপদী। জীবন প্রবাহে বিচিত্র সম্পর্কের দুর্বিপাকে দ্রৌপদী অপমান-বিড়ম্বনা-নিঃস্বতায়*

উত্তরণ ঘটেছে তার, প্রেম-সম্মান- বৈভব – সন্তান সবকিছু হারিয়ে চূড়ান্ত এক রিক্তানারী।

মূলশব্দ: *যাজ্ঞসেনী পাঞ্চালীর উদ্ভব – ক্ষত্রিয়ধবংস প্রসঙ্গ - পঞ্চপাণ্ডব প্রিয়া - বস্ত্রহরণ – পাঞ্চালীর দর্পহরণ – কীচক অপমান – মহাযুদ্ধ – সন্তান হারিয়ে রিক্তা – তেজদীপ্তা নারী অবলা – সম্পর্কের বিবর্তন*

"দীর্ঘ সময় বহন করেছে কঠিন কষ্ট
এই মেয়ের জন্য – সামান্যই দোষ দেওয়া যায়।"

কালের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বয়ে চলেছে মানুষ-ইতিহাস-পুরাণ কালকে অতিক্রম করে। সংঘাত ও সভ্যতায় সে চিত্রপট, দিবস-রজনীর আবর্তে তারই উত্থান-পতন, রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের চিরাচরিত অবস্থানগত প্রক্ষেপ। ইতিহাস-সভ্যতা কিংবা রাজনীতির পদচারনায় এই পরিবর্তনের অন্যতম সূচক দেশে কালে নারীর অবস্থান। সমাজ যতদিন নারীকে পর্দার অন্যদিকে রেখে নিশ্চিন্তে ছিল ততদিন সমাজও আপনার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি। সম্মিলিত উদ্যোগে সে বাঁধন আপনা-আপনি খুলে গেছে। সহজ ছিল না সে যাত্রাপথ, যুগে যুগে নারী দিয়ে গেছে অগ্নিপরীক্ষা, প্রমাণ করতে হয়েছে আপন অস্তিত্ব। মহাকাব্য কিংবা মহাযুদ্ধের মূলে যে নারী সে তো ধ্বংসোত্তর প্রচ্ছন্ন শুভচেতনার বিবেকী শুদ্ধিতার নামান্তর, প্রতীকী অগ্নিযজ্ঞে বিভাজিত হয়ে যায় দুই নারীসত্তা, এক যারা পুড়ে মরে, বাকিরা যারা অগ্নিউত্তীর্ণা।

মহাভারতের অগ্নিকন্যা দ্রৌপদী; তাকে ঘিরে উল্লাস করেছে পবিত্রতা-সতীত্ব-ধর্ম-ন্যায়শাস্ত্র। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী নিত্যস্মরণ যোগ্য পঞ্চকন্যারা সতীত্বের গৌরবে তেজ ও স্বাতন্ত্র্যে ব্যক্তিত্বের আভরণে অটল। দ্রৌপদীর উত্থান তেজ থেকে প্রখর সম্ভাবনার আশয় নিয়ে। বাল্যবন্ধু দ্রোণাচার্যের অপমানের বিহিত করতে অপমানিত যঞ্জ অনুষ্ঠান করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটে।

আবির্ভাব মুহূর্তে দৈববানী শোনা যায় –

"সর্ব্বযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্।।
সুরকার্য্যমিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যাঃ হেতোঃ কৌরবানাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্।।"

(আদি ১৬৭/৪৮,৪৯)

– নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই সুন্দরী কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করবার নিমিত্তে আবির্ভূতা হয়েছে। এই কন্যা যথাসময়ে দেবতাদের অভিলষিত কার্য সম্পন্ন করবে।

একে কেন্দ্র করে কৌরবদের সমূহ ভয় উপস্থিত হবে। কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদীর রূপলাবণ্য চিত্রিত হয়েছে কমলার আদলে। অলংকারের পারিপাট্যে সেই বর্ণনা যথাযথ হয়ে উঠেছে –

"নেত্র – যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূলতা, দেখি পায় ব্যথা,
মদনের শরাসন।।"

দ্রৌপদী চিরকালের আরাধ্য বিস্ময়। দ্রৌপদীর অবস্থান – পরিণতি – ভাগ্যবিড়ম্বনা ইত্যাদি সবকিছুর মূলে আছে দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধি, তা সাধিত করতে গিয়ে নারী জীবনের চাওয়া পাওয়ার এত টানাপড়েন। মূল মহাভারতের দ্রৌপদী বাঙালী কাশীরাম দাসের তুলির টানে নবরূপে চিত্রিত হয়েছে। তাই অগ্নিকন্যার দৈবীতেজে বঙ্গললনার লজ্জা ও শালীনতা অধিক প্রকট হয়েছে। মূল মহাভারতের ধ্রুপদ রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের জন্য কৃত্রিম ধনু ও যন্ত্র নির্মাণ করেন –

"যন্ত্রং বৈহায় সপ্তাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেন সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ।।"

(আর, তিনি আকাশে একটি কৃত্রিম যন্ত্র নির্মাণ করালেন এবং তাহার উপরিভাগে তৎসংলগ্নভাবে একটি লক্ষ্যও তৈরী করালেন।)

কাশীদাসী মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে উপরে শূন্যে চক্রচ্ছিদ্র পথে কনক মৎস্য ও তার মানিক নয়ন দেখা যাবে এবং জলেতে পতিত ছায়া দেখে সেই মৎস্যের মানিক নয়ন বিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে – যা মূল মহাভারতে নেই। মৎস্য-চক্ষু ছেদন করা সত্ত্বেও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে আরো বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। সকলে মৎস্য চক্ষু বিদ্ধকরণ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন –

"শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়।।
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যক্ষ জন্মিবে।।"

সভার সকলের বিশ্বাস অর্জনের জন্য অর্জুন পুনরায় লক্ষ্যবিদ্ধ করে। দু'বার লক্ষ্যবিদ্ধের বৃত্তান্ত মূল কাহিনীতে নেই। শুধু তাই নয়, দ্রৌপদী বরমাল্য দিতে উদ্যত হলে অর্জুনের নিকটে দুর্যোধন দূত পাঠায় –

"একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব।।
আর যাহা চাহ দিব, নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া ধ্রুপদ দুহিতা।।"
স্বয়ংবর কেন্দ্রিক দীর্ঘ বৃত্তান্ত মূলে নেই।

মূল মহাভারতে আদিপর্বে ব্যাস কর্তৃক দ্রুপদকে দিব্যচক্ষুদান এবং দ্রুপদ কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবকে পঞ্চ ইন্দ্ররূপে ও দ্রৌপদীকে স্বর্গলক্ষীরূপে দর্শনের বর্ণনায় ধর্ম-বায়ু-ইন্দ্র-অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দম্ভ প্রকাশের জন্যে শিবের দ্বারা বিষ্ণু অনুমোদনে মর্ত্যে প্রেরণ এবং জনৈক মহর্ষি কন্যার ভীষণ তপস্যায় মহাদেবের নিকট পাঁচবার সর্বগুনসম্পন্ন পতি লাভের ইচ্ছা প্রকাশে পরবর্তী জন্মে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী প্রাপ্তি, তা কাশীরাম দাস স্বকীয় প্রতিভায় বর্ণনা করেছেন। কাশীরাম দাস আদিপর্ব্বে 'কেতকীর প্রতি সুরভির অভিশাপ' বর্ননা করেছেন যা মূল মহাভারতে নেই।

যেখানে যাজ্ঞসেনীর পূর্বজন্ম হল কেতকী। কেতকী কাহিনী অগস্ত্যমুনি ধ্রুপদকে বলেছিল।

সত্যযুগে কেতকী ছিল দক্ষ নন্দিনী। সে সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে হিমালয়ে শিবালয়ে তপস্যার মগ্ন হয়। তপস্যাকালে সুরভির আগমন ঘটলে পাঁচটি ষাঁড় সুরভিকে অনুগমন করলে তা দেখে সামান্য হাসলে সুরভি কেতকীকে অভিশাপ দেয় –

"নাহিক ইহাতে লজ্জা, গরু জাতি আমি।
নরযোনি হয়ে তোর, হবে পঞ্চস্বামী।"

কেতকীর কৌতূহলে সুরভি এক ইন্দ্রের পঞ্চ অংশের কাহিনী বর্ননা করে। পুত্র বৃত্রাসুরকে সংহার করার জন্য ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্র নিধনে সক্রিয় হয়। ইন্দ্র মহাত্রাসে রক্ষা পাবার উপায় করতে থাকেন।

"নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারিজন।
ধর্ম্ম, বায়ু আর দুই অশ্বিনী-নন্দন।।
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্পন।
পঞ্চ ঠাঁই পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর।"

ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্র সংহার করলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা করতে নারদের কথায় পুনরায় ইন্দ্রকে প্রাণদান করেন। পৌরানিক বৃত্তান্ত মহাভারতের কাহিনীকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অর্জুন কর্তৃক বিবাহিত দ্রৌপদীকে মাতা কুন্তীর নিকটে আনা হলে অন্যমনস্ক কুন্তী নিজের অজান্তে যা আনা হয়েছে পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বললে মাতৃ আদেশের দোহাই দিয়ে

দ্রুপদের মধ্যস্থতায় দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সোহাগিনী হয়ে নিয়ম সাপেক্ষ সম্পত্তিরূপে এক বছরের চুক্তিতে প্রতি স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হয় নিয়তির কঠিন নির্মম পরিহাসে।

ময়দানব কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হবার পর সভাপর্বে হিড়িম্বা-ঘটোৎকচের আগমন ও হিড়িম্বা দ্রৌপদীর কলহ কথা মূল মহাভারতে আলোচিত হয়নি। কাশীদাসী মহাভারতে এ এক অভিনব অধ্যায়। হস্তীপৃষ্ঠে হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচকে দেখে ইন্দ্রপ্রস্থে সকলের ধাঁধাঁ লেগে যায়। কেউ কেউ ইন্দ্র-চন্দ্র-প্রেতপতি-অরুণ-বরুণ ইত্যাদি রূপে ভ্রম করে। গজবাহন থেকে অবতরণ করে ঘটোৎকচ নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে। ধর্মপুত্রের আজ্ঞায় ঘটোৎকচকে যজ্ঞস্থানে আনা হয়, হিড়িম্বাকে পাঠানো হয় রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে হিড়িম্বা রাজমাতা কুন্তীর আশীর্বাদ নিয়ে উপবেসন করে –

"কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল।।
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে।।
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী অন্তরে কুপিল।।"

[হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের আগমন]

দ্রৌপদীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় দ্রৌপদী হিড়িম্বার ওপর বিরক্ত হন, দুই সতীনের কলহ চূড়ান্ত মাত্রা স্পর্শ করে। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বা পরস্পরের অভিমান ও অহঙ্কারে আঘাত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চায়। দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে বলে–

"কি আহার, কি আচার, কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস, তোর না জানি কারণ।।"

** * **

ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
তুই ত ভজিলি সেই ভ্রাতৃহন্তা জনে।।"

অন্যদিকে হিড়িম্বাও দ্রৌপদীর প্রত্যুত্তরে আপন ক্রোধ উৎগীরণ করে। যে পার্থ দ্রুপদ রাজাকে পূর্বে বহুতর লাঞ্ছনা করেছে সেই পার্থকে নিজ কন্যা সমর্পণ করে দ্রুপদ - 'শত্রুরে যে ভজে, তারে বলি ক্লীব জন্ম।' হিড়িম্বা বলে দ্রৌপদীর পূর্বে ভীমের সঙ্গে তার

বিবাহ হয়, এই মর্মে দ্রৌপদী হিড়িম্বার সপত্নী, তাই দ্রৌপদী জ্যেষ্ঠাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত;

"একা রাজ্যভোগ কর হয়ে পাটরানী।
দিনেক দেখিয়া মোরে হৈলে অভিমানী।।"

হিড়িম্বা কলহকালে ঘটোৎকচের প্রভাব প্রতিপত্তি বিষয়ে অহংকার করলে কৃষ্ণা 'কুপিত অন্তর'-এ বলে

"পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস্ পুত্রকথা।
পুত্রের করিস্ গর্ব্ব, খাও পুত্রমাথা।।"

কর্ণের বজ্রাস্ত্রের আঘাতে পুত্রের প্রাণহানি বিষয়ে শুনে হিড়িম্বাও দিগ্‌শূন্য হয়ে অভিশাপ দেয় – 'বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হৈবে নাশ।' উভয়ের কলহ সভামধ্যে চূড়ান্ত রূপ নিলে স্বয়ং কুন্তী উভয়কে শান্ত করে।

ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ও পাণ্ডবদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে শকুনি কপট পাশাখেলার চক্রান্ত করলে যুধিষ্ঠির রাজ্য-ধনসম্পত্তি- চার ভ্রাতা সহ নিজেকে ও দ্রৌপদীকে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্বক টানতে টানতে ভরা সভায় এনে হাজির করে। মূল মহাভারতে দ্রৌপদীর অপমানে বিকর্ণ সরব হলে কর্ণ তাকে যথোচিত শাসন ও অপমান করে এবং কর্ণ নিজে দুঃশাসনকে পাণ্ডব সহ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নির্দেশ দেয় –

"দুঃশাসন! সুবালোহয়ং বিকর্নঃ প্রাজ্ঞবাদিকঃ।
পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহর।।৩৮।।

[পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়, সভাপর্ব]

(দুঃশাসন! এই পণ্ডিতাভিমানী বিকর্ণ অত্যন্ত বালক; অতএব তুমি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর বস্ত্রগুলি হরণ কর ত ।।)

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের বস্ত্রহরণের নির্দেশ দুঃশাসন দিয়েছিল –

"দুর্যোধন বলে, এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি।।
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসন।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার।।"

[সভাপর্ব]

সবকিছু পেয়েও সর্বহারা, রাজমহিষী হয়েও ভিখারিনী, প্রবল সম্মানে অধিকারিনী হয়েও অপমানিতা দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বনে গমনকালে প্রবল বিরহে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ব্যাসমুনি বলেছেন দীর্ঘনয়না পরমাসুন্দরী দ্রৌপদী কেশকলাপ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে রোদন করতে করতে রাজার পেছনে গমন করেছিল।

বনপর্বে দ্রৌপদীর দর্পহরণ প্রসঙ্গটি মূল মহাভারতে নেই। কৃষ্ণ পরামর্শে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব পবিত্রকাম্য সরোবরে এসে উপস্থিত হয়। বিভিন্ন তীর্থভ্রমণে সন্তুষ্ট নিজেকে সতী পতিব্রতা মনে করে আনন্দিত হয়। দুঃখিনী বনবাসী পতিব্রতার আচরণে সকল মুনিগণ ধন্য ধন্য করলে নিজ জীবনকে সে সফল বলে মনে করে। চক্রপাণি দ্রৌপদীর সেই অহংকার চূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। সন্দীপন মুনির তপোবনে এক গাছের ডালে অকালে এক আম দেখে পেড়ে দেবার বাসনা প্রকাশ করলে অর্জুন তৎক্ষণাৎ শরযোজনা করে সেই আম পেড়ে দেয়। কৃষ্ণ আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে বলে সন্দীপন মুনি সারাদিন তপস্যা ও অনশন করে সন্ধ্যাকালে পক্ক আমটি না পেলে ক্রোধে সবকিছু ভস্ম করে দেবেন। পরিত্রাণ পেতে কৃষ্ণের স্মরনাপন্ন হলে কৃষ্ণ জানায় –

“সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে।।”

ঐ কথা শুনে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণভোজন ও যজ্ঞ অভিলাষের কথা, ভীম কৌরব সংহারের কথা, অর্জুন কর্ণ সহ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিধন, নকুল যুবরাজ হয়ে ভালমন্দ বিচারকরণ, সহদেব ব্রাহ্মণ সেবা ও জননীর দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হবার মনোবাসনা ব্যক্ত করে। সকলের সত্য বচনে অকালের আমটি কিছু কিছু দূরত্ব উপরে ওঠে। দ্রৌপদী নিজ বাসনা স্বরূপ ভীমার্জ্জুনের হাতে দুর্জনের নিধন চায়, এ কথা বললে তৎক্ষণাৎ -

“পূর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি।”

গোবিন্দ বলে, কপট বচনে আমের অধোগতি হয়েছে। দ্রৌপদী মৌন থাকলে অর্জুন রাগান্বিত হয়ে মুণ্ডপাতের ভয় দেখালে লজ্জা ত্যাগ করে কৃষ্ণা বলে –

“যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন।।
এইজন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয়জন।।
এখন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে।।”

দুষ্ট মতি কৃষ্ণার প্রতি ভীম ধিক্কার দেয় ও মারতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ নিবৃত্ত করে যথার্থ পতিব্রতা বলে। যাজ্ঞসেনী লজ্জিত হয়, কৃষ্ণের দর্পহরণের মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ হয়। কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর অনুরাগ কাশীদাসীতে পাই যা মূলে নেই। বস্তুত কাশীদাসীতে প্রবল তেজময়ী নিয়মনিষ্ঠ পতিব্রতা দ্রৌপদীর চরিত্রে মানবমনের স্বাভাবিক প্রলেপ রয়েছে, কঠিন নিয়মের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে অন্তদ্বন্দ্বের সাবলীলতা লক্ষনীয়; কারণ চিন্তন ও বাস্তবের মধ্যে আকাশমাটির ফারাক। আনুবাদে দ্রৌপদীর ঐ চিন্তনের মধ্য দিয়ে কুন্তীর পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তার ঈঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কর্ণের বীরত্ব পঞ্চপাণ্ডবের অনুরূপ, কর্ণ সূর্যপুত্র, দ্রৌপদীও সেই বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছে।

দ্রৌপদী বনে জঙ্গলে পালন করেছে তার পত্নীধর্ম, মেনে নিতে চেয়েছে ঝঞ্ঝাপূর্ণ নিয়তিকে। তীব্র অপমান বুকে ধারণ করে ক্ষত্রিয় কীভাবে শান্ত থাকতে পারে তা উপলব্ধি করতে না পেরে দ্রৌপদীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। মহাবীর ভীম, মহাযোদ্ধা অর্জুন, সুকুমার নকুল সহদেবের অবস্থা দেখিয়ে যুক্তিবাদী যাজ্ঞসেনী ধর্মপুত্রকে জিজ্ঞাসা করে এমন সমূহ দুর্দশার জন্য দায়ী কে?-

'তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।।' যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ধর্মশাস্ত্র নীতি অনুসারে ক্রোধের কারণে পাপ –তাপ –কুলক্ষয় –সর্বনাশ –অপচয়ের কথা বলে। দ্রৌপদীও পাল্টা প্রশ্ন করতে দ্বিধা করে না –

"যেই জন ধর্ম্ম রাখে, তারে ধর্ম্ম-রাখে।
নাহিক সন্দেহ, শুনিয়াছি ব্যাস মুখে।।
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।"

দ্রৌপদীর যুক্তিকে আরো দৃঢ় করে ভীম। স্থাপিত ধর্মরাজ্য কপট পাশা খেলায় নষ্ট হলে ধর্মের অবস্থান কীরূপে সম্ভবপর হয়।

বনপর্বে হতভাগিনী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা কিছুতেই শেষ হয় না। অপরূপের ওপর বিধাতার এ যেন বারবার বজ্রাঘাত। দুর্যোধন পাণ্ডবদের দুর্বল করে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে দ্রৌপদীকে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখার চক্রান্ত করে এবং ঐ পাপকাজে জয়দ্রথকে নিযুক্ত করে। জয়দ্রথ সকলের অনুপস্থিতে একাকী কুটিরে রন্ধনরতা দ্রৌপদীকে হরণ করে এবং ভীম কর্তৃক যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। একের পর এক আসন্ন বিপদের থাবাও তা থেকে কোনক্রমে রক্ষা দ্রৌপদীর মনকে আরো ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাত বাসকালে বিরাট সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হয়ে অন্যায়ভাবে কামনা করে। সৈরন্ধ্রীর বেশে দ্রৌপদীকে পেতে কীচক ভগিনী বিরাট রাজরানী সুদেষ্ণার দারস্থ হয়। সুদেষ্ণা ঐ কপট অভিলাষে ভ্রাতৃগৃহ থেকে সুধা আনতে বললে দ্রৌপদী তাতে অসম্মত হলে সুদেষ্ণা রাগান্বিত হয়ে বলে –

"প্রেষিণী নারীর কেন এত অহঙ্কার।।
যথায় পাঠাব, তথা করিবে গমন।" (বিরাটপর্ব্বে)

অতঃপর সৈরন্ধ্রী কোন উপায় না পেয়ে ভীমকে সবকথা বলে ও ভীমের পরামর্শে নৃত্যশালায় কৌশলে কীচককে আনলে ভীম নিদারুণভাবে কীচককে বধ করে। কীচকের অন্যায় বধে তার ঊনশত ভ্রাতারা এসে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করে-

"কেহ বলে, অসতীরে মারহ পরাণে।।
অগ্নিতে পোড়াও এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি।।"

ভীম একা মহাপরাক্রমে সকল ভ্রাতাদেরও পরাস্ত করে। দ্রৌপদীর ভাগ্য বিড়াম্বনা প্রতি পদক্ষেপে তা প্রতিহত করে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মহাভারতের বিশাল যুদ্ধে বহুজনপদ ধ্বংস হয়, রক্ত সমুদ্রে ধৌত হয় জন্মাদি কৃত পাপ। ধর্মযুদ্ধে কৃষ্ণ অভীষ্ট পাণ্ডব কৌরবপক্ষকে হারিয়ে জয়যুক্ত হয়। যুদ্ধ অবসানের পরে নিয়তির কঠিন পরিহাসে ভগ্নঊরু দুর্যোধনের মনস্কাম পূরণ করতে অশ্বত্থামা সকলের অপ্রস্তুতির সুযোগে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে পঞ্চপাণ্ডব জ্ঞান করে হত্যা করে। পঞ্চপুত্রকে হারিয়ে দ্রৌপদী তখন বিলাপ করে চলেছে, কোনো কূলকিনারা না পেয়ে প্রলাপ বকেছে। জন্ম থেকে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে সে ভীষণ ক্লান্ত –

"পিতৃ- ভ্রাতৃ – পুত্র শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর।।
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা।।"

কৃষ্ণার বিলাপে ভীম অশ্বত্থামার মস্তক ছেদন করতে চাইলে কৃষ্ণা ভীম সমীপে নিবেদন করে –

"দ্রৌনিক মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মনি যদি দেহ আনি।।
তবে শোক নিবারণ হইবে আমার।"

ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভ নষ্ট করতে চাইলে অর্জুনের প্রয়াসে কৃষ্ণের কৃপায় তা সম্ভব হয়নি অশ্বত্থামার পক্ষে। এই প্রবল পাপে তাকে শিরোমণি ত্যাগ করতে হয়। দ্রৌণির মস্তক মণি ভীম কৃষ্ণাকে দিলে প্রতিশোধের আগুন স্তিমিত হলে কৃষ্ণা বলে – 'মম গেল পরিতাপ।' যদিও পঞ্চসন্তান হারানোর বেদনা মহামূল্য মণি প্রাপ্তিতে সম্ভব নয়। তবে দ্রৌনির শাস্তিতে তা কিছুটা উপশম হয়েছে।

যদুবংশ ধ্বংসের পর দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানে যায়। 'স্বর্গারোহণ পর্ব্বে' দেখি ভদ্রকালী পর্বতে পাণ্ডবদের গমন এবং হরি পর্বতে পথশ্রমে দ্রৌপদীর মৃত্যু হয়। দেবদুর্লভ সেইস্থানে মহাহিমে দ্রৌপদী শীর্ণ কলেবরে পর্বতের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মূল মহাভারতে যুধিষ্ঠির পত্নীমৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে শোক ও বিলাপের বাড়বাড়ন্ত লক্ষিত হয়েছে। সেখানে যুধিষ্ঠির স্বয়ং কৃষ্ণাকে কোলে নিয়ে চার ভাইয়ের সঙ্গে কান্নাকাটির প্রতিযোগিতা করেছে –

"তোমা হেন নারী বিনে, শূন্য দেখি রাত্রি দিনে,
বিধাতা করিল সুখভঙ্গ।।"

মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের কান্নাবিলাস ভিত্তিহীন মনে হলেও বাঙালী কবির হাতে পড়ে কাঁদতে বাধ্য হয়েছে। ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে দ্রৌপদীর মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে ধর্মপুত্র পার্থের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা বলে।

"জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতের আহুতি তাহে হৈল যাজ্ঞসেনী।।"

দ্রৌপদী অগ্নিকন্যা, তেজস্বিনী, সকলের আরাধ্য এক অপরূপ মোহময়ী সৌন্দর্য্য। সম্রাজ্ঞী হয়েও সে সর্বহারা। পিটার ব্রুকের মহাভারত ছবিতে আগুনের অনুষঙ্গ বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এ আগুন কখনো উচ্চাশা, কখনো সভ্যতার ধ্বংসকামী যুদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে। খাণ্ডববন দহন করে ইন্দ্রপ্রস্থে নগরের গোড়াপত্তনে আরেক বসতি স্থাপন হয়েছে বৈভবকে লক্ষ্য করে, দ্রৌপদী সেই বৈভবের উচ্চ সিংহাসনে আসীন উজ্জ্বল প্রতিমা। দৈব আবির্ভাবে দ্রৌপদীর জন্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেই উদ্দেশ্য সাধনা কৃষ্ণা বারংবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে চলেছে। যতবার নতুনভাবে বেঁচে উঠে মানিয়ে নেবার জন্য মানসিক ভূমি খুঁজে নিতে চেয়েছে ততবার নিয়তি নতুন তরঙ্গমালায় অন্য ভূমিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা কৃষ্ণা তেজবতী, সেই লেলিহান শিখায় যেমন সে জীবনব্যাপী জ্বলছে তেমনি যারা দেবীর সান্নিধ্যলাভে হাত বাড়িয়েছে তারাও দগ্ধ হয়েছে।

দ্রৌপদীকে গড়ে তোলা হয়েছে অদ্ভুত রহস্য আবহে। কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণা অগ্নিকন্যা, কাব্যনির্মাতা দ্বৈপায়ন কৃষ্ণবর্ণ তাই তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আবার কৃষ্ণাকে চরম অপমান থেকে যিনি রক্ষা করেছিলেন তিনিও কৃষ্ণ। কৃষ্ণা প্রবল তেজদীপ্তা হয়েও অবলা।

যে নারীকে পেতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, সেই নারীকে লাভের পর পাণ্ডবদের মধ্যে চলে ভাগাভাগি আর ছেলেখেলার আয়োজন। 'যা এনেছ, পাঁচজনে মিলে ভাগ কর' – মাতৃআদেশ আর দ্বৈপায়নের বলা বিধাতার বিধান – (নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্বত্যনিন্দিতা) পাঁচজনের স্ত্রী হবে দ্রৌপদী; এ যেন অদ্ভুতে প্রহসন। কৃষ্ণার পূর্বজন্ম কথা, মাতা কুন্তীর বাক্য, বিধির বিধান – সবে মিলে দ্রৌপদীর বিচিত্র ললাট লিখন, কেউ জানতে চাইল না দ্রৌপদীর ইচ্ছার কথা। তখন পঞ্চপাণ্ডবের চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল কামনার আগুন আর শর্তসাপেক্ষ সহবাসের বাসনা। কৌরব সভায় নির্যাতিতা নারীর আর্তি শুনে কারোর কৌতুক, কারোর বা করুণার উদ্রেক হয়েছে। জয়দ্রথ, কীচক, ঊনশত উপকীচক প্রত্যেকে চেষ্টা করেও অগ্নিস্বরূপার নাগাল পায়নি। আর দ্রৌপদী পায় নি হৃতসম্মান, রাজমহিষী সম্রাজ্ঞীর স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিপত্তি, কাঙ্ক্ষিত পুরুষের প্রেম, মাতৃত্বের চরম সার্থকতা। গোটা জীবন নিয়ে সে কেবল সহ্য করে গেছে পঞ্চ স্বামীর চোখের সামনে ভরা সভায় বেআব্রু হয়েছে। সম্রাজ্ঞী হয়েছে বনবাসী, পাঁচসন্তানের মৃত্যু যন্ত্রনায় দগ্ধ হতে হয়েছে। শাওলি মিত্র এই দ্রৌপদীকে চিত্রিত করেছেন 'নাথবতী অনাথবৎ' উপমায়।

দ্রৌপদীর অর্ন্তলালিত যে প্রেম অর্জুনের জন্য ছিল, অর্জুন তার কোনো প্রতিদান দেয়নি। যে ভীম বারবার দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেছিল, দুর্যোধন –দুঃশাসন- কীচক – উপকীচক – জয়দ্রথ প্রমুখের হাত থেকে বাঁচিয়েছে সেই ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর প্রেম অপেক্ষা করুণার উদ্রেক হয়েছে। অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপরাধে দ্রৌপদী স্বর্গে সশরীরে যেতে পারেনি, পথের ধূলায় ধূসরিত হয়ে তনুলতা লুটিয়ে পরেছে। দ্রৌপদী প্রবল সহ্যশীলা, প্রেম-সম্মান-বৈভব সন্তান সব হারিয়ে চূড়ান্ত রিক্তা এক রমণী।

নারীর বহুসত্ত্বায় হৃদয়বৃত্তির বিবর্তন নতুন সম্পর্ক ও পরিণতির আবর্তে বহুবর্ণে রঞ্জিত। নারী – প্রেয়সী – রূপবতী- কূলবধূ – স্ত্রী – মাতা নানা পরিচয়ের অন্তরালে নিজের অস্তিত্বকে অনুভবের অভিলাস। প্রতি সম্পর্কের পরিণতিতে শূন্যতা – নিঃস্বতা – রিক্ততায় অস্তিত্বের বিপরীত স্রোতে গিয়ে সেই নারী বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সম্পর্কের মোহ ও সীমাবদ্ধতাকে তুচ্ছ করে চরম বাস্তবতায় ধূসর ডানা মেলে ধরে। সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনে মূল্যবোধ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। দ্রৌপদী মহাভারতের এক আশ্চর্য

বিস্ময়, প্রতি সম্পর্কের গভীরতায় সে শিখেছে ধর্মকে ধারণ করতে, কালকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের অনুসন্ধানে তৎপর সে। এই রমণীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে ধর্মযুদ্ধ, আগুন অস্তিত্বে জাজ্বল্যমান সংকটবহুল জীবন উদাসীন মানবী দর্শকের আসনে দাঁড়িয়ে জীবন প্রশ্নে হয়েছে নিরুত্তর, জেনে ফেলেছে সম্মান-আর্তি-শোক- অপমান – মর্যাদা, সবকিছুর থেকে বড় রাজনীতির শাণিত নিয়ম যা তাকে পদে পদে স্তম্ভিত করেছে।

"এভাবেই কপালে কপাল লিখছে
দুর্বিনীত রাজতন্ত্র
** * **
এ অপমান কৃষ্ণার নয়
অপমান সমস্ত পবিত্রতার"
[ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়,
মন মেলে ধরেছো আকাশে]

গ্রন্থপঞ্জী:

১. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ – ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৬৩।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ – কাশীদাসী মহাভারত (১ ও ২ খণ্ড), সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, চতুর্থমুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৪।

৩. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ – মহাভারতম্ (১-৪৩ খণ্ড), বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

৪. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ – মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট, ২০১৬।

৫. ভট্টাচার্য, মহুয়া(মুখ্য সম্পাদক) – মহাভারতে নারী, এবং আমরা, কলকাতা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৫।

৬. ভট্টাচার্য, শ্রীসুখময় – মহাভারতের রচনাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০১৬।

কালচেতনার নিরিখে আধুনিক বাংলা কবিতা : বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়

সীমা পুরকাইত
পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : *ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী সাহিত্য – সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সূত্রে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার যে ছায়া এসে পড়েছিল বাংলা কাব্যে তথা সাহিত্যে, তা-ই বাংলা সাহিত্যের পালাবদল তথা আধুনিকতার বিকাশের পরিপন্থী। এই ধারার কাব্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। তবে আধুনিকতার একটা বড়ো লক্ষণ যে, কালচেতনা, রবীন্দ্র-কবিতা তা থেকে অনেক দূরে - সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, "আমার মনটা হয়তো সোশিয়ালিষ্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না।শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র।" অতএব তৎকালীন বিশ্বসভ্যতার ভাঙন সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কবিতায় তা প্রকাশ পায়নি। সে সম্পর্কে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি কবিতার মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে–*

"কালের নৈবেদ্যে লাগে যে - সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।"

("আগন্তুক", 'পরিশেষ')

রবীন্দ্র রোমান্টিকতার প্রভাব বিংশ শতাব্দীতেও প্রসারিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্র-বৃত্তের আবহে কবিতা লিখলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এই ধারার বিপরীতে নতুন একটি কবিতার ধারা গড়ে উঠতে শুরু করল 'কল্লোল'(১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মূল প্রবণতা ছিল, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসা। রোমান্টিকতার বদলে সমকালীন সভ্যতার স্বরূপকে তাঁরা কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসভ্যতার বিপর্যস্ত পরিস্থিতি এই সময়ের কবিদের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করেছিল ভীষণভাবে।

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে নতুন ধারা সৃষ্টি হল, তার কেন্দ্রে ছিল জীবনবাদী বাস্তবতা। কল্লোলের পরে প্রকাশিত 'উত্তরা' (১৯২৫), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'ধূপছায়া' (১৯২৭), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'পরিচয়' (১৯৩১), 'কবিতা' (১৯২৫) ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ কবিগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল বাংলা কবিতার আসরে, তাঁরারবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রেরণায় বাংলা কবিতাকে একটা নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা কবিতায় বাঁক ফেরার একটা লক্ষণ স্ফুটিত হয়েছিল মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসাধনায়। কবিতায় তাঁরা বিদ্রোহী - প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহ ছিল সমকালের বিরুদ্ধে। তাঁদের পথ ধরেই আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলন আরো গভীরতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় দশকে এসে। যার পশ্চাতে ইউরোপের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ইউরোপের নানা সাহিত্য আন্দোলন ও ভাবাদর্শের আলোকে কবিতা লিখতে শুরু করেন এই সময়ের সমস্ত প্রধান কবিরা। ত্রিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আর তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের।

তিরিশের দশকের কবিদের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নৈরাশ্যবোধ। যা থেকে আসে প্রচলিত মূল্যবোধের ভাঙন। ঈশ্বরে আর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। ঈশ্বর, পুরাণ অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র প্রতীক হিসাবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' কাব্যের 'উপসংহার' কবিতায় –

"তিলভান্ড সর্বনাশ: অতিদৈব বিশ্বের দেউল
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা
প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত কল্কি; কিংবদন্তি শিবের ত্রিশূল,
শূন্যকুম্ভ পুরাণ সংহিতা।"

("উপসংহার" 'সংবর্ত')

'শিবের ত্রিশূল', 'কল্কি', 'শিব' এখানে ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে উঠে এসেছে। কিন্তু অবক্ষয়িত বিশ্বসমাজকে রোধ করার মতো শক্তিধর আজ কেউ নেই। ঈশ্বরও আজ দেশের, সমাজের শান্তি বিনষ্টকারীদের হাতের পুতুল। শিবও আজ অশিব রূপ ধারণ করেছে।

তবে তিনের দশকের বাঙালি কবিরা সময় সচেতন কবি হলেও, তাঁদের কবিতায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ ঘটলেও, তাঁদের কবিতায় স্বদেশের সংকটের চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এবার আসব চারের দশকের কবিদের আলোচনায়। আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক ছিল ভারতের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম উত্তাল মুহূর্ত। একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন, সেইসঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ- সবমিলিয়ে চারের দশক হয়ে উঠেছিল জাতির জীবনের অভিশাপ। ব্যভিচারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ব্যক্তি ও সমাজ। আর সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই এই সময়ের বহু কবি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তাঁদের চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমান অধিকার প্রদান। সবলের সমস্তরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে চেয়েছিলেন এই সময়ের প্রধান কবিরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘মা, তুমি কান্দো’ কবিতায় লিখেছেন -

“অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন।” (‘মা, তুমি কান্দো’, ‘অগ্নিকোণ’)

এখানে আগুন বলতে বহুদিন ধরে সমাজের অন্ধকারকে বহন করে আসা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে শক্তির দ্বারা তারা সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে চায়, তিনের দশকের কবিদের মতোই চারের দশকের কবিদের মূল উপজীব্য কালচেতনা। কিন্তু তাঁরা স্বদেশের রাজনৈতিক সংকটকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস প্রমুখ কবিরা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের কবিতায়ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। এই চারের দশকেই পথ চলা শুরু করেছিলেন বিশিষ্ট কবি শিল্পী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চারের দশকের অন্যান্য প্রধান কবিদের মতোই তাঁর কবিতাও ছিল কালচেতনা-সমৃদ্ধ। সমকালীন সমাজজীবনের ছবি অঙ্কণে তাঁর দক্ষতা অসামান্য। স্বয়ং কবির উক্তি–“আমি আমার সময় ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।” তবে এই সময়ের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক কবিতা লেখেননি এবং ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন রাজনৈতিক দলের থেকে বহুদূরে। ‘চল্লিশের দিনগুলি’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিতে

ঊনচল্লিশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের অগাষ্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ইত্যাদির বিধ্বংসী রূপকে তুলে ধরেছেন।

মূল প্রবন্ধ :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী সাহিত্য – সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সূত্রে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার যে ছায়া এসে পড়েছিল বাংলা কাব্যে তথা সাহিত্যে, তা-ই বাংলা সাহিত্যের পালাবদল তথা আধুনিকতার বিকাশের পরিপন্থী। এই ধারার কাব্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। তবে আধুনিকতার একটা বড়ো লক্ষণ যে, কালচেতনা, রবীন্দ্র-কবিতা তা থেকে অনেক দূরে, -সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। বলেছেন, “রসের দিক থেকে মানুষের ভালমন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশিয়ালিষ্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র।”[১] অতএব তৎকালীন বিশ্বসভ্যতার ভাঙন সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কবিতায় তা প্রকাশ পায়নি। সে সম্পর্কে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি কবিতার মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে–

“কালের নৈবেদ্যে লাগে যে - সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।”(“আগন্তুক”, ‘পরিশেষ’)

রবীন্দ্র রোমান্টিকতার প্রভাব বিংশ শতাব্দীতেও প্রসারিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্র-বৃত্তের আবহে কবিতা লিখলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এই ধারার বিপরীতে নতুন একটি কবিতার ধারা গড়ে উঠতে শুরু করল ‘কল্লোল’(১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মূল প্রবণতা ছিল, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসা। রোমান্টিকতার বদলে সমকালীন সভ্যতার স্বরূপকে তাঁরা কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসভ্যতার বিপর্যস্ত পরিস্থিতি এই সময়ের কবিদের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করেছিল ভীষণভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁকে ঘিরে এক বিরোধী কবি-গোষ্ঠী খাড়া হয়ে উঠছে কবিতার জগতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

“একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে।”(“নূতন কাল”,‘পুনশ্চ’)

তবে ধীরে ধীরে রবীন্দ্র মানস চেতনায় পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। ‘বলাকা’য় কবি লিখছেন –

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।" ("বলাকা", ৩৭ সংখ্যক কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে নতুন ধারা সৃষ্টি হল, তার কেন্দ্রে ছিল জীবনবাদী বাস্তবতা। কল্লোলের পরে প্রকাশিত 'উত্তরা' (১৯২৫), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'ধুপছায়া' (১৯২৭), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'পরিচয়' (১৯৩১), 'কবিতা' (১৯২৫) ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ কবিগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল বাংলা কবিতার আসরে, তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রেরণায় বাংলা কবিতাকে একটা নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা কবিতায় বাঁক ফেরার একটা লক্ষণ স্ফুটিত হয়েছিল মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসাধনায় - "আমার বিশ্বাস যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল ইসলামকে লইয়া আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় আরম্ভ।"[২] কবিতায় তাঁরা বিদ্রোহী - প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহ ছিল সমকালের বিরুদ্ধে। তবে তিনজনের বিদ্রোহের প্রকৃতি একরকম ছিল না - "যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং মোহিতলালের মধ্যে আমরা লক্ষ করিয়াছি যে 'বিদ্রোহী শয়তান'কে, তাহাকেই লক্ষ করি কাজি নজরুলের মধ্যেও। তফাৎ শুধু এইখানে - যতীন্দ্রনাথ যাঁহাকে শুধু বিদ্রূপ করিয়াছেন, কাজি তাঁহার বুকে সোজা হাতুড়ি মারিয়াছেন!"[৩] আরো এক সমালোচক বলেছেন, –"নজরুল ভবিষ্যতকে বিশ্বাস করেছিলেন। এটাই তাঁর চেতনার পরম ইতিবাচকতা। যতীন্দ্রনাথ অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন বর্তমানের দিকে। তাঁর কাঙ্ক্ষিত বাস্তবতাকে তিনি বর্তমান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বুঝে নিতে চেয়েছেন। মোহিতলালের কবি-পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে নিজ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের প্রেরণাক্ষেত্র বলে মেনে নিয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বাঙালির বাঙালিত্ব অনুধাবনের গৌরবময় কালখণ্ড সেটাই। এই তিনজন কবির কাছেই প্রত্যাখ্যেয় বলে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁদের তৎকাল। প্রতিহত কবিচিত্ত তাই ফ্যাশনের মুখোশ ছিঁড়তে চেয়েছে– যতীন্দ্রনাথ; সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহে বিস্ফারিত হতে চেয়েছেন, – নজরুল; অথবা দেহাধীন নিয়তিনির্দেশিত ট্র্যাজেডিকে মুখ্য করে তুলতে চেয়েছেন মোহিতলাল।"[৪] তাঁদের পথ ধরেই আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলন আরো গভীরতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় দশকে এসে। যার পশ্চাতে ইউরোপের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ইউরোপের নানা সাহিত্য

আন্দোলন ও ভাবাদর্শের আলোকে কবিতা লিখতে শুরু করেন এই সময়ের সমস্ত প্রধান কবিরা। ত্রিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আর তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসা। খুবই কঠিন সে সাধনা। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু সে কথাই বলেছেন-- বাঙালী কবির পক্ষে বিশ শতকের তৃতীয় - চতুর্থ দশকের প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সাধনা করেছিলেন এই সময়ের কবিরা। পশ্চিমী কবিদের জীবনাদর্শে অনেক বেশি আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা। এক্ষেত্রে এলিয়টের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। টি. এস. এলিয়টের 'The Waste Land' আধুনিক কাব্যজগতে দিক নির্দেশক এর ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় তথা সমগ্র বিশ্বসভ্যতাকে অনুর্বর পোড়ো জমি রূপে দেখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভয়াবহ করুণ দশা ত্রিশের দশকের আধুনিক বাঙালি কবিদেরও বিচলিত করেছিল। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'টপ্পা ও ঠুংড়ী' কবিতায় বিষ্ণু দে লিখেছেন-

"আসে আর পাশে সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার
মানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি
জানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি।"

("টপ্পা ও ঠুংড়ী", 'চোরাবালি')

অতএব ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম বিকাশে নগরজীবনের যে অন্তঃসারশূন্যতা এলিয়ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বিষ্ণু দে'র চিন্তায়ও তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে পুরুষকারের জয়ের স্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে তাঁর বিখ্যাত 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়–

"জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার–
মেরুচূড়া জনহীন -

হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে লোকনিন্দার দিন
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?”

(“ঘোড়সওয়ার”, ‘চোরাবালি’)

বিষ্ণু দে তাঁর সমকালীন নাগরিক জীবনের রুদ্ধশ্বাস যান্ত্রিকতাকে প্রতিকায়িত করেছেন ‘চোরাবালি’, ‘ফনিমনসা’ ইত্যাদির রূপকে। তিনি লিখেছেন –

“স্বপ্নেরা হল ফনিমনসার বন।”(“পঞ্চমুখ”,‘চোরাবালি’)

অনেকক্ষেত্রে পৌরাণিক রূপকল্পের সাহায্যেও তিনি সমকালীন জীবনচেতনাকে বোঝাতে চেয়েছেন। ‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘ক্রেসিডা’ কবিতায়,

“হেলেনের প্রেমে আকাশে ঝঞ্ঝার করতাল
দ্যুলোকভূলোক দিশাহারা দেবদেবী...
বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগন কোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন - গোধূলি ডুবে গেলোখর রক্তের কোলাহলে।”

(“ক্রেসিডা”, ‘চোরাবালি’)

এই কবিতার মূলে আছে গ্রীক মহাকাব্য খ্যাত ট্রয়লাস ও হেলেনের প্রেম। কিন্তু ট্রয়ের যুদ্ধে তাদের সেই প্রেমস্বপ্ন ভেঙে পড়ে। এই পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে আসলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের মানুষের দুর্বিষহ বিধ্বস্ত জীবনকে প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন। পুরাণের ট্রয়লাস ক্রেসিডার খুল্লতাত প্যান্ডারের সহানুভূতি পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের ট্রয়লাসের জীবনে সেই সুযোগটুকু নেই। সমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয় ব্যক্তিজীবনেও ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে, বিষ্ণু দে এখানে সেটাই বলতে চেয়েছেন। বিষ্ণু দে’র কবিতায় বিদেশি কবিতার ব্যাপক প্রভাব থাকলেও ‘পূর্বলেখ’ (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কবিতায় মার্কসীয় সমাজচেতনা ও ইতিহাসবোধ বিস্তৃত হল।

“সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুঠি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পনজ্ হাতে।” (“জন্মাষ্টমী”, ‘পূর্বলেখ’)

এছাড়া তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থদুটিতেও সাম্যবাদী আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো যখন লেখা হয় তখন একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের রাজনীতিও চরম থেকে চরমতর রূপ ধারণ করে।

তিরিশের দশকের কবিদের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নৈরাশ্যবোধ। যা থেকে আসে প্রচলিত মূল্যবোধের ভাঙন। ঈশ্বরে আর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। ঈশ্বর, পুরাণ অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র প্রতীক হিসাবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' কাব্যের 'উপসংহার' কবিতায় –

"তিলভান্ড সর্বনাশ: অতিদৈব বিশ্বের দেউল
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা
প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত কল্কি; কিংবদন্তি শিবের ত্রিশূল,
শূন্যকুম্ভ পুরাণ সংহিতা।" ("উপসংহার" 'সংবর্ত')

শিব সাধারণত মঙ্গলের দ্যোতক। পুরাণে আছে, সে অশিবের বিনাশ ঘটিয়ে নতুনকে সৃষ্টি করে। অশিব-বিনাশী কল্কিও আজ প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত। শিবের ত্রিশূলও আজ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে না। 'শিবের ত্রিশূল', 'কল্কি', 'শিব' এখানে ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে উঠে এসেছে। বিশ্বসমাজ ধীরে ধীরে কলুষিত হয়ে উঠছে। আর সেই অবক্ষয় রোধ করার মতো শক্তিধর আজ কেউ নেই। ঈশ্বরও আজ দেশের, সমাজের শান্তি বিনষ্টকারীদের হাতের পুতুল। কাজেই মানুষের অভিযোগ বা প্রার্থনা জানানোর মতো ঈশ্বরও আজ আর নেই। শিবও আজ অশিব রূপ ধারণ করেছে। 'উটপাখি' কবিতায় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের মানুষের অসহায়তাকে অসাধারণ চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'উটপাখি' কবিতায় উটপাখির প্রতীকে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষদের কথা ঘোষিত হয়েছে। উটপাখি যেমন ঝড়ের সম্ভাবনায় মরুভূমির বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, সমাজ ও সময়ের সংকটে বিধ্বস্ত মানুষও তেমনি কঠিন বাস্তবের কবল থেকে মুক্তি পেতে যতই মুখ লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করুক, আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। উটপাখির অনুষঙ্গে নৈরাশ্যপীড়িত দিকভ্রান্ত মানুষের কথা আসলে বলতে চেয়েছেন কবি–

"কোথায় লুকাবে? ধুধু করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।

আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক,নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে আর কত?" ("উটপাখি", 'ক্রন্দসী')

এখানে মরুভূমি আসলে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবক্ষয়ী সমাজের প্রতীক। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা যত বেশি পাশ্চাত্য অনুগামী, একইসঙ্গে ততখানিই রবীন্দ্র-রোমান্টিকতার বিরোধী। সুধীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি নিজেই বলেছেন, "মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট।"[৫] 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন – "ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজছাড়া একমাত্র ব্রাউনিং-ই বুঝেছিলেন যে যদি বাঁচতে চায়, তবে ধ্বংসাবশিষ্ট পৈত্রিক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না; তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায় খাওয়া শিরোপা, মরচে – পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত।"[৬]

বিশ্বসভ্যতার ঘনান্ধকার ও পঙ্কিল রূপটিকে জীবনানন্দ দাশও প্রত্যক্ষ করেছেন গভীরভাবে এবং তার প্রকাশ করেছেন এইভাবে –

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।"("সুচেতনা",'বনলতা সেন')

সমাজ ও ইতিহাসের তাৎপর্যে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালটি অদ্ভুত এক অন্ধকারাচ্ছন্নতায়মগ্ন হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতায়, আর্থিক পতনে, মুদ্রাস্ফীতি ও কালো-বাজারিতে, জীবনের সার্বিক মূল্যবোধের পতনে ঘনিয়ে এসেছিল সেই অন্ধকার। সেই পঙ্কিল পরিস্থিতিতে কবি লিখেছেন,

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এপৃথিবীতে আজ।"
("অদ্ভুত আঁধার এক", 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

কবিতার এই বক্তব্যে সমাজ ও সময় অনুধ্যানী কবির সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিশ্বাসের জগৎটি ছিল– "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। এই সমস্ত চেতনা নিয়েই মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য।"[৭]

আগেই বলেছি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন। জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটসের মিল সবচেয়ে বেশি। জীবনানন্দের

কবিতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, পাখিজীবন ও মানবজীবনকে পরিপূরক অবস্থানে বিন্যস্ত করে জীবনবোধের স্বরূপ গড়ে তোলা। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, মানব-জীবন এক অতৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে কীভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। -

"চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের গাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা
যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের - মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।" ("আট বছর আগের একদিন", 'মহাপৃথিবী')

এইভাবে পাখিজীবনের প্রতীকে মানবজীবনের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটসের কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'হায় চিল' কবিতায় চিলের কান্নার সুরে কবিজীবনের যে অপরিসীম শূন্যতা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে তা ইয়েটসের 'He Reproves the Curlew' -এর সমরূপ। তবে আয়ারল্যান্ডবাসী ইয়েটস স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, জীবনানন্দ সহ তিরিশের দশকের বাংলার অন্যান্য আধুনিক কবিদের কবিতার পটভূমি হিসাবে স্বদেশের রাজনৈতিক সংকট তেমনভাবে স্থান পায়নি।

এই ধারার অপর এক অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকার পাতায়। কিন্তু ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর কবিতা প্রধানত রবীন্দ্রানুসরণ। উত্তর-তিরিশে তাঁর কাব্যের পালাবদল ঘটল। ১৯৩৫ – এ 'খসড়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবিসংবাদিতভাবে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠলেন।[৮]

সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। কবি ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছেন –

বোমা– ভাঙা অবসান। শহরে বিদিক সোজা পরে
পদশব্দ শূন্য পাশে গলির জগতে
চূর্ণ চূর্ণ বেলা। তারই মধ্যে ম্লান হাসিমুখ
মেয়ে জানলার কাঁচে একান্তে উৎসুক
চুল আঁচরায় যত্ন করে, ইটস্তূপে ছেলে শুয়ে;
প্রাণ পুনর্বার চলে অগণ্য মৃত্যুকে ছুঁয়ে– ছুঁয়ে।

("ডুসেলডর্ফ",'পারাপার')

কবির প্রতিবাদী উচ্চারণ এখানে শান্ত ও গভীর। প্রতিবাদের মধ্যে তাঁর কবিতায় সর্বদাই এক প্রশান্তির ভাব কাজ করে থাকে। কারণ তিনি আশাবাদী। কবি লিখেছেন –

"ধান করো ধান হবে, ধূলোর সংসারে এই মাটি।
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।"

তবে তিনের দশকের বাঙালি কবিরা সময় সচেতন কবি হলেও, তাঁদের কবিতায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ ঘটলেও, তাঁদের কবিতায় স্বদেশের সংকটের চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এবার আসব চারের দশকের কবিদের আলোচনায়। আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক ছিল ভারতের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম উত্তাল মুহূর্ত। একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন, সেইসঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ - সবমিলিয়ে চারের দশক হয়ে উঠেছিল জাতির জীবনের অভিশাপ। ব্যভিচারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ব্যক্তি ও সমাজ। আর সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই এই সময়ের বহু কবি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তাঁদের চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমান অধিকার প্রদান। সবলের সমস্তরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে চেয়েছিলেন এই সময়ের প্রধান কবিরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'মা, তুমি কান্দো' কবিতায় লিখেছেন -

"অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন।" ('মা, তুমি কান্দো', 'অগ্নিকোণ')

এখানে আগুন বলতে বহুদিন ধরে সমাজের অন্ধকারকে বহন করে আসা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে শক্তির দ্বারা তারা সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে চায়। সমস্তরকম শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ইন্ধন জোগায় এই ভাবাদর্শ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কবিরা আন্তর্জাতিক চেতনাকে আধুনিকতার মানদণ্ড হিসেবে দেখেছিলেন কিন্তু চারের দশকে এসে এই ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে। তিনের দশকের কবিদের মতোই চারের দশকের কবিদের মূল উপজীব্য কালচেতনা। কিন্তু তাঁরা স্বদেশের রাজনৈতিক সংকটকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস প্রমুখ কবিরা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

এবং তাঁদের কবিতায়ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় 'কম্যুনিজ়ম্'কেই আদর্শ করতে চেয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় -

"কৃষক, মজুর। তোমরা শরণ
জানি, আজ নেই অন্য গতি;
যে - পথে আসবে লাল-প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।"

("কানামাছির গান", 'পদাতিক')

অথবা,

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা -
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"

("সকলের গান", 'পদাতিক')

'লাল প্রত্যুষ', 'লাল উল্কি' শব্দগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর বামপন্থী মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বিশ্বাস, সময়ের অন্ধকার একদিন দূর হবেই। তাঁর সেইরূপ এক আশার বাণী প্রকটিত হয়ে উঠেছে এই কবিতায় -

"তুমি আলো, আমি আঁধারের আলবেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।" ("লাল টুকটুকে",'ফুল ফুটুক')

আশাবাদী কবি অন্ধকারকেই অস্ত্র বানাতে চেয়েছেন আলোর দিন ফোটাতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যক্ষেত্রে যখন আবির্ভূত হচ্ছেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বামপন্থী আন্দোলনের প্রচারে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় 'পদাতিক' নিয়ে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা পরে সংকলিত হয়েছে 'কালের পুতুল' গ্রন্থে। সেই গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "...এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেচি, যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।"[৭] কবির বিশ্বাস, কালের সংকট থেকে মুক্তি পেতে সংগ্রামই একমাত্র পথ -

"...শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা।
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না –
পরো - পরো যুদ্ধের সজ্জা।"("মে দিনের কবিতা",'পদাতিক')
তাঁর অগ্রজ কবি সমর সেনও বিশ্বাস করতেন -
"লক্ষ লাল সৈন্য বলিষ্ঠ জয়গানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়
লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,..."("খোলাচিঠি",'খোলা চিঠি')

কবির এইরূপ উক্তি মার্কসবাদের প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থাকে প্রকটিত করে তুলেছে। তাঁর বিশ্বাস, এই মার্কসবাদের পথেই সমাজ ও সভ্যতা একদিন মুক্তির উপায় খুঁজে পাবে, সমস্ত রকম বৈষম্য দূর হবে সমাজ থেকে। তাঁর এইরূপ ভাবনারই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে 'নাগরিক' কবিতায়,

"কিছুক্ষণ পরে হাওয়ায় জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের দ্বীপ থেকে -
সেখানে নীল জল, ফেনাস ধূসর সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন –"
("নাগরিক",'কয়েকটি কবিতা')

সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'মে দিনের কবিতা'য় যেমন লিখেছিলেন 'গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে', অন্যদিকে কবি দিনেশ দাস তাঁর 'কাস্তে' কবিতায় লিখলেন –

"বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।"

পুঁজিবাদী শক্তির আবির্ভাবে, সাধারণ নাগরিকের পুঁজিবাদী শক্তির আবির্ভাবে সাধারণ নাগরিকের জীবনে যে করুণ অসহায়তা নেমে আসে, তার একরূপ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে -

"প্রজাপুঞ্জের স্বপ্নভঙ্গ।
বণিক প্রভু চোখ রাঙায়,
কারখানায় বন্ধ কাজ।"

("ইতিহাস আমাদের দিক নেয়", 'পদাতিক')

পুঁজিবাদ-বিরোধী মনোভাব থেকে কবি দিনেশ দাস লিখছেন তাঁর 'কাস্তে' কবিতায়,

"সারাদিন পরে স্বর্ণ সিংহ লৌহগুহায় ঢোকে
ক্লান্ত লেজার আসিছে বন্ধ হয়ে,
বাইরে এখন বৈকালী ঝড়ে অজস্র সোনা ওড়ে
সোনালী বিকেল স্বর্ণের সমারোহে।
বাহির পৃথিবী আমাদের আর হানেনাকো ইঙ্গিত
বণিক যুগের আমরা পাহারাদার,..."

মানুষের অসহায়তার কথা বলতে গিয়ে মানুষের ক্ষুধা - হাহাকারের দিকটিও বেশ প্রকটিত হয়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রবাদী কবিদের লেখনীতে। দেশজুড়ে অন্নাভাব, দু'মুঠো ভাতের জন্য মানুষ কাঁদছে। ব্যথিত হৃদয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন -

"আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায় সারারাত।"

("আশ্চর্য ভাতের গন্ধ", 'মুখে যদি রক্ত ওঠে')

'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় সমকালীন ভারতবর্ষের যেরূপ অঙ্কণ করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেখানে মানুষের করুণ হাহাকারের দিকটিই বড়ো হয়ে উঠেছে –

"আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারা দিন রৌদে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায় শীতে।"

("আমার ভারতবর্ষ", 'মহাদেবের দুয়ার')

একজন সমাজতন্ত্রবাদী কবি হিসাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমগ্র বিশ্বসভ্যতার বুভুক্ষু মানুষের হাহাকারের ছবি তুলে ধরলেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলত স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি। কবির স্বীকারোক্তি –

“রক্তস্নাত তবু মাগো জন্মে জন্মে ফিরে আসি তোমারই কুটিরে।”

(“আমার মা-কে”,‘লখিন্দর’)

প্রকৃত সমাজমনস্ক ও কাল-সচেতন কবিরা কখনোই স্বদেশ-ভাবনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। তিনের দশকের কবিদের পার্থক্য এখানেই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারের দশকের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কসীয় চিন্তাচেতনার আলোকে কবিতা লিখতে শুরু করলেও, পরবর্তী দশকগুলিতে পৌঁছে তাঁর লেখনীর ভাষা আরো ক্ষুরধার হতে শুরু করল। ষাট, সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগুন সারাদেশকে যখন একরকমে অস্থির করে তুলেছে, সেই অগ্নিগর্ভ প্রেক্ষাপটে কবি লিখেছেন –

“গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে
এই না হলে শাসন?
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি,
বাংলা বন্ধ গুলির মুখে
উড়িয়ে দেওয়া চাই!”

(“গুলি চলছে”, ‘মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে’)

চল্লিশের দশকের অপর এক সমাজ-রাজনীতিমনস্ক, সাম্যবাদী মানসিকতাসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর কবিতার পরতে পরতে প্রকট হয়ে উঠেছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা,

“বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্তপণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে”

(“ভবিষ্যতে”, ‘অপ্রচলিত রচনা’)

বিশ্বের সর্বহারা বুভুক্ষু মানুষের দারিদ্র্যের নির্মমতাকে বোঝাতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন,

“ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”

(“হে মহাজীবন”, ‘ছাড়পত্র’)

ক্ষুধা-দারিদ্র্য যেখানে মুখ্য, সেখানে একজন ক্ষুধার্তের কাছে পূর্ণিমার চাঁদকেও যেন ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়। পেটে ক্ষুধা নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনোই কল্পনা জাগেনা, কবিতাও সৃষ্টি হয় না। একজন ক্ষুধিত মানুষের কাছে এসব কিছু মূল্যহীন। তাই তিনি চান মানুষের জীবন থেকে সমস্তরকম অন্ধকার দূর করতে। পৃথিবীকে অন্ধকার-মুক্ত করতে মহামানবের আহ্বান করেছেন তিনি তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যের 'বোধন' কবিতায়।

প্রত্যক্ষ সাম্যবাদী ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখব অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' কবিতায়। তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র মার্কসবাদের পথেই পুঁজিবাদী শক্তিকে নির্মূল করা সম্ভব।

"এখন প্রহর গোনো।
উপসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষেরা হুঁশিয়ার!
লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার।"

("লাল ইস্তাহার", 'মেঘের মিছিল')

দীর্ঘকাল ধরে শোষিত-বঞ্চিত যারা, তাদের মিলিত শক্তিই পারে সমস্ত রকম শোষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সেই বিশ্বাস থেকেই কবি লিখলেন -

"বিজয়ী রথের চাকা
থমকাবে লালচে কাদায়,
সামনে দাঁড়াবে খাড়া মাংসের প্রাচীর।
জানুক জানুক ওরা মানুষের অসম সাহস।"

("মাটির খবর",'প্রান্তরেখা')

এই চারের দশকেই পথ চলা শুরু করেছিলেন আরো এক বিশিষ্ট কবি শিল্পী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চারের দশকের অন্যান্য প্রধান কবিদের মতোই তাঁর কবিতাও ছিল কালচেতনা-সমৃদ্ধ। সমকালীন সমাজজীবনের ছবি অঙ্কণে তাঁর দক্ষতা অসামান্য। স্বয়ং কবির উক্তি – "আমি আমার সময় ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।"[১০] তবে এই সময়ের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক কবিতা লেখেননি

এবং ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন রাজনৈতিক দলের থেকে বহুদূরে। কবি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন – "...আমার ভিতরে কোনো দল নেই। আমি মনে করি, একজন কবির কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লেখানো উচিত নয়। কবি ইস্যুভিত্তিক সমর্থন করতেই পারেন। তবে সাম্যবাদে আমার আস্থা আছে। কিন্তু তার জন্য দল করতে হবে তার কোনো মানে নেই।"[১১] বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সমাজ-রাজনীতি যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা কবিকে কীভাবে বিচলিত করেছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'চল্লিশের দিনগুলি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিতে। এই কবিতায় কবি ঊনচল্লিশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের অগাষ্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ইত্যাদির বিধ্বংসী রূপকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চিঠিপত্র", একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-২৯৫

২. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়', "প্রাক্-কথন", সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা - ৫

৩. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়", সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা – ১৬২

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বলয় অতিক্রমণ প্রয়াসে: মোহিতলাল",'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮ জানুয়ারি, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা – ১১০, ১১১

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংবর্ত', "মুখবন্ধ", সিগনেট প্রেস, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা – ১০

৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "কাব্যের মুক্তি", 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১০, পৃষ্ঠা– ১৭

৭. জীবনানন্দ দাশ, "উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য", 'কবিতার কথা', নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ২৯

৮. দীপ্তি ত্রিপাঠী, "অমিয় চক্রবর্তী", 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ২৭৫

৯. বুদ্ধদেব বসু, "সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক", 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯ জানুয়ারি, নিউ এজ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬,পৃষ্ঠা- ৮১

১০. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "কবিতা ভাবনা", 'এবং মুশায়েরা', শারদীয় ১৪০৮, পৃষ্ঠা- ১৭

১১. কল্যাণ মণ্ডল, "সাক্ষাৎকার : কবিতাই আমার মাতৃভাষা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী", 'কোরক', বইমেলা ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা– ১৮০, ১৮১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড'। প্রকাশক - শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ । কলকাতা । মে ১৯৮২।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্র রচনাবলী: তৃতীয় খণ্ড'। প্রকাশক - শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ। কলকাতা। নভেম্বর ১৯৮৩।

৩. বিষ্ণু দে। 'কবিতাসমগ্র'। আনন্দ পাবলিশার্স । কলকাতা । ১৮ জুলাই ১৯৫৯ । প্রথম সংস্করণ।

৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । 'কাব্য সমগ্র' । দে'জপাবলিশিং। কলকাতা । ডিসেম্বর ১৯৬০। প্রথম প্রকাশ।

৫. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'নির্বাচিত কবিতা'। দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা । জানুয়ারি ২০০০। প্রথম দে'জ সংস্করণ।

৬. দিনেশ দাস । 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা । জুন ২০১৪ । পুনর্মুদ্রণ। প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৯।

৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায় । 'কাব্যসংগ্রহ ১' । বিশ্ববাণীপ্রকাশনী । কলকাতা । ১৯৫৭। প্রথম প্রকাশ।

৮. সমর সেন । 'সমর সেনের কবিতা' । আনন্দ পাবলিশিং । কলকাতা । মে ২০১৯ । চতুর্থ মুদ্রণ।

৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'সুকান্ত সমগ্র'। সারস্বত লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৪০২ আশ্বিন।

১০. জীবনানন্দদাশ। 'জীবনানন্দদাশের গ্রন্থিত - অগ্রন্থিত কবিতা সমগ্র' । সাহিত্য বিকাশ । ঢাকা । ফেব্রুয়ারি ২০১০ । দ্বিতীয় মুদ্রণ । প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 'চিঠিপত্র' । একাদশ খণ্ড । বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ । কলকাতা । ১৯৭৪।

১২. শশীভূষণ দাশগুপ্ত । 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়'। সুপ্রিম পাবলিশার্স । কলকাতা । বৈশাখ ১৪১৭বঙ্গাব্দ । দ্বিতীয় মুদ্রণ।

১৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।'বাংলা কবিতার কালান্তর' । দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা। ২০১৮ জানুয়ারি । চতুর্থ সংস্করণ।

১৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । 'সংবর্ত' । সিগনেট প্রেস । কলকাতা । জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ । প্রথম সংস্করণ।

১৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ' । দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা। জুলাই ২০১০।

১৬. জীবনানন্দ দাশ । 'কবিতার কথা' । নিউ স্ক্রিপ্ট । কলকাতা । ডিসেম্বর ২০১৮। চতুর্থ মুদ্রণ।

১৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী। 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' । দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা । জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বঙ্গাব্দ। পুনর্মুদ্রণ।

১৮. বুদ্ধদেব বসু। 'কালের পুতুল' । নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা। ১৯৫৯ জানুয়ারি । নিউ এজ সংস্করণ । প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬।

১৯. সম্পা : সুবল সামন্ত। 'এবং মুশায়েরা'। কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা। শারদীয় ১৪০৮।

২০. সম্পা : তাপস ভৌমিক । 'কোরক' । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা । বইমেলা ১৪১৮।

বাংলায় ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৯৩): ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

কালীকৃষ্ণ সূত্রধর
ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ছিল জনগণের আয়ের প্রধান উৎস। এই ধারা ব্রিটিশ আমলেও বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে কৃষিকেই কেন্দ্র করেই ভারতের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনকালে ভারতীয় অর্থনীতি মূলত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সেই সময় বাংলাদেশ ছিল এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর। বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ছিল অত্যন্ত ধনী। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসনের অভিঘাতে ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন করে। এর ফলে ইংরেজদের সামনে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ তৎকালীন কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা তথা ভারতের কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ধারণা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল আমলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাটিই বজায় রেখেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানি যাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়েছিল, তারা কোম্পানিকে কম রাজস্ব দিয়ে বাকিটা নিজেরা কারায়ত্ব করতে থাকে। ফলে কোম্পানির অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেই সময় কোম্পানি ভারতের অন্য রাজ্যগুলি অধিকারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের জন্য কোম্পানি ভূমিরাজস্বের উপর জোর দেয়। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালীন বাংলার গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ, ভেরেলেস্ট ও কাটিয়ারের শাসনকালে এদেশে একটি নতুন জমি বন্দোবস্ত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একের পর এক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। কিন্তু ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য সমাধান তারা করতে পারেনি। শেষ অবধি ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ভূমি বন্দোবস্তকে একটি স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।*

সূচকশব্দ: *দেওয়ানী, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, বাংলা*

প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা:- বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী অধিকার অর্জনের পরে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানী সরাসরি গ্রহণ না করে রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানী মনোনীত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে এই দায়িত্বভার অর্পন করেন। রেজা খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর। কোম্পানি ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য আমিনদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। যারা সব থেকে বেশী পরিমাণ রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিত তারাই আমলা হিসাবে বহাল থাকার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেত। এইভাবে আমিনদারী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় জামিদারদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাড়াল। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গভর্নর জেনারেল ভেরেলেস্ট **১৭৬৯** সালে কোম্পানীর কিছু কর্মচারীকে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ করে। ভেরেলেস্টের পর বাংলার গভর্নর হন কার্টিয়ার। তার শাসনকাল (**১৭৬৯-১৭৭২**) বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি "আমিলদারী ব্যবস্থার" অবসান ঘটায়। কিন্তু সুপারভাইজারদের নিয়োগের অবস্থার কোন উন্নতি হল না। সেইজন্য রাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য **১৭৭০** সালে জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদে ও পাটনায় এবং **১৭৭১** সালে এপ্রিল মাসে কলকাতায় "রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ" ("Comptrolling Council Revenue") গঠিত করেন। এইভাবে কোম্পানী সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেবার জন্য তৈরি হতে থাকে। আবার এই সময় **১৭৭০** সালে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক সমাজ জীবনে নেমে আসে হতাশা। এই অরাজক পরিস্থিতির অবসানকল্পে এবং সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর পরিচালক সভা (Court of Directors) কলকাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। এইভাবে দ্বৈতশাসনের অবসান হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমি রাজস্ব নীতি:- ১৭৭২ সালে ২৮ শে এপ্রিল কোম্পানির পরিচালক সভা (Court of Directors) ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল ছিল মূলত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ।

পাঁচশালা বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৭৭):- ভূমিরাজস্বের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি রেজা খাঁ ও সিতার রায়কে পদচ্যুত করলেন। গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে তিনি একটি রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) গঠন করেন। এই কমিটির উপর রাজস্ব ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব দেন। সরকারি কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত

করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের চারজন সদস্যকে নিয়ে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) গঠন করেন। এই কমিটি জেলায় জেলায় গিয়ে নিলামের মাধ্যমে ইজারাদারদের জমি বন্দোবস্ত দেয়। যে ইজারাদার কোম্পানিকে সর্বোচ্চ কর দিতে রাজি হয় তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা 'ইজারাদারি ব্যবস্থা' বা 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল ইংরেজ কালেক্টরদের হাতে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। তিনি সুপারভাইসরের পদ তুলে দেন। এই পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রথম কার্যকারী করা হয় নদীয়া জেলায়। পরে তা অন্যান্য জেলায় প্রবর্তন করা হয়।

'পাঁচশালা বন্দোবস্তের' দুর্বলতা:- কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছিল। 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' বা 'ইজারাদারি ব্যবস্থা'র প্রচলনের ফলে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। কারণ জমি থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্য রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশী হারে ইজারাদাররা জমি নিলামে ডেকে নিত। ফলে কৃষকদের ওপর খাজনার বোঝা বেড়ে যায়। এছাড়া, ইজারদাররা চাষবাসের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব খাজনা আদায়ের চেষ্টা করত। অনেক ইজারাদার বেশী রাজস্ব আদায় করার জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। নব নিযুক্ত ইজারাদাররা বহু ক্ষেত্রেই কোম্পানিকে ঠিক মত রাজস্ব জমা দিত না। ফলে কোম্পানীর রাজস্ব বাকি পড়ে। অনেক সময় ইজারাদাররা রায়তদের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায় করে কম টাকার রসিদ দিত। ফিলিপ ফ্রান্সিস 'ইজারাদারি ব্যবস্থা'র সমালোচনা করে বলেন, "যে সরকারের লক্ষ্য হল সব থেকে বেশী রাজস্ব আদায় করা, সে সরকার অপরের জবরদস্তিমূলক কর আদায় থেকে রায়তকে রক্ষা করতে পারে না"। সুতরাং এই ব্যবস্থায় জমিদার, জোতদার অথচ, কৃষক সকলেই অসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করত, এ ব্যবস্থায় কোম্পানীকেও রাজস্ব খাতে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হত।

আমিনী কমিশন গঠন:- পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৭৭৬ সালে 'আমিনি কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ভূ-সম্পত্তি জরিপ (যাকে বলা হয় 'আমিনি') করার জন্য একটি রাজস্ব কমিশন গঠন এবং পরবর্তী বন্দোবস্তের জন্য ভূমির যথাযথ রাজস্ব নির্ণয়ের সুপারিশ করেন। চুক্তিভিত্তিক দুজন কর্মকর্তা এবং একজন স্থানীয় দেওয়ান নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। চুক্তিভিত্তিক দুই

কর্মকর্তা ডেভিড অ্যান্ডারসন এবং জর্জ বোগলে কমিশনার হিসেবে এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং পেশকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ রাজস্ব নির্ণয়ে একটি স্থিরমূল্য হিসাব নির্ধারণের বিষয়ে একমত হন, যাতে নমুনামাফিক কিছু কাটছাঁটের পর তা স্থায়ী রাজস্ব কর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে কমিশনকে বাস্তবসম্মত কর্ম পরামর্শ প্রণয়ন করতে বলা হয়।

আমিনি কমিশন পাঁচটি সুপারিশ ও মন্তব্য পেশ করে, যথা- (১) জমিদারদের অনাদায়ি কর পরিশোধে অনীহার কারণে কর মুকুফ করা হবে হবে না; (২) একটি রাজস্ব করের অবসান হলে আরেকটি রাজস্ব কর সৃষ্টি হয়; ফলত কর ছাঁটাই কিংবা কর বিলোপ কোনোটাই রায়তদের জন্য সুফলদায়ক ছিল না; (৩) নদী, নতুন হাট-বাজার পার্শ্ববর্তী জমিদারের হাতে বেদখল হওয়ার অজুহাতে কর হ্রাসের দাবি সমর্থনযোগ্য নয়; (৪) স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতার সুযোগে জমিদাররা অকল্পনীয় পরিমাণে জমিজমা আলাদা করে নিয়েছে; (৫) কোম্পানির দেওনিয়ার ধারণার চেয়ে কর পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

‘একশালা বন্দোবস্ত’:- ১৭৭৭ সালে পাঁচশালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হলে হেস্টিংস এটি রদ করে ‘একশালা বন্দোবস্ত’ চালু করেন। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইজারাদারদের বাদ দিয়ে পুরাতন জমিদারদেরই প্রতি বৎসর তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার নির্দেশ করা হয়। **১৭৭৭** সালে থেকে **১৭৮৯** সালে অবধি একশালা বন্দোবস্ত চালু থাকে। এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা কৃষক ও কোম্পানী উভয়েরই স্বার্থবিরোধী ছিল। যে জমিদার সর্বোচ্চ হারে খাজনা দিতে রাজি থাকতেন, তাকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হত। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পুনরায় জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এরফলে প্রজারা জমিদারদের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হত। আবার অনেক সময় জমিদার কোম্পানীকে প্রতিশ্রুত রাজস্ব না দিতে পেরে জমিজমা ছেড়ে পালিয়ে যেত। এর ফলে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হত। উপরন্তু বাৎসরিক আয় সম্বন্ধেও কোম্পানীর পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

‘পিটের ভারত শাসন আইন’,১৭৮৪:- একশালা বন্দোবস্ত চালু করার সময় বোঝা গিয়েছিল যে, কোম্পানী এই ব্যবস্থাকে এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। কোম্পানীর উদ্দেশ্যে ছিল উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও জ্ঞান অর্জন করে রাজস্ব সমস্যার একটি চুড়ান্ত সমাধান করা। কোম্পানীর পরিচালক সভা (Court of

Directors) চাইছিলেন ভূমি রাজস্ব সমস্যার পাকাপাকি সমাধান। ১৭৮৩ সালে ইংল্যান্ডের পরিচালক সভা এই অবস্থার অবসানকল্পে একটি স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত করার সুপারিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সালে **'পিটের ভারত শাসন আইন'** (Pitts India Act, 1784) এ একটি গ্রহণযোগ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেলারেল রুপে বাংলায় এলেন। কর্ণওয়ালিসের নামের সঙ্গে অতোপ্রোতভাবে জড়িত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সূদুরপ্রসারী সংস্কার হল বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনে একটি পটভূমি রয়েছে।

জন শোর-জেমস গ্রান্ট বিতর্ক:- কোম্পানি ১৭৮৬ সালে থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত নানা অনুসন্ধান চালান। ১৭৮৬ থেকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই তিন বছর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে তীব্র বিতর্ক চলে। রাজস্ব সচিব স্যার জন শোর, দলিল বিভাগের সচিব জেমস গ্রান্ট এবং স্বয়ং কর্ণওয়ালিস তর্ক-বির্তকে অংশগ্রহণ করেন। কাদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত করা উচিত, সরকারী রাজস্বের পরিমান কি হবে এবং ভূমি বন্দোবস্তের সময়সীমাই বা কি হবে এইসব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক চলে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্নে জন শোর ও জেমস গ্রান্ট বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। ১৭৮৯ সালে এক স্মারকলিপিতে স্যার জন শোর এই অভিমত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু মুঘল আমলে জমিদারই ছিলেন জমির মালিক, অতএব জমিদারদের সাথে জমির বন্দোবস্ত করা সমীচীন। জেমস গ্রান্ট রায়তদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্তের অনুকূলে মত পোষন করেন কারণ তার মতে মুঘল আমলে জমিদাররা ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহকারী, রাষ্ট্র ছিল জমির মালিক। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে জন শোর-এর অভিমত ছিল যেহেতু মুঘল আমলে নির্ধারিত রাজস্ব ও প্রদেয় রাজস্বের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকত, অতএব তার মতে, ১৭৮৭ সালকে আদায়কৃত রাজস্বের ভিত্তিতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত। গ্রান্টের মতে, ১৭৬৫ সালের মুঘল আমলের যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমিরাজস্ব ছিল সেটিকে বাৎসরিক রাজস্ব করা উচিত। কর্ণওয়ালিস গ্রান্টের সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করেন। তিনি শোরের সঙ্গে একমত হন যে, জমিদারই জমির মালিক। রাজস্বের পরিমাণ ধার্যের ক্ষেত্রে তিনি শোরের মতকেই সমর্থন করেন। তবে শোর নির্ধারিত ১৭৮৭ সালকে ভিত্তি বৎসর না ধরে ১৭৮৯ সালকে তিনি ভিত্তি বৎসর হিসেবে স্থির করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনই চালু করা উচিত কিনা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শোর ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে তীব্র

বিতর্ক শুরু হয়। শোরের এই ব্যাপারে অভিমত ছিল যে, যেহেতু ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কোম্পানী পর্যাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। অতএব তরিঘরি না করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা একেবারেই সমীচীন হবে না। কোন কোন ভুলভ্রান্তি হলে সেটি সংশোধন করার অবকাশ থাকবে না। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এক্ষেত্রে শোরের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ডঃ বিনয় চৌধুরী 'The Cambridge Economic History of India, Vol II' গ্রন্থে কর্ণওয়ালিসের চিঠিপত্র, ডেসপ্যাচ ও স্বারক লিপি পর্যালোচনা করে এইমত প্রকাশ করেছেন যে, (১) কর্ণওয়ালিস কৃষির অবনতি দেখে শঙ্কিত হন, (২) তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্যে জমিদার জমিতে স্বত্বদান করলে কোম্পানীর পক্ষে জমিদারদের কাছ থেকে নিয়মিত নির্দিষ্টহারে রাজস্ব পাওয়া সম্ভব হবে, (৩) জমি রাজস্ব নিয়মিত আদায় হলে বাংলায় কোম্পানীর বিনিয়োগ পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া তিনি মনে করতেন যে, জমিতে জমিদারদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষির উন্নতির জন্য জমিদাররা কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানী রাজস্ব সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার মতে সেটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় কৃষক স্বার্থ রক্ষিত হবে।

দশশালা বন্দোবস্ত:- পরিচালক সভার অনুমোদন পাওয়ার পর কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যার 'দশশালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। এই সঙ্গে তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে, পরিচালক সভার অনুমতি পাওয়া গেলে এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন:- Court of Directors-এর অনুমোদনক্রমে ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ দশশালা বন্দোবস্তকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এ পরিণত করা হয়। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পেছনে কোম্পানীর আসল উদ্দেশ্য ছিল—(১) এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কোম্পানী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে খাজনা পাবে এবং এর ফলে কোম্পানী তাদের আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে, (২) জমিদাররা জমির স্থায়ীস্বত্ব পেলে তারা জমিতে বিনিয়োগ করবে। ফলে কোম্পানীর লাভ হবে। (৩) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে রাজকীয় অনুগ্রহপুষ্ট এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠবে, যারা ব্রিটিশ সরকারের প্রধান সমর্থক হিসাবে কাজ করবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, জমিদাররা বংশানুক্রমিকভাবে জমির স্বত্ব ভোগ করবে। নির্দিষ্ট তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব জমা দিয়ে জমিদারী

বাজেয়াপ্তের কোন প্রশ্নই থাকবে না। আদায়ীকৃত রাজস্বের ৯০ ভাগ পাবে সরকার আর জমিদাররা পাবে দশ ভাগ মাত্র। ১৭৮৯-৯০ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে বাংলার ভূমিরাজস্ব মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের অবদান:- চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান ঘটে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেও তিনি কিন্তু এর উদ্ভাবক ছিলেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার আগে থেকেই কোম্পানির কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাসী স্কটিশ চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার ডাও ১৭৭০ সালে প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। তিনি মনে করতেন যে, বাংলার উন্নতির জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উন্নত ও গতিশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। ডঃ রণজিৎ গুহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার পেছনে ফরাসি 'ফিজিওক্রাট' দর্শনের প্রভাবের কথা বলেছেন। 'ফিজিওক্রাট' দর্শনে বিশ্বাসী হেনরী পেট্রুল্লো ১৭৭২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। এরপর টমাস ল, ফিলিপ ডেকারস, রিচার্ড বারওয়েল, স্যামুয়েল মিডিলটন প্রমুখ এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন। হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্য ফিজিওক্রাট দর্শনে বিশ্বাসী ফিলিপ ফ্রান্সিস এ ব্যাপারে সবচেয়ে জোরদার বক্তব্য রাখেন। ১৭৭৬ সালে সরকারের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে তিনি চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষে জোর সুপারিশ করেন। ঐতিহাসিক জেমস মিল এর মতে ফিলিপ ফ্রান্সিস-ই হলেন বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত সংগঠক। ১৭৮৪ সালে 'পিটের ভারত শাসন আইন'-এ এই ব্যবস্থার পক্ষে সুপারিশ করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই সুপারিশের পশ্চাতে ফিলিপ ফ্রান্সিসের স্মারকলিপির প্রভাব কাজ করেছিল। ১৭৮৬ সালে কোম্পানির পরিচালক সভা এক নির্দেশনামায় বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে রায় দেয়। তাই বলা যায় যে, বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হল কয়েক দশক ধরে চলে আসা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণতি মাত্র। কর্ণওয়ালিস কখনোই এই ব্যবস্থার উদ্ভাবক নন। তবে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে, "সীমিত অর্থে কর্ণওয়ালিসকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক বলা যায়"। স্মিথ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে লর্ড কর্ণওয়ালিস এক বিপ্লব ঘটান। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে, "১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ভারতে ব্রিটিশ জাতি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ও সফল পদক্ষেপ।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল:- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তবুও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদরা এ ব্যাপারে নানা মত পোষণ করেছেন। মার্শম্যান-এর মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল একটি বলিষ্ঠ, সাহসিকতাপূর্ণ ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ। অন্যদিকে হোমস মতে, এই বন্দোবস্ত ছিল একটি মারাত্মক ভুল। এডওয়ার্ড থটন বলেন যে, চরম অজ্ঞতা থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়। ব্যাডেন পাওয়েল বলেন যে, কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক প্রত্যাশাকে ধ্বংস করে এমন কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যা ছিল অচিন্তনীয়। বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল অপেক্ষা কুফলই ছিল বেশি।

বাংলার কৃষিসমাজে এর প্রভাব:- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জমিদার ও কৃষক শ্রেণী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল ছিল জমিদার শ্রেণীর চরিত্রগত পরিবর্তন। রাজস্বের হার অতিরিক্ত হওয়ায় এবং সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার দরুণ অনেকের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এই আইনের ফলে প্রথম তিন দশক বাংলায় প্রায় অর্ধেক জমিদারীর হাত বদল হয়। এদের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে নতুন এক জমিদার শ্রেণী। ফলে নতুন এক সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি কুফল ছিল মধ্যস্বত্ব প্রথার উৎপত্তি। পুরাতন ও প্রতিষ্টিত জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের সেরূপ ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল কিন্তু পরগাছা এই মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সঙ্গে প্রজাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক রইল না। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের শোষণ করে নিজেদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এদের অত্যাচারে বাংলার কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। জমিদাররা কৃষকদের কৃষি ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে অপারক হওয়ায় মহাজন শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটল। যাদের দেনা শোধ করতে কৃষক সম্প্রদায় সর্বশান্ত হত।

এই বন্দোবস্তের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বাংলার কৃষক সম্প্রদায়। জমির ওপর জমিদারের মালিকানা স্বীকৃত হলেও, জমির ওপর কৃষকের কোনও মালিকানা স্বত্ব ছিল না। জমিদার প্রজাকে ইচ্ছামতো জমি থেকে উৎখাত করতে পারতেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারদের ওপর খুব উঁচু হারে খাজনা ধার্য করা হয়।

জমিদাররা এই খাজনা কৃষকদের ওপর চালান করে দেন। কর্ণওয়ালিস অবশেষে আশা করেছিলেন যে, জমিদাররা রায়তদের পাট্টা দেবেন। ফলে জমিতে তাদের অধিকার সুরক্ষিত হবে। জমিদারদের মত তারাও খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে। কিন্তু এই আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয় এবং জমিদারদের হাত শক্ত করার জন্য ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক আইন প্রণয়ন করা হয়। সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম আইন (Regulative Act, VII, 1799)। এই আইনের বলে জমিদাররা রায়তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত, এমন কি বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারতো। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ 'History of Bengal' গ্রন্থে বলেন যে, 'It (Regulative VII, 1799) gave a blank cheque to the Zamindars'। কৃষক সম্প্রদায় জমিদারদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এই আইনকে "ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালো কানুন" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে জমিদার ও সরকারের মধ্যে চির বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। কিন্তু কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

ডঃ তারা চাঁদ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতের সামাজিক সংগঠন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। চিরাচরিত গ্রামীণ সংগঠন ধ্বংস হয়, সম্পত্তি-সংক্রান্ত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। জমিদার, পত্তনিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতির আবির্ভাব সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুচনা করে। অপরদিকে, গ্রামীণ কৃষক ও কারিগরেরা ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়। এইভাবে গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ঐতিহ্যগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যায়। কার্ল মার্কস-এর মতে, সম্পর্কের এই পরিবর্তনই সামাজিক বিপ্লব ঘটায়।

মূল্যায়নঃ- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে কোম্পানী নিয়মিত রাজস্ব পেতে থাকে। জমিদারি বন্দোবস্ত স্থিতিশীলতা আসে। ফলে জমির ঘনঘন হাত বদল হয় এবং রাজস্বের হারেরও কারবার পরিবর্তন বন্ধ হয়। দেওয়ানী প্রবর্তনের পর বাংলা থেকে কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশে তা দৃঢ় হয়। আবার একথাও ঠিক যে জমি রাজস্বের হার অতিরিক্ত হওয়ায় সময়মত রাজস্ব প্রদান করতে ব্যর্থ হলে অনেক জমিদারদের জমি হতাছাড়া হয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। জমিদাররা কৃষকদের শোষণ করত। এই ব্যবস্থায় রায়তদের দখলীস্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। এই ব্যবস্থায় যে মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল তারা সবসময় রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্ঠায় লিপ্ত থাকত। ফলে রায়তদের

ওপর চাপ বাড়ে। সিটন কার (Setton Car) বলেন যে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করে, প্রজা-স্বার্থ রহিত করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দেয়।" ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির পরিচালক সভা লিখছে—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাদের সঙ্গে হয়েছিল তাদের সত্যিকারের ভূস্বামী বলে ধরে নেওয়ার ফলেই অন্যান্যদের অধিকার ও স্বার্থ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

সহায়ক গ্রন্থ:

১. জীবন মুখোপাধ্যায়- ভারতের ইতিহাস (১৫২৬-১৯১৪), শ্রীধর প্রকাশনী, ২০০৭
২. অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য- ভারতের সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১
৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়- পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১
৪. সব্যসাচী ভট্টাচার্য- ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪
৫. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ- বাংলার অর্থনৈতিক জীবন, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৬
৬. বদরুদ্দিন ওমর- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ, ১৯৯২
৭. অমলেন্দু দে- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১

জীবন-দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও সম্পর্কের পরিণতি: জয় গোস্বামীর 'শয্যাগত' অবলম্বনে

প্রতিম দত্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান

(১)

'পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ,যবে ভাবিনুমনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে,
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব-
মন শুধু বলে,অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভবে-
মন শুধু বলে,অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যুথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে-সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ-
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথ সংকেত কত জানায়েছে যে -বাতায়নে
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান?
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিবে রেখেছে কবির এ গৌরব
মন শুধু বলে,অসম্ভব এ অসম্ভব।[১]

(অসম্ভব,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৯৪০সালের ১৬ই জুলাই,উনআশি বছর দু'মাস বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় 'তীব্র আবেগ আর প্রেমের বিষয়ে শূন্যতার এই হাহাকার' অনিমেষকে বিস্মিত করে।অনিমেষ আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।জীবনের পঞ্চান্নটা বছর সে মানুষের চেয়ে অক্ষরকে বেশি বিশ্বাস করে কাটিয়ে দিয়েছে।উপন্যাসের মধ্যে অনিমেষের অতীত ও বর্তমান পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে।অতীতের মধ্যেই রয়েছে অনিমেষের চারিত্রিক নির্মাণের উপাদান।আর বর্তমানে রয়েছে তার পরিণতি।উপন্যাসের নামেই রয়েছে এক অসুখের ইঙ্গিত।যে অসুখ অতীত ও বর্তমানকে, কবিতা ও প্রাত্যহিক জীবনকে মিলিয়ে ফেলার ফলশ্রুতি।সেই অসুস্থতার দিনগুলিতেই অনিমেষের কাছে তার শৈশব থেকে যৌবনের দিন রাতগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনিমেষের স্মৃতিতে উঠে আসে তার বাবা।বাবার সাথে পাশ্ববর্তী গ্রামে ঘুরেবেড়ানো,গল্পের ছলে পড়া,নৌকাচড়া ইত্যাদি।অনিমেষের চরিত্রে তার বাবার প্রভাব সুস্পষ্ট।বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে 'সহজ পাঠ' পড়েছে।সোম-মঙ্গল-বুধ বার কত তাড়াতাড়ি আসে, কিন্তু রবিবার আর আসতে চায় না।'সে কি গো মা তোমার মতো গরিব ঘরের মেয়ে?'-এই জায়গায় এসে অনিমেষ লক্ষ করে যে,তার বাবার গলাটা কেমন ভেঙে যায়।তার বাবার নিজের জীবন -অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে কবিতাটিকে ব্যক্ত করে-

> *'কী জানিস,ওই যে মা কথাটা এল না?ওটাতেই তো গন্ডগোল হয়।আমি ছোটো ছিলাম যখন...।আমি সারাদিন মাকে পেতাম না।রাতে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতাম।মা কখন আসবে তখন মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোব।মায়ের কাজ আর সারা হত না,এখন বুঝি,পাড়ার লোকদের কাছ থেকে জামাকাপড় এনে সেলাই করে দিত।বই বাঁধিয়ে দিত।ওই সব করে রোজগার বাড়াতে চেষ্টা করত*

মা।...মা আমার আগেই প্রায় রোজই ঘুমিয়ে পড়তাম আমি।বা ঘুম থেকে জেগে দেখতাম মা লণ্ঠনের কম আলোয় সেলাই করছে।' [২]

বাবার চরিত্রের এই কবিতা-প্রীতি, কবিতার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, সংবেনশীলতা এমনকি ভুলোমন সবেরই উত্তরাধিকার পেয়েছে অনিমেষ। 'মানুষ মিছে কথা বলে,কবিতা মিছে কথা বলে না।'-এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে তার বাবাই তাকে শিখিয়েছে।প্রায় একই ধরনের কথা আমরা শুনতে পাই,একালের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি শঙখ ঘোষের জবানিতে,-'সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।কিন্তু জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়।'[৩] অনিমেষের বাবাই অনিমেষকে শিখিয়েছিল বন্ধুত্বের নতুন সংজ্ঞা। যেমন-বয়েসের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।যে মন বুঝবে সেই বন্ধু।ছোটো হলেও অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল- তার বাবা 'ছোক্কাকু'র মতো নয়, 'মেজকাকু'র মতো নয়। একেবারে অন্যরকম।ধীরে ধীরে সেও বাকিদের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছিল।

এমনকি শারীরিক অসুস্থতা বা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ার বিষয়ে ও অনিমেষের সঙ্গে তার বাবার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়।ছোট্ট অনিমেষের পর্যবেক্ষণ- 'হ্যাঁ,বাবার তো শরীর ভালো থাকে না।তাই তো কাজে যায় না বাবা।মা অফিসে যায়।বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।বাবা মাঝে শুয়ে পড়ে।ক'দিন শুয়ে থাকে।আবার উঠে বেরোয়।অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে।'[৪]

জয় গোস্বামী আদ্যন্ত এক কবি।তাঁর উপন্যাসও তাই গড়ে ওঠে কবিতাকে মাঝখানে রেখে। যেমন-জীবনানন্দ দাশের 'যেই সব শেয়ালেরা' কবিতাটি, তাঁর 'সেই সব শেয়ালেরা' উপন্যাসটির অবলম্বন।আবার আলোচ্য উপন্যাসে রয়েছে পূর্বোক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি। উপন্যাসের মূল চরিত্র অনিমেষ রবীন্দ্রনাথের কাছেই আশ্রয় খুঁজতে চায়।

(২)

বাবার পরে কেকাদির প্রভাব অনিমেষের জীবনে সবচেয়ে বেশি।কেকাদির সাথে ছিল তার এক অন্য রকমের সম্পর্ক।কেকাদি অনিমেষের অতীত জীবনের এক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।হয়ত অতীত নয়,তার বর্তমানের সাথেও ওতপ্রোত।এই কেকাদির পরিচয় দেওয়ার আগেই ঔপন্যাসিক অনিমেষের এক স্বপ্নিল অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন-'অনিমেষ দেখল শরীরটা হাল্কা হয়ে এসেছে? তার কোন ও ওজন

নেই।...তার কপালে,মুখে,ঠোঁটের ওপর গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।হাওয়ায় গাছ দুলছে। তার শরীরটাও চিৎ হয়ে ভাসছে।এ কী সম্ভব?এই তো।সে একেবারে হালকা একটা পাতার মতো ভাসছে।'[৫]

এই স্বপ্নটির একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে।ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে অবচেতনের রহস্য উদঘাটনের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে।এই ধরনের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন বিশ্লেষণে বিশ্রুত মনস্তাত্ত্বিক গিরীন্দ্র শেখর বসু বলেছেন- "আমি কতকগুলি আকাশে ওড়ার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া সবগুলির মূলেই গুরুজনের প্রতি কামভাবের আভাস পাইয়াছি।ভাষার দিক দিয়া দেখিলে ও এরূপ স্বপ্নের মূলে যে কামভাব আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।যেমন,কাহারও চরিত্রে দোষ ঘটিলে আমরা চলতি কথায় বলি, 'অমুক আজকাল উড়তে শিখেছে'।" [৬]

আলোচ্য উপন্যাসে অনিমেষের সাথে খুব কম সময়ের জন্য হলেও তার কেকাদির ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।সম্বোধন থেকেই স্পষ্ট বয়সের দিক থেকে অনিমেষ ছোটো,তাই প্রতিবেশী কেকাকে সে 'কেকাদি' বলে ডাকত।

কেকাদি অনিমেষের সহপাঠী সুশান্তর দিদি।তাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরেই থাকে।অনিমেষের বাড়িতে কেকাদির যাতায়াত ছিল।কোনো এক বৃষ্টির দুপুরে অন্তর্মুখী অনিমেষের জীবনে প্রলয় ঘটিয়ে দেয় কেকাদি।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,অনিমেষ তখনও শয্যাগত।লেখকের বর্ণনায়-'কেকাদি ঝুঁকে পড়ে অনিমেষের বন্ধ চোখের ওপর ঠোঁট রাখে।জীবনে প্রথম কোনওমেয়ের ঠোঁটের স্পর্শ অথচ যেন ভালো করে বুঝতেও পারে না অনিমেষ।তার কেমন ছটফট করে ওঠে ভেতরটা।' [৭]

কেকার সাথে সামাজিকতায়, বয়সে, অর্থে ও মানসিকতায়-কোনো কিছুতেই অনিমেষের মিল হওয়ার ছিল না।কেকা কঠোর বাস্তববাদী।জীবনকে জীবন হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত।অন্যদিকে অনিমেষ তার বিপরীত।ফলত কেকা স্বভাব সুলভ পারদর্শিতায় অন্যদিকে মোড় নেয়।ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের মাঝেই আমরা হঠাৎ এক কবিকে আবিষ্কার করি-

> *'...বই দিতে বই নিতে জানাশোনা।জ্বর দেখতে,জ্বর বুঝতে, জ্বর দেওয়া-নেওয়া।কিন্তু তারপরেই তো জানল অনিমেষ যে কেকাদি কবিতাও জানে।*
>
> *জানে কিন্তু বিশ্বাস করে না।'*[৮]

এখানে এসেই অনিমেষ আরও একটি বাধার সম্মুখীন হয়। অনিমেষ কবিতা ও জীবনেকে একাকার করে ফেলে।অথচ কেকা কবিতাকে ‘সত্য’ বা 'মিথ্যা' কোনো পঙ্ক্তিভুক্ত করারই পক্ষপাতী নয়।ভালো বা মন্দেই তার অবসান করে দিতে চায়। তাই ঝুপড়ুর (অনিমেষের ডাকনাম) প্রতি কেকাদির পরামর্শ- ‘কবিতা, কবিতা! জীবন, জীবন। সিনেমা থিয়েটার কবিতাকে তাদের নিজের মতো থাকতে দে অনিমেষজীবনকে তোর নিজের মতো রাখ।যাতে তোর নিজের বেঁচে থাকাটার গন্ডগোল না হয়।’ [৯]

অথচ অনিমেষের তার পঞ্চান্ন বছরের জীবন জুড়ে এই গন্ডগোলটাই পাকিয়ে বসে আছে।ক্রমে কেকাদি তাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দেয়।কেকাদির কাছে অনিমেষের ও ছিল একটা সিনেমা বা কবিতা।স্বভাব অনুযায়ী, একবার পড়ার মধ্যেই তার অবসান।কেকার চরিত্রে দ্বিতীয় পাঠের কোনো গুরুত্ব নেই।কিছুদিনের মধ্যেই শ্যামনগরে তার বিয়ে হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন দেখা হলে, অনিমেষ তাকে জিজ্ঞাসা করে-শ্যামনগরের কোনদিকটায় তাদের বাড়ি।কেকাদি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অনিমেষকে বলেছিল,-‘আমি চাই না তুই যাস।তাই আর বলছি না কোন দিকটায়।' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে কেকাদি আরও বলে – ‘তোকে একা বারণ করছি না।অসীমদা,বাচ্চু আর কল্যাণকেও একই কথা বলেছি।আর বাচ্চু স্যারকে বিয়ের কার্ড দিয়ে বলে এসেছিলাম,সত্যি সত্যি যাবেন না যেন।’ [১০] জয়ের উপন্যাসে নারী-চরিত্ররাই সাধারণ ভাবে রহস্যময়ী হয়ে থাকে। পুরুষ সেখানে নিছক দর্শক।

এখানেই কবিতার সঙ্গে কেকাদির সাদৃশ্য খুঁজে পায় অনিমেষ।যে কথা তার বাবা বলত,কবিতা মিথ্যে বলে না।কেকাদিও সরল করে সবটা বলে দিতে পারত।তার কোথাও কোনো মিথ্যে বলার প্রয়োজন নেই।আসলে সে জীবনে প্রতিটি টুকরো টুকরো অনুভূতিকে মান্যতা দিয়েছে।তার দাবি মিটিয়েছে।আবার কঠোর বাস্তববাদী হিসেবে নিজেও জীবনের থেকে তার পাওনাটা আদায় করে নিয়েছে।কোনো তথাকথিত আদর্শবাদ বা নীতিবোধ দ্বারা তার জৈবনিক অনুভূতিকে ছাইচাপা দেয়নি। যদিও সীমা লঙ্ঘন সে করেনি,সহজভাবে সে অনিমেষের কাছে এসেছে,দূরে চলে গেছে।আঁকড়ে থাকেনি।লক্ষণীয় যে,কেকাদির পরিবর্তে অনিমেষ কবিতাকে বা আরও স্পষ্ট করে বললে কবিতার অক্ষরকেইআঁকড়েধরেছিল।কবিতাই কেকাদির পরিবর্ত,এই অক্ষরের কাছেই অনিমেষ আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছে।জড়িয়ে গেছে এক আক্ষরিক সম্পর্কে।আর সেই অক্ষরই তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে।

(৩)

অন্তর্মুখী অনিমেষ এক সংকটের চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে।ফলে তার পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলো যেন অনুভূতিশূন্য বা অসাড় হয়ে গেছে।সে যেন সংসারের সঙ্গে প্রতারণা করেছে-'...অথবা মা-বাবা আর কেকাদির সঙ্গে ছাড়া সে কখনও স্বাভাবিক আচরণ করেনি।সকলের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকে কাউকেই বুঝতে না দিয়ে।'[১১]

কেকাদি চলে যাওয়ার পর মন্দিরা এসে পড়ে অনিমেষের জীবনে।কেকাদির অনস্তিত্বের শূন্যস্থান পূরণ করে সে।তাদের একটি সন্তান ও হয়।কিন্তু তাদের সম্পর্ক আর পাঁচটা স্বাভাবিক দম্পতির মতো হয় না।লেখক খুব সুন্দর ভাবে তাদের সম্পর্কের পরিণতিটিকে বর্ণনা করেছেন-

> *'নইলে মন্দিরা স্বভাব লাজুক।খানিকটা রক্ষণশীল।খানিকটা ভীরু।নীরব।নীরবতার সঙ্গে নীরবতার ধাক্কা লাগলেও শব্দ হয় না।এ ক্ষেত্রে ও হয় নি।*
> *নিঃশব্দ দূরত্ব হয়েছে।'*[১২]

আসলে অনিমেষ কোনো দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না।সে তার সংকটের মুহূর্তে মন্দিরাকে আঁকড়ে ধরেছিল,দৈনন্দিন অভ্যাসের মতো তাদের দাম্পত্য টিকে ছিল মাত্র।কারণ-'নীরবতার সঙ্গে নীরবতার ধাক্কা লাগলেও শব্দ হয় না।'

অনিমেষ ক্রমেই অক্ষরের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে।অনিমেষ যখন তার কবিতার জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে আসে,তখন সম্পূর্ণ অনিমেষ হয়ে আসে না।আসে টুকরো হয়ে।লেখকের বর্ণনায়-'...অনিমেষ জীবনের প্রায় সমস্ত সময়টাই ওই কবিতার নীচে ঢুকে থাকে।তাই যখন বাইরে বেরোয় অনিমেষ আর বেরোয় না। অনিমেষের ভূত বেরোয়...সে যে অনিমেষের ভূত তখন,সেটাতো কেউ জানে না,তাই সবার সামনে অনিমেষই ভেঙে পড়ে।বারবার ভেঙে পড়তে পড়তে এখন অনিমেষ ভঙ্গুর।'[১৩]

এই ভঙ্গুর অনিমেষ কোনো সামাজিক দায়িত্বই সঠিক ভাবে পালন করতে পারেনি।স্ত্রী-মেয়ে বা সমাজ কারও সঙ্গেই সে স্বাভাবিক ভাবে আচরণ করতে পারেনি।একে সে নিজেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে।কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।অনিমেষ সাংসারিক জীবনের বাধ্যবাধকতা,দায়িত্ব-কর্তব্য উপেক্ষা করে;সে নিজের বিশ্বাসের জগতে বিচরণ করেছে।ক্রমেই স্মৃতির ভারে চাপা পড়ে গেছে।

সম্পূর্ণ অনিমেষ যেন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে।ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়- '...যেমন অনিমেষের প্রেমবোধ।যেমন অনিমেষের লজ্জা।যেমনঅনিমেষের মিলন আকাঙ্ক্ষা।ওরা সব বিভিন্ন ধাক্কায় ছিটকে আর ফিরতে পারেনি।অনিমেষের কৌতুকবোধ। এগুলো বাদ পড়াতে অনিমেষও একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে।অনেক দিনই।বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।কিন্তু অনিমেষ যতটুকু ছিল তার চেয়ে কমে গেছে।' [১৪]

স্বাভাবিক ভাবেই, এই খন্ডিত অনিমেষ তার সামাজিক সম্পর্কগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনা। হয়ত তার প্রয়োজনও অনুভব করে না।হয়ত প্রয়োজন অনুভব করলেও,ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয়ে ব্যর্থ হয়।কিংবা ভাবনার জগতেই সে নিজেকে নিরাপদ রাখে।

(৪)

অনিমেষ কি অক্ষরের গোলকধাঁধাঁ থেকে মুক্তি পেতে চায়নি?নাকি অক্ষরের জগতেই সে মুক্তি খুঁজে নিয়েছিল।পুরোটা না হলেও কিছুটা অন্তত পেয়েছিল-'রাতুল আর অনুপমার সঙ্গে,কর্মস্থলের টেবিলে,নানা কাজের ফাঁকে সে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসে আর এমনি একটা বারান্দা তৈরি হয়ে যায় সেখানে।ওটুকু তার অক্ষরের ভিতরের মুক্তি।কিন্তু অক্ষর থেকেও কী বেরিয়ে যাওয়া যায় না!'[১৫]

কিন্তু এই মুক্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী।রাতুল বা অনুপমার মতো সহকর্মীর সাথে কতক্ষণই বা তার থাকার সুযোগ হয়!ফলত 'ছুটির বারান্দা'র বাইরের যে অক্ষরের জগৎ সেখানে অনিমেষ মুক্ত নয়,বদ্ধ।সে ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে ওঠে।

অনিমেষ নিজেই তার স্ত্রী-কন্যা বা পরিবারের সঙ্গে করা আচরণকে 'অপরাধ' বা 'প্রতারণা' হিসেবে দেখেছে।আবার উল্টোদিকে অতৃপ্ত প্রেমকে মহত্তর করে তুলতে;জাস্টিফিকেশন খুঁজেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে।তাই রাতুল-অনুপমাকে অনিমেষ বলেছে-'এত বয়েসে, এত তীব্র আবেগ আর প্রেমের বিষয়ে শূন্যতার এই রকম হাহাকার,আর কারও লেখায় কি দেখা গেছে বলো?৫০পেরোতে পেরোতেই ভেতরের আগুন নিভতে থাকে।'[১৬]

এইখানেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণের অক্ষম এক চেষ্টা দেখতে পাই আমরা।যেখানে অনিমেষ রবীন্দ্রনাথের একটি দিককেই কেবল লক্ষ করেছে।তা কেবল 'প্রেমের বিষয়ে শূন্যতার এই রকম হাহাকার।'অথচ সেই সুতীব্র আর্তি রবীন্দ্রনাথকে

পলায়নবাদী করেনি।তার জীবনকে এক অর্থে নির্মাণ করেছে।সমৃদ্ধ করেছে।কিন্তু অনিমেষ শুধু ক্রমাগত নিজের ভাবের জগতে বিচরণ করে আত্মতুষ্টি খুঁজেছে।

হাসপাতালে শয্যাগত পঞ্চান্ন বছর বয়সী অনিমেষের সঙ্গে তার কেকাদির আবার সাক্ষাৎ হয়।কেকাও বয়সের ভারে জীর্ণ ও অসুস্থ।সাক্ষাৎ হয়,কেকার মেয়ে তরীর সঙ্গে।সে যেন পঁচিশ বছর বয়সী কেকাদির প্রতিমূর্তি।কেকা তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে এসে অনিমেষের সাথে দেখা করে যায়।আবার সেই ভুলভুলাইয়ার মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে অনিমেষ। কিন্তু আর নয়।সে রুখে দাঁড়ায়-'না,কবিতা,আর নয়।তুমি যাও।সারা জীবন আমাকে ভুলভুলাইয়ার মধ্যে বন্ধ রেখেছ।এবার আমাকে একটু দম নিতে দাও।এখন আমার শ্বাস দরকার।তুমি মিছে কথা বল কিনা বল,তাতে আর আমার কিছু যায় আসে না।বাবা-ই-ভুল ছিল।আমি জানি।তুমি যাও।আর আমাকে স্পর্শ করে না।শব্দ, তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দাও এবার।'[১৭]

যার চোখের পাতা খুলতে আলস্য বোধ হত,সেইঅনিমেষ একাই জানলার ধারে এগিয়ে যায়-বৃষ্টি দেখতে।ঔপন্যাসিক খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই অংশে পৌরাণিক 'সৃষ্টিপদ্মে'র অনুষঙ্গ এনেছেন-'এতদিন সে কী তবে জলের উপরেই শুয়ে ছিল!এবার,যাকে বলে,প্রলয় পয়োধির একেবারে মাঝখানে এসে উপস্থিত।আর ওই বুঝি সৃষ্টিপদ্ম।'[১৮]এতদিন সে জীবনকে যেভাবে দেখেছে,তা ছিল খন্ডিত দেখা।তার নিজের তৈরি ভাবের নদীর উপরিতলে সে শুধু ভেসে থেকেছে।ভালো-মন্দ,প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি,প্রেম-অপ্রেম-সমস্ত কিছু নিয়ে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার কথা সে একেবারেই ভাবেনি। অনিমেষ যেন আজ কিছুটা উদ্যোমী হয়ে ওঠে।দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ায়-সেই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে,যা তার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করেছিল।সৃষ্টিপদ্ম সেই নব সৃজনের ইঙ্গিতবাহী।আবার নতুন করে শুরু করার।জীবনকে অন্য চোখে দেখার।

এই উপন্যাস দুই জীবন দর্শনের দু'টি মানুষের কথা বলে।তাদের জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, তাদের ভিন্ন পথে নিয়ে গেছিল।তাদের এই সম্পর্ক অনিমেষের পরবর্তী জীবনের সম্পর্কগুলোকে অসাড়-অনুভূতিশূন্য করেছে। সে কেবলই অতীতের মধ্যে ডুবে থেকেছে।নতুনকে অস্বীকার করে।অবশেষে এই অতীতের ভার তাকে শুধু ক্লান্তকরেছে।কিন্তু সেই ক্লান্তি থেকে 'সৃষ্টি -পদ্মের'সৃজন হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।রবীন্দ্র রচনাবলী(চতুর্বিংশ খন্ড)।কলিকাতা:বিশ্বভারতী,১৩৫৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৮।

২. জয় গোস্বামী।শয্যাগত।কলকাতা:প্রতিভাস,২০০৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭।

৩. শঙখ ঘোষ।শ্রেষ্ঠ কবিতা। দ্বাদশ সংস্করণ।কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং,২০০৮। ভূমিকা অংশ।

৪. জয় গোস্বামী।শয্যাগত।কলকাতা:প্রতিভাস,২০০৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮।

৫. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪০।

৬. গিরীন্দ্রশেখর বসু।স্বপ্ন।চতুর্থ সংস্করণ।কলকাতা:বিবেকানন্দ বুক সেন্টার,২০১৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৩।

৭. জয় গোস্বামী।শয্যাগত।কলকাতা:প্রতিভাস,২০০৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯।

৮. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১।

৯. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৩।

১০. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫।।

১১. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯।

১২. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৬।

১৩. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬১।

১৪. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬২।

১৫. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪০।

১৬. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২।

১৭. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৮।

১৮. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৮।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাশ্চাত্ত্য সম্পর্ক

সিদ্ধার্থ ঘোষ
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা : *ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা কাব্যজগতে যে সমস্ত প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের আগমন হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুতাপে ঝলসে না গিয়ে নিজস্ব স্বকীয়তার যে দীপ্তিময় শোভা ফুটে ওঠে তাঁর রচনায় তা অনুপমীয়। রঙ্গলাল ছিলেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তার অধিকাংশ সৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য লেখকদের প্রভাব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্ত্যের বহু লেখক তার রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল সে কথা নিজেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের নানা সাহিত্যিক তার রচনায় যে সমস্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং রসবোধের প্রেরণা সঞ্চার করেছিল সে কথা বিশেষভাবে আলোচিত নিবন্ধটিতে।*

মূল শব্দ : *রঙ্গলাল, পাশ্চাত্ত্য, 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', রসবোধ, ঈশ্বরগুপ্ত, ভাবশিষ্য ইত্যাদি।*

রঙ্গলালকে আমরা প্রথম বঙ্গভাষানুবাদক হিসেবে এক অনন্য গরিমা লাভ করতে দেখি। বাঙালি কবি হিসাবে প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে কবিগানের বাঁধনদার হয়েও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঞ্জীবনী স্পর্শে আলোকিত হয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যকে এক আলোকসামান্য রূপদানে ব্রতী হন। পুরাতন রীতিকে অনুসরণ করলেও ঐতিহাসিক কাহিনিকেই মান্যতা দিয়ে স্বদেশ প্রেমের আবেগ সঞ্চার করে বাংলা সাহিত্যের নবতম সিংহদ্বারের উন্মোচন ঘটালেন রঙ্গলাল।

দেশাত্মবোধই ছিল তার কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। পরাধীনতার শিকল মুক্তির জয়গানই তার কাব্যসৃষ্টির অভিপ্রায়, স্বদেশ প্রেম ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বীররসকে কেন্দ্র করে মানব চেতনাকে আন্তরিকতায় মুক্তি দেওয়ার জন্য রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর নিজের সম্পাদনা 'সংবাদ-রসসাগর'-এ তিনি অনেক রচনা প্রকাশ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এছাড়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখকের কাজও করে গেছেন নিজ বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে।

রঙ্গলালের অবিসংবাদিত কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) এই আখ্যান কাব্যের বিষয় বস্তু টড-এর রাজস্থান (Annals and Antiquities of Rajasthan) এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং জহুরব্রতে আগুন

জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আত্মাহুতি দানের কাহিনি অবলম্বনে এই কাব্য গড়ে উঠেছে। এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছিলেন-

> *-'পুরাণেতিহাস বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবক দিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যা কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। .... অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে ভাবের আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদদৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায়-আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।"*

এই দুই বিষয় নির্বাচনের পিছনে যে ইতিহাস, প্রেম ও স্বদেশ প্রীতি পাওয়া যায় সে দুটিই ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে নেওয়া।

কাব্যরুচিতেও রঙ্গলাল বিদেশী ভাবধারাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল রিচার্ডসনের 'Literary Recreation' নামক গ্রন্থের 'Poetry and Utilitarianism' নামক প্রবন্ধটির কিছু অংশ অনুবাদ করে তুলে ধরেছেন। রঙ্গলালের প্রকৃতি-চেতনার মূলেও রিচার্ডসন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রিচার্ডসনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের কথা রঙ্গলালের কলমে শৌর্যগাথা আবহ তৈরি করেছে-।

যেমন :

> *"কবিতার আর এক শক্তি তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্মসকল বুদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে – কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিকসামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয়ভোগ শক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্বদা বিমুক্ত রাখতে পারে এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে যে, জাগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্মল নিত্য সুখ সন্তোষের সম্ভাবনা আছে।"*

রঙ্গলাল চেতনায় প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃতি চেতনার মূল সুরটি তিনি পেয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক রিচার্ডসনের থেকে। পদ্মিনী উপাখ্যানের সূচনাতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্তাকর্ষীয় আভা ফুটে উঠতে দেখা যায়-

'ধরাধর অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নে প্রীতিকর ওষধি বিস্তর।।
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর।।
তরুণ অরুণ ভাতিজ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।।
কোথাও তটিনীকূল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে।।
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার।
ঝল মল ভানু করে করে অনিবার।।
বিবিধি বিহঙ্গ নানা স্বরে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর মন প্রাণ হরে।।

এই সৌন্দর্য সকলে উপভোগ করতে পারে না। নিসর্গের পুরোহিত কবিরাই কেবল এই ঘ্রাণ পেয়ে থাকেন। প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ তৎকালীন বিদেশী দার্শনিকদের ধারণা থেকেই এসেছে। রুশো, কান্ট, ওয়াডস্‌ওয়ার্থ এক নতুন প্রকৃতি চেতনার উন্মেষ ঘটান। তার প্রভাব রঙ্গলাল সাহিত্য ভূমিতেও পড়েছিল।

পদ্মিনী উপাখ্যানের মূল সুর প্রধানত দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম ইংরেজ কবির থেকেই রঙ্গলাল পেয়েছিলেন। ইংরেজ কবি ওয়াল্টর স্কট ও টমাস মুরের দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কবি ডিরোজিওর কবিতা রঙ্গলালকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিল।

যেমন : 'মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন,
যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন।"

ইত্যাদি অংশ ডিরোজিওর 'To India Native Land' কবিতার ভাব অবলম্বন করে লেখা এবং ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য টমাস মূরের 'Glories of Biren the Brave' এবং 'From Life Without Freedom' অনুসরণে রচনা। "কোন মূঢ় চিত্র করে পদ্মদেহ চিত্র করে ইত্যাদি অংশ – শেকসপিয়রের 'কিঙ জন'-এর (চতুর্থ

অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য) "To gild refined gold" ইত্যাদি ছয় ছত্রে ভাবানুবাদ। পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের কাহিনিতেও রঙ্গলাল স্কটের মিনস্ট্রেলের প্রেরণায় চারণের মুখে কাহিনি শুনিয়ে নতুনত্ব এনেছেন, কাহিনি বর্ণনার আদর্শ হলো ইংরজী সাহিত্যের Metrical romance।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই রঙ্গলালের অপর একটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল 'ভেক মূশিকের যুদ্ধ' কাব্যটি হোমারের ইলিয়াডের প্যারডি। কাব্যটির নাম ছিল 'Batramyomachia' [Battle of the Frogs and Mice]। এর ইংরেজী অনুবাদক এর নাম ছিল পার্নেল। কেউ কেউ বলেন ইংরেজি অনুবাদ করেই রঙ্গলাল রচনা করেন আবার কেউ বলেন মূল ভাষা গ্রীক থেকে অনুবাদ করা অসম্ভব .নয়, কারণ তিনি গ্রীক ভাষা জানতেন।

পরবর্তী কাব্য 'কর্মদেবী' (১৮৬২) তেও ইংরেজী কাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটি ইংরেজী রোমান্টিকগাথা কাব্যের মিনস্ট্রেলের মতো ব্রাহ্মণের দ্বারা বর্ণিত কাহিনি, রাজপুত ইতিহাস থেকেই নেওয়া। কর্মদেবীর পূর্বরাগ ও ভ্রমণ কাহিনীতে মুরের 'Lalla Rookh' এর ছায়াপাত ঘটেছে। বিপাশার তীরে রণসজ্জা,বণিকদের ছাউনি, নাইটদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রঙ্গলালের চতুর্থ কাব্য 'শূর সুন্দরী' (১৮৫৮) চারটি সর্গে বিভক্ত ছিল। শূর সুন্দরীতেও ইংরেজী কাব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। কাব্যের মঙ্গলাচরণ রূপে – 'কবিতা শক্তির প্রতি' নামে যে অংশটি রয়েছে ইউরোপীয় মহাকাব্যের Invocation এর অনুসরণ।

পঞ্চম কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরি'তে (১৮৭৯) প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণ থাকলেও রঙ্গলালের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যটিকে স্বাতন্ত্র্যের মহিমা দান করেছে। রঙ্গলাল কাব্যটিকে সাত সর্গে গেঁথেছেন এবং ইংরেজী রোমান্সের রস কিছুটা মিশ্রিত করেছেন। আক্রমণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রেমিকার দর্শন পাবার আশা, -রঙ্গলালের এইসব লক্ষণ স্কট-বায়রনের হিরোইক ভার্স টেলের পরিবেশকেই মনে করিয়ে দেয়। যে কথা স্কট-এর কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে সে কথা রঙ্গলালের কাব্য সম্পর্কেও সত্য –

> *"they use all the romantic resources of Chivalry, Warfare, Pathos, Sentiment and the glamour of an Imagined past'*

রায়রনের চেয়ে স্কটের সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি ছিল রঙ্গলালের। স্কটের জীবনে 'Latin Schooling' 'Antiquarian Study', লেক কবিদের 'innovations and inbred fanaticism – এর প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য এবং অন্যদিকে রঙ্গলালের পাঠশালায় পড়াশোনা, ইতিহাসের প্রতি ঝোক – এই দুই সমান্তরাল সাদৃশ্য তাদের কাছাকাছি এনেছে।

কাব্যরীতিতে রঙ্গলাল ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তকে অনুসরণ করেছেন। মাইকেল রঙ্গলালের এই ভারতীচন্দ্রীয়-রীতিকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করেছেন – 'My option of his is – that he has poetical feelings – some fancy, perhaps Imagination but his style is affected and execrable.'

পয়ার-বন্ধের মধ্যে ভাবমুক্তির প্রচেষ্টা করেছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মিনী উপাখ্যান ও পরবর্তী কাব্যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে আট-ছয়ের মাত্রাভাগের যতি তুলে পংক্তির শেষে যতি এনে ভাবমুক্তির চেষ্টা করেছেন। যেমন:-

ক। অধার্মিক । বিশ্বাস ঘাতক দুরাচার। (ভীম সিংহের বন্ধন দশা। পদ্মিনী উপাখ্যান)

খ। দেখিব তখন। কেটা করিবেক ত্রাণ। (পদ্মিনী উপাখ্যান)

গ। এই দেখ পত্র। পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর। (পদ্মিনী উপাখ্যান)

ঘ। কোথা সে অভাগা । কোথা তুমি ভাগ্যবতী। (কুমারসম্ভব)

ঙ। ধনহীন উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন। (শূর সুন্দরী, দ্বিতীয় সর্গ)

এছাড়া 'কর্ম দেবী'তে বাইশ মাত্রার পংক্তি রচনার প্রয়াস ও মুক্তক রচনার ইঙ্গিত দেখা যায় –

ক) শোকস্বর উঠে, উভয় মেলায়, নিরাশ্বাস অরন্য কমল।
কর্মদেবী জীবন ত্যজিলা শুনি, হলো অতি হৃদয় বিকল।। (জয়তঙ্গের উক্তি)

খ) কাতরা কপোত বধূ বিরহের কালে
কিবা আশ্বাস পরানে?
উদয় অচলে দিনকর,
হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী।
হাসিতে না প্রকাশিত মুখ
মেঘরাশি আসি করিল মলিনী।। (জয়তঙ্গের উক্তি)

বারো আটমাত্রার পদযুক্ত স্তবকও দেখা যায় যা মূলত ইংরেজী কাব্য সাহিত্যেরই অনুকরণ।

যেমন:

দিনকর, দয়া কর তমোহরঃ
হর মম তাপ, তমোনিকর।
তুমি হে প্রভু সবিতা জীব শিব প্রদায়িতা
সর্ব সুখ প্রেরয়িতা, পোষয়িতা পরাৎপর।।
তরুণ অরুণাশ্রয়, করুণা বরুণালয়,
দেহি মে করুণাময়, করুণাবারি শীকর।
তুমি হে কালজনক, মুরতি তপ্ত কনক,
সকল ক্ষণ গণক ত্বংহি ত্রিকাল ঈশ্বর।
মনোমত প্রিয়বরে পেয়েছি তোমার বরে
অরুন্তুদ অবিকরে রক্ষো প্রভো প্রভাকর।।

(কর্মদেবী গীত)

সর্বোপরি ইংরেজী সাহিত্যে রঙ্গলালকে সবদিক থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। ভাবধর্মী, প্রকাশ ভঙ্গি, দীর্ঘ পংক্তি, ও মুক্তক রচনার পিছনেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। পাশ্চাত্য সাহিত্যবেদীর পাদ অর্ঘ্যে রচিত রঙ্গলাল সাহিত্যভূমি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আজও মহার্ঘ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যসূত্র:

১. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ‘বাঙলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব’, পৃ. ৪৮
২. ঐ, পৃ. ৫১
৩. ঐ, পৃ. ৫২
৪. ঐ, পৃ. ৫৩
৫. ঐ, পৃ. ৫৪
৬. ঐ, পৃ. ৫৫
৭. ঐ, পৃ. ৫৭
৮. ঐ, পৃ. ৫৮
৯. ঐ, পৃ. ৫৯

গ্রন্থপঞ্জী:

১. বাঙলার নব্য সংস্কৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল।

২. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য – সাধক চরিতমালা।

৩. রঙ্গলালের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়'' দ্রষ্টব্য।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), সুকুমার সেন।

৫. A Short History of English literature : I for Evans স্কট সম্পর্কিত আলোচনা।

৬. আধুনিক বাংলা ছন্দ : ড. নীলরতম সেন সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ ও ইনডেনচার সিস্টেম : নারাচ উপন্যাসের আলোকে

অসীম কুমার মৃধা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কালিয়াগঞ্জ কলেজ

মানুষ মানুষকে পণ্য করে,
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে।
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে, লজ্জা কি তুমি পাবে না ?

উনবিংশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে নতুন নতুন যুক্তিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ হয়, বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। মেয়েদের অধিকারের জন্য লড়াই করে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছুঁয়ে ফেলেন এক মাইল ফলক, প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একদিকে যেমন ক্রমশঃ অন্ধকার দূর করে আলোর দিকে সামাজিক উত্তরণ ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি বিধবা বিবাহ চালু হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর অতিবাহিত হলেও সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা কিন্তু সেই আলোক থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করছিলো। কৌলিন্য প্রথার সুগভীর ঐতিহ্য মেনে তখনো গৌরীদান করা ছিল দরিদ্র কুলীন পিতামাতার কাছে পারিবারিক সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায়। বাবু সমাজের অধঃপতন, যথেচ্ছ বিলাসিতা, অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ, প্রজাশোষণ, কুপ্রথার শিকড় খুবই গভীরে প্রোথিত হওয়ার কারণে এক রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজ, আবার এরইমধ্যে কিছু শিক্ষিত মানুষ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, সহবাস সম্মতি আইন পাশের জন্য কলম ধরছেন। এহেন জটিল সামাজিক ঘূর্ণাবর্তনের সময়কালকে উপজীব্য করে তরুণ লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘নারাচ’[i] নামক বিশালায়তন উপন্যাসটি লেখেন।

'নারাচ' মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র। এতে ধরাশায়ী করা যেত একাধিক মানুষ অর্থাৎ 'নর'কে। সেই থেকেই নারাচ কথাটির উৎপত্তি। এই উপন্যাসে নারাচ অস্ত্রের মতোই শাণিত ও ক্ষুরধার কিছু অত্যাচারিত মানুষের সব হারিয়েও বারবার উঠে দাঁড়ানোর লড়াকু সংগ্রামকে লেখিকা সুনিপুন লেখনশৈলীতে তুলে ধরেছেন। বেদ, বেদোত্তর স্মার্ত সাহিত্য থেকে বিভিন্ন সূত্র তুলে ধরে উপন্যাসের মূল চরিত্র ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৃষ্ণসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে প্রান্তিক মানুষ ও মেয়েদের ইতিহাস অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। 'নারাচ' পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের আগস্ট মাসে। প্রকাশের মাত্র আট মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় এর দশটি মূদ্রণ। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা হারপার কলিন্স 'নারাচ' উপন্যাসকে অধিগ্রহণ করেছে ইংরেজীতে প্রকাশের জন্য।

সাহিত্যিক দেবারতি মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ১৯৯০) পেশায় উচ্চপদস্থ সরকারী আধিকারিক। বয়সে তরুণ হলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যে স্বল্প কয়েক বছরেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'নারাচ' তাঁর একটি মাইলস্টোন উপন্যাস। লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ঈশ্বর যখন বন্দী' (২০১৬), 'নরক সংকেত' (২০১৭), 'দিওতিমা' (২০১৮), 'অঘোরে ঘুমিয়ে শিব' (২০১৮), 'গ্লানির্ভবতি ভারত' (২০২০) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

'নারাচ' ইতিহাস নির্ভর গবেষণালব্ধ একটি উপন্যাস। আলোচ্য শতকের শেষার্ধের বাংলার কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সাথে কাল্পনিক চরিত্রের মেলবন্ধনে লেখিকা আসলে তৎকালীন সময়ের সমাজের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'নারাচ' উপন্যাসে বেশ কতকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায়। একজন শিক্ষিত পন্ডিত ব্রাহ্মণ, জমিদার বাড়িতে বংশ পরাম্পরায় পুরোহিত বৃত্তি ও টোলে ছাত্রদের বিদ্যাদান করে যাঁর সংসার অতিবাহিত হয় এহেন কৃষ্ণসুন্দর চট্টোপাধ্যায় কালের দূর্বিপাকে পড়ে কিভাবে ব্রিটিশ ইনডেনচার্ড লেবার হয়ে সপরিবারে ল্যাটিন আমেরিকায় চালান হয়ে যান সেই অত্যাচার ও শোষণের কাহিনীই এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নারী মুক্তি আন্দোলন যখন মধ্য গগনে তখন বিপরীত মেরুতে সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথার রমরমা। প্রতি বছর নীরবে ঝরে যাচ্ছে অপরিণত

নাবালিকারা। রক্ষণশীল সমাজ পরকালের দোহাই দিয়ে সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Act, 1891) পাশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে। ঠিক এই সময়েই ১৮৮৭ সালের মে মাসে হাওড়া থেকে পুরী যাওয়ার পথে সেন্ট লরেন্স নামক একটি জাহাজ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায় প্রায় সাড়ে আটশো যাত্রী নিয়ে। যাত্রীদের বেশিরভাগই ছিলেন উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবারের বিধবা মহিলারা। বিশ্বখ্যাত টাইটানিক জাহাজের ভরাডুবির প্রায় পঁচিশ বছর আগে নেটিভ তীর্থযাত্রীদের নিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ব্রিটিশ সরকার মৃত ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কালের গর্ভে চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন তারই আখ্যান এখানে বর্ণিত। তৃতীয়তঃ লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে এসে এক টুকরো লক্ষ্ণৌ গড়ে তোলেন। নবাবের আনন্দনগরীকে ঘিরে নানাধরনের মানুষের বিচিত্র জীবন যাত্রার চিত্রায়ণ।

ইনডেনচার বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাস খুবই বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। ‘নারাচ’ এপ্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবে সেই কৃতিত্বের দাবীদার। যদিও ইংরেজী সাহিত্যে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের উল্লেখ পাই যা মূলতঃ ইনডেনচার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কাহিনী সম্বলিত। বিখ্যাত ভারতীয় উপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষ তাঁর ‘সী অফ পপিজ’ (Sea Of Poppies, 2008) উপন্যাসে কোলকাতা বন্দর থেকে মরিশাসে কুলি হিসেবে কাজ করতে যাওয়া ভারতীয়দের ছবি এঁকেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান সাহিত্যিক গায়ত্রা বাহাদুর তাঁর ‘Coolie Women : The Odyssey of Indenture’ উপন্যাসে ১৯০৩ সালে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ গোয়েনায় কাজ করতে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া গর্ভবতী একাকী ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁর নিজের প্রপিতামহীর গল্প বলেছেন। একাধারে এটি ইনডেনচার্ড লেবারদের দুঃখ যন্ত্রনার কথা, অন্যদিকে কিছুটা তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের আখ্যান। এর প্রকাশ কাল ২০১৩ সাল।

১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন করে ক্রীতদাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে মূলতঃ আখ, তুলো, রবার, চা চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন ধরে দাস ব্যবস্থার ফলে নিপীড়িত শোষিত আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সাধারণ মানুষ এবার শ্রমের জন্য অধিক মূল্য দাবী করতে থাকে, নয়তো স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব জমিতে

চাষ-আবাদ করতে থাকে। শস্তায় শ্রমিকের অপ্রতুলতার প্রভাব গিয়ে পড়ে আখের মিলগুলিতে। ওই সমস্ত উপনিবেশগুলি থেকে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে চিনির যোগান কমতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পার্লামেন্ট ইনডেনচার্ড সিস্টেম নামে একটি নতুন আইন চালু করে।[ii]

ব্রিটিশ সরকার অনেক ভেবেচিন্তে এই 'ইনডেনচার' শব্দটি ব্যবহার করলেন। বাংলায় প্রতিশব্দ হল চুক্তিনামা। শ্রমিক ও বাগিচা মালিক একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। সেই চুক্তিপত্রের নাম হল 'গিরমিট'। শ্রমিকদের বলা হত গিরমিটওয়ালা। পাঁচ বছরের জন্য মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য চুক্তি হত। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে শ্রমিক আবার নিজের গৃহে ফিরবে, আপাত দৃষ্টিতে দারুণ বন্দোবস্ত। ক্রীতদাস প্রথার আজীবন ও বংশানুক্রমিক দাসত্বও আর রইলো না, আবার বাগান মালিকদের চাহিদাও মেটানো গেল। ইনডেনচার্ড সিস্টেমে আড়কাঠিরা মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে, মিথ্যে কথার ফাঁদে ফেলে কোলকাতায় নিয়ে আসত। সাব-এজেন্টরা এই সব আড়কাঠিদের নিয়োগ করত। আড়কাঠিরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। শুধু মানুষ চাই, রাশি রাশি মানুষ চালান হতে থাকল সাগর পারে। আড়কাঠিরা এর বিনিময়ে কমিশন পেত সাব-এজেন্টদের কাছ থেকে। এজেন্টদের লাইসেন্স দিত তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সরকার।

সাধারণত অল্প বয়সী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমিকদেরই চাহিদা ছিল বেশি।[iii] এই নতুন সিস্টেমে মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ করা হল। অনেক ক্ষেত্রে সপরিবারে আবার কখনো সমগ্র গ্রাম ধরে চুক্তিবদ্ধ হত। দক্ষিণ ভারতের কাঙ্গনি সিস্টেমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক সরবরাহ করা হত। ১৮৪০ সালের আগে পর্যন্ত বেশি মাত্রায় ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন মানুষেরা যাঁরা 'পাহাড়ী কুলি' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণ, কৃষক, কারিগর, মুসলমান, নিম্নবর্গের মানুষেরা এই ইনডেনচার চুক্তির জালে জড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে সীমাহীন দারিদ্রতা ও দূর্ভিক্ষের কারণে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জীবন নির্বাহের জন্য উপনিবেশগুলিতে যেতে আরম্ভ করে। ১৮৩৮-১৯১৭ পর্যন্ত প্রায় দেড় মিলিয়ন ভারতীয় শ্রমিকদের ফিজি, শ্রীলঙ্কা, ত্রিনিদাদ, গুয়েনা, মালয়েশিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস সহ ১৯টি ব্রিটিশ উপনিবেশে চালান করা হয়।[iv]

ওলন্দাজ, ফরাসী, স্পেন সহ অন্যান্য উপনিবেশ ধরলে সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন। এরা সাধারণত 'কুলি' নামে পরিচিত ছিল। কুলি শব্দটি কেউ মনে করেন গুজরাটের উপজাতি থেকে এসেছে আবার অন্যমতে তামিল 'Kuli' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ মজুরির বিনিময়ে ছোটখাটো কাজ করা।

১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার একচল্লিশ হাজারের উপরে বাঙালি শ্রমিকদের মরিশাসে পাঠিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে ভারত সরকার কুলি পাঠানোয় নিষেধাজ্ঞা জারী করে ১৮৩৮ সালে। কিন্তু ১৮৪২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পিল ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন ইনডেনচার্ড লাইসেন্স পুনরায় চালু করার। একজন সুরক্ষা আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয় যাতে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় থাকার ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পরিমান জল, খাদ্য এবং জাহাজে থাকাকালীন স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়।[v] কিন্তু অচিরেই এটি শুধুমাত্র কাগজেই থেকে যায়, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি হলেও সব ক্ষেত্রে তা মানা হত না। কেউ কেউ দেশে ফিরতে পারলেও, বেশিরভাগ শ্রমিকদের আজীবন দাসত্ব খাটতে হত। দশ থেকে কুড়ি সপ্তাহ জাহাজে পাড়ি দিতে হত। শ্রমিক ভর্তি জাহাজগুলোর পরিস্থিতি মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না। ১৮৫৬-৫৭ সালে ক্যারিবিয়ান সাগরে যাত্রারত শ্রমিকদের গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হত আমাশয়, কলেরা নয়তো হামের ফলে। জাহাজ বন্দরে পৌঁছানোর পর, উপনিবেশগুলিতে স্থানান্তরের সময় এই মৃত্যুর হার আরো বাড়তো।

বাগানগুলিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে শ্রমিকদের খাটানো হত অতি সামান্য পারিশ্রমিকে। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর শারিরিক দূর্বলতার সময়ে মাইনে কেটে নেওয়া হত। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৭০ সালে জামাইকাতে বার্ষিক মৃত্যুর হার ছিল ১২ শতাংশ, যা তার তিরিশ বছর পরে মরিশাসের সমতুল। দাস শিশুদের পাঁচ বছর বয়স থেকে কাজ করানো হত। ১৮৯৫-১৯০২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েক হাজার ভারতীয় ইনডেনচার্ড শ্রমিক কেনিয়া-উগান্ডা রেলপথ নির্মাণ করে এবং রেল নির্মাণ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কুলিদের কেনিয়া ও নাতালে (দঃ আফ্রিকা) নিয়ে আসে। প্রায় সাত শতাংশ শ্রমিকের মৃত্যু হয় কেনিয়া-উগান্ডা রেলপথ নির্মাণের কাজ চলাকালীন। বহু শ্রমিক পালানোর চেষ্টা করে, ধরা পড়ে আজীবন বন্দী হয়ে কাটাতে হত। কখনো

কখনো তাদের পাঁচ বছরের চুক্তি দ্বিগুন হয়ে যেত। চুক্তি শেষে কেউ কেউ দেশে ফিরে এলেও অনেকে ওইসব দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। মূলতঃ মহিলারা দীর্ঘদিন দূর-দেশে শ্রমিকের কাজ করার পর নিজের পরিবারে গ্রহনযোগ্য না হওয়ার আশঙ্কায় সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিত প্রায়শঃই।

চুক্তিভিত্তিক এই শ্রমিকরা সব সময় চুপচাপ সহ্য করতো এমন নয়, কখনো কখনো তারা ইনডেনচার্ড লেবার সিস্টেমের বিরোধিতা করেছে। এই কঠোর অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সরকারের এজেন্টদের কাছে স্মারকলিপিও পাঠিয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এই শ্রমিকরা বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত বা প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে, কিন্তু এর ফলে অত্যাচার আরো বেড়েছে। পরবর্তীকালে এই বিরোধ একটা সংগঠিত রূপ পায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হাত ধরে। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিকদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ সালে ইনডেনচার্ড সিস্টেমকে বাতিল বলে ঘোষনা করেন।[vi]

আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া দাদা শুক্লসুন্দরের উড়িষ্যায় জাজপুরের কাছে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, কন্যাসম বিধবা ভগিনীর ম্লেচ্ছ দ্বারা ধর্ষণ, এর ফলে কুসংস্কারগ্রস্থ রক্ষণশীল সমাজপতিদের নানাবিধ অন্যায় বিধান কৃষ্ণসুন্দরকে একপ্রকার বাধ্যই করে সপরিবারে দেশান্তরী হতে। হিন্দুশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যকরণ, গনিত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা কৃষ্ণসুন্দর হরিহর নামক আড়কাঠির মিথ্যা প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে পুরোহিতের কাজ পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে কোলকাতায় যায় এবং সেখান থেকে এজেন্ট নবকিশোর দত্তের ডিপোতে ঠাই হয় যতদিন না পর্যন্ত ব্রিটিশ গুয়েনায় যাওয়ার জাহাজ ছাড়ে। কৃষ্ণসুন্দর গিরমিটওয়ালার মাধ্যমে লেখিকা সেযুগের ইনডেনচার্ড শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন কিংবা আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য লড়াইয়ের বিষয়গুলি, ব্রাহ্মসমাজের নারীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে কৃষ্ণসুন্দরের বিধবা ভগিনী ভুবনমণির জড়িয়ে পড়া, কৃষ্ণসুন্দরের দশম বর্ষীয়া কন্যা অপালাকে জোরপূর্বক ইনডেনচার এজেন্ট পঞ্চাশোর্ধ অপুত্রক নবকিশোর দত্তের পুত্র

কামনায় বিবাহ করা, ছোট কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া লোপামুদ্রাকে প্রায়-অপহরণ করে আটকে রাখা, নবকিশোর দত্তের প্রথমা স্ত্রীর সহযোগীতায় সেন্ট লরেন্স জাহাজ থেকে লোপামুদ্রাকে উদ্ধার এই সমস্ত ঘটনাবলী সুকৌশলে সাজিয়ে লেখিকা উনবিংশ শতকের একটি সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী মেটিয়াবুরুজে এক আনন্দনগরী গড়ে তুলেছেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পেনশনের টাকায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেখানে অবাধ প্রবেশ। বৃদ্ধ নবাব সঙ্গীত চর্চা আর শায়েরী লিখে দিনাতিপাত করেন। তাঁর শখের চিড়িয়াখানায় নবকিশোর দত্ত বহুমূল্যের বিনিময়ে পাখি সাপ্লাই দেয় বুলবুল মিয়াঁর মাধ্যমে। এই বুলবুল মিয়াঁ আসলে কৃষ্ণসুন্দরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দাদা শুক্লসুন্দর, প্রেমের কারণে যিনি মুসলমান হয়েছেন। এই শুক্লসুন্দর ওরফে বুলবুল মিয়াঁর হাতেই সেন্ট লরেন্স জাহাজের কেবিনে নবকিশোর দত্তের জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে তাঁর ভাই কৃষ্ণসুন্দরের জীবনের এই চরম দুর্দশার প্রতিশোধ হেতু।

ইনডেনচার্ড লেবার সিস্টেমকে কেন্দ্র করে 'নারাচ' উপন্যাসটি উনবিংশ শতকের নানান ভাঙা-গড়ার সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি ঐতিহাসিক দলিল। কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যাওয়া কিংবা অনালোচিত এই ধরনের লিটল হিস্ট্রি বা ছোট ইতিহাস, ইতিহাসের আর্কাইভ যে খোঁজ দিতে পারে না- সাহিত্যই পারে। এখানেই দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের 'নারাচ' ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র :

1. 'নারাচ'- দেবারতি মুখোপাধ্যায়, আগস্ট ২০২০ ।
2. Indentured Labour from India in the Age of Empire Author(s): Sunanda Sen Source: Social Scientist , January–February 2016, Vol. 44, No. 1/2 pp. 35-74

3. Recruiting Indentured Labour for Overseas Colonies, circa 1834–1910 Author(s): Madhwi Source: Social Scientist , September–October 2015, Vol. 43, No. 9/10 pp. 53-68
4. Boer, Nienke. March 19, 2019. "Indenture." Global South Studies: A Collective Publication with The Global South.
5. Indentured labour from South Asia (1834-1917)' in 'Striking Women: South Asian workers' struggles in the Uk labour market from Grunwick to Gate Gourmet' project. striking-women.org
6. -do-

দেশভাগ ও স্বদেশপ্রেমের আলোকে সমরেশ মজুমদারের অনুপ্রবেশ

আবদুল্লা রহমান
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ছবি আমরা পাই সমকালীন ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায়। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল প্রায় দুশো বছর ঔপনিবেশিক ইংরেজদের হাতে বাংলার শাসন ভার ছিল । মধ্যযুগের ইসলাম রাজের সময় থেকে বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি সহাবস্থান করে এসেছিল বহুবছর। তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ মাঝে মধ্যে নিশ্চয় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তা ভিন্নরূপ নেয়। ইংরেজরা নিজেদের শাসনকার্য সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য, বিরুদ্ধ শক্তির একতাকে বিচ্ছিন্ন করতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম সমাজের চিন্তা চেতনায় একটা বদল এসেছিল। মুসলিম সমাজ কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশে মুসলিম স্বার্থের ক্ষতির কালো মেঘ দেখলেন। যদিও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করা। মুসলিম সমাজ এযাবৎ ইংরেজদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তাদের অভিমান, আত্মদম্ভ তাদের অনেকটা সময় পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম বলেছিলেন 'মুসলমানেরা শাসক জাতি'। তাদের সম্বিত ফিরলো। তারা কংগ্রেসকে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার সংগঠন মনে করে কংগ্রেস থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয়। তারা মনে করেছিল যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করলে তারা শাসক ইংরেজদের কাছাকাছি আসতে পারবে । আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরিতে মুসলমানদের আরও সুযোগের পথ প্রশস্ত হবে । আর সামগ্রিকভাবে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা পাবে।কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজরা মুসলিমদের এই আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের অস্তিত্ব আরও সুদৃঢ় করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ দেখা দেয়। একটা সময় রব ওঠে হিন্দুদের ভাষা হিন্দি, মুসলিমদের ভাষা হবে উর্দু । উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গোহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা গিয়েছিল । যদিও বাংলায় এই আন্দোলনের কোনো প্রভাবই পড়েনি । ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে আরও উসকে দেয় ১৯০৫ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের মতো একটা সিদ্বান্ত নিয়ে । সাময়িকভাবে বঙ্গভঙ্গকে ঠেকানো গেলেও ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে আটকানো যায় না । ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৎকালীন মুসলিম লীগ প্রধান মহম্মদ আলী জিন্না ধর্মীয় মেরুকরণকে গুরুত্ব দেন । তিনি 'ইসলাম বিপন্ন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চলতে থাকেন । মুসলিম লীগের মতোই হিন্দু মহাসভা দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে সওয়াল করে । ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালের হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি রাখেন বীর সাভারকার । এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল ।১৯৪৭ সালের ২ জুন সর্বদলীয় বৈঠকে মাউন্ট ব্যাটনের দেশভাগের প্রস্তাবে সমস্ত দলই সমর্থন জানিয়েছিল । দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হল দেশ । ভাগ হল রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের সোনার বাংলা । ভারতবর্ষের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা পাকিস্থানের অধীনে চলে যায়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার ও পাঞ্জাবের রক্তস্নাত দাঙ্গা পেরিয়ে এল স্বাধীনতা। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে রিক্ত হাতে পূর্ববঙ্গের দিকে যেমন পাড়ি দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একাংশ । তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে অগণিত হিন্দু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে । কিছু মানুষ বুঝতেই পারেনি দেশভাগ কেন হল । মুসাফিরের মতো মানুষের মিছিল এসেছিল সীমান্ত থেকে । আজও পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ অনুপ্রবেশ করে ভারতে রাতের অন্ধকারে কাঁটাতার পেরিয়ে । এই দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় সাহিত্য রচিত হয়েছে । বিশেষকরে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা অসংখ্য রচিত হয়েছে দুই বাংলায় ।

দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অনুপ্রবেশকারী বিষয়ক বেশ কিছু উপন্যাস রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি কালো মেয়ের কথা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন',

'পূর্বপশ্চিম', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড', 'নির্বাস', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', অমর মিত্রের 'ধুলোগ্রাম', সমরেশ মজুমদারের 'অনুপ্রবেশ' ইত্যাদি। ওপার বাংলার লেখকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমরা এখানে আলোচনা করবো দেশভাগের পরবর্তী সময়ের উপন্যাসের ধারায় সমরেশ মজুমদারের 'অনুপ্রবেশ' কীভাবে নিম্ন মধ্যবিত্তের কাহিনি থেকে স্বদেশপ্রেমের আলেখ্য হয়ে উঠেছে ।

একুশ শতকের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম একজন সমরেশ মজুমদার । যদিও তিনি বিশ শতক থেকেই সাহিত্য সাধনা করছেন । তিনি শুধু তাঁর লেখনী গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনি থেকে কিশোর উপন্যাস লিখনীতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' দেশ পত্রিকায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় । সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'সাতকাহন' , 'তেরো পার্বণ' , 'স্বপ্নের বাজার', 'উজান গঙ্গা' , 'ভিক্টোরিয়ার বাগান' ইত্যাদি । তাঁর অনিমেষ চতুষ্ক 'কালবেলা' , 'কালপুরুষ', 'উত্তরাধিকার' ও 'মৌষলকাল' বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁকে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী করেছে । ১৯৮৪ সালে তিনি 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরুস্কার পান ।

'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসটির শুরুতে দেখা যায় ঢাকার বাসুদেব দত্তের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের চিত্র । যে পরিবারের চারজন সদস্য বাসুদেব, তার স্ত্রী, তার পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও কন্যা সুলতা । উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথ অনার্স গ্র্যাজুয়েট। তারপর আর পড়াশুনো তার এগোয়নি, কেননা তার পড়াশুনো চালাতে হলে বোন সুলতার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যায় । এ যেন আমাদের চির পরিচিত একটি বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার । যারা একঘেয়েমি জীবনযাপন করে, যাদের রুচি বদলের ইচ্ছে থাকলেও উপায় করে উঠতে পারে না । যার চিত্র আমরা মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ' উপন্যাসেও পাই । 'বিষাদবৃক্ষ' উপন্যাসটিতে ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হালচাল অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে অনার্স গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবক রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা চড়াই উত্তরাই নিয়ে ।

বাসুদেববাবু চাইছেন রবীন্দ্রনাথ ভারতে তার মাসি শীলার বাড়িতে থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াক । শুধু তাই নয় তিনি স্ত্রী , কন্যাকেও ভারতে পাঠানোর কথা ভেবেছেন:

> *"এখানকার হাওয়া ভাল ঠেকছে না , ক'দিন থেকে ভাবছি তোমাদের তিনজনকেই ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেব। "* [১]

আসলে বাসুদেব বাবুদের মতো বাংলাদেশে থাকা হিন্দুরা নিজেদেরকে সেখানে সুরক্ষিত মনে করছেন না । কেননা বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ । সেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু । নিজেদের সেখানে অসহায় অনুভব করেন । তাই বাসুদেব বাবুর মতো পূর্ব বাংলার হিন্দুরা ভারতে আসার কথা বলেছেন । দেশ ভাগের পর ওপার বাংলার হিন্দুরা মুসলিমদের অত্যাচারেই হোক কিংবা নিজেদের সুবিধায় হোক ভারতে আসতে শুরু করে। উচ্চতর জীবন জীবিকার সন্ধানে । বাসুদেববাবুও রবীন্দ্রনাথকে ভারতে পাঠাতে চান । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনোভাবেই বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে চিরতরে বসবাস করার কথা ভাবতে পারে না । কেননা তার দেশ ও মাটির প্রতি টান তাকে দেশের গন্ডীর বাইরে যেতে দেয় না । তাকে বলতে শোনা যায়:

> *"এই বাংলাদেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে যাবে কেন ? লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে এই বাংলাদেশে কাজকর্ম করে যদি বেঁচে থাকে তা হলে সে পারবে না কেন ?"* [২]

রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে শান্তি ও বাবার মুখ বন্ধ করতে পাসপোর্টের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় পাসপোর্ট এলে কয়েক দিন কলকাতা শহর দেখে ফিরে আসবে । উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রবীন্দ্রনাথ, আনোয়ার, বিশ্বনাথ ও মতিনের বন্ধুত্ব । যদিও তাদের মধ্যে রাগ-অভিমান, মনোমালিন্য হয় । কিন্তু তা সাময়িক , তাদের বন্ধুত্বের নৈকট্যের কাছে এসব তুচ্ছ । আসলে এই বন্ধুত্ব বাঙালি মজ্জায় যুগ যুগ ধরে বহমান । বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম এবং বন্ধুত্বকে এক সাথে করেন না । বন্ধুর বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়ানোই তো বন্ধুত্ব । তার প্রমাণ আনোয়ার ও বিশ্বনাথ দিয়েছে , রবীন্দ্রনাথের দুঃসময়ে । শাহবাগ ক্লাবের গেস্ট হাউসে কাজ করার সময় বিপ্রদাস সেন নামে এক বাঙালি আমেরিকান প্রবাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের । তিনি রবীন্দ্রনাথকে সোনার গাঁ'তে আকবর হক সাহেব নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে একটি নতুন কাজের সন্ধান দেন । আড়াইশো বছরের

পুরোনো কিছু ফাইল নকলের কাজ । কাজ চলতে থাকে , এদিকে সেখানে একরাত্রিতে জোড়া খুন হয়। বিপ্রদাস তাকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখান। কিন্তু যে পত্রিকার কাজের জন্য তাকে আমেরিকা যেতে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ জানতে পারে সেই পত্রিকার অবস্থা ভালো নয় । তার ভিসা বাতিল হয়ে যায়, এদিকে তার কাজটিও চলে যায় ।এখানে বলে রাখা দরকার গোটা দুনিয়াতে এভাবেই রবীন্দ্রনাথের মতো সহজ সরল মানুষেরা বিপ্রদাস সেনদের দ্বারা প্রতিনিয়তই প্রতারিত হচ্ছে । কেননা আগের চাকুরিতে সুখেই দিনপাত করছিল সে । হঠাৎ করে সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের জীবনের।

বিপ্রদাস তাকে আরও একটি দুঃসংবাদ জানান যে আকবর হক সাহেবের বাড়িতে খুনের ব্যাপারে পুলিশ তাকে জেরা করতে তার বাড়িতে খুব শীঘ্রই যাবে । এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জোড়া খুনের কেসে তাকে ফাঁসানো হয়েছে । এরপর দিশেহারা হয়ে রবীন্দ্রনাথ কী করবে কিছুই ভেবে পায় না । শেষে অগত্যা আর কিছু উপায় চিন্তা করতে না পেরে সে দেশ ছাড়ার সিদ্বান্ত নেয় । আসলে সবাই শুধু নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ভারতে আসে নি , রবীন্দ্রনাথ মতো কেউ কেউ যে রাতের অন্ধকারে শুধু মাত্র মানের ভয়ে নিজের সর্বস্ব ওপারে রেখে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসেছে তার প্রমাণ পাই মেলে এই উপন্যাসে। কেননা যে রবীন্দ্রনাথকে একদিন তার বাবা ভারতে যাওয়ার কথা বলেছিল বলে তার মনে হয়েছিল:

" বাবা নিজেকে বাংলাদেশি না ভেবে, একটু বেশি হিন্দু ভাবছে । "[৩]

আসলে রবীন্দ্রনাথ তার বাবার সম্পর্কে যে চিন্তা করেছে । তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ধর্মীয় চিন্তা । পৃথিবীর যে কোনো দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের কাছে ভারত একটি তীর্থক্ষেত্র । তাই তাদের ভারতের প্রতি টানটা অস্বাভাবিক নয় । অন্যদিকে মুসলিমদের মধ্য-প্রাচ্য তথা আরব দুনিয়া একটা স্বপ্ন । তার চিন্তা তাদের ছোটোবেলা থেকেই মজ্জায় নিহিত থাকে "হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা"। রবীন্দ্রনাথ রাতের অন্ধকারে গোপন পথ দিয়ে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ভারতে এসে পৌঁছোয়। মাসি বাড়িতে পৌঁছে মাসির সাথে কথা বলার সময় তাকে বলতে শোনা যায়:

" জানো, আসার সময় মনে হচ্ছিল আমি বাংলাদেশেই আছি ।"[৪]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এপার আর ওপার বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায়নি। এই কাঁটাতার আসলে শুধু জোর করে দিয়ে ভাগ করা হয়েছে বঙ্গদেশকে । এপার ওপার বাংলার নদী-নালা , কৃষি জমি , গাছপালা , পশু-পাখি সবই তো একই রকম । আর সর্বোপরি মুখের ভাষাও বাংলা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মাসি বাড়ি এসে বুঝতে পারে তার বাবা মা তাকে এখানে যে আশা নিয়ে পাঠিয়েছেন তা বাস্তবে সম্ভব নয় । তার মেসোর কথাবার্তায় সে বুঝতে পারে তাকে এখানে রাখাটা তিনি নিরাপদ মনে করছেন না । আর তা স্বাভাবিকও বটে । এদিকে তার এখানে থাকাটা পাঁচ কান হতে থাকে। তার মেসোমশাইকে থানার বড়ো বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন । আসলে পাড়া গাঁয়ের মানুষ অন্যের বাড়িতে কে এসেছে সেটা নিয়ে বেশি কৌতূহলী । রবীন্দ্রনাথকে তাদের চোখ এড়ায়না । তার হাবভাব, চাল চলন দেখে তারা সন্দেহ করতে শুরু করে, এসব সাত পাঁচ কথা থেকেই পুলিশের কান পর্যন্ত কথাটা পৌঁছোয় ।

এই প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশকারী দের সম্পর্কে দু এক কথা না বললেই নয় । দুই বাংলার বিভাজনজনিত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা থেকে উচ্চারিত হতে হতে কেটে গেছে কয়েক দশক। অবিরাম চলছে গোপনে অনুপ্রবেশ , চোরাচালান সীমান্ত অঞ্চলের অপরাধ। কেবলমাত্র বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীই নয় , বাংলাদেশ সরকার যাদের স্থান দেয় নি, সেই রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরাও মায়ানমার থেকে উৎখাত হয়ে জলপথে বা স্থলপথে ভারতে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ভারত সরকার এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে সীমা সুরক্ষা ও তার পাশাপাশি NRC নামে একটি নাগরিকত্ব আইন বলবৎ করেছে ।রবীন্দ্রনাথের মাসির দেওরের মেয়ে স্বপ্না তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় কলকাতায় । স্বপ্নার কাছে পাওয়া ঝন্টুর ঠিকানা খুঁজে বের করার সময়, পথে যেতে যেতে তার মনে হয়েছে:

> *"এই কলকাতায় বোধ হয় সবাই একা একা বেঁচে থাকে, কেউ কারও খবর রাখে না ।"*[৫]

গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিক কলকাতাবাসীকে নতুন লাগাটা খুব অস্বাভাবিক নয় । কেননা গ্রামের মানুষ রাস্তায় দেখা হলে ভাব জমায় , বাড়িতে বসে গল্পের আসর , পাড়ায় পাড়ায় তাসের আড্ডা । আসলে এখানে লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নগরসভ্যতা ও গ্রামীণজীবন দুইয়ের তুলনা।

ঝন্টুর ঠিকানায় পৌঁছে এক নতুন ধরনের জীবনপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হয় রবীন্দ্রনাথ । ঝন্টুকে কেমন জানি অগোছালো মনে হয় তার । ঝন্টু গভীর রাতে বাড়িতে ফেরে , ড্রিঙ্ক করে এসব দেখে রবীন্দ্রনাথের মন কিছুতেই এখানে থাকতে সায় দিচ্ছিল না , কিন্তু কোনো উপায় না থাকায় তাকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে ঝন্টুর সাথে থাকতে হয় । এখান থেকে শুরু হয়ে যায় তার নতুন জীবন । ঝন্টু রবীন্দ্রনাথের পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ভারতীয় কাগজপত্র তৈরি করতে দেয় । ঝন্টুর সাথে কাজ করার সময় বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আনকোরা রবীন্দ্রনাথ ঝন্টুকে চমকে দেয় । কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় কাগজপত্র তৈরি হয়ে আসে । এখানেই আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের মাতৃভূমি-জন্মভূমির প্রতি টানকে । সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না এই ভারতীয় নাগরিকত্ব । এটাকে নিছক অভিনয় বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় । তার মনে হয়:

> *"সে জন্মেছে বাংলাদেশে, সেখানে বড় হয়েছে । বিশে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গাইতে গাইতে রাস্তায় হেঁটেছে । 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বললেই বুক জুড়ে শান্তি অনুভব করতে পারে।"*[৬]

দেশ ও মাটির প্রতি এরকম টান আমরা লক্ষ্য করি হাসান আজিজুল হকের ‘বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থের ‘একটি নির্জল কথা’ নামে দেশভাগের পটভূমিতে লেখা একটি গল্পে দেশান্তরিত মা নিজের দেশ ছেড়ে , ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয় । তার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই আক্ষেপের সুর ‘আমার মাটিটো ক্যানে কেড়ে লিবি ?’ এখানেই দেশ-মাটি-মানুষ যেন একাকার হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ তার বাড়িতে থাকায় শহুরে জীবনে অভ্যস্ত ঝন্টুর প্রবলেম হতে থাকে। সে বাড়িতে মেয়ে মানুষ নিয়ে আসতে পারে না । তাই সে রবীন্দ্রনাথকে অন্যত্র বাড়ি দেখার কথা বলে । রবীন্দ্রনাথ দুই একটা জায়গায় খোঁজ করে শেষে স্বপ্নার সহায়তায় তার ভাড়া ফ্ল্যাটের রুমের পাশেই একটি রুম পায় । এদিকে দালালির

ব্যবসাকে ভালো করে আয়ত্ত করে নেয় রবীন্দ্রনাথ । স্বপ্না তাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাওয়া নিয়ে খোঁটা দিলে সে বলে:

> *"আমি ভেবে রেখেছি , যখন বাংলাদেশ যাব এগুলো ছিঁড়ে ফেলে যাব।"*[৭]

রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী জীবনে তার সব থেকে কাছের যদি কেউ হয়ে ওঠে সে এই স্বপ্না। স্বপ্না একুশ শতকের একজন স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী মেয়ে । রবীন্দ্রনাথ যদি কাউকে ভালোবেসে ছিল সে স্বপ্না । স্বপ্নাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের ভালোমানুষী কে ভালোবেসে ফেলেছিল । রবীন্দ্রনাথকে বসিরহাট থেকে সমূহ বিপদ থেকে বাঁচানো, তার বাবা মাকে বর্ডার সীমান্তে আনতে যাওয়া । আর তার নিজের রুম তাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে হোস্টেলে ওঠা এসবই তার প্রমাণ দেয় । এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো স্বপ্না এর আগে একজনকে ভালোবেসে ছিল । যে তাকে ঠকিয়েছে । স্বপ্না নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল একটা সময়। এই সময় স্বপ্না কাউকে সঙ্গী হিসেবে পাশে পেতে চেয়েছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল । কিন্তু স্বপ্না তাকে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। 'তাহলে তোমাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে'। আসলে স্বাধীনচেতা স্বপ্না রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় নাগরিকত্বকে মেনে নিতে পারে নি। কলকাতার দালালি ব্যবসার রবীন্দ্রনাথকে তার মেকি মনে হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্না বলেছে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালে তাকে মেনে নিতে তার কোনো অসুবিধা হবে না । রবীন্দ্রনাথের দেশ ও মাটির টানকে আরও দৃঢ় করেছে স্বপ্না । তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্বপ্নার গুরুত্ব অপরিসীম । যদিও রবীন্দ্রনাথ মনে মনে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার কথাই ভেবে ছিল । তবুও স্বপ্না কোথাও যেন তাতে আরও তীব্রতা এনে দিয়েছে । স্বপ্না কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনে ধরিত্রী কন্যা রূপেই এসেছে । কেননা স্বপ্না তাকে সমূহ বিপদ বাঁচিয়েছে আবার রবীন্দ্রনাথের দোদুল্যমান অবস্থায় তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় ফিরে যেতে বলেছে।

ভারতে এসে বাসুদেববাবু রবীন্দ্রনাথকে জানান বিপ্রদাস সেন তার খোঁজ করতে বাড়িতে এসেছিলেন । এখানেই একটি নতুন বাঁক নেয় । অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাকি সবার পরামর্শে তার জীবনে রাহু-সম সেন বাবুকে ডেকে এনে আবার গ্রহণ লাগায় সে। বিপ্রদাস সেন তাকে একটি অভিযানের কথা বলে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাওয়ার কথা

বলেন । রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাদেশে থাকাকালীন একবার আমেরিকা যাওয়ার জন্য ভিসা করেছিল এটা সে ভুলে গিয়ে আবার ভারত থেকে ভিসার জন্য আবেদন করে । সেখানেই তাকে পূর্ব ভিসার জন্য আবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেখানকার এক অফিসার । আর এখানেই প্রমাণিত হয় যে সে একজন অনুপ্রবেশকারী । এরপর রবীন্দ্রনাথ চারিদিকে অন্ধকার দেখতে থাকে কী করবে ভেবে কূল কিনারা করতে পারে না। শেষে স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলে সে বাংলাদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । এরকম টালমাটাল অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বাস ধরে প্রথমে দমদম, তারপর ট্রেনে বনগাঁতে পৌঁছোয় । সেখান থেকে হারু নামের এক পাচারকারীর সহায়তায় সে দুই দেশের সীমান্তে এসে পৌঁছোয় , তাকে পথের নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে জগদীশ নামে আর এক পাচারকারীকে দেয় হারু যে তাকে যাওয়ার পথে সাহায্য করবে:

> *"আধ মাইল দূরে একটা খাল পাবেন। কোমর অবধি জল। ওখানে বেড়ে ভেঙে গিয়েছে। এখনও ঠিক করে নি। ও আপনাকে খাল পার করে চলে আসবে। ওপারটা বাংলাদেশ।"*[৮]

জগদীশকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথ । তাদের যাওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় সেনা । বাঁশি বেজে ওঠে টর্চ লাইটের আলোতে চারিদিক দেখা হয় । খালের জলে আলো ফেললে রবীন্দ্রনাথ সেখানে থাকা কচুরিপানার স্তূপে মাথা ডুবিয়ে আত্মরক্ষা করে । যখন রবীন্দ্রনাথ চারিদিক শূন্য দেখেছিল তখন তার মনে হয়েছিল সে কিছুতেই ধরা দেবে না। প্রাণপণ করে গুলি খেয়ে 'মরতে হলে সে বাংলাদেশের মাটিতেই মরবে'। রবীন্দ্রনাথ ফিরে যাওয়া জগদীশের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল । আলো সরে যেতেই সে আবার দ্রুত খাল পথ ভেঙে হাঁটতে শুরু করে । ওপারের মাটিতে পা রাখতেই তার মনে হল 'আঃ , কী শান্তি !' পরিশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ মড়ার মতো মাটিতে পড়ে থাকে । পায়ে অসম্ভব ব্যথা অনুভব করে সে । এমন সময়:

> *"হঠাৎ করে নাকে অদ্ভূত ঘ্রাণ পেল রবীন্দ্রনাথ । মাটির গন্ধ । সে চোখ বন্ধ করল, ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। "*[৯]

রবীন্দ্রনাথের এরকম দেশ ও মাটির প্রতি টান-ভালোবাসা আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

শিবনাথও রবীন্দ্রনাথের মতো তৃষ্ণার্ত শুষ্ক মাটির জল শুষে নেওয়ার শব্দ অনুভব করতে পেরেছিল । মাটির বেদনা, হাহাকার শুনতে পেয়েছিল শিবনাথ :

> *“উঃ, তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে ! মাটি কথা কহিতেছে । মাটি-মা-দেশ জন্মভূমি কথা কহিতেছে । চোখ তাহার ক্রমশ জলে ভরিয়া উঠিল।”*[১০]

রাতের অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলতে থাকে। একটি নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে । এই প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসের মেজোবউয়ের কথা বলা যায় , তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন ‘সকাল হোক, আলো ফুটুক, ত্যাকন পুবদিকে মুখ করে বসব।’ এই ভাবে প্রতিটি আশাহত মানুষ নতুন সূর্যোদয়ে নিজের গ্লানিকে, কষ্টকে , একাকীত্বকে ভুলে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে । বাংলাদেশের সেনার কাছে ধরা পরে সে অকপটে স্বীকার করেছে:

> *" ভুল করে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলাম ।...যদি পাঠান তাহলে একটুও কষ্ট পাব না , কারণ জানব দেশের জেলেই আছি ।"*[১১]

যদিও উপন্যাসের সমাপ্তিতে আমরা দেখি তাকে জেলে যেতে হয় নি । তার বাড়িতে ফোন করে তার কথার সত্যতা যাচাই করে তাকে ছেড়ে দেয় বাংলাদেশি সেনা । উপন্যাসের শেষ বাক্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কাঁদতে দেখি:

> *" রবীন্দ্রনাথ কেঁদে ফেলল । বুকের ভিতরে এত মেঘ জমে ছিল, তা তার জানা ছিল না । "*[১২]

এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এই কান্নার কারণ কী ? আসলে এটা রবীন্দ্রনাথের দেশ ও মাটির অকৃত্রিম টানেরই বহিঃপ্রকাশ । সে নিজের দেশে ফিরে এসেছে এটাই তার কাছে জাগতিক সমস্ত চাওয়া পাওয়ার উপরে । দেশের প্রতি , দেশের মাটির প্রতি এই টান আমাদের একটি অতি পরিচিত নজরুল গীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ‘ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।’ যে গানটিতেও যে কোনো কিছুর উর্ধ্বে দেশ ও দেশের মাটি গুরুত্ব পেয়েছে ।

পরিশেষে বলা যায় সমগ্র উপন্যাসটির আলোচনায় একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্মহীন বেকার ছেলের জীবনের চড়াই উতরাইয়ের ছবি ফুটে উঠেছে ।

উপন্যাসের নায়ক রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের জীবনে দ্বন্দ্ব এসেছে বারবার । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটির একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা হল তার দেশপ্রেম । রবীন্দ্রনাথ প্রবাস জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নি । মিথ্যা খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়ে, পিতা বাসুদেদের বারবার দেওয়া তাগাদায় অসহায় হয়ে রবীন্দ্রনাথ রাতের অন্ধকারে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে এসেছিল । কলকাতার নাগরিক জীবন তাকে তার স্বদেশপ্রেমকে ভুলিয়ে দিতে পারে নি । কলকাতায় বানানো জাল ডকুমেন্টস রবীন্দ্রনাথ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার বাসনা কখনো মরে যায় নি । এখানেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্বপশ্চিম' উপন্যাসের অতীনের সাথে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য । রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, অনুভব করতে পেরেছিল মাটির ঘ্রাণ, ভালোবেসে ছিল স্বদেশকে, দেশের মানুষকে ।এভাবেই 'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসটি দেশভাগের পরবর্তী সময়ে স্বদেশপ্রেমের আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. সমরেশ মজুমদার। ২০১৫। অনুপ্রবেশ।কলকাতা।আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড(প্রথম প্রকাশ)। পৃ. ৮

২. তদেব। পৃ. ১৪

৩. তদেব। পৃ. ৬৯

৪. তদেব। পৃ. ৯৬

৫. তদেব। পৃ. ১১৬

৬. তদেব। পৃ. ১৩০

৭. তদেব। পৃ. ১৩৪

৮. তদেব। পৃ. ১৮০

৯. তদেব। পৃ. ১৮২

১০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।১৩৯১ বঙ্গাব্দ। তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খন্ড)। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স(চতুর্থ মুদ্রণ)। পৃ. ২৬৫

১১. সমরেশ মজুমদার। ২০১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮৩

১২. তদেব। পৃ. ১৮৩

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :

১. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০১৩। বিভাজনের পশ্চাৎপট। কলকাতা। রিডার্স সার্ভিস (প্রথম প্রকাশ)।

২. পঞ্চানন সাহা। ২০০৭। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : নতুন ভাবনা। কলকাতা। বিশ্ববীক্ষা (তৃতীয় সংস্করণ)।

৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৮। জিন্না : পাকিস্থান নতুন ভাবনা। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স (প্রথম প্রকাশ)।

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ২০১৬। কালের প্রতিমা। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং (পঞ্চম সংস্করণ)।

৫. সুজাতা বন্দোপাধ্যায়। ২০১৫। দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য বর্তমান প্রেক্ষিতে। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (প্রথম প্রকাশ)।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা। ২ জুন২০১৫। কলকাতা।

৭. হাসান আজিজুল হক। ২০০৭। বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প। ঢাকা।সময় প্রকাশন (প্রথম প্রকাশ)।

তথ্য সূত্রঃ

i.‘নারাচ’- দেবারতি মুখোপাধ্যায়, আগস্ট ২০২০ |

[ii] Indentured Labour from India in the Age of Empire Author(s): Sunanda Sen Source: Social Scientist , January– February 2016, Vol. 44, No. 1/2 pp. 35-74

[iii] Recruiting Indentured Labour for Overseas Colonies, circa 1834–1910 Author(s): Madhwi Source: Social Scientist , September–October 2015, Vol. 43, No. 9/10 pp. 53-68

[iv] Boer, Nienke. March 19, 2019. "Indenture." Global South Studies: A Collective Publication with The Global South.

[v] Indentured labour from South Asia (1834-1917)' in 'Striking Women: South Asian workers' struggles in the Uk labour market from Grunwick to Gate Gourmet' project. striking-women.org

[vi] -do-

সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতঃ মন্দাক্রান্তা সেনের 'ঝাঁপতাল'

শম্পা সিনহা বসু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দি ভবানীপুর এডুকেশান সোসাইটি কলেজ

সারসংক্ষেপ : *তিথি ও পার্থর পারস্পরিক ভালোবাসা ও দাম্পত্য জীবনের উত্থান পতনের নানা ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে মন্দাক্রান্তা সেনের প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁপতাল'। পার্থর ভালবাসাকে সঙ্গী করে তিথির পিতৃগৃহ ত্যাগ ছিল তিথির জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। নিষ্কর্মা পার্থকে ভালোবেসে শ্বশুরবাড়িতে তিথিও তার সম্মানের জায়গা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ি বর ননদ সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলতে একসময় তিথি তার নিজস্বতা হারিয়ে বসে। অনেক ঝড় ঝাপটার পর তিথির মনের ওপর থেকে পার্থর ভালোবাসার পর্দাটা ক্রমশ সরে যায়। পার্থ, তার মা ও বোনের সঙ্কীর্ণ মন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তিথি। অবশেষে নিজের মতো করে বাঁচার জন্য, নিজেকে আরও একবার নূতন করে আবিষ্কার করার জন্য শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে তিথি। যে তিথি একদিন পার্থকে ভরসা করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেই তিথি অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার জন্য শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে গেছে তার মা বাবার শান্তির আশ্রয়ে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকে নূতন করে তার জীবনটা গড়ে নিয়েছে। তার পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছে। সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপনার পেশায় নিযুক্ত করেছে নিজেকে।*

সূচক শব্দ : *ঝাঁপ, অন্ধকার, আলো, ভালোবাসা, প্রতিবাদ*

'একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে এখনও পায়ের তলায় মাটি পায়নি, এত তাড়াতাড়ি আরও একটা ভুল সে কিছুতেই করবে না'[১] স্পর্ধিত উক্তিটি মন্দাক্রান্তা সেনের 'ঝাঁপতাল' উপন্যাসের তিথির। জনপ্রিয় সাহিত্যিক মন্দাক্রান্তা সেনের সাহিত্যজগতে হাতেখড়ি কবিতা লিখে। মন্দাক্রান্তার প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁপতাল' প্রকাশিত হয়েছে ১৪০৭ সনের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায়। এরপর মন্দাক্রান্তার লেখনী থেকে বেরিয়েছে 'দলছুট' (২০০২), সহাবস্থান (২০০৪) প্রভৃতি উপন্যাস।

সাধারণ, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তিথি 'তার বরাবরের প্রিয় সাবজেক্ট' জিওগ্রাফি নিয়ে ভর্তি হয়েছেকলেজে। তিথি নিজেকে বড় মনে করলেও তার দাদা তমালের কাছে সে 'ছোট ও ফালতু', 'অপদার্থ'। তিথি অবশ্য দাদার কথায় কর্ণপাত করে না। তাই

পূজোর সময় তিথি তার বন্ধু মৌসুমি ও তার খুড়তুতো দাদা পার্থর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোয়। প্রথম দেখাতেই তিথির থেকে বারো বছরের বড় পার্থকে তার ভাল লাগে। সেই ভালোলাগা ভালোবাসাতে পৌঁছতে বেশি সময় নেয় না। মনের দিক থেকে পার্থ ও তিথি পরস্পর খুব কাছাকাছি চলে আসে।

তিথি বিশ্বাস করতে পারে না তার মতো কুৎসিত অপদার্থ মেয়েকে কারোর ভাল লাগতে পারে। 'একরম প্রেম তার জীবনে আসবে'[২] তিথি ভাবতে পারেনি কখনও। পার্থ ছিল তিথির জীবনের প্রথম পুরুষ, কিন্তু পার্থর জীবনে তিথি প্রথম নারী ছিল না। পার্থর জীবনের প্রথম নারী সুদক্ষিণা পার্থকে পাঁচ বছর ভালোবাসার পর তাকে ঠকিয়ে তার কাছে থেকে চলে যায়। ডাক্তারকে বিয়ে করে সংসারী হয়। পার্থর কষ্ট দেখে তিথির মনে হয় সে কখনও পার্থকে কষ্ট দেবে না। পার্থ এবং তিথির সম্পর্ক বাড়িতে জানাজানি হলে অশান্তির শেষ থাকে না। মা বাবার শত অনুরোধেও সে পার্থর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে না। তিথি জানত পার্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবুও তিথির মনে হয় – 'জীবনের এ কোন অদ্ভুত বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে সে, সামনের পথ এত ঝাপসা লাগছে কেন! ...... তিথির মনে হতে লাগল তার সামনে একটা গভীর, ভীষণ গভীর খাদ। খাদটা যেন খুব সবুজ ...... ওখানে যেতে হলে তাকে নীচে ঝাঁপ দিতে হবে। তিথির ঝাঁপ দিতে খুবভয় করছে, কিন্তু খাদটাও তাকে ডাকছে, তীব্রভাবে ডাকছে। ... তিথি চোখ বন্ধ করে ঝাঁপ দিল।'[৩] তিথি তার পরিবার এমনকি নিজের কথাও ভাবল না, শুধুমাত্র পার্থর ভালোবাসার ওপর ভরসা করে পার্থর সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়েতে রাজি হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রির পর তিথির মনের দোলাচলতা, যন্ত্রণা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন মন্দাক্রান্তা। 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি বিয়ে করলাম মাকে না জানিয়ে... আমি কখনও ভাবিনি ...। মা! মা! আমি বিয়ে করেছি, মা – ওমা! আজ আমার বিয়ে হয়ে গেল... তিথি আচমকা চাপা কান্নার দমকে ফুলে উঠছিল।'[৪] রেজিস্ট্রির পর তিথি পার্থদের বাড়িতে বেড়াতে এসে সেখানে পার্থদের যাপিত জীবন দেখে নিরাশ হয়। 'পার্থর বাড়িতে দুটো ছোট ঘর ... মনে হয়েছিল কোনও ঘরেই পা ফেলার জায়গা নেই, নিশ্বাস যেন বন্ধ লাগছে।'[৫] বাবা মার নিরাপত্তায় স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা তিথি কৌতূহলবশত পার্থকে জিজ্ঞাসা করেছিল তারা বিয়ের পর কোথায় থাকবে? পার্থ তিথিকে ভালো থাকার ও ভালো রাখার আশ্বাস দিয়েছিল। সরল তিথি পার্থকে বিশ্বাস করে পার্থর সঙ্গে

ভবিষ্যৎ জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে স্বপ্ন ও বাস্তবের পার্থক্যটা কিছুদিনের মধ্যেই টেরপায় তিথি।

পার্থর তিথিকে এইভাবে বিয়ে করাতে পার্থর বাবা অলকের একদমই সায় ছিল না। অলক জানত তার ছেলে নিষ্কর্মা, অপদার্থ। অলকের ক্রোধ ঝরে পড়ে তার উক্তিতে –'রাস্কেল তোমার এত হিম্মত, তুমি বিয়ে করেছ? নিজে তো কবেই গোল্লায় গেছ, আবার একটা পরের মেয়ের সর্বনাশ করলি তুই কোন আক্কেলে-।'[৬] বিয়ের পরে প্রথম পূজো তিথি তার শ্বশুরবাড়ির ভিটে বর্ধমানে সবার সঙ্গে কাটিয়েছে। সেখানেও এইভাবে বিয়ে করার অপরাধে তিথিকে নানাজনের কাছ থেকে কটু কথা শুনতে হয়েছে। তিথির মনে হয় 'তার স্বীকৃতির চারপাশে একটা অদ্ভুত শূন্যতা ভাসছে।'[৭] ওই শূন্যতাটুকু কাটাতে তিথি সারাদিন কাজে ডুবে থেকেছে।

তিথিরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর তার বাবা বিশ্বনাথ ও তার মা অদিতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেনি। কিন্তু মা বাবাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ভেতরে তিথি ছটফট করেছে। বিশ্বনাথ বা অদিতি এমনকি তিথির দাদা তমালও তিথির এই কাজকে সমর্থন করতে পারেনি। তারাও ভেতরে কষ্ট পেয়েছে। একটা নিষ্কর্মা ছেলেকে বিয়ে করে তিথি অল্প বয়সে সংসারের জালে আষ্টেপৃষ্টে বাধা পড়ুক তা অদিতি চায়নি। অদিতির দ্বিধাবিভক্ত মনের নিপুণ বর্ণনা করেছেন মন্দাক্রান্তা। 'তার একটা মন আকুল প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলছে-ঠাকুর ও যেখানে গেছে যেন সুখে থাকে, আরেকটা মন গোপনে অপেক্ষা করছে কবে তিথি পার্থকে ছেড়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসবে।'[৮] তিথির এই দুর্ঘটনার জন্য অদিতি নিজেকে অপারগ বলে মনে করেছে। তিথি শ্বশুরবাড়িতে বেকার স্বামীর অক্ষমতা ঢাকার জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে। সংসারের স্বচ্ছলতা আনার জন্য ও স্বামীর অপরাধ স্খালনের জন্য তিথি সিদ্ধান্ত নেয় সে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করবে। তিথি কলেজ যাওয়া শুরু করে। মাধুবউদির পরামর্শে সমস্ত তিক্ততা ভুলে সে তার মা বাবাকে চিঠি দেয়। তিথির শ্বশুরবাড়িতে পার্থর কোনও সম্মান নেই, অথচ সেই সম্মানহীনতা পার্থকে কোনভাবেই লজ্জিত করে না, কিন্তু তিথি লজ্জিত হয়। যার ভরসায় তিথি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এসেছিল সে যে সত্যিই ভরসার যোগ্য নয় তা তিথির বুঝতে দেরি হয় না, তিথির মনে হয় –'সে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খাদে পড়ে গিয়েও ক্রমশ আরও অতলে পিছলে যাচ্ছে সে। যে ভরসায় সে চোখ বুজে ঝাঁপ দিয়েছিল, তা সত্যি হয়নি। কেউ তাকে লুফে নেয়নি। তাকে নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়াতে হবে। অথচ খাদের গা এত ঢালু আর পিছল, সে দাঁড়ানোর জমি

তো দূরের কথা, পতন আটকানোর জন্যে আঁকড়ে ধরারই কিছু পাচ্ছে না।'[৯] সেই বিপদের দিনেও প্রতিবেশী মাধুবউদি তিথির দিকে সমস্ত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তিথির পড়ার জন্য দোতলায় একটা ঘরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। অদিতি বিশ্বনাথ সমস্ত ভুলে তিথিকে ক্ষমা করে দিয়ে তার চিঠির উত্তর দিয়েছে। মায়ের অনুরোধে তিথি ও পার্থ তার বাড়িতে এসেছে। সেখানে মা বাবার আন্তরিকতায় তিথি ব্যাকুল হয়ে ওঠে কিন্তু পার্থর অভদ্র আচরণ তিথিকে কষ্ট দেয়। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করতে থাকে অবিশ্বাস, হতাশা। অদিতি, বিশ্বনাথ, তমাল -সবাই তিথির শ্বশুরবাড়িতে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই 'কুৎসিত বাড়িতে' তিথি থাকে ভেবে অদিতি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। অদিতি তিথিকে সমস্ত আসবাবপত্র দেওয়ার প্রস্তাব রাখলে পার্থ তাতে সম্মতি জানায় কিন্তু তিথি এর প্রতিবাদ করে বলে – 'না একদম না ...... আমার বিয়ে কি তোমরা দিয়েছ যে ওইসব দিতে হবে? আমি তোমাদের কাছ থেকে ওসব কিছু নেব না।'[১০] তিথির কথাতে খুশি হতে পারেনা পার্থ। পার্থর স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদী চেহারা তিথির চোখের সামনে অনাবৃত হয়ে যায়। কলেজ থেকে ফিরে পার্থর সঙ্গে তিথি বোঝাপড়া করতে চায়। তিথি পার্থর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পার্থ তাকে স্ত্রীর কোন মর্যাদা দেয়নি। 'আমি তোমার স্ত্রী পার্থ! তোমার সঙ্গে আমার শুধু শোয়ার সম্পর্ক নয়! ...তুমি একটা দায়িত্বও পালন করেছ? আর আজ তুমি চাইছ আমার মা-বাবা আমাদের সব দেবে ......'[১১]তিথি ও পার্থর দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত ক্রমশ নড়বড়ে হতে থাকে, তাদের এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের সম্পর্ক থেকে রেহাই পেতে চায় তিথি।

পার্থর আধিপত্যের কাছে তিথি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল সংসারে শান্তি বজায় রাখতে। তিথি সবকিছু নীরবে মেনে নিয়েছিল, তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে আরো মজবুত করার জন্য, কিন্তু তিথি ও পার্থর বিবাহিত জীবন শান্তির হয়নি। ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে তিথির যাপিত জীবন। তাদের অশান্তি যখন চরমে পৌঁছল তখন তিথি অন্যায়কে সমর্থন না করে জানিয়েছে – 'আমাকে তুমি চেনো না পার্থ, একটুও চেনো না। তোমার জন্যে অনেক বদলেছি নিজেকে, আর নয়। এবার থেকে আমি নিজের মতো থাকব। দেখি তুমি কী করতে পারো!' [১২]

তিথি শুধু অন্তরের দিক থেকেই নয়, তার বাইরের সাজপোশাকেও পরিবর্তন এনেছে। হাতের শাঁখা পলা শাড়ি ছেড়েছে। এই নিয়ে তার শাশুড়ি সুধার কাছ থেকে নানা কটু কথা তাকে শুনতে হয়েছে। তবুও তিথি হার মানেনি অন্যায়ের কাছে। তিথি

জানে তার শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের কাছে 'তার পড়াশুনা করার চেষ্টাটা যেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিলাস। স্বার্থপরতা।'[১৩] তিথি সবার সঙ্গে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির কাছে হারতে বসেছিল যখন সে জানল সে দু মাসের অন্তঃস্বত্তা। নিমেষের মধ্যে তার স্বপ্ন ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু তিথি এত সহজেই তার স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেয়নি। তিথি পার্থকে বুঝিয়েছে এখন তারা 'বাচ্চার জন্য তৈরি নয়'। কিন্তু পার্থ তিথির কথা মানতে চায়নি। তিথির কাছে সন্তানের থেকেও অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কলেজ, পরীক্ষা সর্বোপরি তার নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কিন্তু পার্থ তিথির কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলে – 'পরীক্ষাটা এর চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয় ... পরীক্ষা চাইলে পরেও দেওয়া যাবে।'[১৪] পার্থ ও তার পরিবারের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের কাছে ক্রমশ তিথির সহনশীলতাও হার মানতে বাধ্য হচ্ছিল। পার্থর মিথ্যাভাষণ, কামুকতা, নির্লজ্জতা ক্রমশ তিথিকে হতবাক করেছে। তিথির যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্রটি ঔপন্যাসিকের সংবেদনশীলতায় সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। 'আবারও একটা কঠিন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। জীবনে এত একা এর আগে সে কখনও ছিল না।' [১৫] তিথি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়ে নিজেকে পুনর্নির্মাণের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অতীতে সে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে কিন্তু পুনরায় সে আর ভুল করতে চায়নি। তিথি 'অ্যাবরশান' করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পার্থ বা তার বাড়ির লোকজন তিথির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে না। তিথির শাশুড়ি সুধার অশালীন আচরণে তিথি বিমূঢ় হয়ে যায়। আরো স্তম্ভিত হয় যখন পার্থ তাকে জানায় – 'অনেক সহ্য করেছি আমরা। যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছ তুমি। আর নয়। চুপচাপ মায়ের কথা শুনবে তো শোনো। নইলে বেরোও বাড়ি থেকে।'[১৬] তিথি বুঝতে পারে তার ও পার্থর সম্পর্কের মধ্যে সমস্ত বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে। যে পার্থ একদিন পরম ভরসায় ভালোবেসে তিথিকে ডেকেছিল, তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, সেই পার্থই তিথিকে ঘর ছাড়ার কথা বলেছে। তিথি ও পার্থর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল ভালোবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরতা যার কোনটারই অস্তিত্ব বর্তমানে আছে বলে তিথি মনে করে না। পার্থ ও তিথির সম্পর্কের মধ্যে জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাস, পারস্পরিক দোষারোপ। তিথির মনে হয়েছে পার্থর হৃদয়হীনতা, সঙ্কীর্ণ মানসিকতা, হিংস্র আচরণ তাদের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মিথ্যে অপবিত্র সম্পর্কের বোঝা বহন করতে আর রাজী হয়নি তিথি। তাই ভালোবাসাহীন সম্পর্ককে একপ্রকার জোর করেই শেষ করতে চেয়েছে তিথি।

তিথি শ্বশুরবাড়ির শেষ চিহ্নটুকু অর্থাৎ লোহা আর ব্রোঞ্জের চুড়ি খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পার্থকে জানিয়ে যায় 'ডেকেছিলে বলে এসেছিলাম। চলে যেতে বলছ চলে যাচ্ছি। এই দুইয়ের মধ্যিখানে আমাকেও কম সহ্য করতে হয়নি।'[১৭] সংস্কারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিথি বেরিয়ে আসে। সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকা বদ্ধ জীবনকে মুক্তি দেওয়ার আনন্দে সে বেখেয়ালে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পথ চলে। পার্থর অসহনীয় আচরণ, মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পেতে তিথি সবকিছু ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু তিথির ভবিতব্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার আপনজন তার মা বাবার কাছে।

তিথির যন্ত্রণা, দুঃখ উপলব্ধি করেছে অদিতি। তাই পার্থ তিথির সন্তানসম্ভবনার কথা জানিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে অদিতি পার্থকে ফিরিয়ে দিয়েছে। যে মুহূর্তে অদিতি জানতে পেরেছে তিথি 'প্রেগন্যান্ট' সেই মুহূর্তে একটা অজানা আশঙ্কাতে তার মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। অদিতির মনে হয়েছে – 'তিথির আর কিছু করার নেই। পড়াশোনা শুরু করে যাও বা একটু কোনোওরকম ভ্যবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে পা বাড়িয়েছিল, আবার পিছলে গেল সে। এত তাড়াতাড়ি ফাঁদে পা জড়িয়ে ফেলল মেয়েটা!' [১৮] কিন্তু তিথির অ্যাবরশানের সিদ্ধান্ত জানার পর অদিতি তাকে সাহায্য করেছে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে। পার্থ তিথির কাছে ক্ষমা চাইলেও তিথি তাকে ক্ষমা করেনি বরং তার জীবন থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আইনি বিচ্ছেদ হয়েছে। তিথি মুক্তি পেয়েছে তার যন্ত্রণাদায়ক বিভীষিকাময় জীবন থেকে। সে নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছে।। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের অধ্যাপক হিসেবে। দুঃস্বপ্নের রাত কেটে তিথির জীবনে এসেছে নতুন সকাল। সেই সকালের আলোয় সে তার পাশে পেয়েছে মা বাবা আর অনিন্দ্যর মতো ভালো বন্ধুকে। তিথির এইবারের ঝাঁপ কোন অতল গহ্বরে ছিল না, এবারের ঝাঁপ ছিল অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার 'জার্নি'। নতুনভাবে জীবনটাকে উপলব্ধি করার আনন্দ, নতুনভাবে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জ। তাইতো উপন্যাসের শেষে অদিতির সঙ্গে তিথিও সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করেছে –' মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি .... শুভ্র আলোক লাগায়ে...।' [১৯]

সুত্র-নির্দেশ :

১. মন্দাক্রান্তা সেন, ঝাঁপতাল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর২০০০, পৃঃ ২০৮

২. তদেব, পৃঃ ২৯
৩. তদেব, পৃঃ ৪০
৪. তদেব, পৃঃ ৪১
৫. তদেব, পৃঃ ৪২-৪৩
৬. তদেব, পৃঃ ৬৩
৭. তদেব, পৃঃ ৯৬
৮. তদেব, পৃঃ ১২৭
৯. তদেব, পৃঃ ১৫২
১০. তদেব, পৃঃ ১৭৫
১১. তদেব, পৃঃ ১৭-১৭৮
১২. তদেব, পৃঃ ১৮০
১৩. তদেব, পৃঃ ২০২
১৪. তদেব, পৃঃ ২০৪
১৫. তদেব, পৃঃ ২০৫
১৬. তদেব, পৃঃ ২১৩
১৭. তদেব, পৃঃ ২১৪
১৮. তদেব, পৃঃ ২১৯
১৯. তদেব, পৃঃ ২২৪

সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারী

স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপিকা, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ,
শ্রীরামপুর, হুগলী

সমাজ বিজ্ঞানী R.M. Maciver বলেছেন - "Society is the system of social relationships in and through which we live" অর্থাৎ সমাজই তৈরী করে সম্পর্ক যা গঠিত হয় সমাজের রীতি নীতি ও প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী। সমাজের নির্ধারিত সম্পর্কের বাইরে গিয়েও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৈরী হয় কিছু সম্পর্ক যা সমাজের চোখে বিশেষিত হয় সমাজবহির্ভূত সম্পর্ক নামে। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেক গুলিতেই দেখা যায় নারী পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই ধরণের সম্পর্ক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জীবনের জটিলতা', 'অহিংসা'।

সামাজিক বিধি নিষেধ, সংস্কার, ধর্ম, সংস্কৃতির আবেষ্টনে মানুষের যে সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তার অবদমিত কামনা বিকৃত পথ অনুসন্ধান করতে থাকে। মানুষের অবচেতন স্তরে প্রবৃত্তির যে তাড়না, তার সঙ্গে সভ্য সমাজ ও সংস্কৃতির যে অভিঘাত তথা চেতনা স্তরের যে দ্বন্দ্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা-ই তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব সব থেকে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন –

> *"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট অধিকাংশ বিবাহিতা নারীই দাম্পত্য জীবনে অসুখী। এই অসুখের কারণ নরনারীর জীবনের সচেতন স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, মগ্ন চৈতন্যের অতল গভীরে এর আদি উৎসের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক অনেক স্থলেই। ... এক অকারণ দ্বিধা ও সংশয় তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রাণরসকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"*[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে এই দ্বন্দ্বের বহুরৈখিক রূপটি বোঝা যায়।

এই পর্যায়ের প্রথম আলোচ্য উপন্যাসটি হলো ‘দিবারাত্রির কাব্য’ (১৯৩৫)। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র হেরম্ব, কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তার প্রবৃত্তির আগুনে দগ্ধ হয়েছে উপন্যাসের তিনটি নারী চরিত্র – সুপ্রিয়া, মালতী ও আনন্দ। নিজের স্ত্রী উমাকে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে হেরম্ব প্রচার করে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। নারীদের ভোগ করে প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা তার প্রথম থেকেই ছিল। তা সত্ত্বেও একের পর এক নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বারবার। তিনটি নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে লক্ষ্য করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে বলেছেন –

> *“বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায় সেগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection – মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।”*

উপন্যাসের প্রথম নারী চরিত্র সুপ্রিয়া, যে হেরম্বর প্রতি আকৃষ্ট ছিল বাল্যকাল থেকেই। কিন্তু তার বিয়ে হয় রূপাইকুড়ার দারোগা অশোকের সঙ্গে। পাঁচ বছর বাদে এই রূপাইকুড়াইতেই পুনরায় হেরম্বর সাথে তার দেখা হয়। তখন দেখা যায় সুপ্রিয়া এই পাঁচ বছরে তার স্বামীকে বিন্দুমাত্র ভালোবাসতে পারেনি। মনের দিক থেকে আজও সে তৃপ্ত নয়, তার জীবনদর্শন হল তাৎক্ষণিক সুখ। আর তাই সে হেরম্বর সাথে দেখা হওয়া মাত্র সামাজিক বাধা-নিষেধ অমান্য করে হেরম্বর সাথে মিলিত হতে চেয়েছে। সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ স্বামীকে ত্যাগ করতে চেয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে –

> *“এতদিন আশায় আশায় কাটিয়েও যে কষ্টটা আমি পেয়েছি, ও তার কি বুঝবে। ছাই সংসার, ছাই ভালোবাসা। ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল!”*[২]

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় সুপ্রিয়ার অন্তরের দ্বন্দ্বকে। এক সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করে অবৈধ এক সম্পর্ক গ্রহণের মধ্যে হিন্দু রমণীর যে চিরাচরিত সংস্কার, দোলাচলতা ছিল তা প্রকাশ পেয়ে যায় এক বক্তব্যেই। কিন্তু হেরম্ব সুপ্রিয়ার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। মানসিক নৈকট্য না থাকার কারণে স্বামী অশোকের থেকে সে দৈহিক সুখে তৃপ্ত হতে পারেনি, অথচ তার দেহ মন সর্বস্ব দিয়ে সে চেয়েছিল হেরম্বকে কিন্তু হেরম্ব বারবারই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় নারী মালতীর জীবনও আবর্তিত হেরম্বকে কেন্দ্র করেই। হেরম্বর ছোটবেলায় মালতীকে ভালবাসলেও মালতী হেরম্বর মাস্টারমশাই অনাথের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় পুরীতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রেমের মোহ কেটে যায়। এই অতৃপ্তির কারণেই সে বেছে নেয় মদ্যপান ও তন্ত্রসাধনা। দিনের পর দিন শরীরী উপবাসে মালতী হয়ে পড়ে বিকারগ্রস্ত। তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে সে স্বেচ্ছাচারিণী ও উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে ওঠে। যৌনক্রিয়া হয়ে ওঠে মালতীর কাছে নেশার মত। সে ভাবে – "জিভকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেটে না।"[৩] মালতীর সাথে অনাথের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যায় অনাথের পলায়নে, আর মালতী চলে যায় তার অনুরাগী গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে। যে সম্পর্ক শুধুমাত্র আবেগহীন শরীরী সম্ভোগে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, স্বাভাবিক কারণেই একুশ বছরের একঘেয়ে দাম্পত্য জীবনে তা ছিন্ন হতে বাধ্য।

উপন্যাসের তৃতীয় নারী আনন্দ মালতী-অনাথের কন্যা আনন্দ। যাকে দেখেই হেরম্ব অল্প বয়সের মালতীর সঙ্গে মিল খুঁজে পায় এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আনন্দ হেরম্বর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হলেও বিবাহে ভীত হয়ে ওঠে। একসময় আনন্দ বুঝতে পারে, ভালোবাসা হচ্ছে মিছে কথা, ভালোবাসা হচ্ছে একধরণের অন্ধমোহ, ঘোর, বিকারগ্রস্ততা। শরীরের প্রতি শরীরের দুর্নিবার জৈবিক আকর্ষণের মোহই হচ্ছে ভালোবাসা। প্রেমের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাই এক সময় অস্থির, উত্তেজিত আনন্দ প্রবল ঘোরের মধ্যে পরিনৃত্য শুরু করে ও অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দেয়।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের তিন নারীকেই দেখা যায় নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ও প্রবৃত্তির কারণে তারা সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক গঠনে অক্ষম। সমাজের নিয়মে আবদ্ধ করতে চাইলেও সুমিত্রা, মালতী বা আনন্দ কেউই সেই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে পারেনি অবদমিত যৌন কামনা-বাসনার বহিঃপ্রকাশের ফলে। ফ্রয়েডীয় super ego-কে দমন করে এদের ক্ষেত্রে ID এর পাশব তাগিদ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সামাজিক সম্পর্কগুলিও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় যে উপন্যাসটি এখানে আলোচ্য সেটি হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। এই উপন্যাসের নায়ক কুবেরও তার সংসারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী। তার স্ত্রী মালা প্রতিবন্ধী, কোন এক গোপন সম্পর্কে তার জন্ম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার টানাপোড়েনে কুবেরের অন্তর্জগৎ ঢাকা পড়েছিল। হঠাৎ করে কপিলা তার বোন মালার সংসারে এলে, তার ছন্দোময় গমন ভঙ্গি লাস্যময়ী চলন

কুবেরের মনে নতুন স্বপ্ন দেখায়। কপিলা হয়ে ওঠে উপন্যাসের মুখ্য নারী। ঘটনার মোড় ঘুরতে শুরু করে। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কপিলার – "আমারে নিবা মাঝি লগে?"[৪] এই উক্তির মধ্যে দিয়েই কপিলার কুবেরের প্রতি আকর্ষণ প্রতিধ্বনিত হয়। অথচ কপিলা যে তার স্বামীর সংসার ছেড়ে এসেছিল তার প্রতিও কপিলার মনে ভালবাসা নিরন্তর, তাই কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে, কুবেরের বুকে মাথা রেখেই সে বলে – "মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়?"[৫] এই মন কাতর থাকার কারণ রূপে সে জানায় – "সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।"[৬] একদিকে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ স্বামীর প্রতি আকর্ষণ অন্যদিকে অবৈধভাবে কুবেরের প্রতি আকর্ষণ দুই এর টানাপোড়েনে কপিলার মনে অস্থিরতা দেখা দেয়। স্বামী শ্যামাদাস তাকে নিতে এলে তার সাথে সে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে, এবং তার সাথে চলে যায়। কুবেরের কথা তার মনেও থাকে না। সমাজ সম্মত সম্পর্কে তার সম্মতি ছিল সবসময়ই কিন্তু যখন সমাজ সম্মত পথ বন্ধ তখন প্রবৃত্তির আকর্ষণে সে ছুটে গেছে সমাজ নিন্দিত পথে। অন্তরের দ্বন্দ্বে কপিলা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বারবার। আমিন বাড়ি হাসপাতালে গোপীকে ভর্তি করার পর হোটেলে কুবেরের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানোর পরদিন সকালে তার মনে হয় – "পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড় লজ্জা করিতেছে কপিলার, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে, স্বামী যে তাহার নয়।"[৭] বাইরে থেকে সে যতই কুবেরকে আকর্ষণ করতে চেয়েছে মানসিক দিক থেকে Super Ego নিষিদ্ধ সম্পর্কে বাধা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যৌন কামনা বাসনা লিবিডো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। হোসেন মিয়ার সহায়তায় কুবের কপিলা ময়না দ্বীপে চলে গিয়ে নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। সমাজ পরিচালিত জীবনযাত্রায় যে সম্পর্ক গড়তে তাদের বাধা ছিল, হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপ সেই সমাজের বাইরে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সেই সম্পর্ক গড়তে আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নারী চরিত্র কুসুম, 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কপিলার মত দ্বিধাগ্রস্থ নয়। শশীর প্রতি তার আকর্ষণ যে প্রত্যক্ষভাবেই প্রকাশ করেছে। এখানে দ্বিধাগ্রস্থ শশীর নাগরিক সচেতন মন। কুসুম গাওদিয়া গ্রামের কৃষক পরাণ ঘোষের স্ত্রী। পরাণ ঘোষের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে সে অসুখী তা উপন্যাস থেকেই জানা যায়। শশী তাকে 'পরাণের বৌ' সম্বোধনে ডাকলে সে তা পছন্দ করে না, শশীকে বলে –"পরাণের বৌ বললে আমার

গোসা হয় ছোটবাবু।"[৮] শশী মতিকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কুসুম আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। শশীকে স্পষ্ট করেই বলে ফেলে – "এমনি চাঁদনী রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।"[৯] কিংবা – "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?"[১০] এর উত্তরে শশীর কাছ থেকে সে রূঢ় জবাব পেয়েছে, শশী বলেছে – "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"[১১] যে সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক দুজনের মধ্যে তৈরি হতে চলেছিল তা যেন নিমেষে নিভে যায়, কুসুম ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে নেয়। আর তখনই শশীর মধ্যে দেখা দেয় তার প্রতি আকর্ষণ, আগ্রহ। কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুসুমের অন্তর তখন বজ্র কঠিন, তাই শশীর ডাকে সাড়া না দিয়ে সে অনায়াসে বলতে পেরেছে – "লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, বলা যায়? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না – বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি – আর কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"[১২]

শশী ও কুসুমের সম্পর্ক গভীরতা লাভ করতে পারেনি তার একটি বিশেষ কারণ উভয়ের সামাজিক অবস্থান। শশীর নাগরিক মনে নারী সম্পর্কে যে ধারণা সুপ্ত ছিল সহজ, সরল, স্পষ্ট বক্তা, গ্রাম্য কুসুমের সঙ্গে তা মেলে না। কিন্তু অন্তরের কোনও এক অন্তঃস্থলে কুসুমের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল তা বোঝা যায় কুসুমের শশীর প্রতি অনাগ্রহে শশীর ব্যাকুল হয়ে যাওয়ায়। আর কুসুম তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা থেকেই, নিজস্ব মানসিক ও শারীরিক চাহিদা থেকেই আকৃষ্ট হয়েছে শশীর প্রতি, সে কথা কুসুম নির্দ্ধিধায় স্বীকারও করেছে। কিন্তু শশী কুসুমের সম্পর্কে সংকট নেমে এসেছে শশীর অবহেলার জন্য। কুসুম তার অসুখী দাম্পত্য সম্পর্ককেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। নিজের কামনা-বাসনা সবকিছুকেই ত্যাগ করেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কপিলা কুবেরের সঙ্গে সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়তে সব কিছু ছেড়ে এসে যে সাহস দেখাতে পেরেছে তার কারণ অবশ্যই কুবেরের তার প্রতি আকর্ষণ আর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় কুসুম যখন শশীর জন্য সব ত্যাগ করতে চেয়েছিল তখন দিনের পর দিন শশীর অনাগ্রহ তাকে আকর্ষণ বিমুখ করে তুলেছে। প্রেম তার মন থেকে মুছে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য আর একটি উপন্যাস 'জীবনের জটিলতা'তে দেখিয়েছেন নর-নারীর জীবনের জটিল দ্বন্দ্বকে। বিমল-শান্তা-অধর-নগেন-প্রমীলা-লাবণ্য এই চরিত্রগুলির মধ্যে এক জটিল সম্পর্কের কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিমল ও শান্তার বিবাহ বহির্ভূত অসফল প্রেম এবং শান্তার স্বামী অধরের প্ররোচনায় শান্তার আত্মহত্যা, কাহিনীতে এক জটিলতার, সৃষ্টি করেছে। শান্তার সঙ্গে বিমলের সম্পর্ক কোনসময়েই সেভাবে পূর্ণতা পায়নি, শান্তা বিমলাকে বাতায়ন পথে ভালবেসে তার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, স্বামী অধরকে সে কখনোই ভালবাসতে পারেনি। অধর সব বুঝে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে শান্তাকে মেরে ফেলেছে, আত্মহত্যায় নিরন্তর প্ররোচিত করে। শান্তা ও অধরের সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র সামাজিক বিবাহ সম্পর্ক। আর সেই অধিকারেই অধর শান্তার ওপর নিজের সমস্ত চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছে দিনের পর দিন। কিন্তু বিমলের সঙ্গে শান্তার সম্পর্ক সামাজিক না হলেও মানসিক। তারা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে মাত্র একদিন কিছুক্ষণের জন্য। এই ভালোবাসার অধিকারেই বিমল তাকে গৃহত্যাগ করতে বললেও আজন্ম লালিত সংস্কারের জন্য শান্তা পক্ষে সম্ভব হয় না এই দাবী মেনে নেওয়া। অন্যদিকে শান্তা-বিমলের সামান্য সময়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য অধর দেখে ফেলায় শান্তার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। অধরের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সে ছাদ থেকে লাফ দেয়। সেই মুহূর্তে প্রাণে বেঁচে গেলেও অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত শান্তা সেই অবস্থাতেও সবার অলক্ষ্যে ছুটে ছুটে আসে জানালার কাছে, বিমলকে দেখার উদ্দেশ্যে। আর শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে। শান্তা আত্মহত্যা করেছে বিবেকের দংশনে। বিমলের কাছ থেকে ফিরে আসার পর অধর বারবার তাকে প্ররোচিত করে বলেছে – "আমি হলে মরতাম শান্তা, অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দোষী মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম।"[১৩] একদিকে অধরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যেখানে ভালবাসা নেই অন্যদিকে ভালবাসার সম্পর্ক যেখানে সামাজিক বৈধতা নেই, ভালোবাসাহীন অধিকার আর অধিকারহীন ভালবাসা এই দুই সম্পর্কের টানাপোড়েনে মৃত্যু হয় শান্তার মত নারীর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য আর একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'অহিংসা'। 'অহিংসা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র মাধবীলতা যে মহীগড়ের রাজপুত্র নারায়ণের সঙ্গে ঘর ছেড়ে সদানন্দের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই তাকে আমরা দেখি মত্ত অবস্থায় সমগ্র উপন্যাসেই আশ্রমের পৌঢ় সাধু সদানন্দ তার সঙ্গী বিপীন, কে যেমন সে শরীরী সম্পর্ক তৈরীতে বাধা দেয়নি, সে রকমই মহেশ চৌধুরীর ছেলে

বিভূতির সঙ্গে বিয়েতেও সে আপত্তি করেনি। কিন্তু সদানন্দকে মাধবী ঘৃণা করলেও তার প্রতি যে আসক্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভূতির মৃত্যুর পর সদানন্দের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে মাধবীলতার সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনে তার প্রবৃত্তির তাড়নার বিষয়ী স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম যার সাথে মাধবীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই মহীগড়ের রাজপুত্র নারায়ণের সঙ্গে সে ঘর ছেড়েছিল কিন্তু তার প্রতি পরবর্তীকালে আর কোনও আকর্ষণ দেখি না। এরপর যখন সদানন্দের আশ্রমে যখন তার আশ্রয় হয়েছে সদানন্দ, "দু হাত বাড়াইয়া পুতুলের মতো মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।"[১৪] তখনও ঘুম ভেঙে মাধবীও কৌতূহলী চোখে – "মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ় বয়সী দৈত্যটিকে পুতুল খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।"[১৫] মাধবীর এই প্রতিবাদহীন আত্মদানে – "সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।"[১৬] মাধবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সদানন্দের বন্ধু, আশ্রমের আর এক প্রধান ব্যক্তি বিপিনও। গ্রামের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি মহেশ চৌধুরীর সাধু সদানন্দর চরণদর্শন করার জন্য জেদ, মাধবীলতার সাহায্যে সেই কার্যসিদ্ধি এবং মহেশের মাধবীকে ডেকে পাঠানোর সুযোগ নিয়ে বিপিন তাকে বাড়ি কিনে দেবার, ব্যাঙ্কে তার নামে টাকা রেখে দেবার প্রলোভন দেখিয়েছে। বিপিনকেও মাধবী কোন বাধা দেয়নি, বলেছে – "ও! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে? শীগ্‌গির নিন, একটুতো ঘুমোতে হবে রাত্রে।"[১৭] পরবর্তীকালে সে মহেশ চৌধুরীর পুত্র বিভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং বিয়েও করেছে। অথচ তার মনের মধ্যে সদানন্দের প্রতি একটা আকর্ষণ থেকেই গেছিল, সেই জায়গা থেকেই – "দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা বিভূতির দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয় বিভূতিকে।"[১৮] বিভূতির সাথে বিবাহের পরেও মাধবী গেছে সদানন্দের আশ্রমে এবং তার সাথে মিলিত হয়েছে। সদানন্দের মধ্যে যে ধর্ষকামী প্রবৃত্তি ছিল তার প্রতিই মাধবীর আকর্ষণ। বিভূতির শান্ত প্রেমপূর্ণ দৈহিক মিলন তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। মাধবীর প্ররোচনাতেই বিভূতি ও সদানন্দের শিষ্যদের মধ্যে মারামারিতে মৃত্যু হয় বিভূতির। বিভূতির মৃত্যুতেও তার মনে কোন রেখাপাত করেনি। বিভূতির পিতা মহেশ মাধবী ও সদানন্দের সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল আর তাই বিভূতির মৃত্যুর পর তাদের দুজনকে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় তুলে দেয়। তারা অনির্দেশ্য পথে ভেসে চলে।

'অহিংসা' উপন্যাসের নারী চরিত্র মাধবীলতা বারবার বহুজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে কিন্তু কোনটিই অন্তরের টানে নয় সবকটিই দৈহিক প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পাঁচটি উপন্যাসে বিভিন্ন নারী চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিটি নারীই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়েছে, এবং প্রতিটিই পৃথক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন রেখায় পরিচালিত। 'দিবারাত্রির কাব্যের' সুমিত্রা, মালতী, আনন্দ, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কপিলা, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কুসুম, 'জীবনের জটিলতা' উপন্যাসের শান্তা বা 'অহিংসা'র মাধবীলতা প্রত্যেকেই সমাজ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থান, ঘটনাক্রম পৃথক হলেও একটি বিষয়ে সকলের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে, তা হলো প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিতে দেখাতে পেরেছেন প্রবৃত্তি কিভাবে বহুরৈখিক পথে চালিত হয়ে মানব চরিত্রকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকে।

সহায়ক সূত্র :

১. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য – গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, পৃ. ৩২৬

২. দিবারাত্রির কাব্য (মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম খন্ড) ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৯৯

৩. তদেব, পৃ. ১২৫

৪. পদ্মানদীর মাঝি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৪

৫. তদেব, পৃ. ৫২

৬. তদেব, পৃ. ৫২

৭. তদেব, পৃ. ৫৮

৮. পুতুলনাচের ইতিকথা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৪৮

৯. তদেব, পৃ. ৪০৪

১০. তদেব, পৃ. ৪০৫

১১. তদেব, পৃ. ৪০৫

১২. তদেব, পৃ. ৪৭৭
১৩. জীবনের জটিলতা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩৮
১৪. অহিংসা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৮৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৮৪
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৪
১৭. তদেব, পৃ. ৩২০
১৮. তদেব, পৃ. ৩৭২

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. মানিক সাহিত্যে অবচেতন – সুজিৎ ঘোষ, প্রতিভাস, ২০০৩
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডীয় প্রভাব – ড. উৎপল তালুকদার, অনার্য, ঢাকা, ২০১৮
৩. বাংলা সাহিত্যে নর নারীর সম্পর্ক – বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১০

আদিবাসী জীবনে জীবিকা ও গানের দ্বিরালাপ

চন্দনা সাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস’ কলেজ

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি একদা অনার্য আদিবাসীদের জীবনে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল।দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই চিত্রটি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে আর্যরা এদেশে অনুপ্রবেশের পর। শুধু বঙ্গদেশ নয়, বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী জনজাতির অর্থনৈতিক দুরবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে।সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে আদিবাসীদের ক্রমাগত পশ্চাদবর্তীতার মুখ্য কারণ শিক্ষাগত অনগ্রসরতা এবং সমকালীন অগ্রবর্তী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা।এছাড়া সরকারি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির সামগ্রিক ও সার্থক বাস্তবায়নে আংশিক ব্যর্থতাও এর জন্য দায়ী।অবশ্য সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী আদিবাসী বৃহৎ সামাজিক বৃত্তে স্থান করে নিচ্ছে। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন আদিবাসীর সঙ্গে সমগ্র আদিবাসী জনজীবনকে সমীকৃত করা এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হবে না।কারণ মূল আদিবাসী গোষ্ঠীর সুসংহত ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার সাথে উচ্চশিক্ষিত পরিমার্জিত আদিবাসীদের আধুনিক জীবনধারা কোথাও আংশিক কোথাও সম্পূর্ণরূপে পৃথক এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্রবহীন।এখনো অবধি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বৃহত্তর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংস্থানের প্রধান মাধ্যমগুলি হল খাদ্যসংগ্রহ, কৃষিকাজ, পশু ও মৎস্য শিকার, পশুপালন, হস্তশিল্প ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে অনেকেই উচ্চসম্প্রদায়ের উৎসব-অনুষ্ঠানে নাচ-গান-অভিনয়ের মত (নিজ নিজ সম্প্রদায়ের) শিল্পকলা প্রদর্শন করাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে।এছাড়া মাটি কাটা, ইটভাটার কাজে বহু আদিবাসী যুক্ত রয়েছে।এভাবেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ক্রমান্বয়ী রূপরেখাটি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় সাম্প্রতিককালের মানচিত্রে- সংগ্রহমূলক অর্থনীতি> সাংস্কৃতিক যাযাবর অর্থনীতি>স্থায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি> নগর অর্থনীতি > মহানগর অর্থনীতি।আদিবাসীদের মূল কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে তাদের গানের বিপুল সম্ভার।গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা বোঝা যায় যে,কর্মজীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে, যেমন- চাষের সময় জমিতে জোঁকের উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করেও কৃষিকাজ করার সময়, মাছ ধরা ও মাছের পসরা সাজিয়ে হাটে যাবার সময়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিকার করার নানা পর্যায়ে এইসমস্ত গান সৎ,পরিশ্রমী ও নির্ভীক আদিবাসী

নরনারীকে কর্মজীবনের বিচিত্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আত্মবিশ্বাস যোগাতে সাহায্য করে। তাদের বজ্রকঠিন জীবনসংগ্রামের পথে এগিয়ে চলতে দুঃখজয়ী সুখজাগানিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রস্বরূপ এই গান।বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত পরিধিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবিকা ও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত গানের আধারে তাদের বর্তমান জীবনের রূপরেখাটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

প্রথমে আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল উপজাতির কথা। সাঁওতালরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিজের অথবা অন্যের জমিতে চাষবাস করে, কৃষিকাজই তাদের প্রধান জীবিকা।এছাড়া বনজ ফল, শালপাতা,মোম,মধু প্রভৃতি আহরণের পাশাপাশি পশুপালনও করে। জীবজন্তু শিকারের পেশাগত ঐতিহ্য ক্রমশ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হলেও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।সহরায় বা বাঁধনা পরবের পঞ্চম দিন 'সাকরাত' বা শিকারে যাবার ঐতিহ্যপূর্ণ নিয়ম পালন করে তারা।অনেকে পায়রা,হাঁস,মুরগি,শুকর প্রভৃতি প্রতিপালন করে, পুকুর-খাল-বিলে মাছ ধরে। অতীতে বারোটি গোত্রে বিভক্ত সাঁওতালদের সমাজে স্বতন্ত্র কৌলিকবৃত্তি নির্ধারিত ছিল।যেমন- হাঁসদা ও টুডুদের পেশা ছিল লৌহসামগ্রী-নাকরা-মাদল প্রস্তুত করা,কিস্কুদের কাজ রাজপাট পরিচালনা করা, মুর্মুদের পৌরোহিত্য, মার্ডিদের কৃষিকাজ ইত্যাদি।কিন্তু পরিবর্তিত সময়ে ও সমাজে এই প্রথা অনেকখানি শিথিল হয়ে গেছে।বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যাগুরু এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারাই অগ্রবর্তী।একটি গানে তাদের ধান কর্তন ও গোলাজাত করার খণ্ডচিত্র বিদ্যুৎ রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে –

ফালনামাঝি ভোকতাগিরি
বালেবাবু হাঁসুয়া লে লে
দানা কাটি যায় হো
দানা যো কাটালাং
দানা যো মুঠো ভরি রাখালাং
দানা যো মাথা ভরি আনালাং
সেই দানা গাঁথালাং
সোনে কিরি মোউরা,
সেই মোউরা পহিরালাং।
শির রে বাঢ়া দে

জল খাইতে যাবই
থান নাজ্জো হুই।

গানটিতে গ্রামের মোড়লের এক অনুগত লোক বালেবাবুকে হাঁসুয়া নিয়ে ধান কাটতে যেতে বলা হয়েছে। ধানের দানা কাটার পর মুঠো ভরে রাখা হল এবং মাথায় বহন করে আনা হল।তারপর সেই দানা রেখে সাফাই করা হল। এবার ধান গোলাজাত করতে বলা হচ্ছে কারণ দীর্ঘ কাজের পর সঙ্গীটি এবার জল খাবে।কৃষিকাজে কঠোর পরিশ্রমের দিকটি এই গানে ধরা পরেছে।

শিকারজীবী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনে প্রতি পদে বিপদের সম্ভাবনা।তাই, শিকারে বের হবার আগে হিংস্র শ্বাপদবহুল জঙ্গল থেকে অক্ষতভাবে শিকার নিয়ে ফেরার কামনায় দ্রিহিবাবা ও গ্রোখাবাবাকে তারা স্মরণ করে গান গায়-

এ বাবা দ্রিহিবাবা হে বাবা গ্রোখাবাবা
লাহতাইনম বেঙ্গে দেরে দ
তোকই বাবা পানজা কিলাং।

শিকারের একটি গানে দুই ভাই এর মর্মন্তুদ কাহিনি চিত্রিত হয়েছে।গানটি নিম্নরুপ-

জুড়ি সিতা হোকিন রুওরিনা রে
আতুরিন করাহুকু সেতেরিনা রে
নিএওরেনজুরি বাবায় তোকয়ইনা রে
নেতম তিমা কুলায় বহু
কোঁইয়েতিমা মারাঃ
সার বহুলিং নারা কেরঃ
বকোইং কোরাম রেদো বহু
সার পারাওয়েন ।

একদিন শিকার থেকে স্বামীর সঙ্গী কুকুর দুটি ফিরে এল, সঙ্গী গ্রামের লোকজন ফিরে এল ,কিন্তু স্বামীর আগমনে অহেতুক বিলম্ব বধুকে দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন করেছে।ওদিকে জঙ্গলে ডানে খরগোশ মাঝে ময়ূর, মাঝে স্থিত ভাইয়ের বুকে অসাবধানতাবশত দাদার তীর বিদ্ধ হয়েছে।শিকার ফেরত ভাসুরকে লক্ষ্য করে বধূ জানতে চাইছে স্বামীর আগমন বার্তা।এই গানেরই কাহিনির অনুষঙ্গে আর একটি গান-

জিলদো গোগে পেহো দিসেম হোরতে
বকোইং গোগে পেহো নাতু হোরতে

জিলদো দোহইয়েপ্পে দিসেম হোরতেন
বকোইং দোহইয়েপ্পে নিনয়া রাচারে
জিলদো গেদে পেহো দিসেম হোরতে
বকোইং তোপায়য়েপ্পে নাতু হরতে।

শিকারে দাদার নিক্ষেপিত তীর বিঁধে ভাই মারা গেছে। মৃত ভাইকে গ্রামবাসী আনছে ঘাড়ে করে,হরিণের মাংস আনবে বাইরের লোক। হরিণের মাংস থাকবে বাইরের ডেরায়,ভাইকে রাখা হবে নিজ আঙ্গিনায়। হরিণের মাংস বাইরের লকজন কাটবে। ভাইকে গ্রামবাসী মাটির নীচে শায়িত রাখবে।শিকারলব্ধ মৃত পশুর সঙ্গে শিকার ফেরত মৃত আপনজনের তুলনা গানটিকে অন্য মাত্রা গিয়েছে। শিকারের এই গানগুলি মূলত বাঁধনা পরবের শেষ দিন সাকরাতের সময় গাওয়া হয়।

পশ্চিমবাংলার অপর এক আদিবাসী সম্প্রদায় কোরা। রিসলে সাহেবের মতে অস্ত্রো- এশিয়াটিক গোষ্ঠীর মুন্ডারি শাখার অন্তর্গত কোরা জনজাতি জীবিকাগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য মূল শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাদের প্রধান জীবিকা মাটি খোঁড়া। এই প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ খুব প্রচলিত- ‘কোরা মাটি খোঁড়া’। এর পাশাপাশি মাছ ধরা, চাষের কাজ,শিকার করেও তারা জীবিকা নির্বাহ করে।অতীতের মত না হলেও এখনো তারা পাখি, খরগোশ শিকার করে এবং হাঁস মুরগি প্রতিপালন করে।একটি গানে মাটি খোঁড়া কোরাদের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের হতাশা উচ্চকণ্ঠ হয়েছে-

ঝাড় জাঙ্গাল কাট কুনে
কারালুঁ মায় বাসা
দেখো রে ভায় হাকিম কে তামাসা
সুখাল রুটি ভুকাল কোরা
কোরা কাটে মাটি
দেখোরে ভায়া
হাকিম কে তামাসা।

জঙ্গল কেটে বসত গড়া সত্ত্বেও হাকিমের তামাশায় কোরাদের কপালে জোটে শুকনো রুটি আর অভুক্ত দিনযাপনের দুঃস্বপ্ন। মাটি কাটে কোরারা, হাকিমের তামাশায় তাদের এই দুরবস্থা।

কৃষিকাজ করতে গিয়েও তাদের সম্মুখীন হতে হয় নানারকম সমস্যার। চাষের জমির অপ্রতুলতা প্রধান বাধা,তাই-

নেদিয়া ধারি ধারি
এক চিরা বারি
আর সাঁওয়া ঝারোক
গে নুনি বাঁচে পরাণ।

নদীর তীরে সামান্য একটু জায়গায় ফসল বুনে সেটুকুই ঝেড়েবেছে খেয়ে প্রাণধারণ করতে হয়।

এছাড়াও রয়েছে চাষের জমিতে পোকামাকড়, বিষাক্ত প্রাণী,জোঁকের উপদ্রব-

জোঁকে কাটাল বিচে ডুবা মে

কেঁসে কাটাবো বরা ধান

বরা ধানে নাই কাটলে
চেঁঙ্গের বুতরু
কৈঁসে পসাব হো
জোঁকে কাটাল বিচে ডুবা মে
কেসেঁ কাটাবো বরা ধান।

ডোবার মাঝে জোঁক কামড়াচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ধান কাটতে হবে।এখানেই দুঃখের শেষ নয়,এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলের অভাব-

সারাগেতে জল নাই
পিরথিমিতে চাষ নাই
রামোরাম বিনায়ে বিনায়ে
চাষা কান্দে রে।
রামোরাম ইলায়ে বেসিয়ে
কিসান কান্দে রে।

স্বর্গতে জল নেই, পৃথিবীতেও বন্ধ চাষাবাদ।আলে বসে চাষি তাই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।পেশাগত জীবনের এই হাহাকার ও জীবনযন্ত্রণা গানগুলিকে চূড়ান্তভাবে বিষণ্ণ ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। জীবিকাগত এই সমস্যা তাদের দাম্পত্য জীবনেও কখনো কখনো বহন করে আনে অশান্তির জ্বালা-

দেখেঁ শায়াঁ বিপতি হামারি রে
লুগা মর ফাটি গেল
কাটাল লুগা কাটাল শাঁয়াঁ

ম্যুড়ে নায় সিন্দুরা
আব নায় রব ঘারে
দেখেঁ শায়াঁ বিপতি হামারি রে
লুগা মোর ফাটি গেল।

স্বামীকে দারিদ্র্যের জ্বালায় আক্ষেপ করে স্ত্রী জানায় যে তার পরিধেয় শাড়ি ও সায়া ছিঁড়ে গেছে,সিঁথিতে দেবার সিঁদুরটুকু পর্যন্ত নেই। এমন স্বামীর সংসার সে করবে না।

এ প্রসঙ্গে দ্রাবিড় শাখাভুক্ত ওরাওঁ গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রবন্ধের সমাপ্তিরেখা টানবো। ওরাওঁ জনজাতির প্রধান পেশা কৃষিকাজ। তবে এর সঙ্গে পশুপালন, শিকার, মাছ ধরা এবং খেজুর পাতা দিয়ে চাটাই, মাদুর, কুলো, ঝুরি, বিন্না ও নারকেল কাঠির ঝাঁটা তৈরির মত ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের কাজও তারা দক্ষতার সঙ্গে করে থাকে। অতীতে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল শিকারকার্য, তারই প্রভাবে আজও তাদের গৃহে পূজিত হন শিকারের দেবতা 'শিকারভূতা'। শিকারভূতার পূজা করলে অরণ্যে হিংস্র ও বিষাক্ত জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত, সেইসঙ্গে কাঙ্খিত শিকার লাভ হত।ওরাওঁদের একটি গানে শিকারের চিত্র পাই, যদিও তা খুব আশাপ্রদ নয় –

আরি হো নিরিগা রে নিরিগা
সাতটোলা নিরিগা
যায়েকে মেলা বঢ়া দুরাহো।
আরিহো, নিরিঙ্গা রে নিরিঙ্গা
সাতটোলা নিরিঙ্গা
কোনে মারালে মিরিগা।
বাঢ়ভাইয়া চন্দরসায়
মেজভাইয়া নিন্দারসায়
ছোটভাইয়া মারালে মিরিগা ও।

শিকারিকে শিকার করতে বহু দূরে যেতে হল,সাত গ্রাম ঘুরতে হল।শেষপর্যন্ত কে মৃগ শিকার করল।বড় ভাই চুপ করে আছে ,মেজো ভাইও ঝিমিয়ে পড়েছে।শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই শিকার করল।জীবিকার এই দুর্দশা আমাদের কাছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত ছবিটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এরই সূত্র ধরে আসে দাম্পত্য অশান্তি এবং ফলশ্রুতি যথাযথ উপার্জনের জন্য পরিবার ত্যাগ করে অন্যত্র গমন-

নেপাল কালাকো বিধানোন দেরা

ডিম্বো পেলেগি ভারি মানালাগি
পৈরিবারি নেপাল কালাকো বিধানোনদেরা
পৈরিবারি ডিম্বো পেলেগি ভারি মানালাগি।

উপার্জন নেই,হাতে টাকাপয়সা নেই,তাই ডিমের মত ফুলে গেছে স্ত্রীর মুখ। এই পরিস্থিতিতে রোজগারের জন্য আগামীকালই নেপাল যাত্রা করবে স্বামী।গানটিতে স্ত্রীর রাগান্বিত অবয়বের উপমাটি চমৎকার। অপর একটি গানেও উপার্জনের জন্য প্রবাসী স্বামীর চিত্র রয়েছে,তবে এখানে রাগের পাত্রটি স্বয়ং স্বামী –

শিম্বালি যে পুইন্দা মাঝারে গে
ঘাড়ে ঘাড়ে হারে ডিপ্পা নাল
আঙ্গান মাঝে রে গে ঘাড়ে ঘাড়ে হারে ভিঠালাল
তেঙ্গায় কুদোয়হোলে নিন
রোহোর দাগা রাজি চালান কাওই
আঙ্গান মাঝারে গে দাগা দেশা চালান কাওই
তেঙ্গায় কুদোয়হোলে নিন
রোহোর দাগা রাজি চালান কাওই।

মাঘ মাস,চারিদিকে শিমূল ফুলের মেলা। স্বামী প্রবাসে উপার্জন করে। শহরে যাবার সময় সে স্ত্রীকে উপার্জনের কথা গোপন রাখতে বলেছে। অন্যথায় স্ত্রীকে সে অন্যত্র চালান করে দেবে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিন প্রজাতির আদিবাসীর জীবিকা সম্পর্কিত গানগুলির মধ্য দিয়ে উঠে আসা অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও জীবনসংকটের ছবি আমাদের আহত তো করেই সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে তাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর এর কটু প্রভাবও সঙ্গত কারণেই ব্যথিত করে তোলে।গানগুলির সমাজতাত্বিক ও নৃতাত্বিক মূল্য মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের চিত্রও এইসব গানে মেলে। সর্বোপরি, এই গানগুলির মধ্যে নিয়তির অপ্রতিরোধ্য অশুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে জীবনের যে প্রবল জয়ধ্বনি শুনি, যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার না-দেখা ছবি দেখি তা শহুরে জনমানসে এক অতুলনীয় বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত করে ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. সাহা, চন্দনা ২০১৬, আদিবাসী সঙ্গীতঃ পটভূমি মালদহ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

২. ঘোষ, প্রদ্যোত ২০০৭,বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ।

৩. ঘোষ, দীপঙ্কর ২০০৯, আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি ,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

৪. ঘোষ, সুবোধ ২০০০, ভারতের আদিবাসী,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা।

৫. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ ২০১২ ,ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা।

৬. সাহা, চন্দনা ২০১৪, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির দর্পণে বাংলার মুখ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ।

৭. সুর, অতুল ২০১১, প্রাগৈতিহাসিক ভারত ,সাহিত্যলোক ,কলকাতা।

৮. Risley, Herbert 1891, Ethnographic Glossary, Bengal Secretarial Press, Calcutta.

৯. Roy, Sarat Chandra 1972, Oraon Religion & Customs, Editions Indian, Calcutta.

কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুর ও বৈষ্ণব পদাবলী : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ওম প্রকাশ সিংহদেও
সহযোগী অধ্যাপক, করিম সিটি কলেজ (জামশেদপুর)

ঝুমুর গান পৃথিবীর প্রাচীনতম লোকসংগীত গুলির মধ্যে একটি। বৃহত্তর মানভূম গান-বাজনা ও নাচের জায়গা। এখানে লোকগানের কত যে ধারা তার হিসেব নেই। প্রথমে কবে কোথায় ঝুমুর গানের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল যে ঝুমুরের আদি উৎসভূমি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, ছাড়াও সমগ্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য, আসাম, বিহার, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে ঝুমুর গানের ব্যাপক প্রচলন আছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ঝুমুর গুলির সুর, তাল ও ছন্দের ভেদাভেদ থাকতে পারে। কম করেও হাজার বছর প্রাচীন এই গান গ্রামীণ লোকজীবন থেকে উঠে আসা রোমাঞ্চকর এক প্রেমসঙ্গীত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার নায়ক-নায়িকা এই ভূখণ্ডের আদিবাসী তথা জনজাতির যুবক-যুবতীরা। ঝুমুর যে অতি প্রাচীন লোকসংগীত তার নানন নিদর্শন খুঁজে পাই বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে। এই ঝুমুর গানকে যারা বহতা রেখেছেন তাঁরা হলেন মূলতঃ গ্রামীণ কবি ও রসিক। সপ্তদশ শতকের কবি বিনন্দিয়া সিংহ, ব্রজরাম তাঁতী, থেকে শুরু করে ঝুমুরের বিশিষ্ট কবি হিসাবে যাঁরা আজও জনমানসে অম্লান, তাদের মধ্যে ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, দুর্যোধন দাস, দীনা তাঁতী, ত্রৈলোক্য মন্ডল, সৃষ্টিধর মাহাত, বাউল দাস, বুধবাবু, উপেন্দ্রনাথ সিংদেব, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেব ইত্যাদি ঝুমুর কবিরা এখনও জনমানসে জীবিত। বিদ্যাপতি যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে 'মহাজন' কবিব্যক্তিত্ব সেইরূপ ঝুমুর সংগীতের প্রবাদপ্রতিম কবিব্যক্তিত্ব ভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ব্রিটিশ ভারতের বৈদ্যনাথ ধামের নিকট কুণ্ডা গ্রামে শ্রীশ্রীত্রিপুরানন্দ ওঝার জোষ্ঠ পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ছিলেন সদুপাধ্যায় শ্রীশ্রীশৈলজানন্দ ওঝা। ভবপ্রীতানন্দ ওঝার পূর্বপুরুষরা মিথিলা থেকে এসেছিলেন। মিথিলার বিল্বপঞ্চক গ্রাম থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ চন্দ্রমান ওঝা প্রথম বৈদ্যনাথধাম আসেন শিবদর্শনের জন্য। কবি ছিলেন তাঁর

বংশের চতুর্দশ পুরুষ। কবির শৈশব বেশ আদর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। গভীর স্নেহ দিয়ে তাঁর পিতামহী তাকে লালন পালন করেছিলেন। কৈশোর কালে কবির সাথে কিছু কারণে তাঁর পিতামহের সঙ্গে মতান্তর ঘটেছিল, তাই কবি পৃথকভাবে বাসা বাঁধেন। হঠাৎ একদিন কবির পিতা শ্রীশ্রীত্রিপুরানন্দের দেহান্তর ঘটে। এর পর কবি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন। ওই সময় কবির পিতামহকে সর্দার পান্ডার পদটি ছেড়ে দিতে হয়। ফলস্বরূপ কবি প্রায় বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ফলে কবিকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। দারিদ্র্য তখন সর্বগ্রাসী। পাঠশালা ছেড়ে কবিকে প্রকৃতির পাঠশালায় যেতে হয়। বনপাহাড়, নদীনালা, পশুপাখি, আকাশ-বাতাস সবকিছুই ছিল কবির শিক্ষক। সেই সময় থেকে কবির কণ্ঠে সুরের আর কথার আবির্ভাব।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের রাধাকৃষলীলার দেহাশ্রয়ী কাব্য – "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে ঝুমুরের আদিরূপ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ, সাহিত্যরত্ন প্রাপ্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুরগানের ধারায় রচিত'। সেন আমলে রচিত শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা খুঁজে পাই। লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের রচিত 'গীত গোবিন্দ' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলার ঘটনা ছন্দ-অলংকারে তুলে ধরেছেন। জয়দেব সেইসব পদ আস্বাদন করে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির গাত্রে বিষ্ণু উপাসনার নানন নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত বিষ্ণুচক্র সে কথাই প্রমান করে। বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস রধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছেন। এইসব বর্ণনা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তীকালের, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবই প্রধান। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যেও এসেছিল বিরাট পরিবর্তন। সেইসময় মানভূমের মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল নিমাই- "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" ঝুমুরের বেশ কিছু লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় যেমন- সম্পর্ক তৈরী করে বলা ঝুমুরের একটি লক্ষণ। যা উক্ত কাব্যেও পাওয়া যায়-

কৃষ্ণ- এ ভোঁ যবেঁ ন ধরিবে আমার বচন।
রাধিকা- এ হে।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে।।

ঝুমুরেও এ ধরণের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়----

রাধা- *ও হে কৃষ্ণ ধরি শ্রীচরণে।*
বিপদে উদ্ধার কর উপায় সাধনে।।
তীক্ষ্ম অতি লয়ে আয়ান আসিছে ধেয়ে (দেখহে)
ভয়ে শুকাইল হিয়ে হেরি এ নয়নে।।
কৃষ্ণ- *প্রাণেশ্বরী একি বল মোরে।*
বিপদে ফেলিয়া তোমায় পালাইব ঘরে।।
কাতরা হতেছ কেনে, ধৈর্য্য ধর মনে প্রাণে (ধনিহে)
আয়ান আসি এখানে কি করিতে পারে।।

ঝুমুরের যে ভঙ্গিতে ঝুমুরিয়ারা নাচে, সে আঙ্গিকও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পদগুলির মাথায় লেখা বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থেকেও এই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন ঐশ্বর্য যুগের সূচনা হয়েছিল, ঝুমুর সাহিত্যেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে মানভূমে যে আদি রসাত্মক ঝুমুর প্রচলিত ছিল তার স্থান অধিকার করে নিল—রাধা-কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক ঝুমুর। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে রাধাকৃষ্ণ প্রণয় মূলক তাঁর ঝুমুর পদগুলি বাংলা লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কোন কোন ঝুমুর গানকে বৈষ্ণব পদ বলে ভ্রম হয়, যেমন—

পূর্বরাগ — উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে---

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বংদর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে"।

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে রতি উন্মীলিত হয়, তাকে বলা হয় পূর্বরাগ। বৈষ্ণব কবিদের মতোই ভবপ্রীতানন্দ ওঝা পূর্বরাগ পর্যায়ের অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন-

সাক্ষাৎ দর্শনের পদ –

সঙ্গে সহচরী হেমকুম্ভ ধরি কে যায় তরুণী বালারে ?
শশাঙ্ক বদনী কুরঙ্গ নয়নী রূপে চন্দুঁ দিশি আলারে ।।
।।রং।। ওকে ধনি যায় যমুনাতে, চমকে রূপে চপলা রে ।।
জিনিয়া সুবর্ণ সুউজ্জ্বলবর্ণ দুকুল নীল উজালারে।
পীন পয়োধরে সাজে থরে থরে নব গজমতি মালারে।।
মদন কার্ম্মুক জিনিয়া ভ্রুযুগ স্বভাবে অতি সরলারে ।।

(২)

স্বপ্নে দর্শনের পদ –

আজি স্বপ্নে হেরি হরি দ্বিগুন বিরহে মরি
সে ঘটনা কহিব কেমনে ?
।।রং।। মরি মরি! চমকি ভাঙ্গিল ঘুম মধুর বচনে।।
সোহাগে ধরিয়া হাত হাঁসি কোন যদুনাথ
উঠো প্রিয়ে ঘুমাও এত কেনে ? ।।রং।।
হেরিয়া নীলমনি শিরে খসিল অশনী
ভবপ্রীতা রাধার স্বপ্ন ভণে ।।

বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে রাধার মতো কৃষ্ণেরও পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। রাধার রূপ দর্শন করে কৃষ্ণ বিমোহিত হয়ে বলেছেন –

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।

অনুরূপ ভাবে কবি ভবপ্রীতাও কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। রাধার রূপ দর্শনে মোহিত হয়ে কৃষ্ণ সখা সুবলকে বলেছেন –

হেমাঙ্গী সঙ্গিনী মাঝে চলে নিন্দি গজরাজে
ধরায় যেন খেলিছে দামিনী
সুন্দরী বয়ঃ কিশোরী যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
বামা নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক বদনীরে ?
।।রং।। বল সুবল ! জলে যায় কার ধনীরে ?
(আমি হেন রূপ না দেখি মা শুনি রে)

কি অসামান্য এই রূপ বর্ণনা, এখানে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা বৈষ্ণব কবিদের সমগোত্রীয়। রাধার মতো শ্রীকৃষ্ণও রাধার রূপে মাতোয়ারা। এখানেই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা, নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। এখানে রাধা যেন প্রবল গতিশীল এক নদী। যিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কৃষ্ণরূপ অসীম সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছেন। কৃষ্ণ নিকুঞ্জে বসে আছেন সখা সুবলের সাথে, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে কোন এক অসামান্য রূপসী রাত্রির অন্ধকার পায়ে ঠেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। তিনি আদৌ বুঝে উঠতে পারেনি এই রূপসী মেয়েটায় তাঁর আকাঙ্খিত রাধা। তিনি

তাই ভুল করে শ্রীমতি রাধার সেই নিশীথ অভিষার বর্ণনা করেছেন সখা সুবলের কাছে–

মুখ জিনি পূর্ণ ইন্দু ললাটে কস্তুরী বিন্দু
কলঙ্ক মানায়
ভ্রু যুগ কার্ম্মুক কটাক্ষ শর বিন্ধায়
।।রং।। সুবল বলনা আমায়
কে কামিনী যামিনীতে একাকিনী যায় ?
সুবল বলনা আমায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো ঝুমুর সাহিত্যেও এই অভিসার পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য জীবাত্মার অভিসার। এই অভিসারের পরম প্রাপ্তিই মিলন। আর সেখানেই জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনা-হতাশা-নিরাশার অবসান। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি হেতু নতুন মাধুর্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং আদিক্ষিণ্য (কোটিল্য) ধারণ করে তাকে 'মান' বলা হয়। পদাবলী সাহিত্যে মানের তাৎপর্য হল নায়ক তাকে অবহেলা করে অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা নায়িকা, কৃষ্ণ নায়ক এবং চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। রাধার মতো চন্দ্রাবলীও কৃষ্ণকে কাছে পেতে চান। মিলিত হতে চান। আবার কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সেই প্রেমকে উপেক্ষা করতেও পারেন না। তিনি তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। পরদিন এসে উপস্থিত হন রাধার কাছে। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলনের চিহ্ন দেখে তিনি কৃষ্ণের প্রতি রেগে আগুন। রাধার সমস্ত বিশ্বাস মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তিনি কৃষ্ণকে কুঞ্জ থেকে বিতাড়িত করে দিতেও পিছুপা হননি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অনুতাপের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যান। কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করতে গিয়ে রাধার সেই রুঢ় কর্কশ ভাষী কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা অসাধারন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন----

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কপট আমার পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমার
ধিক হে নিষ্ঠুর কালা,
শুনহ অশুচি উচ্ছিষ্টেতে অরুচি
না করে ব্রজেন্দ্র বালাহে।
।।রং।। যাওহে নাগর। যাও স্থানান্তর
দিতে এলে কেন জ্বালা।।

সারারাত জেগে রাধা কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছে এই বুঝি তিনি এলেন। কিন্তু না, তিনি আসেন নি। তাঁর সমস্ত সাজসজ্জা যেন মনে হয়েছে অর্থহীন। তারই বেদনা প্রকাশিত হয়েছে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝার নিচের ঝুমুরটিতে—

জেগে রইলাম সারানিশি　　　　না আইল কাল শশী গো
প্রকাশিল পূর্ব্ব দিশি নাশি তমঘোর,
।।রং।। আমার প্রাণধন না আইল সখি !
নিশি হৈল ভোর ।।
বাসি হৈল ফুলের মালা　　　　না আইল নাগর কালা গো –

ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব আমরা তার রচিত "ঝুমুর রসমঞ্জুরী" গ্রন্থে বহু ঝুমুর পেয়ে থাকি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝারেও মনে হয়েছে, জীবনে যেন চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। অর্থ-গাড়ি-বাড়ির জন্য প্রতিনিয়তই মরীচিকার পিছনে ছুটছি। অথচ জীবনে থাকবে না কিছুই। হরি নামেই শেষ সত্য। কিন্তু মানুষ এই সত্যটি বুঝতে পারে না—

মুঢ় ধনবান যারা　　　　ধরা দেখে সরা পারা
হরি ধনে করে অনাদর।
বুঝে না সেই পামর　　　　মানব তনু নশ্বর
ধন জন মিথ্যা মোহ কর ।

কিন্তু আপেক্ষের বিষয়, এত বড় একজন প্রতিভাধর কবি বাংলা সাহিত্যে অনালোকিত থেকে গেলেন। তিনি যদি ঝুমুর রচনার পরিবর্তে বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় মনোনিবেশ করতেন, তাহলে তাঁর নাম হয়তো বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভাস্বর হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মানভুমের মাটি আর জলকে ভালোবেসে শুধু ঝুমুর লিখেই কাটিয়ে দিলেন সমগ্র জীবন। অবশ্য সমগ্র ঝুমুর দেশের মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন সশ্রদ্ধ ভালোবাসা, যা কোন কালেই শেষ হবার নয়- অন্তত যতদিন এই ভূখণ্ডের ঝুমুর প্রেমী মানুষ বেঁচে থাকবেন, ততদিন ভবপ্রীতানন্দ ওঝা তাঁদের মনের মণিকোঠায় চির ভাস্বর হয়ে বেঁচে থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১.　লোকায়ত মানভূম – সম্পাদনা- শ্রমিক সেন ও কিরীটি মাহাত

২. পুরুলিয়ার ঝুমুর – সম্পাদনা- সুভাষ রায়
৩. বৃহত্তর মানভূমের ঝুমুর – পবিত্র ভট্টাচার্য
৪. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য – বঙ্কিম মাহাত
৫. ঝমুর ও চর্যাপদ – কিরীটি মাহাত
৬. সীমান্ত বাংলার লোকযান – ডঃ সুধীর কুমার করণ
৭. ঝড়খন্ডী ভাষাগুচ্ছের পাঁচ সহোদরা – ডঃ বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী
৮. রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর ঝুমুর পদাবলী – সম্পাদনা – সুভাষ রায়
৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- বংশী খন্ড(রাধাবিরহ)- সম্পাদনা- ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা
১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বতর্কের নিরসন ও মানভূম সংস্কৃতি – পাগল বাউরী
১১. মানভূমের ঝুমুর-ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় – সম্পাদনা – দিলীপ কুমার গোস্বামী

'কবি'র লোকসংস্কৃতিঃ একটি নিবিড় অনুধ্যান

অসীম হালদার
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

।। এক।।

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির অন্তর্গত 'লোক' হল সংহতের সমাজের মানুষ-'Member of the integrated society'(১) আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় সংস্কৃতি হলো Material, Functional, Spiritual culture- এই রূপের প্রকাশ। ইংল্যান্ডের Folkore Society-র সভাপতি A.R. Wright লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেছেন -

'It might be defined as the science which studies the expression in popular beliefs, institution, practices, oral literature and arts and pasttime of the mental and spiritual life of the flok, the people in gegneral in every stage of barbarism and culture'. (২)

সংহত সমাজ মানুষের সামূহিক বিশ্বাস, অভ্যাস, সংস্কার, আমোদ কৌতুক, শিল্প-সাহিত্য (মৌখিক) - এসব কিছুর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হল লোকসংস্কৃতি। এককথায় সংহত গোষ্ঠীর জীবনাশ্রয়ী কৃতি। সমাজ বা রাষ্ট্রর সামাজিক এবং ভিত্তিকে যদি সৌধ ধরা হয় তবে তার উপসৌধ হলো সংস্কৃতি। অভিজাত্যবোধে উচ্চসংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির পার্থক্য করা হলেও বলতে হয় তাদের মধ্যে উপাদান সবই এক। পার্থক্য কেবল মনের। লৌকিক সংস্কৃতিই বিবর্তিত হয়ে উচ্চসংস্কৃতিতে প্রসার লাভ করে। এই দৃষ্টিতে উচ্চসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির তুলনায় জটিল, মনানাশ্রিত ও শোভন । লোকসংস্কৃতি সেখানে প্রধানত মৌখিক, ঐতিহ্যনির্ভর, বৈচিত্রহীন হলেও কৃষিনির্ভর গ্রামীণ পল্লীজীবনের সারল্য সেখানে অনুভূত হয়। লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন-

> *'লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজের অমার্জিত সংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রবর্তী সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগত অতিপ্রযত্ন নিরপেক্ষ; প্রধানতঃ ঐতিহ্যশ্রয়ী বাকভাষা-*

অঙ্গভাষা, কারুকলা,চারুকলা- পোশাক-,পরিচ্ছেদ রান্নাবান্না, সুর-ছন্দ,ক্রীড়া- অভিনয়, ঔষধ, তুকতাক, প্রথা-উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলাপার্বণ ইত্যাদিতে অভিব্যাক্ত; এবং ক্ষেত্রানুসারে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় মূর্তি বা বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হলেও, সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্বন্ধ পাতের সচলতায় আদিম সমাজের হারানো অতীতে মূল প্রোথিত করে বিবর্তনের ধারায় চলমানকালের সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে আগামী দিনের বাতাবরণে সম্প্রসারিত'। (৩)

এই লোকসংস্কৃতি প্রধানত বস্তুকেন্দ্রিক, বিশ্বাস -অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, বাককেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক, এবং অঙ্কনকেন্দ্রিক শ্রেণীতে বিভক্ত। আর তা অনুশীলনের জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক- ভৌগলিক পদ্ধতি, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি , নৃতত্ত্বমূলক পদ্ধতি, মনোসমীক্ষা মূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি এবং টাইপ-মোটিফ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। লোকসংস্কৃতির প্রায় সব বৈশিষ্ট্য লোকসাহিত্যে পাওয়া সম্ভব । লোকসাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখাগুলি হল – ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসংগীত, লোককথা, গীতিকা, লোকনাটক ইত্যাদি। এই ছড়ার মধ্যে জন্ম নিতে পারে- ধুয়া, ফোড়ন, আখর। লোকসংগীতের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণাজাত নিরপেক্ষ সংগীত যেমন- খেউড়, আখড়াই, টপ্পা, বারমেসে গান আসবে। নানারকম পাঁচালী গান, ব্রতকথা,ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসংগীত হিসাবে চিহ্নিত । খেউড়কে ধর্মীয় প্রেরণানিরপেক্ষ লোকসংগীত বলা হলেও এর মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্ব, আচার, রাধাকৃষ্ণ লীলা ইত্যাদি। অত্যন্ত অশ্লীলভাবে পরিবেশিত হয়ে নিম্নরুচির দর্শক চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। তাই ঝুমুরের অন্তর্গত খেউড় গানকে মিশ্র প্রেরণাজাত সংগীত হিসেবেও বিবেচনা করা চলে।

।। দুই।।

রাঢ় বঙ্গের মাটি আর মানুষকে সাহিত্যের পাতায় যিনি প্রাণবন্ত ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তারাশঙ্কর। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের এই সন্তানটি রাঢ়ের মাটির এত কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন যে তাদের লোকজীবনের বিচিত্র পরিচয়কে সম্যকভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর অনেক উপন্যাস এই অভিজ্ঞতার শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। 'কবি' উপন্যাসের মূল বিষয় কবিগান। এই কবিগানকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি বিবৃত হয়নি। ঘটনা পরম্পরায় আরো অনেক লোকসঙ্গীতের সূত্রপাত সেখানে লক্ষ্য করা যায়। কেবল তাই নয় উপন্যাসে কিছু লোকবিশ্বাসের ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। কবিগান উপনাসের মূল গান । এই কবিগান একসময় রুচি,

শ্লীলতা বা ভদ্রতার মুখরক্ষার কথা না ভেবেই অর্ধ শিক্ষিত ‘কাবিওয়ালা’দের দ্বারা পরিবেশিত হত। শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ‘কাবিওয়ালা’ শব্দটিকে অনেকটা ইংরেজি poetaster শব্দের মতো বলে মনে করেন। অবশ্য রাম বসু, হরু ঠাকুরের মতো অভিজাত ‘কাবিওয়ালা’রা একসময় এই লৌকিক সংগীতের শাখাটিকে সমৃদ্ধ করতে নেমে পড়েন। ‘কবি’র কবি নিতাই। সেকালের ‘কাবিওয়ালা’দের থেকে সে অনেক মার্জিত এবং সোভনরুচির মানুষ। কবিত্ব তার সহজাত প্রতিভা। বিদ্যা তার বিশেষ নেই । কেবল শাস্ত্র রিডিং পড়ার মতো সাধারণ জ্ঞানটুকু সে আয়ত্ত করেছিল নিজের প্রচেষ্টায়। এজন্য স্বজনদের কাছ থেকে কম আঘাত তাকে পেতে হয়নি। বসনের সংস্পর্শে অন্তত বাধ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত সে যা গেয়েছে তাতে অশিষ্ট ভাষা বা গ্রাম্যরুচির কোন প্রশ্ন ওঠেনি।প্রসঙ্গান্তরে সে কথা বলা যাবে। এখন দেখা যাক কবিগানের সূত্রে আলোচ্য উপন্যাসে আর কোনকোন লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের যেসব শাখাসমূহ সেখানে সংযোজিত সেগুলি –

- এসবের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ঝুমুরের বিকৃত দেহভঙ্গির নাচ
- কিছু লৌকিক বিশ্বাসসঞ্জাত ঘটনা (ঠাকুরঝিকে ভূতে ভর করেছে তাই কালীর ভরনে দাঁড় করানো)

কবিয়াল হিসেবে নিতাই এর প্রথম আবির্ভাব ও নিবেদনের ভাষায় অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারনের লৌকিক রীতি ‘ভদ্দ’ ‘সি-চরণে’ উচ্চারিত হয়। নিতাইয়ের কণ্ঠে সেটাই স্বাভাবিক। নইলে তা চরিত্র সাপেক্ষে অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। স্বরচিত ধুয়ায় সে আসরবন্ধন সমাপ্ত করে যখন গো - তত্ত্ব ব্যাখ্যার ছাড়ায় মনোনিবেশ করে তখন তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রকাশ সমস্ত শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে। গো- তত্ত্বের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা প্রদানকারী ছড়ায় সে আসরকে চমকে দেয়। বিস্মিত কলকাতার চাকুরে বাবুর ভাষায়- Son of a Dom—অ্যাঁ-He is a poet. বিমুগ্ধ ঠাকুরঝির

অবগুণ্ঠন খসে পড়ে। প্রতিপক্ষ পোক্ত কবিয়াল মহাদেব নাস্তানাবুদ করতে লক্ষ্য করে তাকে ব্যঙ্গবর্ষণ, সদলবলে ছড়া, ধুয়া, ফোড়নের সম্মিলী আক্রমণ করে। সেইসব শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজ (বংশ তুলে, মশা- চিংড়ি- আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা ব্যাঙ্গসম্বোধনে) নিতাইকে জর্জর-ক্ষত-বিক্ষত করে তুললেও গালিগালাজের উত্তরে বিনয় মিশ্রিত সম্বোধনে প্রতিপক্ষকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করে নেয়। এই আসরে উচ্চারিত নিতাইয়ের ছড়ার বিষয় শাস্ত্রকথা, নীতিকথা, কিন্তু মহাদেবের ছড়া নীতিআদর্শ সুভাষিত নয় বরং কদর্য ছাড়া কিছু রুচিবিকৃত হতে পারে কিন্তু আনুষ্ঠানিক আক্রমণাত্মক অ-নানুষ্ঠনিক কবি গানের অন্তর্গত এই অশ্লীল গালিগালাজমিশ্রিত ছড়া সমকালীন দর্শকরুচির প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। এহেন রুচির প্রশ্নে আমরা 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্বীকার করে নিতে পারি-

> *'ইংরেজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিলনা। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।... তখন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্য চাহিত না'।* (৪)

বিশ্বকবির এই ইঙ্গিতটি 'কবি'র জমিদার-প্রজা শ্রোতাদের উদ্দেশেও ব্যবহার করা চলে। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাজনের পরিবারকে নিয়ে নিতাই যে গান বেঁধেছে রামায়ণের স্মরণে বাঁধা সে গানে তার আশ্রয়সূত্র সুদৃঢ় হয়েছে। রাজন, রাজনের পুত্র এবং রাজনের স্ত্রীকে নিয়ে বাঁধা সে লৌকিক গানে শুদ্ধ নির্মল পরিহাসের জন্ম হয়েছে। রাজনের বেটা 'যোবরাজ' বা 'রাজার ঘরের ঘরনী যিনি' গানে রাজনের পরিবার কবিয়ালের সহজাত গান বাঁধার প্রতিভায় চমকিত হয়েছে। ফলে রাজনের গৃহে তার পাকাপাকি আশ্রয় জুটেছে চণ্ডীমেলার আসরে সেদিন চেনা মানুষ নিতাইয়ের মধ্যে থেকে একটি অচেনা মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখে তার বসন অসম্বৃত হয়ে গিয়েছিল। রাজনের গৃহে বাঁধা আজকের গানে ঠাকুরঝিসহ রজনের পরিবার বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। এদের কাছ থেকে নিতাই স্বীকৃতি পেলেও 'বেনে মামা'র স্টলে আড্ডা দিতে আসা বিপ্রপদ ব্রাহ্মণ এখনো তাকে ব্যঙ্গ করতে ভোলে না। স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদের ছলে সে ব্যঙ্গ করে- 'ভব কপি, মহাকবি দগ্ধানন সলাঙ্গুল'। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। উচ্চসংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যে পার্থক্যের

সীমারেখা সর্বদা অনুমান করা যায় তা বিপ্রপদের ব্যাঙ্গেও প্রমাণিত সত্য যেন। মোহন্ত নিতাইকে পুরস্কারস্বরূপ পদক দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নিতাই একদিন তা চাইতে গেলে মহন্ত যেভাবে তাকে হেয় করে, তাচ্ছিল্য সহকারে ব্যঙ্গ করে তা বোধহয় ঐ দুই সংস্কৃতির পার্থক্যের অনুভূতির জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। উচ্চসংস্কৃতির ধারকদের দ্বারা অবহেলিত হতে থাকা নিতাই যখন স্বজনদের আক্রমণেরও শিকার হল তখন সে প্রেক্ষাপটে তার মানসিক শক্তির জোগানদাতা তার আদর্শ, তারণ কবির এই গান- 'তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন' বিপ্রপদ হয়তো একসময় তার প্রতিভাকে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু সেজন্য নিতাইকে কম অপেক্ষা করতে হয়নি। 'কপিবর'কে ঘুঁটের 'মেডেল' পরানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিপ্রপদ। এ-হেন অপমান জ্বালার পথ অতিক্রম করে যন্ত্রনায়জর্জর নিতাই ক্লান্ত হতে হতে যেন শান্তি পেয়েছে ঠাকুরঝির প্রেমাঞ্চলের ছায়ায়। ঠাকুরঝির প্রেম তার জন্য শান্ত দখিনা বাতাস বয়ে এনেছে। তাইতো সহজাত সুরে ঠাকুরঝির জন্য তার কণ্ঠ থেকে গান নেমে এসেছে-

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কালো কেশে রাঙ্গা কুসুম হেরেছে কি নয়নে'?

।। তিন।।

শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদের সংজ্ঞায় বলেছেন- 'প্রকৃতপক্ষে সমাজ যাহা আচরণ করে এবং সামাজিক মানুষ প্রত্যাহিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাদের মধ্যে যাহা নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিতান্ত তিক্ত, প্রধানতঃ তাহার দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মধুর বচন নহে, তাহা সংসার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র'।(৫) ' কবি' উপন্যাসে রাজনের মুখরা স্ত্রী গ্রাম্য গালিগালাজের চমৎকার বাঁধুনিতে যেমন স্বামীকে বিঁধিতে পারে তেমনি নির্জীব ট্রেনকে অভিশাপ দিতেও তার বাধেনা- 'পুল ভেঙে পড়ে যমের বাড়ী যাও, যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' 'হাঁকিড়ে' চলছ- এই আগুনের তাপে অঙ্গ তোমার গলে গলে পড়ুক। যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক - যে চোঙের গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উল্টিয়ে পড়, পাল্টিয়ে পড়; নরকে যাও'। তার শ্লেষ মিশ্রিত মুখঝঙ্কার থেকে নিতাই-ঠাকুরঝি কেউই বাদ যায়না। ঠাকুরঝি-নিতাইয়ের হাসি-ঠাট্টা, একসাথে চা খাওয়ার বিনিময়কে রূপক -

বক্রোক্তি- শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় বিঁধিতে সে বিন্দুমাত্র পিছপা হয়না। প্রশ্নাত্মক প্রবাদে বোনকে সে আক্রমণ করে -

'হাসিস না লো কালীমুখী - আর হাসিস না,
লাজে মরি গলায় দড়ি - লাজ বাসিস না?'

নিতাইয়ের পরম অনুরাগিনী ঠাকুরঝি দিদির শ্লেষতীক্ষ্ণ গ্রাম্য প্রবাদে সাময়িক বিপর্যস্ত হয়েছিল মাত্র। ছিষ্টিধরের সঙ্গে কবির লড়াইয়ের আসরে মহাদেব নিজেকে একলব্যের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে নিতাইকে এগিয়ে দিয়েছিল একলব্যের ভূমিকায়। ছিষ্টিধর আসরের একলব্যকে গালিগালাজ, ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপে জর্জর করে ধরাশায়ী করে তুলতে চেয়েছিল। নিতাই সেখানেও সংযত ভাষায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তর দিয়েছিল। বিনয়মিশ্রিত ছাড়ায় ছিষ্টিধরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও সে শুনিয়েছিল-

'বাম্ভন প্রধান ওহে দ্রোণাচায্য
গুরু হয়ে তোমারে এ কি অন্যায় কায্য
আমি একলব্য নহি সভ্য-ভব্য
না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।
দশের সাক্ষাতে - পা নিলাম মাথাতে'-

কবির স্বীকৃতি লাভের পর পেশাগত গৌরবে নিতাই এখন আর কুলির কাজ করেনা। স্বাভাবিকভাবে সামর্থ্যে কুলানোর অভাবে সে আর দুধের জোগান নেবে না। মর্মাহত ঠাকুরঝি বিনা পয়সায় দুধ দিতে চাইলে নিতাই তাকে তার পরিবার বাধা সম্পর্কে সচেতন করে শুনিয়েছে- 'জানতে পারলে তোমার স্বামী পোহার করবে, শাশুড়ি তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে'-। ক্রমে ঠাকুরঝির সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক যখন প্রগাঢ় হয়েছে তখন নিতাইয়ের মনে ঠাকুরঝিকে নিয়ে নানা প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। ঠাকুরঝি যে ভিন্ন জাতি, অন্য ঘরনী। সুতরাং এ যে মহাপাপ। আত্মসৃষ্ট রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কিত ধর্মপ্রেরণা নির্ভর আখরে সে নিজের অবস্থাকে বর্ণনা করেছে-

'ঘর জ্বলিল - মন হারালো ছটার সুরে গো!
সুখের একি আকুল আতান্তর'।

ঠাকুরঝিকে নিয়ে নিতাইয়ের হৃদয়-দ্বন্দ্ব যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে তখন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে আপন রক্তস্রোতের বিপরীতে গড়া তার ন্যায়বোধ ঠাকুরঝিকে ভুলে যেতে বলেছে। দূর থেকে চাঁদকে দেখার বাসনায় বিদায় নিতে চেয়েছে। ঠিক তখনই

স্টেশনে এসেছে ঝুমুরের দলটি। অশ্লীল আদিরসাত্বক খিস্তি-খেউড় মিশ্রিত এই লোকসংগীত একসময় বাংলার লোকজীবনের পরিতৃপ্তি সাধন করত। 'বহু' পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণির বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াদেয়। মেয়েরা নাচে, গায় অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মতো এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়। আসরে কিছু 'পেলাও পড়ে'। রাত্রে তারা দেহ ব্যবসা করে। তারা পুরাণের পালাগানও জানে। তেমন আসর পেলে সে গানও করে। এই ঝুমুরের দলের মেয়ে বসন। প্রথম সাক্ষাতেই নিতাইয়ের হাতে তৈরি চা ঠাকুরঝির জন্য কিনে আনা (নিতাই মেলা থেকে কাপটি এনেছিল) মগে খেতেখেতে নিতাইকে নিয়ে নানা স্থূল পরিহাসে মেতে ওঠে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে এদের উদ্ভব। আক্ষরিক অর্থে অশিক্ষিতা এই মেয়েগুলির মধ্যে সঙ্গীত ব্যবসায়ীনী হিসেবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি আছে। পালাগানের পৌরাণিক জ্ঞান, উপমা, ব্যঙ্গ শ্লেষ প্রয়োগে এরা আসরকে মাতিয়ে তোলে। পুরুষদের তেল চপ চপে চুলে বাহারে টেরি, গায়ের রঙচঙে ময়লা ছিটের জামা। আর মেয়েদের গায়ে গিল্টির গহনা- কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা। পরনের সস্তা বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁটে- গালে লাল রং, তার ওপরে সস্তা পাউডার ও স্নো'র প্রলেপ। পায়ে আলতা এবং হাতেও লালরঙের ছোপ। বেশ- বাস- গানে- সবকিছুতেই তাদের অশ্লীলতার ছাপ। নিতাইয়ের ভাষায় বাহারসর্বস্ব রাঙ্গাবরণ 'শিমূলফুল'। স্টেশনে তাদের আসরে নিতাই অংশ নিয়ে তাকে 'শিমূল ফুল' বলে গান পরিবেশন করে। ক্ষোভে বসন আসর ছেড়ে যেতে চাইলে আসরে কোলাহল শুরু হয়। কেউ নিতাইয়ের উপর চটে যায়। কেউ অর্থের চুক্তিতে আবধ্য ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুবির্নীত স্পর্ধায় ক্ষুব্ধ হয়ে আস্ফলেন করে। নিতাই পথ আগলে হাতজোড় করে বসনকে আসরে ফিরিয়ে আনে। মোটামুটি ভদ্র-জনের এই আসরে বসন খেউড় গান গায়না। নাচের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অন্যধরণের লোকগান পরিবেশন করে –

'ঝুম ঝুমাঝুম বাজলো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো!

জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখী গাগরী'

গান শেষে রাত্রে বসন ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে নয়নের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে মিশে গেল। মদ আর যৌন উন্মত্তায় পড়ে থাকল সেখানে। পরদিন নিতাই সেই স্বৈরিণীকে নিজের গামছায় ধুলা মুছিয়ে নিয়ে এল বাসায়। ঠাকুরঝি দেখে গেল বসনকে। ঠাকুরঝির বিশ্বাস এই মেয়েরা যোগবশ জানে। অজানা আশঙ্কায় সে- 'কাল রাত থেকে আবার মূর্ছা যাচ্ছে, দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মতো করছে'। এসব দেখে ঠাকুরঝির মরদটিও বড় কাঁদছে। রাজনের দৃঢ় বিশ্বাস-'এ তোমার নিঘ্যাত অপদেবতা, না হয় ডাক ডাকিনী, কি কোন দুষ্টু লোকের কাজ'। এ বিশ্বাস একা রাজনের নয়, লোকবিশ্বাস ও বটে। তাই লৌকিক সংস্কারের নির্ভরতায় তাদের (ঠাকুরঝির পরিবারের) সিদ্ধান্ত –

'মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বৃত্তান্ত আজই জানা যাবে'।

'ভরনে' দাঁড় করানোর লৌকিক সংস্কার বিশ্বাসের ঘটনাটি উপন্যাসিক যথার্থ বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। লক্ষণীয় তাদের এই প্রথার পদ্ধতিগত ধারাটি- 'সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল- কালী, কারলী, নরমুণ্ডমালী! ভূত পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, সাকিনী, রাক্ষস, পিশাচ, যে মন্দ করেছে মা তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে! তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

--বল বল ? কে তোকে এমন করলে বল ? দোহাই মা কালীর।

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মতো দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতেছিল, তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বরবহুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া ছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল- বলছি বলছি, আমি বলছি'।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের, বলিয়াছে- 'ওস্তাদ, কবিয়াল । আমাকে লালফুল দিলে'। উপরের উদ্ধৃতাংশের মধ্যে 'ভরন' প্রথা সম্পর্কে যে পদ্ধতি- উপায় বর্ণিত হয়েছে তা মন্ত্র নির্ভর, গ্রাম্য লৌকিক সংস্কৃতি। ভূত-প্রেত-ডাইনিতে ভর করলে সেইসব অপদেবতাকে দূর করতে আজও এই ধরনের লৌকিক বিশ্বাসসঞ্জাত প্রথা-পদ্ধতি ও

তুকতাকের উপর নির্ভর করে লোকমানুষ। ঠাকুরঝির মুখ থেকে নিতাইয়ের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনের স্ত্রী নিতাইকে অশ্লীল, অশ্রাব্য বিশেষণে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। নিতাইয়ের দিকে আঙুল তুলে হেয় করার পাশাপাশি অভিযোগ জানিয়েছিল- 'তুই, তুই, তুই! তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা। এত লোভ তোর? তোর মনে এত পাপ'? রাজার স্ত্রী গ্রাম্য, অশিক্ষিত, মুখরা, নারী। স্বামীর সঙ্গে নিতাইয়ের সম্পর্কের যে গভীরতা তার মর্ম সে বোঝে না। আর প্রেম যে স্থান,কাল,পাত্র নিরপেক্ষ,সে বোধ তার থাকার কথাও নয়। যা-হোক, এই লজ্জা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে নিতাইকে ঝুমুরের দলের সঙ্গী হতে হলো। আলেপুর, আলেপুর থেকে কান্দরা, কান্দরা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে অজানা কোন স্থানের পথে ছুটে চলল সে। রাজন তাকে অনুরোধ করল অনেক। প্রতিশ্রুতি দিল ঠাকুরঝির সাথে তার 'ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা'। সব অনুরোধ, প্রতিশ্রুতি, উপরোধ উপেক্ষা করে নিতাই বেরিয়ে পড়লো অজ্ঞাত জীবনের পথে।

রাস পূর্ণিমায় আলেপুরের বিখ্যাত মেলায় পৌঁছে নিতাই মুহুর্তে ভুলে গেল প্রাক্তন সব কথা। লোকে লোকারণ্য মেলার স্থানে স্থানে পণ্যসম্ভার ভরা সারি সারি দোকান। স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর-যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। মেলার আসর তাকে বারবার টেনে টানছে যেন। অধীর উত্তেজনার মধ্যে সে মনে মনে রচনা করে ফেলল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক ধর্মীয় প্রেরণাজাত একটি লোকসংগীত। মানুষ কেবল মদই ভালোবাসে, দুধে অরুচি-একথা সে বিশ্বাস করে না। তাই আসরে পরিবেশন করবে লোকসংগীতটি-

'ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে-
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি-
ওহে কুলটি কালা'।

অশ্লীল রসের পরিবেশনায় জয়ের আনন্দে বসন ও নিতাই পরস্পর পরস্পরের নিবিড় বাহু বন্ধনে নির্ভয়ে একে অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করিল। বিহ্বল বসন প্রেমাবশে শেখর রায়ের গান ধরে দিল। সে গান তার আকুতি মিশ্রিত প্রার্থনা যেন। দেহপজীবিনী হলেও নিতাইয়ের প্রেম তার কণ্ঠে এমন গানের সুর এনেছে- 'পরাণ-বঁধুয়া তুমি/তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি'। কাহিনির শেষে এগান বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল বসনের জীবনে। কাল রাতে নেশার ঝোঁকে নিতাই যে গান

গেয়েছে, বমি করে আস্তানার খুপরি নোংরা করেছে আজ সকালে নেশা কেটে গেলে নিতাই সেইসব অপকর্ম-অপকীর্তি নিয়ে অনুতাপ বোধ করে। বসন কালকের আসর জয়ের আনন্দে আজ আরও উত্তেজনা বোধ করে। আজ সে উলঙ্গবাহার শাড়ি পরে প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করে আসর মাতিয়ে তুলবে। কিন্তু মেলা-বাজার থেকে যে কবিগান, পাঁচালী, তারজার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চন্ডীমাহাত্য সত্যপীরের গান, কবিকঙ্কন চন্ডী, অন্নদামঙ্গল বই কিনে ও পড়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ গান আসরে পরিবেশন করবে ভাবে, তার রুচিশীল মনকে কি বসনের উলঙ্গবাহার নৃত্য টানতে পারে? সে দল ছেড়ে পালানোর কথা ভাবলো কিন্তু সচতুর বসন্তের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। এরমধ্যে নিতাই এর কাছে বসন তার ক্ষয়রোগের কথা স্বীকার করেছিল। কাশির সঙ্গে তার রক্ত ওঠে। তার মতো বেশ্যা জীবনের পরিণতি, কপালের লিখন সকল ঝুমুর দলের বেশ্যাদেরই অনিবার্য পরিণতির সত্য। দলনেত্রী হয়তো অচল দেহকে ফেলে যাবে পথে। হয়ত গাছতলায় জ্যান্ততেই 'শ্যাল-কুকুর' ছিঁড়ে খাবে। এমন বেদনা মিশ্রিত আত্মজীবন-পরিণতির বর্ণনা শুনে নিতাই আর পালাতে পারে না। বরং বসনের সঙ্গে মন্দির থেকে গাঁটছড়া বেঁধে ফিরে আসে।

।। চার।।

উপন্যাসের 'সতেরো' সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা মাসীর মুখে পদ্মা তীরের বাংলার 'সোনার দ্যাশের' লোকজীবনের বিচিত্র স্বাচ্ছন্দ জীবনের বর্ণনা শুনতে পেলাম। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য সেখানে যেমন সুলভ তেমনি আসর গান সেখানে কত মনোহর ছিল। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দেখা গেল নিতাই লক্ষ্মীর ব্রতকথা নিয়ে পাঁচালী গান রচনা করে দলের সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে । -

'নমো নমো লক্ষ্মী দেবী- নমো নারায়নী-
বৈকুন্ঠের রানী মাগো -সোনার বরণী-
শতদল পদ্মে বৈস- তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ- তাই তো চঞ্চলা'।
ভনিতা অংশ শুনিয়েছে-
'অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল-
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনহ নিখিল'।

নিতাইয়ের পরিচিত কবিয়ালরা কবিগান করে, ছাড়া কাটে, দু-চারটে গানও লেখে কিন্তু ধর্মকথা নিয়ে কেউ এমন পাঁচালী রচনা করেনা। তার রচিত পাঁচালী এখন

দলের মেয়েদের ব্রতকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সাফল্যে নিতাই গদগদ হয়েও ভনিতাংশে বড় কবিয়ালদের প্রণাম জানাতে ভোলেনি। পাঁচালী বা ব্রতকথার মত লোকসংস্কৃতির বিষয় নিতাইয়ের সহজাত কবিত্ব শক্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। মেয়েদের মুখে নিজের রচিত ব্রত কথা শুনতে শুনতে সে ভাবছে-আর কী রচনা করা যায় যা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

আলেপুর মেলার আকর্ষণ কেবল-যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর নয়। মেলার প্রান্তে গাছের নিচে খড়ের ছোট ছোট ঘরে বসনদের ঝুমুরের দলের আস্তানা। পাশে আরও কয়েকটি ঝুমুরের দলের আস্তানা। খানিকটা দূরে জুয়ার আসর। তার কিছু পরে চতুষ্কোণ আকারের খোলা একটা জায়গায় সারিসারি খড়ের ঘর বেঁধে বেশ্যাপল্লী বসে গিয়েছে। ‘সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিছে’। নিতাইয়ের আগমনের আবেগে সকল খদ্দের নাগরদের চলে যেতে বলে। নিতাইয়ের হাত আকর্ষণ করে মদ খেতে অনুরোধ করে। এই ঝুমুর দলের সংস্কৃতিতে নিতাই অভ্যস্ত নয়। চরম অস্বস্তিবোধ করে সে চলে যায় রাধাগোবিন্দের মন্দিরে, বৈষ্ণব বাবাজির আখড়ায়। আখড়ায় সে গেয়ে ওঠে রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপের স্তবগান ‘আশ মিটিয়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী’। মোহন্ত তাকে শুনিয়েছে প্রভুর সংসারে কেউ নীচ নয়, কেউ ঘৃণ্য নয়। এরপর দলে ফিরে সে দেখল- বারমেসে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বেশ্যা মেয়েগুলির প্রস্তুতিপর্ব। চারিদিক নিকানো, সকলে লাল পাড়ের শাড়ি পরে পূজার জন্য তৈরি হয়েছে। উপবাস, পূজার আয়োজন, নিষ্ঠা-নিতাইকে অবাক করলো। শুনল পূজার ব্রত কথা। এখন নিষ্ঠাবতী বসনের সংস্পর্শে যেতে তার আজ বাধা নেই। বসনের কন্ঠে চন্ডীদাসের পদগান শুনে সে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

মেলার প্রথম আসরে বিপক্ষ কবিয়াল নিজে বৃন্দে দূতীর ভূমিকায় উপস্থিত হয়ে নিতাইকে কৃষ্ণ সাজিয়ে গালিগালাজ মিশ্রিত ধুয়া শুরু করল - ‘কা-দা জা-মের বো-দা কষের রসে ওলো মজেছে কালা’। তারপর সে আরম্ভ করল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সঙ্গে তুলনা উপলক্ষ্য করে সে বসনের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করলে আসর অশ্লীল রসে মত্ত হয়ে ওঠে। এই অশ্লীল খেউড়ের জবাব নিতাইয়ের কাছে নেই। এমন কুরুচির ওপর সে কখনো নির্ভর করেনি। বুদ্ধির প্রাখর্য মিশ্রিত তার জবাব আসর মাতাতে ব্যর্থ হলো। অপমানিত বসন আস্তানায় খুপরির মধ্যে এসে বিরক্তির জ্বালায় মদের মধ্যে ডুব দিল। পরাজয়ের গ্লানি থেকে নিতাইয়ের গালে সে চড় বসিয়ে দিল। এই আকস্মিক আঘাতে মর্মাহত নিতাই তার রক্তবীজের মধ্যে

হারিয়ে যাওয়া বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণু গুলিকে জাগাতে নিজে মদ্যপান করলো।নিতাই ভুলে গেল নীতিকথা, পাপ-পুণ্যের সমস্ত হিসাব-নিকাশ। মাসি শুনিয়েছিল- 'কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া -শেষে তাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউর ছোট জিনিস কিসে?' মদ্যপানের পর নিতাই ফিরে এলো আসরে। ধর্ম ভুলে গেল, মিহিধার ফেলে ফাল চালাতে শুরু করে খেউড়ের গানে। বুড়ি দূতীকে ছড়ির বাড়ির বদলে যুক্তিতে শায়েস্তা করার কথা শোনালো গানে। বুড়ির কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার, তেলকের বাহারের ব্যঙ্গ করে গাইল -

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে!
রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তড়ি ঘাঁটিস নে।
ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!

নিজে নাচতে নাচতে অশ্লীল কদর্য ভাষার গালিতে দূতীকে বিদ্ধ করে ফেলল -

বুড়ী খানিকটা নেড়ী কুটিনী মরে নাই, মরে নাই
ও হায়, তার মরণ নাই-মরণ নাই।

অশ্লীল এই খেউড় শুনে শ্রোতারা অট্টহাসিতে রাত্রি কাঁপিয়ে তুললো। নিতাই চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক- নিমগ্ন করে তুলেছে। সেই স্রোতে ভাসতে বসন যে কখন আসরে ঢুকে অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে দিয়েছে নিতাই তা টের পেল না।

মাসি ছড়ার সুরে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনির সন্ধান দিল নিতাইকে। সে কাহিনিতে যে প্রণয়ের বর্ণনা আছে তা আদিরসাত্মক লৌকিক প্রণয়ের কথা। নিতাই বইটি সংগ্রহ করল। সেই সঙ্গে দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও বটতলার ছাপাখানা থেকে সংগ্রহ করে আনল। বৈষ্ণব গান, শ্যামাসংগীত-এর পাশাপাশি দাশু রায় খেউড়ও লিখেছেন। দাশু রায়ের উদাহরণ সামনে আসায় নিতাই আর খেউড় নিয়ে হীনতাবোধ করে না। তবে খেউড় এখন আর তাকে বিশেষ গাইতে হয় না। বরং অশ্লীল খেউড়ের গালিগালাজের উত্তরে সে চোখা- চোখা বাঁকা রসিকতায় আসরে তারিফ আদায় করে। বৃন্দে দূতীর সঙ্গে পুরানো পালার পুরনাবৃত্তিতে সে মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্যে ও ব্যাঙ্গ শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় আসর জমিয়ে দেয়-

'ও পাছে,- পিরীত করিতে চায়- যম ওরে নেয় না তাই-
ও তোর পায়ে ধরি-ওরে বুড়ি - ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।
যমকে ভালবাসিস নে'।

পূর্বের মত অশ্লীল খেউড় এখন গাইতে না হলেও নিতাই এখন মাঝে মাঝে বসনের মুখে হাসি ফোটাতে বসনের আবদার মেনে মদ খায়। বসনও তার পরিণতির ভবিতব্যকে বুঝে নানা ছুতোনাতা করে অভিমান করে,কাঁদে। ব্যথিত নিতাই তার চোখের জল মুছিয়ে গান ধরে-

'তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি!
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জানি নাকি'?

এমন বাহারের গান বসনকে তাৎক্ষণিক মুগ্ধ করে। ক্ষয়রোগ তার দেহের লালিত্য কেড়ে নিয়েছে। তার সে প্রখর চাহনি আর নেই। তাকে সান্তনা দিতেই নিতাই তার নয়নকোণের আগুন কোথা গেল জিজ্ঞাসা করে গানের সুরে। বসন্তের কান্না তাতে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই বসন্ত তাকে অনেক শিখিয়েছে। বসন্তের নিকট থেকে শেখা টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় প্রিয় গান। এখন সে বুঝেছে- 'পদাবলীর 'পিরীতি' এক আর টপ্পার ভালোবাসা অন্য জিনিস- একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি'। বসন্ত তাকে টপ্পাগানের শ্রেষ্ঠ কবি নিধুবাবুর নাম শুনিয়েছে। গুনগুন করে নিতাই নিধুবাবুর টপ্পা আওড়াতে থাকে-

তারে ভুলিবো কেমনে।
প্রাণ সপিঁয়াছি যারে আপন জেনে?
কিংবা
ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।

কাহিনি যখন লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের সংমিশ্রণে এভাবে মনোরম গতিতে এগিয়ে চলেছে তখনই বসনের জীবনে ঘনিয়ে এসেছে চরম সত্য। নিতাইয়ের কন্ঠে গান-'এই খেদ আমার মনে মনে' মুহূর্তের বসনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। কবিয়ালকে সে জিজ্ঞাসা করে- এ গান সে কেন লিখল? সে তা এখন ভালো আছে। তবে কেন কবিয়ালের মনে হলো জীবন এত ছোট? ক্লান্ত বসন এখন চায়না তার ঘরে লোক আসুক। বরং নিতাইয়ের প্রেমে ধন্য হয়ে বাঁচার উদগ্র বাসনায় প্রতিদিন গোপনে দূর্বারস খেতে সে ভোলে না। নিতাই আসার পূর্বে জীবনকে সে হেলার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আজ নিতাইয়ের প্রেমের গৌরবে বাঁচার অদম্য বাসনায় সে স্বীকার করে।

'মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না'।

নিতাই এর সংস্পর্শে আসার পর থেকে বসন খাদ ছেড়ে খাঁটি সোনা হয়ে গলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা শুরু করেছিল। সোনা হওয়ার নতুন আকর্ষণের আনন্দ অনুভব করতে শুরু করলেও খাদের পুরনো টানের যন্ত্রণা তার ছিল। তাই পুরোপুরিভাবে অসংযত অতীতকে ভুলে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য নিজেও যেমন খানিকটা দায়ী তেমনি খানিকটা দায়ী দলনেত্রী মাসির ব্যবসায়িক হিসাব। ফলস্বরূপ একদিন তাকে প্রাণ দিতেই হল। নিতাইয়ের কোলে মাথা পেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে ভগবানের বিরুদ্ধে তার যে নালিশ ছিল তা জানিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি সে-‘ কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামী পুত্র ঘর-সংসার কি দিয়েছে?’ তবে রাধানাথের চরণে অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে গেছে- ‘আসছে জন্মে দয়া করো’। বসনের শবদেহ শ্মশানে দাহ করার পর শ্মশানের প্রগাঢ় অন্ধকারে বসে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঝুমুরের দলে আর নয়। এবার তার নতুন পথে বের হবার পালা। কাশীধামের নতুন পরিবেশে আন্তরিকতার বড় অভাব বোধ করে। একে একে তার স্মৃতিপথে ধরা পড়ে নিজের দেশের বিচিত্র প্রকৃতি, পাখি, প্রিয়জনদের ছবি। এখানে পরিচিত জনৈক মা তাকে উপদেশ বাণীতে শোনায়- বৈরাগ্য নয়, কাজের মধ্যেই সুখ। সেই মা তাকে শোনালেন- তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল- তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। মণিকর্ণিকার ঘাটে বসনের দেওয়া শেষ স্মৃতি পিতলের আংটি সে গঙ্গায় ফেলে বলবে- বসন তুমি স্বর্গে যাও। আংটিটি আর জলে ফেলা হয় না। বরং সেটি পুনরায় হাতে পরে সে ফিরে আসে গুনগুন করতে করতে- ‘এই খেদ মোর মনে’। কাশীর গান, শ্যামার গান দু- একটি রচনা করে সে সেগুলি গিয়েছিল বটে কিন্তু প্রাণের টান সে অনুভব করতে পারেনি। বিচিত্র ভাবনার মধ্যে মনে পড়ে দেশের বাড়ির ‘বার-মেসে’ লোকসংগীত-

বৈশাখে সূর্যের ছটা-
যত সূর্য ছটা, কাটফাটা, তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে-।

....
....
....
....

জৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষ তলে, মেয়ের দলে অরণ্য ষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে- সাজেন নানা সাজে।

ক্রমান্বয়ে 'বার –মেসে' গানের সুরে চৈত্রের বর্ণনা সমাপ্ত হয়। নিতাই যাত্রা শুরু করে দেশের পথে ফেরার। পরিচিত প্রিয়জনদের স্নেহ – আদরের মধ্যে শুনতে পাই বিপ্রপদ নেই, ঠাকুরঝিও নেই। ঠাকুরঝির কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনে ভারাক্রান্ত নিতাই স্থির করে চন্ডীতলায় সে মাকে জিজ্ঞাসা করবে- 'জীবন এত ছোট কেনে'?

নিতাইয়ের কবিজীবন ঠাকুরঝি এবং বসনের সংস্পর্শে দুটি অধ্যায়ে পূর্ণবৃত্তে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দুটি অধ্যায়ের কাহিনিকে রসপ্রিয় করে তুলতে উপন্যাসিক লোকসংস্কৃতির নানা মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। ঠাকুরঝি অধ্যায়ের তুলনায় বসন অধ্যায়ে বিষয়টি অধিকতর প্রাণবন্তভাবে গৃহীত হয়েছে। ধুয়া, ছড়া, ফোড়ন, আখর, শ্লোক, ঝুমুর নাচ, খেউড়, পাঁচালী, টপ্পা, ব্রতকথা, বারমাসে, ধর্মীয়প্রেরণা মূলক লোকসংগীত, ধর্মীয়প্রেরণা বর্জিত লোকসংগীত ইত্যাদি লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান, বিচিত্র লোকবিশ্বাসের ঘটনাবলীকে কাহিনিতে বর্ণনা করে উপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসটিকে সার্থক করে তুলেছেন। উপন্যাসের কাহিনি থেকে তা বাদ দিলে উপন্যাসটি নিতান্তই সাধারণ কথা হয়ে পড়ে। তাই বলতে হয় বিষয়টি উপন্যাসের অন্যতম ভারকেন্দ্র ।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস - বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা- ১৩৩ পুস্তক বিপণী, কলকাতা ২০০৮

২. Flok-Lore-Arthur Robinson wright.Peg-49 Pub.Flok-Iore Society.W Glaisher.London 1919.

৩. লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ - ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৮, এ মুখার্জী এন্ড কোং; কলকাতা ১৯৮৫

৪. লোকসাহিত্য 'কবি সংগীত' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , পৃষ্ঠা-৭৮ বিশ্বভারতী ১৩১৪

৫. বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খন্ড প্রবাদ) আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-১৮৪, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. কবি-অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্নাবলী, আশ্বিন ১৪০৬।

২. তারাশঙ্কর সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে- ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা) রত্নাবলী, কলকাতা।

৩. তারাশঙ্করঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য - প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদনা)।

৪. তারাশঙ্কর ও বাংলা চলচ্চিত্র-ধ্রবগোপাল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ তারাশঙ্কর স্মৃতি -সংখ্যা ১৩৯৯।

৫. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি' কলকাতা ১৯৮৭-১৯৮৮।

৬. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খন্ড)- সুকুমার সেন, আনন্দ, প্রকাশ ১৩৬৫।

৭. বাংলার লোকসাহিত্য- আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম খন্ড, কলকাতা, প্রকাশ – ১৯৬৩।

৮. লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে- বরুণকুমার চক্রবর্তী, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা- ১৯০৯

৯. স্মরণে তারাশঙ্কর, আনন্দবাজার পত্রিকা। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জুলাই ২০১১।

জগদীশ গুপ্তর 'অরূপের রাস' : Fetishism বা 'বস্তুকাম' সম্পর্কের রসায়ন

শান্তনু দলাই
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ

সারসংক্ষেপ: *এই প্রবন্ধে 'অরূপের রাস' গল্পকে কেন্দ্র করে কানু, রানু ও ইন্দিরা চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদের আলোকে তিনটি চরিত্রকে। গল্পটিতে রানু ও ইন্দিরার সম্পর্কের মধ্যে 'Lesbianism' বা সমকামিতার সম্পর্ক আদৌ ছিল কিনা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। কানু, রানু ও ইন্দিরা চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে Fetishism বা 'বস্তুকাম' সম্পর্কের রসায়ন। ইসমত চুগতাই-এর 'লিহাফ' গল্পটিকে পাশাপাশি রেখে নির্নয় করা হয়েছে এই গল্পের 'বস্তুকাম' প্রেম এবং সমকামী সম্পর্কের স্বরূপকে। এছাড়াও প্রকৃতিবাদ বা 'ন্যাচারালিজম'- এর আলোকে এই গল্পের মুখ্য তিনটি চরিত্রের জৈবিক প্রবৃত্তি তথা কামনা-বাসনাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং অনুসন্ধান করা হয়েছে জগদীশ গুপ্তর গল্প প্রকৌশলের মৌলিকত্বের দিকটিকে।)*

বিশ শতকীয় বাংলা কথাসাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে রবীন্দ্রবিরোধী আবার অপর ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অনুসারীও ছিলেন। আবার সাধারণ তাৎপর্যে তিনি কল্লোল, কালিকলমের লেখক হয়েও স্বতন্ত্র পথের অভিযাত্রী ছিলেন। কল্লোল, কালিকলমের তরুণ লেখকদের থেকে বয়সে সামান্য বড় হয়েও কল্লোলীয় ভাবনাকে সঠিক অর্থে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও পরিণতি, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তন এসবই জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্যে অনায়াসে উঠে এসেছে। ছোটগল্পে নর-নারীর মনোজগতের অন্ধকার রহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে চেয়েছেন তিনি জীবনের অতল তলে তলিয়ে। সেই রহস্যময় অন্ধকার থেকেই তিনি উদ্ধার করে এনেছেন মণি-মুক্তো। রুদ্রের যে কঠিন রূপ তিনি সারা জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন তার নিগূঢ় রহস্য সন্ধানে তিনি একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্থ থেকেছেন। প্রেমের চেয়ে কামনার বিকৃতি, আশা ও বিশ্বাসের চেয়ে হতাশা ও সংশয়, জীবনের চেয়ে মৃত্যুর দুঃসহ রূপ-ই তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্লট

হয়ে উঠেছে। তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা জগদীশ গুপ্তকে দেখি ফ্রয়েডীয় মগ্নচৈতন্যের একজন সন্ধানী রূপে। কিন্তু এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যবহার না করে বরং নিজস্ব বয়ানে ফ্রয়েডীয় ভাবনার মূলতত্ত্বটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সমভাবাপন্ন কোনো গোষ্ঠী বা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগের খবর তেমন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জীবনকে দেখতে এবং আঁকতে গিয়ে লেখক মনের গহন গভীরে নেমে পড়েছেন যার দ্বারা ফ্রয়েডীয়তত্ত্ব আপনা আপনিই এসে গেছে। শৈশব থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং প্রবহমান জীবনধারাকে জগদীশ গুপ্তর যেভাবে দেখা হয়েছে তা রচনার উপাদান রূপে অনায়াসে সেগুলি এসে গেছে। পরম্পরাগত ভাবে গার্হস্থ্য বাঙালির আচরিত জীবনধারার সর্পিল গুহাপথে (অন্ধকার মনের বিশৃঙ্খল বীভৎসতা) তিনি নিখুঁতভাবে আলো ফেলতে পেরেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করেছেন জীবনের মৌলসমস্যা এবং মনোবিকলনের স্বরূপকে। সামাজিক জীবনের অভ্যস্থ ধারণাকে জীববিজ্ঞানের যুক্তির দ্বারা আঘাত করে সমাজের গতিপথের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর বিদ্রোহী সত্তার স্পষ্ট প্রমাণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকগত মূল্যবোধের মধ্যে যে ঘুন ধরে আছে সেই ঘুনপোকাকে সূক্ষ্মভাবে বের করে এনেছেন। যার ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো প্রাথমিকভাবে বাঙালি জীবনের অভ্যস্ত চরিত্র হলেও গল্প এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির কিলবিল রূপ বেরিয়ে এসেছে। এই চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের যে প্রস্তুত ধারণা আছে মানবমনের অচেনা, অপরিচিত এবং অদ্ভুত কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তারা সেই ধারণাকে নাড়িয়ে দেয়। সুতরাং জগদীশ গুপ্ত একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার। তাঁর সময়ের অন্যান্য গল্পকারদের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

জগদীশ গুপ্তর **'অরূপের রাস'** উপরোক্ত গোত্রের একটি গল্প। এই গল্পের মতো প্রেমের গল্প বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। সাধারণত প্রেমের গল্পে নর-নারীর দেহ ও মনের আন্তঃসম্পর্ক ও বিরহ মিলনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। কিন্তু 'অরূপের রাস' সেই অর্থে প্রেম বিষয়ক গল্পের শ্রেণি পর্যায়ে পড়ে না। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে রানুর দেহজ সম্পর্ক পাঠকের অনুভূতিতে অভিনব ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দেয়। এই গল্পে রানু ও কানুর সম্পর্কের থেকেও এক ভিন্ন গোত্রের ইঙ্গিত আমরা পাই রানু ও ইন্দিরার সহবাসের দৃশ্যে। এই গল্পের কাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- প্রথমভাগে রানুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী। এরমধ্যে ঘটনাক্রম হলো রানু ও কানুর ভাব এবং আড়ি, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান ইত্যাদি। এসবকিছুই গল্পের দ্বিতীয় অংশের ভিত্তিভূমি তৈরি

করেছে। গল্পের শুরুতেই দেখি কানু রানুর কোমর জড়িয়ে ধরে ও রানু ছাড়িয়ে নেয়। রানু তার বিয়ের কথা কানুকে জানায়। বিনা পণে রানুর বিয়ের দিন স্থির হয়ে যায়, রানু কথা বন্ধ করে দেয় কানুর সঙ্গে, অথবা রানুর বাটি ভর্তি খাবার কুকুরের সামনে বসিয়ে দেওয়া, রানুর বিয়ের অনুষ্ঠানে কানুর লেখা কবিতার কাগজ উনুনের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে প্রেমের খেলা ও তার থেকে মান-অভিমান তা তরুন-তরুনীর প্রেমের সাধারণীকরণ মাত্র। গল্পের কাহিনীতে দেখি রানুর বিয়ে ও রানুর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। চৌদ্দো বছর বয়সি বিবাহিত যুবতী সুন্দরী রানুর পিত্রালয়ে ফিরে আসা এবং কানুর সঙ্গে দেখা হলেও দুজনের কথা না বলা- এই সবকিছুর মাধ্যমে উপেক্ষিত কানুর মনে নব ভাবনার জন্ম দেয়। এরপর রানুর পিতা-মাতার মৃত্যু, রানুর পিতার বাড়ি বিক্রি, কানুকে রানুর চিঠি ইত্যাদি ঘটনা কানুর প্রতি রানুর প্রগাঢ় প্রেমানুভূতিকে স্পষ্ট করে তোলে। কানুর কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায় রানুর প্রেমানুভূতি। এভাবেই দুই তরুন-তরুনীর মনের গহীনে নবতর প্রেমভাবনার স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে। বয়োসন্ধিক্ষণের অনুভূতিগুলি এখন অনেকটা পরিপক্ক ভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে আকারে-ইঙ্গিতে। এই ভাবেই গল্পের প্রথম আখ্যানটি পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'অরূপের রাস' গল্পের শেষাংশে দেখা যায় রানুর স্বামী বদলির চাকরি নিয়ে কানুর বাড়ির কাছে চলে এসেছেন। ভাড়া বাড়িতে এসে রানু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার জীবন সার্থকতার ভিন্নতর তাৎপর্য উপলব্ধি করে। রানুর ছেলে বেনুর প্রতি কানুর বাৎসল্য সৃষ্টি হয় এবং ইন্দিরার সঙ্গে রানুর গলায় গলায় ভাব জমে ওঠে। নিঃসন্তান ইন্দিরার আদরের ধন ওঠে বেনু। ঘটনাক্রমে দেখা যায় রানু কোনো এক অজানা অভিপ্রায়ে তার বুকের ধন বেনুকে ইন্দিরার হাতে তুলে দিতে চায়। বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে এই অনুভূতির তাৎপর্য হৃদয়াঙ্গম করা কঠিন। 'আয় বৌ তুই আর আমি এক হয়ে যাই' - রানুর এই দুটি অভিপ্রায় পাঠকের মনকে নাড়িয়ে দেয়। রানুর মানসিক অবস্থা দেখে কানুর মধ্যে রানুকে নিয়ে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়। এই ভাবে কাহিনী এগিয়ে চলে। রানুদের পুনরায় বদলির খবর আসে। ভাড়া বাড়ি ছাড়ার আগের দিন রানু কানুকে প্রণাম করে এবং সে কানুকে জানিয়ে দেয় 'কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ আমার কাছে শোবে। বৌটি বড় ভালো মানুষ।' রানুর এসব আচরণে কানু স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং রানুর মধ্যে এক জটিল রহস্যময়তা লক্ষ্য করে। পাঠকের কাছেও রানুর এরূপ আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু ইন্দিরার কাছে রানুর পাগলামি বলে অনুমিত হয়। সচেতন পাঠক কিন্তু রানুকে পাগল না ভেবে বরং ইন্দিরার সঙ্গে রাত

কাটানোর শর্তকে অবচেতনের রহস্যময় রূপ বলে ভেবে নেয়। 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি' এই শর্তে পাঠক অবচেতন মনের রহস্যময় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। দুই নারী পরস্পরের 'স্বামী-স্ত্রী' এই সত্যের এক অনাস্বাদিত ব্যঞ্জনা নিরূপণ করে। সর্বোপরি গল্পের শেষে কানুর উপলব্ধি পাঠককে এক জটিল প্রেমমনস্তত্ত্বের আভাস দিয়ে যায়। 'ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুচিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।.....আমি তৃপ্ত।' এই অনুভূতি আসলে অরূপ প্রেমের রসানুভব।

এই গল্পের রানু চরিত্রটি সারা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ছোটবেলার ভালোবাসা এবং তার প্রেমিককে নিজের করে পাওয়ার বাসনা বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়, কিন্তু যৌবনের প্রথম প্রেমাস্পদের শারীরিক আবেশকে অনুভব করবার জন্য তার বর্তমান স্ত্রীর শারীরিক আলিঙ্গনের যে বাসনা রানুর মধ্যে আছে তা সত্যিই অভিনব এবং জৈবিক বাস্তব। "রানু নিজের সেই বাল্যপ্রেম সম্পর্কে অধিকারবোধ ফিরে পায় ইন্দিরাকে দেখেই। ইন্দিরার স্বামী ও সে প্রেমের শারীরিকতা থেকে মুক্ত নয় গল্পের শেষ বাক্যে তাও বোঝা যায় - 'আমি তৃপ্ত'। রানুর এই আচরণকে 'মনোবিকার"দিয়ে দাগিয়ে দিলে ভুল হয়ে যাবে। '[১]বয়সের হিসেবে জগদীশ গুপ্তর সঙ্গে কল্লোল, কালিকলম পত্রিকার অধিকাংশ লেখকগনই প্রায় সমবয়সি ছিলেন। কালিকলম এর অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে গল্পকার লিখেছিলেন "আমার বয়স আপনাদেরই রকম তবে কম-বেশি যা তা"[২]। এ বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন "বয়সে কিছু বড়ো কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তারও যেটা দোষ সেটাও ওই তারুণ্যের দোষ- হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার। কিন্তু আসলে যে তেজী তাকে কখনো দোষ অর্শে না।"[৩] 'অরূপের রাস' গল্পটির কাহিনী পুনরায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই 'প্রগাঢ় প্রৌঢ়তা'র। ছোটোবেলার খেলার সঙ্গী পাড়ার কানুদাকে ভালোবাসে রাণু। কিন্তু ব্রাহ্মণ কানুর সাথে অব্রাহ্মণ রাণুর বিয়ে হয়নি। রাণুর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ঘটনাচক্রে বসন্তবাবুকে নিয়ে সংসার পেতেছে বাপের ভিটেয়। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক বড় মধুর। বসন্তবাবুর বদলির খবর এল। চলে যাওয়ার আগের দিন কানুদাকে সে বলে— "কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে।" পরদিন ইন্দিরা কানুকে বলল রাণুর পাগলামির কথা। "ইন্দিরা বলিল— যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গেলাম। — ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ... আমি তৃপ্ত।" কাহিনীর শুরুতেই দুটি বিষয় পাঠকের নজর কাড়ে।

তারমধ্যে একটি; বারে বারে রাণু ও কথকের বয়সের পার্থক্যকে নির্দেশ দেওয়া— "সে সাত, আমি চৌদ্দ বছরের", "রাণুর বয়স দশ, আমার সতেরো" অর্থাৎ; বয়সের সাথে সাথে সাথে মনোজগতের যে পরিবর্তন তা যেন জানিয়ে যাওয়া বা পাঠক কে স্মরণ করিয়ে রাখা। লেখক বুঝিয়ে দেন দুজনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো। রানুকে যেদিন বরপক্ষ দেখতে এলো সেদিন তার সাজসজ্জা দেখে গল্পকথক অনুভব করলেন তার "বুকের ভিতরকার বাকস্ফূর্তি যেন অকস্মাৎ অবরূদ্ধ হইয়া গেলো...।" রাণুর বিয়ের কিছুদিন পরেই তাই কানুর উপলব্ধি ছিল এইরূপ - "অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি-তরঙ্গের মতো আমার বুক জুড়িয়া গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলো।"—সমাজ নিরূপিত বিধানে এই কামনা ঠিক কতখানি অনুমোদনযোগ্য তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। অন্যদিকে রাণুর ভাবনা যদি দেখা যায় তাহলে তা পূর্বেই উল্লিখিত। এখানে, বেশকিছু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এর মাধ্যমে লেখক তাঁর অসম্ভব প্রজ্ঞার স্পর্শে কানু ও রানুর প্রেমের সম্পর্ককে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমত, কানুর পরিবার ব্রাহ্মণ হওয়ায় রানুর অনুরাগ মাথা উঁচু করে প্রকাশ পায়নি। অন্যদিকে, বিনা পণে রানুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঘটনা আসলে কানুর পরিবারের কাছে পরম্পরা বিরুদ্ধ। রানুর ছেলের প্রতি ইন্দিরার যে বাৎসল্য তা আসলে সন্তানহীনতার গ্লানি নাকি একাকীত্বের যন্ত্রণা যা ইন্দিরাকে বারবার দহন করে? এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান গল্পে পাওয়া যায় না। রানুর ছেলেকে কেন্দ্র করে কানুর যে লালসা "তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ"। রাণুর "প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্তরস স্থানান্তরিত -হৃদয়ের আনন্দ , ... হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।" — না পাওয়ার মধ্যে পাওয়ার যে পরিতৃপ্তি বারবার এই কাহিনীতে তা ঘুরে ফিরে এসেছে। বাস্তবে তা হলো অবদমিত কামনার নিরাভরণ প্রকাশ। গল্পের শেষ দুটি বাক্য, "ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ... আমি তৃপ্ত।" এই তৃপ্তি ঠিক কীরকম? কানু - রাণু ও ইন্দিরা এই তিনটি চরিত্রের এক অদ্ভুত, অদৃশ্য ত্রিকোণ সম্পর্ক ও বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করি। "কানুদার শরীর না পাওয়ার যন্ত্রণায় রাণু 'কানুদার' স্ত্রীকেই স্পর্শ করতে চেয়েছে। 'কানুদার' স্ত্রীকে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে কানুদার শরীরের স্বাদ নিয়েছে। 'কানুদাও' এতে তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু ইন্দিরা? ইন্দিরার সংঘাতটাই যেন একটা প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করায়। কানুর সন্তানহীনতার কারণ এবং ইন্দিরার রাণুর সাথে মিলন — এই দুইয়ের মধ্যেই আছে অতৃপ্ত অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও লালসা। এই 'লালসা'-র contrast তিনটি চরিত্রের তিনরকম, তা সত্ত্বেও

ইন্দিরার অভাববোধের প্রশ্নটাই সামনে আসে। রাণুর এই মিলন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও ইন্দিরার এই মিলন ঠিক কী ইঙ্গিত করে? বলা বাহুল্য, লেখক এই প্রশ্নের নিরসন করেননি। এই সংশয়টি তাই কাহিনীর শেষেও রয়ে যায়।"[৪]

ইন্দিরার সঙ্গে সহবাসে শেষ পর্যন্ত রানু তৃপ্ত হয়েছে কতখানি তা জানা যায় না, "তবে কানুকে পরিতৃপ্তি দিয়ে মুক্তি ঘটিয়েছে কামনার বেড়াজাল থেকে। ইন্দিরার প্রতি রানুর যে সম্ভোগেচ্ছা তাকে আপাতভাবে 'Lesbianism' বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।"[৫] কারণ সৃষ্টির উপযোগী হিসেবে বিপরীত লিঙ্গের যৌনতাকে মান্যতা দিয়েছে এবং সমকামকে নিষিদ্ধ করেছে। নিজের দেশকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজনীতিক টমাস বেবিংটন মেকলে সমকামিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে লর্ড মেকলের তৈরি এক আইনে বলা হয়েছে, 'প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ' যেকোনো যৌন সংসর্গের অপরাধে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি হতে পারে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে যাতে মানুষেরা ভিন্নতর যৌনতার আস্বাদনে মেতে না ওঠে তার জন্য সমকামকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের শরীরেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে এমনই রক্ষাকবচ। সম্প্রতি আইনী অনুমোদন পাওয়া গেলেও আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত সমকামিতাকে দীর্ঘদিন ছাড়পত্র দেয়নি। যদি আমরা সাহিত্যের দরবারে দেখি তাহলে অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে কিংবা বিদেশি সাহিত্যে এই রূপ 'স্ত্রী-সমকামিতা'কে বিষয় করে সাহিত্য লেখা হয়েছে অনেক। এক্ষেত্রে ইসমত চুগতাই-এর 'লিহাফ' গল্পকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলে অনেক চর্চা হয়েছে। এই উর্দু লেখিকা ১৯৩০-এর দশকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের যৌনতা এবং নারীবাদ, মধ্যবিত্ত কৌলীন্য এবং শ্রেণী সংগ্রামের মত বিষয়গুলি নিয়ে লিখতেন। সাহিত্যিক বাস্তবতার মাধ্যমে তিনি বিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৪২ এ উর্দু সাহিত্য পত্রিকা 'আদাব-ই-লতিফ'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প 'লিহাফ'। ধনী জমিদারের স্ত্রীর সঙ্গে কাজের মেয়ের দৈহিক সম্পর্ক ছিল এ গল্পের মূল উপজীব্য। তার পরই তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনে ব্রিটিশ সরকার। লাহৌর আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়, ক্ষমা চাইতে রাজি হননি বিদ্রোহী লেখিকা। দু' বছর কেস চলার পর জিতে যান তিনি। এই গল্পের বর্ণনায় বেগমজান আর রব্বুর লেপের একপাশ যখন কাঁপছিল এবং ওঠানামা করছিল তখনই অনুমান করা গেল, এই মোটা লেপের আড়াল রাখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসছে। সভ্য সমাজ গঠনের পর থেকে যে অভিযোগের আঙুল

উঠেছিল সমকামের বিরুদ্ধে, যে সংকীর্ণ সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, বিপরীত লিঙ্গভিত্তিক যৌনতার সেই সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বেগমজান আর রব্বু লেপের আচ্ছাদনের দ্বারা। যৌনতায় কোনোপ্রকার শ্রেণি বৈষম্য থাকুক তা বেগমজান-রব্বু চায় না। তাই তাদের মধ্যে অতিক্রমনের একটি জোরাল বক্তব্য ছিল। "সৃষ্টি আর আনন্দকে যে সর্বদা এক সমীকরণের এপার ওপারে থাকতেই হবে তার কোনও মানে নেই। তবে সেটাকেই নিয়ম করে তোলা এক ধরনের আগ্রাসন। অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টির আভাস নেই, সেখানে আনন্দের কোনও মূল্য নেই। শুধু সমকামিতা কেন, যে কোনও যৌনতা, যা শুধু আনন্দের নিমিত্তই, তাকে ব্রাত্য করে রাখাই এই আগ্রাসী ব্যবস্থার প্রচলিত ছক।"[৬] সমাজ নিরূপিত যৌনতার আধার সম্পর্কিত যে প্রচলিত ছক সেটা ইসমত চুগতাই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বার বার বলতেন, 'মারা গেলে আমাকে কফিনে রেখো না' – ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত চিতার আগুনে দাহ করা হয়েছিল। মৃত্যুর পরেও বন্দী না থেকে মুক্ত আকাশের দাবী করে গেছেন ইসমত। অপর দিকে জগদীশ গুপ্তর "রাণুকে অবশ্য শ্রেণিবৈষম্যের চৌকাঠ পেরোতে হয়নি। ভালবাসার মানুষ হিসেবে সে বেছে নিতে পেরেছিল তার শ্রেণিরই সঙ্গীকে। কিন্তু যে স্বাধিকারপ্রমত্ততায় ইন্দিরাকে সে রাতে পাশে নিয়ে শুতে চেয়েছিল, তা যেন কোনও অনুমোদনেরই অপেক্ষা করে না, তা চাওয়া স্রেফ নিয়মরক্ষার খাতিরেই। অবশেষে ইন্দিরা যখন বলে- 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি'- সেই অকপট বয়ান চমকে দেয় বইকি। মনের মানুষকে নিজের করে না পাওয়া এবং যৌনতায় নিজের পছন্দকে স্বীকৃতি দেওয়ার নিরিখে এই দুই নারী সেদিন সত্যিই 'অরূপের রাস' নামিয়ে এনেছিল। সেখানে খেলা করে নিখাদ ভালবাসা।"[৭]সুতরাং জগদীশের রানু ও ইন্দিরার মধ্যে এরূপ সম্পর্ক ছিল না যাকে চোখ রাঙ্গিয়ে সমকাম বলা যায়। জগদীশ গুপ্ত তাঁর গল্পে যৌনতার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলেও তিনি এই গল্পে কোথাও সমকামী মিলনের স্পষ্ট বর্ণনা দেন নি। "কেবল ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাই এটি 'Homosexuality' এর তকমা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, হয়ে উঠেছে 'Homo Eroticism'-এর যথার্থ বাহক।"[৮] অনুরূপভাবে ইসমত চুগতাই-এর 'লিহাফ' গল্পেও কোথাও সমকামীত্বের লক্ষ্য করা যায় না। এই গল্পটিও পাঠককে 'Homo Erotic Sense' এর বার্তা দেয়। গল্পকার লিখলেন "He, however, had a strange hobby... He kept an open house for students— young, fair and slender-waisted boys whose expenses mere borne by him." বেগমজান ও রাব্বুর প্রেমের বর্ণনা দিয়েছে অন্দরমহলের

দায়িত্বে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সেই বাচ্চা মেয়েটি এইভাবে — "I woke up at night and Begum Jaan's quilt was shaking vigorously as though an elephant was struggling inside"... "Go to sleep Child... There's no thief." that was Rabbu's voice." সুতরাং চুগতাইর গল্পের কোথাও কোনো সমকামী মিলনের বর্ণনা নেই। শুধুমাত্র দৈহিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিনব পন্থাটি নির্দেশ করেছেন গল্পকার। একই পন্থা লক্ষ্য করি জগদীশ গুপ্তর 'অরূপের রাস' গল্পে রানু ও ইন্দিরার মিলন আকাঙ্ক্ষায়।

বরং ফ্রয়েডীয় মগ্নচৈতন্যের ধারণার দ্বারা মিলিয়ে দেখলে গল্পটিকে Fetishism বা বস্তুকামের গল্প রূপে মেনে নিতে হয়। কারণ রানুর মূল গন্তব্য ছিল কানুর শরীর। রানু ও ইন্দিরার মাঝে কানু এসে পড়ায় সেখানে 'সরলমতি' ইন্দিরাকে রানু 'ইউজ' করেছে। ইন্দিরার মন ও শরীরের প্রতি আলাদা কোনো আকর্ষণ রানুর ছিলনা। স্বামীর বদলির সূত্রে যাওয়ার সময় হয়েছে। তখন প্রেমের দাবী মেনেই শরীরের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিতে চেয়েছে। তথাকথিত সামাজিক শূচিতা ও দাম্পত্যের প্রতি বাহ্যিক ভাবে একনিষ্ঠ থেকে নিজের আত্মতৃপ্তি ঘটিয়ে নিয়েছে। গভীর প্রেমকে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপ দিয়েছে Fetishism বা বস্তুকামিতার মধ্য দিয়ে।"[৯] মানুষ যাকে কামনা করে তার ব্যবহৃত উপকরণের দ্বারা কামতৃপ্তি চরিতার্থ করা এর মূল উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে এটি 'স্ত্রী-সমকামিতা'র গল্প বলে মনে হলেও বাস্তবে ইন্দিরার Fetish চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। কানু ও রানুর প্রেমের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠা এইরকম প্রচ্ছন্ন যৌনতা ও ব্যতিক্রমী প্রেমের ধারণা কল্লোলীয় গল্পধারায় সত্যিই বিরল। জগদীশ গুপ্ত সেই অর্থে একজন যথার্থ ন্যাচারালিস্ট গল্পকার হয়ে উঠতে পেরেছেন।

কেন আমরা 'ন্যাচারালিজম' বলতে চাই তার কারণ তত্ত্ববিশ্বে এই শব্দবন্ধটির মূল কথা হলো অধ্যাত্ম বা শারীরিক প্রবৃত্তি-অতিরিক্ত মানুষ বিশেষ কোনো গুণের অধিকারী নয়, যে শুধুমাত্র উন্নততর প্রাণী, অন্যান্য প্রাণীর মতো সেও প্রকৃতির কাছে অসহায়। মানুষের জীবনবৃত্ত নিয়ন্ত্রিত হয় দুটি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা— বংশগতি ও পরিবেশ। মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষুধা, যৌনবাসনা, লালসা ইত্যাদি বংশগতির সূত্রে আসে। এবং সে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ, নিজের পরিবার, শ্রেণি ও প্রতিবেশের অধীন। রবার্ট ডারউইনের 'থিওরি অফ ইভোলিউশন', চার্লস-এর তত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞানী ক্লাউড বার্নার্ড–এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসব কিছুর উপর 'ন্যাচারালিজম'-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে, নির্মোহ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের আচরণ ও জীবন-পরিণতির সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে আসছে 'ন্যাচারালিজম'।

সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ও পুরনো সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে, রূপান্তর ঘটে মূল্যবোধের। ইন্দ্রিয়াতীত রবীন্দ্রদর্শনের বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে জন্ম নিল বাস্তবতার, স্বাভাবিকভাবে চলে এলো প্রকৃতিবাদ ও বাস্তবতার বিষন্ন রূপ। ১৮৮০ সালে এমিল জোলা তাঁর 'দ্যা এক্সপেরিমেন্টাল নভেল' শীর্ষক বইটিতে লিখলেন যে, মানুষের অধিবিদ্যক (metaphysica) অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে, শারীরবৃত্তীয় চাহিদায় মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছে। এমিল জোলার বক্তব্যটি ছিল "The metaphysical men is dead; our whole demand is transformed with the coming of the Physiological man"[1]। সুতরাং "এমিল জোলা 'ফিজিওলজিক্যাল ম্যানে'এর মৃত্যু ঘোষণা করে 'ল ম্যানমেটাফিজিক্যা'-র আগ্রাসী সত্তার কথা বলেছিলেন। সেই 'ফিজিওলজিক্যাল ম্যান' বাংলা সাহিত্যে পা রেখেছিল জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্যে।"[১০] বাহ্যত 'প্রকৃতিবাদ'কে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিলেন না বটে কিন্তু অদ্ভুত ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের আঁতের কথা উঠে এলো। অনুরূপভাবে জগদীশ গুপ্তর 'অরূপের রাস' গল্পের 'ইন্দিরা' আর 'রাণু'-র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষিত মিলন আসলে প্রকৃতি সমর্থিত। গল্পকার এখানে ন্যাচারালিস্ট এর ভূমিকা পালন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. উত্তম পুরকাইত(সম্পা.), 'উজাগর' পত্রিকা, 'জগদীশ গুপ্ত' সংখ্যা, চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৪, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা:৩৪৫

২. সুবীর রায় চৌধুরী(সম্পা.), জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৩৮

৩. সুবীর রায় চৌধুরী(সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা:২৩৮

৪. সুজয় চক্রবর্তী(সম্পা.), 'পারক' পত্রিকা, 'অরূপের রাস': একটি পুনর্পাঠ(প্রবন্ধ), তিস্তা রায়চৌধুরী, পারক প্রকাশনী, ২০১৯

৫. উত্তম পুরকাইত(সম্পা.), 'উজাগর' পত্রিকা, 'জগদীশ গুপ্ত' সংখ্যা, চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জগদীশ গুপ্তর গল্পের বিষয়ে কিছু ভাবনা(প্রবন্ধ), মননকুমার মন্ডল, ১৪২৪, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা:৩৩৮

৬. সৃঞ্জয় বসু(সম্পা.), সংবাদ প্রতিদিন(দৈনিক), সম্পাদকীয়, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা:২
৭. সৃঞ্জয় বসু(সম্পা.), পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা:২
৮. সুজয় চক্রবর্তী(সম্পা.),পূর্বোক্ত পত্রিকা
৯. উত্তম পুরকাইত(সম্পা.),পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা:৩৩৮
১০. সুধীর চক্রবর্তী(সম্পা.), বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা: ২৪৬
1. Emile Zola, The experimental Novel, Haskell House, New York, 1964, chapter: IV

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিপর্যয়

প্রহ্লাদ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সময়টা ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদী জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণ এবং তার দুদিন পরে ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সর্বক্ষয়ী ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ যার পরিসমাপ্তি। এই যুদ্ধ অন্যান্য দেশের মতো প্রত্যক্ষে না হলেও, পরোক্ষে ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ডকে করে তুলেছে নির্মমভাবে ক্ষত-বিক্ষত। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হৃৎপিণ্ড নিয়েই ভারতবর্ষ 'কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে' চলে ভবিষ্যতের পথে। সর্বস্তরব্যাপী এই বিপর্যয় এবং পরবর্তী সময়ের অভূতপূর্ব টানাপোড়েন, সংকট যে শুধু মানুষের জীবনধারাকে বদলে দিল তা নয়— অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে ভেঙে দিল মানুষের এত দিনের লালিত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ (Sence of Value)–কে।[১] সমাজতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় যা একধরনের 'বৈপ্লবিক রূপান্তর'-এর সমতুল্য— "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কনট্রোল রেশনিং, কালোবাজার, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনিত বীভৎস হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবিভাগজনিত লক্ষ লক্ষ উদবাস্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রকল্পজনিত বিপুল মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবদলের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে এমন একটা ওলোট-পালট হয়ে গেছে, তার সমস্ত স্তর ও মূল পর্যন্ত এমনভাবে নড়ে উঠেছে, চিরায়ত নীতিবোধ মূল্যবোধ মানবিকতাবোধ এমন সজোরে ধাক্কা খেয়েছে, ... যে তাকে গতানুগতিক 'পরিবর্তন' বা 'Social Change' না বলে 'বৈপ্লবিক রূপান্তর' বলা যায়।"[২]

১৫ আগস্ট ১৯৪৭। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এনেছে দেশভাগ, কৃত্রিম মারণ দুর্ভিক্ষ,[৩] মুদ্রাস্ফীতি, প্রাণঘাতী হত্যাকাণ্ড ও শরণার্থীদের পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায়; বিশেষ করে নগর কলকাতায়। পরবর্তীতে মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতির হাত ধরে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে কালোবাজারি, বেকারত্ব দারিদ্র এবং ভুখা মিছিল। এছাড়াও অর্থনৈতিক সংকট জনিত কারণে চাকরিতে ছাঁটাই, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি,

লে-অফ, লক-আউট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত অজস্র প্রতিবাদ। ফলস্বরূপ, যুগজীবন হয়ে ওঠে বিপন্ন। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতাও আর্থিক সংকটের এই নিদারুণ বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বিপন্ন কালের এই জটিল অন্তর্ঘাতের মায়াজাল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব ও আভিজাত্যকে রক্ষার জন্য আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী নাগরিক মধ্যবিত্ত মন বাধ্য হয়ে তাদের মূলবোধকে ক্ষয়িত করেছে এবং মূল্যবোধহীন বিবেক নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ভণ্ডামী মেতে উঠেছে— 'স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল স্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, প্রাণঘাতী দাঙ্গা, দেশভাগ, অনন্ত শরণার্থীর স্রোত ...আঘাতে আঘাতে বাঙালির সাবেকি মূল্যবোধগুলো যেন তছনছ হয়ে গেল। ঘরে বাইরে গ্রামে শহরে সর্বত্রই তখন ভাঙন আর ভাঙন।'[৪] কিছু পরে, ষাটের দশকের শেষপর্বে নকশাল আন্দোলনের দাবদাহ কেবলমাত্র যুবসমাজকেই ক্ষয়িত করেনি, নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্তের স্মৃতি ও সত্তায় অলক্ষ্যে সঞ্চার করে দেয় এক গোপন রোগ। যা গোপনে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে চলল অন্তর্ঘাতে জর্জরিত, বিপন্ন গোটা মধ্যবিত্ত মনকে। 'বাস্তবজীবন সন্নিহিত শিল্প-মাধ্যম'[৫] ছোটগল্পেও তার প্রতিচ্ছবি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত।

আত্মরক্ষা, ক্ষুধার নিবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদার মধ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর চেতনার প্রকাশ। কিন্তু মানুষ ত্রিবিধ নাগপাশের এই গণ্ডীকে অতিক্রম করে 'মানুষ' হয়ে ওঠে কোন এক বোধের পরিপ্রেক্ষিতে। এই বোধ হল— নীতিবোধ বা মূল্যবোধ। যে মূল্যবোধ মানুষকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করে তুলেছে।[৬] ব্যক্তি মানুষের যে মানবিক স্বরূপ তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে তাকে তার মূল্যবোধ বা নীতিবোধ। সাধারণভাবে, জীবনের চরম মূল্যকে অন্বেষণ করতে মানুষ যে বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি আস্থা রাখে তাই তাদের মূল্যবোধ বা মূল্যচেতনা।[৭] গবেষক Milton Rokeach মূল্যবোধ বা 'Sense of Value'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে— 'A Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or endstate of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence.'[৮]

মানুষের মধ্যে চিরন্তন বেশ কিছু মূল্যবোধ থাকে— দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সততা, উদারতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি। তবে, সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনানির্ভর মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তির মূল্যচেতনা এবং সামাজিক মূল্যচেতনা সমাজে ন্যায় ও স্থিতিশীলতা রক্ষা

করে।[৯] কিন্তু অনেক সময় সামাজিক মূল্যবোধ বা মূল্যচেতনার সঙ্গে ব্যক্তির মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব অনিবার্জ হয়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণে কোন কার্য অন্যায় বলে বিবেচিত হলেও, ব্যক্তির হৃদয় খুঁড়ে তার হৃদস্পন্দন অনুভব করলে দেখা যায় সে, কার্য সম্পন্নকারী ব্যক্তিটি অপরাধী নয়; সে হয়তো মানবিক মূল্যবোধে আস্থাশীল একজন ব্যক্তি। ফলস্বরূপ, সামাজিক মূল্যবোধ বা Social Value-এর চেয়েও ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট, রূপান্তর অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে।[১০] আমাদের আলোচনাতেও ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পরিবর্তনের দিকে অধিক আলোকপাত করা হবে।

সমকালীন অবক্ষয়িত রাজনীতি, বিপন্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ভয়াবহ স্বার্থপরতায় মানুষের যখন অস্তিত্বের সংকট হয়, তখন সে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে নানা অপরাধের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ক্ষয়িষ্ণু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও হিমাবহে নিঃস্ব, রিক্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদে মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এমনকী, নিজেদের স্বচ্ছন্দে রাখার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় অনবরত উপেক্ষা করে চলেছে মূল্যচেতনাকে। নাগরিক মধ্যবিত্তের মানবিক মূল্যবোধের এই মর্মান্তিক অবক্ষয়ের রূপকে বিভিন্ন গল্পকার তাঁদের ছোটগল্পে স্বকীয় বিশিষ্টতায় গভীর ও মর্মন্তুদভাবে পরিস্ফুট করেছেন। গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বিপন্ন কালের অন্তর্ঘাতে জর্জরিত মধ্যবিত্ত মনের নৈতিক-বিকৃতি তথা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ভয়ঙ্কর প্রচ্ছায়াকে দিব্যেন্দু তাঁর গল্পের অণুবিশ্বে কতটা সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন তা আমাদের এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

> *স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাঙালি জীবন আরও গভীর সংকটের মুখোমুখি। অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মূল্যবোধের ভাঙন, রাজনৈতিক দিশাহীনতা বাঙালি জীবনকে করে তুলল অস্থির। কোন পথে এগোনো উচিত— তা নিয়ে দেখা গেল দ্বিধা সংশয়। নানা রকম ক্লেদ, বৈষম্য বাঙালি জীবনকে করে তুলল ভারাক্রান্ত।*[১১]

বিভাগ পরবর্তী নিষ্ঠুর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং অবক্ষয়িত রাজনীতির আঘাতে আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মন যখন দিশেহারা, তখন সুস্থ-পরিশীলিত জীবনের আশায় অমানুষিক লড়াইয়ে ক্রমাগত হারিয়ে ফেলতে হয়েছে তাদের আঁকড়ে রাখা এতকালের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। বিপন্ন কালের পটভূমির সঙ্গে পটধৃত শহুরে জীবনের মূল্যবোধের

সংকট ও বিপর্যয়কে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত উন্মোচন করেছেন তাঁর বেশ কিছু গল্পে। 'চিলেকোঠা' (দর্পণ, ১৩৭১) তার অন্যতম নিদর্শন। ভারত কৃষি-কেন্দ্রিক দেশ। কিন্তু অনেক সময় সরকারের খামখেয়ালির জন্য কৃষিকে অবহেলিত হতে হয়। এবং অনিবার্জ হয়ে ওঠে খাদ্য-সংকট। স্বাধীনতার একযুগ পরে অর্থাৎ ষাটের দশকের শুরু থেকেই অবহেলিত কৃষি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে চীন (১৯৬২) ও পাকিস্তানের (১৯৬৫) সঙ্গে যুদ্ধের সূত্রে বিপুল অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে চলে যাওয়ায় দুর্বল খাদ্য-পরিস্থিতি আরও ভীষণরূপ ধারণ করে। ফলে, মানুষের ক্ষোভ, অসন্তোষ যা এতদিনের পুঞ্জিভূত ছিল তা ফেটে পড়ে ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনে।[১২] এই সংকটের সূত্রে রাজনীতিতে দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে যায়। বাজার থেকে খাদ্য শস্য সরকারের নামে তুলে দুর্ভিক্ষের মধ্যে কালোবাজারি করে মন্ত্রীর স্নেহভাজন গোষ্ঠী। দুর্নীতির হাত ধরে চোরাচালান বৃদ্ধি পাওয়ায় কালোবাজারে বেড়ে যায় চালের দাম—

> *খাদ্য সংকট এই দশকে বরাবর ছিল। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে, বিক্ষোভে এ রাজ্য উত্তাল হয়ে ওঠে। খাদ্যনীতিতে সরকার জনগণের সমস্যা মোচন করতে পারেনি। তখন থেকেই এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার এবং বঞ্চনার কথা বারবার শোনা গেছে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর থেকে এরাজ্যের বাংলা-বিহার সীমান্তে চেকপোস্ট বসিয়ে চোরাচালান বন্ধের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্য সংগ্রহ অভিযান চলে। কিন্তু চোরাচালান বন্ধ করা যায়নি। কালোবাজারে চালের দাম বেড়ে যায়।*[১৩]

কালোবাজারে চালের আকাশ ছোঁয়া দাম এবং পরিশেষে চালের অমিল নাগরিক মধ্যবিত্তের বিবেক-বিসর্জনের ইতিবৃত্ত 'চিলেকোঠা'। বাজারে চালের অভাবের প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের শুরু। গল্পের অন্যতম চরিত্র বসন্তের মুখে সেই সংকট ধ্বনিত— 'ঘরে যা চাল আছে তাতে আর দেড় দিন চলবে টেনেটুনে। একটা কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাত্রে ক'দিন রুটি চলবে। কাহাতক আর রুটি চিবোনো যায়।'[১৪] সেকারণে, ঘুম থেকে উঠেই সরকারি ব্যবস্থায় দোকানে চাল পাওয়ার আশায় স্ত্রীর কথা মতো থলি হাতে দোকানে যায় বসন্ত। কিন্তু অনেকের ন্যায় তাকেও হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। রুলিং পার্টির নেতারা অধিক মুনাফার আশায় সরকার প্রদত্ত সেই চালকে নিজেদের আরতে

জমায়েত করে। এরূপ কর্মকাণ্ডকে বসন্তের ধাপ্পাবাজি বলেই মনে হয়। হারানের চাল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর তার সেই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ— “ ‘কোথায় চাল।’ স্পষ্টই বিরক্ত বোধ করল বসন্ত, ‘শালাদের সব ধাপ্পা।... যেমন আপনার সরকার তেমনি কাগজগুলো। পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ।’”[১৫] সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বার্থে কোন বিশেষ মতাদর্শের নেতাদের ভোট দিয়ে জয়ী করে। কিন্তু সেই সব নেতারা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে প্রকারান্তরে নিজেদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এরূপ কর্মকাণ্ডে নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অসামঞ্জস্যের চিত্র স্পষ্টিকৃত। ক্ষয়িষ্ণু সময়ে চাল নিয়ে কুৎসিত কর্মে নিয়জিত বিবেকহীন নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ উগরে ওঠায় স্বাভাবিক— ‘বসন্তের নিঃশ্বাস পড়ল। নেতাগুলোকে হাতে পেলে চিবিয়ে খায়। সেটা ওর একার কাজ নয়। কিছুদিন জোট বেঁধে কিল ঘুষি তছনছের পথে এগিয়ে গেলে যদি বিবেকে টান পড়ে। সতেরো বছরের স্বাধীনতা আর কিছু না দিক বিবেকবোধ পুরোদস্তুর নস্যাৎ করে দিয়েছে।’[১৬]

বসন্ত যে বাড়িতে ভাড়া থাকে, সেই বাড়ির চিলেকোঠায় থাকে মানিক। বাড়িওয়ালার ভাইপো; এবাড়ির কেয়ারটেকার। তার কাজ কাপ্তানি হলেও, রাজনীতির সক্রীয় কর্মী। ‘গতবার ইলেকশনের সময় পার্টির হয়ে বাড়িবাড়ি ভোট ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল।’[১৭] পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় মানিক নিজের সুবিধার্তে দুবস্তা চাল এনে চিলেকোঠায় সংরক্ষণ করে। বসন্ত ও তার প্রতিবেশী হারানের ভাষ্যে তা উল্লেখিত। গল্পের খণ্ডাংশ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

> *‘মানিক কাল রাত্রে দুবস্তা চাল পাচার করেছে—’*
>
> *‘কোথায়?’*
>
> *যেন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কিছু শুনছে, সেইভাবে দুপায়ে উঠে দাঁড়াল বসন্ত। নিশ্বাস বন্ধ।*
>
> *‘কোথায় আবার চিলেকোঠায়।’*
>
> *বসন্ত বসে পড়ল। বুকের মধ্যে হঠাৎ ঝড় বইতে শুরু করেছে। উত্তেজনায় হারানের হাত থেকে তাসের বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিল।*
>
> *‘ব্যাপারটা কনফিডেনসিয়াল। তুমি আবার এ নিয়ে হইচই করো না বাপু।’ বোকার মতো হাসল হারান।*
>
> *‘রাত্রে পেচ্ছাপ করতে বেড়িয়েছিল শম্ভু, সেই সময় নাকি চাকরটা আর কুলি মিলে পাচার করেছিল। শম্ভু দেখে ফেলেছে।’*

'বলেন কি, দুবস্তা।'[১৮]

কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বেই চালের জন্য মানিকের কাছে যাওয়া সত্ত্বেও বসন্তকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। প্রচণ্ড রাগে তাই সে ফেটে পড়ে। অন্যদিকে শম্ভু এবং হারান নিজেদের স্বার্থে মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে চুরি করা চালের ভাগিদার হয়— 'শম্ভু ওর বখরা নিয়ে নিয়েছে। ... সকালে মানিকের কাছে গিয়েছিলুম। আমিও চাল এনেছি। পুলিশে জানালে মানিক আমাদের ফাঁসাবে। ... চাল নেই ভাগ্নেকে দিয়ে দিয়েছি।'[১৯] বসন্তের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায় হারানের ঘরের তক্তোপোশের নিচে একবস্তা চাল দেখে। হারান নিজেকে বাঁচানোর জন্য— 'ও চাল আমার নয়, মানিকের। এখানে চালান করেছে।'[২০] বললেও বসন্ত বিশ্বাস করেনি; বরং বলে ওঠে— 'শালা চোর'। মানুষের অন্তর্জগতে চিরন্তন কিছু মূল্যবোধ থাকে, যার মধ্যে অন্যতম— 'সত্যবাদিতা'। ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সঙ্গে বুঝতে গিয়ে মানুষ সেই গুণটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। নাগরিক মধ্যবিত্ত হারানও সেই পথের অন্যতম পথিক। শেষপর্যন্ত, বিষাক্ত ক্ষোভের সূত্রে বসন্ত হারানকে পদাঘাত করে। তবে তার 'চোখে কোন রাগ নেই, জ্বালা নেই, দুঃখ নেই শুধুই মিনতি।'[২১] চালের অভাবে যে মানুষ গুলো বিবেককে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের চোখে অসহায় মিনতি ছাড়া আর কোন ভাষায় বা থাকতে পারে ! তবে বসন্তের এই 'বলিষ্ঠ লাথি' কেবল হারানের প্রতি নয়, সমকালীন সংক্ষুব্ধ সমাজের মূল্যবোধহীন রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতিও। এছাড়াও বসন্তের বাড়ির ঝি স্বাস্থ্যবতী কমলার শরীরকে ক্ষুধার্ত চোখ দিয়ে ভোগ করার মধ্যেও হারানের অবক্ষয়িত নীতিবোধের পরিচয় মেলে। লেখকের জবানিতে তা ব্যাখ্যাত— 'চকিতে তাকিয়ে দেখল চোখ বড় বড় করে কমলাকে গিলছে হারান। লোকটা ইতর।'[২২] সত্যি, হারানের এরূপ কর্মকাণ্ড ইতরতারই পরিচায়ক। সর্বজ্ঞ কথকের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of View)-কে অবলম্বন করে দিব্যেন্দু খুব কৌশলে হারান, মানিক, শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গে বিপথগামী সমকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এককথায় বিবেকবোধের বিনষ্টীকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন নিজস্ব প্রতিভাবলে।

আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক দায়বোধের বিরোধটিকে দিব্যেন্দু ধরে দেন ঠিক ঠাক ! মিডলক্লাস মরালিটিকে তিনি কোন কোন গল্পে প্রচণ্ড অস্বস্তির মুখোমুখি ফেলে দিয়েছেন। আবার কোন সময় মূল্যবোধের স্বেচ্ছাকৃত অবক্ষয়কেও যে মধ্যবিত্ত গুরুত্ব দেয় না তার নির্লজ্জ প্রমাণ হয়ে রয়েছে 'বিবেক' (শারদীয়া মহানগর, ১৩৯০) গল্পটি।[২৩] গল্পের প্রধান চরিত্র জহর টিপিকাল

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। কর্মব্যস্ত জীবন এবং আত্মসুখ তার একান্ত কাম্য। তার গাড়ির ড্রাইভার জনার্দনের ছোটমেয়ে কিডনি ইনফেকশন জনিত কারণে জ্বরে অসুস্থ। সেকারণে, মেয়ের চিকিৎসার জন্য অফিস থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরে জহরকে সে বলে— 'স্যার, আজ একটু ছুটি পেলে ভালো হত। ... আমার ছোট মেয়ের জ্বর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব—'[২৪] জহর নিজে ড্রাইভ করতে জানলেও জনার্দনকে ছুটি দেয়নি বরং মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে ডাক্তারোচিত ভঙ্গিতে বলে— 'জ্বর মানে তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ? কাল সকালে দেখালেও চলবে। কাল বরং একটু দেরিতে এসো'[২৫] এই উক্তির মধ্য দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক, বিলাসী নাগরিক উচ্চ-মধ্যবিত্ত জহরের হৃদয়ের মূল্যবোধহীনতার দিকটিই প্রকাশিত। মানুষের মনের অন্তঃস্থলে দয়া, মায়া, সহানুভূতি প্রভৃতি যে মানবিক গুণগুলি থাকে; তার বিন্দুমাত্র জহরের মনে থাকলে এরূপ উক্তি বলতে পারত না। পারত না— 'লোকগুলো এত ইরেসপনসিবল। লাস্ট উইকে নিজের জ্বর বলে কামাই করল। আজ মেয়ের জ্বর ! অজুহাতের অভাব নেই কোনও—'[২৬]-এর মতো হৃদয় বিদারক উক্তিও। নাগরিক মধ্যবিত্ত নিজের আভিজাত্য এবং বিলাসী জীবন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা গুলির কোন মূল্যই আজ তাদের কাছে নেই।

জহর ভাবত তার বিবেক অত্যন্ত প্রখর, এতদিনের সাফল্যের সবটাই তার বুদ্ধি ও বিবেক চালিত। সে-ই বিখ্যাত হোটেলে অনুষ্ঠিত পার্টি থেকে ফেরার পথে ড্রাইভারকে উপেক্ষা করে মদের নেশায় বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটায়। এবং তারপরই ড্রাইভার জনার্দনকে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়ে ভাবে ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য জনার্দন হয়তো টাকা নিয়ে 'দর-কষাকষি' করবে, কেননা এই সমস্ত লোকের বিবেক থাকে না। প্রয়োজন ও প্রলোভন— দুটোকে এক জায়গায় মেলাতে পারলে এরা খুন পর্যন্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, সে আরও ভাবে—

> *সকলেই জানে, গাড়িটা তার হলেও ড্রাইভারই চালায়। এখনও চালাচ্ছে। অ্যাক্সিডেন্ট করে থাকলে ড্রাইভারই করেছে। পৃথিবীতে কেউই নিশ্চয়ই এমন মূর্খ নয় যে ভেবে নেবে, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে একটি নিরীহ মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের হাতে স্টিয়ারিং তুলে নিয়েছিল জহর।*[২৭]

জহরের এই ভাবনার মধ্যেও তার আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসত্তার নৈতিক বিনষ্টির ছবিটিই প্রকাশ পেয়েছে। বরং, গাড়ি চালক জনার্দনই হয়ে উঠেছে নীতিপরায়ন একনিষ্ঠ

ভৃত্য ও মানবিক গুণসম্পন্ন পূর্ণ মানুষ। তাই সে আক্রান্ত মানুষটির চিকিৎসার কথা ভাবে এবং বলে ওঠে— 'গাড়ি থামান। দেখুন হাসপাতালে দিতে হয় কিনা! ইস্!'[২৮] কিন্তু ন্যায়-নীতি-বিবেকের বুলি আওরানো মধ্যবিত্ত জহর মানুষটি 'মরে গেলে পুলিশ কেস হবে বলে' গাড়ি থামায় না। এগিয়ে চলে বাড়ির উদ্দেশে। এই একই রকমের বিবেকজাত অপরাধবোধের আর একটি আখ্যান দিব্যেন্দুর 'মারিয়ে যাওয়া' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৭৯) গল্পটি।

আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ একটা আত্মসুখী জীবনযাপন এতটাই মেতে উঠেছে যে, সেই মোহে অনেক সময় মানবিকতার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এবং সংঘটিত করে ফেলে বিভিন্ন বিবেকবোধহীন কর্মকাণ্ড। তার অন্যতম উদাহরণ দিব্যেন্দুর 'সাধুচরণ' (শারদীয়া মহানগর ১৩৮৯)। গল্পের প্রধান চরিত্র— মৃগাঙ্ক এবং সাধুচরণ। মৃগাঙ্ক কলেজের অধ্যাপক। তবে রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। অন্যদিকে সাধুচরণ মৃগাঙ্ক-অনিতার সংসারের অনেকদিনের পুরনো বয়স্ক ভৃত্য। অত্যধিক বয়সের কারণে দুর্বলতা তার প্রতিটি পেশীর নিত্যসঙ্গী। মনের জোরে এমনকী নিরুপায় ভাবে অবিশ্রান্ত খেটে চলে মধ্যবিত্তের এই সংসারে। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুরারগ্য ব্যাধী আলসার তার অন্তঃস্থলের শক্তি বিলীন করে দেয়; খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে; সেকারণে বারেবারে নিজেকে জিরিয়ে নিতে চায়। দুর্বলতা কিংবা পেটের জ্বালা হেতু নিয়মে বাধা ছকের মধ্যে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে রান্নার কাজ সম্পন্ন না করায় মধ্যবিত্তের সংসার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনিতার সংলাপে তার পরিচয় পাওয়া যায়—

> *'কাণ্ড দ্যাখো!' মৃগাঙ্ককে সামনে পেয়ে অনিতার জোর বেরে গেল আরও। বলল, 'আটটা বেজে গেল! এখনও হাড়ি চড়ায়নি উনোনে ! এখন কে তোমায় কলেজের ভাত দেবে, কেই বা রুনির স্কুলের ভাত দেবে। আবার চোপা করছে মুখের ওপর। শরীর খারাপ, বাবুর নাকি দুর্বল লাগছে— কাজ করতে পারবে না।'*[২৯]

অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি মানুষের দয়া, সহানুভূতি প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ অনিতার হৃদয়ে তার কিঞ্চিৎ দেখা মেলে না। বরং সে বৃদ্ধ ভৃত্যের অসুস্থতাকে ব্যাঙ্গের খোরাক করে তুলেছে এবং প্রয়োগ করেছে শ্লেষাত্মক কিছু শব্দবন্ধ। যা তার ক্ষয়িত মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।

অনিতার হৃদয়বিদারক শব্দ বাণের জ্বালায় ক্ষুব্ধ সাধুচরণ প্রতিবাদ স্বরূপ— 'তোমাদের শরীর খারাপ হতে পারে, আমার পারে না। ... ঠিক আছে ছেড়ে দেব কাজ।

ফুটপাতে গিয়ে মরব। পনেরো বছর ধরে রক্ত চুষে হাড় কালি করেছ ! আমারও আর ইচ্ছা করে না।'[৩০] বললে মানবিকতা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে রাগন্বিত মৃগাঙ্ক পিতৃসম ভৃত্যের পিঠে পদাঘাত পূর্বক গৃহ থেকে বিতারিত করে। লেখকের জবানিতে তা বিশ্লেষিত—

> *সাধুচরণের কথা শুনে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। ... হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা লাথি মাড়ল সাধুচরণের পিঠে। তারপরে সপ্তমে গলা তুলে বলল, 'শালা নিমকহারাম ! নিকলো- আজি নিকলো—' ... লাথির চোটেই উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল লোকটা। আর উঠছে না দেখে পাশে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল অনিতা। চোদ্দ বছরের রুনি বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বাবা, মা ও সাধুচরণকে জুড়ে গোটা দৃশ্যটায় চোখ রেখে আতঙ্কের গলায় বলল, 'মরে গেল নাকি।'*[৩১]

রক্তাক্ত সাধুচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রবল ঘৃণায় বলে যায়— 'না বাবু ! এখানে মরবো না।'[৩২] মৃগাঙ্ক কলেজের অধ্যাপক; সেহেতু অসুস্থ বয়স্ক মানুষের প্রতি বিনীত ব্যবহার পাঠক তার কাছে আশা করে। কিন্তু পাঠকের আশা সে পূর্ণ করতে পারেনি। অসুস্থ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখায়নি ; বরং ভৃত্যের কণ্ঠে প্রতিবাদ বেমানান বলে পদাঘাত করেছে। গল্পকার এখানে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের ভদ্র, শিক্ষিত মুখোশের অন্তঃস্থলে কুৎসীৎ ও হৃদয়বিদারক ক্ষয়িত মনের অবস্থানকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন শশাঙ্ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যে দৃশ্য পাঠ কিংবা অবলোকন করে পাঠকও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তবে, মধ্যবিত্ত মনের এরূপ হৃদয়হীন অজস্র দৃশ্যই ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমান নাগরিক পরিবেশের 'অলিতে-গলিতে'।

নীতিসর্বস্বতা, মূল্যবোধ— এই শব্দগুলি মধ্যবিত্তের ম্যানিফেস্টোর মতো। তবে তার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এই শ্রেণির স্খলন-পতনের ছবি।[৩৩] যেমন- দিব্যেন্দু পালিতের 'নিয়ম' গল্পটি (দেশ, ১৩৬২)। গল্পটিতে হিন্দু-মুসলমান— দুটি সম্প্রদায়ের সমানুপাতিক জীবন চিত্রের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের আমূল বিনষ্টী প্রকাশিত। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে বিরাজ করেছে— পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উদ্দালক বসু। কাহিনির সূচনাতেই ছোটদারগা মন্মথ তালুকদারের নেতৃত্বে ত্রিশজন সৈনিক সহযোগে রসুলগঞ্জের জঙ্গল থেকে বিখ্যাত এক ডাকাত দল গ্রেফতারের প্রসঙ্গ চোখে পড়ে— 'রসুলগঞ্জের জঙ্গলে অনেক সংঘর্ষের পর অনেক দিনের পুরনো ও দুর্ধর্ষ ডাকাত দলকে ঘন্টা কয়েক আগেই শাসনে এনেছে সে।...

ছোটদারোগা মন্মথ তালুকদার যে একটা অসীম সাহসিক কাজ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই।’[৩৪]

প্রতিপক্ষ ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে চারশো সাতাশ সংখ্যক আর্মড (সৈনিক) নিহত এবং তেইশ সংখ্যক আর্মড আহত। মর্মন্তুদ এই ঘটনা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উদ্দালক বসুর মনে কোন রেখাপাত করেনি। বরং সে নিজের নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়ে মৃত সৈনিক ইসমাইলের পরিবারে মৃত্যু সংবাদ প্রেরণের পরিবর্তে মৃত্যুর ঘটনাটিকে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এবং মন্মথর উদ্দেশে বলে— ‘বেশ এবার তুমি যাও। আর একটা কথা, চারশো-সাতাশের ডেথ নিউজটা যেন বেশি ছড়িয়ে না যায়।’[৩৫] শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর এই শোকাবহে অর্থাৎ সৈনিকদের শোকদিবসে স্ত্রীর অবর্তমানে লেডিস কলেজের অধ্যাপক মিস স্বপ্না রায়ের সঙ্গে কামচরিতার্থতার তাগিদে পার্টির আয়োজন করে— ‘...উদ্দালক বসুর কোয়ার্টারের সম্মুখে সবুজ ঘাসের লনে ঝালর দেওয়া সামিয়ানার নীচে রঙিন আলোয় আলোকিত আসর ঝলমল করে। সারিসারি চেয়ারের মাঝখানে ঝকঝকে টেবিলে কাচের ফুলদানিতে ফুলের স্তবকে স্নিগ্ধ সুরভি ভেসে বেড়ায়। আমন্ত্রিতদের সেবায় তৎপর হয়ে আসরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটোছুটি করে বয় আর বাবুর্চি।’[৩৬] সৈনিকদের শোকের মুহূর্তে পার্টির অজুহাতে চারিদিক রোশনাই করার মধ্যে উদ্দালকের মূল্যবোধের ক্ষয়িত রূপটি প্রকাশিত। বড়দারোগা অনুপম হৃদয়বত্তা হেতু ‘ট্রাজিক ডেথের’ দিনে এরূপ পার্টির আয়োজনে বাধা দেওয়ার উদ্দালক তাকে অপমান করে এবং মৃতদেহ সৎকারের দাবীতে অপেক্ষমান সৈনিকদের শাস্তির কথা বলে— ‘—শাটাপ। উত্তেজনায় উদ্দালকের গলা কাঁপে— এত স্পর্ধা ওদের হল কবে থেকে? ওদের বলোগে, বেশি চেঁচামেচি করলে সব কটাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হবে। আর কাল সকালে ওদের সকলের আড়াই ঘণ্টা একস্ট্রা মার্চ-পানিশমেন্ট...।’[৩৭] এই সংলাপ মধ্যবিত্ত উদ্দালকের হৃদয়হীনতার পরিচয় বহন করে।

প্রতিটি ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিষেধ থাকে। মুসলিম ধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য নিয়মের মধ্যে অন্যতম— মৃত্যুর পরে মৃত-দেহকে কবর দেওয়ার রীতি। মৃতদেহ দাহ তাদের বিধি নিষিদ্ধ একটি কাজ; তাদের কথায়— ‘হারাম’। এই গল্পে দেখা যায় সহকর্মী ইসমাইলের মৃতদেহ সৎকারের দাবীতে সৈনিকদের প্রতিবাদ উত্তরোত্তর দৃঢ় হলে তা নিবারণের তাগিদে হিন্দুধর্মাবলম্বী পুলিশ অফিসার উদ্দালক বসু মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়— ‘এক মুহূর্ত কী

ভেবে নেয় উদ্দালক এবং তার পরেই বলে— ঠিক হ্যায়, জ্বালা দেও।’[৩৮] মুসলিম ধর্মাবলম্বী সৈনিকের দেহ যথাবিহিত মাধ্যমে সৎকার না করে, জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশের মধ্যে উদ্দালকের নীতিহীন মনের পরিচয় মেলে। এছাড়াও, স্ত্রীর অবর্তমানে সুন্দরী মিস স্বপ্না রায়ের সঙ্গে যৌনক্রিয়া এবং মিস রায়ের সহায়তায় কলেজের সুশ্রী ছাত্রী কন্যাসমা মালবিকা বোসকে ভোগ করার বাসনা তার মূল্যবোধহীনতারই চিহ্নায়ন। ভোগলিপ্সা এবং ক্ষমতার প্রতাপ মুখোশধারী আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তকে কীভাবে ‘জানোয়ার’ করে তোলে উদ্দালক বসু তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গল্পটিতে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত শ্বশুর আবদুল ও পুত্রবধূ নৈয়ারার (ইসমাইলের স্ত্রী) অসহায় জীবনের চালচিত্রের পাশাপাশি পুলিশকর্মী উদ্দালক বসুর কামনা মদির মন ও নির্লজ্জ মুখকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ গল্পটির অন্তঃস্থলে মধ্যবিত্ত উদ্দালকের প্রতি তীব্র ঘৃণার সমান্তরালে বহমান আবদুল, নৈয়ারার অনুভবী অন্তর্বেদনা।

ষাট ও সত্তরের দশক রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অস্থির সময়। এই সময়পর্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলার বিশেষ করে নগর কলকাতার বুকে ভয়ের সঞ্চার করেছিল, সেটি নকশাল আন্দোলন। সত্তরের দশকের প্রথম দুবছরের মধ্যে শাসক শ্রেণির সর্বশক্তি প্রয়োগের কারণে এই আন্দোলন অবসানমুখী হলেও, বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব লক্ষ করা যেতে থাকে। দিব্যেন্দু পালিতের ‘মানুষের মুখ’ (দেশ, ১৩৭৭) গল্পটিতে নকশাল অধ্যুষিত, সন্ত্রাস-সংকুল ক্ষয়িষ্ণু উত্তাল কলকাতার হিমাবহ এবং ভদ্র-শিক্ষিত আত্মসুধান্বেষী মধ্যবিত্তের হৃদয়হীনতার কুৎসিৎ রূপটি অনুপুঙ্খভাবে বর্ণিত। গল্পটির সূচনা একটি ভয়ার্ত, উদ্বেগজনক খবর দিয়ে— ‘বাড়ি পৌঁছে বিভূতি শুনল অজয় তখনও ফেরেনি।’[৩৯] এর পরেই পাঠক অবগত হয়েছে সেই ভয়ঙ্কর কালের ইতিকথা সম্পর্কে— ‘আজকাল এমনিতেই রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হয়ে থাকে ; আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় আজ আরো বেশি ফাঁকা লাগছিল। শোনা যাচ্ছে পাইপ গানের গুলিতে আজও একজন মারা গেছে।’[৪০] সন্ধের সময় কেউ এসে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর গভীর রাত্রি হওয়া সত্ত্বেও বিভূতি ভ্রাতা অজয় বাড়ি ফেরেনি। বাড়ির পরিবেশ থমথমে। উৎকণ্ঠিত এই সময়ে আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যবিত্ত বিভূতি ঘরের বাইরে যেতে ভয় পায় ; বৃদ্ধ পিতাকে বলতে চায়— ‘নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠাও কেন ! এখনও কিছুদিন আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল।’[৪১] কিন্তু রাত্রি ক্রমশ অধিক হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভূতিকে অজয়ের খোঁজে বেড়তে হয় বৃদ্ধ পিতার উদ্বেগ কমাতে। নির্জন পথের হিম-আবহে গলির ভিতর থেকে

আততায়ীদের ছুটে আসতে দেখে খুন হওয়ার আশঙ্কায় বিভূতি এত ভয় পায় যে, অজয়কে খোঁজার ঝুঁকি আর নিতে চায় না। সে ভাবে— 'অজুর চেয়ে আমার জীবনের দাম অনেক বেশি।'[৪২] কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও পিতার স্তব্ধ, বিপন্ন মুখের ছবি মনে পড়ায় বাড়ি যেতে পারেনা। হঠাৎ অন্ধকারে একটা চাপা 'গোঁঙানি' শুনতে পেয়ে দেখে— একটা মানুষের মুখ। যার পেট কেটে 'হাঁ করা' অথচ বেঁচে আছে। লেখকের বর্ণনায় এরূপ—

> *যুবকটি পেট থেকে হাত তুলল। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত জ্যান্ত তার চোখ। মুখ বিকৃত করে একবার ঘাড় তোলার চেষ্টা করল, পারল না। শুকনো জিভে ঠোঁট চাটতে চাটতে কোন রকমে বলল, 'বাঁচান !' তারপর, 'জল— আঃ, একটু হল—' ... বিস্ফারিত চোখে ও শুধু দেখল হাঁ করা পেটের ভিতর থেকে যুবকটির দলা পাকানো নাড়িভুঁড়ি ঢলে পড়েছে মাটির দিকে।*[৪৩]

প্রায় নিহত এই ব্যক্তিটি অজয় না হওয়ায় বিভূতি প্রাণের ভয়ে তার জীবন-পিপাসার আর্তি শুনেও দাঁড়ায়নি, অন্ধকারের মধ্যেই ছুটতে থাকে। কারণ— যারা মানুষটিকে খুন করেছে তারা ফিরে আসতে পারে কিংবা কাঁচা রক্ত ও তন্ত্রের ঝাঁঝালো গন্ধ শরীরে ছড়ালে পুলিশ-কুকুরের প্রবল ঘ্রাণশক্তি তাকে সনাক্ত করবে হত্যাকারী রূপে। ভদ্র-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনের সংগোপনে আত্মকেন্দ্রিক হৃদয়হীনতার যে বিভৎস ক্ষয়িষ্ণু রূপটি নিহিত থাকে সেটিই উদ্ঘাটন করেছেন লেখক।[৪৪] নাগরিক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থমগ্ন এবং পলায়নী মানসিকতার নির্মম প্রকাশ বিভূতির চরিত্রে। সেকারণে, বিভূতির বিকৃত আচরণ এবং নৈতিক বিনষ্টির রূপটি পাঠক-মনে ভয়ঙ্করতম অভিঘাতের সৃষ্টি করে।

নাগরিক মধ্যবিত্তের নৈতিক বিকৃতির প্রচ্ছায়া 'কলকাতা ১৯৬৭' গল্পটিতেও বর্তমান। ছয়ের দশকের শেষার্ধে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সরকারের অরাজকতার কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সময়ে, অসময়ে সেকারণে দেখা দেয় একাধিক আন্দোলন কিংবা হরতাল। এই শহরের 'সুবিধাভোগী ফাঁপা চেহারাটা' দিব্যেন্দুর লেখকসত্তা অবলোকন করেছেন বলেই আমরা পেয়ে যায় 'কলকাতা ১৯৬৭' –এর মতো সত্য নির্ভর গল্প। 'বারো ভূতের সংসার'— যুক্তফ্রন্টের ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও অরাজকতায় মানুষ বিত্রস্ত। এর সঙ্গে সরকার কর্তৃক নকশাল আন্দোলন দমনের চেষ্টা মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থাকে আরো

বাড়িয়ে দেয়। সংক্ষুব্ধ এই পরিস্থিতিতে আগরওয়ালাদের কাছ থেকে অপ্রতুল অর্থের স্বাদ পেয়ে 'সেটেলমেন্ট ডেফার' করেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতা অমিয়। শিবুর মুখে তার পরিচয় পাওয়া যায়— 'আপনার নামেও কেচ্ছা করছে আজকাল। আপনাদের মিটিংটা যে ফেল করল, ও বলছিল আগরওয়ালাদের টাকা খেয়ে আপনি নাকি সেটেলমেন্ট ডেফার করেছেন। কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি ফেল করবে, তারপর কংগ্রেস আসবে। আগরওয়ালারা তখন উল্টো চাপ দেবে।'[৪৫] নিজের স্বার্থ, সুখ-সুবিধা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি নিয়েই ব্যাপৃত থাকার তাগিদে অমিয় নিজের রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে বিসর্জন দিতে দ্বিধান্বিত হয়নি। এরূপ কর্ম তার নীতিহীনতার অন্যতম সাক্ষ্য। শুধু তাই নয়, সক্রীয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও প্রাণের ভয়ে হরতালের দিনে মিছিলে যোগ না দিয়ে অধ্যাপক বন্ধু হিমাংশুকে মদের টোপ এবং ব্রিজ (তাস) খেলার টাকা দিয়ে বন্ধুপত্নী সুধার শরীর ভোগের বাতাবরণ নির্মাণ করে। এবং হিমাংশুর ফ্ল্যাটে প্রবেশ পূর্বক উত্তেজনার প্রচণ্ডতায় আত্মঘাতির মতো সুধার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

> *সুধা তৈরি হয়েই ছিল। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে মুখের ওপর অমিয়র নিঃশ্বাসের তাপ লাগতেই চাপা বলায় বলল, 'কী করছ ! ও এক্ষুণি এসে পড়বে। ...'আসবে না।' সুধার তরল মুখের ওপর লালাসিক্ত ঠোঁট চেপে ধরে, ধরা গলায় বলল অমিয়, 'ও শালা শুধু মাল চেনে। তোমাকে চিনলে এখন বেরুত না।' ... সুধা গলতে শুরু করেছিল। নিজের সর্বাঙ্গে ওর ভীষণ জ্যান্ত শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিতে নিতে ক্লান্ত ও দুঃখিত অমিয় অনুভব করল, সে ফুরিয়ে যাচ্ছে।*[৪৬]

বিভ্রান্ত সময়ের করাল গ্রাস থেকে নিজের বিলাসিতাকে বজায় রাখার চেষ্টায় কিংবা ভোগলিপ্সার আততির জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি 'বিবেকের দলাকে' খুব সহজেই উপড়ে ফেলে সমাজ ও নীতি গর্হিত কর্মলীলায় কীভাবে মেতে ওঠে দিব্যেন্দুর অমিয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট। তবে, নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানবিকতার এরূপ অবক্ষয় অস্থির সেই সময়েরই অনিবার্জ পরিণাম।

'সোনার ঘড়ি' (শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯৪) গল্পটিতে গল্পকার তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত দেবদত্তের কৃত্রিম সৌজন্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন পশুত্বকে অনাবৃত করেছেন। মনোমালিন্যের কারণে স্বামী শ্যামলের কাছ থেকে চলে এসে পুত্র পুনপুনকে অবলম্বন করে সোমা আশ্রয় নেয় মাসতুতো দিদি— রিনা এবং

জামাইবাবু— দেবদত্তের সংসারে। দেবদত্ত কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু অধ্যাপক দেবদত্ত নিজের 'শরীরী-বাসনা' তথা ভোগলিপ্সা চরিতার্থতার জন্যে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী শ্যালিকার উন্মুক্ত শরীরের ওপর নিক্ষেপ করে বুভুক্ষু রোমশ থাবা—

> *তৈরি করে রাখা ডান হাতটা এবার সোমার পিঠের অনাবৃত অংশে তুলে দিল দেবদত্ত। সোমা সরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেবার আগেই হাতটাকে আরও দীর্ঘ ও সবল করে ওর শরীরটাকে নিজের শরীরে টেনে এনে ক্ষিপ্তের মতো ওর মুখের ওপর নিজের তপ্ত মুখটাকে চেপে ধরল।*[৪৭]

দেবদত্ত ভেবেছে নিরুপায় হয়ে তার কাছে আশ্রিতা হওয়ায় শরীর দাবী করলেও সোমা তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করবে না। কারণ, দেবদত্তের অনুগ্রহই বর্তমানে তার একমাত্র প্রার্থনীয়। কিন্তু সোমা তার 'আত্মমর্যাদা' লোভী অধ্যাপকের কাছে বিলিয়ে দেয়নি। বরং লোভতুর বাহুবন্ধন থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং বলে উঠেছে— 'ছি! ছি! আপনি এরকম।'[৪৮] আশ্রিতার নিকট এরূপ প্রত্যাখ্যান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহ্য হয়নি। অনুভব করে তীব্র অপমান। সেই অপমানের জ্বালা মোচন ও নিজেকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করার জন্যে শিক্ষিত দেবদত্ত নিজের সোনার ঘড়ি চুরির মিথ্যা দায় চাপিয়েছে শ্যালিকা পুত্র ছোট্ট পুনপুনের ওপরে। অসহায় মায়ের মতো সন্তানের প্রতি এরূপ মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেনি সোমা, বরং পুত্রকে প্রহারের মধ্যদিয়ে দেবদত্তের অন্তঃস্থলের আবিলতার সম্মুখে আয়না তুলে ধরেছে— 'আপনি কী বলছেন আমি জানি। কেন বলছেন তাও জানি ! ...আপনার সোনার ঘড়ির চেয়েও বেশি দাম আমি দেব আপনাকে, দেবুদা ! দোহাই আপনার— আঁকড়ে থাকার জন্য আমার শুধু ছেলেটাই আছে— ওকে চোর বলবেন না—।'[৪৯] ভদ্র-শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত দেবদত্ত স্ত্রী শারীরিকভাবে নিরুত্তাপ হওয়ায় নিজের যৌন-ক্ষুধাকে চরিতার্থ করার জন্য অন্তরের নূন্যতম মূল্যবোধকেও বিসর্জন দিয়েছে এবং মেতে উঠেছে বিরংসার মহারণে। আসলে সর্বজ্ঞ কথকের কথন-বিশ্বকে অবলম্বন করে গল্পকার গল্পটিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের সমস্ত মুখোশকে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে এক একটি করে উন্মোচন করেছেন। এই গল্পের মতো নির্মম রসিকতাকে অবলম্বন করে পরিচালিকার জবানিতে রচিত 'ওষুধ' (সানন্দা, ১৩৯৭) গল্পটিতেও স্ত্রীর অবর্তমানে যুবতী ঝির সঙ্গে শরীরী খেলায় মত্ত কলেজ অধ্যাপকের মানবিকতার বিপর্যয় চিত্রিত হয়েছে গল্পকারের প্রতিভাবলে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে আগাগোড়া একধরনের সংযোগ বজায় রেখেছেন

বলেই গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রতারণা ও কৃত্রিমকতাকে নির্ভুলভাবে বিদ্ধ করতে পারেন, এমনকী বিদ্রুপ করতে পারেন তাদের নষ্টিকৃত মনোজগত ও প্রতিবাদহীন জীবনযাত্রাকে।

নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মূল্যবোধহীনতার আরেক গল্প 'পতনজনিত' (শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯০)। তবে কোন একক ব্যক্তি-মানুষের নয়, সামাজিক মূল্যবোধের অসামঞ্জস্যের ছবি এখানে স্পষ্ট। নতুন গড়ে ওঠা একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং সেখানে রয়েছে আশিটির বেশি পৃথক পৃথক ফ্ল্যাট। এই হাউসিং কমপ্লেক্সের পিছন দিকে প্রত্যুষে পাওয়া যায় এক যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ। লেখকের ভাষ্যে সেই মৃতদেহে বিস্তৃত বর্ণনা এরূপ—

> *এটা বাড়ির উত্তর দিক। ... নয়নতারা গাছের দিকে মাথা এবং জলের পাম্পের দিকে পা, দেখল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে সত্যিই পড়ে আছে একটি লাশ। তবে মেয়ে মানুষ বলতে বা বোঝায় এটি তা নয়। একটি পরিপূর্ণ যুবতী বাইশ থেকে বত্রিশ যে-কোনও বয়স হতে পারে। একটি হাত কোমরের নীচে চাপা পড়া, অন্য হাতটি দূর দিয়ে ছড়ানো; কব্জির পাশে কয়েকটি চুড়ির টুকরো। মাথাটা অল্প হেলে আছে বাঁদিকে। ... খয়েরি ব্লাউজের ওপর দিকের বোতাম ছিড়ে প্রায় অনাবৃত করে দিয়েছে বাম স্তনটিকে। একটি পা সামনের দিকে টান-টান করে ছড়ানো, অন্যটি হাঁটুর কাছে মুড়ে ত্রিভূজাকৃতি। সবচেয়ে যা বিসদৃশ নীল ও খয়েরিতে মেশানো ডুরে শাড়িটা সায়া-সমেত উঠে গেছে কোমর পর্যন্ত— সেই কারণেই প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে নাভির নীচ থেকে সম্পূর্ণ নিম্নাঙ্গ।*[৫০]

এর পর ফ্ল্যাট বাড়ি গুলির অধিবাসীদের মধ্যে শুরু হয় মৃতা মেয়েটির পরিচয় অন্বেষণের ব্যগ্রতা। যৌনতা উপভোগে মধ্যবিত্ত মন সর্বদা ক্লান্তিহীন। সেকারণে, মৃতা স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়েটির নগ্নতাকে নাগরিক মধ্যবিত্ত মন পরতে পরতে উপভোগ করেছে। চুয়ান্ন বছর বয়সী বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর যামিনী হালদার যেমন এই মৃত দেহকে প্রত্যক্ষ করে নিজের রোমকূপকে সজাগ করেছে এবং অনুভব করেছে প্রবল উৎকণ্ঠা— 'নিজের অভিজ্ঞতায় কোনও যুবতী নারীর এই দেহ যামিনী প্রত্যক্ষ করেছে অন্তত কুড়ি বছর আগে, নিজেরই স্ত্রী মধ্যে। সুতরাং রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল তার। আর ভাল করে দেখার আগে রুমাল বের করে অভ্যাস বশত চাপা দিল নাকে।[৫১]

যামিনীর মতো প্রলয় তরফদার মৃতার পায়েরদিকে গিয়ে ‘নিবিষ্টভাবে’ মৃতদেহকে ফালাফালা করে গিলতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, উল্লেখিত দুজনের সঙ্গে সঙ্গে হাউসিং কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি যামিনী হালদার পুত্র দিবাকর, অশোক কুণ্ডু, এম.এল.এ. সুধাংশু রায়, রিপোর্টার নির্মল গুপ্তের মতো অসংখ্য মধ্যবিত্ত চোখ লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে মৃতার প্রতিটি অঙ্গকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিজেদের ‘দর্শকাম’ চরিতার্থ করেছে। রুচিরা-অশোকের ফ্ল্যাটের ঝি শৈলর জবানিতে নীতির কথা বলা মধ্যবিত্ত সমাজের যৌনতা অন্বেষণের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের নষ্টিকৃত রূপটি নিপুণ ভাবে রূপায়িত— “ ‘ঝাঁটা হাতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল শৈল। নিজেও ঝুঁকল সামান্য। কিছু দেখতে না পেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই ঝাঁট দিতে শুরু করে বলল, ‘বাবুরা সব চোখ বড় করে গিলছে—’ ”[৫২]

ভরা রোদ্দুরে অতগুলি পুরুষের চোখের সামনে নগ্নভাবে পড়ে থাকতে দেখে নীতিবোধপরায়ণ ঝি চম্পাবতী মেয়েটির নগ্নতাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেও মধ্যবিত্ত মন আইনের ছুতোয় মৃত নারীর নগ্নতার অপমানকে আচ্ছাদন করতে চায়না কারণ— দেহের উন্মুক্ততার মধ্যেই তারা লাভ করে অমোঘ আনন্দ। পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নগ্ন আসলে কে নিহত নারীটি না মধ্যবিত্ত মানুষগুলির মগ্ন চৈতন্য ? এরূপ পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে ঝি বিমলা গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে চায় মৃত্যুর পরেও আপমানিত নারীদেহটিকে। কিন্তু পুলিশ অফিসার ‘ফটো তোলা না হলে ঢাকা দেবার নিয়ম নেই’[৫৩] বললে সে গর্জে ওঠে— “ ‘ও হরি, এর বেলায় নিয়ম নেই !’ কেউ কিছু বুঝবার আগেই মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল বিমলা, ‘আর তিন ঘন্টা ধরে ভদ্দরলোকেরা যে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখছে, সেটা কার নিয়ম হে বাছা।’ ”[৫৪] এ কথার পর লোকাতুর মধ্যবিত্তের ভিড় কমে যায়। এ ভিড় বিবেকবান, নীতিপরায়ন মানুষের নয়, সমাজের নোংরা মানসিকতার উপর থুবরে পড়া অজস্র বিবেকহীন, নীতিবোধহীন মধ্যবিত্ত সমাজের। এইভাবেই গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত তার গল্পের আধারে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির শত শত লোভাতুর, মূল্যবোধহীন ও স্বার্থান্বেষী মুখের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিজস্ব কথন-শৈলীতে। যা তাঁর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

উল্লেখপঞ্জি :

১. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১৮।

২. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ (প্রকাশ ভবন) : আগস্ট ২০১৬, পৃ. ২১৬।

৩. জনৈক গবেষক Peter Custers তাঁর Women in the Tebhaga Uprising গ্রন্থে এই দুর্ভিক্ষকে 'Man Made' বলে অভিহিত করেছেন— দ্র. মৃণালকান্তি মণ্ডল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় ও রূপের মূল্যায়ন, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৬।

৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গল্প উপন্যাসে বাঙালিনী নিজেকেই দেখতে চান, অভীক সরকার (সম্পাদিত), দেশ, বাঙালিনীর রুচিবদল, ৬৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা : ১৮ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪০।

৫. অতনু শাশমল, বাংলা উপন্যাস ও গল্পে নগর-জীবন (১৮২৫-১৯১৩), লালমাটি, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : বইমেলা ২০১৬, পৃ. নিবেদন অংশ।

৬. সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত লেখক নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসে নারীর অবস্থান, অধিকার প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে নীতিবোধ সম্পর্কে এরূপ অভিমত পোষণ করেছে। — দ্র. শ্রাবন্তী বসু, দিব্যেন্দু-নবনীতা আলাপচারিতা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পাদিত), প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ : ২০০৩, পৃ. ১৯৭।

৭. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট, পুস্তক বিপণী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪, পৃ. ১১।

৮. Milton Rokeach, the Nature of Human Value, Free Press, New York, First Edition : 1 August 1973, p. 5.

৯. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট, পৃ. ১৪।

১০. তদেব, পৃ. ১৫।

১১. স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, তৃতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৫, পৃ. আত্মপক্ষ অংশ।

১২. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট, পৃ. ২০২।

১৩. মৃণালকান্তি মণ্ডল, পূর্বোক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় ও রূপের মূল্যায়ন, পৃ. ২৩।

১৪. দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০, পৃ. ২২১।

১৫. তদেব, পৃ. ১১৯-১২০।

১৬. তদেব, পৃ. ১২২।

১৭. তদেব, পৃ. ১২১।

১৮. তদেব, পৃ. ১২৩।

১৯. তদেব, পৃ. ১২৪।

২০. তদেব।

২১. তদেব, পৃ. ১২৪-১২৫।

২২. তদেব, পৃ. ১২১।

২৩. উজ্জ্বকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), পঞ্চাশের দশকের কথাকার, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৩১৮।

২৪. দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৩০-১৩১।

২৫. তদেব, পৃ. ১৩১।

২৬. তদেব, পৃ. ১৩৬।

২৭. তদেব, পৃ. ১৩৭।

২৮. তদেব।

২৯. তদেব, পৃ. ১০৫।

৩০. তদেব।

৩১. তদেব।

৩২. তদেব, পৃ. ১০৬।

৩৩. সুরজিৎ বেহারা, ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৯, পৃ. ৫৬।

৩৪. দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৫, পৃ. ২১।

৩৫. তদেব।

৩৬. তদেব, পৃ. ২৩।

৩৭. তদেব, পৃ. ২৩-২৪।

৩৮. তদেব, পৃ. ২৬।

৩৯. তদেব, পৃ. ২৬০।

৪০. তদেব।

৪১. তদেব, পৃ. ২৬১।

৪২. তদেব, পৃ. ২৬৫।

৪৩. তদেব।

৪৪. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট, পৃ. ২২১।

৪৫. দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৩০২।

৪৬. তদেব, পৃ. ১৬০।

৪৭. দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-২, পৃ. ৩০২।

৪৮. তদেব।

৪৯. তদেব, পৃ. ৩০৩।

৫০. তদেব, পৃ. ১৩৯-১৪০।

৫১. তদেব।

৫২. তদেব, পৃ. ১৪২।

৫৩. তদেব।

৫৪. তদেব, পৃ. ১৪৭।

দেশভাগ: দ্বি-জাতি সম্পর্ক-একটি পর্যালোচনা

পায়েল নন্দী
সহকারী অধ্যাপিকা, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কোলকাতা

সারসংক্ষেপ: *সম্পর্ক শব্দবন্ধটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা পূর্ণ। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুসারে হিন্দু ও মুসলমান এই দ্বি জাতির সম্পর্কটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। বিশেষত স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে এই দ্বি জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা বিশেষ পর্যালোচনার দাবিদার। দেশভাগের পূর্বের ও পরের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এই দ্বি জাতির সম্পর্কের উপর ও প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্বের সম্প্রীতি আবার পরবর্তী কালে বিদ্বেষ,এই পরিবর্তনের প্রক্ষিতে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের বিশ্লেষণে যুক্ত হয় বহুমাত্রিকতা। এই বহুমাত্রিকতার নিরিখে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সম্পর্কের বিশেষ কিছু আঙ্গিকের উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।*

সূত্র শব্দ: *স্বাধীনতা- দেশভাগ-দ্বি-জাতি- সম্পর্ক-পূর্ববঙ্গ- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি- আতঙ্ক- অবিশ্বাস- সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ- উত্তরদায়।*

সম্পর্ক শব্দটির পরিসর বৃহৎ। এই বৃহৎ পরিসরের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক হল জাতিগত সম্পর্ক। ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে যে সম্পর্কের আলোচনা সেকাল একাল তথা সর্বকালের এক বিশেষ পর্যালোচনার পরিসর তৈরী করে।

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বহু প্রত্যাশিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে গেছে আপাত অপ্রত্যাশিত আরেকটি বিষয়, দেশভাগ। সাধারণ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের চিরায়ত ঐতিহাসিক চর্চায় ১৯৪০ এর মুসলিম লীগ এবং এর অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নার প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান' দাবির উপর দেশভাগের অন্যতম দায় চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে স্বীকার করে নিলেও ওয়াভেল আমলের একেবারে শেষের দিকে পাটেল ও নেহেরু সহ অনেক নেতার কাছেই যে, তৎকালীন রাজনৈতিক জটিল সমীকরণের একটিই অনিবার্য সমাধান হয়ে উঠেছিল দেশভাগ তা অস্বীকারের ও উপায় থাকে না। কিন্তু এই দেশভাগের প্রেক্ষিতে অর্জিত স্বাধীনতার পরিণাম বিষয়ে অনেকের মনেই সংশয় তৈরী হয়েছিল বিশেষত দেশভাগের পশ্চাতে যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল

তার ভয়াবহ আশঙ্কার নিরিখে। গান্ধীজী দেশভাগের প্রস্তাব কে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপদ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের স্বিদ্ধান্ত এবং র‍্যাডক্লিফের অবিবেচনা প্রসূত সীমানা নির্ধারনের ফল ছিল বিষময় এবং সুদূরপ্রসারী। এর মধ্যে নিহিত ছিল জাতিগত সমস্যা,সাম্প্রদায়িক অশান্তি,এবং উভয় বাংলার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ তথা উদ্বাস্তু সমস্যার বীজ।

উভয় বাংলার সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসকে দুটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। অবিভক্ত বাংলা তথা দেশভাগের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাস যা বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে এসেছে এযাবৎ এবং অপরদিকে দেশভাগের সীমারেখায় বিভক্ত বাংলায় জ্বলে ওঠা দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, অবিশ্বাসের বিষবাষ্পের উদগিরণ।

দেশভাগ পূর্ব পূর্ববাংলার দৈনন্দিন জীবনেরস্মৃতির পাতায় ডুব দিলে বেশিরভাগ বর্ণনাতেই পরিপাটি সাজানো গ্রামীন জীবন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো প্রক্ষাপটগুলিই পরিস্ফূট হয়। হয়তো দেশান্তরের পরবর্তী সময়ের জীবনযাত্রায় এই বিষয়গুলির অনুপস্থিতিই এর কারণ। দেশান্তরিত মানুষের স্মৃতিচারণায় প্রায়শই অবিভক্ত পূর্ব বাংলার দুরর্গাপূজা ও তাকে কেন্দ্র করে মহোৎসব এবং এক অসামান্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র ফুটে ওঠে। জনৈকা উদ্বাস্তু মহিলার স্মৃতিচারণায় জানা যায় , ‘বছরকার দিন। মনের মধ্যে কেমন যেন ঠেকত। সকলের ভালো হোক, মঙ্গল হোক। জিলিপি, রসগোল্লা, খুরমা(আঙুল গজা) দিয়ে মিষ্টিমুখ সবার। সন্ধের পর প্রতিবছর হামিদ মিয়া, তৈয়ের আলিরা আসত, থালা ভরা নাড়ু চাই তাদের।[২] স্মৃতিচারণায় হিন্দু ও মুসলমানদের একসঙ্গে হোলি খেলার কথাও অজানা নয়।[৩] অর্থাৎ স্মৃতিচারণায় উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির উল্লেখ লক্ষনীয়। স্মৃতিচারণায় ব্রিটিশ শাসন ও মুসলমানদের তুলনামূলক আলোচনার ও উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ববাংলার হিন্দুদের কাছে ব্রিটিশদের তুলনায় মুসলমানরা দেশভাগের পরেও ‘কম বিদেশি’ ছিল। জনৈক এক ব্যক্তির উক্তি তে ‘দুশো বছর ব্রিটিশদের সহ্য করেছি-মুসলমানরা কি তার চেয়েও বেশি বিদেশী নাকি?’[৪] প্রকৃত অর্থে পূর্ববঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য পূর্ণ যে সহাবস্থান ছিল তা দেশভাগের পরেও বেশ কিছু সময়

বিশ্বাসযোগ্য রয়ে গিয়েছিল। উভয়ের সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বিষয়টি বারংবার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত হয়েছে।

স্মৃতিচারণার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও দেশভাগ পূর্বে, পূর্ববাংলায় হিন্দু ও মুসমানদের সম্প্রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সাহিত্য যেহেতু সমাজ, সময়, কালেরই প্রতিবিম্ব তাই দেশভাগের পূর্বের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণে সাহিত্যের উল্লেখ অনস্বীকার্য।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের মুল চরিত্র 'সোনা' র সাথে বাড়ির মুসলমান চাকর ঈশমের এক নিবিড় বাৎসল্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু ঈশম নয়, ফতিমার সঙ্গে সোনা বাবুর সখ্যতা ,শুধু এক আন্তরিক সম্পর্ক প্রকাশ করে তাই নয়, উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ও নিদর্শন হয়ে থাকে। এমনকি সোনাদের দেশ ছেড়ে চলে আসার মুহূর্তে ঈশমের আক্ষেপে কোথাও সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসের লেশমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না। 'কি সুখে হে পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার দ্যাশ ফ্যালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়।'[৫] জ্যোতির্ময়ী দেবী র 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে সুতারা দত্ত র জীবন কাহিনী রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলমান দাঙ্গার ভয়াবহতার পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সহাবস্থানমূলক সম্পর্কের বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা যায় না। দাঙ্গার পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বা দাঙ্গার মধ্যেও সুতারার বাবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তামিজ কাকা ও তার পরিবার নিজেদের প্রাণ সংশয়ের কথা ভুলে গিয়ে যেভাবে সুতারাকে আশ্রয় দিয়েছিল.তার সম্মান ও প্রাণ বাঁচিয়েছিল তা দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

অতীতের স্মৃতিচারণা, সাহিত্যের উপস্থাপনা প্রভৃতের প্রেক্ষিতে প্রায়শই বিস্ময় প্রকাশ পায়। বিস্ময় এইখানেই যে, এতবছরের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের পর হঠাৎ কি হল, যার ফল এত বিষময়।

প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার জন্মলগ্নে দ্বি- জাতি তত্ত্বের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের ফলাফল হিসেবে এক অজানা আশঙ্কা, ভয়, আতঙ্ক, উভয়ের প্রতি পারস্পরিক অবিশ্বাসের কালো মেঘ ঘিরে ফেলেছিল বিভক্ত দুই বাংলার সামগ্রিক সত্ত্বাকে। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল হিন্দু ওমুসলমানের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক হিংসার উদ্ভব। একই উঠোনে সকলে মিলে দেশভাগ, স্বাধীনতার সংবাদ শোনা হলেও

দেশছাড়ার চিন্তা জন্মায় না। আশঙ্কা তৈরি হয়, কিন্তু আশঙ্করা যুক্তি খুঁজে পায়না। যদিও আশঙ্কা,ভয় উভয়ের মনের মধ্যেই জমা হচ্ছিল, তাই অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক খারাপ না হলেও বা প্রত্যক্ষ দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি না হলেও দেশভাগের হাওয়ায় বিশ্বাস ভাঙতে শুরু করেছিল। 'গ্রামের মুসলমানরা ও বলতে লাগল, আর ভরসা দিতে পারছি না।'[৬] এমনকি তুলসি মঞ্চের ইট খুলে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনারও সাক্ষী হল পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা।[৭]

মূলত দেশবিভাগের আগে থেকেই যখন সুস্পস্ট বোঝা গিয়েছিল যে পাকিস্তান হতে যাচ্ছে, তখন থেকেই মুসলমানরা অত্যন্ত সচেতনভাবে যেভাবে হিন্দুদের মানসিক নিপীড়ণ করতে শুরু করেছিল, তা প্রাথমিক পর্বে হিন্দুদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। হিন্দুদের মধ্যে এইসময় একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই আতঙ্কিত হিন্দুদের বেশিরভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায়। এই বিষয়টিকে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লষণ করেছেন। তিনি হিন্দুদের এই দেশত্যাগের কারনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেখা যায় হিন্দুরা বিশেষত অবস্থাপন্ন হিন্দুরা কিছুতেই 'পাকিস্তান' কে মেনে নিতে পারছিলেন না। বংশ-পরম্পরায় পূর্ববঙ্গে তাঁরা জমি ভোগ করেছেন, সামাজিক মর্যাদা পেয়েছেন। দেশভাগের পরে তাঁরাই অনুভব করছিলেন দেশটার অধিকার আর তাঁদের রইল না, দেশটা অন্যের হয়ে গেল। নিজভূমে তারা পরবাসী হয়ে গেলেন।অবস্থাপন্ন হিন্দুদের প্রবল আত্মভিমানের অহমিকা ছিল অনস্বীকার্য। মুসলমানরা মূলত ছিল হিন্দু জমিদারদের প্রজা। আর হিন্দু জমিদাররা এই মুসলমান প্রজাদের ম্লেচ্ছ বা যবন বলে ঘৃনা করত। কিন্তু দেশভাগের ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মুসলমান প্রজারা সমাজের উঁচু শ্রেণীতে উঠতে থাকে। দেশের কর্তায় পরিনত হতে থাকে। এই ঘটনা সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের অহমিকায় আঘাত দিয়েছিল। এর পাশাপাশি কিছু ঘটে যাওয়ার বা বলা যেতে পারে মুসলমানদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আক্রমনের সম্মুখীন হওয়ার আতঙ্ক , এবং হিন্দুদের মানসিক যন্ত্রনার অন্যতম আরেকটি বিষয় ছিল নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নটি। দেশভাগের সন্ধিক্ষণে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাববোধ কতটা প্রগাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছিল হিন্দুদের মধ্যে তার একটি উদাহরণ হল নোয়াখালির দাঙ্গার পর মেয়েরা স্কুলে যেত জামার ভিতর 'বাঘনখ' বলে একটা জিনিস নিয়ে। কিন্তু শুধু হিন্দুদের আতঙ্ক,ভয় ও নিরপত্তাহীনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলে ইতিহাস নিরপেক্ষ থাকে না। কারণ এর ঠিক বিপরীতে বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কোলকতায় হিন্দুদের

দ্বারা মুসলমান পল্লী আক্রমনের সত্যি মিথ্যে দুই জনশ্রুতি একত্রিত হয়ে দুই বাংলার আকাশকেই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।মুসলমান জনসমাজ ও সন্ত্রস্ত বোধ করছিল।তাদের আতঙ্কের মধ্যও মিশে ছিল দেশভাগের চরম মুহূর্তে নারীর নিরাপত্তার অভাববোধ এবং অন্যদিকে দেশভাগের পূর্বে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বঞ্চনা,শোষণ ও অপমান হয়েছিল তার প্রতিশোধের স্পৃহা। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতি সন্দেহভাজন দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত হয়েছিল। বিভাজনের ভিত্তিতে দ্বি জাতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ বা দেশভাগের ইতিহাস কোন ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমানদের মনস্তাত্তিক সংকটের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। যদিও এই বিষয়টির উল্লেখ খুব কম চোখে পড়ে। ঋত্বিক ঘটকের 'সড়ক' গল্পটি তে এই বিষয়টির উল্লেখ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।[৮]আবু রুশদের 'নোঙর', সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' র কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।[৯]মূলত বিভাগোত্তর হিংসা উভয় সম্প্রদায়কেই আঘাত করেছিল। এই আঘাতের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের অবনতিকেই সুনিশ্চিত করেছিল। এই উপমহামহাদেশের জীবনযাপনে বিভাজন পরবর্তী হিংসার অধ্যায় টি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আশিষ নন্দী বলেছেন,এই হিংসায়'সভ্যজীবনের ভিত্তিটাই গিয়েছিল চুরমার হয়ে।'[১০]

স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরবর্তী সময়কালে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আতঙ্ক, ভয়, হিংসা, হানাহানি সর্বোপরি দাঙ্গার বাতাবরন তৈরী হয়েছিল তা সামগ্রিক অর্থে দেশভাগ পূর্ববর্তী এই দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির সম্পর্ক কেই এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছিল। দেশভাগের আখ্যানে যে যন্ত্রনা, কান্না, জমাট বেঁধে আছে তার অন্যতম কারণ এই ইতিহাসে অন্তর্লীন হয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হানাহানির রক্তপাত। বিভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষবাষ্পের উদগিরণ না থাকলে হয়ত ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, দেশভাগের ইতিহাস অন্য কোন প্রেক্ষিতে রচিত হত। দেশভাগ হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষের যে বীজ বপন করেছিল তার উত্তরদায় উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। আর সেই কারণেই ভারতবর্ষের চিরন্তন সম্প্রীতির আদর্শ, দেশভাগের জটিল রাজনীতির আবর্তে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মত কলুষিত অধ্যায়ের চ্যালেন্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং স্বাধীনতা, দেশভাগ ওতার

পরবর্তী কালের ইতিহাসের চর্চায় হিন্দু ও মুসলমান, দ্বি-জাতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

সূত্র নির্দেশ:

১. লাডলীমোহন রায়েচৌধুরী, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ:৫৯

২. কিরণময়ী মন্ডল, গোপন স্বপ্ন, ভাগফল ৭১, মেয়েদের কথা, সংকলন ও সম্পাদনা, ঝর্ণা বসু, ৯কাল, কোলকাতা, ২০১৮, পৃ: ৩৩।

৩. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্ত্বা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১৪।

৪. ঐ, পৃ: ১৬

৫. আশিস হীরা, উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০১৯, পৃ: ২৭৭

৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্ত্বা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১৬।

৭. ঐ।

৮. ঐ, পৃ: ৫।

৯. ঐ, পৃ: ৫।

১০. ঐ, পৃ: ৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৭।

২. সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮।

৩. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।

৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।

৫. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১।

৬. জ্যোতির্ময়ী দেবী, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, কোলকাতা, ১৯৬৮।

৭. আশিস হীরা, উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০১৯।

৮. মধুময় পাল (সম্পাদিত), দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১।

৯. Gargi Chakraborty, Coming out of Partition: Refugee women in Bengal, New Delhi, Bluejay Books, 2005.

১০. Jasodhara Bagchi, Subharanjan Dasgupta, with Subhasri Ghosh (edited) ‘The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India, Kolkata, Stree, 2003.

দ্রবময়ীর সম্পর্ক

শর্মিষ্ঠা ঘোষ
দর্শন বিভাগ
ফকির চাঁদ কলেজ

ভূমিকা :

ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে মানুষ কতকাল গৃহস্থ জীবন যাপন করবে, সন্তান সুখ ভোগ করবে তার একটা সীমা নির্ধারিত ছিল। এই সীমার শেষ থেকেই বানপ্রস্থের আরম্ভ। সাধারণ মতে সময় সীমাটা পঞ্চাশ, শাস্ত্রে আছে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর দাম্পত্য এবং বাৎসল্য রস উপভোগ করে বেড়িয়ে পড়ার কথা। কথাটা বলা সহজ হলেও কাজে করা খুব কঠিন। কারণ ততদিনে পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিগণ পরিবারের জালে এমন ভাবে আষ্ঠেপিষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় যে সে সময় ঘর ছেড়ে বেড়োনো বড় কঠিন। বর্তমান দিনে বনে গিয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম পালন সম্ভব না হলেও কিছু বছর আগে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যেত বৃদ্ধ বয়সে ধর্মকর্মের জন্য কাশী বা বৃন্দাবনে গিয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করতে। বার্ধক্যে বানপ্রস্থ বা কাশীবাস এসবের মূল উদ্দেশ্যই হল বৃদ্ধ বয়সে ধর্মাচরণ। প্রাচীন শাস্ত্রে বৃদ্ধ বয়সে ধর্মাচরণের কথা বলা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ যখন যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয় -

"শক্লোতি জীণঃ খলু ধর্মমাপ্তং কামোপভোগেম্বগতির্জরায়াঃ
অতশ্চ যূনঃ কথয়ন্তি কামান্ মধ্যস্য বিত্তং স্থবিরস্য ধর্মম্"।। [১]

এর অর্থ জরাতুর ব্যক্তি কেবল ধর্মই প্রাপ্ত হতে পারে, কামোপভোগের শক্তি জরার থাকে না; সেইকারণে (জ্ঞানীরা) যৌবনে কাম, মধ্য বয়সে অর্থ, বার্দ্ধক্যে ধর্ম পালনের কথা বলেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের দিকে তাকালে একথা স্পষ্ট যে, বার্ধক্যের সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ ও ধর্মাচরণের এক সম্পর্ক আছে। তবে ঐ যে পঞ্চাশ বছর হোক বা পরে যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরিবারের সম্পর্কের জাল, মায়া, মমতা সব ত্যাগ করে গৃহ ত্যাগ করা সহজ বিষয় নয়। এইরূপ এক চিত্র দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দ্রবময়ীর কাশীবাস" গল্পে। ৬৬ বৎসর বয়সের এক গ্রাম্য, বিধবা বৃদ্ধা দ্রবময়ী। যিনি কাশী গিয়ে আবার ফিরে আসেন নিজের ভিটেতে এবং উপলব্ধি করেন "এই ভিটেই আমার গয়া কাশী"[২]। এই প্রবন্ধে বার্ধক্যে উপনীত দ্রবময়ীর সামাজিক ও

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে তাঁর জীবনে যে নিবিড় সম্পর্কগুলির জন্য এক চালার ভিটে 'গয়া কাশী' হয়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবো।

গোপীনাথপুরে দ্রবময়ীর জীবন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে দেখতে পাই বৃদ্ধা দ্রবময়ীএকা গোপীনাথপুর গ্রামে বসবাস করেন। পুত্র, কন্যা, নাতি, নাত-বৌ এবং তাদের ছোট সন্তান, সকলে থাকলেও তিনি একা গ্রামে বসবাস করেন। "এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আঁচেন, সবাই ছেড়ে গিয়েছে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাতনি – একঘর বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়!"[৩] তাই দুঃখ করে দ্রবময়ী বলেন, "কেউ নেই আজ"[৪]। বর্তমান সময়ে তাঁর সব থেকে কাছের হল কন্যাসুলভ মুংলি। নিজ মেয়ের মতো করে লালন পালন করেছেন এই মুংলিকে। মুংলি হল দ্রবময়ী গাই গরু। "মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গরুটাকে এত ভালোবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান"[৫]। দ্রবময়ী তাকে কচি কচি বাঁশ পাতা এনে নিজ হাতে খাইয়ে দিত। নিজে অসুস্থ হলেও মুংলির চিন্তা তাঁর মাথা থেকে যেত না। দুমাস কাল ধরে ম্যালেরিয়াতে ভুগছিলেন, ঘড়ির কাঁটা ধরে বিকেল হলেই পালাজ্বর আসে, সে সময়ও কে আনবে মাঠ থেকে মুংলিকে - এ চিন্তা যায় না। পাড়া প্রতিবেশি ন'বৌ, তিনি একমাত্র যে দ্রবময়ী খোঁজ খবর রাখে। অসুখ-বিসুখ হলে গরুটা মাঠ থেকে এনে দেয়, কখনও একটু সাবু করে নিয়ে আসে, অন্তত জানলা দিয়ে দুটি কথা বলে ও বারবার খোঁজটুকু নেয়। জটের গয়লার অড়ল ক্ষেতের পাশে গরু দিয়ে এসেছে, পালাজ্বর আসাতে দ্রবময়ী বিকেলে মুংলিকে আনতে যেতে পারে নি, নো'বৌ এনে দেবে বলেছে। তবুও শান্তি নেই দ্রবময়ীর। "বৃদ্ধা ন'ঠাকুরুণ আবার এসে জানলায় দাঁড়িয়ে বল্লেন – কম্প থেমেছা দিদি? ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেঁড়া স্তুপের মধ্যে থেকে জবাব এল - গোরু। আমার গরু তো"। আবার জ্বর একটু কমলেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "বলি আমার গরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে"[৬]? ন'বৌ এর উত্তর "হ্যাঁ হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই মলে শেষকালডা"[৭]। দ্রবময়ীর কাছে এই রকম স্নেহের পাত্রী মুংলি। এছাড়া রয়েছে খয়েরখাগী কাঁঠাল গাছ, ডুমুর গাছ এগুলিও তাঁর বড় আপন। "আসলে দ্রব ঠাকুরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু'পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু

গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতে দেবেন না”[৮]। গাছ বা জমিজমা দ্রবময়ীর কাছে ব্যবসায়ের বিষয় নয়, ভালোবাসার বিষয়। তাঁর স্বামীর স্মৃতি, যা তিনি একা আগলে রেখেছে। এই নিয়েই তাঁর একলার জীবন কাটে।

মুংলি আর এই গাছগুলো ছাড়া রয়েছে ন’বৌ ও কনক। ন’বৌ আপনার কেউ নয়, দ্রবময়ীর প্রায় সমবয়সী এক বিধবা বাড়ির প্রতিবেশিনী, যার নিজের কোন সন্তান নেই। বছরের মধ্যে তিন থেকে চার মাস ঝগড়ার জন্য দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথা ও দেখাদেখি বন্ধ থাকে। তবুও এই দ্রবময়ীর কিছু হলে খোঁজখবর নেওয়া, নাতিদের চিঠিতে খবর দেওয়া সবই ন’বৌ করে থাকে। এছাড়া কনক যে কিনা নিজের স্বার্থ নিয়ে মায়ের জন্য একটা লেবু নিতে আসে দ্রবময়ীর বাড়িতে, অনেক গালমন্দ খেয়েও মায়ের লেবু নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই কনক হল দ্রবময়ী মনের কথা বলার সাথী। কনক বুঝলও কিনা তা দ্রবময়ী বোঝে না, কথা বলার মতো কাউকে না পাওয়ায় যখন কনককে পায় মনের হাজারো দুঃখের কথা, নাতি নাতনি সব থাকতেও একা এইখানে পড়ে থাকে, কেউ তাঁর খোঁজ নিতে আসে না সেসব বলে যায়। “দ্রব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেচেন, নাতবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে...... এই ধরণের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে ঠাকুমা মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল”[৯]। তবু দ্রবময়ীর একা, নিঃসঙ্গ মন ছাড়তে চায় না কনককে, নির্জন বিকালবেলা একটু কথা বলার মানুষ পেয়েছে, তাই আরও কটা কথা বলে চলে। রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকলেও এদের সঙ্গে যেন তাঁর আত্মার গভীর সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে, আর এই সম্পর্ক গুলো নিয়েই গোপিনাথপুরে দ্রবময়ীর জীবন কেঁটে যাচ্ছিল।

কাশীবাসী দ্রবময়ী

দুমাস ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন দ্রবময়ী, চিঠি দিলেও কেউ আসেনি দেখতে। সব নাতিরাই খুব ব্যস্ত, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলে প্রতিষ্ঠিত। একদিন কানু(মেজ নাতি নীরদচন্দ্র) এসে উপস্থিত, সে দ্রবময়ীকে কাশী নিয়ে যাবে। জীবনের শেষ সময় কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে স্থান পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। বৃদ্ধ বয়স ধর্মকর্ম করার সময়, তার উপরে কাশী, বাবা বিশ্বনাথের স্থান। ন’বৌ ও ভাবলো দ্রবময়ী ভাগ্য বটে। দ্রবময়ী যাবার আগে সকল কিছু দান করে দিয়ে যায়, মুংলিকে ন’বৌ এর কাছে দিয়ে যায়।

জীবনের শেষ বয়সটা বাবা বিশ্বনাথের ওখানেই কাঁটাবে এই মনের ইচ্ছা নিয়ে কাশী পৌঁছায়। সেখানে কানুর বন্ধু সত্যের মা নিরজাবাসিনীর পাশের ঘরে স্থান হল দ্রবময়ী। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ের ৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে –

অতিক্রান্তাসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণাঃ।

শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।।

ব্যাসদেব পান্ডুর মৃত্যুর পর মাতা সত্যবতীকে এ কথা বলেছেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “বস্তুত পৃথিবী যৌবন কখনও যায় না। আসলে মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুত্রের যৌবনারূঢ় কালকে অথবা নাতি নাতনিদের সময়টাকে আর পছন্দ করতে পারে না, নিজের বৃদ্ধ মানসিকতাকে মেলাতে পারে না সমকালীন আধুনিকতার সঙ্গে”[১০]। ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ গল্পে নিরজাবাসিনী চরিত্রটি সেই কারণেই হয়তো তিনি স্ব-ইচ্ছায় সংসার ত্যাগ করে কাশীতে বসবাস করছেন। কিন্তু দ্রব ঠাকরুণের কিন্তু এই রকম কোন অবস্থা নেই, কারণ তিনি একা গোপিনাথপুরে বসবাস করেন। নিরজাবাসিনী দ্রব ঠাকরুণের চেয়ে বয়সে দু-পাঁচ বছরের ছোট হবে, মাথার চুল পাক ধরে নি, স্বাস্থ্য ভালো, শহুরে, শিক্ষিতা, মার্জিত কথাবার্তা। যশোরের গোপিনাথপুর গ্রামের বিধবা দ্রবময়ী প্রথম দিনই কথা বলতে একটু ভয় পান, ইতস্তত করেন। নিরজাবাসিনী বার্ধক্যে ধর্মাচারণ করার উদ্দেশ্যে কাশীবাসি হয়েছেন স্ব-ইচ্ছায়। মন প্রাণ দিয়ে তিনি ধর্মাচরণ করেন। তাঁর কাছে এই বয়স ধর্মাচরণ করার বয়স, যা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে। তিনি যেন পঞ্চাশ উর্দ্ধে বানপ্রস্থ ধর্ম পালন করতেই এখানে এসেছেন। তাই কথায় কথায় পরজন্ম, কর্মবাদ, গীতাপাঠ, বিভিন স্থানে মুনি ঋষিদের প্রবচন শোনেন; কিন্তু এ সকল কিছু দ্রবময়ীর কাছে অবোধ্য, তিনি এসব বোঝেন না। আর নিরজা বিধবা এক বৃদ্ধার পরজন্ম ভালো করার নিমিত্ত দ্রবময়ীকেও কাশীর বিভিন্ন স্থানে কখনও কাশীখন্ড শুনতে, কখনও আবার ধর্মীয় বিভিন্ন পাঠ শুনতে নিয়ে যান। পাঠ শুনতে গিয়ে অনেক সময় নীরজা নিজে ধ্যান, যোগ করতে বসে যান, দীর্ঘ সময় দ্রবময়ী একা বসে থাকে সেখানে, তাঁর কোন পাঠ বা প্রবচনে মন বসে না, তিনি ওখানে বসেই কখনও গ্রামের চিন্তা, কখনও সংসারিক কোন চিন্তায় নিমগ্ন হন। কেদার ঘাটে কাশীখন্ডের ব্যাখ্যা করছেন উপীন কথক, সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছে, বিশেষ করে নিরজা মন দিয়ে এসকল পাঠ শোনে। “দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কটা কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল

– নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সে দিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে”[১১]। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, দ্রবময়ী কি নাস্তিক? বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কাশী বিশ্বনাথের স্থানে এসেও তিনি ঘর সংসারের চিন্তায় মগ্ন। তিনি নিজেও সেই আশঙ্কা করেছেন, “দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান”। এর জন্য মনে হয় যে, তিনি নাস্তিক নন। তাছাড়া সুবচনীয় ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা – তিনি এসব শুনতে। যে গুলো পাড়াগাঁয়ে সাধারণত হয়ে থাকে। আসলে নিরজাবাসিনী সত্যের মা শহুরে শিক্ষিতা মহিলা, তিনি প্রাচীনশাস্ত্র, পুঁথি পাঠ করেছেন, এর থেকে তাঁর বদ্ধ মূল ধারণা হয়েছে জগৎ অনিত্য। এছাড়া এতদিন তিনি সংসারের জন্য সকল কর্তব্য পালন করেছেন, এখন পরপারের জন্য নিজেকে গুরুর পায়ে সমর্পন করেছেন।তাই তিনি বলেছেন, "গুরুই কেবল নিত্য বস্তু”[১২]। এবং সত্য সত্যই তিনি সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করেছিলেন তাই তো নিজের ছোট ছেলের বিয়েতেও যায় নি। কানু এপ্রসঙ্গে দ্রবময়ীকে জানায়, “সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের – ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ – কিছুতেই গেলেন না। বললেন যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোন ফল হল না”[১৩]। দ্রব ঠাকরুণের কাছে এ নিদারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার বটে। আসলে দ্রবময়ী কাছে সংসারে মায়া নয়, সংসারই একমাত্র সত্য বস্তু। সারা জীবন তিনি সংসার ধর্মই মন দিয়ে পালন করেছেন। স্বামীর স্মৃতি রূপে ঐ ভিটে ও গাছপালা আগলে পরে রয়েছেন জীবনের শেষ সময়, তাঁর কাছে ইহ জন্মটাই সব, পরজন্মের কথা সে জানে না। অপর দিকে নিরজাবাসিনী তাঁর ইহজন্ম কাঁটিয়েছেন, এখন তিনি ইহ জন্মের জন্য নয়, পরজন্মের জন্য বাঁচতে চান, সে রূপে ধর্মাচরণ করেন। ইহ জগতের সকল মায়া ত্যাগ করে নির্বিকল্প সমাধির জন্য বিভিন্ন যোগ্যাভ্যাস করে থাকেন। যার মাথামুন্ডু দ্রবময়ীর কাছে কোনভাবেই বোধগম্য হয় না। তাঁর কাছে নীরজা ‘ধর্মবাতিকগ্রস্তা’। কানুকে একবার এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাবার কথাও বলেন, “বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা”। কিন্তু সে কথায় কানু কান দেয় না, বরং হেসে বলে যায় “আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষ বয়েসে কাশীবাস করতে এলে – না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি”[১৪]। কানু আরও বলে গেল যে, “চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে”[১৫]। এ কথাটা একদম ঠিক, দ্রবময়ী আলাদা করে ধর্মকর্ম করার

সময় পাননি, সারা জীবন সংসারের জন্যই তাঁর সকল কর্ম, এবং সংসারই তাঁর সকল ধর্ম হয়ে রয়েছে। এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে এ সকল অভ্যাস তিনি পরিবর্তন করবেন কি ভাবে! কোন ধন সম্পত্তি বা ব্যবসায়ীক বুদ্ধিও তাঁর নেই, আছে শ্বশুর ভিটা ও কিছু স্মৃতি। তাই যখন সত্যের মাকে দেখে স্বামীর দেওয়া হার বিক্রি করে সেই টাকা গুরুর হাতে তুলে দেয় তখন সে বিস্মিত হন এবং সারাক্ষণ এই কথা ভুলতে পাড়েন না। কিন্তু নীরজার বক্তব্য ছিল "দিদি সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা"[১৬]। আর এ সকল কথা দ্রবময়ী বোঝে না, যে স্বামী ও সংসারকে আগলে সারা জীবন কাঁটলো, সেই স্বামী কার, স্ত্রী কার?? এ কথা দ্রবময়ী ভাববে কি ভাবে? সে ইহ জগতে বিশ্বাসী, মুংলি কি খাচ্ছে? কেমন আছে? খয়েরখাগী গাছটাতে কাঁঠাল হল কিনা? আম কে নিল? কনক এখনও লেবু নিতে আসে কিনা? এক বছর হয়ে গেছে, প্রথম প্রথম ন'বৌ এর চিঠি আসতো এখন সে চিঠিটাও আসে না – কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে এসে যিনি এসব চিন্তা থেকে একমুহূর্তের জন্য দূরে থাকতে পারে না, তাঁর কাছে এই জগত কি ভাবে অনিত্য হবে? তাছাড়া নিত্য, অনিত্য এই কঠিন শব্দগুলোর অর্থ দ্রবময়ী জানে না। তাই যখন নীরজার গুরুদেব তাঁকে দীক্ষা নিতে বলেন এবং বলেন যে দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি। তখন দ্রবময়ী পরিষ্কার জানান যে, "ফলের জন্য তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম"[১৭]। একদম নির্ভেজাল সত্য কথা এটা যে তিনি অসুস্থ ছিলেন আর রোগ নিরাময়ের জন্য কাশীতে আগমন, ধর্মাচরণ করতে তিনি কখনই আসেনি। এছাড়া তাঁর নাতি মাত্র ৭টাকা পাঠিয়েছে ঘর ভাড়া দিয়ে সব শেষ হয়ে গেছে, তাই টাকার অভাব থাকায় সে যাত্রায় দীক্ষা নেওয়া রোধ করতে পেরেছিলেন। আবার শুনতে পেলেন গুরুদেব আসছে এবং সত্যের মা নীরজাবাসিনী বললেন, "এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না"[১৮]। এদিকে বেশ কিছুদিন ধরেই দ্রবময়ীর মন ভালো নেই, বারবার মুংলি, ঐ বাড়িঘর এর কথা মনে পড়ে। সেদিন স্বপ্ন দেখেছে "তাঁর গোপিনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচ তলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েছে – ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েছে মুংলি.............. কাঁঠাল হয়েছে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখজ্যে গিন্নি বলচে – হ্যাঁ খুড়ীমা এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো .... কনক বলচে, তা ঠাক্‌মা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পারে

না"[১৯]। এর মধ্যে কানু এসে হাজির হওয়াতে নাতির কাছে কেঁদে গোপিনাথপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। আর গুরুদেব আসার আগে তিনি কাশী থেকে গুপীনাথপুরের উদ্দেশ্যে কানুর সঙ্গে ট্রেনে করে পাড়ি দেন। গোপিনাথপুরে ফিরে দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি ন'বৌকে বললেন, "আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই – এই ভিটেই আমার গয়া কাশী"[২০]।

উপসংহার

গীতায় বলা হয়েছে –

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্।।(৭/২৯)

এর অর্থ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জরা অর্থাৎ বার্ধক্য এবং মৃত্যুর ভয় ও আনুষঙ্গিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় সাধন করেন।

বাস্তবিকই দেখা যায় বার্ধক্যে ধর্মাচরণ, ভগবৎ ভজনায়, ধ্যান, যোগ প্রভৃতির নিয়মিত চর্চা দ্বারা দিন যাপন করলে মনের বল দৃঢ় থাকে, ফলে সুস্থ দেহ, মন নিয়ে জীবনের শেষের দিনগুলো কাঁটে। দ্রবময়ীর কাশীর সঙ্গিনী নিরজাবাসিনী অনেক এই ধরণের এক বৃদ্ধা। যিনি জীবনের শেষ সময় জড়, অনিত্য জগতের মায়া কাটিয়ে ভজন, সাধন নিয়ে জীবন কাঁটাতে চান। তাঁর কাছে জীবনের কোন সম্পর্কই আজ গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুরোনো স্মৃতিও আজ যেন গুরুত্বহীন, তাই অনায়াসে বলতে পারেন, "কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী"। নিজের সন্তানের মায়াও যেন তিনি কাঁটিয়েছেন, তাই তো দেখা যায় নিজের ছোট ছেলের বিয়েতেও তিনি যান নি। তিনি বলেন সংসারের বন্ধনে তিনি আর জড়াতে চান না। অর্থাৎ বার্ধক্য জীবনে শেষ স্তরে উপস্থিত হয়ে সত্যের মা নীরজাবাসিনী জীবনের সব সম্পর্ক গুলো কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। মন থেকে সংসার ও সম্পর্কের টান টা ছিঁড়ে গেছে। বর্তমানে গুরুই তাঁর সব, ধর্মাচরণ করে পরজন্মকে সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নীরজাবাসিনীর যে ছবি পাওয়া গেছে তা থেকে তাঁর যে সামাজিক প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় তা হল, তিনি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ। ফলত টাকা পয়সার অভাব তাঁর নেই, টাকা পয়সা নিয়ে কোন চিন্তা তাঁকে করতে হয় না। আপর দিকে দ্রবময়ীর সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি গ্রাম্য, অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন বৃদ্ধা। যার ঘর ভর্তি আপনজন থাকা সত্ত্বেও আজ কেউ নেই, তিনি একা গোপিনাথপুরে

বন জঙ্গলের মধ্যে ছেঁচার বেড়া দেওয়া একখানা চালাঘরে বসবাস করেন। এই জীবনের প্রাত্যহিক চাহিদার কথাই সে ভাবে, পরজন্ম নিয়ে ভাবার সময় নেই। কাশীতে বসবাসকালে মাসে নাতিরা ১১টাকা করে পাঠাতো, তাই দিয়েই জীবন যাপন করতেন, এমনও সময় গেছে মাত্র ৭টাকা পাঠিয়েছে। "নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েছে"[২১]। ঘর ভাড়াতে যদি সব টাকা চলে যায় সারা মাস কি ভাবে যাবে? অর্থাৎ অর্থের সংকট অবশ্যই ছিল দ্রবময়ীর জীবনে। তা দ্রবময়ীর বিভিন্ন কথার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। "বৃদ্ধকালের সমস্যা, আমার ধারণা, প্রধানত মধ্যবিত্তের সমস্যা – বিশেষভাবে উঠতি মধ্যবিত্তদের। নিম্নবিত্তদের মধ্যে এই সমস্যার বিশেষ কোনও সচেতনতা নেই, উচ্চবিত্তরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারেন"[২২]। সত্যি তাই, বার্ধক্যের সমস্যা মূলত মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের সমস্যা। নিরজাবাসিনীও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত একজন বিধবা বৃদ্ধা। তাই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তিনি জীবনের সব সম্পর্ক ত্যাগ করে, জরা বা বার্ধক্য, মৃত্যু রূপ দুঃখ এসব নিয়ে আলাদা করে ভাবচ্ছেন। এই অনিত্য জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, নির্বিকল্পক সমাধি লাভের জন্য জীবন যাপন করছে। দ্রবময়ী জীবনে বার্ধক্যকে নিয়ে আলাদা করে উপলব্ধি করার বা পুঁথি পড়ার সময় বা উপায় নেই। তিনি তাঁর গতানুগতিক জীবনেই অভ্যস্ত। বিয়ের পর যে ভিঁটেতে উঠেছেন, যে ভিঁটেতে তাঁর স্বামী পরলোকগত হয়েছেন, সেই ভিঁটেকেই আগলে তাঁর জীবন যাপন। সেখানে রক্তের সম্পর্কের কেউ না থাকলেও তারাই দ্রবময়ীর আপনজন।

বার্ধক্যে স্মৃতিচারণারেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। অ্যারিষ্টটল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৃদ্ধবয়সে স্মৃতিচারণের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, পূরবী, পুনশ্চ, আরোগ্য, আকাশপ্রদীপ, জন্মদিনে প্রমুখ কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় প্রমুখ প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায়। ১৯৩৯ সালে ৭ই এপ্রিল(কবির বয়স ৭৯) দুপুরে শ্যামলীতে বসে কবি শৈশবের কথা মনে করে বলেন, "পারিস তোরা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে আমার সেই ছেলেবালাকার দিনগুলি – যেখানে কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই! মহা আনন্দে দিনগুলো কাটিয়ে দিতুম তবে"[২৩]। দ্রবময়ীকেও একাকীত্বের জীবনে স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায়, যদিও বহু পুরানো ছোটবেলার বা বিয়ের পরের কোন স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায়নি। নাতিদের কথা, বড় নাতির ছেলে খোকনের কথা স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে, সেখানে প্রচ্ছন্ন এক বেদনা দেখতে পাওয়া যায়। গোপিনাথপুরে কনককে

পেয়ে স্মৃতিচারণ করার সময় ছোট মেয়েটি তাঁর কথা বুঝতে পারছে কিনা সে জ্ঞান হারায়। এই স্মৃতিচারণের সঙ্গী হিসাবেই কনকের সঙ্গে তাঁর এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কাশিতে গিয়ে আবার দেখতে পাওয়া যায়, গোপিনাথপুরের স্মৃতি তাঁকে বেশি টানছে। কিন্তু সেখানে স্মৃতিচারণ করে ব্যক্ত করার কোন মানুষ নেই, একমাত্র সঙ্গিনী নীরজা, যে সকল কিছুকে বন্ধন মনে করে চারটি জ্ঞান দিয়ে দেয়, তাই দ্রবময়ী চুপ করে যায়। তাঁর মন কোন ভাবেই কাশীতে টেকে না। তাঁর মনে হয় "আপনার জন পড়ে রইল – তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ – আর তিনি কোথায়"[২৪]!

এখানে দেখতে পাই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এমন দুই নারী, যাদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই তাঁদের জীবনের দার্শনিক যে দৃষ্টিভঙ্গী তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে দেখা যাচ্ছে নীরজাবাসিনী ধর্মের জন্য, পরজন্মের জন্য নিজ সন্তান মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। অপর দিকে দ্রবময়ীর জীবনে আজ যাদের সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, যাদের জন্য মন কাঁদে, কাশী বিশ্বনাথের কাছে গিয়েও যাদের স্বপ্ন দেখে, যাদের প্রাণের থেকে আপন বলে মনে করেন তাদের কারো সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই; মুংলি, খয়েরখাগী কাঁঠাল গাছ, ডুমুর গাছ এরা তো মানুষও নয়, কিন্তু এদের সঙ্গেই দ্রবময়ীর আত্মার সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। সম্পর্ক কখনই একতরফা হয় না, তাই শুধু দ্রবময়ী তাদের আপন ভাবে, ভালোবাসে তা নয়, তারাও দ্রবময়ীকে ভালোবাসে। তার প্রকাশও গল্পে দেখা যায়। দ্রবময়ী কাশী যাবার পর থেকে মুংলি ওঠে না, খায় না। আবার দ্রবময়ী কাশী থেকে ফিরলে, তাঁকে দেখে "মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে"[২৫]। কি এক অদ্ভূত মনোরম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এঁদের মধ্যে। তাই তো কাশী থেকে ফিরে "দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল"। এরাই দ্রবময়ীর পরমাত্মীয়, তাই গোপিনাথপুরের ভিঁটে তাঁর কাশী, গয়া পূর্ণতীর্থ।

তথ্যসূত্র:

১. বুদ্ধচরিতম – অশ্বঘোষেররচিত, ডঃ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃ ৪৬।

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃ ৬২৪

৩. ঐ, পৃ. ৬১২

৪. ঐ, পৃ ৬১২

৫. ঐ, পৃ ৬১২

৬. ঐ, পৃ ৬১১

৭. ঐ, পৃ ৬১১

৮. ঐ, পৃ ৬১৩

৯. ঐ, পৃ ৬১৪

১০. নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ ২৯

১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃ ৬২১

১২. ঐ, পৃ ৬১৯

১৩. ঐ, পৃ ৬২০

১৪. ঐ, পৃ ৬২০

১৫. ঐ, পৃ ৬২১

১৬. ঐ, পৃ ৬২১

১৭. ঐ, পৃ ৬১৯

১৮. ঐ, পৃ ৬২৩

১৯. ঐ, পৃ ৬২৩

২০. ঐ, পৃ ৬২৪

২১. ঐ, পৃ ৬১৯

২২. অমরেশ দত্ত, বানপ্রস্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ ১৩।

২৩. রাণীচন্দ্র, আলাপচারী :রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীগ্রন্থবিভাগ, পৃ ৬৫

২৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, প্রথমখন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃ ৬২৩

২৫. ঐ, পৃ ৬২৩

নাচনী : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে

অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশিষ্ট নাট্যকার সৈকত রক্ষিত তাঁর নাচনী নাটকে সচেতনভাবেই লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান নাট্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। নাটকের নামকরণে যেমন তেমনি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও লোকসংস্কৃতিকে শিল্পনিপুণভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। 'নাচনী' মূলত ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত এক বৃহৎ ভূখণ্ডের বিশেষ নৃত্য। এই অঞ্চলের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা আপন মর্যাদাবৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য নৃত্যগীতপটীয়সী নাচনী প্রতিপালন করে থাকেন। আসলে সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ কিম্বা অন্য সমাজের অল্পবয়স্কা কন্যা বা বধূকে কুলত্যাগ করিয়ে নাচ গানের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে আপন সহচরী করে তোলেন। পরবর্তীতে সেই রমণীই হয়ে ওঠে নাচনী। কোন কোন নাচনী তাদের আশ্রয়দাতাকে ছেড়ে স্বাধীনভাবে ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নাচ গানের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করে থাকে। নাচনী নাচের সঙ্গে যে গান যুক্ত থাকে তা মূলত ঝুমুর। এই নাচনী নাচ মূলত আদি রসাত্মক। অবশ্য ঝুমুর গানগুলির মধ্য দিয়ে অনেকসময় নির্মল প্রেমের সন্ধানও পাওয়া যায়। নাট্যকার তাঁর 'নাচনী' নাটকে পুরুলিয়ার অন্যতম লোকসংস্কৃতি নাচনীদের জীবনকে কেন্দ্র করেই লোকজ উপাদানগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন।

লোকায়ত সংস্কৃতি 'নাচনী' নাটকের প্রাণ। নাটকের নামকরণ সেই লোকসংস্কৃতির দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাটকের নামকরণ থেকে শুরু করে কাহিনি ও ঘটনার সর্বত্র লোকসংস্কৃতির ধারা বহমান। 'নাচনী' নাটকে সেই লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানগুলিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লোকনৃত্য : নাট্যকার তাঁর 'নাচনী' নাটকে ঝুমুর গানের সঙ্গে সঙ্গে 'ছৌ' নাচের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন শিল্পের দাবি মেনেই। এই 'ছৌ' নাচের মূল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নাচনী লীলাবতী, পস্তুরানী এবং রাধারানী ইত্যাদি লোকচরিত্রগুলিকে নাটকে স্থান দিয়েছেন নাট্যকার। 'ছৌ' পুরুলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এটি আবশ্যিকভাবে মুখোশ নৃত্য। এই নৃত্যধারার মধ্যে বীররসই প্রধান। প্রায় প্রতিটি পালার মধ্যে

পুরাণকেন্দ্রিক ঘটনার যুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থাপিত এই ধারার আখ্যানে। অশুভ শক্তির পরাজয় ও শুভ শক্তির জয়ের মধ্য দিয়ে এক ধরণের আদিম বিশ্বাস পরিতৃপ্ততা লাভ করে এখানে। নৃত্য পালাগুলির মধ্যে 'রাবণবধ', 'মহিষাসুর মর্দিনী', 'তারকাসুরবধ', 'মদনভস্ম', 'কিরাতার্জুনীয়' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নাচনী' নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে এই 'ছৌ' নাচের সুস্পষ্ট প্রয়োগ বর্তমান। পাঁড়কিড্ডির গৈরা সর্দারের নাচনী লীলাবতীকে হরণ করে নিয়ে গেছে রাঙামেটার বাঘাশ্বরের যুবক ছেলে টুনা। স্বাভাবিকভাবেই গৈরা সর্দার তার নাচনীকে উদ্ধার করতে গেলে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব সংঘাত। বাঘাশ্বর মাহাতো নিজের অহঙ্কার আর আভিজাত্য প্রদর্শন করতে গেলে গৈরা সর্দার বলে ওঠে-

> *"গৈরা : হ ভাই দাদারা, তরা ত এখন ই কেথা বলবিসেই। তবে শুন, এই বুঢ়া তুইও শুনেলে, ইটা মরদের কাজ হৈল নাই। ইটা অন্যায় হইলো। মুরাদ থাকলে একাই লড়াই করে নারীকে জিততে হয়। নাচনীকে জিতে ঘর ঢুকা। দশ লক মেলে লড়তে আসেছিস, পরের বলে মদদানি দেখাছিস"?*

একথা শোনার পরই বাঘাশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বীকে লড়াইয়ে আহ্বান জানায়- 'ঠিক আছে তাইলে একা একা ভিড়ে যা হামার সঙে। যদি জিততে পারিস, তাইলে লাচনীকে তরাই নিয়ে যাবিস'। গৈরা সর্দার সম্মতি জানালে ছৌ নাচের কিরাত অর্জুন পালার বাজনা বেজে ওঠে। নাচিনীকে নিয়ে আসা হয়-

> *"সঙ্গীরা নাচিনীকে মাঝখানে রাখে। ছৌ নাচের মুখোশ পরে শুরু হয় লড়াই। লড়াইটি হবে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। মাঝে মাঝে উল্কা দিয়ে ওঠে। সম্মিলিত ধ্বনি ওঠে- ছ্যৌ! ছ্যৌ! কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর দু-পক্ষই নাচনীকে অধিকার করতে যায়। পতন ঘটবে গৈরা সর্দারের। সে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে। বাঘুর দলের লোকেরা বিজয় উল্লাস দিয়ে উঠবে"।*

'ছৌ' নাচের এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে নাটকের বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এবং সেই সূত্রেএই লোকনৃত্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

লোকসঙ্গীত : লোকসঙ্গীত মাটির সঙ্গে গভীর মমতার বন্ধনে লালিত গ্রামীণ জনসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য উপাদান। 'নাচনী' নাটকে যে কয়েকটি লোকসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে তা লোকজীবন থেকেই উঠে এসেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে পালোয়ান

হেলার কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে একটি বাউল গানের সুচনাংশ। নাচনী লীলাবতীকে ঘরবন্দী করে টুনা বড়ই চিন্তাগ্রস্ত, দ্বিধাদ্বন্দ্বে অস্থির। নারীর মোহিনীমায়ায় ভীত সন্ত্রস্ত। সেই সঙ্গে আছে পিতৃভয়। সে বলেছে 'দমে ডর লাগছে। হামার বাপ যদি এখন শুনে ন, তাইলে মাইরি বলছি, হামকে ছেঁচে মরাবেক। বলবেক, তোর এত বড় বিদ্যাপ, কোই দেখি তোর লংকাটা কতনা ডাগর হঁয়েছে'। এই 'লংকাটা' শব্দটির মধ্য দিয়ে যৌনাচারের ইঙ্গিত দিয়ে রসিকতার ছলে তার সাহসিকতাকে কৌতুক করেছে। হেলা বলেছে- 'সাধে কি বাউলরা গানে গানে বলে- কাঁচা লংকারে'..। বাউল গানের কয়েকটি শব্দবন্ধে টুনার মানসিক টানাপোড়েনের অবস্থা ফুটে উঠেছে।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাচনী নাচের মহড়া উপলক্ষে বাদ্য বাজনা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাঘাশ্বর তার নাচনী পস্তুরানীকে নিয়ে নাচতে থাকে। নৃত্যগীতের আসরকে জমজমাট করার জন্য বাঘাশ্বর আকর্ষণীয় নাচের মুদ্রা নাচনীকে দেখাতে থাকে। বাঘুর কথায়- ' বাজা বাজা হারমোনি।(হারমোনি বেজে ওঠে) নাচে গানে চটক আনতে হবেক। তা নইলে লোকে দেখবেক কেনে? এখন ত আর ভভপিতার যুগ লয়। সিনেমা, টিভির যুগ। হামাদের লাচখেল তেমনি হতে হবেক। লে মাথায় ঝুড়িটা নিয়ে তুঁই আগু আগু ঢং দেখায় যাবি। আর হামি যাব তোর রাস্তা ধরে, লে-'।

এরপর পস্তু মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কোমর নাচিয়ে যেতে থাকে। সেই সময় মাদল বাজিয়ে সুর করে ঝুমুর ধরে বাঘু-

"চৈলা যা তুঁই কথাকে যাবি।
যথায় যাবি তথায় পাবি"-।

গানটিতে, মনের মানুষের স্থান সর্বত্রই এই ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে। মোহিনীময়ী নারী পস্তুর প্রতি তার মনের অভিলাষ সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

নাটকের এই একই দৃশ্যে বাঘুর কণ্ঠে আর একটি ঝুমুর গান ব্যবহৃত হয়েছে- 'বঁধু আর কি দিয়ে সাজাব তুমাকে/ সিন্দুরে কাজলে টলমল'। গানটিতে বাঘুর মনে লীলাবতীর আগমন যেন তার পূর্বরাগেরই বহিঃপ্রকাশ। কৃষ্ণের নাম শুনে রাধার যে আকুলতা তেমনি লীলাবতীর নাম শুনেই বাঘু যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। 'নাচনী' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বাঘুর কণ্ঠে আর একটি ঝুমুর গান ব্যবহৃত হয়েছে- 'আঁধার ঘরে, হুড়ুক হুড়ুকাকে ঢেলে গো'। এই ঝুমুরটিতে স্বপ্নমধুর বাঘু ও পস্তুরানীর আদি রসাত্মক ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে আর একটি ঝুমুর সংযোজিত হয়েছে। বাঘু পস্তু দুজনেই ঝুমুর গান গাইতে শুরু করে- 'বঁধু কী পান খাওয়ালি তুঁই' ...। কিন্তু

পাঁড়কিড্ডির লোকদের আগমনে গানটি বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দৃশ্যে পস্তুর বিষাদভরা কণ্ঠে সংযোজিত হয়েছে একটি গান-

'ভাঙিয়া গেল রে হামার সনার বরণ দেহী
ই কানা- খালভরার সঙে রহি কি না রহি রে'।

গানটির মধ্যে মানুষের জীবনসত্যসুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। গানটিতে পস্তুর দ্বন্দ্বময়ী নারীসত্তার আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে। রাঘুর জীবনে মোহিনীময়ী লীলাময়ী লীলাবতীর আগমন ঘটলে স্বাভাবিক ঈর্ষাকাতরতায় যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে পড়ে পস্তুরানী। তার নারী মনের সুতীব্র জ্বালা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও ব্যক্ত হয়েছে 'কানা-খালভরা' শব্দের মধ্য দিয়ে। নাটকের একেবারে শেষলগ্নে বাঘুর কণ্ঠে আর একটি ঝুমুর গান ('তুমার সিঁথার সিন্দুর দামিনী') পরিবেশিত হয়েছে। যেখানে লীলাবতীর রূপ যৌবনে ডুব দিয়ে তাকে দামিনীর সঙ্গে তুলনা করেছে।

লোককথা : 'নাচনী' নাটকে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো লোককথারও বহু উপাদান লক্ষ করা যায়। যেমন-

ক) ই শ্লা মাঞা মানুষের লীলা বুঝা ভার।
খ) ভাদৈরা মেখ, এখনি রোদ আর এখনি বাদল।
গ) কন লাউ খাপরা ডিংলা চপা।
ঘ) বাপকা বেটা আর ইয়াকা ঘড়া, কুছ নাহি ত থোড়া থোড়া।
ঙ) বিটি ছ্যেলা মানেই বিপদের জিনিস।
চ) মুচ নাহি ত কুছ নাহি।
ছ) ঝালের জিনিস ঝাল ত হবেকেই।
জ) সব শিয়ালেরই একেই রা।
ঝ) বাপের কলা চিটা গুড়।
ঞ) যার বাঁহীর জোর আছে, মদদানী আছে, যে লুটতে পারবেক তারেই।
ট) শরীর হল চ্যালা কাঠের পারা।

লোকভাষা : লোকভাষা লোকসংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ। লোকভাষার মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ রামেশ্বর শ এর মতে, 'লোকসমাজের সাহিত্য যেমন লোকসাহিত্য, লোকসমাজের ভাষা তেমনি লোকভাষা'(সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা)। পুরুলিয়া অঞ্চলের লোকসাধারণের আঞ্চলিক কথ্যভাষার মধ্য দিয়ে নাটকের চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লোকভাষার

মধ্যে এসেছে নানা উপমা ('তুমার নাকটা সিমফুচির পারা, তোমার চৈখগিলা কাজললাতার পারা, তুমার ইয়াগুলা ইয়ার পারা'-), রূপক (জীবন অরণ্যে হামার যৌবন কুসুমভাতি অকালে নিভে যাবেক?) ইত্যাদি। নাট্যকার এই নাটকে
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লোকভাষাকে প্রয়োগ করে নাটকটিকে শিল্পিত মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নাটকটি নিবিড় পাঠে লোকভাষারই কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়-

ক) শব্দের অন্তে 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- যাবেক, লিবেক, কাটবেক, কিন্তুক, মরাবেক, পারবেক, লড়বেক, হবেক, ঘরকে, মরাবেক ইত্যাদি।

খ) 'এ' এর উচ্চারণ অনেকাংশে 'অ্যা' এবং 'ও' কার কখনো 'ঐ'রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- ট্যাক(ট্যাক আপ), ভাদৈরা, ঝারৈলের, ইত্যাদি।

গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার 'নাচনী' নাটকের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- হঁয়ে, হেঁ, মঁচটা, শুঁকায়, তুঁই, হঁ ইত্যাদি।

ঘ) বহুবচনে 'গুলান' 'গুলা' 'গিলান' শব্দের ব্যবহার এই অঞ্চলের কথ্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- বন্ধুগুলান, কথাগিলা, চোখ গুলা, আঙ্গুল গিলা ইত্যাদি।

ঙ) 'ন' এর উচ্চারণ 'ল' রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- লাচা, লাচনি ইত্যাদি।

চ) সাপেক্ষ শব্দজোড় এর বহুল প্রয়োগ এই কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন- হিলায় হিলায়, হুডুক হুডুকা, ঘণ্টা ঘণ্টি,কাঁটা কাটি, সুগুম সুগুম, ক্যাঁটের ক্যাঁটের ইত্যাদি।

শব্দ ভাণ্ডার- পাগটা- মাথায় বাঁধা কাপড়/ পিঠে তৈরির জন্য গুড়/ চিনির রস, মহুলা মদ- মহুয়া রস, লুচকাতে- ছিনিয়ে নেওয়া/ অসাবধানে তুলে নেওয়া, সুপুর- বাঁশের তৈরি কুলো, ডাঙের কসরত- লাঠিখেলা, বজড়া বজড়ি- আছাড় মারা,ইয়াকা ঘড়া- এখানের ঘোড়া, ডাং- লাঠি, পারা- মতো, হুদকে- ছটপটিয়ে, একপাট- একগ্লাসের মতো মদ, আমশির- আমকে কেটে রোদে রেখে শুকনো করা, পোঁন্দটা- মলদ্বার, চুটি- শালপাতার মধ্যে তামাক দিয়ে তৈরি চুরুট বিশেষ, কোঁড়চে- কোমরের কাপড়ের মধ্যে রাখা, ঢাড়াই মারতিস- খুব পেটাত, ঢাড়াই- পেটানো, খামুস- চুপচাপ, সুগুম- নির্বাক, আলিস- অলস, টেকায়- আটকে রাখা, ছেঁচে মরাবেক- পিটিয়ে মেরে ফেলবে, গেতুজালে- ছোট ছোট ফাঁকওয়ালা মাছ ধরার জালবিশেষ, আঁটু- হাঁটু, মদ্দানি- মদ রাখার পাত্র, হুড়কাটা- কাঠের দরজার পিছনে ছিটকিনি বিশেষ, ঠেঙ্গার- লাঠির, মুহের-

মুখের, ঠেগায়- লাঠি দিয়ে পেটানো, চমচম করে- ভয় ভয় করে, রুপু- টিয়া পাখি, সাজলন্ত- মানানসই, আস্তে মুস্তে- ধীরে ধীরে, কন- কোন, খাপরা- মাটির তৈরি প্রায় গোলাকার টালি যা মাটির বাড়ির ছাদে দেওয়া হয়, মারতিস ডিংলা- কুমড়া, মাঝিহিড়ার- গ্রাম্য নাম, বিঁড়া- ধানের গাছা, পারা- মতো,

কটাশের- বিড়ালের থেকে একটু বড় জন্তু, ঘণ্টা ঘণ্টি- মাটিতে পরে পরে লুটোপুটি, ছাতা টাড়ের পরব- বিশ্বকর্মা পূজার সময় একটি উৎসব যেখানে রাজবংশের লোকেরা মাঠের মধ্যে ছাতা উপরে তোলে, চুয়াড়- বদমাশ, বাহ্যা- চালানো(মূলত লাঙল চালানো), খেদবিসেই- তাড়াবেই, ঝারৈলার- একধরণের বাদ্যযন্ত্র, অমঠার- যকৃত, আলগায়- পাঁজা কোলা করে তুলে নেওয়া, উয়েই- সেই-ই, গৈড়াই মাছ- ছোট পুকুরে মাছ, সিমফুচির- খুবই ছোট একধরণের পাখি, কাজললাতার- চোখে পরানোর জন্য কাজল রাখার পাত্র বিশেষ, ইয়াগুলা- অনেকগুলো, তকক- পর্যন্ত ইত্যাদি।

পোশাক পরিচ্ছেদ ও সাজসজ্জা :'নাচনী' নাটকের সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে 'ছৌ' নৃত্য আর 'ঝুমুর' গানের আসর। স্বাভাবিকভাবেই 'ছৌ' নাচের নর্তকীদের বেশভুষা আকর্ষণীয়। মুখোশ আবশ্যিকভাবে থাকলেও পুরুষদের পোশাকে লক্ষ করা যায় নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি ও মুখোশ। সৈকত রক্ষিতের নাটকেও সেই একই চিত্র লক্ষ করা যায়। নাটকের সুচনাংশেই দেখা যায় তেল চকচকে শরীরে 'নেংটির মতো করে ধুতি পরেছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে কোন বস্ত্র নেই'। আছে 'পাগটা'(পাগড়ি)। আর নাচনীদের সাজসজ্জাতে আছে- 'খপায় গোলাপি ফিতা দিয়ে ঘুঙুর দিয়ে বেলকাঁটা গুঁজে গুঁজে' নর্তকী তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাদের প্রসাধনের মধ্যে আছে 'পাউডার', বালা, উরমাল (রুমাল),কুমকুম, লিপিসটিক, স্যান্ট(সুগন্ধি), আলতা, আরশি (আয়না),) লাক(লাক্স) সাবান, হিমানি, সাজার বাস্কা (বাক্স) ইত্যাদি।

পুরুলিয়ার লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনে ও নিত্য প্রয়োজনে যেসমস্ত **লোকায়ত দ্রব্যাদি** ব্যবহার করে নাটকে তার বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন- মাদল, ঘুঙুর, টাঙ্গি, তীর ধনুক ইত্যাদি। এছাড়াও **লোকনেশা** হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত মহুলা মদ, বিড়ি ইত্যাদি। **লোকউৎসব** হিসেবে এসেছে ছৌ নাচ, কীত্তন, বাউল গান, ছাতা টাড়ের পরব ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

সৈকত রক্ষিত তাঁর‘নাচনী’ নাটকে এইভাবে গ্রামীণ সমাজের লোকায়ত ধারার প্রচলিত রূপকে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। লোকায়ত গ্রামীণজীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে নাট্যকারের যে বাস্তব ও নিখুঁত অভিজ্ঞতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থঋণ:

ক. নাচনী (মূল নাটক) - সৈকত রক্ষিত।

খ. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ- সম্পাদক দুলাল চৌধুরী, আকাদেমি অব ফোকলোর কলকাতা।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত কালপত্র-পত্রিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পর্যালোচনা

শুভ্র সরকার
গবেষক, সিকম্ স্কিল ইউনিভারসিটি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সারসংক্ষেপ : *মহিলা সম্পাদিত। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র – বঙ্গ-মহিলা আবির্ভূত হয় ১৮৭০ খ্রীঃ মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও দেশ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়গুলির উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। সমগ্র বাঙালি সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল পত্রিকাগুলি। বহু-পত্রিকায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা চালিত ছিল বাংলা সাময়িকপত্রগুলি। সামাজিক কুসংস্কার মুক্তির জন্য ও পত্রিকাগুলি অবিচল প্রচেষ্টা করেছিল।*

সূচক শব্দ : *প্রেক্ষাপট, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পর্যালোচনা।*

প্রেক্ষাপটঃ-

পুরুষ সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র ‘দিগদর্শন’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এবং মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র ‘বঙ্গমহিলা’ আবির্ভূত হয়েছিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। বাহান্ন বছরের ব্যবধান থাকলেও সাময়িকপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনায় বাঙালি মহিলারা শুরু থেকেই কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। সংখ্যাতেও কম ছিলেন না সম্পাদিকারা, ঊনিশ শতকেই মোট তেরোটি পত্রিকা মুদ্রিত হয়েছিল মহিলা সম্পাদকদের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। পরের শতকের প্রথম বারো বছর (১৩০৮ ব. – ১৩২০ ব.)-এ বরং মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা খানিকটা কমে গিয়েছিল। আটটির মত মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সন্ধান পেয়েছি আমরা। এর পরবর্তী সময়কালে (১৩২১ ব. – ১৩৩৭ ব.) পত্রিকার সংখ্যা আবার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ষোলো বছরে একুশটি মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দর শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পত্রিকার সংখ্যা প্রায় কুড়ি। সাতাত্তর বছর ধরে প্রকাশিত ষাটটিরও বেশি মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে আমরা চৌত্রিশটি পত্রিকা নিয়ে এই আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনায় প্রথম যে পত্রিকাটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেটি ‘খ্রীষ্টীয় মহিলা’ এবং

শেষতম পত্রিকা 'মাতৃভূমি'। এদের মাঝে রয়েছে – 'ভারতী', 'বালক', 'পরিচারিকা', 'পুন্য', 'অন্তঃপুর', 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'জাহ্নবী', 'মাহিষ্য মহিলা', 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'। 'পরিচারিকা'-নবপর্য্যায়, 'দীপালি', 'আন্নেসা', 'দীপক', 'নব্যভারত', 'বাঙ্গলার কথা', 'শ্রেয়সী', 'মহিলা বান্ধব', 'সেবা ও সাধনা', 'মাতৃমন্দির', 'শ্রমিক', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'পাপিয়া', 'মুকুল'-নবপর্য্যায়, 'আলোক', 'মুক্ত', 'জয়শ্রী', 'রূপরেখা', 'মন্দিরা', 'বিজয়িনী', 'অচেনা' ও 'মেয়েদের কথা'।

মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

চৌত্রিশটি পত্রিকাই নানা গুণে সমৃদ্ধ ছিল। কোনও না কোনও একটি লক্ষ্য নিয়ে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও দেশ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অন্যান্য বিষয়গুলি উল্লেখ করতে দ্বিধা করেনি পত্রিকাগুলি। যেমন – 'মুকুল'- নবপর্য্যায় ছিল শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকা। 'বালক'ও ছিল বালকদের পাঠ্য পত্রিকা। কিন্তু দুটি পত্রিকাতেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আলোচনাসহ যে বিষয়গুলি প্রকাসিত হত, সেগুলি পরিণত মনের উপযোগী ছিল। পরাধীন দেশের বালক-বালিকা-নবীন-প্রবীণ প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মনে সচেতনতা নির্মাণ করেছিল পত্রিকাগুলি। 'অন্তপুর', 'মেয়েদের কথা' ইত্যাদি পত্রিকার নাম শুনে অনুভব হয় যে এগুলি অন্তঃপুরের মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত । কিন্তু দেশ-বিদেশের সংবাদ থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চর্চায় ; পত্রিকাগুলির আগ্রহ ও উৎকর্ষ দেখে বলতে হয়, এরা মেয়েদের অন্তঃপুরকে মিশিয়ে দিয়েছিল বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই বহুমুখীনতার পরিচয় দিয়েছিল চমৎকারভাবে। বহুমুখীনতার প্রসঙ্গে বলা যায়, মহিলা সম্পাদিত এবং প্রধানত মহিলাপাঠ্য হলেও সাময়িক পত্রগুলি নারী-পুরুষ উভয়কেই পাঠকরূপে গ্রহণ করেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা শোচনীয় হলেও, পুরুষদের চিত্রও বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। শিক্ষা-সংস্কার সবক্ষেত্রেই তারা যথেষ্ট দুর্বল ছিল। দেশের ভবিষ্যতের জন্য নারীর সঙ্গে পুরুষদেরও উন্নত করার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছিল পত্রিকাগুলি। আবার নারীর উন্নতি ও প্রগতির জন্য পুরুষদের উপরে নির্ভর হতে বাধ্য হয়েছিল মহিলা সম্পাদকরা। ঊনিশ শতক থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় নারীর যে সামান্য উন্নতি ও বিকাশ হয়েছিল, তার জন্য পুরুষদের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাই নারীপ্রগতির কর্মযজ্ঞে পুরুষদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে, তাদের সহযাত্রী করে নিজেদের লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করেছিলেন সম্পাদিকারা। একথা বলা হয়ত

অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের আলোচিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে পুরুষ সহযোগীরা অনেকভাবে জড়িত ছিলেন।

পর্যালোচনাঃ-

সমগ্র বাঙালি সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল পত্রিকাগুলি। একটি আদর্শ দেশনির্মাণের জন্য যে উপাদানগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের যথাযথ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন মহিলা সম্পাদিকারা। পরাধীন দেশের শৃঙ্খলিত মানব মানবীকে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিল পত্রিকাগুলি। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বেশ কয়েকটি মহিলা সম্পাদিত বাংলা পত্রিকাই ছিল রাজনৈতিক পত্রিকা যেমন – 'বাঙ্গলার কথা', 'নব্যভারত', 'শ্রমিক', 'মুক্ত', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা', 'অর্চনা' ও মাতৃভূমি'।

কয়েকটি পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ জাতিগঠন। তারাও রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছিল। যেমন, 'ভারতী', 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'জাহ্নবী', 'সেবা ও সাধনা', 'মাতৃমন্দির', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'বিজয়িনী' ইত্যাদি। এছাড়াও 'বালক', 'পরিচারিকা', 'পরিচারিকা' – নবপর্য্যায়, 'দীপালি', 'দীপক', 'মুকুল'-নবপর্য্যায়, 'আলোক' ইত্যাদি পত্রিকাতেও রাজনৈতিক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল।

পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইংরেজ বা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মত গঠন। সময়ের সঙ্গে এই ভাবনা চিন্তার প্রসঙ্গ ও কৌশল পরিবর্তিত হয়েছিল। ঊনিশ শতকের পত্রিকাগুলিতে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ইত্যাদিতে ব্রিটিশ সরকারের নঞর্থক ভূমিকাগুলি উল্লেখিত হয়েছিল। বিশ শতকে পত্রিকাগুলির স্বর আরও উচ্চকিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের মধ্যে আবির্ভূত 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'জাহ্নবী ইত্যাদিতে বয়কট আন্দোলন, লর্ড কার্জনের ঘৃণ্যভূমিকা, কংগ্রেস, দিল্লির দরবারের ভাল মন্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'ভারতী'র ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এরপর গান্ধিজী ভারতে আসেন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, কংগ্রেসের অন্তর্কলহ, স্বরাজ পার্টিগঠন, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল পত্রিকায়। যেমন – 'নব্যভারত', 'বাঙ্গলার কথা', 'সেবা ও সাধনা', 'মাতৃমন্দির', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ইত্যাদি। বিশ শতক থেকে বাংলায় যে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার সমালোচনা করে একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাগুলিতে। ধীরে ধীরে বাংলায় উগ্রপন্থী আন্দোলনের রেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিক-আন্দোলন ধর্মঘট ইত্যাদির সূচনা হয়। বিশ শতকের চল্লিশ

দশক সম্ভবত ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাধিক সমৃদ্ধ অধ্যায়। এই সময়ের পত্রিকাগুলিতে বিশেষত 'মন্দিরা', 'অর্চনা' ও 'মাতৃভূমি'তে এর প্রবল প্রভাব পড়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরালে ধীরে ধীরে এসেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা। কয়েকটি পত্রিকায় কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছিল, যেমন – 'শ্রমিক', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা', 'অর্চনা' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত বলা যায় পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য 'শ্রমিক', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা'-র সম্পাদিকারা সরকার দ্বারা বিবিধ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

আমাদের আলোচিত বহু পত্রিকাই প্রত্যক্ষ কোনও রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা চালিত ছিল। 'ভারতী', 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'জাহ্নবী'-তে বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রচার থাকত। 'নব্যভারত'-এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর নজর দেওয়া হত। চিত্তরঞ্জন দাশ কথিত 'স্বরাজ'-এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রচার থাকত তাঁরই প্রবর্তিত 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায়। আবার চিত্তরঞ্জন দাশের সমালোচনা করে, গান্ধিজীকে প্রবলভাবে সমর্থন করত 'সেবা ও সাধনা'। শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে প্রচার চালিয়েছিল 'শ্রমিক'। বাংলায় ক্রমাগত বাড়তে থাকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা সংঘাত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল 'মাতৃমন্দির'। 'মন্দিরা', 'অর্চনা' ও 'মাতৃভূমিতে গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা, দেশভাগ, ডাক বিভাগের সমস্যা ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে নানা মৌলিক ভাবনা ছিল 'সেবা ও সাধনা', 'রূপরেখা' পত্রিকারও।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিল। ঊনিশ শতক থেকেই সচেতন ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সুস্পষ্ট হতে থাকে। 'ভারতী', 'বালক', 'পুণ্য', 'পরিচারিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়েছিল ঊনিশ শতকে। সাম্রাজ্যবাদের আড়ালে উপনিবেশগুলিতে কিভাবে নিজেদের আর্থিক মুনাফা লাভ করে দেশগুলি, তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে এই পত্রিকাগুলিতে। বঙ্গভঙ্গের উত্তাল তরঙ্গে জন্মগ্রহণ করা 'ভারতমহিলা', 'সুপ্রভাত', 'জাহ্নবী', 'পরিচারিকা-নবপর্য্যায়ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে সমালোচনা করেছিল পত্রিকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পাশ্চাত্য দেশগুলির স্বার্থসংঘাত, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, মধ্যপ্রাচ্যের তেল দখলের লড়াই ইত্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ছিল 'মন্দিরা'য় ।

আমাদের আলোচ্য পত্রিকাগুলির রাজনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল, সেটি হল ভারতীয় মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার। উনিশ শতক থেকে সারা বিশ্বের দেশে দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষিত নারীরাও এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে প্রচার শুরু করেছিলেন। 'ভারতী' 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'পরিচারিকা'-নবপর্য্যায়, 'আন্নেসা', 'নব্যভারত', 'বাঙ্গলার কথা', 'সেবা ও সাধনা', 'মাতৃমন্দির', 'শ্রমিক', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'মুক্ত', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা' ইত্যাদি জোরদার প্রচার করেছিল পত্রিকাগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় – 'অন্তঃপুর', 'ভারত মহিলা', 'সুপ্রভাত', 'পরিচারিকা'-নবপর্য্যায়, 'মাতৃমন্দির', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্রিকার কথা।

দেশ ও সমাজের এই আলোকময়ীরা পত্রিকার আড়ালে একেকটি আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, জড়তাগ্রস্ত বাংলা তথা ভারতীয় সমাজকে নব চেতনা ও নবজীবনবোধে উজ্জীবিত করেছিলেন। দেশের মানব-মানবীরা শিক্ষিত হোক, কুসংস্কার মুক্ত সমাজ নির্মিত হোক, মেয়েরা উন্নত হোক, শিশুরা রোগমুক্ত থাকুক এবং সর্বোপরি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করুক – এই সমস্ত পবিত্র শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল আলোকময়ী কন্যাদের লেখনীতে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক সম্পাদিকার এখনও পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে ব্যক্তিপরিচয় না থাকুক তাঁদের কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে পত্রিকাগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

'সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী' গ্রন্থের শেষে লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবেদনশীল ভঙ্গীতে বলেছিলেন – "এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ নয়। দ্রুত ধাবমান কালের সহিত তাল রাখিয়া নারীরাও চলিতে চাহিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠ মুখর হইয়াছে।।.. উপযুক্ত কর্ম্মী সন্ধানের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে, আমার বিশ্বাস আছে, বাঙালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস একদিন উদ্ঘাটিত হইবে। সে কাজের ভার ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।" (পৃ.৩৪)

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি:

১. এ আর দেশাই, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং কলকাতা, দ্বিতীয় অনুবাদ সংস্করণ, ২০০১

২. গীতা চট্টপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' (১৯০০-১৯১৪) প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা – ১৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৩. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড (১৯১৫-১৯৩০), প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

৪. ঐ, তৃতীয় খন্ড (১৯৩১-১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ, ২০০১

৫. 'বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭ ব.।

৭. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪০১ ব.

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র' (প্রথম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৯ ব.

৯. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪ ব.

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী' বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৫৭ ব.

১১. স্বপন বসু ও মুনতাসীর মানুন (সম্পা) 'দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৫ ।

১২. স্বপন বসু, 'সংবাদ সাময়িক পত্রে ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ', দ্বিতীয় খন্ড, পঃবঃ বাংলা একাদেমি, ২০০৩ ।

১৩. হরিপদ ভৌমিক, 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা', ১ম ও ২য় খন্ড, পুস্তক বিপণি, কলকাতা (১৯৮৭ ও ১৯৮৮) ।

১৪. Bagal Jogesh Chandra, 'Women's Education in Eastern India, the 1st Phase' কলকাতা, 1956.

১৫. Karlekar Malavika, 'Voice from within : early personal narratives of Bengal Women', Delhi, 1991.

১৬. Murshid Gulam, 'The Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905', Sahitya Samsad, Rajasahi University, 1988.

১৭. Sarkar Tanika, ' The Hindu Wife and Hindu Nation : Domesticity and Nationalism in Nineteenth Century Bengal' Studies in History, July-Dec, 1992.

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধারণ বাঙালি পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়
স্কটিশ চার্চ কলেজ

প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে চিত্রিত পরিবারগুলিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজিত করা যায়, যেমন -- অন্ত্যজ পরিবার, সাধারণ বাঙালি পরিবার, বণিক পরিবার, রাজ পরিবার ইত্যাদি। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, জেলে, গোয়ালা, কবি, ধর্মব্যবসায়ী, ভিক্ষাজীবী, সুদখোর মহাজন, শিক্ষক প্রভৃতি মানুষের পরিবারগুলিকে সাধারণ বাঙালি পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মধ্যযুগের সাহিত্যে চিত্রিত এই সমস্ত সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলির অধিকাংশই ছিলো স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ, শালা-শালি, সতীন-জা সম্বলিত বৃহৎ যৌথ পরিবার। পরিবারগুলিতে পারিবারিক শ্রেণী বিভাজনের নিরিখে বিভিন্ন পরিবারিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র রূপ দেখা যায়।

সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলিতে নারী পুরোপুরিভাবে অন্তঃপুরচারিণী ছিলো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারে নারী-পুরুষের মধ্যে সমকর্তৃত্ব চোখে পড়ে। স্ত্রী ছিলো স্বামীর সহমর্মী-মন্ত্রণাদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী, এবং একই সঙ্গে সেবিকাও। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিলো অম্ল-মধুর। দারিদ্র বিজড়িত পরিবারে অবিবেচক স্বামী আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্ত্রী যেমন তাকে কড়া জবাব দিতে দ্বিধা করতো না (দ্বিজ মাধব : মঙ্গলচণ্ডীর গীত), তেমনি পরনারীর প্রতি স্বামীর আসক্তি দেখলে তাকে ভর্ৎসনা করতেও পিছুপা হতো না। ক্রুদ্ধ ঘরণী রীতিমতো তর্জন-গর্জন করে এমন কথাও বলে উঠতো --

'মোর ঘরে আন যদি সেই বনচারী।
পুড়িয়া করিমু ছালি সকল উয়ারি'॥

(আলাওল : সতী ময়না লোর-চন্দ্রাণী, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা।)
স্বামীও স্ত্রীকে দৃঢ় ভাবে জানিয়ে দিতো --

'তান পতি কিঙ্করের তুল্য আমি নহি' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

নারীরা পরিবার প্রতিপালনের জন্য অনেক সময় স্বামীর পাশাপাশি নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জনে অংশ নিতো। গোয়ালা পরিবারের বধূ রাধা পসরা সাজিয়ে দুধ-দই বিক্রি করতো, সেই উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যেমন রয়েছে, তেমনি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কাব্যেও ছদ্মবেশিনী মনসার উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রী ছিলো স্বামীর দুর্দিনের সাথী এবং প্রয়োজনের পরামর্শদাত্রী। কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, রাজা বীরসিংহ রায়ের কোটাল বাঘাই রাজার কাছ থেকে চোর ধরে দেবার জন্য মাত্র ছয় দিন সময় পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে সব বলে এবং স্ত্রীর পরামর্শ নেয়। আবার অনেক সময় স্ত্রীর পরামর্শে চ'লে স্বামী বিপথগামীও হয়। গোপীচন্দ্রের গান কাব্যে রদুনারাণী তার স্বামী গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ঠেকাবার জন্য বান্দি দাসীকে পাঁচশ টাকা দিয়ে যখন পণ্ডিতের কাছে পাঠায়, তখন পণ্ডিত রেগে যায়। কিন্তু 'পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান'। ফলে ব্রাহ্মণী স্বামীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে --

'দিনান্তরে বেড়াও ঠাকুর পাঞ্জি পুস্তক নিয়া।
চাউল মুষ্ঠি কাঁচা কলা না পাও খুঁজিয়া॥
অপনে আসিল পাঁচশ টাকা তোমার দরজায় সাজিয়া।
এইগুলা টাকা জোলা ঠাকুর দেইস আরো ফিরিয়া॥
নেও নেও ঠাকুর মশায় টাকা নেও গণিয়া।
কত লাগে মিথ্যা গণনা আমি দেই লেখিয়া॥'

পণ্ডিত স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হন এবং --

'সুবুদ্ধ ছিল ঠাকুরের কুবোধ লাগাল পাইল।
ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে টাকা হাত করিল॥'

পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো সুস্থ-সুন্দর। স্বামী যেমন স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও অনুরক্ত থাকতো, স্ত্রীও তেমনি গৃহলক্ষ্মী হয়ে স্বামী ও সংসারের সেবায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করতো। এমনকি স্বামীর কাছে থেকে সর্বদা তার সেবা করার জন্য স্ত্রী এমন কথা বলতেও দ্বিধা করত না যে --

'করিব তুমার সেবা সেই সে আমার শোভা
গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ॥' (জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল)

সে যুগে সমাজের রক্তচক্ষু এড়াতে, প্রয়োজনে বামন, রোগী, বেকার, বৃদ্ধ, নপুংসক নির্বিশেষে যেকোন পাত্রের হাতেই বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নির্বিচারে তুলে দিতো

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। মনের মধ্যে নিদারুণ হতাশার যন্ত্রনাকে দমিয়ে রেখেই গৃহ ধর্ম পালন করতে হতো মেয়েদের। মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লিখিত নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এর প্রমাণ মেলে। এই ছিল সাধারণ বাঙালি পরিবারের, বিশেষত অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ভাগ্যলিপি। কখনো তারা আপন দুর্ভাগ্যের জন্য হা-হুতাশ করতো, আবার কখনো স্ত্রী-ধর্ম পালনের নীতিশিক্ষাকে শিরোধার্য করে স্বামীর গরবে গরবিনী হয়ে উঠতো। তারা একাধারে যেমন অপরের সুদর্শন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামীকে দেখে মুগ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে আপন স্বামীর নিন্দে করে মনের জ্বালা মেটাতো, অপরদিকে তেমনি আশৈশব পারিবারিক অনুশাসনে গড়ে ওঠা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বাসের বাঁধন ছিন্ন করতে কখনোই প্রস্তুত হতো না। পরপুরুষের কাছ থেকে কুপ্রস্তাব পেলে তারা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করতো। তখন স্বামীই হতো তাদের কাছে 'আসমানের চান', 'কাঞ্চাসোনা', 'অঞ্চলের ধন'। (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মলুয়া পালা' : মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) কোনো পরপুরুষ তখন তাদের কাছে স্বামীর 'নউখের সমান'-ও নয়।

পরিবারের বধূ অন্যান্য সদস্যদের খুশি রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাশুড়ী ও ননদীর অনুশাসন মেনে চলতে হতো তাদের, কারণ --

'সাসুড়ী ননদ মোর অতি দুরুবার।' (বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

বেশিরভাগ পরিবারেই 'শাশুড়ি হীরার ধার ননদী দুর্জন' হতো। বধূর ওপর থাকতো তাদের সদাসতর্ক নজর। অনেক সময়ে এই পারিবারিক অনুশাসনে স্বামীও সামিল হতো। পরিবারের বধূরাই রান্নাবান্না করে সযত্নে শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী-ননদ-দেওর-ভাসুর প্রমুখ সবাইকে খাওয়াতো। এর কোনরকম অন্যথা হলে অথবা খাবার তৈরিতে বিলম্ব হলে তার কপালে জুটতো তিরস্কার --

'ভাসুর করে কিচিরমিচির দেওরে করে রাগ।
ফোটা তিলক কাইটা হউর সাইজা রৈচে বাঘ॥
খিদার জ্বালায় জ্বইলা মৈল অঙ্গ কুটি কুটি।
সোয়ামী আইসা রাগ কইরা ধ'ল্ল চুলের মুঠি॥'

(দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা : 'মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা', দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অভাবী পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই স্বল্পাধিক ব্যভিচারী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেহেতু সে যুগে বাঙালি পরিবারে একাধিক বিবাহের রেওয়াজ ছিল, সেহেতু স্বামীর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যের বন্ধন বিশেষ দৃঢ় ছিল না। প্রায়শই পরনারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পুরুষ একাধিক বিবাহে উৎসাহিত হয়ে উঠতো এবং ঘরে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্বেও সুন্দরী পরনারীর উদ্দেশ্যে সে অনায়াসে বলতে পারতো --

'আমার গৃহেতে আইস শুন সীমন্তিনী।
তোমারে করিব আমি প্রধানা গৃহিণী॥'
(কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত)

এমনকি আত্মপ্রচারের ভঙ্গিতে এমন কথাও পুরুষ বলে উঠতো --

'চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে
খাসা গুয়া খায় ছাঁচি পান।
সিঁথায় সিন্দুর ভরা সুখের ঘর করে তারা
জঞ্জাল গোদের মাত্র ঘ্রাণ॥
তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লয়ে ঘর করি
উপদেশ মিলাইয়া আনি।' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

সংসারের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ বহুবিবাহে উদগ্রীব, তার নিজের পরণে 'ছেঁড়া টেনা', অথচ সে পরনারীকে সুখে রাখার মিথ্যে আশ্বাস দেয়। অন্যদিকে আবার, সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলিতে কোনোক্রমে কন্যাকে পাত্রস্থ করে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হওয়ায় ছিল অধিকাংশ পিতার লক্ষ্য। এই কারণে অধিকাংশ নারীই নিজের পরিবারে সুখে থাকতো না। কারোর স্বামী কানা বা খোঁড়া বা অসুস্থ, কারুর স্বামী বৃদ্ধ ও কলহপ্রিয়, কারোর বা স্বামী অতিশয় খর্বাকৃতি কুদর্শন। আবার কারোর স্বামী এমনই হতদরিদ্র যে তার সংসারে সদাই অনটন। সবমিলিয়ে নারীদের, বিশেষত বধূ-নারীদের মনের জ্বালা একসময় এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠতো যে তাদের মনে হতো এমন স্বামী-সংসার থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। বধূ তার বৃদ্ধ স্বামীর প্রসঙ্গে এমন কথাও ভাব তো --

'মনোজ আগুনে সখি সদাই পুড়্যা মরি।
হেন স্বামী কাটিয়া বাশুলি পূজা করি॥' (রূপরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল)

এইভাবে সংসারের শাসিত ও বঞ্চিত হতে হতে মানসিকভাবে ন্যুব্জ নারীর মন ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে বহির্মুখী। গোয়ালা পরিবারের বউ নপুংসক আইহন-পত্নী রাধা ক্রমশ সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হতে হতে একসময়ে পারিবারিক বন্ধন ও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততাকে তুচ্ছ করে মনে-প্রাণে কৃষ্ণ-আসঙ্গ কামনা করেছে। বিবাহোত্তর জীবনে অসুখী হওয়ার কারণেই বধূরা ব্যভিচারিণী হয়ে উঠতো এবং অসদুপায়ে আপন মনের বাসনাকে চরিতার্থ করতে তৎপর হতো। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিপালের ঝি ও শিবা বারুই-এর বউ নয়ানীর লাউসেনকে দেখে মনে হয়েছে --

'বৈদেশী কুমার বিনে না রয় পরাণ। বিলক্ষণ বেশে যাব তার বিদ্যমান॥
বিরলে বলিব হিত উপদেশ বাণী। ভুলাইয়া বৈদেশীরে আনিব আপনি॥'

(প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

নয়ানী পরপুরুষ লাউসেনের উদ্দেশে অভিসারে বেরোয়। এমনকি সেইসময় তার শিশুপুত্র সঙ্গ নিলে প্রথমে সে শিশুর প্রতি রুষ্ট হয়, তারপর তাকেও এই অন্যায় অভিসারে সঙ্গে নেয় --

'শুভক্ষণে সুন্দরী বাহিরে দিল পা। পাছু পাছু ডাকে শিশু কোথা যাহ মা॥
এত শুনি হৈল ধনী আগুনের কণা। ঐমনি বেটার গালে দিল দুই ঠোনা॥
পাছু গুড়াইল শিশু ঘরে নাই থাকে। দুগ্ধের বালক চাঁদ নিল বাম কাঁখে॥
নিচুপে নিচুপে শীঘ্র চলিল নয়ানী। মনে শঙ্কা আছে পাছে দেখে ননদিনী॥'

শ্বশুরালয়ে পরিজনদের দুর্ব্যবহারে অস্থির, সতীন-জ্বালায় জর্জরিত, 'ননদিনী সতিনী বচনে উঠে বসে' এমন স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা নয়ানী লাউসেনকে বলে --

'অস্থির আমার মন ঘরে নাই স্বামী। পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাব আমি॥
আজি বাসা নিতে চল মোর অন্তঃপুর। কাটিব তোমার পায়ে শাশুড়ী শ্বশুর॥'

পারিবারিক ব্যভিচারের উল্লেখ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কোটালের প্রতি হীরামালিনীর উক্তিতেও পাওয়া যায়। সে কোটালকে বলেছে --

'লোকের ঝি বহু লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥'

তবে একথা ঠিক যে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বধূ-নারীরা সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেও স্বামী-সন্তান-সংসারের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিবেদিত থাকতো। আবার কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম পরিবারে দেখা যায়, স্বামীর

প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা এতটাই গভীর হতো যে, স্বামীর পাঠানো তালাকনামা হাতে পেয়েও স্ত্রী তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতো --

'আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥'

(শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈমনসিংহ-গীতিকা : দেওয়ান মদিনা, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মৈমনসিংহ-গীতিকার 'দেওয়ান মদিনা' পালায় দুলাল ও তার স্ত্রী মদিনার সুখী সংসারচিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দুলাল যখন কর্দমাক্ত জমিতে চারা ধানের গাছ পোঁতায় ব্যস্ত থাকে, মদিনা তখন তার জন্য ভাত রেঁধে অপেক্ষা করে। ধানের চারা পুঁতে ফিরে এসে দুলাল মদিনার অনেক তারিফ করে। মাঘ মাসের দারুন শীতের ভোরে উঠে দুলাল ক্ষেতে জল দেয়, আর মদিনা তার কাছে আগুন নিয়ে যায়। পর তারা দুজনে মিলে আগুন পোহায়। তারা সাইল ধান মাড়িয়ে তা ঘরে তোলে। তারা বুলবুলির বাচ্চাকে খাঁচায় রেখে যত্নে পালন করে, বিড়াল পোষে। আমের বড়া লাগিয়ে জল দিয়ে সেই চারাকে বাঁচিয়ে রাখে। এইভাবে তারা পরম সুখে দিন কাটায়। স্বামী-স্ত্রীর কী সুন্দর মধুর সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে কাব্য-কাহিনীতে।

ভাই-বোনের সম্পর্কও ছিল মধুর। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকার মলুয়া পালার চাঁদবিনোদ তার বোনের বাড়িতে গেলে বোন তাকে সাদরে আপ্যায়ন করে। প্রথমেই সে তার ভাইকে চুন-খয়ের দিয়ে সাচি পান দেয়, আর সেইসঙ্গে 'উত্তম সাইলের চিঁড়া' আর 'শবরী কলা' খেতে দেয়। তারপর সে চাঁদবিনোদকে তামাক ও টীকা দেয়। বিনোদ তার বোনকে সব কথাই বলে, অথচ লজ্জায় মলুয়ার প্রতি তার মনের দুর্বলতার কথা সে বলতে পারে না। তবুও তার বোন ভাইয়ের মনের কথা বুঝতে পারে। অপরদিকে, মলুয়া যখন আত্মহত্যার জন্য ঘাটে যায়, তখন তার পাঁচ ভাই তাকে 'সোনার পানসী' করে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসতে চায়। দুষ্ট দেওয়ানকে মেরে অপহৃতা বোনকে উদ্ধার করার পর স্বজনেরা মলুয়াকে অসতী বলে চিহ্নিত করলে পাঁচ ভাই তাদের প্রাণের বোনকে অভয় দিয়ে বলে --

'ভাত-কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও।
বাপের বাড়ি থাকবা তুমি পরম সুখী হইও॥'

বোনকে তারা সব রকম সুখ দিতে প্রস্তুত। আবার বাপের বাড়িতে কন্যা ছিল 'মায়ের নয়নতারা নয়নের মণি'। এমনকি পরিবারে 'পাঁচ ভাইয়ের থাইক্যা কন্যার ছিল দর'।

কিছু ক্ষেত্রে আবার বধূর প্রতি শাশুড়ীর স্নেহের চিত্রও চোখে পড়ে। মৈমনসিংহ-গীতিকার মলুয়া পালায় আত্মহত্যার রত বধূ মলুয়ার জন্য শাশুড়ীকে ব্যাকুলভাবে ছুটে আসতে দেখা যায় --

'দৌইড়া আইল শ্বাশুরী আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনীর বেশ॥
শুন গো পরাণ বধূ কইরা বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে॥
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবা রাতি॥'

লোচনদাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' শাশুড়ী-বধূর মধুর সম্পর্ক চোখে পড়ে। সর্প আঘাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হলে লক্ষ্মীসমা বধূর মৃত্যুতে শচীমাতা বিলাপ করে বলে ওঠেন --

'আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি।
আমারে না খাইলে কেনে জীত বধূ খালি॥'

বধূর বিহনে শাশুড়ির মনে হয়েছে --

'আজি হৈতে শুন্য হৈল মোর গৃহবাস।'

বধূও স্বামীর অনুপস্থিতিতে শাশুড়ীকে সযত্নে দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণে দ্বিধা করত না। এমনকি বৃদ্ধা শাশুড়ীকে একা ফেলে রেখে ভাইদের সঙ্গে বাপের বাড়ি যেতেও তার মন চাইতো না --

'মা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চভাই
শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্ম্ম আমি চাই।'

(লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল, শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ)

মুসলিম পরিবারেও বধূর যথেষ্ট মর্যাদার ছিল। শাশুড়ী-ননদীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিলো ভালো। শাশুড়ী-বধূর মধুর সম্পর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'লালমতি সয়ফুলমুলুক' কাব্যে বলেছেন --

'দুর্লভ পুত্রের বধূ শাশুড়ীর প্রাণ।
সহস্র দুহিতা নহে বধূর সমান॥
পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল।

বধূ সুখে নিজ গৃহে প্রচণ্ড উজ্জ্বল॥
জননী পালয় কন্যা বহু যত্ন করি।
শাশুড়ী নিকটে বঞ্চে বহু মান্য ধরি॥
নিরন্তর দেখি বধূ জুড়ায় নয়ন।
বৃদ্ধকালে পুত্রবধূ করয় পালন॥'

পিতা-মাতার কাছে স্বভাবতই সন্তান ছিল প্রাণাধিক প্রিয়। মলুয়া পালায় দেখা যায়, মলুয়ার মা কন্যার দুর্দশার কথা শুনে তিনদিন যাবৎ অন্ন ত্যাগ করেন, ত্রিরাত্রি ঘরে সন্ধ্যাবাতি না জ্বালিয়ে তিনি কন্যার কথা ভেবে কেবল কাঁদতে থাকেন। কন্যা যেমন 'ঘরের ঈশ্বরী' (লোচনদাস ঠাকুর : শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল), তেমনি পুত্রের শ্রীমুখ দেখেও পিতা-মাতা 'আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ' (বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত, সুকুমার সেন সম্পাদিত)। ধনোপার্জনের জন্য পুত্র পরদেশে যেতে চাইলে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে --

'ধন-উপার্জ্জনে পরদেশ যাবে তুমি।
তোমারে না দেখি এথা মরি যাব আমি॥
জল বিনু যেমন মীনা না ধরে পরাণ।
তোমা বিনু আমার তেমন সমাধান॥'

(লোচনদাস ঠাকুর : শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল)

ছেলেও পরদেশ যাত্রার আগে মায়ের কথা ভেবে স্ত্রীকে বলে যায় --

'মাতার সেবায় তুমি রহিবে তৎপর॥'

প্রাগাধুনিক কাব্যগুলির সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলিতে দেখা যায়, মোটের ওপর পরিজনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ভালো। ভাই ভাইয়ের কাছে ছিল 'জীবনধন' (জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। আবার, দুষ্টের ছলনায় প্রভাবিত হয়ে মামা তার বাড়িতে আশ্রিতা ভাগ্নীকে কলঙ্কিনী জ্ঞান করে বের করে দিতে চাইলেও মামী তা মানতে নারাজ --

'সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত কুমারী।
কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি॥'

(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকা : দেওয়ানা মদিনা)

সুতরাং প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে চিত্রিত সাধারণ বাঙালি পরিবারে কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত নিম্নস্তরের কিছু অভাবী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক

সম্পর্কের শৈথিল্য দেখা গেলেও, সাধারণ শিক্ষিত ও কিছু সচ্ছল পরিবারগুলিতে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ভালো। সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় যাপিত হতো তৎকালীন সাধারণ বাঙালি পরিবারজীবন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বিজয় গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ, শ্রী প্যারীমোহন দাসগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

২. রামাই পন্ডিত : শূন্যপুরাণ, শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৩. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : শিবায়ন, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৪. রামেশ্বর ভট্টাচার্য : শিবসঙ্কীর্তন, রামেশ্বর রচনাবলী, শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য -পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

৬. নারায়ন দেব : পদ্মাপুরাণ, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. দ্বিজ বংশীদাস : পদ্মাপুরাণ, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

৮. শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত শাক্ত পদাবলী, দশম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৯. জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ ও অধ্যাপক ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, মলুয়া পালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১১. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকা, মলুয়া পালা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ।

১২. দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত মৈমনসিংহ গীতিকা, দস্যু কেনারামের পালা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৩. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৪. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল : বাংলার সামাজিক ইতিহাস, উদ্ধৃত মুহম্মদ আব্দুল জলিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত সতীময়না লোর-চন্দ্রানী : আলাওল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

১৬. রূপরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, ভারবি সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৭. জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।

১৮. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ অবলম্বনে আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

১৯. বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

২০. ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল, অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র সম্পাদিত, বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২১. লোচন দাস ঠাকুর : শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৪৪ গৌরাব্দ।

২২. বিষ্ণুদাস আচার্য : সিতাগুণকদম্ব, হৃষিকেশ বেদান্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

২৩. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত মৈমনসিংহ-গীতিকা, দেওয়ানা মদিনা, (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)।

২৪. আহমদ শরীফ : ষোড়শ শতকে বাংলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, উদ্ধৃত মুহম্মদ আব্দুল জলিল, (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)।

রবীন্দ্রভাবনায় কালিদাসের সাহিত্য কৃতির সম্পর্ক অনুসন্ধান

সুকন্যা সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, কান্দি রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: *মহাকবি 'কালিদাস' প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, আর বিশ্বকবি 'রবীন্দ্রনাথ' আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ের সাহিত্যক্ষেত্র পৃথক। একজনের অবদান সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়, অপরজনের দান বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য। মহাকবি কালিদাসের অমর রচনাসম্ভারের বর্তিকা হাতে করে অধুনা তিমিরাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে প্রবেশ করে, সেই বর্তিকার আলোয় উদ্ভাসিত সেকালের সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জীবনযাত্রা, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নগর-জনপদ, তপোবন ও রাজসভার অভিজ্ঞতা নৈপুন্যের সঙ্গে আহরণ করে আপন সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে সার্থক প্রকাশ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে মহাকবির কাছে ঋনী বিশ্বকবি। রবীন্দ্র জীবনে কালিদাসের প্রভাব এতটাই যে, মহাকবিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বিশ্বকবিকেও সম্পূর্ণ অনুভব করা যাবে না। আলোচ্য গবেষনাপত্রে রবীন্দ্রভাবনায় কালিদাসের সাহিত্যকৃতির সম্পর্ক অনুসন্ধানের সামান্যতম প্রয়াস করা হয়েছে।*

মূল শব্দ: *মহাকবির সাহিত্যসম্ভার, বিশ্বকবির সাহিত্যসম্ভার, বিশ্বকবির কাব্যে মহাকবির প্রতিচ্ছবি, উভয়ের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা।*

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাকাশের অতি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন কবিকুলচূড়ামনি কালিদাস। 'কালিদাস' শব্দটি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের দ্যোতক নয়, এক সুবর্ণযুগের সূচক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-আদিকবি বাল্মীকির পরে যাদের নাম তুল্যশ্রদ্ধায় সমাদৃত তাদের মধ্যে অন্যতম কালিদাস। অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের ক্ষেত্রে যেমন, কালিদাসের ক্ষেত্রেও তেমনই ব্যক্তিগত জীবনইতিহাস রহস্যাবৃত। অতীতের কোন্ শুভলগ্নে ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে এই মহাকবি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা এই একবিংশ শতাব্দীতেও অবসান হয়নি।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি বলেছেন –

''হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল''।।

মহাকবি কালিদাসের অবদান সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। তিনি একাধারে দৃশ্য কাব্য রূপে মালবিকাগ্নিমিএম্, ‘বিক্রমোবর্শীয়ম্’, ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ আবার গীতিকাব্যরূপে ‘ঋতুসংহার’, ‘মেঘদূতম’ এবং মহাকাব্যরূপে ‘রঘুবংশম্ ও ‘কুমারসম্ভবম্ সহৃদয় পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন। ভাষার লালিত্য, বর্ণনার বৈচিত্র্যতার, ভাবের ব্যঞ্জনায়, ছন্দের মাধুর্যে মহাকবি কালিদাস অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রভাবনায় কালিদাসের সাহিত্যকৃতির প্রভাব অতুলনীয়।

ব্রিটিশশাসনাধীন ভারতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আবির্ভূত রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, নাট্যকার, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক। ‘কবিগুরু’, গুরুদেব’, ‘বিশ্বকবি’ ইত্যাদি অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা হয়। ভাবগভীরতা, গীতিধর্মীতা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বকবির ‘৫২টি কাব্যগ্রন্থ’[১], ‘৩৮টি নাটক’[২], ’১৩টি উপন্যাস’[৩], ‘৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন’[৪], তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তা প্রকাশিত হয়।

কালিদাসের কাব্যের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শৈশবেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমন্ডলেও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা তথা কালিদাস চর্চার আবহ ছিল। তাঁর দুই ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। অন্য ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন নাটক। শিশু রবীন্দ্রনাথ ও কণ্ঠস্থ করেছিলেন কালিদাসের একাধিক কাব্য। শিশু বয়সের কাব্যচর্চা থেকেই মহাকবি, বিশ্বকবির অন্তরে বিরাজমান। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন – ‘’কালিদাসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। বাল্যকাল হইতেই যে কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতার দিগন্তরে যে সমস্ত মহাশিখর, জাগ্রত, কালিদাস তাঁহাদের উচ্চতম। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহা হইতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।’’

রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব ও তাঁর কাব্যের প্রতি মুগ্ধতা ‘বনফুল’ কাব্য থেকে লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের নায়িকা ‘কমলা’ যেন ‘শকুন্তলার’ আদর্শে গড়া। রবীন্দ্রমননে কালিদাস যেন শাশ্বত, চিরন্তন সৌন্দর্যবোধের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

কালিদাসের কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন মত উদ্ধৃত নির্বাচন করে আপন রচনাকে অলংকৃত করেছেন, আবার কোথাও বা কালিদাস কথিত নীতিকথাকে স্মরণ করেছেন।

কালিদাস বলেছেন – *'ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ –*

র্নবাম্বুর্ভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।

অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ

স্বভাব এবৈষ পরোপকারিনাম্।।''[৬] *(৬/১২)*

অর্থাৎ বৃক্ষসমূহ ফলসমাগমে স্বতঃই আনত হয়। মেঘমালা নূতন জলভারে অনেকদূর পর্যন্ত নিম্নগামী হয়। প্রকৃত সজ্জন ব্যাক্তি সর্বদা বিনীত থাকেন, পরোপকারীদের এটাই স্বভাব।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' তে এই একই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ''যে ব্যক্তি স্বভাবত বড় মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে একথা পুরানো হইয়া গিয়াছে।''

কালিদাসের কোনো কোনো উক্তিকে গ্রহণ করার মতোই কালিদাস বর্ণিত মনোরম চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। মেঘদূতের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' এই শ্লোকাংশে যক্ষবধূর অনুকরণে লেখেন –

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন,

বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,

অযত্নশিথিল বেশ,

সেদিন ও এমনিতর অন্ধকার দিন।

আবার কখনও বা কুমারসম্ভবে বর্ণিত নন্দীর চরিত্রের অনুকরণে লেখেন –

'' ও যেন শিবের তপোবন দ্বারের নন্দী

দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।''

কালিদাসের কাব্যে অনুপ্রানিত হয়ে এরকম অজস্র উদাহরণের প্রয়োগ বিশ্বকবি তার কাব্যে ঘটিয়েছেন।

চৈতালি কাব্যে কালিদাসের স্মরণে তিনটি কবিতা বিশ্বকবি লিখেছেন – ঋতুসংহার, কালিদাসের প্রতি এবং মানসলোক।

মহাকবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'মেঘদূত' বিশ্বকবির মনকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে তিনিই উক্তকাব্যের ভাব, ভাষা আর বর্ণনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একাধিক কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিচিত্র প্রবন্ধে'র অনেকগুলি প্রবন্ধে রয়েছে বর্ষার কথা,

মেঘদূতের কথা তো আছেই। 'প্রাচীন সাহিত্যে' আছে মেঘদূতের সমালোচনামূলক নিবন্ধ। 'লিপিকার মধ্যে রয়েছে মেঘদূতের প্রবন্ধ, পুনশ্চ গদ্যকাব্যের মধ্যেও 'বিচ্ছেদ' শীর্ষক কবিতাটিতে মেঘদূতের কথাই আছে। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী'র মধ্যেও মেঘদূতের প্রবন্ধ এসে পড়েছে। তাছাড়াও রয়েছে অনেকগুলি কবিতা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের যেমন মেঘদূত, বর্ষামঙ্গল, একাল ও সেকাল, বর্ষার দিনে, স্বপ্ন ইত্যাদি। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি বাংলা ভাষায় রচিত কালিদাসের মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। 'মেঘদূত' কবিতাটি যেন বিশ্বকবির তাঁর প্রিয় কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ সমালোচক এডওয়ার্ড থম্পসন বলেছেন –

> *" the poem in his first tribute to kalidasa – The first tribute has the impressive charm at confidence The poet, aged twentynine, knows that he is India's greatest poet since kalidasa. If the dead know of such things, the great spirit honoured by this splendid tribute must have been glanddened."*[৭]

বিচিত্রা প্রবন্ধে 'নববর্ষা' ই শ্রেষ্ঠ। 'পূর্বমেঘ' তাঁর কাছে অচেনা দুনিয়ার স্বেচ্ছাবিহারের বিলাস আর 'উত্তরমেঘ' চিরমিলনের উচ্চাভিলাষ'। মেঘদূতের জগৎ ভোগে ও ঐশ্বর্যে দ্যুতিময়, ইন্দ্রিয়ও বিলাসে ভরপুর। কাল্পনিক দেবনিবাস অলংকার বর্ণনায় ভারতের বিশাল ভৌগলিক পরিচয়ের বর্ণনাই মেঘদূত অনবদ্য। মনুষ্যনির্মিত ঐশ্বর্যের যে অপূর্ব সমন্বয় কালিদাসের মেঘদূতে ঘটেছে, তার তুলনা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জগতে মেঘদূতেরই প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল। মেঘদূত সৌন্দর্যের অনাবিল প্রদর্শনী। এ সৌন্দর্য বস্তুর বহিরঙ্গের, মানব-মানবীর যৌবনের আর এক প্রকৃতির অনন্ত সচ্ছলতার। এই সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে মহাকবির মেঘদূতের সমালোচনা করতে গিয়ে বিশ্বকবি তাঁর উপাদান সৃষ্টি করলেন এক অভিনব মেঘদূত যা ভাবে, ভাষায় বাক্যবিন্যাসে কালিদাসের মেঘদূতের পর্যায় নিঃসন্দেহে স্থান পাবার যোগ্য। ''আবার সেই ভারত খন্দটকুর নদী, গিরি, নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটা শোভা, সম্ভ্রম, শুভ্রতা আছে। এগুলির মধ্যে প্রবেশ করবার যদি পথ থাকিত, তবে এখনকার চারদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত''।[৮]

''ঋতুসংহার' মহাকবির প্রস্তুতি পর্বের কাব্য। প্রথমদিকের অপরিণত বয়সের রচনা হলে ও কবির রচনাভঙ্গীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাতে সুস্পষ্ট। আবেগের ফল্গুধারায় ষড়ঋতু বর্ণনা সরস হয়ে উঠেছে। বিশ্বকবি কল্পনা কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার' এবং 'মেঘদূত' উভয়কাব্যেরই ভাবানুবাদ এবং আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। বিশ্বকবির এ কবিতা পাঠ করতে গিয়ে আজকের নুতন ভারতের সহৃদয় পাঠক অতীতের উজ্জয়িনীর নববর্ষা সমারোহ উৎসবে যোগ দিয়ে প্রচুর আমোদ প্রমোদ উপভোগ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য এমনভাবে অন্য কোনো সাহিত্যে আছে বলে মনে হয় না। এতে বর্ষার সমস্ত অন্তবেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হয়ে গেছে। কবি কল্পনা করেছেন, কালিদাসও কোন এক বর্ষণমুখর সময়ে বিরহকাতরা হয়ে রচনা করেছিলেন এই বিরহকাব্য। রবীন্দ্রনাথ তাই তো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন –

'' আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশমরত্ন নবরত্নের মালে।।''

মহাকবি কালিদাসের প্রায় সকল কাব্য এবং নাটকের পটভূমি হলো তপোবন। মহাকবির বিভিন্ন রচনায় বিচিত্র এই তপোবন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত হৃদয় জুড়েছিল। প্রাচীন ভারতের তপোবন শান্ত, স্নিগ্ধ এবং পবিত্র পরিবেশ বিশ্বকবিকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, সেই তপোবনেরই প্রতিচ্ছবি করে তিনি সৃষ্টি করছেন শান্তিনিকেতনে ব্রক্ষচর্যাশ্রম। কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ঋষি বশিষ্ঠের তপোবন এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পটভূমিরূপে চিত্রিত মহর্ষি কন্বের আশ্রমের বর্ণনা থেকে উপকরণ আহরণ করে বিশ্বকবি তাঁর চৈতালী কাব্যের 'তপোবন' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন।

কালিদাসের তপোবন কেবলমাত্র যে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল তা নয়, মহাকবির আর্দশ রাজচরিত্রও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহাকবি কালিদাসের রাজাদের মত বিশ্বকবির রাজা ও রাজ্যশাসনকে তপস্যার মত গ্রহণ করে সার্থকতার সঙ্গে প্রজাপালন করে, বার্ধক্যে সকল ভোগ – ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে ধর্মাচরনের জন্য বনে গমন করেছেন –

'ত্যজি রাজ্য সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত''

মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যেও নাটকে প্রকৃতি ও মানুষের যে একটা নিবিড় প্রীতি ও সৌহার্দ স্থাপন করেছেন তার ও প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং বিশেষভাবে ছোট গল্পে মানুষ ও ঘটনার সাথে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তা কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার প্রভাবপুষ্ট বলে মনে হয়। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরীতে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ এ' মহাকবি প্রসঙ্গে বিশ্বকবি লিখেছিলেন –

"মনে আছে বহুকাল হল রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। বেশ বুঝলুম এসব কাব্য আমি যেরকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর কেউ তেমন করে পড়েনি।" কালিদাসের কাব্য জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সুগভীর একাত্মতা তা এই মন্তব্যের দ্বারা নির্দেশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কালিদাসের সমালোচনার বৈশিষ্ট্যর কথা বোঝাতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন – " কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা উদ্বোবিত ও পরিপুষ্ট করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কাব্যগুলির ভিতরে নিজের ভাবধারা আরোপিত করিয়া নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে যে কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্প্রসারনের দ্বারা গভীর করিয়া তুলিয়াছেন, যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে তাহাকে কালিদাসের পরিবেষ্টনীর ভিতরেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস তাঁর মনের তারে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন তাহা এত যুগের বায়ুকম্পনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের তারে নূতন নূতন ঝংকার দিয়াছে। এসুর অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর, কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হইতে নেপথ্যসংগীত রচনা করিতেছেন। সেই নেপথ্যসঙ্গীতের সহিত গভীর সঙ্গতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর ও একটা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে।"[৯]

অঙ্কে শায়িত সন্তানের মতো কালিদাস কৃত সমগ্র দৃষ্টিকে বুদ্ধিদীপ্ত, শ্রুতিমধুর ও সুললিত ছন্দে লালন পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সৃষ্টিকার্যে বারংবার উদ্দীপ্ত হয়েছি আমরা। রবীন্দ্রনাথের অমরসৃষ্টি ব্যাপ্তি লাভ করেছে, বিশ্বচরাচরে, গ্রহণীয় হয়েছে মানস-মনে।

তথ্যসুত্র :

১. চক্রবর্তী, শুভঙ্কর (সম্পা)। সর্বজনের রবীন্দ্রনাথ। কলকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃষ্ঠা – ২৫

২. তদেব, পৃষ্ঠা – ২৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩১

৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৩

৫. রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ

৬. বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.)। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। কলকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০5। পৃষ্ঠা – ৩৬৫

৭. ভট্টাচার্য, শ্রীবিষ্ণুপদ। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথঃ তুলনাত্নক সমীক্ষা। কলকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮। পৃ – ৩

৮. প্রাচীন সাহিত্য

৯. ত্রয়ী, ১৮৩

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে সম্পর্কের জটিল জাল

ললিতা রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
স্কটিশ চার্চ কলেজ

স্বাধীনতা উত্তরকালে কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় কিশোর ও প্রাপ্তমনস্কদের একটি পরিচিত নাম ব্যোমকেশ বক্সী। তাঁর স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরই পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। ব্যোমকেশ দেখা দিলেন, সেই জাতীয় গোয়েন্দা হিসেবে। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কালপর্বে ব্যোমকেশ বক্সীর ৯ টি কাহিনিই মানের দিক থেকে আন্তর্জাতিক। প্রথম আবির্ভাবেই 'সত্যান্বেষী' তাঁর নিজস্ব বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানা নিয়ে আপামর বাঙালি পাঠকের রহস্য ও গোয়েন্দাকাহিনির চাহিদা তৃপ্ত করেছিলেন। শুধু কাহিনির মৌলিকতা গুণেই নয়, অপরাধ ও অপরাধীর বৈশিষ্ট্যে, সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েনে, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেশ কালের বাস্তবতা বাংলা গোয়েন্দাকাহিনিকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিল। আমরা এ পর্বে আলোচনা করবো 'শজারুর কাঁটা' এবং 'দুর্গরহস্য' – যে দুটি কাহিনিতে সম্পর্কের জটিল জাল – গোয়েন্দাকাহিনিকে তরান্বিত করেছে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সত্যান্বেষী গল্পের মাধ্যমে ব্যোমকেশের গোয়েন্দাগিরির জগতে আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল – 'পথের কাঁটা', 'সীমন্তহীরা'। আমাদের আলোচ্য 'দুর্গরহস্য' ও 'শজারুর কাঁটা'-র প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৫২ এবং ১৯৬৭। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুমেয়। বহু উপন্যাসে তিনি পাঠককে ইতিহাসের রোমান্সের মধ্যে প্রবেশ করালেও গোয়েন্দাকাহিনিতে তিনি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন সমসাময়িক যুগপট। ব্যোমকেশ সিরিজের গল্পগুলিতে যেটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্য সেটি হচ্ছে গল্পগুলির কেন্দ্রিয় বিষয় 'খুন'। খুনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার এবং সম্পত্তিকেন্দ্রিক। তাতে সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং ব্ল্যাকমেলিং যুক্ত। কাহিনিগুলিতে বিচিত্র ধরনের পাপ, অপরাধ ও অপরাধীর ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টতই দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে সৎ, নির্লোভ, বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেও যে অপরাধের বীজ সুপ্ত থাকে সেটি অসামান্য মুন্সিয়ানা অঙ্কন করেছেন

লেখক। গোয়েন্দাগিরির মধ্যে দিয়ে রহস্যের জাল ভেদ করতে গিয়ে কখনো কখনো অজান্তেই মানব অস্তিত্বের সংকটটুকু আবিষ্কৃত করেছেন তিনি। পাঠকও গোয়েন্দা গল্পের লঘু মজা পেতে পেতে হঠাৎই গম্ভীর ও মৌন হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের টানাপোড়েন। গল্পে গোয়েন্দার কৌশলে একজন ক্রিমিনাল ধরা পড়ে যাচ্ছে, প্রায়ই তার আইনি শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে, ক্কচিৎ সে পালিয়ে বাঁচছে, কখনো আত্মহত্যা করছে। অপরাধী চিহ্নিত হচ্ছে। পাঠক এবং সামাজিক মন নিশ্চিন্ত – গোয়েন্দা গল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

'দুর্গরহস্য' গল্পে মূলত বনেদী পরিবারের সম্পত্তিকেন্দ্রিক জটিলতার কথা আছে। তিন পুরুষ ধরে কাহিনি বিধৃত। ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যবহার রয়েছে। এই কাহিনিতে ব্যোমকেশের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণধর্মী, মস্তিষ্কচালিত। কাহিনিতে অপরাধের প্যার্টান বিচিত্র। মণিলালের বিচিত্র অপরাধে কাহিনিটি পরিপূর্ণ। হাঁড়ি করে সে সর্প নিক্ষেপ করেছে। তীক্ষ্ণ ফাউন্টেন পেনে সাপের বিষ ভরে অস্ত্র হিসাবে তাকে ব্যবহার করেছে। মণিলাল বহুরূপী চরিত্র। পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।

অপর কাহিনিটি 'শজারুর কাঁটা'। কাঁটা সিরিজের দ্বিতীয় গল্প। কাহিনি দাম্পত্যসংকট কেন্দ্রিক। ব্যোমকেশের কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাপ্তমনস্ক কাহিনি। সম্পর্কের টানাপোড়েন রয়েছে গল্পের মূলে। গল্পের বাড়তি পাওনা মেডিকেল সায়েন্সের আশ্চর্য ব্যবহার। হৃৎপিন্ডের অবস্থান বুকের ডানদিকে। গোয়েন্দা-রহস্যগল্পের সাফল্যের মাত্রা অপরাধ এবং অপরাধকর্মের পদ্ধতির জটিলতার সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ সম্পর্কের জটিলতা যত বেশি; আপরাধের পাশ্ববর্তী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধের শাখা প্রশাখা যত ঘননিবদ্ধ এবং গোয়েন্দার অনুসন্ধান পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম, অভিনব – গোয়েন্দা গল্পের রস-উপভোগ ততই গাঢ়। এদিক থেকে 'দুর্গরহস্য' ও 'শজারুর কাঁটা' অসাধারণ সফল–

'দুর্গরহস্য'-র সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল মূল রহস্যের আবর্তে জড়িত ব্যক্তিগুলি (দু-একজন পরিবারের বাদে) সবাই এক পরিবারের অন্তর্গত। মূল ঘটনার চারপাশে প্রায় সবাই একই প্রজন্মের ব্যক্তি হলেও রহস্যের উৎস ও সমাধানের কালসীমা কয়েক প্রজন্মে বিস্তারিত। দুর্গের আদিপুরুষরা হলেন জানকীরাম তার পরবর্তী প্রজন্মরা হল রাজারাম ও জয়রাম। সিপাহি বিদ্রোহের সময় সিপাহিরা যখন জয়রামদের দুর্গ লুট করতে উদ্যত তখন রাজারাম উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিবারের অন্য

সবাইকে পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল পরগনায় স্থানান্তরিত করে নিজেরা দুর্গের মধ্যে অজ্ঞাত স্থানে সঞ্চিত ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখলেন,

> "পিতাপুত্র মিলিয়া সঞ্চিত সোনা লুকাইতে প্রবৃত্ত হলেন। ...তারপর দুর্গের মধ্যে কি হইল কেহ জানে না।"

দুর্গের বাইরে ঝোঁপজঙ্গল, পরিত্যক্ত কামান ও দুর্গের মধ্যে পাথর ছাড়া আর কিছুই সিপাহি আক্রমণে অবশিষ্ট থাকেনি। জানকীরাম-রাজারামের পরবর্তী ষাট বছর এই বংশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বংশের দুই যুবক রামবিনোদ ও রামকিশর সিংহ (দুই ভাই) পুনরায় কেল্লার পার্শ্ববর্তী শৈলগৃহে পরিবারসমেত বসবাস করলে এই সময়েই রহস্য ঘনীভূত হয়। পারিবারিক সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে বিরোধের জোরে এবং দুর্গকে কেন্দ্র করে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কাহিনির এই রঙ্গমঞ্চে বাইরে থেকে প্রবেশ করেছে ব্যোমকেশ বক্সী। প্রবেশের অব্যবহিত কারণ ইতিহাসের অধ্যাপক ঈশান মজুমদারের দুর্গের মধ্যে রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান। কাহিনির পটভূমিকায় আছে শত্রু সৈন্যদলের দুর্গ আক্রমণ এবং দুর্গ আক্রমণ করে চলে যাওয়া।

কাহিনির শুরু হয়েছে সাঁওতাল পরগনার পাহাড় ঘেরা দুর্গে ব্যোমকেশের তদন্তে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। অধ্যাপকের মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে ব্যোমকেশ প্রথমেই পরিচিত হয় রামবিনোদ-রামকিশোরের পরিবারের সদস্যের সঙ্গে। নীচে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের বিশেষ চারিত্রিক পরিচয় এবং উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার পরিচয় দেওয়া হল -

বড়োভাই : রামবিনোদ ইনি বেশিদিন বাঁচেননি, যৌবনকালেই রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল।

ছোটোভাই : রামকিশোর। স্ত্রী গত হয়েছে।(পুত্রগণ ও জামাতা-কন্যা বর্তমানে মৃত)।

বড় পুত্র বংশীধর : দুর্দান্ত ক্রোধী, বহরমপুর কলেজে ঈশান ঘোষের তত্ত্বাবধানে পড়ত। কয়েক মাসের মধ্যে কলেজে কী এক দুষ্কর্ম করায় তাকে কলেজ ছাড়তে হয়। রামকিশোরের বাল্যবন্ধু অধ্যাপক ঈশান ঘোষ ব্যাপারটিকে চাপা দেন। বর্তমানে জমিদারি তত্ত্বাবধান করে। স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুর পর বংশীধর আরও ভয়ানক প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল।

পুত্রবধূ : বিবাহের কয়েক মাস পরেই বধূর খাদে পড়ে রহস্য জনক মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পুত্র মুরলীধর : বংশীধরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোটো, গিরগিটির মতো রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা, ট্যারা চোখ। স্বভাবে ধূর্ত। জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। চরিত্রও

বংশীধরের বিপরীত। রাগী নয়, মিটমিটে শয়তান। বাবা বিয়ে দেয়নি। খাস চাকর গণপৎ-কে নিয়ে দুষ্কর্ম করে বেড়ায়।

কন্যা হরিপ্রিয়া : মুরলীধরের চেয়ে বছর চারেকের ছোটো শারীরিক বিকলতা নেই। চোখের দৃষ্টি বিষমাখানো। ঈর্ষাকাতর স্বভাব। সকলের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াত। বংশীধরের বধূকে পদে পদে অপদস্থ করত। লেখাপড়া শেখেনি। তদন্তে বার হয় পুত্রবধূর মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হরিপ্রিয়া। বিয়ে হয়েছিল মণিলালের সঙ্গে। সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় হরিপ্রিয়ার।

জামাতা মণিলাল : চাপা প্রকৃতির যুবক, দরিদ্র, ঘরজামাই। শ্যালকরা ঠাট্টা করলে হরিপ্রিয়া অসন্তুষ্ট হত। ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করত। হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কন্যা তুলসীর সঙ্গে মণিলালের বিবাহের কথা হয়েছিল।

হরিপ্রিয়ার পরবর্তী দুটি ভাইবোন-

কিশোর গদাধর : হাবলা গোছের। বয়স অনুপাতে অপরিণত বৃদ্ধি। হিহি করে কেবল হাসে; লেখাপড়ায় মন নেই। গুলতি নিয়ে বনে পাখি শিকার করে। ছোটবোন তুলসী নিত্যসঙ্গিনী।

সর্বকনিষ্ঠা তুলসী : ছিপছিপে শরীর, পাতলা মুখ, চঞ্চলা প্রকৃতির। অন্যসব ভাইবোনের বাড়ির অনেক গোপন তথ্য ব্যোমকেশকে জানিয়ে তদন্তে সাহায্য করেছিল। রামকিশোরের পোষ্য রমাপতির (গৃহশিক্ষক) প্রতি অনুরক্ত।

পোষ্য রমাপতি : দুঃস্থ স্বজাতি; রামকিশোরের বাড়ীতে আশ্রিত তুলসী, গদাধরের গৃহশিক্ষক। লাজুক প্রকৃতির। তুলসীকে মনে মনে ভালোবাসে। ব্যোমকেশের জেরার মুখে এমন কিছু তথ্যের সন্ধান দেয়, যার ফলে রহস্য উদ্ধারে সুবিধা হয়েছিল।

ব্যোমকেশ বক্সী তদন্তে নেমে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন-

- রামবিনোদের পরিবারে প্রায়ই সর্পাঘাতে মৃত্যু বা অপঘাতে মৃত্যু লেগে থাকে।
- প্রফেসর ঈশান ঘোষ শুধু হাওয়া বদল করতে দুর্গে আসেননি। এসেছিলেন অন্য কিছুর সন্ধান করতে। কিছু গুপ্ত তথ্য জেনে যাওয়ায় কে বা কারা প্রফেসরকে দুর্গ থেকে তাড়াতে চেয়েছিল সাপের ভয় দেখিয়ে। পরে সর্পাঘাতেই তার মৃত্যু হয়।
- ঈশান ঘোষের ডায়েরিতে এমন কিছু ‘কথা’ লেখা যার সূত্র ধরেই ব্যোমকেশ রহস্য সমাধান করেছেন। উদাহরণ –

১। "ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন তবে তিনি মহরমের বাজনার ছন্দে বলিতেন— ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!"

২। "রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।"

৩। "বংশীধর এক মারাত্মক কেলেংকারি করিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।"

৪। "দুর্গে গুপ্তকক্ষ দেখিতে পাইলাম না।... নিশ্চয় কোথাও গুপ্তকক্ষ আছে। কিন্তু কোথায় ?"

৫। "কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া দুর্গ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বংশীধর? আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়িব না।"

এরপর প্রফেসরের ডায়েরিতে শেষ লেখা-

> *"বাংলা ভাষায় লেখা নয়, উর্দু কিংবা ফারসীতে লেখা তিনটি পংক্তি। তাহার নীচে বাংলা অক্ষরে কেবল দুইটি শব্দ - মোহনলাল কে?"*

উপরি উল্লেখিত সবকটি তথ্য থেকেই গ্রন্থিমোচনের মাধ্যমে রহস্য সমাধানের আলোকরেখা দেখতে পেয়েছিলেন ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ নিশ্চিত ছিলেন পূর্বপুরুষের ধনসম্পত্তি দুর্গেরই মধ্যে কোথাও গুপ্তস্থানে রক্ষিত আছে। শুধু সিপাহিরা কেন, রামবিনোদ-রামকিশোরের পরিবারের কেউ সেটা জানে না। উর্দুলিপিতে লেখা সূত্রের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছে মুনশী আতাউল্লা - লেখার সারমর্ম এই,-

> *"যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।"*

এখানে প্রশ্ন ওঠে 'মোহনলাল' কে? ঈশানবাবুকে হত্যার মোটিভ কি টাকা? ঈশানবাবু ধরতে পেরেছিলেন দুর্গে নিশ্চয় কোনো গুপ্ত তোষাখানা আছে। পরিবারেরই কেউ সেটা জানতে পেরে খুন করেছে ঈশানবাবুকে। অন্যদিকে ঈশানবাবু দুর্গে যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল ঘরের দেয়ালে সারি সারি গজাল লাগানো। দেওয়ালে এতগুলো গজালের নিশ্চয় অন্য কোনো বিশেষত্ব আছে। ব্যোমকেশ উদ্ধার করেছে গজালগুলিকে নাড়ালে চতুষ্কোণ পাথর ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সরু অথচ প্রশস্ত গুপ্ত তোষাখানার পথ করে দেয়। ঈশানবাবু যে এই গুপ্তপথের সন্ধান জানত তারও অকাট্য প্রমাণ মেলে, -

> *"এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে এককোণে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়িল। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি - একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ।... ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবু যে এ ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ।"*

অতঃপর প্রফেসরের ডায়েরির শেষ 'ক্লু' মোহনলালের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতেই দুর্গের রহস্যের অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়। এর কৃতিত্ব অবশ্যই কিছুটা প্রাপ্য অজিতের। অজিত বাইনোকুলার দিয়ে রামকিশোরবাবুর বাড়ির দৃশ্য দেখে ব্যোমকেশকে জানালে ঈশান ঘোষের খুন এবং রমাপতির মণিলালের ফাউন্টেন পেন চুরির ঘটনা এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের শীতকালে সাপের কামড়ে মৃত্যু একসূত্রে গাঁথা পড়ে। মণিলাল যে ফাউন্টেনপেন ব্যবহার করত সেটির সাহায্যেই বেদেদের কাছে থেকে কেনা সাপের বিষ দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত। কলমের দুটি আঁচড় দেখতে একেবারে সাপে কামড়ানো দুটি দাগের মতো। এবং অপরাধী নিঃসন্দেহে অন্য কেউ নন মণিলাল। ব্যোমকেশ জানিয়েছে, মণিলাল বেশ ভালোমানুষ ছিল কিন্তু তার স্বভাব 'রাক্ষসের মতো'। যদি তুলসী জামাইবাবুর কলম এনে রমাপতিকে না দিত এবং পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে নাটক যদি না জমে উঠত তবে মণিলালের কুকীর্তি হয়তো চিরঅজ্ঞাতই থেকে যেত। কাহিনির একেবারে ক্লাইম্যাক্সে ধাধার গ্রন্থিমোচন করেছেন ব্যোমকেশ। এ বিষয়ে গোয়েন্দা গল্প-লেখক হয়তো চিরঋণী থেকেছেন ঐতিহ্যশালী রচনা নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর কাছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' মনে না পড়লে মোহনলাল যে কামানের নাম এটি ব্যোমকেশের মনে ভেসে আসত না,-

> *"আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল, "আবার আবার সেই কামান গর্জন – গর্জিল মোহনলাল...।" কামান – মোহনলাল।... বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল। ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।"*

এই 'মোহনলাল' অর্থাৎ দুর্গের বাইরে যে পরিত্যক্ত কামান তার মধ্যেই গচ্ছিত রেখেছিল রাজারাম। ব্যোমকেশ নিজেও তারিফ করেছিলেন রাজারামের বুদ্ধির।

দাম্পত্য সংকটের মধ্যে তৃতীয় পুরুষের প্রবেশ এবং তার ফলে খুন অথবা খুনের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস – 'শজারুর কাঁটা'।

'শজারুর কাটা' গল্পে নামেই প্রমাণ. এখানে হত্যার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শজারুর কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটি অস্ত্র। এ গল্পও পরকীয়া প্রেমের। দু-মাসের বিবাহিত দম্পতি দেবাশিষ এবং দীপার জীবনে আবির্ভূত হয়েছে দীপার পূর্বপ্রেমিক সঙ্গীতশিল্পী প্রবাল গুপ্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই মানুষের মনের গহীনে গিয়ে রহস্য আর রোমাঞ্চের জাল একই সাথে বুনে যেতে চেয়েছেন তখনই তিনি আশ্রয় করেছেন দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরালকে বা প্রেমের পূর্বরাগ-অনুরাগ। কারণ 'নারী' বা বিশেষ করে নর-নারীর সম্পর্কের জটিল সমীকরণই যে বিশ্বের সকল রহস্য ও রোমাঞ্চ রসের মূল ভাব। এটা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর স্রষ্টার কাছে ছিল গভীরভাবে স্পষ্ট। তাই, সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর দাম্পত্য-জীবনের সঙ্গেই একাধিক ব্যোমকেশ কাহিনির উপজীব্য হয়ে উঠেছিল নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক। দেবাশিস-দীপা-প্রবাল এই তিনজনের ত্রিকোণ প্রেমের জটিল রহস্যময় সমীকরণকে ব্যোমকেশ বক্সী সমাধান করে দিলেও, চরিত্রগত দিক দিয়ে দীপা যথেষ্ট রহস্যময়ী। বারবার তার রহস্যময় আচরণই কাহিনিকে রহস্যাবৃত করে তুলেছে। দক্ষিণ কলকাতার সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী একটি পরিবারের মেয়ে দীপা। যেখানে আজও মেয়েদের একা একা বাড়ির বাহিরে যাওয়া বারণ, আর মেয়ের পুরুষ বন্ধু বা ভিন্ন জাতে বিবাহের তো কোনো প্রসঙ্গই ওঠে না। তবু দীপা ভালোবাসে। বাড়ির অমতেই বাড়ি থেকে পালিয়েই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পালাতে গিয়ে দাদার কাছে ধরা পড়ে, গৃহবন্দী হয়। অথচ কাউকে জানতে দেয় না তার ভালোবাসার মানুষটি কে। ইতিমধ্যে দীপার বিবাহ দেওয়া হয় দেবাশিস ভট্টের সাথে। কিন্তু দীপা দেবাশিসকে ঠকায় নি, বিবাহের পরই তাকে জানিয়ে দেয় সে অন্য কাউকে ভালবাসতো, আজও বাসে, আবারও ভালোবাসার মানুষটির নাম উহ্যই থেকে যায়। দীপা-দেবাশিস সকলের সামনে বিশেষ করে নকুলের সামনে একটা স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবনের অভিনয় করে যেতে থাকে। এই অভিনয়টুকু করার ফাঁকেই দীপার নিজের ভালবাসা তার অজান্তেই ধীরে ধীরে আধার বদলে ফেলে। অপরদিকে প্রবাল দেবাশিষকে খুনের চেষ্টায় সফল হওয়ার পথ পোক্ত করে তুলতে উদ্যোগী হয়। খুনের ছককে নিখুঁত করতে এবং খুনের মোটিভে সকলকে বিভ্রান্ত করতে প্রবাল ইতিপূর্বে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে। প্রথম খুন হয় একজন ভিখারি—দীপা-দেবাশিষের ফুলশয্যার রাত্রিতে। দ্বিতীয় খুনের শিকার একজন জনমজুর। তৃতীয় জন একজন মণিহারী ব্যবসায়ী। সবশেষে শজারুর কাটা বিদ্ধ হয় মূল লক্ষ্য দেবাশিষবাবুর বুকে। সমস্ত ঘটনাটাই একজন বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের

উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ড- এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল প্রবাল। ঘটনাচক্রে দেবাশিষ আহত হলেও তার মৃত্যু ঘটেনি। শরদিন্দু এখানে প্রকৃতিবিজ্ঞানের একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তকে কাজে লাগিয়েছেন। দেবাশিষের হৃৎপিণ্ডটি ছিল বুকের বাঁ দিকে নয়, ডানদিকে। ফলে শজারুর কাঁটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। ঘটনার পর তদন্তের ভার পড়ে ব্যোমকেশের ওপর। সন্দেহের তির বিদ্ধ করতে গিয়ে ব্যোমকেশ বুঝলেন প্রবাল পাগল না হলেও প্রকৃতিস্থ নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে দৈবদুর্বিপাকে গরিব হয়েছে। ষড়রিপুর মধ্যে ওর চরিত্রে প্রধানভাবে বর্তমান লোভ আর ঈর্ষা। এ দুটি তাকে বিবেকহীন করেছিল। এ হেন অপরাধীকে ধরবার জন্য পুলিশ অফিসার সঙ্গে নিয়ে ব্যোমকেশ হাজির হন রবীন্দ্র সরোবরের নির্ধারিত স্থানে। যেখানে ব্যোমকেশকে মারবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল খুনী কিন্তু আগে থেকে প্রস্তুত ব্যোমকেশ খুনীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। গল্পের উপসংহারে দেবাশিষ ও দীপার সম্পর্কের দুর্যোগ কেটে গিয়ে আবার সেখানে জীবনের স্বচ্ছ বাতাস বইয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই ব্যোমকেশ বক্সীর। এই মানবিক মূল্যবোধই শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

আকর গ্রন্থ :

১. ব্যোমকেশ সমগ্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া সম্পর্ক

শ্রেয়া মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সার সংক্ষেপ : *সম্পর্ক বলতে বোঝায় একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন যোগসূত্রে আপনজন হয়ে ওঠা। পরকে আপন করা। স্নেহ, ভালোবাসার দ্বারা একে অন্যের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা। মা, বাবা, ভাই, বোন সকলের সাথে আমাদের স্নেহের বন্ধন। কিন্তু 'সম্পর্ক' শব্দটি শুধুমাত্র পারিবারিক স্নেহ বন্ধনের মধ্যেই নিজেকে সীমিত করে রাখে নি।'সম্পর্ক' শব্দে স্নেহ, ভালোবাসার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেমের প্রগাঢ় আকর্ষণ। বিবাহিত সম্পর্ককেছাপিয়ে উঠেছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েন। বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে থেকেও পুরুষ ও নারী উভয়েই আকৃষ্ট হচ্ছে অন্যের প্রতি।নিজেদের অতৃপ্তিকে পূর্ণ করছে সেই সম্পর্কে, যাকে বলে অবৈধ সম্পর্ক। এই অবৈধ সম্পর্ক শুধু যে বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ তা নয়, বহু বছর আগে থেকেই এই সম্পর্ক চলে আসছে। তার দৃষ্টান্ত রয়েছে মধ্যযুগের কাব্যে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,বৈষ্ণব পদাবলী চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গলপ্রভৃতি কাব্য,যারা প্রাগাধুনিক যুগের অবৈধ বন্ধনের প্রমাণ রেখেছে। এই বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করাই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।*

সূচক শব্দ : *অবৈধ সম্পর্ক, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য।*

মূল আলোচনা

প্রাগাধুনিক সাহিত্যে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্কের নানা পরিচয় রয়েছে। বিশেষত নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের বৃত্তান্ত যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু মর্ত্যেরঅবিবাহিত সম্পর্ক নয়, দেব-দেবীরাও অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত হয়েছে। সাধকরা সন্ন্যাসীর জীবন ধারণ করেও সাধারণ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আবার বিবাহিত সম্পর্কে থেকেও নারী পুরুষ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।কিন্তু তাদেরসে সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় নি। বছরের পর বছর তাদের সম্পর্ক পরিসীমা বর্হিভূত হয়েই সাহিত্য জগতে রয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যর আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং দ্বিতীয় নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', এই দুই কাব্যে অবৈধ পরকীয়া সম্পর্কের নানা প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এই 'পরকীয়া' ঠিক কি? রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নারীর পরকীয়া সম্পর্কে বলেছেন—

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।।"[১]

অর্থাৎ অনুরাগবশত নিজেকে নিরপেক্ষভাবেঅধর্মচারী লোকের সঙ্গে যারা মিলিত হয়, তারাই পরকীয়া নায়িকা বলে পরিচিত।

পরকীয়া নায়িকার বহু নিদর্শন রয়েছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে, যার প্রথম প্রমাণ "চর্যাপদ'। 'চর্যাপদে' এক সাধারণ নারী, যে গৃহবধূ, লোকলজ্জায়, পুরুষশাসিত সমাজে, সকলের সামনে আসতে ভয় পায়, সেই নারী প্রেমের আকর্ষণে সমাজ, সংসার উপেক্ষা করে অন্য পুরুষের কাছে গেছে। বিবাহিত সম্পর্কে থেকেও আকৃষ্ট হয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে, যে সম্পর্কের কোনো স্বীকৃতি না থাকলেও সে নিজেকে সুখী মনে করে, রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়েছে প্রেমের আশায়। যে নারী সামান্য কাকের ভয়ে অতিষ্ঠ সেই বধূবেশী নারী অভিসারে গেছে প্রেমের আকঙ্খায়, সুখের আকর্ষণে। কুক্কুরীপাদ রচিত চর্যার ২ নম্বর পদে রয়েছে তার উল্লেখ -

"দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।।"[২]

গৃহবধূরাই শুধু যে অন্য পুরুষের আকর্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে অভিসার যাত্রা করেছে তা নয়।যারা সমাজে ভোগহীন, লালসাহীন জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল তারাও আকৃষ্ট হয়েছিল সমাজের জাতপাতহীন নারীর প্রতি। যোগী হয়েও সাধক যোগিনীর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছে। সমাজের কাছে যে সম্পর্ক লোকলজ্জা, সেই সম্পর্কে নির্দ্বিধায় জড়িয়েছে একে অন্যের সাথে। একে অন্যকে চুম্বন করার ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে, যোগী যোগিনীর মুখে চুম্বন করতে চেয়েছে, অনুভব করতে চেয়েছে সেই প্রেমের আস্বাদন,যোগী যোগিনীর প্রেমে এতই একনিষ্ঠ যে তাকে ছাড়া তার বাঁচার ইচ্ছাও নেই, চর্যার ৪ নম্বর পদে রয়েছে তার নমুনা, যেখানে গুন্ডরীপাদ বলেছেন -

"যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি ।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ।।"[৩]

সমাজে যারা অচ্ছুত, যাদের সমাজ গ্রহণ করে নি, সেই ডোম্বি নারীর প্রতিও কাপালিক আকর্ষণ অনুভব করেছে। কাপালিক তার সাধুবেশ ত্যাগ করে, হাড়ের মালা পড়েছে শুধুই ডোমিনী জন্য। সমাজ চ্যুত নারীর প্রতি তার যে আকর্ষণ তা কাহ্নপাদ ধরেছেন—

"তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।"[৪]

মর্ত্যে যখন সাধারণ নর-নারী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন স্বর্গের দেবতারাও যে পিছিয়ে আছেন, তা নয়। বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে থেকেও তাঁরা অন্যের প্রতি প্রেমে লিপ্ত হচ্ছেন। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কাহিনী।

রাধা বিবাহিত নারী। বড়ায়ির কাছে রাধার রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন। রাধার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে কুমারী রূপের চিহ্ন নেই, রয়েছে রাধার বিবাহিত রূপের বর্ণনা। রাধার কপালে সিঁদুরের উজ্জ্বলতা জেনেও কৃষ্ণের মন ব্যাকুল হয়েছে, রাধাকে পাওয়ার জন্য বড়ায়ির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন কৃষ্ণ। তাঁর বিবাহিত রূপ লাবণ্যকে দেখার জন্যই কৃষ্ণ চঞ্চল।যে কোনো উপায়ে তাঁর কাছে রাধাকে এনে দেওয়ার জন্য বড়াইয়ের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সেই ব্যাকুলতা ব্যক্ত করলেন কবি চন্ডীদাস,

"রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে।।"[৫]

প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্যে কৃষ্ণের মন ব্যাকুল হয়েছে, বসন্তের আগমনে কোকিলের কুহুতান, প্রকৃতির সমারোহে রাধার রূপ লাবণ্য কৃষ্ণের মনকে যেন পঞ্চবাণে দগ্ধ করেছে। মদনবাণে কৃষ্ণ শুধুই রাধার কামনা করেছেন। বড়াইয়ের কাছে কৃষ্ণ রাধাকে না পাওয়ার মদনবিকারের জ্বালার বর্ণনা দিয়েছেন, বড়ু চন্ডীদাস কৃষ্ণের মনের কথাই ব্যক্ত করলেন-

"আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।"[৬]

মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবস্থান সুখপ্রদ ছিল না। সমাজে পুরুষের প্রাধান্য ছিল। বিবাহিত নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষের আগ্রহের কোনো অন্ত ছিল না। আর তাই কুলবধূকে প্রেমের প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বড়াইয়ের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। বড়াই কৃষ্ণের মধ্যস্থতাকারী হয়ে রাধার কাছে ফুল, তাম্বুল পৌঁছে দিয়েছে, রাধার মন পাওয়ার উপায় কৃষ্ণকে বলে দিয়েছে-

"তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী

****

ফুলে তাম্বুলে ভরি লাঁ যাহা ডালী।"[৭]

পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বিবাহিত নারীর ভূমিকা যে ছিল না তা বলা যুক্তহীন। কৃষ্ণের রতিসম্ভোগের আশাকে রাধা দ্বিগুণ করেছেন তার কথার বিস্তারে। রাধা বিবাহিত হয়েও যে কুমারী, সে যে স্বামী সুখ বঞ্চিত নারী তা স্পষ্ট ভাবেই রাধা কৃষ্ণকে

বুঝিয়েছেন। তার প্রথম যৌবন সুখ চুরি করা সহজ নয়, তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে, তার মনের পরিচয় দিলেন বড়ু চন্ডীদাস—

"প্রথম যৌবন মুদিত ভান্ডার তাত না সম্বাএ চুরী।"[৮]

কৃষ্ণ রাধার শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ। কামবাণে জর্জরিত কৃষ্ণ কুলবধূ রাধার বারো বছরের দান চেয়েছেন, তার স্তনযুগলের দান চেয়েছেন তেরো লক্ষ, বড়ু চন্ডীদাস তাঁর কাব্যে বলেছেন-

"শ্রীফলযুগল তোহোর তনে। এহার দান তের লক্ষ ধনে।"[৯]

"'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধা-কৃষ্ণের যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সূচিত হয়েছে, 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে সেই সম্পর্কের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে। রাধা বিবাহিত হয়েও স্বপ্নে অন্য পুরুষকে কামনা করেছেন, তার রূপ সৌন্দর্যে বিভোর হয়েছেন। স্বামী আয়ানের সৌন্দর্য তার কাছে নশ্বর। সেই পুরুষের মুখবিবর চাঁদের থেকেও সুন্দর, মালতী ফুলের মালা সেই পুরুষের কণ্ঠের সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করছে। জ্ঞানদাস তাঁর পূর্বরাগ পদে রাধার সেই কল্পিত পুরুষের যেন ছবি অঙ্কন করেছেন—

"রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখে ছটা জিনি ইন্দু।
মালতীর মালা গলে দোলে।"[১০]

রাধা শুধু যে তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, তা নয়, তাঁর যৌবন সেই পুরুষকে কামনা করেছে— রাধাকে আলিঙ্গনে ভরিয়ে দিচ্ছে সেই পুরুষ, রাধার সমস্ত মন প্রাণ রঙ্গ তামাশার দ্বারা অধিকার করে নিচ্ছে, রাধার কল্পনাকে জ্ঞানদাস তাঁর পদে তুলে ধরেছেন,

"হাসি হাসি কথা কয় পরাণ ছাড়িয়া যাই
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।"[১১]

পরপুরুষের জন্য রাধার মন যেমন উত্তলা হয়েছে, তেমনি কুলবধূ রাধার জন্য, কৃষ্ণ একমুহূর্ত স্থির হতে পাচ্ছেন না। কৃষ্ণ নির্জনে একা বসে আছেন, সমস্ত সখীর সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। দিনরাত শুধুই কুলবধূর চিন্তায় ব্যাকুল। তার জন্য কৃষ্ণ বাঁশির মোহন সুরও বিস্মৃত হয়েছেন। কবি নরহরি কৃষ্ণের সেই রাধা-মগ্ন প্রেমের স্বরূপ চিত্রিত করলেন—

"না জানি কি জপ রজনীদিন।
ছাড়িয়া মোহন মুরলী গান।"[১২]

এ প্রেম তো সাংসারিক গন্ডীবদ্ধ প্রেম নয়, এ প্রেম প্রিয়তমাকে ক্ষণিকের জন্য কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনা। কৃষ্ণ সর্বদা যমুনা থেকে আগত রাধার পদচিহ্নের মধ্যে নিজেকে ধূলিধূসরিত করে রেখেছেন। সেই পদচিহ্নের মধ্যেই কৃষ্ণ যেন রাধাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন। কবি কৃষ্ণ প্রেমের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করলেন তাঁর পদাবলীর কাব্যের মধ্যে,

"যমুনা হইতে আইলা যে পথে
রাখিয়া চরণ চিন।
সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর
না জানি রজনী দিন।" [১৩]

কবি নরহরি যখন বিবাহগন্ডী বহির্ভূত কৃষ্ণের ব্যাকুল প্রেমকে চিত্রিত করছেন, তখন আরেক কবি চণ্ডীদাস কুলবধূর সমাজ, সংসার, ভয়, লজ্জা, অতিক্রম করে কৃষ্ণমগ্ন রাধার চিত্র অঙ্কন করলেন। রাধা সাংসারিক কাজকর্ম বিস্মিত হয়ে, গুরুজনের সম্মুখে ভীত না হয়ে, বারবার ঘরের গণ্ডী অতিক্রম করতে চাইছেন। কৃষ্ণকে পাওয়ার আশায় রাধা এতই মগ্ন যে স্বাভাবিক মাত্রাকে দ্বিগুণ করেছে তার শ্বাস প্রশ্বাস। কদম্ব কাননের দিকে বারবার দেখেও রাধা নিজেকে শান্ত রাখতে পাচ্ছেন না, কবি চণ্ডীদাস পদাবলী'তে বলেছেন—

"ঘরের বাইরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।" [১৪]

বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের সাথে মিলনের জন্য সমস্ত বিপদসঙ্কুল পরিবেশকে অতিক্রম করেছেন। বিবাহিত নারীর চিহ্নস্বরূপ অলঙ্কার পরিত্যাগ করেছেন। গমনের পথে রাধার শারীরিক ভারসাম্যও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উচ্চ কুচ যুগল তার কাছে ভার বলে মনে হয়েছে। কবি বিদ্যাপতি তাঁর পদে রাধার কৃষ্ণের সাথে মিলনের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন চমৎকার ভাবে—

"পথ বিপথ নাহি মান।
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মান এ ভার।।" [১৫]

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীগণের অন্দরমহলের জীবন কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় রেখেছে মঙ্গলকাব্যগুলি। দেব-দেবীরা যে বিবাহিত সম্পর্কের পরিসীমা অতিক্রম করেছেন, তার কিছু নিদর্শন কবিরা রূপায়িত করেছেন মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, শিবায়ন কাব্যে।

মঙ্গলকাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিবাহিত হয়েও শিব অন্য নারীর সঙ্গ কামনা করেছেন, দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েও নিচ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিবের মন চঞ্চল, চন্ডীর সাথে সাংসারিক বন্ধনে থেকেও আভিসারে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। পরনারীর প্রতি আকর্ষণে শিব নিজ স্ত্রীর বন্ধনও ত্যাগ করেছেন। চন্ডী শিবকে বিপথ থেকে ফেরাতে চাইলে শিব চুপিসারে চন্ডীর সঙ্গ ছেড়েছেন। শিব নন্দীকে বলদ সাজার আদেশ দিয়ে চন্ডীর আজান্তে অন্য নারীর কাছে গেছেন। যার নিদর্শন রাখলেন বিজয়গুপ্ত তাঁর 'পদ্মপুরাণে'-

"চন্ডীরে নিদ্রালি দিয়া বাহের হইল হর।।
হাতসানে কহে কথা না করে শবদ।
নন্দীরে আদেশ দিল সাজাইতে বলদ।।" [১৬]

সুমধুর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, দেব জীবনের ওপরেও তার প্রভাব কম নয়। বসন্তের আগমনে কোকিলের পঞ্চম সুরে, ভ্রমর ভ্রমরীর গুঞ্জনে স্বয়ং মহাদেবও মদনের পঞ্চম বাণে কামচঞ্চল হযন-

"কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস।।
খসিল অনঙ্গের ধন চমকিত ত্রিলোচন
বাম হস্তে ধরিল সন্ধানে।।" [১৭]

এই মহারস পাতালে প্রবেশ করে মনসার জন্ম হয়। শিব পরনারীর প্রতি এতই আকর্ষিত যে তাঁরইঔরসজাত কন্যার রূপসৌন্দর্যে কামাতুর হন। মুগ্ধ নয়নে তাকেই কামনা করেছেন। তাঁর এই মনোভাবকে প্রকাশ করলেন বিজয়গুপ্ত-

"কন্যার রূপ দেখিয়া বিস্মিত ত্রিলোচনা।
এক দৃষ্ট হইয়া শিব চাহে ঘন ঘন।।" [১৮]

সমাজে তখন পুরুষের চাওয়া পাওয়া প্রাধান্য পেত, আর তাই চন্ডীর সাথে সাংসারিক জীবনে থেকেও নিজের অজান্তেই নিজের কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন শিব, তার সাথে কাশীতে গিয়ে সংসার করতে চেয়েছেন-

"কন্যার রূপ দেখি অদভূত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী।।" [১৯]

স্বর্গের দেববকুল প্রধান যখন কন্যাবেশী নারীতে আকৃষ্ট, তখন মর্ত্যে শিবভক্ত চাঁদ ঘরে সনকার মতো স্ত্রী থাকার পরেও সামান্য এক নটীর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় কামভাবে জর্জরিত হয়ে তাকে মহাজ্ঞান মন্ত্র দান করেন। যে জ্ঞান সনকার কাছে অজানা তা পরনারীর যৌবনের লোভে চাঁদ মনসাকে দান করলেন।বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে সেই পরিচয় দিলেন-

"কটাক্ষে হরিল তারে মহাজ্ঞান অনুসারে
মহাজ্ঞান হরিল বিষহরে।
দেখিয়া নটীর বেশ কামবাণে হইলা শেষ
চান্দর প্রাম কাঁপে থর থরি।।" [২০]

শিব তাঁর বিবাহিত স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়েছেন ডোমনীর রূপ দর্শন করে। ডোমনীর সৌন্দর্যে পঞ্চবাণে জর্জরিত শিব শুধুই ডোমনীকে কামনা করেছেন। শিবের মনের ভাবরূপ ব্যক্ত করলেন বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে-

"দেখিয়া ডুমনীর রূপ পাগল ত্রিলোচন।
মদনে মোহিত হইয়া ডাকে ঘনঘন।।" [২১]

ডোমনীর স্পর্শে ব্যকুল শিব তাঁর হাতের রন্ধন ভোজনেও আগ্রহী হয়েছেন। 'পদ্মপুরাণে' বিজয়গুপ্ত বললেন—

"রন্ধন করহ তুমি করিব ভোজন।" [২২]

শিব কামভাবে জর্জরিত পুরুষ, নিজ সংসার তিনি বিস্মৃত হয়েছেন বেহুলার নৃত্য প্রদর্শন দেখে। মনসার মতো বেহুলাকেও অঙ্কশায়িনী করার লোভে মহেশ্বর চঞ্চল হয়েছেন। মদনবাণেজর্জরিত শিব জগৎ সংসার ভুলে বেহুলাকেই শুধু কামনা করেছেন। 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে কবি বললেন—

"বেউলারে দেখিয়া শিব কামে অচেতন।।
মহাদেব বলে বেউলা আর গতি নাই।
যৌবন সফল কর ভজ মোর ঠাই।।" [২৩]

নারী এবং পুরুষ উভয়ের অন্তরে গোপনে লালিত হত অভিসার যাত্রা। সাংসারিক জীবনের অতৃপ্তি চালিত করত বিপথে। 'শিবায়ন' কাব্যে রয়েছে তার নিদর্শন। শিব বিবাহিত জীবনে গৌরীর সাথে সংসার করেও সামান্য এক বাগদিনীর প্রতি আকৃষ্ট

হচ্ছেন, তাকে অঙ্গুরী প্রদান করে জীবনে স্বীকৃতীও জানিয়েছেন। তাকে শিব শুধু পিতলের অঙ্গুরী দান করেনি, বরং মণিমাণিক্য খচিত আঙ্গুরী উপহার দিয়েছেন। কবি রামেশ্বর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন-

"পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন।
মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন।।"[২৪]

শিব বাগদিনীর প্রতি এমনই আকৃষ্ট যে গৌরী থাকার সত্ত্বেও পরস্ত্রীকেই মনে ঠাঁই দিতে চেয়েছেন, গৌরীর সঙ্গ ত্যাগ করে তাকেই যে সঙ্গী করবেন, এ আশ্বাসও দিয়েছেন। কবি রামেশ্বর শিবের এই মনোভাবকেই প্রকাশ করলেন-

" বুকে তোকে দিব ঠাঞি   তিলেক ছাড়িব নাই
সদাই থকিবে আমা সনে।"[২৫]

শুধু শিব যে বাগদিনীকে চেয়েছেন তা নয়, বাগদিনীর মনেও শিবের জন্য ছিল গভীর আসক্তি। আর তাই সে শিবকে বলেছে রূপ গুণ না থাকার পরেও সে শিবকে প্রেম দান করবে, তার শর্ত শুধুএকটাই, তাকে শুধুই তার কথা শনতে হবে। শিব নিজের স্ত্রীর কথার গুরুত্ব দেননি কিন্তু তার কাছে পরনারীর কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবি তাঁর কাব্যে বললেন—

"রূপ নাই গুণ নাই ধন নাই তোর।
বুড়া ভাতার ধরব কান চাড় কান্দ্যাছে মোর।"[২৬]

শিবের সাথে গৌরীর সংসার জীবন অভাব অনটনে পূর্ণ। সেদিকে শিবের বিন্দুমাত্র বিবেচনা নেই। জীবনের অতৃপ্তিকে রসদ করেশিব প্রবেশ করেছেন কোঁচনী পাড়ায়। কোঁচনী পাড়ায় শিব কামরূপে প্রবেশ করলে সকলে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে, কবি তাঁর বর্ননা দিলেন কাব্যমধ্যে-

" কোঁচের নগরে হর করিল প্রবেশ।
ধরিল মনস্থ মথ মন্মথের বেশ।।"[২৭]

'মনসামঙ্গল', 'শিবায়ন' কাব্যে যেমন মহেশ্বরের গোপনচারিণীর উল্লেখ আছে, 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যও তার ব্যতিক্রমী নয়। গৌরী শিবের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞাত। পরনারীর প্রতি শিবের আকর্ষণের কথা গৌরীর অজানা নয়, তাই গৌরীর মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। শিব গৌরীর সাথে নিজ অঙ্গ মেলাতে চান না,কারণ তাঁর সাথে অঙ্গ মেলালে যে কুচনীর বাড়ি তাঁর যাওয়া হবে না। কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থে গৌরীর মনোভাব প্রকাশ করলেন নিজ ভাষায়-

"অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গ মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা।"[২৮]

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে পরকীয়া সম্পর্ক সেইভাবে উল্লেখ নেই। কিন্তু দেবী চন্ডী আর ফুল্লরার কথোপকথন প্রসঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণের সীমিত উল্লেখ রয়েছে। চন্ডী ফুল্লরার গৃহে এসেছেন পতীর সাথে মনোমালিন্য করে। পরপুরুষের কাছে শান্তিলাভ করার জন্যই তাঁর আগমন। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তৃপ্ত হতে চেয়েছেন অন্য পুরুষকে সঙ্গ করে। কিন্তু ফুল্লরার কাছে তা বেমানান। ফুল্লরা বুঝিয়েছে কোন অবস্থার মধ্যেই পতির সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়, পরপুরুষ কখনোই আপন হয় না, সে কখনোই রাগ-অভিমান ভাঙাতে পারে না। ফুল্লরার মনেরভাব মুকুন্দ প্রকাশ করলেন তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ডে-

" ছাড়িয়া পতির পাশ কেন আল্যা পরবাস
আপনার কি সাধিলে মান।।"[২৯]

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে যে বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেখানে নিষ্পাপ প্রেমের প্রকাশ প্রায় শূন্য। সমগ্র নারী ও পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে যৌন বাসনা। মঙ্গলকাব্য জুড়ে রয়েছে পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও মানসিক অতৃপ্তি, যা চালিত করেছে সংসার জীবনের বর্হিভাগে পা রাখতে।নারী ও পুরুষের— তা সে মানব-মানবী হোক কিংবা দেব-দেবী, কামনা-বাসনায় মিশ্রিত প্রেমের এ এক আকর্ষণীয় সম্পর্কের দিক, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আর সমাজ ও সাহিত্যকে রসপূর্ণ করে তুলেছে।

পাদটীকা :

১. রূপ গোস্বামী, 'উজ্জ্বলনীলমণি', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৫৫
২. ড.নির্মল দাশ (সম্পাদিত), চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেজ পাবলিশার্স,১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১৫
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১২১
৪. ঐ, পৃষ্ঠা১৩৭
৫. বড়ু চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃষ্ঠা-২০৭
৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৮

৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২০৯

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-২৫৯

৯. ঐ, পৃষ্ঠা-২৩৩

১০. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদ সমীক্ষা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৯

১১. ঐ, পৃষ্ঠা-১১৯

১২. ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৪

১৩. ঐ,পৃষ্ঠা-১২৫

১৪. ঐ,পৃষ্ঠা-১২৯

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৪

১৬. বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ’, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৪

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-২০

২০. ঐ,পৃষ্ঠা ১৬১

২১. ঐ,পৃষ্ঠা ৩৪

২২. ঐ,পৃষ্ঠা ৩৯

২৩. ঐ,পৃষ্ঠা ৪৮৯

২৪. রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন’, ড. দয়াময় মণ্ডল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮৬

২৫. ঐ,পৃষ্ঠা-১৮৭

২৬. ঐ,পৃষ্ঠা-১৮৪

২৭. . ঐ,পৃষ্ঠা-১২৮

২৮. ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৯.

২৯. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২, পৃষ্ঠা- ২৪৯

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রযুক্তিগত পরিষেবার চিত্র: একটি তুলনামূলক আলোচনা

হীরক ঘোষ
গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুরমঠ, হাওড়া
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ
গ্রন্থাগারিক সহায়ক, টি. এইচ. কে. জৈন কলেজ, কলকাতা

সারাংশ : *সাধারন গ্রন্থাগারগুলি সাধারন মানুষের তথ্যের চাহিদা পূরণে সর্বদা স্বচেষ্ট। এগুলি যদি নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে সকলের তথ্যের চাহিদাপূরণ করতে পারে, তবে বর্তমান সময়ে এই গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে গ্রহনযোগ্যতাও বাড়বে। এই লেখনীতে, পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট কয়েকটি সাধারন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রযুক্তিগত পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারন গ্রন্থাগারগুলি এই প্রেক্ষিতে বর্তমানে কোন পরিস্থিতিতে আছে। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে, অল্প কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া গ্রন্থাগারগুলিকে এ বিষয়ে এখনও অনেক পথ চলতে হবে।*

সূচক : *সাধারন গ্রন্থাগার, ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, প্রযুক্তিগত পরিষেবা, তুলনামূলক আলোচনা।*

ভূমিকা-

সমস্ত গ্রন্থাগারই তাদের ব্যাবহারকারীদের যতদূর সম্ভব সেরা তথ্য ও পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারন গ্রন্থাগারগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজ গঠনে এদের গুরুত্ব অপরিসীম, কারন সাধারন মানুষদের নিয়েই এদের অগ্রগতি। এনসাইক্লোপেডিইয়া অফ্ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স (১৯৭৮) তাই বলছে, "Public library is a public institution,... one that opens its collections, facilities and services without distinction to all citizen"। ইফলা/ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো (১৯৯৪)-এ সাধারন গ্রন্থাগারগুলিকে প্রথাগত পরিষেবার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরিষেবার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির যুগে, উন্নত বা উন্নয়নশীল নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশে সাধারন গ্রন্থাগারগুলিতেও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিষেবা, যেমন- অনলাইন ডেটাবেস, ইন্টারনেট,

ই-বই, ই-পত্রিকা প্রভৃতি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন হওয়ার পরে ৪০ বছর অতিক্রান্ত, এই সময়কালে সরকারী, সরকার পোষিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৪৮০টি ও বেসরকারি পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ২০০০টি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরনের জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বহুমুখী প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে, প্রযুক্তিগত পরিষেবাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের (WBPLN) মাধ্যমে একটি সর্বজনিন ও সুসংহত ক্যাটালগ ব্যাবস্থা প্রদান, পুরোনো ও বিরল তথ্যসম্পদকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সাধারনের ব্যাবহারের উপযোগী করা প্রভৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর নিয়োগ বন্ধ থাকার কারনে এই উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং এতে জনসাধারনের গ্রন্থাগারমুখী হবার প্রবনতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

গবেষণার প্রশ্ন-

এই প্রবন্ধে মূল প্রশ্নটি হল, বর্তমান প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারন গ্রন্থাগারগুলি প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদানে কতটা সক্ষম ?

উদ্দেশ্য-

এই তুলনামূলক রচনাটির মূল উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কি ধরনের প্রযুক্তিগত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তা লক্ষ্য করা এবং তার পাশাপাশি আরো কি কি বিষয়ে উন্নতির প্রয়োজন আছে তা জানার চেষ্টা করা।

চাহিদা ও গুরুত্ব-

উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারন গ্রন্থাগারগুলি ব্যাবহারকারীদের এমন অনেক পরিষেবা দিতে পারে যেগুলি ব্যাবহারকারীদের বিশেষ করে নুতন প্রজন্মের কাছে গ্রন্থাগারবিমুখতা হ্রাস করতে পারে। বর্তমান সময়ে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রযুক্তি সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেকোনো প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব থাকে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাধারন গ্রন্থাগারগুলিতে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগ প্রতীয়মান (রায়চৌধুরি, ২০২১), সেই কারনেই এই প্রবন্ধ রচনা। পশ্চিমবঙ্গের সাধারন গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে অতীতে বেশকিছু সমীক্ষা ও প্রবন্ধ প্রকাশ পেলেও শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান নিয়ে এর আগে কোনো লেখনী সম্ভবত প্রকাশ পায়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, বর্তমান গবেষণাটি এই ব্যাপারে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম হতে পারে।

সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা –

কামিলা (২০১৫), বর্ধমান জেলার সাধারন গ্রন্থাগারগুলির উপর সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, কর্মীসঙ্কট, গ্রন্থাগারবিমুখতা এবং প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায়, গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠুভাবে চালাতে সমস্যা হচ্ছে। সামাধান হিসাবে গ্রন্থাগারে ইন্টারনেটের ব্যাবহার, নির্দিষ্ট মুক্ত উৎস (Open Source) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের ব্যাবহার, কর্মীদের যথাযথ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কোনার (২০১৫), তাঁর লেখায় গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাবহার কার্যকর ভাবে ও দক্ষতার সাথে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার পথ নির্দেশ করেছেন এবং সাথে সাথে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তাও তুলে ধরেছেন।

ভৌমিক (২০২১), তাঁর লেখায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারন গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কিভাবে সাধারন গ্রন্থাগারের সাথে জনসাধারণকে একাত্ম করা হচ্ছে তা তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন দেশ কিভাবে সাধারন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করছে তাও উল্লেখ করেছেন। প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত পরিষেবার যে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে তাও জানিয়েছেন।

রায়চৌধুরি (২০২১), গ্রন্থাগারের পরিসর ও পরিষেবা বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলি কিভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারে তার একটি রূপরেখা দিয়েছেন। প্রযুক্তির নতুন নতুন ব্যাবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি কিভাবে শুধু নিয়মিত পরিষেবাই নয়, তার বাইরেও আরও কি কি নতুন পরিষেবা দিতে পারে যা সংলগ্ন জনসাধারণকেও গ্রন্থাগার ব্যাবহারে উৎসাহী করবে তারও দিশা দেখিয়েছেন।

লেডিগা ও ফমব্যাড (২০১৮), তাঁদের প্রবন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারন গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার পাশাপাশি সাধারন গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাবহার কিভাবে প্রযুক্তিগত বৈষম্য (Digital Divide) হ্রাস করতে পারে তা সমীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁরা এই সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খোঁজারও চেষ্টা করেছেন।

শ (২০১৯), এর মতে, গ্রন্থাগার পরিষেবায় তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্ব বর্তমান সময়ে অপরিসীম। তথ্য-প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারনেটকে বই এর প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করার কথা তিনি বলেছেন, সাথে সাথে তথ্য-প্রযুক্তি

ব্যাবহার করে কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যাবস্থাকে আরও উন্নত করা যায় তার একটা দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

সরকার ও দে (২০১৫), উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত ২০টি সাধারন গ্রন্থাগারে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই প্রথাগত পরিষেবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। তবে অল্পকিছু গ্রন্থাগার এই পরিষেবার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে, যদিও বিভিন্ন কারনে সার্বিক ভাবে এই পরিষেবা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন অর্থের অভাব, কর্মীসঙ্কট প্রভৃতি। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই গ্রন্থাগারগুলির ব্যাবহারকারীরা সাম্প্রতিক তথ্যের থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ফলস্বরুপ গ্রন্থাগারবিমুখতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামিউল্লা (২০১৯), তাঁর লেখায় বারুইপুর মহকুমার সাধারন গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উপকরণ বা পরিষেবা নেই। এর সমাধান হিসাবে তিনি এই গ্রন্থাগারগুলিতে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের কথা বলেছেন এবং শূন্য পদে দ্রুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের কথা বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনাগুলি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সাধারন গ্রন্থাগারগুলিকে বর্তমান ইন্টারনেট যুগে টিকে থাকতে হলে এবং নতুন প্রজন্মকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করতে হলে প্রযুক্তিগত পরিষেবা দিতেই হবে, এছাড়া উপায় নেই।

পদ্ধতি-

বর্তমান লেখনীতে প্রথমে একটি বিস্তারিত প্রশ্নাবলী (Open-ended) তৈরি করা হয়েছে। এরপর সেই প্রশ্নাবলী নির্বাচিত গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠানো হয়েছে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং সেই সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা পত্রটি নির্মিত হয়েছে। এখানে গ্রন্থাগারগুলি নির্বাচন করা হয়েছে ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে। সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।এখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে।

পরিধি-

মোট নয়টি গ্রন্থাগার থেকে এই তথ্য আহরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে চারটি জেলা গ্রন্থাগার এবং পাঁচটি শহর গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগারগুলি হল-

১) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার,

২) জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ 24 পরগনা,

৩) বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, এবং
৪) জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া।
শহর গ্রন্থাগারগুলি হল-
১) বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী,
২) বালি সাধারণ গ্রন্থাগার,
৩) বোলপুর সাধারণ পাঠাগার,
৪) সাঁইথিয়া শহর গ্রন্থাগার, এবং
৫) সুভাষ পাঠাগার, আলিপুরদুয়ার।

এখানে কোনো ইউনিট গ্রন্থাগার বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যেহেতু এগুলিতে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রযুক্তিগত পরিষেবা সরকারি তরফে চালু করা যায়নি।

সীমাবদ্ধতা-

বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা অতিমারির কারণে দীর্ঘদিন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বন্ধ থাকায়, চেষ্টা করা হলেও নয়টির বেশি গ্রন্থাগার গবেষণাপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতিমারিও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে জন্য তথ্য আহরণ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হয়েছে। গ্রন্থাগারের কর্মীসঙ্কটও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য একটি কারণ।

বিশ্লেষণ ও আলোচনা-

নয়টি সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রযুক্তিগত পরিষেবা সংক্রান্ত তুলনামূলক সারণী

	উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার	জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার	জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া	বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী	বালী সাধারণ গ্রন্থাগার	বোলপুর সাধারণ পাঠাগার	সাঁইথিয়া শহর গ্রন্থাগার	সুভাষ পাঠাগার
স্থাপিত (Eastablishment)	১৮৫৯	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫০	১৮৮৩	১৮৮৫	১৯৮০	১৯৬২	১৯৪৬
প্রকার (Types)	জেলা গ্রন্থাগার (সাধারণ)	জেলা গ্রন্থাগার (সাধারণ)	জেলা গ্রন্থাগার (সাধারণ)	জেলা গ্রন্থাগার (সাধারণ)	শহর গ্রন্থাগার (সাধারণ)	শহর গ্রন্থাগার (সাধারণ)	শহর গ্রন্থাগার (সাধারণ)	শহর গ্রন্থাগার (সাধারণ)	শহর গ্রন্থাগার (সাধারণ)
জেলা (District)	হুগলী	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বীরভূম	পুরুলিয়া	কলকাতা	হাওড়া	বীরভূম	বীরভূম	আলিপুরদুয়ার
কমপিউটার (Computer)	৮ টি, নিজস্ব সার্ভার আছে	আছে, সংখ্যা উল্লিখিত নয়	৩ টি	আছে, সংখ্যা উল্লিখিত নয়	৪ টি	৬ টি	৪ টি	৩ টি	আছে, সংখ্যা উল্লিখিত নয়
ইনটারনেট পরিষেবা (Internet facility)	আছে	আছে	আছে	আছে	নেই	আছে	নেই	নেই	আছে

ওয়েবসাইট (Website)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	নির্মানাধীন	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	নেই
প্রতিলিপিকরণ পরিষেবা (Xerox facility)	আছে	আছে	আছে	আছে	আছে	আছে	আছে	নেই	আছে
মুদ্রণ পরিষেবা (Printing facility)	আছে, (মূল্য প্রদানে)	আছে	আছে, (মূল্য প্রদানে)	নেই	আছে, (১-২ পৃষ্ঠার জন্য বিনামূল্যে)	আছে, (মূল্য প্রদানে)	আছে, (মূল্য প্রদানে)	আছে, (শুধুমাত্র অফিসের জন্য)	আছে
ওয়াই-ফাই পরিষেবা (Wi-Fi facility)	নির্মানাধীন	আছে	নির্মানাধীন	নেই	নেই	আছে	নেই	নেই	নেই
ই-তথ্যসম্পদ (CD-ROM, DVD, ই-বই, ই-পত্রিকা, ইত্যাদি)	DVD আছে	CD-ROM, DVD এবং ই-বই, কিণ্ডেল আছে	DVD এবং ১টি ই-পত্রিকা আছে	CD আছে	নেই	CD এবং ই-বই আছে	নেই	CD আছে	নেই
ভৌত সংরক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সংরক্ষণ পরিষেবা (Physical & Digital Preservation facility)	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ করা হয়	উভয় প্রকারই করা হয়	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ আছে	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ আছে	উভয় পরিষেবাই আছে, ক্লীপগুলি সদস্যদের জন্য, ভৌত সংরক্ষণ অফিসের জন্য	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ আছে	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ আছে	শুধুমাত্র ভৌত সংরক্ষণ আছে	নেই
এল এম এস এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহস্থল (LMS and Institutional Repository)	কোহা (WBPLN -এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN-এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN -এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN-এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN-এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN -এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN -এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN -এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই	কোহা (WBPLN-এর মাধ্যমে), IR-প্রত্যক্ষভাবে নেই

ওয়েব ওপ্যাক (WebOPAC)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN-এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	আছে (WBPLN -এর মাধ্যমে)	নেই
প্রোজেক্টারের মাধ্যমে দৃশ্য-শ্রাব্য পরিষেবা (Audio-Video Through Projector facility)	আছে	আছে	নেই	নেই	নেই	নেই	আছে, শুধুমাত্র শিশু বিভাগের জন্য	নেই	নেই
নিরাপত্তা পরিষেবা (Security facility)	শুধুমাত্র সিসিটিভি (CCTV)	উল্লিখিত নেই	শুধুমাত্র সিসিটিভি (CCTV)	নেই	শুধুমাত্র সিসিটিভি (CCTV)	শুধুমাত্র সিসিটিভি (CCTV)	নেই	নেই	নেই

১) প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারেই কম্পিউটার আছে এবং সেগুলি ব্যবহারকারী ও কর্মী উভয়েই ব্যবহার করতে পারে। এর মধ্যে উত্তরপাড়াতে নিজস্ব সার্ভার আছে। উত্তরপাড়াতে সর্বাধিক ৮টি কম্পিউটার আছে। তিনটি গ্রন্থাগার, যথা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পুরুলিয়া ও সুভাষ পাঠাগারে কম্পিউটারের সংখ্যা উল্লিখিত হয়নি।এথেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হচ্ছে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য আরও বেশিসংখ্যক কম্পিউটারের প্রয়োজন।

২) বাগবাজার, বোলপুর, সাঁইথিয়া বাদে বাকি ছয়টি গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট আছে। যদিও অতিমারির সময় থেকে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসকদের যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যে গ্রন্থাগারগুলিতে নেই, সেখানেও জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হলে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) একমাত্র সুভাষ পাঠাগার ছাড়া বাকি সব কটি গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইট আছে, তবে তা নিজস্ব নয়। WBPLN এর মাধ্যমে এই গ্রন্থাগারগুলির হোম পেজে প্রবেশ করা যাবে।

৪) সাঁইথিয়া ছাড়া বাকি সব কটি গ্রন্থাগারে প্রতিলিপিকরণ এর সুবিধা আছে। অর্থের বিনিময়ে সাদা-কালো প্রতিলিপিকরণ করা হয়, তবে তা অল্প সংখ্যক পৃষ্ঠা হলে।

৫) পুরুলিয়া ছাড়া বাকি সব কটিতেই মুদ্রণ সুবিধা দেওয়া হয় অর্থের বিনিময়ে।

৬) দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বালি ছাড়া আর কোথাও ওয়াই-ফাই সুবিধা দেওয়া হয় না, তবে উত্তরপাড়া ও বীরভূম এই দুই জায়গাতে এই সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে। এই সুবিধাটি যদি সমস্ত শহর ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে দেওয়া যায় তবে জনসাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হবে।

৭) বাগবাজার, বোলপুর এবং সুভাষ পাঠাগার বাদে বাকি গ্রন্থাগারগুলিতে কিছু না কিছু ই-তথ্যসম্পদ আছে। কোথাও শুধুমাত্র সিডি বা ডিভিডি আছে, আবার কয়েকটি গ্রন্থাগারে এগুলি বাদ দিয়েও ই-বই, ই-পত্রিকা রাখা হয়। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কিন্ডেল (Kindle) ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। বর্তমান সময়ে পাঠকদের, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে মুদ্রিত তথ্যসম্পদ এর তুলনায় বৈদ্যুতিন তথ্যসম্পদ বেশি গ্রহনযোগ্য। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে ভাবতে হবে আরও বেশি করে এই তথ্যসম্পদ রাখার জন্য যাতে এই প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা যায়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য যদি অডিও-বইয়ের কথা ভাবা যায় তাহলে তারাও গ্রন্থাগারে বেশি করে আসতে চাইবে।

৮) সুভাষ পাঠাগার বাদে বাকি গ্রন্থাগারগুলিতে মূলত ভৌত সংরক্ষণ করা হয়। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে বৈদ্যুতিন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, তবে তা খুবই কম। বর্তমান যুগ ডিজিটাইজেশনের, সুতরাং শুধু ভৌত সংরক্ষণ করলেই হবে না, তার সাথে সাথে বৈদ্যুতিন সংরক্ষণও করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর এর মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য নথি আছে, সেগুলিকে ডিজিটাইজ করে সকলের ব্যবহারের জন্য WBPLN-এ রাখা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ৩৩ হাজারেরও বেশি বই ও অন্যান্য নথি এখানে সংরক্ষিত করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক তথ্যসম্পদ সংরক্ষিত করা যাবে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে যে সংগ্রহ আছে, পুরোটাকেই অদূর ভবিষ্যতে ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব হবে। এতে পাঠকরাই সব থেকে উপকৃত হবে।

৯) প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারেই কোহা (KOHA) নামক মুক্ত উৎস গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার আছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের তথ্য WBPLN তথ্য ভাণ্ডারে সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং ব্যবহারকারী চাইলে ঘরে বসেই এই নেটওয়ার্ক থেকে কোন গ্রন্থাগারে কি আছে তা জানতে পারে। কোনো গ্রন্থাগারেরই

নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহস্থল বা ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি নেই, তা আছে শুধুমাত্র WBPLN-এ।

১০) সুভাষ পাঠাগার বাদে বাকি সব কটি গ্রন্থাগারেই কম্পিউটারে গ্রন্থাগার সূচি রাখা থাকে এবং তা ব্যবহার করা যায় শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে বসেই। গ্রন্থাগার কর্মীরা কোহা নামক সফটওয়্যারটিতে নথিগুলির বিবরণ যুক্ত করে দেয় এবং তা জমা থাকে WBPLN-এ। ওয়েব ওপ্যাক (Web OPAC)-এ পাঠক সুচি ঘরে বসেই দেখতে পারে এবং তার ঈপ্সিত নথিটি কোন গ্রন্থাগারে আছে তাও জানতে পারে।

১১) উত্তরপাড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বোলপুর ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থাগারে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দৃশ্য-শ্রাব্য পরিষেবা দেওয়া হয় না, যদিও বোলপুরে এটি দেওয়া হয় শুধুমাত্র শিশু বিভাগের জন্য। এই ব্যবস্থাটি অন্য জেলা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিতেও থাকা প্রয়োজন, কারন এর সাহায্যে গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা ও বিনোদন মূলক বিভিন্ন কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্র ইত্যাদি দেখাতে পারে যা সন্নিহিত অঞ্চলের জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

১২) উত্তরপাড়া, বীরভূম, বাগবাজার ও বালিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে শুধুমাত্র সিসিটিভি ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি। কর্মীসঙ্কটের কারণে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকুও রক্ষিত হয় না। এই বিপুল সম্পদ রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে যেমন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের প্রয়োজন তেমনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রযুক্তিরও দরকার আছে।

পরামর্শ ও উপসংহার-

দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারগুলিতে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী (সংখ্যাটি প্রায় ৩৮০০) নিয়োগ না হওয়ায় বর্তমানে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সব জেলাতেই একজন গ্রন্থাগারিক বা কর্মীকে দুটি বা তিনটি গ্রন্থাগারে সপ্তাহে দুদিন বা তিনদিন করে পরিষেবা দিতে হচ্ছে। ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। যেখানে গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ পরিষেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে প্রযুক্তিগত পরিষেবা দেওয়া তো কল্পনাতীত। যদিও যে সমস্ত গ্রন্থাগারে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা আছেন তারা সীমিত পরিসরের মধ্যেও সাধ্যাতীতভাবে নিয়মিত পরিষেবার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের জন্য সম্প্রতি সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা

যায়, এর ফলে এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নিয়োগ হলে শূন্য পদগুলো পূরণ হবে এবং ভবিষ্যতে কর্মীসঙ্কট মিটবে। বর্তমানে প্রযুক্তিগত পরিষেবা যতটুকু দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তা মূলত জেলা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিতে। কিন্তু সাম্প্রতিক অতিমারির কারণে গ্রন্থাগারগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় প্রযুক্তি দ্বারা যে কাজগুলি গ্রন্থাগার কর্মীরা করছিলেন সেগুলিও প্রায় বন্ধ এবং উপকরণ গুলিও দীর্ঘ অব্যবহারে নষ্ট হতে বসেছে। কর্মীসঙ্কট এবং অতিমারি অতিক্রান্ত হলে সরকার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সদিচ্ছায় শুধু জেলা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিই নয়, এই পরিষেবা সমস্ত একক এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতেও ছড়িয়ে দিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে কিভাবে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আরো উন্নততর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়। তাহলে জনসাধারণকেও আবার গ্রন্থাগারমুখী করা যাবে।

সহায়ক তথ্যসুত্র:

১. কামিলা, কা. (২০১৫). সাধারন গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের পথ: বর্ধমান জেলা সমীক্ষা. *গ্রন্থাগার, ৬৫*(৮), ১৩-১৬.

২. ভৌমিক, অ. কু. (২০২১). সাধারন গ্রন্থাগারের সংকট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা. *গ্রন্থাগার, ৭০*(৯-১০), ৩২-৩৪.

৩. রায়চৌধুরি, অ. (২০২১). সমাজ উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিসর ও পরিসেবা. *গ্রন্থাগার, ৭০*(৯-১০), ২৬-২৯.

৪. শ, নি. (২০১৯). মানব সম্পদ উন্নয়নে উন্নত গ্রন্থাগার পরিষসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়াতে হবে. *গ্রন্থাগার, ৬৯*(৯), ৫-৭.

৫. সামিউল্লা, সে. (২০১৯). বারুইপুর মহকুমায় সাধারন গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ও সমাধানের পথ. *গ্রন্থাগার, ৬৯*(৮), ১০-১১.

৬. *IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994.* (1994). Retrieved from https://ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994

৭. Kent, A., Lancour, H. & Daily, J. E., (Eds.). (1978). *Public libraries.* Encyclopedia of Library and Information Science (Vol.24). New York: Marcel Dekker.

৮. Konar, U. (2015). Impact of information technology in library and information services. *College Libraries*, *30*(3-4), 27-31.

৯. Lediga, M. M., & Fombad, M. C. (2018). The use of information and communication technologies in public libraries in South Africa as tools for bridging the digital divide: The case of the Kempton Park public library. *Public Library Quarterly*. doi:10.1080/01616846. 2018. 1471964

১০. Sarkar, L., & Dey, S. (2015). Information services of public libraries under Barrackpore Sub-Division in the district of North 24 Parganas, West Bengal: A critical study. *College Libraries, 30*(3-4), 73-84.

মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ : একটি নারীবাদী পর্যালোচনা

সৌতি বসু
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়

সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে দুজন ব্যক্তির মধ্যে এমন এক যোগাযোগকে বোঝানো হয় যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যজনের জন্য অনুভব করে বা অন্যের জন্য কিছু করে। অর্থাৎ দুজন ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে একে অন্যের জন্য কিছু করে, তখন তাদের সেই পারস্পরিক আদান-প্রদানকে 'সম্পর্ক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সম্পর্ক এমনিতেই বহুমাত্রিক। নানা ধরনের সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে দুজন চেতন জীবের সম্পর্ককেই বোঝা হয়। যেমন, দুজন ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক বা একজন মানুষের সঙ্গে হয়তো তার পোষা কুকুরের সম্পর্ক ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা লক্ষণীয়, ইংরাজিতে 'relation' শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হলেও, বাংলা ভাষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'সম্পর্ক' ও 'সম্বন্ধ' শব্দদুটির মধ্যে প্রয়োগগত ভিন্নতা বিদ্যমান। দুজন ব্যক্তির মানসিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'সম্পর্ক' শব্দটি প্রযুক্ত হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন অচেতন বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্ক বোঝাতে কিন্তু 'সম্বন্ধ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় একজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ হয় যারা চেতন জীব নয়, যেমন – নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্বন্ধ বা আইনস্টাইনের সঙ্গে তার রিলেটিভিটি তত্ত্বের সম্বন্ধ প্রভৃতি। স্রষ্টার সঙ্গে তার সৃষ্টির সম্পর্ক অনস্বীকার্য। সম্পর্ককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে তার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগও সম্ভব। কিন্তু স্থূলভাবে সম্পর্ককে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- দুটি চেতনজীবের সম্বন্ধ বা একটি চেতন জীবের সঙ্গে কোনো অচেতন বিষয়ের সম্বন্ধ। এখন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ যদি আমাদের আলোচ্য বিষয় হয় এবং সেইক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভাজনকে সামনে রেখে যদি মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধকে বুঝতে চেষ্টা করা হয় তাহলে প্রশ্ন হবে যে, এই সম্বন্ধ কোন্ প্রকারভুক্ত হবে? দুটি চেতনের সম্বন্ধ, নাকি একটি চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্বন্ধ? মানুষের চেতনা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃতিকে চেতন বলা যাবে কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধকে বোঝার জন্য এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিবিড়। মানুষ প্রকৃতির থেকেই সৃষ্ট। স্রষ্টার সঙ্গে তার সৃষ্টির সম্বন্ধকে যেমন অস্বীকার করা যায় না প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকেও তেমনি অস্বীকার করা যায় না। মানুষ প্রকৃতির এই সম্বন্ধ সাহিত্যে খুবই চর্চিত, সেখানে এই সম্পর্ক কিছুটা রোমান্টিক দৃষ্টিকোন থেকেও ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। দর্শনের জগতেও মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধকে ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। মানব-প্রকৃতির এই সম্বন্ধ নীতিবিদ্যারও একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। মূলধারার তত্ত্বে মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ একরকম ভাবে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে, নারীবাদী তত্ত্বে বা উত্তর আধুনিক যুগের দার্শনিক তত্ত্বে সম্পুর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে এই বিষয়টিকে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নারী–নিসর্গবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, মানব সমাজে যেমন নারী অবদমিত, উপেক্ষিত, তেমনি প্রকৃতিও একইভাবে অবদমিত এবং উপেক্ষিত। সাহিত্যে প্রকৃতির প্রতি যতই রোমান্টিকতা দেখানো হোক না কেন, বাস্তবে প্রকৃতি বঞ্চনা আর উপেক্ষার বিষয়মাত্র। প্রকৃতির এই বঞ্চনা বা উপেক্ষা, তাঁদের মতে, নিছক ঘটনাচক্র নয়; এর পিছনে গভীর তাত্ত্বিক সমর্থন আছে বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, দার্শনিক রেনে দেকার্তের দ্বৈতবাদী চিন্তা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

দেকার্ত দেহ ও মনের মধ্যে দ্বিকোটিক বিভাজন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি দাবী করেছিলেন যে, দেহের বিস্তৃতি আছে আর মনের চেতনা আছে। অন্যদিকে মনের বিস্তৃতি নেই, দেহের চেতনা নেই। চেতনাহীন দেহকে মনই চালনা করে। নাবিক যেভাবে তার জাহাজকে চালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে, মনও একইভাবে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে (Williams 2014)। দেকার্তের কাছে দেহ যন্ত্র আর মন তার যন্ত্রী। আপাতদৃষ্টিতে, এই বিভাজন খুবই নিরপেক্ষ ও যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে অনেক সমস্যা লুকিয়ে আছে বলেই সমালোচকরা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, দেকার্ত দেহ-মনের এই বিভাজনের মাধ্যমে জগতকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন- যা বিস্তৃতিযুক্ত তা চেতন নয়, আর যা চেতন তা বিস্তৃতিযুক্ত নয়, অর্থাৎ চেতন এবং অচেতন (জড়) – এই দুটি তত্ত্বে জগত বিভক্ত হয়ে গেছে (Cottingham 1996)। শুধুমাত্র এই বিভাজন হয়তো সমস্যাজনক ছিল না কিন্তু এদের মধ্যে স্তরভেদের সূচনাতেই সমস্যার সূত্রপাত হল। দেকার্ত মন আর দেহকে সমান গুরুত্ব দিতে চাননি। চেতনাযুক্ত মন আর বিস্তৃতিযুক্ত দেহকে যদি তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সত্তারূপে স্বীকার করতেন, তাহলে কোনো

সমস্যা হত না। মন বা আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র। নিশ্চেতন দেহে আত্মার প্রবেশমাত্র তা চেতন হয়ে ওঠে এবং দেহ থেকে চেতনা বিযুক্ত হলে দেহ পুনরায় বিশুদ্ধ জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তাই দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু নেই, তা অমর। এই দাবীর পাশাপাশি দেকার্ত দেহ এবং মনের আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্বীকার করলেন। মনের বুদ্ধি আছে, যৌক্তিকতা আছে, বিচারশীলতা আছে। দেহের এই গুণগুলি নেই, দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে কিছু অনুভব আর আবেগ। এখন, বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের জন্য বুদ্ধি, যুক্তি বা বিচার-বিবেচনাই আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। জ্ঞানের রাজ্যে, ইন্দ্রিয় অনুভব প্রায়শই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। দেকার্তের মতে, আবেগ জ্ঞানলাভের প্রধান অন্তরায়। তা স্বচ্ছ বুদ্ধিকে অস্বচ্ছ করে তোলে। যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য আবেগকে পরিহার করা আবশ্যিক বলেই তিনি মনে করেছিলেন। ফলে, দেকার্তের দর্শনে দেহ-মনের দ্বৈতবাদের পাশাপাশি যুক্তি – আবেগের দ্বৈতবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে নারীবাদীরা মনে করেন। দেহমাত্রই আবেগসর্বস্ব। আর আবেগ যেহেতু যথার্থ জ্ঞান লাভের পথে প্রধান অন্তরায়, তাই আবেগ পরিহার করা প্রয়োজন। অতএব, আবেগের আধাররূপে দেহও পরিহারযোগ্য। দেকার্তের এই স্তরভেদযুক্ত দ্বৈতবাদী চিন্তার মাধ্যমে দর্শনের জগতে মনের প্রাধান্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনই একই সঙ্গে দেহের অবমূল্যায়নেরও সূচনা হয়েছে বলে নারীবাদীরা অভিযোগ করেন।

তবে, এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, মন প্রাধান্য পেলে এবং দেহ উপেক্ষিত হলেই বা সমস্যা কেন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দেকার্তকৃত দেহ-মনের এই দ্বিকোটিক বিভাজন এবং তাদের উচ্চ-নীচ স্তরভেদের প্রভাব সুদুরপ্রসারী; তা কেবলমাত্র কার্তেসীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। দেকার্ত মন বা চেতনার উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে, চেতনাকে তিনি মানুষের জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র প্রকৃতিজগত তাঁর কাছে চেতনাহীনরূপে প্রতীত হয়েছিল। ফলে, কার্তেসীয় দর্শনে মানব-প্রকৃতির দ্বৈতবাদও সূচীত হয়েছিল। দেকার্তের কাছে চেতনা বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষ বুদ্ধিশীল, মানুষের আচরণে বুদ্ধির প্রকাশ স্পষ্ট, তাই কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে তিনি চেতনার উপস্থিতি স্বীকার করেছেন। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির অন্য কোনো বস্তুতে চেতনার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃতিজগতে এমন কোনো ক্রিয়াকর্ম দেখতে পাওয়া যায় না, যা বুদ্ধির বা চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং, তাঁর মতে, মানবভিন্ন প্রকৃতিকে মনহীন বা চেতনাহীন রূপে গণ্য করাই যথার্থ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, না-মানুষ

প্রকৃতিতে উপস্থিত অনেক প্রাণীদের মধ্যেই চেতনা বিদ্যমান, কারণ তাদের বিভিন্ন আচার আচরণে সচেতনতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাই তাদের অনুভবক্ষম বলেই মনে হয়। ফলে, তাদের চেতন প্রাণীরূপে গণ্য করা উচিৎ। কিন্তু দেকার্ত না-মানুষ প্রাণীজগতের ঐ সচেতনতার প্রকাশকে নিছক যান্ত্রিক এবং দেহজ ক্রিয়ারূপেই গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, না-মানুষ প্রাণীদের ঐসব ক্রিয়ার মধ্যে চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় না (Wilson 1991)।

দেকার্ত এপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মনে করা যাক, কোনো একটি যন্ত্র যদি মানুষের সমতুল্য ক্রিয়াসাধনে সক্ষম হয় তাহলেও যেমন তাকে মানুষরূপে গণ্য করা হয় না, তেমনি কোনো না-মানুষ প্রাণী যদি মানুষের অনুরূপ আচরণ করতে সক্ষম হয় তাহলেও তাকে চেতন প্রাণীরূপে বিবেচনা করা সঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে দেকার্ত ভাষা ব্যবহারকে এক্ষেত্রে চেতনার মানদণ্ড রূপে গণ্য করেছিলেন। ভাষা ব্যবহার বলতে মনের ভাবকে যথাযথভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করাকেই তিনি বুঝেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, না- মানুষ প্রকৃতিতে এমন কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই যারা ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাঁর মতে, একমাত্র মানুষই তার বুদ্ধিমত্তার কারণে ভাষা প্রয়োগে সক্ষম, তাই মানুষের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র চেতনার উপস্থিতি স্বীকৃত হওয়া উচিত।

দেকার্তের এই দাবীর বিরুদ্ধে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, না-মানুষ প্রকৃতিজগতে এমন অনেক প্রাণীর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যারা শব্দোচ্চারণে সক্ষম। যেমন, তোতাপাখি বা ময়না পাখির কথা বলা যায়, যারা প্রায় মানুষের মতোই কথা বলতে পারে। দেকার্ত এই সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন যে, তোতা বা ময়নার মতো পাখিরা মানুষের মতো শব্দোচ্চারণে সক্ষম কেননা তারা মানুষের অনুরূপ স্বরযন্ত্রের অধিকারী। মানুষের মতো স্বরযন্ত্র তাদের দেহে উপস্থিত থাকার ফলে তারা মানুষের উচ্চারিত শব্দকে অনুকরণ করতে সমর্থ হয়। এপ্রসঙ্গে দেকার্ত সুস্পষ্টভাবে শব্দোচ্চারণ ও ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ময়না বা তোতা পাখি মানুষের উচ্চারিত শব্দ অনুকরণে সক্ষম হলেও কখনোই মানুষের মতো ভাষা প্রয়োগে সমর্থ হয় না অর্থাৎ তারা কখনোই যথার্থ অর্থে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। অতএব, তাদের এই অন্ধ অনুকরণকে চেতনার প্রকাশরূপে গণ্য করা যায় না (Wilson 1991)।

দেকার্ত এপ্রসঙ্গে তাঁর সমালোচকদের আরো বলেছেন যে, প্রকৃতিজগতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যেখানে না-মানুষ প্রাণীরা এমন পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়, যা একজন মানুষ তার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করেও করতে পারে না। কিন্তু দেকার্ত না-মানুষ প্রাণীদের এই পারদর্শিতাকে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ হিসেবে মানতে রাজী হননি। তাঁর মতে, এগুলি প্রাণীদের সহজাত যান্ত্রিক প্রবণতামাত্র। সহজাত প্রবণতাবশে তারা কোনো একটি আচরণে পারদর্শী। ঐ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সমরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শনে অক্ষম। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে তাদের আচরণে বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। দেকার্ত তাই না-মানুষ প্রকৃতিকে যন্ত্র হিসেবেই গণ্য করেছেন।

দেকার্তের মতে, ঈশ্বর যেমন মন সৃষ্টি করেছেন তেমনি জড় দেহও তৈরী করেছেন। মানব দেহ সৃষ্টির পর যখন তার মধ্যে আত্মার প্রবেশ ঘটিয়েছেন তখন তা সজীব এবং চেতন হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে না-মানুষ প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে তিনি দেহ সৃষ্টি করলেও সেখানে আত্মার প্রবেশকে নিষিদ্ধ করেছেন। ফলে, তারা মনহীন, চেতনাহীন জড় পদার্থই থেকে গেছে।

নারীবাদীরা লক্ষ করেছেন যে, দেকার্ত চেতনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেছিলেন যেগুলি কেবলমাত্র মানব জগতেই সীমাবদ্ধ। যেমন, গণনা করা, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি। যেসব ধর্ম মানবজগত ও না-মানব প্রকৃতি জগতের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান যেমন, অনুভূতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি, সেগুলিকে তিনি অচেতন অন্ধ যান্ত্রিক দেহজ ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ সেইসব ধর্মগুলিকে তিনি দেহের সঙ্গেই যুক্ত বলে মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, দেহ ও প্রকৃতিকে তিনি এক আসনে বসিয়েছেন, উভয়ই তাঁর কাছে জড়, অচেতন এবং যান্ত্রিক। দেহ বা প্রকৃতিকে যন্ত্রবৎ বিবেচনা করে দেকার্ত তাদের থেকে যাবতীয় কর্তৃত্বের (agency) অধিকার হনন করেছেন। শুধু তাই নয়, অচেতন বস্তু হিসেবে সৃজনশীলতা (Creativity), বিষয়মুখিনতা(intentionality) লক্ষ্যাভিমুখিনতা (goal – directedness) প্রভৃতি চেতনার সব বৈশিষ্ট্যগুলিই এদের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হয়েছে, এমনকি ইচ্ছার স্বাধীনতাটুকুও তাদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়নি।

নারীবাদীরা মনে করেন যে, মূলধারার চিন্তায় নারী, প্রকৃতি, আবেগ প্রভৃতিকে একবন্ধনীভুক্ত করে এবং একই সঙ্গে বুদ্ধি এবং যুক্তির বিরুদ্ধ রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে একধরণের সুচিন্তিত রাজনীতি কাজ করছে। সবক্ষেত্রেই আধুনিক যুগের দার্শনিক

চিন্তায় বুদ্ধির বা যুক্তির প্রাধান্য এবং আবেগ ও আবেগ সংযুক্ত বিষয়কে পরিহার করার যে প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, তার ফল সুদূরপ্রসারী। সামাজিক স্তরে বুদ্ধি বা যুক্তি সবসময়ই পুরুষের গুণ হিসেবে চিহ্নিত অন্যদিকে নারীর জন্য নির্ধারিত হল আবেগ। দেকার্ত স্বীকৃত দেহ-মন বা যুক্তি -আবেগের বিভাজন, যা কার্তেসীয় দর্শনে নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, তা তত্ত্বের সীমানা অতিক্রম করে সামাজিক চিন্তা-ভাবনার স্তরে চলে এল। সামাজিক জীবনে প্রচলিত নানা বিভাজন যেমন- পুরুষ-নারী, মানব-প্রকৃতি, সাদা-কালো, প্রভু-ভৃত্যের মতো স্তরভেদ যুক্ত সম্বন্ধগুলিকে তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করল (Plumwood 1993)। এই বিভাজনগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পুরুষের গুণাবলীরূপে চিহ্নিত ধর্মগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে আর তার বিরুদ্ধ ধর্মগুলি অবহেলিত হয়েছে। নারীবাদীরা মনে করেন, আধুনিক যুগের দার্শনিক তত্ত্বের পরোক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে পিতৃতন্ত্র পুরুষের গুণগুলিকে একত্রিত করতে চেয়েছে এবং তার মাধ্যমে অপুরুষালি গুণগুলিও 'একত্রিত' হয়ে গেছে এবং ভিন্ন বা 'অপর'(other)রূপে চিহ্নিত হয়েছে। দ্বৈতবাদের হাত ধরে খুব সহজেই অপৌরুষের গুণগুলি উপেক্ষিত হয়েছে এবং পুরুষালি গুণগুলি ক্ষমতার কেন্দ্র দখল করেছে। এই লিঙ্গকেন্দ্রিক একদেশদর্শিতা দার্শনিক চিন্তার জগতে 'androcentrism' নামে খ্যাত। 'Androcentrism' যে কেবলমাত্র পুরুষালি গুণের প্রাধান্যকেই সূচীত করে, তাই নয়, বরং ক্ষমতার (power) প্রেক্ষিতে পুরুষালি গুণের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নিসর্গনারীবাদীরা মনে করেন যে, লিঙ্গকেন্দ্রিক একদেশদর্শিতাই মানবকেন্দ্রিকতার (anthropocentrism) জনক। মানবকেন্দ্রিক চিন্তায় মানুষকেই জগতের শ্রেষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং মনে করা হয় যে, না-মানুষ প্রকৃতির তুলনায় মানুষ উন্নততর। মানুষই একমাত্র স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান বা স্বতঃমূল্যবান, বাকী এই জগতের সবকিছুই পরতঃমূল্যবান, অর্থাৎ তার নিজের কোনো স্বকীয় মূল্য নেই, মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিরিখেই তার মূল্য বিচার্য। না-মানুষ জগতের প্রতি মানুষের আচরণ নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হওয়াই উচিত নয় বলে মানবকেন্দ্রিকতা দাবী করে। কারণ নৈতিকতার প্রশ্ন কেবলমাত্র চেতন বিচারশীল জীব অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অচেতন না-মানুষের জগত তাই নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত হবারই সুযোগ পায় না। না-মানুষ জগতের উপর মানুষের নির্যাতন বা নিপীড়নকে তাই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় বলে মনেই করা হয় না এবং

মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু মানুষের এই আচরণ লাভজনক, তাই মানবকেন্দ্রিকতা তাকে সমর্থন করারই পক্ষপাতী (Plumwood 1997)।

নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানবকেন্দ্রিকতা বা লিঙ্গকেন্দ্রিকতাকে বুঝতে হলে তার পিছনে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার রাজনীতিকেও বুঝতে হবে। পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে পুরুষালি গুণগুলিকেই আদর্শ গুণরূপে চিহ্নিত করা হয় এবং অন্যান্য গুণগুলি পুরুষালি গুণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নারীবাদীরা মনে করেন, ক্ষমতার অধিগ্রহণ ব্যতীত তা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র ক্ষমতার সাহায্যেই যেকোনো বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেকোনো সম্পদকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করার সামর্থ্য লাভ করা সম্ভব হয়। তাই নারীবাদীরা মনে করেন যে, প্রকৃতিকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করার পিছনেও একধরণের ক্ষমতার রাজনীতি কাজ করে। কিন্তু এই রাজনীতিকে বোঝার জন্য ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় – তা বুঝে নেওয়া যাক। সহজ কথায়, বলা যায়, ক্ষমতা হল তাই যার সাহায্যে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থাৎ ক তার ক্ষমতার মাধ্যমে খ-কে এমনভাবেই প্রভাবিত করে যে, খ-এর স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ক, খ-কে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করে যা ক-এর প্রভাব ব্যতীত খ কখনোই করতো না, কারণ সেই কাজ খ-এর স্বার্থের পরিপন্থী। আবার, মিশেল ফুকো (Michel Foucault) ক্ষমতাকে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন "... if we speak of the structures or the mechanism of power, it is only insofar as we suppose that certain persons exercise power over others" (Foucault 1983, 217)। ফুকোর মতে ক্ষমতার গঠন বা পদ্ধতিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অন্য কারোর ক্ষমতার উপর প্রযুক্ত হচ্ছে। ফুকোর এই বক্তব্যে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত, ফুকো মনে করছেন যে, ক্ষমতা তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন তা প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ বাস্তবে তার একটা প্রয়োগের দিক থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা সবসময়ই অন্যের উপর প্রযুক্ত হয়ে, অন্যের ক্ষমতাকে খর্ব করে। এখান থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হল, কোনো একটি সামর্থ্য তখনই ক্ষমতারূপে চিহ্নিত হবে, যদি তা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বর্গের ক্ষমতার উপর প্রযুক্ত হয়ে তার বা তাদের ক্ষমতাকে আচ্ছাদিত করে বা সীমিত করে।

ক্ষমতার এই ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, ক্ষমতা কখনোই সমরূপে বন্টিত হতে পারে না। তা অসম বন্টনকেই প্রশ্রয় দেয়। অসম বন্টনের অর্থই হল তা ক্ষমতার স্তরভেদ সৃষ্টি করে। ক্ষমতার সোপানের উচ্চস্তরে যে অধিষ্ঠিত, তার ক্ষমতা, সোপানের

নিম্নস্তরে থাকা ব্যক্তি বা বর্গের ক্ষমতার তুলনায় বেশী। ক্ষমতার সোপানে অবস্থান অনুসারে এক নতুন সমীকরণ তৈরী হয়। একজন বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উচ্চস্তরে স্থান পায় অন্যজনে কম ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে নিম্নস্তরে নেমে যায়। ক্ষমতার প্রকৃতিই হল তা কেন্দ্রিভূত হতে চায়। কোনো একটি ক্ষেত্রে একটি ব্যক্তি বা বর্গ যদি বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে ঐ ক্ষমতার সাহায্যেই অন্যান্য ক্ষেত্রতেও তারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চায়। কারণ ক্ষমতা সবসময়ই দুটি পক্ষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে একপক্ষে কেন্দ্রিভূত হয় এবং অন্যপক্ষকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করার পথ খুঁজতে থাকে। এই ক্ষমতার রাজনীতি সর্বত্র বিদ্যমান। আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা বর্তমান। তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রত্যেক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিন্যাসের ভিন্নতা থাকলেও সবক্ষেত্রেই তা কোনো একপক্ষের (অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের) নির্যাতনকে সুনিশ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশালী সবসময় ক্ষমতাহীনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাহীনের ক্ষেত্রে নির্যাতনে রূপান্তরিত হয়; যদিও এই নিয়ন্ত্রণ যে সবসময় নির্যাতন হিসেবে প্রতিফলিত হয়, এমন নয়। কারণ, নিয়ন্ত্রণের (domination) নিজস্ব কিছু যুক্তি আছে (Warren 1994)। এই যুক্তিতে দেখানো হয় যে, ক্ষমতার নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা বর্গকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযোগ্য অধিকার উচ্চস্তরের ক্ষমতাশালীর আছে। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতার এই উচ্চনীচ স্তরভেদকেও যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতার অসম বণ্টন এই যুক্তিতে সমর্থিত হয়। এই যুক্তিতে সবসময়ই মনে করা হয় যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা বর্গ কিছু বিশেষ গুণ বা ধর্মের অধিকারী যার জন্য তারা এই বিশেষ ক্ষমতা লাভে সক্ষম এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতে ঐ গুণের বা ধর্মের অভাব থাকায় তারা অনুন্নত, তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই ধরনের বিভিন্ন যুক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতার রাজনীতি বিভিন্ন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সেই নিয়ন্ত্রণকে যথাযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করারও চেষ্টা করে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণের রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কেন্দ্র-প্রান্তের বিভাজন সৃষ্টি হয় (Warren 1994)।

নারীবাদীরা মনে করেন যে, দ্বৈতবাদী চিন্তাধারাও সবসময়ই জগতকে দুটি কোটিতে ভাগ করতে চায় এবং এই কোটি দুটি কখনোই সমমূল্যযুক্ত হয় না। একটি বেশী মূল্যবানরূপে কেন্দ্রে স্থান পায়, অন্যজন কম গুরুত্বপুর্ণ হিসেবে প্রান্তের দিকে সরে যায়। ভ্যাল প্লামউড (Val Plumwood) মনে করেন যে, যেকোনো বৈষম্যের

পিছনে কোনো না কোনো ধরনের কেন্দ্রিকতার (centrism) ধারণা কাজ করে (Plumwood 2002)। দ্বৈতবাদী চিন্তাধারাতে কীভাবে কেন্দ্রস্থিত সত্তা এবং প্রান্তস্থিত সত্তা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কীভাবে একটি সত্তার অবমূল্যায়নের সূচনা হয় তা ভ্যাল প্লামউড বিস্তারিতভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। প্লামউডের এই আলোচনাকে ক্ষমতার রাজনীতির প্রেক্ষিত থেকে বিচার করে দেখলে দ্বৈতবাদের রাজনীতিকে বোঝা এবং বিভিন্ন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তার প্রভাবকে অনুধাবন করা সহজতর হবে।

দ্বৈতবাদী চিন্তায় দুটি বিষয়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়। গুণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে দুটি বিষয়ের মধ্যে এই বিভাজন করা হয়। এই জগতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে। প্রতিটি বস্তুই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য বস্তুর থেকে স্বতন্ত্র। ফলে, দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা খুবই স্বাভাবিক। চারিত্রিক বা গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাবশতঃ বিভাজন গড়ে তোলা যেতেই পারে। ফলে, দ্বৈতবাদ যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাতে সমস্যার কোনো কারণ নেই। কিন্তু, সমস্যা হয়। নারীবাদীরা অভিযোগ করেন যে, দ্বৈতবাদ কেবলমাত্র বিভাজন করে না, বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-নীচ স্তরভেদের সৃষ্টি করে। কোনো একটি পক্ষ বেশী মূল্যবান রূপে চিহ্নিত হয় আর অন্যটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। স্তরভেদযুক্ত এই বিভাজনে একটি সত্তা মুখ্যসত্তা হিসেবে প্রাধান্য পায়, অন্য সত্তাটি গৌণসত্তা রূপে অবহেলিত হয়।

প্লামউড মনে করেন যে, দ্বিকোটিক এই রাজনীতিতে মুখ্যসত্তা কেন্দ্রে স্থান পায় এবং গৌণসত্তা 'অপর' বা 'other' হিসেবে প্রান্তের দিকে সরে যায়। এই 'অপর' রূপে চিহ্নিত কোটিতে একটি ধর্মই স্বীকৃত হয়, তাহল মুখ্যসত্তা যে ধর্মের অধিকারী, সেই ধর্মের অভাব। অর্থাৎ কেন্দ্রস্থিত মুখ্যসত্তা যে গুণের স্বীকৃতি পেয়ে কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে, অন্যান্য সত্তায় কেবলমাত্র সেই গুণের অভাব আছে বলেই মনে হয়। ঐ বিশেষ গুণ ব্যতীত মুখ্যসত্তায় অন্য কোনো গুণ আছে কিনা, তা কিন্তু কখনোই বিবেচনাধীন হয় না। অপর হিসেবে চিহ্নিত কোটিতে থাকা বস্তুগুলির মধ্যেও যে বিভিন্নতা থাকতে পারে, তাও স্বীকৃত হয় না। তাদের কেবল মাত্র একটি বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে বলে মনে হয়, মুখ্যসত্তায় যে বৈশিষ্ট্যটি আছে, সেই বৈশিষ্ট্যের অভাব। যেমন, মন বা দেহের মধ্যে দ্বিকোটিক বিভাজন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে চেতনার উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। মনে চেতনা আছে, দেহে চেতনা নেই। কিন্তু দেহ চেতনাহীন হওয়া

সত্ত্বেও যে দেহের স্বতন্ত্র কিছু গুণাবলী থাকতে পারে এবং সেই গুণগুলিও যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তা দ্বৈতবাদী চিন্তা কাঠামোতে ভাবাই সম্ভব হয় না (Plumwood 2002)।

দ্বৈতবাদী চিন্তায় যখন এইভাবে বিভাজন গড়ে তোলা হয় তখন দুটি কোটির মধ্যে অতিবিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। একটি কোটি গুণযুক্ত এবং অন্য কোটি সম্পুর্ণ গুণবিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। বুদ্ধিকে যেখানে বিভাজনের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে মুখ্যসত্তা বুদ্ধিযুক্ত এবং গৌণসত্তা সম্পুর্ণ বুদ্ধিহীন রূপেই চিহ্নিত হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মাত্রাভেদ স্বীকৃত হয় না। এর ফলে মুখ্যসত্তা থেকে গৌণসত্তা এতদূরে সরে যায় যে, তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ গৌণসত্তা সবসময়ই আদর্শ গুণের অভাবের প্রতীকরূপেই উপস্থিত থাকে। যেমন- দেহ-মনের বিভাজনের ক্ষেত্রে মন চেতন আর দেহ অচেতন বস্তু হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। অচেতনতা অতিরিক্ত দেহের কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তাই করা সম্ভব হয় না। বর্ণ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে সাদা ও কালো মানুষের বিভাজন কেবলমাত্র সাদা রঙের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতির ভিত্তিতেই করা হয়। কালো মানুষদেরও যে কোনো গুণ থাকতে পারে, তা যেন ভাবাই সম্ভব হয় না। এই ধরনের চিন্তা প্রক্রিয়ার কারণেই মন চেতনার অধিকারী হিসেবে বেশী প্রাধান্য পায় বা সাদা মানুষ, কালো মানুষের থেকে সমাজে বেশী প্রতিষ্ঠা বা সম্মান লাভ করে আর অন্যদিকে কালো মানুষেরা চেতনাহীন, অবহেলিত, উপেক্ষিত হয়ে প্রান্তের দিকে সরে যায়। তাদের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে যায়। নারীবাদীরা মনে করেন, এই উচ্চ-নীচ স্তরভেদের মাধ্যমে শুধু যে একদলের অবমূল্যায়ণ হয়, তাই নয়, নিম্নস্তরে স্থান পাওয়া গোষ্ঠীকে নির্যাতন করাও যুক্তিসম্মত হয়ে ওঠে।

মুখ্যসত্তা ও গৌণসত্তার মধ্যে অতিবিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়ার পর মুখ্যসত্তা সর্বৈবভাবে গৌণসত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়। গৌণসত্তার উপর নিজের অস্তিতের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যসত্তা সেই নির্ভরশীলতাকে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে। দ্বৈতবাদী চিন্তাধারায় গৌণসত্তার অস্তিত্ব ততটুকু স্বীকার্য যতটুকুর দ্বারা মুখ্যসত্তার পরিধির সীমানা নির্দিষ্ট হয়। চেতনার পরিধি মানবজগতের সীমানা নির্দেশ করে। পরিধির বাইরে থাকা অচেতনের অস্তিত্বও সেইজন্যই স্বীকার করতে হয়, কারণ অচেতন না থাকলে চেতনের সীমানা সুনির্দিষ্ট হয় না। মানবজগত নিজের অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি জগতের উপর নির্ভরশীল কিন্তু এই নির্ভরশীলতা মানবজগত কখনোই স্বীকার করে না। নারীবাদীরা এই বিষয়টিকে

অস্বীকৃত নির্ভরতার (denied dependence) দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিকোটিক বিভাজনে মুখ্যসত্তা সামনের সারিতে স্থান পায় আর গৌণ সত্তা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন, অনাবশ্যক সত্তারূপে পশ্চাৎপট রচনা করে। মুখ্যসত্তা সেই সিংহাসনে আসীন, যে সিংহাসনকে নির্মাণ করা এবং বহন করার দায়িত্ব থাকে গৌণসত্তার উপর। সিংহাসনে আসীন সত্তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পিছন থেকে যারা সিংহাসনকে ধরে রাখে তারা দৃষ্টিপথের আড়ালেই থেকে যায়।

প্লামউড আরো মনে করেন যে, মুখ্যসত্তা ও গৌণসত্তার মধ্যে অতিবিচ্ছেদ ঘটানোর পর অর্থাৎ দুটি কোটিকে একে অন্যের থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন করার পর ঐ কোটিগুলির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্ব্যক্তিক বিভিন্নতাকে দ্বৈতবাদে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় যে, একটি কোটির সব সদস্যই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কোনো সদস্যের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সেখানে স্বীকৃত নয়। একীকরণের (homogenisation) এই প্রক্রিয়া অতিবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি চলতে থাকে। যেমন, সমাজে নারী এবং পুরুষের বিভাজনের ক্ষেত্রে পুরুষমাত্রই যুক্তিশীল, বুদ্ধিমান এবং নারী মাত্রই অযৌক্তিক, বুদ্ধিহীন হিসেবে বিবেচিত হয়। নারী আবেগপ্রবণ অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, অযৌক্তিক এবং কেবলমাত্র নিম্নস্তরের দেহজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধেই এই গুণাবলী প্রযোজ্য। অন্যদিকে পুরুষ মাত্রই আবেগহীন, কেবল যুক্তির দ্বারা চালিত, তাই কোনো পুরুষের আবেগপ্রবণতা এই চিন্তায় সমর্থনযোগ্য নয়, বরং তা নিন্দনীয়। নারীবাদীরা মনে করেন যে, দ্বৈতবাদী চিন্তা ঘরানা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই বিভিন্নতাকে অস্বীকার করতে চায়। একটি গোষ্ঠীর সবাই যদি সমগুণযুক্ত হয় তাহলে খুব সহজেই একের জায়গায় অন্যকে প্রতিস্থাপন করা যায়। বিভাজন রেখাটিও খুব স্পষ্ট থাকে। বিভাজন রেখাটি সুস্পষ্ট না হলে অন্য গোষ্ঠীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধাজনক হয়ে থাকে। পুরুষ এবং নারীর গুণাবলীর মধ্যে যদি সুস্পষ্ট ভেদরেখা না থাকত তাহলে পুরুষ মাত্রই পুরুষালি আর নারী মাত্রই মেয়েলি – এই বিভাজন আর করা যেত না। নারী আবেগতাড়িত তাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম- সেই কারণে, নারীর মঙ্গলার্থেই বুদ্ধিমান, যুক্তিশীল পুরুষের নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত কর্তব্য – এই যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সহজ হত না (Plumwood 2002)।

দ্বৈতবাদী চিন্তাধারা সবসময়ই দেখাতে চেষ্টা করে যে, এই বিভাজন কার্যকরী এবং উভয় গোষ্ঠীর জন্যই উপযোগী যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রান্তস্থিত গৌণসত্তা

সবরকমভাবে কেন্দ্রস্থিত মুখ্যসত্তাকে ধরে রাখে, তার অস্তিত্ব রক্ষার যাবতীয় সরঞ্জামের যোগান দিয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও তার কোনো স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হয় না। গৌণসত্তা নিছক প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগানের যন্ত্রমাত্র হয়েই থেকে যায়। মানব-প্রকৃতির দ্বিকোটিক বিভাজনে প্রকৃতি মানুষের বেঁচে থাকার যাবতীয় বস্তুর যোগান দেয় কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে ভোগ্যপণ্যের অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা সে লাভ করতে পারে না। উপনিবেশস্থাপনকারী ও উপনিবেশাধীনের সম্বন্ধও একই রকম। উপনিবেশস্থাপনকারীর যাবতীয় সম্পদের আয়োজন করার দায়িত্ব উপনিবেশাধীনের কিন্তু উপনিবেশাধীন সত্তারও যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তারা যে নিছক যন্ত্রমাত্র নয়, তাদেরও যে সৃজনশীলতা থাকতে পারে, তারাও যে কর্তৃত্ববান হতে পারে – তা যেন এই প্রক্রিয়ায় ভাবাই সম্ভব হয় না। দ্বিকোটিক বিভাজন সবসময়ই কেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবহেলা বা উপেক্ষা মানবকেন্দ্রিক চিন্তারই পরিণাম। তবে এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ বর্জন করা কিন্তু সহজ নয়।

মানবকেন্দ্রিক চিন্তার সমর্থকরা মনে করেন যে, মানবকেন্দ্রিকতা অবশ্যম্ভাবী, এর থেকে ভিন্ন কোনো সম্ভাবনার কথা চিন্তাই করা যায় না, কারণ মানুষ সবসময় তার নিজের প্রেক্ষিত, অবস্থান, ইতিহাস, মূল্যবোধ বা পছন্দ-অপছন্দের নিরিখেই চিন্তা করতে পারে। মানবকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে যদি মুক্ত হতে হয় তাহলে মানুষকে তার প্রেক্ষিত, অবস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে হবে, যা বস্তুতঃ অসম্ভব। সুতরাং মানতে হবে যে, মানবকেন্দ্রিক চিন্তা বর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। অতএব, কেবলমাত্র মানুষ এবং তার স্বার্থই বিবেচনাযোগ্য, অন্যান্য বিষয়ের প্রতি নৈতিক বিবেচনা বা সহানুভূতি বা উদ্বেগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই জগতে কেবলমাত্র মানুষেরই মূল্য আছে, মানুষই কেবলমাত্র স্বতঃমূল্যবান, আর বাকী সব বস্তুই যেহেতু মানুষের মূল্যের নিরিখেই বিচার্য তাই তারা কখনোই স্বতন্ত্র বিচার-বিবেচনার বিষয় হতে পারে না।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে নিসর্গতাত্ত্বিকরা সমর্থন করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। প্লামউড মনে করেন, মানুষ নিজের প্রেক্ষিত থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হতে অসমর্থ হলেও কিছু ক্ষেত্রে মানুষ চাইলে অন্যের স্বার্থ বা প্রয়োজনের কথাও চিন্তা করতে পারে, নিজের স্বার্থের ভিত্তিতে চিন্তা না করে, অন্যের (other) প্রয়োজন, চাহিদা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিজের চিন্তার পরিসরে স্থান দিতে পারে। অন্ততঃ অন্যের

চাহিদা বা প্রয়োজন বা স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে পারলেই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে প্লামউড মনে করেছেন। (Plumwood 1997)

মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ এবং ক্ষমতার রাজনীতি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, তার প্রভাবে বাস্তুতন্ত্রের সাম্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। মানব সমাজে কার্তেসীয় চিন্তার অনুসরণে বুদ্ধিকেকেন্দ্রিকতা যেভাবে পুরুষকেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে- নারী-পুরুষের বিভাজন ঘটিয়েছে, বিশ্বজগতেও ঐ বুদ্ধিকেন্দ্রিকতাই মানব-প্রকৃতির বিভাজন গড়ে তুলেছে। মানুষ বুদ্ধির অধিকারী হিসেবে ক্ষমতার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে আর প্রকৃতি বুদ্ধিহীন হিসেবে প্রান্তের দিকে সরে গেছে। মানুষ, প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত জীবনধারণে অক্ষম, কিন্তু সেই নির্ভরশীলতা কখনোই মানুষের আচরণে প্রকাশ পায় না। ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে মানব সমাজ সেই নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করতে চায়, প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনের সামগ্রী বা সাধন হিসেবে গণ্য করতেই তারা আগ্রহী। এই শোষণ এবং নির্যাতন প্রকৃতিকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে চলেছে। আর যদি সম্বন্ধের কথা বলা হয়, তাহলে এই সম্বন্ধকে একমুখী শোষণের সম্বন্ধ রূপেই চিহ্নিত করতে হবে। নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সবরকম সম্বন্ধেই রাজনীতি আছে। আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। এপ্রসঙ্গে তাঁদের একটি বিখ্যাত স্লোগান আছে -- 'personal is political'। এই রাজনীতি মূলতঃ ক্ষমতার রাজনীতি। অর্থাৎ, ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ সর্বত্রই বিদ্যমান, একইসঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, যেকোনো সম্বন্ধ তখনই সফল হয়, যখন সেখানে ক্ষমতার সমবিন্যাস বর্তমান থাকে, যখন সম্বন্ধীদ্বয় সমস্তরে অধিষ্ঠিত থাকে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উচ্চ-নীচ স্তরভেদযুক্ত একমুখী সম্বন্ধেই বৈষ্যমের সূচনা হয়। দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে; দুটি বিষয়ের মধ্যে ভিন্নতা থাকার কারণেই তারা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে চিহ্নিত হয়। তা না হলে তাদের অভিন্নরূপেই গণ্য করতে হত। সুতরাং ভিন্নতার স্বীকৃতি আবশ্যিক। কিন্তু, সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই, যখন দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে স্তরভেদ অনুসারে গুরুত্ব আরোপিত হয়। দুটি বিষয়ই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ রূপে স্বীকৃত হলেই কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু গুরুত্বের মাত্রাভেদ স্বীকৃত হলেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাধান্যেরও মাত্রাভেদ হয়। যার গুরুত্ব বেশী সে বেশী প্রাধান্য পায়, অন্যজন অপ্রধান গৌণসত্তা রূপে উপেক্ষিত হয়। প্রাধান্যযুক্ত সত্তায় ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হয়। ক্ষমতার প্রকৃতিই যেহেতু কেন্দ্রিভূত হওয়া, তাই একজায়গায় ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হলে,

অন্য জায়গায় ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে ফলে কেন্দ্রস্থিত সত্তা ক্রমশ ক্ষমতাবান হতে থাকে এবং প্রান্তস্থিত সত্তার ক্ষমতা সেই অনুসারে হ্রাস পেতে থাকে। ক্ষমতাবান সত্তা ক্ষমতাহীনকে শোষণ করে আরো বেশী ক্ষমতার অধিকারী হতে চেষ্টা করে। বৈষম্যের রাজনীতি ক্ষমতার হাত ধরে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং, ক্ষমতার অসম বিন্যাস ও কেন্দ্রিকরণের প্রক্রিয়াকে যদি রোধ করতে হয়, বৈষম্যহীন পৃথিবী যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে বৈষম্য সৃষ্টিকারী চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উচ্চ-নীচ (top-down) স্তরভেদমূলক চিন্তার অনুষঙ্গকে ছিন্ন করতে হবে। তবেই মানব-প্রকৃতি তথা অন্যান্য বৈষম্যমূলক সম্পর্কগুলির নতুন রসায়ন সৃষ্টি হবে।

তথ্যপঞ্জী :

1. Cottingham. J. 1996. *Descartes : Meditation on First Philosophy – with Selection from the Objection* and *Replies.* Cambridge: Cambridge University Press.
2. Foucault, M. 1983. ‘Afterword : The Subject and Power’ in H. Dreyfus and P. Rabinow. eds. *Foucault: Beyond Structuralisms and Hermeneutics.* 2nd Edition. Chicago : University of Chicago Press.
3. Plumwood, Val. 1993. *Feminism and the Mastery of Nature.* London : Routledge.
4. Plumwood, Val. 1997. ‘Androcentrism and Anthropocentrism: Parallels and Politics’ in K. J. Warren. ed. *Ecofeminism : Women, Culture, Nature.* Bloomington : Indiana University Press.
5. Plumwood, Val. 2002. *Environmental Culture : The Ecological Crisis of Reason.* London: Routledge.
6. Warren, K. J. 1994. ‘Towards on Ecofeminist Peace Politics’ in K. J. Warren. ed. *Ecological Feminism.* London: Routledge.

7. Warren K. J. 1996. ‘The Power and the Promise of Ecological Feminism’ in K. J. Warren. ed. *Ecological Feminist Philosophies.* Bloomington : Indiana University Press.
8. Williams, B. 2014*. Descartes: The Project of Pure Enquiry.* UK: Taylor and Francis.
9. Wilson, M. D. 1991. *Descartes: The Arguments of the Philosophers.* London: Routledge.

সেক্স, পর্নোগ্রাফী ও বাঙালীর যৌনতা : একটি সামাজিক মূল্যায়ন

উৎকলিকা সাহু
গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যৌনতা মানবজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীনভাবে যুক্ত, জীবজগতে যৌন প্রবৃত্তি এক স্বাভাবিক বিষয়। দেশ কাল নির্বিশেষে সকল জাতি, পরিবেশে যৌনতা সত্য। মানুষের শৈল্পিক কর্মধারাতেও তাই যৌনতার প্রকাশ ঘটেছে বারংবার। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র বা উপন্যাসেও যৌনতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীর জীবনেও যৌনতার প্রবেশ তাই স্বাভাবিক। ভারতীয় রক্ষনশীলতায় যৌনতা এক নিষিদ্ধ শব্দ বলে পরিগনিত হলেও অতীতের ভারতবর্ষে চারুকলার দিকে তাকালে এই নিষিদ্ধ শব্দটির প্রতিও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বিষয়টি প্রাচীন ভারতেও নিষিদ্ধ ছিল কিনা তা প্রশ্ন জাগায়। প্রায় ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে চান্দেল্লদের দ্বারা তৈরী মন্দিরের দেওয়ালের ভাস্কর্যে যৌনক্রিয়া ও নগ্নতার প্রকাশ দেখা যায়। অনুমান করা হয় বাৎসায়নের কামসূত্র দ্বারা এই ভাস্কর্য অনুপ্রানীত হয়েছে। বাঙালীর জীবনেও যৌনতা ও নগ্নতা বহুপূর্বেই ছিল। সে সম্পর্কে বহু গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া গেছে। ছাপাখানা তৈরীর আগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমপর্যায় নিয়ে যে পুঁথি বা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি ছাপাখানা স্থাপনের পরে বটতলার সাহিত্য ও চটি বই গুলিতেও নারী-পুরুষের গোপন বিষয়ে চটুল হাস্যকর রচনা প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় আলোক বর্তিকার সংস্পর্শে এসে বাঙালীর নিজস্ব যৌন চিন্তা ও নৈতিকতার প্রারম্ভ হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভিক্টোরিয়ান সমাজের মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য চিন্তার মধ্যেও বৈচিত্র ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল। ঊনিশ শতক থেকে বিংশ শতকে পদার্পনের সময়কালেও বাঙালীর যৌন ভাবনার মধ্যেও বৈপরীত্ত-বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বাঙালীর যৌন চেতনা বা তার আলংকারিক প্রকাশ থিয়েটার, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই যৌনতা নতুন নয়, যদি আরো প্রচীন যুগে ফিরে যাওয়া যায় তবে বৈষ্ণব পদাবলীর সময়েও এর চর্চা পাওয়া গেছে। একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখনই তাকে যৌনপর্যায়ের ভিত্তিতেই ‘ছেলে’ বা ‘মেয়ে’ বলে

বিভাজন করা হয়। প্রাচীন ইউরোপেও যৌনতাকে উপজীব্য করে লেখা লিখি হোত। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পোপ চতুর্থ পল প্রথম ক্যাথলিক চার্চের নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন যার মধ্যে ৫৫০ টি গ্রন্থ ছিল ধর্মীয় কারণে নিষিদ্ধ এবং আরো কিছু বইকেও নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছিল অতিমাত্রায় যৌনতাকে উপজীব্য করে রচনার জন্য। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভার্টিকান নিয়মিত 'লিব্রোরাম প্রোহিবিটোরাস' বা নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করে গেছে। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। ১৭৪৮ সালে ক্লিল্যান্ড রচিত গ্রন্থ 'Memoirs of a Women of Pleasure' যেটা পরে 'The Life and Adventure of Miss Fanny Hill' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল যেটিও ষাটের দশক অবদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে নিষিদ্ধ ছিল।[১] যৌনতার সাথে পর্নোগ্রাফির সম্পর্ক সম্পৃক্ত। 'পর্নোগ্রাফি' শব্দটিও নিষিদ্ধ বলে ভাবা হোত। কিন্তু শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। শব্দটির সাথে গ্রীক শব্দ Pornographos এর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। Porne ও graphien এর যোগসূত্রে শব্দটির উৎপত্তি। Porne এর মানে 'বেশ্যা'; সেই সহ Porne পর আছে Pernanai/ 'বেচা' ক্রিয়াপদের ছায়া। নিস্কর্ষ : Porne শুধু সাধারণ ভোগ্য বারবণিতা কিংবা অভিজাত ভোগ্য উপপত্নী নয়, 'ক্রীতদাসী'ও। graphien এর অবদান graphos, প্রাথমিক মানে যার 'লিখন' অনুষঙ্গত জুড়ে তার সঙ্গে 'অঙ্কন'।[২] সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে শব্দ হিসাবে Pornography বা বেশ্যায়ন এর অর্থ হল গণিকা নিয়ে লিখিত বা চিত্রায়িত প্রতিবেদন স্বরূপ। "আত্মীয়তায় গ্রিক হলেও ইংরেজী 'Pornography' বা ফরাসি 'Pornographie' বয়সে নেহাত অর্বাচীন। যে শতকে 'intellectual', 'capitalism', 'bureaucracy', 'aesthetic', 'individualism' ইত্যাদি ভারি ভারি তথা শ্রবননন্দন শব্দাবলীর যাত্রারম্ভ, সেই ঊনিশ শতকেই ('Heterosexual' ও 'homosexual' সহ) 'Pornography' –র প্রাদুর্ভাব (Raymond Williams : Keywords; Annette Kuhn : The Power of the Image)। এ থেকে এমন ধারণা নেহাত বাতুলতা, যে, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি 'পর্নোগ্রাফি' শব্দটির পত্তন হওয়ার আগে যৌন অভিপ্রকাশের কোন অবকাশ ছিলনা – মূর্তি, চিত্র, কাব্য, ভাস্কর্য, কত না শিল্পক্ষেত্রে তার সাক্ষর নিদর্শ রয়েছে।[৩] ১৮৫৭ সালে ডাওলিসনের একটি গ্রন্থ 'Medical Lexicon : A Dictionary of Medical Science' বইটিতে প্রথমবার ইংরেজীতে পর্নোগ্রাফিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল "A description of Prostitutes or of Prostitution as a matter of public hygiene."[৪] সুতরাং উক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে

স্বচ্ছ একটি ধারনার অবতারনা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল যৌনতা ও পর্নোগ্রাফির সাথে বাঙালী যুবসমাজ তথা বাঙালীর ইতিহাসে সম্পর্ক কতখানি। 'অশ্লীলতা' বা 'গোপনীয়তার' মোড়কে এই জৈব চাহিদাকে আড়ালে করার কুণ্ঠা কেন বাঙালী সমাজে। পর্নোগ্রাফি ও যৌনতা বহু পূর্ব থেকেই বাঙালীর স্বত্তায় বিচড়ন করে আসছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে চতুরাশ্রমের বিষয়ে বলা হয়েছে তা হল ব্রহ্মাচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গুরুগৃহে শিক্ষালাভ হল 'ব্রহ্মচর্য' পর্যায়। কামকে ত্যাগ করে তখন শিক্ষা গ্রহন করার সময়। আর 'গার্হস্থ্য' জীবন মানেই সেখানে অবধারিত ভাবে 'কাম' পালনীয়। কারণ 'কামের' সাথেই প্রজননের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীনভাবে যুক্ত। " 'শুক্র' এবং 'আর্তব' -উভয়েই দেহের 'রক্ত' ঘনীভূত হয়ে গড়ে ওঠে। তাই দেহের সারাৎসার 'বীজ' –এর যথাযথ সংস্করণ ও ব্যবহারের নির্দেশ বারবার দেওয়া হয়েছে হিন্দু আয়ুর্বেদের চিকিৎসাশাস্ত্রে। ব্যক্তির শরীরের গঠন, লিঙ্গনির্ণয় –সবই নির্ধারিত হয় 'শুক্র' এবং 'আর্তব' –এর আনুপাতিক মিশ্রণ এবং প্রাধান্য অনুযায়ী। কল্পনা করা হয়, দেহের কঠিন, কাঠামোগত অংশগুলি গড়ে ওঠে পুরুষবীর্য থেকে এবং অপেক্ষাকৃত কোমল অংশসমূহ চামড়া, মাংস –প্রভৃতি গড়ে ওঠে 'আর্তব' থেকে।"[৫] ভারতীয় সভ্যতায় যৌন নৈতিকতা পার্থক্য পরিস্ফূট হয়েছে। ব্যক্তির সমগ্র জীবনের একটি অংশ হিসাবে যৌনতাকে ধরা হয়। ব্যক্তির এই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সাধনা হল 'পুরুষার্থ'। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নিয়ে এই পুরুষার্থ তৈরী। একটি মানুষ তার জীবনের প্রথম তিনটি উপাদান পালন করার পর অন্তিম প্রাপ্তি হল 'মোক্ষ' লাভ করা। 'মোক্ষ' মানেই মৃত্যুর পর জীবের আত্মার পরমাত্মার সাথে লীন হয়ে যাওয়া। 'পুরুষ' শব্দটির অর্থটি হল অগ্রসরমান সত্ত্বা। 'পুরুষ' এবং 'নর' দুটি পৃথক ধারণা। 'নর' মানে যে নিজের সকল পাপ পূন্যের দায় বহন করবে। " 'গীতা'য় 'নর' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে ৮ বার (২/২২, ৫/২৩, ১২/১৯, ১২/২২, ১৭/১৭, ১৮/১৫, ১৮/৪৫ এবং ১৮/৭১ : 'অধ্যায়' এবং 'শ্লোক' সংখ্যার ভিত্তিতে, সর্বত্রই 'নর' হলেন সেই ব্যক্তি, তিনি 'মোক্ষ' অভিমুখী নন।"[৬] নারী শরীরকে নিয়েও প্রাচীন ও মধ্যযুগে আলোচনা হয়েছে। তবে বলা হয়ে থাকে যে, চন্দ্রের যেমন ষোলটি কলা তেমনি নারী শরীরের ষোলটি স্থানে এই সময় রতিতিথি অনুসারে 'কাম' সঞ্চালন হয়। নারী শরীরকেও যৌনক্ষমতা অনুসারে চারভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী ও হস্তিনী। নারী যৌনপথকেও চারভাগে ভাগ করা হয়েছে যথাক্রমে 'করিকর', ফনিভোগ, 'অর্ধেন্দু' ও 'কামাঙ্কুশ'। এছাড়া বাৎসায়ন নির্দেশিত মৈথুনমুদ্রা, প্রহনন, শিৎকার, নায়ক-নায়িকা প্রকরণ ব্যভৃত হয়েছে।

রতিশাস্ত্রকারদের তুলনায় 'অনঙ্গরঙ্গ' র লেখক কল্যানমল্লের পার্থক্য হল তিনি 'লিঙ্গভক্ষন' এর কথা বলেছেন অর্থাৎ পুরুষলিঙ্গের দ্বারা নারীকে যৌন উদ্দীপন করা।[৭] প্রাচীন কালে ভারতের যৌনাচার নিয়ে তথ্য প্রমান পাওয়া গেছে। গ্রিস বা মিশরেই কেবল এই যৌনাচার আবদ্ধ ছিলনা। ভারতেও এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। ঋগবেদে রুদ্র ও তাঁর কন্যা ঊষার যৌন সম্পর্ক বলা হয়েছে। (১০/৬১/৫-৭)।[৮] ঐতরেয় ব্রাহ্মন (৩/৩/৯), শতপথ ব্রাহ্মন (১/৭/৪/১-৮) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মন (৮/২/১০) প্রজাপতি কর্তৃক তাঁর নিজের কন্যাকে সম্ভোগের ঘটনাও আলোচিত হয়েছে।[৯] এমনকি মহাভারতেও দ্রৌপদী পঞ্চ পান্ডবের পত্নী হয়েছিল। পান্ডবরা দ্রৌপদীর রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলেন যা মহাভারতে দেখতে পাওয়া গেছে :

"কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম।
বভূবাধিকমন্যাভ্যঃ সর্বভূতমনোহরম্।।" (১৮৪/১৪)। [১০]

স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিনাদন্ডে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেনীর নারীর সাথে যৌনসঙ্গম করা যেত। গণিকা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের স্বৈরিনী ছিল এদের মধ্যে। এদের ক্ষেত্রে একে ব্যভিচার বলা হোত না। কিন্তু অপরের রক্ষিতার সাথে যৌনসঙ্গম ব্যভিচার বলেই গন্য করা হোত।[১১] সুতরাং, যৌনতা নিয়ে আদি যুগ থেকেই পুরান ও স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচনা হয়ে আসছে। যৌনতা ও যৌনচর্চা তাই বাঙালী তথা আপামর ভারতীয়দের কাছে কোন নতুন ঘটনা নয়।

যদি মধ্যযুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের রসশাস্ত্র আলোচনা যুক্তিযুক্ত। এই কাব্যের অলঙকার এর শোভা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। আদিরসকে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠরস বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। শ্রীরাধিকার শৃঙ্গার রসের কথা কাব্যে স্থান পেয়েছে-

"চাহিল মোরে সুরতী না দিলো মো অনুমতী
দেখিলো মো দু অজ পহরে।।" [১২]

এর পরেই কবি বলেছেন-

"পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞি পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গনে।।" [১৩]

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য করুন রসের ব্যঞ্জনায় আবর্তিত হতে থাকে। কবি এখানে সেই দুর্লভ কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান, যার দ্বারা সম্ভোগ শৃঙ্গারে কলুষিত কাব্য নম্র বিধুর বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সৌন্দর্যভূমিতে উত্তীর্ন হয়।"[১৪] অন্যদিকে বিদ্যাপতি রাধার

সদ্যযুবতী সত্ত্বাকে দেখিয়েছেন। শতানন্দের একটি পদেও বয়ঃসন্ধির রাধার বর্ণনা এরূপ-

“গতেবাল্যে চেতঃকুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষবাস্যাঃ স্তনযুগভূন্নিজিগমিষু।
সকম্পা ভ্রুবল্লী চলতি নয়নং কর্নকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ।।” [১৫]

অর্থাৎ বাল্যকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর শ্রীরাধিকার হৃদয়ে এখন মদন বাণ বিদ্ধ। তাই দেখে তাঁর স্তনযুগ যেন ভয়েই নির্গত হতে ইচ্ছুক। তাঁর ভ্রুবল্লী কম্পিত এবং মধ্যভাগ কৃশ। তাঁর নিতম্বযুগল অবসন্ন হয়েছে। তাই শতানন্দের রাধার সাথে বিদ্যাপতির ‘সৈসব যৌবন দরাসন ভেল’ পদের সাদৃশ্য আছে।[১৬]

বারোশো শতকে রচিত গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ শতকে গৌরাধিপতি লক্ষন সেনের সভাপতি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচনা করেন। গীতগোবিন্দ প্রেম রসে সিক্ত একটি বৈষ্ণব পদাবলী যা গীতিকাব্যও বটে। রাধার বিরহ, অভিমান, মিলন হল এই বিখ্যাত কাব্যের বিষয়বস্তু। গীতগোবিন্দের বিখ্যাত অংশটি হল-

“স্মর – গরল – খন্ডনং, মম শিরসিমন্ডনম্
দেহি পদপল্লব মুদারম।।”

অর্থাৎ তোমার গরল নাশকারী চরণপদ্ম আমার মাথায় দাও, আমার দেহমনের বিরহ শীতল হোক। এই বিতর্কিত অংশ নিয়ে হইচই শুরু হয়েছিল তৎকালীন সমাজে। শ্রীকৃষ্ণ যিনি সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর মাথায় কিবা নারীরূপী শ্রীরাধিকার চরণ! তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দকে নিয়ে প্রচুর বিতর্কও বিদ্যমান। ওদিকে বড়ু চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ –এর ‘নৌকাখন্ড’ –এ রাধা-কৃষ্ণের কামভাবের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এভাবে-

“দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে।।
কুচ কনককমলকোরক আকার।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার।।...
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন।।

ধীরে ধীরে পরসিয়া রাধার জঘন।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবনে।।
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতি সুখে।।”[১৭]

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের থেকেও অনেক বেশী সক্রিয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের রাধার থেকেও বহুলাংশে পরিণত বড়ু চন্ডীদাসের রাধা। ‘বাণখন্ডে’ রাধা রতিক্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের থেকেও পরিণত ও সক্রিয়। তবে এটাও বাস্তব যে বড়ু চন্ডীদাস ও জয়দেবের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন কেবলমাত্র শরীরে সীমাবদ্ধ থাকছেনা। তবুও বড়ুর কাব্যে রাধার রমণ কৃষ্ণের কাছেও উপভোগ্য ছিল-

“কপট কোপ হরী রাধা নাগরী গোহালী।
বলে উঠিআঁ উপরে তলে কৈল তুরী।।
উপরে নাগরী রাধা তলে নন্দোবালা।
মেঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা।।
যেন রতি পরকার করিল কাহ্নে।
রাধাএঁ করিল এবেঁ তেহেন দুগুনে।।
সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।
তখনে তোষিল রাধা মাধবের মনে।।”[১৮]

মধ্যযুগের ভারতে দৌলত কাজীর ‘লোরচন্দ্রানী’ একটি রোমান্টিক আখ্যান কাব্য। দৌলত কাজী সম্ভবত পদাবলী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন বেশী। নায়িকা চরিত্র ‘চন্দ্রানী’ –র স্বামী বামন বীর্যশালী হলেও সে ছিল নপুংসক। তাই স্ত্রীয়ের সাথে কামকেলিতে তিনি অসমর্থ-

“সর্বগুণে সম্পূর্ন যৌবন বীর্যবল
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।।”[১৯]

যৌন বাসনায় পরিপূর্ন না হওয়ায় চন্দ্রানী নিত্য বিলাপরতা। তখনি তার জীবনে এসেছিল রাজা লোর। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজা লোরের সাথে চন্দ্রানীর মিলনও হয়েছিল-

“দোহো উনমত্ত দোহো রসিক সুজান।
কামরসে রতিশাস্ত্রে দোহান বিদ্বান।।...
প্রথমে মদন কেলি ঘন আলিঙ্গন।

কামতাপে ভয় লজ্জা ধৈর্য পলায়ন।।...
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতিরঙ্গে দুইজন মল্ল জড়াজড়ি।।"[২০]

মধ্যযুগের ভারতীয় রচনাগুলিতে যৌনতার পরিপূর্ন আভাস ও কাম রিপু সম্পর্কে প্রকাশ্যে বর্নণ করা হোত। আঠারো বা ঊনিশ শতকের যৌনতার আলোচনা থেকে তৎকালীন সমাজে যৌনতার ব্যাখ্যা ছিল অন্যরকম।

আধুনিক ভারতের যৌনতা নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা হয় তার মধ্যে প্রথমেই বাঙালীদের বটতলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসেই যায়। প্রথমেই জানা প্রয়োজন বাংলার ছাপাখানা সম্পর্কে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় অনেক ছাপাখানা তৈরী হয়েছিল। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড হুগলী থেকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'অ্যা গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশ করেছিল। সেটাই বাংলা মুদ্রনের সূচনা বলা চলে। তখন হরফ তৈরীর পিছনে প্রধান কৃতিত্ব ছিল চার্লস উইল কিন্সের যিনি তিনটি বাংলা ফন্ট তৈরী করেছিলেন।[২১] এরপরেই বাংলার বই রচনার অভিমুখ তৈরী হয়। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা বই, ছাপা চিত্র ইত্যাদি এই বটতলা থেকেই প্রকাশিত হোত। শোভাবাজার এলাকার এক বিশাল বটগাছকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয়েছিল প্রাচীন কলকাতার বই পাড়া। নিম্নরুচির যৌন রসাত্মক বই, পুঁথি, দেবদেবীর পাঁচালি, পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হোত এই বটতলা থেকে। মূলত ব্যবসায়িক লাভেই এইসব বই পত্র এখানে প্রকাশ হোত। "খ্যাতনামা লেখকেরা বটতলার বই বা সাহিত্যকে ব্যাঙ্গ করেছেন, বাদ যাননি স্বয়ং বঙ্কিমও তবুও তৎকালীন সময়ে যে বটতলার গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা দুইই ছিল তা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করতে পারেননই।"[২২] বটতলার ছাপাখানার জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা প্রেস' তৈরী করেছিলেন, যেটির সাথে 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকাও যুক্ত ছিল। "তাঁর 'কলিকাতা কার্যালয় (১২৩০)' ও 'নববাবু বিলাস (১২৬০)' –এই দুটি পুস্তিকা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' –র (১৮৬১-৬২) এবং তারপর পরবর্তীকালে 'সোনাগাজীর রঙ্গরস', 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' ইত্যাদি পুস্তিকার পথ পরিষ্কার করেছিলেন।"[২৩] 'দূতীবিলাস' গ্রন্থটিকে ভবাণীচরণ নিজেই 'আদিরসাত্মক' বলেছেন। অর্থাৎ এখানে পৃথক ভাবে অন্য একটি ধারা হিসাবে পর্নোসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলনা। ঊনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জেমস লঙ তিনটি ক্যাটালগ তৈরী করেছিলেন। লঙ সাহেবের প্রথম ক্যাটালগের

বইগুলি 'শ্লীল' পর্যায়ভুক্ত ছিল। এটা ১৮৫২ সালের ঘটনা। সেই 'শ্লীল' পর্যায়ের বইগুলিই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্যাটালগে 'ইরোটিক' নামে ভিন্ন একটি শ্রেনীভুক্ত হয়। পরে ১৮৫৬ সালে 'অশ্লীলতা আইন' ও ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের প্রভাব পড়েছিল ১৮৫৯ সালে তৈরী তৃতীয় ক্যাটালগে। "এতে মহাবিদ্রোহের স্পষ্ট উল্লেখ সহ ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে তথাকথিত অশ্লীলতার ধারনাকে এক করে দেখা হয়। অশ্লীলতা বিরোধী এই অভিযান কেবমাত্র ইংরেজ প্রভুদের আয়োজন নয়, নেটিভ সমাজের এলিট ভদ্রলোকও এর অংশীদার হয়। ভিক্টোরীয় ট্যাবুর স্থান হয় ব্রাহ্মন্য রক্ষণশীলতার ক্রোড়ে। ফল, বটতলার প্রকাশনা।"[২৪] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোক রহস্য' -তে বাবুদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য রসিকতার সাথেই বর্ণনা করেছেন। "যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং সুলিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনি নিজেই বাবু।"[২৫] ঊনিশ শতকের বাংলার সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতুম পেঁচার নকশা' গ্রন্থটিতে তৎকালীন সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। গ্রামের জমিদার শ্রেনীরা শহরে এসে ব্যবসায়িক কাজে বসবাস করতে শুরু করেছিল। প্রায় আড়াইশ বছর আগে বাঙলার সমাজে ধনী, প্রাচুর্বান, শিক্ষিত পুরুষদের নামের আগে "বাবু" শব্দের ব্যবহার হোত। রক্ষিতাদের দালানকোঠা করে দেওয়া, পায়রা ওড়ানো, শনিবারের রাতে বাঈ বেশ্যা নিয়ে আসর বসানো, এমনকি কুকুর বিড়ালের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে নিজেদের আর্থিক সংগতি দেখানো। এইগুলি ছিল বাবুদের বৈশিষ্ট্য। "শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'বাবু' -দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, ত্রস্রাজ, বীনা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করতে যাইতেন।"[২৬] কোন গণিকার যদি হঠাৎ সুখ্যাতি বা নাম ছড়িয়ে পড়ে তখন ঐ গণিকাকে নিজেদের 'বাঁধা মেয়েমানুষ' করে রাখবার প্রবল প্রতিযোগীতা হোত বাবুদের মধ্যে।[২৭] সরস্বতী পূজার সাথে বারাঙ্গনাদেরও সম্পর্ক ছিল। গণিকাদের পাড়াতেও সরস্বতীর পূজা হোত। শুন তে হয়তো আশ্চর্য লাগছে কিন্তু বাৎসায়নের মতে কামদেবের পুজো করতে চৌষট্টি কলার অভ্যাস করতে হয়। আর এই শিক্ষার প্রারম্ভ সরস্বতী পুজোর দিন থেকেই। এই চৌষট্টি কলার মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, জুয়া, কবিতা লেখা সব কিছুই সম্পৃক্ত এবং এই

শিক্ষাগুলির দেবী হলেন দেবী সরস্বতী। কলকাতা শহরের নিষিদ্ধপল্লীতে সরস্বতী পুজোতে আনন্দের আসরও বসত। হুতোম পেঁচার নকশায় কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন- “সরস্বতী পুজোর আর পাঁচদিন আছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তথাপি ইয়ার দলের শঙ্কা অথবা বিরামের নাম নাই।... সকল বেশ্যাবাড়ির দরজাতেই প্রায় জুড়ি, তেঘুড়ি, চৌঘুড়ি খাড়া রয়েছে। গৃহ মধ্যে লালপানির চকচক, চেনাচুরের ছপছপ ও বোতল গেলাসের ধনধন শব্দ শুনা যাচ্ছে।”[২৮] সরস্বতী পুজোর দিনই নিষিদ্ধপল্লীতে নতুন নতুন নৃত্য প্রদর্শিত হোত। শ্রী পঞ্চমীর রাতে ছবি যেত বদলে। তখন ‘নথভাঙা’ –র নামে কৌমার্যহরণের অনুষ্ঠান হোত। সরস্বতীর পুজোয় যাবতীয় আনন্দ ও নান্দনিক দিকটি সরে গিয়ে তখন কামের উৎসব পারমম্ভ হোত।[২৯] ১৮৬৫ সালে ‘সমাজ কুচিত্র দর্পন’ –এর জানুয়ারী সংখ্যায় শ্লেষ বাক্যে বলা হয়েছিল- “পাঠকগণ মনে করুন, আশ্বিন মাসের শারদীয় পঞ্চমীর মতো এ পঞ্চমীর তত মাহাত্য নাই, তথাপি শহরে আমোদের স্রোত ধরছেনা। ... বারাঙ্গনা পল্লীর কথাই এক স্বতন্ত্র। সেখানে শহরের রকমারি আমোদের ও আমোদপ্রিয় দলের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম যেন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে, ধুনো, শাঁখ, গঙ্গাজলও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত হয়ে ওই সকল কুঞ্জে লুকিয়ে রয়েছেন।”[৩০] ঊনিশ শতকের সেই বাঙালীর যৌনতার ধারা আংশিক পরিবর্তন হয়ে বিংশ শতকেও দেখতে পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত লেখক সমরেশ বসুর ‘বিবর’ –এ প্রচলিত প্রথা ভাঙার চাহিদা দেখা গেছে। তাঁর এই উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায় এড়াতে পারেনি। তিনি নিজেই লিখেছিলেন- “জীবনে যদি অন্ধকার থাকে, তাকে অন্ধকারেই রাখতে হবে কেন? আলোয় আনতে গেলে পেচক শৃগাল চিৎকার করবে। করুকইনা। তবু অন্ধকারে যেন না থাকতে হয়।”[৩১]

সত্তরের দশকে বাঙালি প্রথম ‘পর্নো’ শব্দের সাথে পরিচিত হয়। আর আশির দশক থেকে এই শব্দটির বহুল প্রচলন শুরু হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই শব্দটিকে কেন্দ্র করে অনেক লেখা-লেখিও হচ্ছে। “ইতিহাস চর্চার জায়গা থেকেই সেক্স বা পর্নোগ্রাফি পত্রিকার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে বুঝতে চাইবো আমরা। আসলে সেক্স পত্রিকা বা পর্নোগ্রাফি পত্রিকা মানে কেবল মোটাদাগের রগরগে অশ্লীল উত্তেজক কাহিনী বা চিত্র নয়, এর একটা ইন্টেলিকচুয়াল ইতিহাস নির্মান রয়েছে।”[৩২] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে তখণ্ড সেক্স ও ফ্যান্টাসি কেন্দ্রিক লেখালেখি প্রকাশিত হোত। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শঙ, বিজ্ঞান, শিল্প নিয়ে যেভাবে চর্চা হয়েছে সেভাবে ইতিহাস চর্চা হয়নি। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর ‘The Calling of History’ (২০১৫ সাল) বইয়ের প্রথম

অধ্যায়ে 'The Popular Origins of Academic History' –তে জানিয়েছেন যে ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে স্নাতকোত্তর স্তরে ইতিহাস সাবজেক্টটাই ছিল না। আধুনিক ও মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রথম স্নাতকোত্তর বিভাগ (Modern and Medieval History) খোলা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ইতিহাস বিভাগ খোলা হতে থাকে বিংশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে।"[৩৩] সুতরাং ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষদের থেকে শুরু করে সামাজিক বিভিন্ন দিকগুলি আজ ইতিহাসের মধ্যে সম্পৃক্ত। আলোচনার শেষে অবশ্যই 'ফুকোর' দার্শনিক চিন্তার কথা বলতে হয়। তিনি ক্ষমতার ইতিহাসকে সুচারুভাবে দেখিয়েছেন। ক্ষমতা যুগ যুগ ধরে আস্তে আস্তে মানুষের শরীরেও তার দখলদারি করে ফেলেছে। তাঁর মতে ক্ষমতা যৌনতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকো যৌন নৈতিকতার ক্ষেত্রকে চারটি ভাগে বিভাজন করেছেন। প্রথমতঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট যৌনতার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা ও খাদ্যতত্ত্বের সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ গার্হস্থ্য অর্থাৎ পরিবার, ভৃত্য প্রভৃতির সাথে যৌন আচরণ এবং অর্থনীতি, তৃতীয়তঃ ভালবাসা ও প্রেমপ্রথা অর্থাৎ কিশোরদের সাথে সমকামী যৌনতা, চতুর্থতঃ যৌনতা জ্ঞানের উৎস ও দর্শন।[৩৪] বাঙালীদের মধ্যে যৌনতার সাপেক্ষে বিভিন্ন যৌন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। শালীনতা রক্ষার দায়ে সর্বত্র তা বলার বাধানিষেধ থাকলেও সেইসব শব্দ ও ভাষার মধ্যেও অদম্য কামভাব লুকিয়ে থাকে যার বহিরপ্রকাশ ঘটে সমাজের যত্রতত্র। কৈশোর বয়স থেকেই যৌনতা নিয়ে যে জানার প্রচন্ড ইচ্ছা তার জন্যই পর্নোগ্রাফী, চটি বই বা বটতলার সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছে বাঙালী এবং এখনো হচ্ছে। বহুকাল ধরে প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা যৌন শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ছিলনা। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সময় থেকেই বিদ্যালয়ে এরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যা গুরুত্বপূর্ণও বটে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীরা একটা সময়ে যেমন বটতলার সাহিত্যের 'অশ্লীল' গল্প পড়তো তেমনি বর্তমানে ভার্চুয়াল জগতে 'পর্নো' নিয়ে বাঙালীর লুকোনোর কিছু নেই। যৌনতা এখন শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞাপনেও মিলেমিশে গেছে। তাই বাঙালী এখন অনেক সাবালক ও সোচ্চার যৌনতা নিয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. জান্নাতুল নায়েম পিয়েল, 'পর্নোগ্রাফি বিবর্তনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা', ২৭ –শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, roar.media, seen on ১/৬/২১;

২. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পর্নোলোকে পর্যটন', অধীর বিশ্বাস (সম্পাদক), "গাঙচিল পত্রিকা", কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ- ২২;

৩. তদেব, পৃঃ- ২০ – ২১;

৪. জান্নাতুল নায়েম পিয়েল, প্রাগুক্ত, roar.media, seen on ১/৬/২১;

৫. Ronald B. and Ralph W. Nicholas, 'Kingship in Bengali Culture', New Delhi, 2005, পৃঃ- ৫৪; অর্নব সাহা, 'বাঙালীর যৌনচর্চা', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ- ২৫;

৬. অর্নব সাহা, 'বাঙালীর যৌনচর্চা', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ- ২৩;

৭. তদেব, পৃঃ- ৩০;

৮. জীবন মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ', নবভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ- ২৬;

৯. তদেব, পৃঃ- ৩৫;

১০. তদেব, পৃঃ- ১৩৬;

১১. অতুল সুর, 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', আনন্দ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪২১, পৃঃ- ১০৮ – ১০৯;

১২. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ- ৫৫;

১৩. তদেব, পৃঃ- ৫৫;

১৪. তদেব, পৃঃ- ৫৫;

১৫. সত্য গিরি (সম্পাদনা), বৈষ্ণবপদাবলী, রত্নাবলো, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ- ২৩;

১৬. তদেব, পৃঃ- ২৮;

১৭. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), 'বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ- ২৭৭; অর্নব সাহা, 'বাঙালীর যৌনচর্চা', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ- ৩২;

১৮. জান্নাতুল নায়েম পিয়েল, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৩;

১৯. চঞ্চল দেবনাথ, 'আধুনিকতায় দৌলত কাজীর', 'লোর চন্দ্রানী' বা 'সতীসায়না' কাব্য, ১ –ম জানুয়ারী, ২০২০, www.dakshinerjanla.com, seen on ৩/৬/২১;
২০. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), 'দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রানী ও সতীসায়না', কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ- ২৯; অর্নব সাহা, 'বাঙালীর যৌনচর্চা', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ- ৩৩;
২১. ইন্দ্রজিত চৌধুরী, 'বাংলা মুদ্রন-সংস্কৃতির অচেনা দিগন্ত', archives.anandabazar.com, seen on ৩/৬/২১;
২২. রিক চ্যাটার্জী, 'বটতলার গল্প', ৭ –ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, www.jiyobangla.com, seen on ৬/৬/২১;
২৩. সুকুমার সেন, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ- ২৬;
২৪. শুভদীপ ঘোষ, 'সাহিত্যে পর্নোধারা : পাশ্চাত্য ও বাংলা', "গাঙচিল পত্রিকা", কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ- ২৬২;
২৫. www.kolkata24x7.com, seen on ৬/৬/২১;
২৬. প্রৌঢ় ভাবনা, 'কলকাতার বাবু কালচার', www.sachalayatan.com, seen on ৬/৬/২১;
২৭. জান্নাতুল নায়েম পিয়েল, প্রাগুক্ত, seen on ৬/৬/২১;
২৮. দেবাশিষ পাঠক, 'শুধু কি বিদ্যার দেবী', www.aajkaal.in, seen on ৬/৬/২১;
২৯. প্রাগুক্ত, seen on ৬/৬/২১;
৩০. প্রাগুক্ত, seen on ৬/৬/২১;
৩১. শুভেন্দু দাসমুন্সী, 'বিবর আত্মদর্শন?', eisamay.indiatimes.com, seen on ৬/৬/২১;
৩২. অঙ্কন ঘোড়ই, 'সেক্স পত্রিকা' ও 'মধ্যবিত্ত বাঙালীর নবজাগরণ', "গাঙচিল পত্রিকা", কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ- ৯৪;
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৪;
৩৪. সব্যসাচী সেন, 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?', "গাঙচিল পত্রিকা", কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ- ১৮৯;

গ্রন্থপঞ্জী

১. জান্নাতুল নায়েম পিয়েল, ‘পর্নোগ্রাফি বিবর্তনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা’, ২৭ –শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, roar.media;

২. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পর্নোলোকে পর্যটন’, অধীর বিশ্বাস (সম্পাদক), “গাঙচিল পত্রিকা”, কলকাতা, ২০১৮;

৩. Ronald B. and Ralph W. Nicholas, ‘Kingship in Bengali Culture’, New Delhi, 2005;

৪. অর্নব সাহা, ‘বাঙালীর যৌনচর্চা’, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯;

৫. জীবন মুখোপাধ্যায়, ‘প্রাচীন ভারতে বিবাহ’, নবভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩;

৬. অতুল সুর, ‘ভারতের বিবাহের ইতিহাস’, আনন্দ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪২১;

৭. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩;

৮. সত্য গিরি (সম্পাদনা), বৈষ্ণবপদাবলী, রত্নাবলো, কলকাতা, ২০০৬;

৯. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ‘বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, কলকাতা, ১৯৯৬;

১০. চঞ্চল দেবনাথ, ‘আধুনিকতায় দৌলত কাজীর’, ‘লোর চন্দ্রানী’ বা ‘সতীসায়না’ কাব্য, ১ –ম জানুয়ারী, ২০২০, www.dakshinerjanla.com;

১১. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), ‘দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রানী ও সতীসায়না’, কলকাতা, ১৯৯৫;

১২. ইন্দ্রজিত চৌধুরী, ‘বাংলা মুদ্রন-সংস্কৃতির অচেনা দিগন্ত’, archives.anandabazar.com;

১৩. রিক চ্যাটার্জী, ‘বটতলার গল্প’, ৭ –ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, www.jiyobangla.com;

১৪. সুকুমার সেন, ‘বটতলার ছাপা ও ছবি’, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩;

১৫. শুভদীপ ঘোষ, ‘সাহিত্যে পর্নোধারা : পাশ্চাত্য ও বাংলা’, “গাঙচিল পত্রিকা”, কলকাতা, ২০১৮; www.kolkata24x7.com;

১৬. প্রৌঢ় ভাবনা, ‘কলকাতার বাবু কালচার’, www.sachalayatan.com;
১৭. দেবাশিষ পাঠক, ‘শুধু কি বিদ্যার দেবী’, www.aajkaal.in;
১৮. শুভেন্দু দাসমুন্সী, ‘বিবর আত্মদর্শন’, eisamay.indiatimes.com;
১৯. অঙ্কন ঘোড়ই, ‘সেক্স পত্রিকা’ ও ‘মধ্যবিত্ত বাঙালীর নবজাগরণ’, “গাঙচিল পত্রিকা”, কলকাতা, ২০১৮;
২০. সব্যসাচী সেন, ‘শরীর! শরীর! তোমার নাই কুসুম?’, “গাঙচিল পত্রিকা”, কলকাতা, ২০১৮;

সবুজ বিপ্লব ও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা : পারস্পরিক সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অঞ্জন ঘোষ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর গভীর রাতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ভোপাল নামক ছোট্ট শহরটিতে ঘটে গিয়েছিল এক ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনা যা সমকালীন ভারতবর্ষ সহ গোটা বিশ্বকে দাড় করিয়ে দিয়েছিল এক সন্ত্রস্ত প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ভোপালের একটি রাসায়নিক কারখানায় সেই রাতে ঘটে গিয়েছিল বিশ্বের ভয়ঙ্করতম শিল্প বিপর্যয়। এই দুর্ঘটনার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব জনিত সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে 'সবুজ বিপ্লব'কে অন্যতম পরিত্রাতা হিসাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল যার সূত্র ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, ক্ষতিকারক কীটনাশক, আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি। তৎসহ ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের মতন বৃহৎ মার্কিন পুঁজিপতি বহুজাতিক সংস্থা, যারা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বারবার শিল্প দুর্ঘটনার মতো বিভীষিকায় জড়িয়ে ফেলতে কুণ্ঠা বোধ করে না।*

শব্দসূচক : *সবুজ বিপ্লব, ভোপাল, মিথাইল-আইসোসায়ানেট, মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা, ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন।*

১৯৬০ এর দশকে ইউরোপে পরিবেশবাদী চিন্তাধারার ও আন্দোলনের প্রসারের ফলে কীটনাশক-এর ব্যবসা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এ কারণে বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তাদের কীটনাশক ব্যবসার রেশ ধরে রাখতে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অপরদিকে, ভারতবর্ষে 'সবুজ বিপ্লব'-এর হাত ধরে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। যার ফলে উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের চাহিদা বিপুল বৃদ্ধি পায়। তাহলে বিষয়টা দাড়াল এরকম, 'শিকারী শিকার খুঁজছে, অপরদিকে শিকার স্বয়ং শিকারীকে খুঁজছে', ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার কৃষিক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তিকে স্বাগত জানালে তার সুযোগ নিয়ে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন নামক একটি

আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা ভারতে একটি বিশাল কীটনাশক কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তুতি সেরে ফেলে।[১]

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথ ধরে একটু পিছিয়ে গেলে দেখা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে দুই পাকিস্থান থেকে বিপুল পরিমানে শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে তার ফলে জন সংখ্যার পরিমান ব্যপক বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে অধিকাংশ কৃষিজমি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে ভাগ হয়ে যাওয়ায় খাদ্য ভান্ডারে টান পড়ে অর্থাৎ পর্যাপ্ত মানুষের খাদ্যের চাহিদার তুলনায় জোগানের পরিমান হ্রাস পায়। এছাড়া, ‘‘স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পরিকল্পিত শিল্পায়নের জন্য বিশাল টাকা বিনিয়োগ করা হলে কৃষিক্ষেত্র অবহেলিত হয়ে তার ফলে যে বিশাল জনবিস্ফোরণ ঘটেছিল উক্ত সময়ে তার খাদ্যের চাহিদা ভারতের বাজার পুরোপুরি মেটাতে পারল না।[২]

বিকল্প চিন্তা হিসাবে পি.এল.-৪৮০ কার্যসূচী অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানী করার বিতর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সালে ৩০ লক্ষ টন এবং ১৯৬৩ সালে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টোব্দে পরপর ২ বছর খরা হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন ১৭-২০% হ্রাস পায়। এছাড়া ভারত-চিন (১৯৬২) এবং ভারত-পাক (১৯৬৫) যুদ্ধ পরিস্থিতি খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রকে আরও সঙ্কুচিত করে যার ফলে খাদ্যের অভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। যে কারনে ১৯৬৬ সালে ভারত আমেরিকা থেকে ২ কোটি টনের বেশী খাদ্য আমদানী করতে বাধ্য হয়।[৩]

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ভারতের উচ্চ নেতৃবর্গ বিশেষত খাদ্যমন্ত্রী সি. সুব্রমনিয়ম ভারতীয় কৃষির মৌলিক রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়াকে মদত দিয়েছিলেন।[৪] যার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি কৌশল পরিত্যাগ করে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণের একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আধুনিক ট্রাক্টর সহ কৃষি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ভারতে আনার এবং উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৬০-এর দশকে এইচ.ওয়াই. ভি উচ্চফলনশীল মেক্সিকান বামন গমের আবিষ্কার এবং সেই সঙ্গে সার, কীটনাশক ও বিদেশী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল যা ‘সবুজ বিপ্লব’ নামে পরিচিত। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বিপুল পরিমান বৃদ্ধি

পেল ঠিকই কিন্তু তাকে রক্ষা করবার জন্য চাহিদা বাড়ল কীটনাশকের। স্বাভাবিক ভাবেই এই সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন নামক মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, ভারতে ইউ.সি.সি (ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন)-এর প্রবেশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯৬০-এর দশকে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ১৪০০ মেট্রিকটন কার্বাইল বা সেভিন নামক কীটনাশক আমদানি করা হয়েছিল। তবে এই কীটনাশকের অসম্ভব কার্যকারীতা, চাহিদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে যার ফলে ১৯৭৪ সালে এর আমদানীর পরিমান ৫৯০০ মেট্রিকটন।[৫] উক্ত এই কীটনাশকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার নড়েচড়ে বসে এবং আমদানী ব্যয় হ্রাস করার জন্য ভারতের বুকেই একটি কীটনাশক কারখানা নির্মাণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রকে আলোচনা শুরু করে।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা মে দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভোপালে একটি ডেমন স্ট্রেশন প্লান্ট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বছরে ৫০০০ টন মিথাইল আইসোসায়ানেট নামক বিষাক্ত গ্যাস থেকে নির্মিত কীটনাশক উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করে ভারত সরকার।[৬]

সেভিন নামক এই কীটনাশক উৎপাদনে মূল মৌলিক উপাদান ছিল মিথাইল আইসোসায়ানেট নামক বিষাক্ত গ্যাস। এই মিথাইল আইসোসায়ানেটের প্রথম ড্রাম ভারতে আসে ১৯৭৩ সালে। গ্যাসীয় অবস্থায় এম.আই.সি মানুষ ও প্রাণীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর কারণ এটি ফুসফুস ও মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। জলের সংস্পর্শে এলে এটি ভয়নাক রূপ ধারণ করতে পারে। এ জন্য দরকার ছিল একটি সুপরিকল্পিত নিরাপত্তা যুক্ত কারখানা সেই সঙ্গে দরকার ছিল একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সদাজাগ্রত সচেতন ম্যানেজিং কমিটি। দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। যার ফলে ঘটে যায় একের পর এক দুর্ঘটনা।

১৯৭০ সালে ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড ভোপালের কারখানায় তাদের কীটনাশক উৎপাদন শুরু করে কিন্তু এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আদৌ কতটা সুরক্ষিত ছিল তা নিয়ে ছিল অনেক প্রশ্নচিহ্ন। ১৯৭৮ সালের ২৪শে নভেম্বর ওয়েলডিং-এর রড থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ন্যাপথল স্টোরে ছিটকে পড়লে ঘটে যায় একটি বড়সড় দুর্ঘটনা। ১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে এই কীটনাশক তৈরীর অন্যতম উপাদান ফোজেন গ্যাস লিক হবার ফলে মহম্মদ আশরফ নামক একজন কর্মী মারা যায়। ১৯৮২ সালে ৯ই

ফেব্রুয়ারি একইভাবে বিষাক্ত গ্যাস লিক হবার কারণে ২৫ জন শ্রমিক আশঙ্কাজনক অবস্থাতে হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৯৮২ সালের ১৪ই অক্টোবর সাবু খান নামক একজন ব্যক্তি কর্মরত অবস্থায় আক্রান্ত হন। এই একের পর এক দুর্ঘটনা প্রমান করে দিচ্ছে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রশাসন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মরিয়া হয়ে উঠলেও শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কোম্পানীর উদাসীনতায় একের পর এক ইঞ্জিনিয়ার কাজ ছেড়ে চলে যান বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে এরপর অদক্ষ কর্মচারীরা কারখানাটি পরিচালিত করতে থাকে।[৭;]

নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি এবং অদক্ষ কর্মীদের পরিচালনায় ভোপালের এই পেস্টিসাইড কারখানাটি হয়ে উঠেছিল বিদেশী গল্পে বর্ণিত ভয়ঙ্কর ‘পেন্ডোরাস বক্স’। উৎপাদন জনিত ব্যয় হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন জেনে শুনেই তাদের ভারতীয় শাখা ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ইউ.সি.আই.এল কে নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেনি। কারখানা কতৃপর্ক্ষ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক ভাবে MIC গ্যাসকে যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল তা বন্ধ ছিল। সি.বি.আইয়ের চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিপর্যয়ের সময়ে কারখানায় ছয় দফা নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনোটাই সক্রিয় ছিল না। গ্যাস লিক হলে যে সাইরেন বাজার কথা ছিল তা ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাতে বাজেনি।[৮]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ইউনিট বন্ধ রাখা, দক্ষ কর্মী সঙ্কোচন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি সম্মিলিত কারণের সমন্বয়ে ভোপালের কীটনাশক কারখানাটি হয়ে উঠেছিল একটি মৃত্যুপুরী যার ফলস্বরূপ ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর একটি ট্যাঙ্ক থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ মিথাইল আইসোসায়ানেট নির্গত হতে শুরু করে। প্রায় ৪১ টন MIC ছড়িয়ে পড়ে এই শহরের বাতাসে যার সংস্পর্শে তৎকালীন ভোপালের প্রায় ৭ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% মানুষ যার ফলে ওই রাতেই মৃত্যু হয় ২৫০০ জন মানুষের। কিন্তু যত সময় অতিক্রান্ত হতে থাকে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখে পতিত মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে পরিবারগুলির সদস্যের যথাযথ দাবির ভিত্তিতে তা হল প্রায় ২২০০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে ওই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে এবং ৫ লক্ষ ৫০ হাজার জনের বেশী মানুষ বিভিন্ন মাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।[৯]

উক্ত ঘটনাটি ভারতীয় ন্যায় ব্যবস্থার যাতাকলে নিছক একটি শিল্প দুর্ঘটনার তকমা পেয়েছিল। কোম্পানীর মালিক ওয়ারেন আন্ডারসনকে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করলেও (১৯৮৪, ৭ ডিসেম্বর) তার নিরাপত্তার কারণে তৎকালীন ভোপালের জেলাশাসক মোতি সিং কয়েকজন পুলিশ কর্মীসহ আন্ডারসনকে লুকিয়ে ভোপাল বিমানবন্দরে নিয়ে যান এবং সেখানে থেকে বিমানে করে তাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১০] এরপর আকস্মিক ভাবেই ওয়ারেণ আন্ডারসন দিল্লী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার অনুমতি পান, যা ছিল দেশের পক্ষে লজ্জাজনক ও নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি অসম্মান। ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষ সেদিন আস্থা রাখলেও প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। UCC এর ভারতীয় শাখা ও তাদের সাতজন আধিকারীকের বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও দীর্ঘদিন সেই মামলার নিষ্পত্তি ঘটেনি। বিচার চলাকালীন একজন অভিযুক্ত ভারতীয়ের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ আড়াই দশক পর ২০১০ সালের ৭ই জুন সাতজন দোষীকে ৩০৪-এ ধারা অনুসারে হঠকারী ও অমনযোগী কার্যকলাপের কারণে দু বছরের সাজা শোনানো হয়।[১১]

১৯৮৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ঘটনার ৪ বছর পর সুপ্রিম কোর্ট উক্ত ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনকে ৪৭০ মিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদানের আর্জি জানায়।[১২] বলা বাহুল্য, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ঘটনার প্রাথমিক পর্বে ভোপাল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্থ, মৃত, আক্রান্তদের যে পরিসংখ্যান প্রদান করেছিলেন তা কখনোই স্থির ছিলনা কারণ মিক গ্যাসের দীর্ঘকালীন ক্ষতিকর প্রভাবে আক্রান্তদের পরিসংখ্যান উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল। ফলস্বরূপ ১৯৮৯ সালে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার অনুসারে মৃত ও আহতদের গড়পড়তা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল মাত্র ১২,৪১৪ টাকা অর্থাৎ এই মীমাংসটি হল বিশ্বের সবথেকে ভয়ঙ্করতম শিল্পবিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে সস্তার মীমাংসা।[১৩]

উপরিউক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে একথা বলা সমীচীন হবে যে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ প্রাথমিক পর্বে দেশভাগ জনিত কারণে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম হল খাদ্যাভাব জনিত সমস্যা। এই সমস্যা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে উচ্চনেতৃত্ব মণ্ডলী সবুজ বিপ্লবকেই পরিত্রানের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই দেশটি বিভিন্ন কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে চটজলদি বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তড়িঘড়ি এ সমস্ত পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর

বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে জেনেও নেতৃবর্গ ও পরিচালকমণ্ডলীর দোদুল্যমান মনোভাব ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতন ভয়াবহ শিল্প র্দুঘটনাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। সবুজ বিপ্লবে উচ্চফলনশীল বীজ ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষ যে সাফল্যের মুখ দেখেছিল তার গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে ভারত সরকার বেশী খরচায় বীজ ও কীটনাশক আমদানী করার পরিবর্তে স্বদেশে কম খরচায় উৎপাদনের দিকে বুঝেছিল, এরই হাত ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পেরেছিল ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের মতো মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা। নয়া উদারনৈতিক নীতি গ্রহণকারী পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রমজীবি জনগনের শ্রম ও শিল্প পুঁজির সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। কারণ শ্রমজীবি মানুষের শ্রমের মূল্য যত কমানো যায়, পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় তত বাড়তে থাকে। আধুনিক বৃহৎ কোম্পানীগুলি তাই উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য যেকোনো অনৈতিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেনা। নিরাপত্তামূলক ব্যয় হ্রাস করার জন্য তারা যেকোনো আপোষে দ্বিধাবোধ করেনা। যার ফলস্বরূপ ঘটে যায় মর্মান্তিক শিল্প দুর্ঘটনা। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (১৯৮৪) যার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই একথা বলা বাহুল্য, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যতটা দরকার তদাপেক্ষা বিজ্ঞান সচেতনতা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. Ingrid Eckerman : The Bhopal Saga causes and consequences of the World’s Largest industrial Disaster, Universities Press Hydrabad, 2005, Page-21.

২. বিপানচন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী : ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে। পৃষ্ঠা ৪৯২

৩. Ibid : Page – 493

৪. Themistocles Dsilva : The Black box of Bhopal. Trefford Publishing, Canada, 2006, Page-31.

৫. Ibid, Page – 32

৬. Gazetter of India, Madhyapradesh, Page – 199

৭. H. L. Prajapati : Gas Tragedy : An Eye Witness, Mittal Publication, Delhi, 2003, Page -22

৮. নন্দন পত্রিকা, ভোপাল : একটি সমীক্ষা, 4th September, 2010, p.-10

৯. Ibid, Page – 08

১০. Moti Singh : Unfolding there betrayal of Bhopal Gas Tragedy, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 2008, Page – 81

১১. নন্দন পত্রিকা, ভোপাল : একটি সমীক্ষা, 4th September, 2010, p.-10

১২. Themistocles Dsilva : The Black box of Bhopal. Trefford Publishing, Canada, 2006, Page-164.

১৩. নন্দন পত্রিকা, ভোপাল : একটি সমীক্ষা, 4th September, 2010, p.-12

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘কিনু গোয়ালার গলি’ ও ‘সুধার শহর’ : সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

সুব্রত পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের পরিচয়, তারপর ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পর্কগুলি আমরা জন্মসূত্রেই পেয়ে থাকি। হৃদয়ের হৃদ্যতায় সম্পর্ক মধুর হয় আবার পরিস্থিতি ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কে প্রলেপ পড়ে। আবার যে সম্পর্কে প্রাণের সংযোগ গড়ে উঠতে পারে না, সেখানে সম্পর্কে আসে তিক্ততা। আমাদের জীবন জুড়ে থাকে নানান সম্পর্কের শামিয়ানা। হৃদয়ের গোচরে কিংবা অগোচরে সম্পর্কেরা প্রস্ফুটিত হয়। কোনও সম্পর্ক শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হয় আবার কোনও সম্পর্ক অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সম্পর্কের এই দোলাচলতা যেমন বাস্তবে তেমন আমরা সাহিত্যেও লক্ষ্য করি। সাহিত্যের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে সম্পর্কের বয়ন। প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের রচনাতেই রয়েছে সম্পর্কের নির্মাণ। সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। সন্তোষকুমার ঘোষের ‘কিনু গোয়ালার গলি’ ও ‘সুধার শহর’ উপন্যাসে সম্পর্কের যে বহুমাত্রিক বয়ন লক্ষণীয় তা এখানে বিশ্লেষণ করে দেখানোর প্রয়াস রাখছি।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘কিনু গোয়ালার গলি’(১৯৫০), প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়কালে কলকাতা শহরের গলি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার সাক্ষী প্রমথনাথ পোদ্দার—“শিকে ঘেরা ঘরখানিতে বসে সোনা চাঁদি ওজন করছে বটে, কিন্তু বাইরের সব খবর জানছে ঠিক”।[১] মণীন্দ্র-শান্তি-ইন্দ্রজিৎ, শান্তি-ইন্দ্রজিৎ-নীলা, নীলা-অবিনাশ, শকুন্তলা-বনমালীর সম্পর্কের নানা সমীকরণগুলি তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

শান্তি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নাম-পরিচয়ের সংকটের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিয়ের পর স্বামীর পরিচয়েই নারীর পরিচয়। শান্তির স্বামী মণীন্দ্র সান্যাল। শান্তি—মণিবাবুর বউ বা মিসেস সান্যাল, তার কোনও নিজস্বতা নেই।

মণীন্দ্র গল্প-উপন্যাস লিখতো। গল্প-উপন্যাস লিখে সংসার চালানো কষ্টকর, এতে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা কম। তাই সে গল্প-উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে। নাটকের অভিনয় থিয়েটারে একবার চলতে শুরু করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ। শান্তি ধীরে ধীরে মণীন্দ্রকে অবহেলা করেছে এরং স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে বাঘবন্দি খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। শান্তি ইন্দ্রজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, যা মণীন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। মণীন্দ্র শান্তিকে বাধা দেয়নি, সবকিছু মুখ বুজে দেখেছে আর তার নাটকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছে। লেখক বলেছেন—"রিয়েলিস্ট আর্টিস্ট মণীন্দ্র, মনহীন মননশিল্পী; শান্তি ওর রসসৃষ্টির রাসায়নে গিনিপিগ ছাড়া কিছু না।...শান্তির হাতের খেলনা ইন্দ্রজিৎ; মণীন্দ্রের হাতের খেলনা শান্তি। চক্রাকার খেলার ছক"।[২] শান্তিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। মণীন্দ্র সফল হয়েছে থিয়েটারে আর শান্তি অভিনয় করবে সিনেমায়।

ইন্দ্রজিৎ কবি, বি.এ. পাস করে এম.এ., ল পড়ছে। শান্তির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক, যা সমাজ স্বীকৃত অর্থে অবৈধ। এই সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ দুর্বল এবং শান্তির খেলার পুতুল। ইন্দ্রজিৎ শান্তিকে সিনেমা দেখানোর জন্য নিজের আংটি বিক্রি করেছে। ইন্দ্রজিৎ ও শান্তি দু'জনে বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছে, এর পেছনে রয়েছে মণীন্দ্রের উদাসীনতা ও প্রশ্রয়। নীলা ইন্দ্রজিৎকে ভালোবেসেছে, তাকে শান্তির মোহ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে এবং তাকে একটি সুস্থ জীবন দান করতে চেয়েছে। ইন্দ্রজিৎও নীলাকে আকড়ে ধরে জীবনকে নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছে, প্রুফরিডারের চাকরি নিয়েছে। নীলা-ইন্দ্রজিতের সম্পর্ক অনেকটাই গভীর হয়েছে, নীলার গর্ভে ইন্দ্রজিতের সন্তান। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ শান্তিকে ভুলতে পারেনি, একথা জানার পর নীলা তাকে আর বিশ্বাস করতে পারেনি। ইন্দ্রজিৎ দায়িত্ব, কৃতজ্ঞতা থেকে নীলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু নীলা চেয়েছিল একটু ভালোবাসা যা ইন্দ্রজিৎ তাকে দিতে পারেনি বলেই নীলা মনে করেছে। নীলা অন্তঃসত্ত্বা—একথা জানার পরও অবিনাশ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে কিন্তু নীলা কারও দয়ার পাত্রী হতে চায়নি, সে নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে—"আমাকেও আপনার সঙ্গে নিতে হবে, শকুন্তলাদি। নিতেই হবে। সব পরে বলব, শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আপনার প্রতিষ্ঠানটি একেবারে উঠে গেল না। ছোটখাটো একটা প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গেই চলল"।[৩]

অভিনাশ কৃতি ব্যবসায়ী, বিপত্নীক, নীলার দাদা দেবব্রতর কাকাশ্বশুর। অবিনাশ নীলাকে পছন্দ করে এবং বিয়ে করতে চায়। সেই কারণেই নীলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য

রেডিও দিয়েছে, সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছে, নীলাকে গানের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে, ভাড়াবাড়ি চুনকাম করিয়েছে আর সর্বোপরি দাদাকে ব্যবসায় সুযোগ করে দিয়েছে। দেবব্রত নিজের স্বার্থের জন্য একজন আটচল্লিশ বছরের ব্যক্তির সঙ্গে আঠারো-উনিশ বছরের বোনের বিয়ে দিতেও রাজি—"তার চেয়ে কে ভাল জানে যে সুখী না করে উপায় ছিল না কাকাবাবুকে। নীলার জন্যই অবিনাশ যে তাকে নেকনজরে দেখতে শুরু করেছিলেন, এ-কথা স্বগত স্বীকার করায় লজ্জা নেই। নীলাকে বাদ দিয়ে সস্ত্রীক ওঁর ওখানে ওঠাতে অবিনাশ যে বিশেষ প্রীত হননি, এ-কথা দু'দিনেই বুঝতে পেরেছিল। সেই থেকে এই দম্পতি কায়মনোবাক্যে কামনা করেছে একটি কনে, যাকে চল্লিশোত্তর কাকাবাবুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়"।[৪] শেষপর্যন্ত নীলা কিন্তু অবিনাশকে বিয়ে করেনি, সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়েছে।

শকুন্তলা নার্স, কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে কিনু গোয়ালার গলিতে 'সেবাসত্র' খুলেছিল। উদ্দেশ্য মানুষের শুশ্রূষা করা, বিনিময়ে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করা। নারীর স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। কিন্তু সমাজ এই সহজ বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তাই প্রমথনাথ পোদ্দার বলেছে—"কিনু গোয়ালার গলি তো নবদ্বীপ হয়ে উঠল মশাই।...ওঁরা অনেক রকমে দেখা দেন। নর্তকী, দেবদাসী, সেবাদাসী।...সেবিকা আর সেবাদাসী একই"।[৫] সমাজের এক নোংরা মানসিকতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। শকুন্তলার অতীত জীবনের কাহিনি 'সেবাসত্রে'র পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বনমালী সরকার একজন 'ঝানু সাংবাদিক', শকুন্তলার স্বামী ছিল। উভয়ের বিচ্ছেদের পর বনমালী আবার বিবাহ করেছে, শকুন্তলা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছিল। বনমালীর দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পুনরায় শকুন্তলাকে ফিরিয়ে নিতে চায়—এখানেই শকুন্তলার সঙ্গে বনমালীর বিরোধ। বনমালী 'সেবাসত্রে'র নামে সংবাদপত্রের পাতায় মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়েছে। 'সেবাসত্র'কে পতিতালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং সেখানে বিভিন্ন অবৈধ ও অসামাজিক কাজকর্ম সম্পন্ন হয় বলে সংবাদ পরিবেশন করেছে—"বনমালী ছাড়া এমন বিষ আর কেউ ঢালতে জানে না। ওর দেহের সমস্ত দূষিত বিষ জমা হয়েছে গিয়ে কলমে। খিস্তি সাপ্তাহিক। বনমালী মিডিয়াম বেছে নিয়েছে মন্দ না"।[৬] কিন্তু শকুন্তলা হার মানেনি, অর্থের বিনিময়ে সে কোনও অন্যায় কাজ করতে রাজি হয়নি।

উপন্যাসে শেষপর্যন্ত দেখা যায় শকুন্তলা নিজের ‘সেবাসত্রে’র স্বপ্নকে সঙ্গী করেই কিনু গোয়ালার গলি ত্যাগ করেছে—“সেবাসত্রের স্বপ্ন আমার শেষ হয়নি ভাই, মনের জোর এখনও আছে। তবে দিনকতক একটু জিরিয়ে নেব”।[৭] নীলাও ইন্দ্রজিৎ বা অবিনাশকে বিবাহ করেনি। শকুন্তলার ‘সেবাসত্রে'র স্বপ্নকে আশ্রয় করে সেও গলি ত্যাগ করেছে। মণীন্দ্র ও শান্তিও সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায় গলি জীবন ত্যাগ করেছে এবং ইন্দ্রজিৎ মেসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

‘সুধার শহর’ উপন্যাসটির পূর্বনাম ছিল ‘মোমের পুতুল’, উপন্যাসটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ২৭শে জুন ১৯৫৩ থেকে ৯ই জানুয়ারি ১৯৫৪ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে (শ্রাবণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে (অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) ‘সুধার শহর’ নামে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে একাধিক মা-মেয়ের সম্পর্কের বৈপরীত্য চোখে পড়ে। মা এবং মেয়ের চিরাচরিত স্নেহময় সম্পর্কের ধারণা এই উপন্যাসে লক্ষণীয় নয়। কখনও অর্থনৈতিক অনটন, কখনও পরিস্থিতির চাপে পরিবর্তন এসেছে মা এবং মেয়ের সম্পর্কে। প্রথমেই আসি সুধা ও তার মা মল্লিকার প্রসঙ্গে। মল্লিকার সঙ্গে সুধার মানসিক দূরত্ব অনেকখানি। ফুলমাসির কাছে শহর কলকাতায় এক নতুন পরিবেশে পাঠিয়ে দিলে সুধার অভিমানী মন একান্তে কেঁদে ওঠে—“মা পর করে দিলেন সুধাকে। ফুলমাসি তো যে-কোনও একজনকেই মানুষ করে দিতে চেয়েছিল। মা দিতে পারতেন লতুকে, পীতুকে, বিনুকে, মিতুকে। বেছে বেছে সুধাকেই দিলেন কেন। এখানে সে বন্দি।...বেঁচে যায় যদি ফের ফিরে যেতে পারে সেই দেশের বাড়িতে, ছেঁড়া জামা পরে যেমন খুশি, যখন খুশি ছুটোছুটি করতে পারে।...মা কেন তাকে সঁপে দিলেন ফুলমাসির হাতে। কেন, কেন”।[৮]

কিশোরী মন অনেকখানি ক্ষোভ উগরে দেয় মায়ের প্রতি। শশাঙ্কের কাছে মল্লিকার ফের অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা শুনে মায়ের প্রতি সুধার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন পরে ফুলমাসির কাছ থেকে সুধা যখন গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে আসে, তখন সুধা সদ্য যৌবনা। বহুদিনের অদর্শনের পরে মেয়েকে দেখে মায়ের যে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস জাগতে পারে তার বহিঃপ্রকাশ এখানে নেই বরং মল্লিকা দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত মেয়েকে দেখে—“এই মেয়েটিকেই কি মল্লিকা মাত্র ক’মাস আগে অতসীর হাতে তুলে দিয়েছিল? সেই বটে, তবু সে নয়, এক হয়েও এ যেন একটু আলাদা। এ-সুধাকে মল্লিকা চেনে না, একান্ত আপন, তবু পর, নাড়ির

সম্পর্ক, তবু কাছে টেনে নিতে কোথায় যেন লজ্জা।...মল্লিকা কেমন সংকুচিত হয়ে গেল, সে যেমন করে দেখছে সুধাকে, সুধাও তেমন করে, ওর নতুন পাওয়া সব-বুঝি চোখ দুটো দিয়ে চিরে-ছিঁড়ে দেখছে না তো মল্লিকাকে?”[৯] মা-মেয়ের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক এখানে অনুপস্থিত। সম্পর্কে একরাশ দ্বিধা, সন্দেহ, দূরত্ব দানা বেঁধেছে। সুধাকে দেখে মল্লিকার বিস্ময় আর ফুরোয় না—“মেয়ের দিকে চেয়ে ভাবে এমন কেন হল, কী করে বদলে গেল সুধা; খেয়াল থাকে না সে নিজেও একদিন এমনি বদলেছিল, অনেক ক্লেশ, অনেক ক্লেদ, অনেক দুঃখ, রোমাঞ্চ, স্বেদ আর অভিজ্ঞতায় স্নাত হতে হতে নতুন একটি শরীর-মন পেয়েছিল”।[১০]

নীলুকে প্রেমাংশু চৌধুরী দত্তক নিতে চেয়েছে এবং মা এই প্রসঙ্গে রাজি হয়েছে শুনে “ক্ষোভে উত্তেজনায় সুধা শক্ত করে চেপে ধরল বালিশটা, হায় রে, সে অসহায়, কোনও প্রতিকার করবার সাধ্য তার নেই”।[১১]

কলকাতা শহরে এসে বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সুধা, তার দেহে ও মনে পরিবর্তন এসেছে। পরিচিত হয়েছে নূপুরের সঙ্গে, জেনেছে তার জীবনের নির্মম পরিণতি। সুধার মনে বাসা বেঁধেছে সন্দেহ। বিশ্বাস, আস্থা শিথিল হয়েছে। আর তাই মল্লিকার নবজাত শিশুপুত্রের ওষুধের অভাবে মৃত্যুতে মল্লিকাকেই দায়ী করে সুধা—“বিশ্বাস করি না, মা ওকে মেরে ফেলেছে।...খোঁজ নিয়ে দেখিস, মা’র আবার ছেলেপুলে হবে। সেটাকে ঠেকাতে পারেনি, খাওয়াবে কী, সেই ভয়ে-ভয়ে যেটা ছিল সেটাকে মেরে ফেলেছে। নইলে মা হয়ে কোলের ছেলেকে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে দেয়, কোথাও শুনেছিস?...নিজের মেয়েকে ফেলে রাখে মাসির কাছে, ছেলেকে বিক্রি করে দেয়”।[১২] এখানে লক্ষ্য করা যায় সুধা ও মল্লিকার সম্পর্ক ততটা ভালোবাসায় ভরে উঠতে পারেনি যতটা ভরে উঠেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে দেয় পরিবারের সম্পর্কের সমীকরণগুলি। রূপান্তর ঘটে চরিত্রের, পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, যা সামাজিক অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে। উপন্যাসটিতে অতসীর সঙ্গে ওর মায়ের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। প্রথম দিকটায় কিন্তু এমন ছিল না। অতসী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসায় মা অতসীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছে। ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে মানসিকতায়ও পরিবর্তন এসেছে—“নানা আঘাতে, তাপে মাতৃস্নেহের সবটুকু রস ঝরে গিয়ে মা আত্মসর্বস্ব আমসিতে পরিণত হয়েছেন। এখন ভাবছেন শুধু নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ”।[১৩] অতসী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে লক্ষ্য করেছে—“সবচেয়ে বড়

পরিবর্তন ঘটেছে মায়ের অন্তরে। এই কি সেই মা, যিনি একবার, অতসীর বড় একটা অসুখের সময়, ওর শিয়রে সমানে সাতদিন বসেছিলেন? খাওয়া না, নাওয়া না, শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে পড়েছিলেন নিজে? অতসী সুখী হবে বলে সর্বস্ব বাঁধা রেখে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন?...শুধু তো দু'বেলা দু'থালা ভাতের অভাব, তাই কি এত বদলে দেয় মানুষকে"।[১৪]

অতসী মায়ের চোখে লক্ষ্য করেছে লোভের লেলিহান শিখা। যে মা একদিন নীলাদ্রির সঙ্গে সিনেমা দেখে ফিরতে রাত হয়েছিল বলে নির্মমভাবে অতসীকে মেরেছিল। সেই মা আজ অতসী স্কুলের কাজ সেরে বাড়ি না ফিরলেও ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করেনি। বরং আদিত্য মজুমদার অতসীকে নাচ দেখাতে নিয়ে যাওয়ায় সে গদগদ কণ্ঠে বলেছে—"অন্য মাস্টারনিদের চোখ টাটায়নি?"[১৫] দোকান থেকে সে নিজে অতসীর জন্য পছন্দ করে শাড়ি ও প্রসাধনী সামগ্রী কিনে এনেছে। নিজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার তাড়নায় উৎফুল্ল চিত্তে আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে গিরিডি যাওয়ার সময় সে নিজের হাতে অতসীর শাড়ি-ব্লাউজ, স্নো-পাউডার সুটকেসে গুছিয়ে দিয়েছে। আদিত্য মজুমদার অতসীর খোঁজে তাদের বাড়িতে আসলে সেই সল্প সময়েও তাকে তোষামোদ করতে ছাড়ে না অতসীর মা—"সেবার আপনার সঙ্গে গিরিডি গিয়ে কিন্তু বেশ সেরে এসেছিল"।[১৬] যে মা আর্থিক উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে অতসীর মেলামেশাকে এভাবে সমর্থন করে সেই আবার অতসীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় তাদের সম্পর্ককে কুশ্রী ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে না। অন্যদিকে অতসী তার প্রেমিক নীলাদ্রিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে রেখে তার দেখাশোনা করতে চাইলে সে অতসীর অনুপস্থিতিতে আদিত্য ও অতসীর সম্পর্কের কথা, তাদের সন্তান জন্মানোর কথা জানিয়ে নীলাদ্রিকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে, আবার শশাঙ্কের কাছে আদিত্য ও নীলাদ্রির সঙ্গে অতসীর সম্পর্কের নালিশ জানাতেও দ্বিধা করে না।

একদিকে ছেলে কর্মহীন অন্যদিকে মেয়ের রোজগারে প্রতিপালিত হওয়ার সংকোচ অতসীর মায়ের মনে ক্রিয়াশীল ছিল, যার ফল স্বরূপ মেয়ের কল্যাণের কথা মা চিন্তা করতে পারে না। ন্যায়নীতিবোধ বিবর্জিত হয়ে তারা কলহে লিপ্ত হয়েছে। সেই সময় মা ও মেয়ে একে অপরকে বিশ্রী ভাষায় আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না। এ প্রসঙ্গে লেখক কুকুর-বেড়ালের ঝগড়ার অনুষঙ্গ টেনেছেন—"ঠিক নীচের গলিতে একটা নেড়ি কুকুরের সঙ্গে ও-বাড়ির পোষা বেড়ালটার বিষম ঝগড়া লেগেছে"।[১৭]

এবার আসা যাক নূপুর ও তার মায়ের প্রসঙ্গে। নূপুর পঙ্গু, সারাদিন বিছানায় শুয়ে তীব্র অবসাদগ্রস্ত এই মেয়েটি মানসিকভাবেও অসুস্থ। যৌনতা বিষয়টির আস্বাদ নিতে সে যৌনবিষয়ক বই পড়ে, অশ্লীল ছবি দেখে। সেইসব বই নিশীথ রোজ এনে দেয় নূপুরকে। নূপুরের মাও সেইসব বই প্রকাশ্যে নূপুরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে—"মা জানে আমার দৌড় ওই বই পড়া অবধি। খারাপ তো হব না, হবার সাধ্যই নেই। খোঁড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি, শরীরের আধখানা দড়ির মতো শুকনো। আমার আবার ভয় কী ভাই"।[১৮]

এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে লজ্জা সংকোচের কোনও বালাই ছিল না। অসুস্থ নূপুরের চিকিৎসার সূত্রে ডাক্তার চৌধুরী প্রায় রোজই আসেন নূপুরদের বাড়িতে। দিনের পর দিন ইনজেকশন, ওষুধ দেয় কিন্তু নূপুরের অসুখ সারে না। এই ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে নূপুরের মায়ের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নূপুরের মা এতটাই আত্মসর্বস্ব, এতটাই পরকীয়ায় অন্ধ যে শুধুমাত্র ডাক্তারের যাতায়াত বাড়িতে নিশ্চিত করবার জন্য নিজের মেয়েকে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে রাখার ষড়যন্ত্র করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নূপুর বিস্মিত হয়ে ভেবেছে—"ডাক্তারের কথা না হয় বুঝতে পারি, আর কিছু না হোক, শুধু ভিজিটের লোভেই ওরা অনেক সময় রোগ জিইয়ে রাখে। কিন্তু মা হয়ে মেয়ের এমন সর্বনাশ করল কী করে" ![১৯]

শুধু তাই নয়, নূপুরের মা এবং ডাক্তার চৌধুরী মিলে ঠিক করেছে নূপুরকে কোনও এক স্যানিটোরিয়ামে রেখে নিজেরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে নতুন করে জীবন রচনা করবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নূপুরের মাকে ডাক্তার চৌধুরী ঠকায়। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মায়ের একমাত্র অবলম্বন তখন মেয়ে নূপুর। কলকাতা থেকে নূপুর মাকে নিয়ে দূরে কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চায়—"এই শহরটা তো আমাকে সারিয়ে তুলল না, আমার মাকেও ঘর দিল না। এখানে আমাদের মায়ে-ঝিয়ের ঠাঁই হয়নি, দেখি অন্য কোথাও যদি হয়"।[২০]

সুতরাং দু'টি উপন্যাসেই আমরা লক্ষ্য করি সম্পর্কের নানান জটিলতা। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের চরিত্রেরা সম্পর্কের টানাপোড়েনে আবদ্ধ হয়েছে ঠিক, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশা করেছে। আর 'সুধার শহর' উপন্যাসে মা-মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। সুধা, অতসী, নূপুর—এই তিনজনের সঙ্গে তাদের মায়েদের যে সম্পর্ক তা স্নেহসুধায় ভরে ওঠেনি বরং মা-মেয়ের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অবহেলার,

ঘৃণার, কলহের, আত্মসর্বস্বতার। তাই বলা যায়, সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে একদিকে যেমন চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষণীয় অন্যদিকে তেমনই সম্পর্কগুলি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র(১ম খণ্ড), কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫

২. তদেব, পৃ. ৪৪

৩. তদেব, পৃ. ১০২

৪. তদেব, পৃ. ৯৩

৫. তদেব, পৃ. ৩৩

৬. তদেব, পৃ. ৫৯

৭. তদেব, পৃ. ১০১

৮. তদেব, পৃ. ২৩৫

৯. তদেব, পৃ. ২৯১

১০. তদেব, পৃ. ২৯৫

১১. তদেব, পৃ. ৩০৭

১২. তদেব, পৃ. ৩৫০

১৩. তদেব, পৃ. ৩৩২

১৪. তদেব, পৃ. ৩৩৬

১৫. তদেব, পৃ. ৩৩৬

১৬. তদেব, পৃ. ২৪৬

১৭. তদেব, পৃ. ২৪১

১৮. তদেব, পৃ. ২৪৩

১৯. তদেব, পৃ. ২৭৭

২০. তদেব, পৃ. ৩৪৭

লোকশিক্ষা ও টুসু গান

সুমন্ত মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : *লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে কোন একটি অঞ্চলের লোকায়ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠে। টুসু গান ও লোকসংগীত। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী ও নিম্নবর্ণ সমাজের মেয়েদের দেবী টুসু।এই দেবীর পূজা উপলক্ষে গাওয়া গানই হল টুসু- লোকসংগীত।তাই তার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও নিম্ন বর্ণের মানুষের লোকায়ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গানগুলো মেয়েরা মুখে মুখে রচনা করে, সমাজের কল্যাণ সাধন করে। গানগুলো মেয়েদের মুখে মুখে রচিত বলে, সমাজের হাঁড়ির খবর বেরিয়ে আসে। প্রেম প্রণয়,অভাব-অভিযোগ,চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ,ঝগড়া-বিবাদ, জাতি ও জীবিকা, সামাজিক রীতিনীতি খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, প্রসাধনী, আসবাব, বাসস্থান,সংস্কার ও লোকবিশ্বাস,বিনোদন এর সাথে সাথে সামাজিক শিক্ষা যা গ্রাম্য জীবন কে গড়ে দেয় উচ্চ স্থানে । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকশিক্ষাকে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন "লোকশিক্ষা" প্রবন্ধে। লোকশিক্ষা কে পাথেয় করে টুসু সঙ্গীত শিল্পীরা সমাজের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছেন,সমাজকে বিপদ থেকে সুস্থ পথে নিয়ে আসার জন্য।*

মূল শব্দ : *লোকশিক্ষা, নিম্নবর্ণ, লোকশিল্পী, টুসু গান, লোকায়তদেবী, উৎসব, সীমান্ত বাংলা।*

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ।সামাজিক চিন্তা-চেতনার বাস্তব রূপ ধরা দেয় সাহিত্যে। সাহিত্যের অন্যতম শাখা হলো লোকসাহিত্য, আর লোকসাহিত্যের প্রধান সম্পদ হলো লোকসংগীত। রাঢ় বাংলাতে এই লোকসঙ্গীতের সিংহভাগ জুড়ে থাকে ঝুমুর, ভাদু, টুসু। এদের স্রষ্টা হলেন গ্রামের সাধারণ নর-নারী। ইদানিংকালে লোক কবিদের হাতে রচিত হচ্ছে ঝুমুর -ভাদু- টুসু গান। কবিতার বহরের গান। সুর ও সাহিত্য রসে প্রাণবন্ত ধারা পাঠক তার মনকে আকৃষ্ট করছে।

আমার আলোচ্য বিষয় বাংলা লোক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যালাড টুসু সঙ্গীত।অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় চাউরি থেকেই টুসু সঙ্গীত গাওয়া শুরু হয়। চলে গোটা পৌষ মাস ব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায়। কণ্ঠে সুর, মনে আনন্দ, নতুন

ফসল ঘরে আসার পরের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, পৌষ পরব, পিঠে পুলি, নতুন ধানের গন্ধ- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আনন্দের মহোৎসব। এই উৎসব মূলত- কুড়মি, হাড়ি,ডোম, বাউরি, লোহার, দেশোয়ালি মাঝি, নাপিত,সরদার,খেঁড়া,লধা, শবর,শুড়ি, কুমার প্রভৃতি জাতি করে থাকে। খোল, ঢোল, করতাল, ঝুমঝুমি, হারমোনিয়াম,প্রভৃতি সহযোগে নৃত্যগীত এই উৎসবের প্রধান প্রধান বাদ্যযন্ত্র।

টুসু গানের ব্যাপ্তি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি কিয়দংশ, ধানবাদ,সাঁওতাল পরগনা, রাচি,হাজারীবাগ, ও সিংভূম এর বিস্তারিত অঞ্চল। টুসু পরব কে ঘিরে নানা মত, নানা বিতর্ক রয়েছে, প্রচুর কিংবদন্তি ও গল্পকথা, মিথ। আর বিতর্ক রয়েছে প্রচুর প্রতীক বা মূর্তি পূজার উপকরণ নিয়ে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম রয়েছে।

টুসু লোকায়ত দেবী হলো ও তার দেবী রূপটির পরিবর্তে মানবী রূপটিই অনেক বেশি উজ্জ্বল। তাই তিনি অনায়াসে হয়ে ওঠেন,কখনো পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের নারী, কখনো বা পুরুষ, অর্থাৎ টুসু কে অবলম্বন করেই পশ্চিম -সীমান্ত বঙ্গের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী,বালক-বালিকা তাদের মনের সুপ্ত বাসনা গুলি ব্যক্ত করে। আর সেগুলি ধর্মীয় সঙ্গীত না হয়ে, হয়ে ওঠে একান্তভাবেই বঙ্গীয় -ঝাড়খন্ড বা লোকায়ত ও পশ্চিম -সীমান্ত বঙ্গবাসীর মানস দর্পণ। সমাজ অনুশাসন, খাদ্য, বাসস্থান,পোশাক-পরিচ্ছদ,অলংকার সংস্কার,বিশ্বাস,খেলাধুলা,আমোদ-প্রমোদ,ধর্ম-কর্ম,দেবদেবী, পরিবার পরিকল্পনা,পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, রাজনৈতিক,সামাজিক বিষয়, সমাজের নানান ধরনের উপকারিতা-অপকারিতা, সুফল- কুফল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে টুসু সংগীত রচিত হচ্ছে।

আমরা জানি যে লোকশিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের জন্য লোক শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে নানাভাবে লোকশিক্ষা দান করা হতো, বিনোদন ছিল লোক শিক্ষার অঙ্গ। লোক শিক্ষার মাধ্যমে, মানুষ নীতি -আদর্শ শিখত।স্বাধীন ভারতে লোক শিক্ষাদানের অনেক সুযোগ ছিল। দূরদর্শন,সিনেমা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া হতো। লোকশিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা, স্কুল কলেজের শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে না। লোক শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায় ও নীতির আদর্শএ দীক্ষিত হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়।(1)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন বাংলার লোক শিক্ষা নাই। আরো বলেছেন-" ইহা কখনো সম্ভব নয় যে বিদ্যালয় পুস্তক পড়়আইয়া ব্যাকরন, জ্যামিতি শিখাইয়া, শত কোটি লোকের শিক্ষা বিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে এবং সে উপায় এ শিক্ষা সম্ভব নহে।চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা নিজ নিজ কার্যের দক্ষতা কর্তব্য কাজে উৎসাহ, এই শিক্ষাই হল শিক্ষা। ইউরোপে লোকশিক্ষার প্রধান উপায় হল সংবাদপত্র।(2)

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কথকতায় ছিল এদেশে লোকশিক্ষার কার্যকরী মাধ্যম। বুদ্ধদের থেকে শ্রীচৈতন্য এই দীর্ঘ সময় কালে লোকশিক্ষা হয়েছে বক্তৃতার দ্বারা। এবং তা ছিল কথকতার মতোই অন্তরঙ্গ,ভাবের বক্তৃতা। তাতে শাক্ষ্য সিংহ, তার শিষ্যগণ শংকরাচার্য, চৈতন্যদেব, লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন।প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কথকতাই ছিল লোক শিক্ষার প্রধান মাধ্যম।গ্রামে, শহরে, নগরে সর্বত্র কথকতা কে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করে,কোন এক জায়গায় বসে পুরান, ইতিহাসের বিষয়কে উপাদেয় করে পরিবেশন করতেন।মানুষ বিনোদন ও লাভ করত আবার লোক শিক্ষা ও পেত। সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরত্ব, লক্ষণের সত্যব্রত, ভিষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মত্যাগ -এইসব বৃত্তান্ত কথকেরা সুরসহ সমবেত সকলের সম্মুখে বিবৃত করতেন। সাধারণ মানুষ তা শুনে জীবন দর্শন সংক্রান্ত অনেক কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখত। মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হতো, ধর্ম শিখত, কর্ম শিখত, পাপ-পুণ্যের বোধ লাভ শিখত। মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করত। সমাজের কল্যাণ হত। বর্তমানে বাংলার লোকশিক্ষা বৃদ্ধি পায় না। কারণ সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরি হয় না। তাই লোকশিক্ষা হতে পারে না বলে বঙ্কিম বাবু মত প্রকাশ করেছেন।(3)

বর্তমান ইন্টারনেট ও ই-মেইলের যুগে পাল্টে যাচ্ছে জীবনযাপন প্রণালী। জীবনচর্চার ধরন-ধারণ, জীবনের রসায়ন। দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে সরে যাচ্ছে, সমাজ থেকে সুস্বাস্থ্য ও সুমানসিকতা, যা সুস্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায়।শুরু হয়েছে ইন্দুর দৌড়, বেড়েছে বেগ, কমেছে আবেগ। আবেগ হীন জীবন, শুষ্ক মরুভূমির মতোই রুক্ষ। আমরা জানি যে সংস্কৃতি ও ভাষা, জাতির পরিচায়ক।এক জাতি ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় আজ প্রকৃত শিক্ষার পথে কোথায় যেন ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ঘটছে নানা অঘটন, তাই সুস্থ সমাজের কথা মাথায় রেখে একেবারে প্রচলিত সুরে সহজ সরল, কথার আঙ্গিকে টুসু শিল্পীরা গান গেয়ে চলেছেন

সমাজের মঙ্গল কামনায়। যেমন- নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নেশার অপকারিতা,টিভির কুফল, নারী শিক্ষা, সর্বশিক্ষা অভিযান, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, প্রতিষেধক টিকা সংক্রান্ত, জল সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, গাছের উপকারিতা, মদের জ্বালা, ধোঁয়াহীন চুল্লি নির্মাণের উপকারিতা, গোবর গ্যাসের উপকারিতা, বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য, শৌচাগার নির্মাণ এর উদ্বুদ্ধ করা, বিজ্ঞাপনের খপ্পড়ে না পড়া, কম বয়সে বিয়ে করার কুফল, গাড়ি চালাও সাবধানে ইত্যাদি।

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ:- চল যাবো চল সবাই স্কুলে/ আমরা রইভ্য নাই মুখ্খু বলে/ (রঙ)//নিরক্ষর এর কি যে কষ্ট/ বলা যাবেক নাই বলে / চাইকরা জামাই জুটা দায় গো,লেখাপড়া না শিখলে// সরকারে গড়েছে স্কুল/ চল যাব চল পাঠশালে /অ -আ -ক -খ শিখব সবাই/ লিখব সিলেট পেন্সিলে //লেখাপড়া শিখ গো টুসু -/ বইয়ে যাবিস নাই জলে / ভাগ বাটা নাই লেখাপড়ার /যেতেই পার মন গেলে/ হরি বলে, আয় সকলে সবাই যাব স্কুলে/ লেখাপড়া না শিখলে /মরবিরে তিলে তিলে//(4)

(২) পণপ্রথার বিরুদ্ধে:- ব্যাটার বিহায় লিভো ফট ফটি/ কত কষ্টে বিকেছি বিটি/(রঙ)/ /লাখ টাকা গুনে নিব /নিব গয়না গাটি / উঠাঞ বয়সাঞ থাসে দিবেক / বায়না কইরব ব্যান্ড পার্টি // যত কুটুম খুঁজবো আমি /যত আছে নাতিপুতি/ গটা গাঁকেই ভোজ খাওয়াবো/ পরের পয়সার ব্যথা কি// বিটির বীহাই কাঁদেছি গো -লাইগেছে দাঁতকপাটি/ বেটার বিহায় তুলবো উশূল লিব কালার টিভি টি // হরিবলে ভাইবে ভাইবে /-দেখাস না আর আভ্ভুতি/ তোদের জন্য টিকে আছে সর্বনাশা এ প্রথাটি// যেদিন সবাই বুঝতে পারবি /সবারেই হবেক বিটি /পন দিও না পন লিব না /বলবে সেদিন মা -বেটি// লেখাপড়ার ধার ধারিস নাই /বইলেই তোদের এই গতি/ পণপ্রথা পাল্টাতে হলে /পাল্টা গো তোদের মতি//(5)

(৩) নারী শিক্ষা:- দে মা আমায় বই সিলেট কিনে/ ইবার যাবো আমি স্কুলে/(রঙ)/লোকের ছেলে স্কুল যাচ্ছে-/ কান্দে তাদের ব্যাগ ঝুলে,/হামদের এখন সময় যাচ্ছে /ছাগলের সঙ্গে বুইলে// লোকের ছেইলার মতন আমি- যাব গো ইস্কুল চইলে /পড়ে লেখে মানুষ হব/ রৈয়ভ নাই মুখখু বৈলে /বিটি ছেইলেঅ্যা বলে মাগো - /রাখিস না আর আগুলে /বিটি ছেল্যআ ও সবেই পারে/ বাবাকে দেনা বইলে // হরি বলে শুন গো টুসু -/ চল যাবো চল স্কুলে /বইয়ের পাতে অনেক কিছু/ জানতে পাইরব্য পড়িলে //(6)

(৪) সর্বশিক্ষা অভিযান :- লেখাপড়ার বড়ই রে আদর/ আমরা রইবো নাই আর নিরক্ষর/(রঙ)// চল গো টুসু স্কুল যাব/ ইস্কুলে দিছে খাবার/ সর্বশিক্ষা আইসেছে গো শুনছো কি সেই খবর// লেখাপড়া শিখা গো টুসু-/ বলছি তোকে বারে বারে/ লেখাপড়া শিখলে টুসু/ পরে পাবে উপকার // লেখাপড়া না শিখলে চোখ থাকিতে ও অন্ধ কার/ রান্নাঘরেও কাজ করিতে লেখা পড়ার দরকার// হাটবাজারে যাবে টুসু -/হিসাব রাখবে খরচার/ নগদ পয়সা গুনে দিবে/ ঠকাবে না কেহ আর// ভালো কইরে পড়বে টুসু/ পাশ করো বছর বছর/ হরি বলে হেসে হেসে তবেই পাবি ভালো বর //(7)

(৫) প্রতিষেধক টিকা সংক্রান্ত :- টিকা নিতে ভুলনা টুসু/ টিকা নিলে সুখ অনেক কিছু /(রঙ)// চল টুসু চল হেলথ সেন্টারে -/টিকা সব বুঝে লুব/ মাসে মাসে দিনে দিনে টিকা গুলান সব লুব/ টিটেনাসের টিকা নিলে/ ধনুষ্টংকার হটে পিছু/ গর্ভবতী মায়ের সেবায়/ আনন্দে বাঁচে শিশু// বি.সি.জি এর টিকা দিব-/ জন্ম হওয়ার ঠিক পিছু/ যক্ষা রোগের প্রতিষেধক/ বাদ পড়ে না যেন কিছু/ পোলিওর টিকা ভুল করো না -/নিয়ম মাফিক সবকিছু,/বিকলাঙ্গের হাত থেকেই ভাই/ রেহাই পাবেক তোর শিশু/ হরি বলে, টিকা নিলে-/ ভাবতে হবে না কিছু,/ চল টুসু চল হেলথ সেন্টারে/ ঘরের কাজ হবেক পিছু //(8)

(৬) জল সংরক্ষণ:- জল ছাড়া যে জীবন বাঁচে না জলের অপচয় কেউ করো না /(রঙ)// জল পিপাসায় প্রাণ যায় যায় /প্রাণ বুঝি আর থাকে না// মাটির নিচে জলের স্তরে /ভুল করে বিষ মেশাও না // মাটির নিচের জমা জলকে / যখন তখন তুলবে না /জমা জলটা ফুরাঁ এ গেলে/ খাবার জল আর মিলবে না// বৃষ্টির জল কে আটক কর/ যেন বহে পালায় না /জলেই মোদের জীবন বাঁচে/ একথা কেউ ভুল না //হরি বলে শুনো সবাই / জলের দাম তো লাগে না /এই ভাবনাটা মাথায় রেখে/ জল নষ্ট কেউ করো না //(9)

(৭) টিভির কুফল:- ঘরে ঘরে টিভি ঢুইকেয়েছে /টিভি খুইলেছে ত মইরছে/(রঙ)// খাটো খাটো পোশাক পরে/ যা খুশি তাই নাচিছে/ একই ঘরে মার আর বেটি /ওই সব ছবি দেখিছে // পড়াশোনা চুলহায় যাছে /নাচে গানে মাতেছে /কি যে হলো বুঝতে লারছি/ কন হুচুকে পাইছে// টুসু গেল ভাদু গেল /সংস্কৃতি সব ভুলিছে,লারে লাপ্পা নাচ গান দেখে/ পরের নকল শিখিছে // হরি বলে জাড়ের দিনও গোটা গা টা দেখাচ্ছে / শরীর দেখাঞ কিটা হবেক /ছেল্যেআ ভুলা শিখেছে //(10)

(৮) বাবা মার প্রতি কর্তব্য :- বাবা মাকে কভু ভুলিস না/ ও তুই হারালে আর পাবি না/ (রঙ)// ন -মাস দশ দিন গর্ভে ধরা -/ কত যে তার যাতনা/ কত যত্ন পরিচর্যা/ তার হিসেব যে মিলে না// লেখাপড়া শিখে টুসু আত্ম গরব করো না /বাবা মায়ের আদর ছাড়া/ চাকরি তো তোর জুটতো না // আসবি যাবি পরব পালি/ কটু কথা বলবি না/ মা বাবা তোর শুভাকাঙ্ক্ষী/ ভালো ছাড়া চাহে না // বাবা মায়ের মতন আপন/ আর কেউ হতে পারে না/ বাবা মায়ের স্বপ্ন দেখা/ তারি ত তুই একজনা// ছোট খুকি নই লো তুই আর -/তোর এখন আছে ডানা,/ সহর দিগে মন টানছে/ সব দেখিছেন একজনা //(11)

(৯) ধোঁয়াহীন চুল্লি নির্মাণের উপকারিতা :- বানাবো গো ধোঁয়াহীন চুলা/ পালায় যাবে গো ঐ ঝুলগুলা/(রঙ)// হ্যাঁড়ির তলায় কালি জমে/ ঘষে খিআই হাতগুলা // লিটই লিটই রান্না করা-/ রাঁধুনির যে কী জ্বালা/ ধুঁয়া গিলে পেট ভরে যায় /ভাবি গো কি দুঃখ ভালা// চোখ ফুলে হয় কেঁদের মতন /রান্না ঘরলে বাইরালে/ ধুঁয়ার জ্বালা বড় জ্বালা/ কে সামলাবেক ইয়ার ঠেলা// দমে খরচ নাইলে টুসু / দরকার নাই কাউকে বলা/ ঝকঝক্যআ থাকিবেক দেওয়াল/ জমবেক নাই আর ঝুলগুলা//(12)

(১০) শৌচাগার নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করা:- মাঠে ঘাটে পায়খানা করা/ মান-সম্মানের বাঁচা মরা/(রঙ)// দমে খরচ নাইলে টুসু / হোস না লো তুই মনমরা / চেষ্টা থাকলে উপায় আছে /ঘরে শৌচাগার' করা //বাড়িতে শৌচাগার থাকিলে / আনন্দে বাঁচবি তোরা/ রোগ অসুখলে মুক্তি পাবি/ জীবন হয় শান্তি ভরা// মাঠে-ঘাটে সকাল-বিকাল -/ লিতই পায়খানা করা,/লজ্জা শরম সবই হারায়/ লজ্জা পায় মা-বোনেরা// কম খরচে শৌচাগার টি -/ বানাবো চল আমরা /স্বাস্থ্য বিধান মানলে টুসু/ রোগ অসুখ যায় দূর করা//(13)

এবার আমরা গান গুলো সম্বন্ধে অল্প আলোচনা করে এই প্রবন্ধ কে উপসংহার এর দিকে নিয়ে যাবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ গানটিতে বলা যায় যে- অক্ষর জ্ঞান যার নেই, সেই তো নিরক্ষর।সে তো চোখ থাকতেও অন্ধ। নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা শোষিত মানুষ, নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করতে হলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এই জন্যই তো গণশিক্ষা ও সর্বশিক্ষা অভিযান। সর্বশিক্ষা অভিযান বর্তমানে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের সাফল্যের

পেছনে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ আবশ্যক। তাই টুসু শিল্পীরা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন সমাজকে।

আবার নারী শিক্ষা বিষয়ে দেখা যায় নারী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো স্কুল কলেজের শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে কল্যাণ ধর্মে শিক্ষাগ্রহণ করা। আমরা জানি মুসলমান শাসনে নারী শিক্ষার ধারা হয়েছিল রুদ্ধ। তারপর এল কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহের মত অভিশাপ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কার ভরা নারীর জীবন।এখনো অনেক পরিবার আছে যাদের ধারণা মেয়েদের বেশি উচ্চ শিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়। কারণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করলে তাদের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে না। কিন্তু পুরুষদের সাথে সাথে নারীরাও শিক্ষিত হলে তবেই সমাজের উন্নতি হবে।আর নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব নিতে হবে।তবেই পণপ্রথার মত কু-প্রথা গুলি কে নির্মূল করা সম্ভব হবে। মেয়েদের শিক্ষার পথে এখনো অনেক বাধা রয়েছে।সেগুলি কাটিয়ে উঠে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ কোথায় টুসু শিল্পীরা গানের মাধ্যমে সচেতন করতে চেয়েছেন।

প্রতিষেধক টিকা সংক্রান্ত বিষয়ে বলা যায় যে, শিশু ও মায়ের জীবনকে সুস্থ সবল ও দৃঢ় করে গড়ে তোলাই হলো জাতির কর্তব্য ও রাষ্ট্রের কর্তব্য।এই কারণে সরকার বিভিন্ন ধরনের টিকাদান কে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির সাফল্যের জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু এগুলির সঠিক ব্যবহার জানার জন্য টুসু শিল্পীরা হেল্থ সেন্টারে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টিকা নেওয়ার কথা বলছেন। যা সহজেই এই গানগুলির মাধ্যমে সাধারণ মেয়েরা অনুধাবন করে হেল্থ সেন্টারে গিয়ে টিকা গুলি নিচ্ছেন। এখানেই টুসু গানের সার্থকতা। সমাজ শিক্ষক হিসাবে তার ভূমিকা।

জল সংরক্ষণ বিষয়ে বলা যায় যে জীবনে ও প্রাত্যহিক জীবনে সব রকম জলের প্রয়োজন। কোনো জল পান করার জন্য, কোনো জল অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য, নিত্যব্যবহার্য জলের অতি ব্যবহার ও অপব্যবহার রোধ করার প্রয়োজন।জীবনদায়ী জল কে আমরা সযত্নে সংরক্ষণ করতে পারি। বৃষ্টির জল কে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ধরে রাখতে পারি। সবাই মিলে জলকে নির্মল রাখার প্রয়াস করতে পারি। তবেই অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে। সে কোথায় টুসু শিল্পীরা বলতে চেয়েছেন।

বৃত্ত বাসনার দুর্নিবার লোভে বিপর্যস্ত একবিংশ শতাব্দী। অথচ সভ্যতার ঊষালগ্নে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছিল তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য।মানুষ নির্বিচারে বিনাশ করছে প্রকৃতির ভারসাম্য। যে বাতাস তার প্রাণবায়ু,যে জল তার জীবন,যে মাটি তার ধাত্রী,যে শব্দ তার শ্রুতি- সেই সব কিছুকে বিবেকহীন মানুষ করছে কলঙ্কিত। তাই প্রকৃতির আশীর্বাদ ধন্য মানুষ,আজ প্রকৃতির প্রতিশোধের মুখোমুখি। দূষণের প্রতিক্রিয়া বড় ভয়াবহ। কেবল তাৎক্ষণিক মৃত্যু নয়, তিলে তিলে মৃত্যু। বায়ু দূষণের পরিমাণ আজ ভয়ঙ্কর।তাই পরিবেশকে দূষণের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করা জরুরি কর্তব্য। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে সে প্রকৃতপক্ষে পরিবেশেরই সন্তান। সুস্থ পরিবেশের উপর নির্ভর করে সুস্থ জীবন। তাই তো লোকশিল্পীর গান গেয়ে মানুষকে সচেতনতার পথ দেখাচ্ছেন।

টিভির কুফল বিষয়ে বলা যায় যে দূরদর্শন শিক্ষা, তথ্য প্রচার ও বিনোদনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। ব্যক্তি মর্যাদার প্রতীক রূপে সারা বিশ্বের স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে সমাজে দূরদর্শন এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। টিভির নগ্ন বিজ্ঞাপন ও ছবি দেখে শিশু ও তরুণ মন কলুষিত হচ্ছে এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি হচ্ছে। মানুষের বাস্তব বোধ কে নষ্ট করে সুস্থ মানসিকতাকে অসুস্থ করে তুলছে। নীতিহীনতা, ধ্বংস, হত্যা,আর বিশৃঙ্খলার দৃশ্য দূরদর্শনে বেশি করে দেখানো হচ্ছে। লোকশিল্পীরা সচেতন করতে চেয়েছেন,যে দূরদর্শন কে সুস্থ সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে বলি সমাজ শিক্ষক ও লোক শিক্ষক হিসেবে টুসু গানগুলি নানাভাবে দেশের এবং দশের এর চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে। গ্রামীণ জনজীবনকে বর্তমানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লোকশিল্পীরা প্রচলিত সুরে,সুর বেঁধে প্রাথমিকভাবে সমাজ শিক্ষাকে সমাজ গড়ার আন্দোলনে শামিল করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । যার জন্য আমাদের গ্রামীণ সমাজ উন্নতির আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছেন এবং গ্রামীণ সমাজ আনন্দে ভরে উঠছে।

তথ্যসূত্র:-

১. বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড(১৩৯০), বিবিধ প্রবন্ধ লোকশিক্ষা, যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, 32, এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,কলকাতা- 9, পৃষ্ঠা 376.

২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- 376.

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- 377.

৪. টুসু সঙ্গীত,হরিপদ মাহাত, প্রকাশক -লোকসংস্কৃতি মানভূম প্রকাশনী, কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, প্রথম প্রকাশ বাঁকুড়া লিটল ম্যাগাজিন মেলা, 2013, পৃষ্ঠা-2.

৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-3.

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-6.

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-9.

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-12.

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-13.

১০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-30.

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-21.

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-18.

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তথ্য সূত্র নং 4 পৃষ্ঠা-19.

ব্যক্তি ঋণ:- হরিপদ মাহাত ও অচিন্ত্য জানা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ নারী, তুলিকা মজুমদার, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর- 2006.

২. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, (১৩৯০), যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, 32,এ,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কোলকাতা -9

৩. টুসু সঙ্গীত হরিপদ মাহাত, লোকসংস্কৃতি মানভূম প্রকাশনী,কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, বাঁকুড়া লিটল ম্যাগাজিন মেলা -2013.

৪. টুসুর কথা,ছন্দা ঘোষাল, (১৪১২), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক- দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, 66 /3 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -9.

৫. দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার টুসু- ভাদু -ঝুমুর,(2012), ড. দয়াময় মন্ডল, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ৪এ ও 5বি কলেজ রোড,কলকাতা-9.

৬. টুসু ও ভাদু তুলনা ও বিশ্লেষণ (2012) ড.দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ 6/2,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা -9.

মহিয়সী অঘোরকামিনী : নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল দূত

দীপংকর বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বারুইপুর কলেজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

***সংক্ষিপ্তসার** : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার এক গ্রাম্য বালিকা বধূর মহিয়সী হয়ে ওঠার কাহিনী এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। একজন নিরক্ষরা নারী কিভাবে স্বামীর যোগ্য সহায়তায় শিক্ষা লাভ করে বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অঘোরকামিনী দেবী। ২৪ পরগণা জেলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। স্বামী প্রকাশচন্দ্র একজন সরকারী কর্মচারী। উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে সারাজীবন নিষ্ঠার সাথে ধর্মপালন করেছেন। তাঁর স্বল্প জীবন কিন্তু বহু ঘটনা ও কার্যাবলীতে ঠাসা। স্বামীর কাছে প্রাথমিক পাঠ নিয়ে, পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌতে মিস থোবার্ন এর ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বিহারের বাঁকিপুরে মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। তিনি ছিলেন এদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত। তাঁর জীবনদর্শন, ত্যাগ, দৃঢ় মানসিকতা নারী জাগরণের পথ প্রশস্ত করেছে।*

তাঁর সেবামূলক কাজের নানা বর্ণনা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। সামাজিক নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমাজে মেয়েদের যোগ্য স্থান লাভের কথা বলেছেন। মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে জাত-পাত তিনি মানতেন না। তার পরিচয় কন্যার বিবাহের সময় পাই। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সকলের বিপদে আপদে তিনি ছুটে যেতেন। যতটা সম্ভব সাহায্য করা এবং অসুস্থ নারীদের সেবাকার্য দ্বারা সুস্থ করে তুলতেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের আহ্বানে অঘোরকামিনী দেবী গায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতিথিপরায়ণতা ছিল তার জীবনের এক মহান ব্রত। তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শগুলি পরবর্তীকালে সন্তানদের মধ্যে পড়েছিল। এইভাবে একজন সাধারণ মেয়ে সমাজকে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন।

***শব্দসূচক** : মতিহারী, বাঁকিপুর, লক্ষ্ণৌ, মিস থোবার্ন, আধ্যাত্মিক বিবাহ, সেবাব্রত, দৃঢ়চেতা, ব্রহ্মোপসনা।*

একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত রমণী সুযোগ, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা কিভাবে একজন অসাধারণ, অনন্যা নারী হয়ে উঠতে পারেন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন অঘোরকামিনী দেবী। সে যুগের গ্রাম্য পরিবেশে অন্তঃপুরচারিনী মহিলাদের জীবনযাত্রা যে কতখানি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, তা আমাদের অজানা নয়। সমস্যা সঙ্কুল নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিকূল আবহের মধ্যেও তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। এবং নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিহারে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাল্যবিবাহের কলঙ্ক নিজের জীবন তপস্যায় মুছে নিঃশেষ করে দিতে পেরেছেন। ব্রাহ্মধর্ম পালন, প্রগতিশীল সমাজ ভাবনা, দেশজ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সচেতনতায় উদ্দীপ্ত এক নারী অঘোরকামিনী। কোনটা ধর্ম আর কোনটা কুসংস্কার তা বিচার করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বালিকা বয়স থেকেই তার মনে ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠিটা যথার্থরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার সেবামূলক কাজের অনেক নিদর্শন আমরা পাই। তাঁর জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলি ও মহান কার্যাবলীর কিছু অংশ এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

অঘোরকামিনীর জন্ম ১৮৫৬ খ্রি. মে-জুন মাসে, ১২৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে চব্বিশ পরগণা জেলার মাইহাটির শ্রীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বিপিনচন্দ্র বসু। জন্মের তারিখ নিয়ে 'অঘোর প্রকাশ' গ্রন্থের প্রথমে লেখা হয়েছিল— তোমার পিত্রালয়ে কেহই তোমার জন্মের তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। একে তো কন্যাসন্তান তাহাতে আবার পল্লীগ্রামে জন্ম। কেমন করিয়া ঠিক থাকিবে। তোমার পিতামহ হরচন্দ্র বসু মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। পল্লীতে তাঁর সাহস ও দানশীলতার বিষয়ে জানা যায়। তোমাদের বাটীতে দুর্গোৎসব বড় ধুমধামে হইত। কিন্তু সংসারের কন্যা সন্তানরূপে অঘোরকামিনী ছিলেন আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই। পিত্রালয়ে তার ডাক নাম ছিল ঘোরী। এই লেখা থেকে বোঝা যায় তৎকালীন মেয়েদের বিশেষ করে গ্রাম্য মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বা মূল্য কতটা।[১] তখন কেইবা জানত গ্রামের এই নিরক্ষর বালিকা একদিন হয়ে উঠবেন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত।

১৮৬৬ খ্রি. শ্রীপুর গ্রামের স্বর্গীয় প্রাণকালী রায় এর পুত্র প্রকাশচন্দ্র রায় এর সঙ্গে অঘোর কামিনীর বিবাহ হয়। অনেক ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল ও বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন ১০ বছর আর পাত্র প্রকাশচন্দ্রের বয়স তখন ১৮ বছর। একে বাল্য বিবাহ বলা চলে। তবে ঐ আমলে এধরনের চল ছিল। গ্রাম্য বালিকা নিরক্ষর ছিলেন এটাই স্বাভাবিক। প্রকাশচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।[২] প্রকাশচন্দ্রের বংশধররা বিত্তবান হলেও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তাই বালিকা বধূ একপ্রকার অভাবের সংসারে এসে পড়েছিল। তাছাড়া স্বামীও তখন রোজগার করতে না পারায় সাংসারিক গঞ্জনা তাঁকে

সহ্য করতে হয়েছিল। তবে অঘোরকামিনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও পরোপকারী ছিলেন। নিজেদের অভাব অনটনের কথা কখনও কাউকে বুঝতে দেননি। সামান্য অর্থেও হিসাব করে সুন্দরভাবে সংসার প্রতিপালন করেছিলেন।

সেই সঙ্গে ধৈর্য্য, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। পরে এইসব গুণগুলিই তার জীবনের মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর চরিত্রের মধ্যে সেবাপরায়ণতা ও পরোপকারিতার মত গুণগুলি বরাবরই ছিল। নিজের বসন্ত রোগ নিরাময়ের পর দুই বোন ও ভাই জ্ঞানচন্দ্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি তাদের অক্লান্তভাবে সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তোলেন। অল্পদিনেই রন্ধন পটু ও কর্মপটু হিসাবে পাড়ায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাই যেকোন সামাজিক কাজে পাড়াপড়শিরা তাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। তবে বালিকা বয়স থেকেই অঘোরকামিনীর মনে ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিটা যথার্থরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। একবার অঘোরকামিনী নিজ গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। খাবার সময় দেখতে পেলেন যারা ভাল শাড়ি ও দামী অলঙ্কার পড়ে এসেছেন তাঁদের যত্ন বেশী হচ্ছে। আর যাদের সাজ পোশাক সাধারণ তাদের কোন যত্ন করা হচ্ছে না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ধনী দরিদ্র বলে ব্যবহারের বৈষম্য তাঁর প্রাণে বড় আঘাত করেছিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করেছিলেন দরিদ্রদের প্রতি ঐরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখনও করবেন না। সেই সংকল্প তিনি জীবনে কোনদিন ভঙ্গ করেননি।[৩] তিনি গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতিগুলি একদমই পছন্দ করতেন না। তবু ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে জোর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন পরিবারের লোকেরা।

অঘোরকামিনীর স্বামী প্রকাশচন্দ্র রায়কে কর্মসূত্রে বংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় (যেমন- বর্ধমান, কলকাতা, মতিহারী, পাটনা, বাঁকিপুর ইত্যাদি) থাকতে হয়েছে। তাই সবসময় স্বামীর পাশে থাকা সম্ভব হয়নি। তবে নিয়মিত তাদের মধ্যে পত্রালাপ চলত। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন। আপন চেষ্টায় প্রকাশচন্দ্র পোস্টমাস্টার থেকে শুরু করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হয়েছিলেন। অঘোরকামিনী প্রকৃত অর্থে স্বামীর সহধর্মী ও সহকর্মী হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যবধূর প্রতি প্রকাশচন্দ্রের এক গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। প্রকাশচন্দ্র রায় ‘অঘোর প্রকাশ’ গ্রন্থে নির্দ্ধিধায় বলেছিলেন তোমার মত করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলব। তার নিরক্ষরা পত্নীর পড়াশুনোর দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। অঘোরকামিনী সারাদিন সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই দিনেরবেলা সম্ভব হত না বলে রাত্রে পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রকাশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— সকলে শয়ন করিলে, যখন তুমি শয়ন করিতে আসিতে, তখন তোমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। আমি গুরু হইয়া স্বতন্ত্র বসিতাম, তুমি ছাত্রী হইয়া ভয়েভয়ে দূরে বসিতে। অনুরাগের সহিত আপনার পাঠ শিখিতে। এইরূপে তোমার ক,খ আরম্ভ

হইল। ক্রমে প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ শেষ হইয়া গেল।[৪] এইভাবে অঘোরকামিনী স্বামীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আরো শিক্ষা লাভের আগ্রহ তাঁর মধ্যে জেগেছিল।

মানবজীবনের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, সঙ্গগুণে কিংবা সঙ্গদোষে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে। সৎসঙ্গ লাভ করা মানুষের পরম সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন বলেই উত্তরকালে প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজকে আদর্শ করে নিজের জীবন ও সহধর্মিনী অঘোরকামিনীর জীবন আদর্শরূপে গড়ে তোলেন। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী ব্রাহ্ম সমাজে ও অপর সমাজে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন। অঘোরকামিনীর অসামান্য প্রতিভা এই পরিবারকে আদর্শ পরিবারে পরিণত করেছিলেন। তাই এই পরিবার 'অঘোর পরিবার' নামে খ্যাত ছিল।[৫] এই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন দুই কন্যা সুসারবাসিনী ও সরোজিনী এবং তিনপুত্র যথাক্রমে সুবোধচন্দ্র, সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র। বিস্তৃত ও প্রসারিত ছিল অঘোর পরিবারের পরিধি— যেখানে আত্মীয়ে অনাত্মীয়ে, স্বজনে-পরিজনে কোন প্রভেদ কখনও দেখা যায়নি। যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল বহু রুগ্ন, বিপন্ন, শোকার্ত, দীন-দুঃখী ও অনাথ নর নারী।[৬]

সেকালে যারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন হিন্দু সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তারা যথেষ্ট লাঞ্ছনা পেতেন। অঘোরকামিনী ধর্ম সাধনার পথে স্বামীর পথ অনুসরণ করে প্রকৃত সহধর্মিনী হয়েছিলেন। সেজন্য স্বামী অপেক্ষা তাঁকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার সুযোগ তাঁদের ঘটেছিল।[৭] শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর কিছুদিন হরিনাভিতে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পোস্টমাস্টারের কাজ ছেড়ে দেবার কিছুকাল পর ১৮৭৩ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে প্রকাশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি সপরিবারে তাঁর ধর্মবন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে একত্রে বাস করতেন। উভয় পরিবারের মধ্যে তখন অত্যন্ত হৃদ্যতা ও প্রীতির ভাব জন্মেছিল। এসম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখেছিলেন— "১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে তোমাকে ও কন্যা দুটিকে সেখানে লইয়া গেলাম। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তুমি মিশিতে লাগিলে। ব্রাহ্ম পরিবার যে কত উন্নত হয়, একত্রে উপাসনার যে কত সুফল, তাহা অনুভব করার সুযোগ পাইলে।.... আমি মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলিফ সুপারিন্টেন্ডের কাজ পাইলাম। একাজে বেতন অধিক ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা বেশি থাকায় সেখানে যোগদানের সিদ্ধান্ত লইলাম। আসিবার সময় তুমি ও তোমার কন্যাগুলি এবং শিবনাথের পত্নী ও কন্যা এত ক্রন্দন করিয়াছিলে যে সে কান্নার রোল আমি ভুলিতে পারিব না।"[৮]

অঘোরকামিনী গ্রাম্য বালিকা ও গ্রাম্য বধূরূপে জীবন আরম্ভ করলেও অত্যন্ত প্রগতিশীলা নারীর মতই পুরুষদের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন— ‘‘বাহিরে আসিয়া তোমার মনে স্বাধীনভাব বাড়িতে লাগিল, সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার বিষয়ে, নারী জীবনের আদর্শ বিষয়ে, চিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইতে লাগিল। যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশের নারীর অবস্থা কত হীন, তাহার উন্নতির পথে কত বাধা— ততই তোমার মনে ক্লেশ হইতে লাগিল।.... উপাসনা, সংকীর্তন, আলোচনা প্রভৃতি যাহা কিছু পুরুষেরা করিতেন, তোমার মনে হইত যে নারীদের তাহা করা আবশ্যক, ও তাহা করিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। আর যথার্থ কথাই তো তাই। বিধাতা একই ধাতুতে নারীর ও পুরুষের আত্মাকে গড়িয়াছেন, ভিন্ন নিয়ম কি রূপে হইতে পারে? অধিকারে ছোট বড় কিরূপে হইতে পারে? যখন সামাজিক উপাসনায় আচার্য বলিতেন, আমরা দন্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি তখন কোন নারীরাই উঠিতেন না; কিন্তু তুমি আপনাকে সমাজের একজন মনে করিতে এবং প্রত্যেক সামাজিক উপাসনায় ও সাধারণ প্রার্থনার সময় পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে। এজন্য তোমাকে অনেক নিন্দা ও ভৎর্সনা সহ্য করিতে হয়েছিল। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতে না।[৯] এর মধ্যদিয়ে অঘোরকামিনী দেবীকে আমরা একজন তেজস্বিনী নারীরূপে দেখতে পাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, উড়িষ্যার মধুসূদন রাও প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্নেহাশীষ লাভে ধন্য হয়েছেন অঘোরকামিনী দেবী। সংসারের হাজার কাজের মধ্যেও কোনদিন তাঁর ব্রাহ্ম উপাসনা বন্ধ হত না। ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবে যোগদান করার জন্য একবার প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী কলকাতায় আসেন। অঘোরকামিনীর উপাসনায় অনুরাগ কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন, নিজ শৃঙ্খলাগুণে তুমি সন্তানদের খাবার খাইয়ে প্রতিদিন সকাল ৮ টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে উপাসনা স্থানে যেতে। তুমি উপাসনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতে। তোমার ধর্মানুরাগ দেখে সকলেই আশ্চর্য হতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন একবার বলেছিলেন ‘‘যে নতুন মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনার অনুরাগ শিক্ষা কর।”[১০] সুতরাং অঘোরকামিনী আপন তেজে ব্রাহ্ম ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অঘোরকামিনীর নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা দেখে তাকে মৈত্রেয়ী নাম দিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা ঐ

নামেই তাকে ডাকতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'স্ত্রীচরিত্র' গ্রন্থে 'স্বাধ্বী অঘোরকামিনী' সম্বন্ধে লিখেছেন— প্রকাশচন্দ্র ও তার স্ত্রী অঘোরকামিনী ব্রাহ্ম সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের নিষ্ঠা, ভক্তি, সচ্চরিত্রতা সকলেই জানেন। তাদের ন্যায় ধর্মবন্ধু আর কখনও পাননি। ধর্ম বিশ্বাসে, ধর্মসাধনে, ধর্মপ্রচারে অঘোরকামিনীর অবিশ্রান্ত উৎসাহ ছিল। তিনি ধর্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চব্রত পালন করেছেন। প্রকাশচন্দ্র রায় তাকে সহধর্মিনীরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। আমরা তাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি করে সুখী হয়েছি, উপকৃত হয়েছি ও কৃতার্থ হয়েছি।[১১]

অঘোরকামিনী স্বামী সন্তানদের নিয়ে অনেকদিন মতিহারীতে ছিলেন। অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন দুজন মহাপুরুষ সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার কার্যে দেশে দেশে উন্মাদের মত ভ্রমণ করছিলেন। একজন নবযুগের ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অপরজন সাধু অঘোরনাথ। এদের ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রদীপ্ত অগ্নিময় মূর্ত্তি ও ভাগবত প্রেমের অমৃতময় প্রভাব দর্শন করে অঘোরকামিনী ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এরপর থেকে অঘোরকামিনী ব্রাহ্ম ধর্মে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য মতিহারীতে আসার পর থেকেই সাধারণ গৃহিনী অঘোরকামিনী দেবী অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়ে শুরু করেন। মতিহারীতে বসে আরেক জনের সাহচর্যে তারা আসেন। তিনি হলেন কেদারনাথবাবু। যিনি এক পত্রে প্রকাশচন্দ্রকে লিখেছিলেন— "প্রকাশ তুমি জান না অঘোর কি রত্ন।[১২]

১৮৭৩ খ্রি. অঘোরকামিনীর স্বামী প্রকাশচন্দ্র রায় দুর্ভিক্ষ রিলিফ সুপারিন্টেন্ডের চাকুরী নিয়ে সপরিবারে বিহারের মতিহারীতে আসেন। এই পদের বেতন তখন ছিল ৮০ টাকা। এই বেতনের টাকা থেকে প্রতি মাসে ৩০ টাকা হিসাবে প্রকাশচন্দ্র বাড়ীতে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বাকি ৫০ টাকাতে সংসার চালানো মুশকিল। কিন্তু এই অল্প টাকা দিয়েই অঘোরকামিনী ভালভাবেই সংসার চালাতেন। এমন কি সংসারের অভাব অভিযোগের কথা স্বামীকে জানতেও দিতেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শত বিপদেও ঋণ গ্রহণ করবেন না। ভাল বস্ত্রও তিনি পরিধান করতেন না। বিহারের 'মুটিয়া' যা সেখানকার গরীব দুঃখীরা ছাড়া আর কেউ পড়ত না সেই বস্ত্রই তিনি আদরের সাথেপরিধান করতেন। দামী অলংকারও কখনও পড়তেন না। পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও তিনি সাধারণ বেশভূষা ও সরল জীবন যাপন করেছেন।[১৩]

একটি ঘটনার কথা এখন উল্লেখ করা যায় যা থেকে অঘোরকামিনীর দানশীলতা ও পরদুঃখ কাতরতার কথা জানতে পারা যায়। সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এক ভীষণ

ঘূর্ণিবাত্যায় বহু লোকের প্রাণহানি হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন এক আবেদন প্রচার করেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অঘোরকামিনী তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে, বিক্রয়লব্ধ টাকা কেশবচন্দ্রের হাতে পাঠিয়ে দেন।[১৪] তিনি সর্বদা আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নিতেন এবং অভাবগ্রস্ত ও দুর্গত প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন সরকারী উচ্চপদে চাকুরী করা সত্ত্বেও কোন আর্থিক সঞ্চয় তাদের ছিল না। বিভিন্ন সেবামূলক কার্যে এই অর্থ ব্যয় করে দিয়েছিলেন।

অতিথিপরায়ণতা ছিল অঘোরকামিনীর জীবনের আর এক মহান ব্রত। উড়িষ্যার মধুসূদন রাও একবার অঘোর পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখেছিলেন ''রাজগৃহ হইতে বাঁকিপুর ফিরিবার কিছু কাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন ওই তো তীর্থ। গয়া কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ আর কোথঅও দেখি নাই। রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনা করে গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তার মধ্যেই আহারের বন্দোবস্ত হইলো....। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদর মেশানো থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।[১৫] আত্মীয়-স্বজন এবং ব্রহ্মধর্মের বহুলোকেরা অনায়াসেই তাঁদের গৃহে আসতেন। তাদের সেবা করে তিনি কৃতার্থ হতেন।

অঘোর প্রকাশের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিধানচন্দ্রের জন্মের পরেই তারা সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, তাদের আর সন্তান হবে না। এইরূপ সংকল্প গ্রহণের কারণ হিসাবে প্রকাশচন্দ্র লিখেছিলেন— অনেকগুলি সন্তান হলে নারীর ধর্মসাধনে ব্যাঘাত হয় তা তুমি উপলব্ধি করেছিলে। বাইরের জগতে যেতে গেলে সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে দাসীর কাছে রেখে যেতে হয়। কিন্তু খুব ছোট সন্তানকে তো রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রথমে তারা দুজনে ছয় মাসের জন্য আধ্যাত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করলেন। স্থির হয় ছয় মাস শরীরের কোন সম্পর্ক থাকবে না। পরম নিষ্ঠার সাথে ব্রতচারী দম্পতি সেই দুঃসাধ্য ব্রত পালন করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রত গ্রহণ করলেন সারাজীবনের জন্য। কিন্তু এই কাজ যে ভীষণ কঠিন। কারণ তখনও তারা যৌবনকাল অতিক্রম করেন নি। সেইসময় স্বামী প্রকাশচন্দ্রের বয়স ছিল ৩৪ বছর আর স্ত্রী অঘোরকামিনীর বয়স ছিল ২৬ বছর। পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরকে সম্বল করে পুণ্যাত্মা সাধক-সাধিকা ধর্মার্থ সেই মহাব্রত পালন করেছিলেন মৃত্যুকাল অবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁরা শারীরিক মিলনের পরিবর্তে আত্মিক মিলন সংঘটনে সতত সাধনা করেন। কেবল চিন্তার মাধ্যমেই পরস্পরের মধ্যে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন।[১৬]

কর্মসূত্রে শেষজীবন তাঁরা বাঁকিপুরেই কাটিয়েছিলেন। বাঁকিপুরের সাধনক্ষেত্রে প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী দেবী কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলেন। কিন্তু একথা তারা প্রচার করেন নি, কারণ যদি ব্রত ভঙ্গ হয় তাহলে সবাই হাসাহাসি করবে। তখনকার চোখের জলের কথা কেবল দুজনেই জানতেন আর জানতেন স্বয়ং ভগবান।[১৭] এরপরেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেদের আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্পন্ন করবেন। যে রাজগৃহকে মহাত্মা বুদ্ধদেব পবিত্র করেছিলেন, তারা সেখানে গেলেন। ১৮৯১ খ্রি. ২৭ জানুয়ারী উভয়ে উভয়ের মস্তক মুণ্ডন করেন এবং ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে 'আধ্যাত্মিক বিবাহ' নামক নবসংহিতায় লিখিত একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।[১৮] এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর তাদের পার্থিব সুখের লালসা যেন চরণতলে ধূলোর সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। তাদের আত্মা শুভ্র কপোতের ন্যায় উর্দ্ধে, প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে লাগল। তাদের আত্ম শুভ্র কপোতের ন্যায় উর্দ্ধে, প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে লাগল। সুতরাং তারা গৃহে থেকেও সন্ন্যাসের জীবন বেছে নিলেন।

কন্যার বিবাহদানের ক্ষেত্রেও আমরা অঘোরকামিনী দেবীর উদার মানসিকতার পরিচয় পাই। বড়মেয়ে সুসারবাসিনীর বিবাহের বয়স যখন হল, তখন পিতা মাতা বিবাহ সম্পর্কে তার মনের ইচ্ছা জানতে চাইলেন। সুসার ছোট কাগজে লিখে জানালেন সে বৃন্দাবনকে ভালবাসে। বৃন্দাবনকে তাঁরা ভালভাবে চিনত ও জানত, কারণ সে বাড়ীতে পড়াতে আসত। এই বৃন্দাবন ছিল নিম্নজাতির এক সচ্চরিত্র যুবক। সে হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্ম সমাজে এসে যোগ দিয়েছিল। তাই কন্যার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গরীব হলেও সৎ ও উদার চিত্তের যুবক বৃন্দাবনের সঙ্গে তার বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন অঘোর ও প্রকাশ। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা এই বিবাহের বিরোধীতা করে থাকেন। প্রকাশচন্দ্র ছিলেন উচ্চবংশের বঙ্গজ কায়স্থ, তার পত্নী অঘোরকামিনী ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর। এখন কিনা ছোট জাতের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেবেন। কিন্তু সব বাঁধাকে তারা দূরে সরিয়ে দিয়ে মেয়ের বিয়ে বৃন্দাবনের সঙ্গেই দিয়েছিলেন।[১৯]

কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম শেষপর্যন্ত ভয়ানক হয়েছিল। কারণ বৃন্দাবন ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ করেন এবং স্বাধ্বী পত্নীকে ত্যাগ করে হিন্দু সমাজে ফিরে যান। সে হিন্দু সমাজের এক স্বজাতির মেয়েকে পুনরায় বিবাহ করে। বৃন্দাবনের বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। আদালতে বিষয়টি উঠলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। কিন্তু সুসার তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে নি। তাঁর ভাগ্যের পরিহাসকে সে মেনে নিয়েছিল। তাঁর পিতামাতাও মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবনকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সুসারবাসিনী ব্রহ্মচারিণী হয়ে ঈশ্বরের সেবিকা হয়ে চিরজীবন কাটানোর পথ বেছে নিলেন। এই ঘটনায় অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রকে পরিচিত লোকেদের কাছ থেকে

অনেক ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছিল।[২০] অঘোরকামিনী সমস্ত ঘটনাকে নীরবে মেনে নিয়ে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্ম উপাসনায় মনোনিবেশ করেন।

অঘোরকামিনী দেবীর স্বল্প জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজটি ছিল নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ। দীর্ঘদিন বিহারের বাঁকিপুরে থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এখানকার মেয়েদের দুঃখ-কষ্টের জীবন। তাদের মধ্যে একটুও জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেনি। তিনি সংকল্প করলেন মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নারীজাতির উন্নতির জন্য লক্ষ্ণৌ এ মিস থোবার্ন এর কলেজে ছাত্রী রূপে থেকে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করবেন। গৃহস্থবধূ, সন্তান-জননী, পতিসঙ্গহীনা হয়ে দূরদেশে কলেজে পড়া কেমনভাবে সম্ভব হবে— একথা তিনি একবারও সমস্যা বলে ভাবলনে না।[২১] কারণ তিনি জানতেন এব্যাপারে তাঁর স্বামী প্রকাশচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন অবশ্যই পাবেন।

১৮৯১ খ্রি. তিনি দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌএর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এসম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখেছিলেন— তোমাকে দূরদেশে পাঠানো আমার পক্ষে কত কঠিন ছিল। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আবদ্ধ রাখতে চাইলাম না। উড়িয়ে দিয়ে, উড়তে দিয়ে আক্ষেপ করলাম না; উড়তে গিয়েও তুমি আক্ষেপ করলে না। লক্ষ্ণৌ এ পৌঁছানোর পর Women's College-এর কর্ত্রী মিস থোবার্ন এই বাঙালী মহিলার বৈরাগ্য, সংকল্পের বল ও আশ্চর্য ধর্মাভাব দেখে মোহিত হয়েছিলেন। মিস থোবার্ন তাঁকে অন্যান্য ছাত্রীদের মতন নিয়মের অধীনে রাখতে চাইতেন না। তিনি তাঁকে ছাত্রীর মত না দেখে আপন ভগিনীর মত দেখতে লাগলেন। কিন্তু অঘোরকামিনী পূর্ণমাত্রায় নিয়মের অধীনেই চলতেন। সেখানে তার দৈনন্দিন কাজ ছিল ভোর সাড়ে ৪ টে থেকে ৫ টা উপাসনা। ৫ টা থেকে ৬ টার মধ্যে খাওয়া, ঘর পরিষ্কার ও বস্ত্র পরিধান। ৬ থেকে সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস করা। সাড়ে ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে স্নান, আহার ও বিশ্রাম। ১২ থেকে সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত পড়াশুনা করা। সাড়ে ৫ টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আহার। ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত গান বাজনা ও ধর্মপালন। ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত নিজ ঘরে বসে পড়াশোনা করা। আর রাত সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়া।[২২] এই দৈনন্দিন নিয়মের মধ্যে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

এই সময় স্বামীকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে তার স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল— 'তোমার ঘোরী কিছুতেই পিছপা হবে না। তোমার ঘোরী কিছুই জানে না। প্রকাশ। তুমি যা বলে দেবে এই দাসী প্রাণ দিয়ে তা করে দেবার চেষ্টা করবে। ভারত মহিলা- ১৩১৬ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এরূপ লেখা পত্রগুলির সুন্দর বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি।[২৩]

অঘোরকামিনীর ঘরের একপাশে লাল শালু দিয়ে একটি ছোট দেবালয় গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে অবসর পেলে তিনি ব্রাহ্ম উপাসনা করতেন। উদারমনা মিস থোবার্ন সবসময় তার প্রতি নজর দিতেন। একদিন লাল রঙের আশ্চর্য এক টুকরো ঘর দেখে মিস থোবার্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ‘‘উহা কি? তুমি বললে Prayer room মেমসাহেব শুনে আশ্চর্য হলেন এবং সকল মেয়েদের বলে দিলেন ‘‘মিসে রায় যখন Prayer করবেন, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করেন। অনেক উৎসাহ ও ধৈর্য্য নিয়ে অঘোরকামিনী সেখানে হিন্দী ও ইংরাজী শিখতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজী বই পড়ে ফেললেন। মিস থোবার্ন পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধূলোর নিদানও দিয়েছিলেন। অঘোরকামিনী বুঝেছিলেন শুধু পড়াশোনা নয় শরীর ভাল রাখার জন্য খেলাধূলোরও প্রয়োজন। তিনি কোনরকম সংকোচ না করে মাথায় রুমাল বেঁধে অল্প বয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলোর আনন্দ উপভোগ করলেন।[২৪] এখনে খুব তাড়াতাড়ি যেন সময় কেটে যাচ্ছিল।

এভাবেই অঘোরকামিনীর লক্ষ্ণৌ-এর শিক্ষা জীবনের শেষ হতে লাগল এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা স্থির হল। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাঁকিপুরে ফিরে এসে একটি উপাসনাগৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, বোর্ডিং ও পীড়িতদের জন্য আশ্রম স্থাপন করা হবে। প্রথমেই একটি স্কুল খুলতে হবে। যা করতে আপাততঃ মাসে প্রায় ১০০ টাকা ও কয়েকটি ঘর লাগবে। ১৮৯১ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ থেকে স্বামীর কাছে ফিরে আসেন। দেশের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্যই তাঁর এতখানি তপস্যা। অচিরেই সে সংকল্প তিনি পূরণ করলেন।[২৫] কয়েকজন শুভন্যুধায়ী ব্যক্তি ও তার স্বামী প্রকাশচন্দ্র তাঁকে সর্বতভাবে একাজে সাহায্য করলেন।

বাঁকিপুরের বিখ্যাত উকিল গুরুপ্রসাদ সেন অঘোরকামিনী দেবীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বাঁকিপুরের পুরতান বালিকা বিদ্যালয়টির ভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। প্রথমে দশজন মেয়েকে নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়। পরে ২০ জন ছাত্রী হয়। তাঁদের চেষ্টায় আরো ১৫ জন হিন্দুস্থানী বালিকা এসে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ধীরে ধীরে অঘোরকামিনী মেয়েদের থাকবার জন্য একটি বোর্ডিং খোলেন। বিদ্যালয়টি ক্রমে এন্ট্রাস স্কুলে পরিণত হয়। ছাত্রীদের কাছ থেকে মাত্র ৭ টাকা ফি নেওয়া হত। যা দিয়ে সব খরচ মিটত না। প্রকাশচন্দ্র বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য অনেক আর্থিক সাহায্য দিতেন। এছাড়া নয়াটোলার বাড়ীর একটি অংশ বোর্ডিং এর জন্য ছেড়ে দেন।[২৬] স্কুল পরিচালনায় অঘোরকামিনীর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ এবং তা সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর দুই কন্যাও স্কুল ও বোর্ডিং পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করত। ১৮৯৩ খ্রি. ২রা এপ্রিল তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা "The Indian spectator' লিখেছিল— "By far the

most notable institution, however, at Bankipur, is an unpretentious Boarding house, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mr. Prokash Chandra Rai is the wife of a gentlemen who holds a respectable Govt. appointment and who is in well to do circumstances.....[২৭] আজও বিদ্যালয়টি বিদ্যমান। তবে বিহার সরকার সেটি অধিগ্রহণ করেছে।

একজন গ্রাম্য সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা রমণী সুযোগ অধ্যাবসায় ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা কীভাবে অসাধারণ, অনন্যা নারী হয়ে উঠতে পারেন— তারই উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন অঘোরকামিনী দেবী। মেয়েদের রান্নাবান্না শেখার চেয়ে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে অঘোরকামিনী বিশেষ জোর দিতেন। তিনি স্বামীকে বলেছিলেন— "৭/৮ বছর মাত্র মেয়েরা পড়তে পায়। তা যদি রান্নাবান্না শিখতে সময় কেটে যায়, তবে কিছুই শিক্ষা হবে না। আমি ১৫ দিনের মধ্যে রান্না শিখিয়ে দেব।" মেয়েরা যে সহজে স্কুলে আসত তা নয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদের সাথে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে এক একটি মেয়ে জোগাড় করতে হত তাঁকে। বাঁকিপুরের এই বিদ্যালয়টি ক্রমে বিহার প্রদেশের নারী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত হয়েছিল। তাই ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।[২৮]

মিস থোবার্নের উদার মানসিকতা অঘোরকামিনীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর কাছ থেকেই তিনি বুঝতে শিখলেন মেয়েদের বাইরে যেতে হলে কীধরনের পোশাক পরিধানের প্রয়োজন। শাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে যাওয়ার অসুবিধা বুঝলেন— আঁচল বারবার মাথা থেকে পড়ে যায়। মিস থোবার্নের দেখাদেখি গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা এক প্রকার গাত্রাবরণ তৈরী করলেন। তা কখনও শাড়ির উপরে, কখনও ভেতরে পড়তেন। এই সময় থেকেই জুতো-মোজা পড়ার অভ্যাস করলেন। প্রকাশচন্দ্র স্ত্রীর পোশাকের পরিবর্তন দেখে লিখেছিলেন— "বঙ্গ নারীর জড়সড় ভাব এই সময় হইতে তাহা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল।[২৯]

অঘোরকামিনী দেবীর জীবনের কিছু কিছু ছোট ঘটনার মধ্যেও তার মহান আদর্শ ও সাহসী চরিত্রের রূপটি ফুটে ওঠে। একবার শীতকালে বাংলাদেশের একটি সার্কাসের দল বাঁকিপুরে তাঁবু খাঁটিয়েছিল। ভয়ঙ্কর শীতে এই দলের একটি যুবকের নিউমোনিয়া রোগ দেখা দিল। যুবকটি বিদেশে অসহায় অবস্থায় রোগে পড়ে অস্থির হয়ে উঠল। এই অসহায় যুবকটি কঠিন অবস্থার কথা অঘোরকামিনীর কানে পৌঁছাল। আর কি তিনি স্থির থাকতে পারেন। যুবকটি কোথাকার কে? কি রকম চরিত্র? সে সকল বিষয়ে চিন্তা না করে যুবকটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। চিকিৎসা ও সেবা দ্বারা তাঁকে সুস্থ করে

তুললেন। যুবকটি পুরোপুরি সুস্থ হলে তাঁকে পাথেয় খরচ দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।[৩০] এর মধ্য দিয়ে তাঁর সেবামূলক আদর্শ ফুটে ওঠে।

অঘোরকামিনী বাঁকিপুরের কোন অসহায় লোকের বাড়ীতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের পীড়ার সংবাদ পেলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি এমন কোমল স্নেহপূর্ণ হয়ে রুগ্ন রমণীদের সেবা করতেন যে তারা তাদের অন্তরের ভাবাবেগে আকুল হয়ে তাঁকে মাতৃরূপে সম্বোধন করত।[৩১] দেবী অঘোরকামিনীর সেবা করা ও সাধনা সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র মহাশয় তাঁর 'স্ত্রী চরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন— "অঘোরকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে একাধিক অনুরাগিনী ও উৎসাহী হয়ে উঠিলেন যে অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল।" একদিন খবর পেলেন বাঁকিপুরে কোন উচ্চ কর্মচারীর পত্নী প্রসব যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে পড়ে আছেন এবং তার রুগ্ন শিশুকে দেখবার কোন লোক নেই। শুনামাত্রই তিনি সেখানে ছুটে গেলেন। যদিও এই পরিবার তাঁর অপরিচিত ছিল। তথাপি সারাদিন তাদের সেবা করলেন। তিনি আর একদিন শুনলেন একটি অতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক প্রসবান্তে অতিশয় রুগ্ন হয়ে পড়েছে। দ্রুতগতিতে সেখানে গিয়ে দেখেন— ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শয্যা নেই, বস্ত্র নেই। ঔষধ পথ্য কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পরিচিত একজন ডাক্তারকে সেখানে ডেকে পাঠান। নিজের বাড়ী থেকে শয্যাদ্রব্য ও বস্ত্র আনতে পাঠালেন। আর নিজ হাতে ঝাঁটা নিয়ে সেই ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। ডেপুটি ম্যজিস্ট্রেটের স্ত্রী হয়েও অঘোরকামিনী এইভাবে মানুষের বিপদে আপদে ছুটে আসতেন।[৩২] লোকহিতার্থ কর্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকার মধ্যে তিনি অপূর্ব আনন্দ পেতেন।

এই মহীয়সী মহিলা তাঁর স্বামী প্রকাশচন্দ্রের মত নির্ভীক ছিলেন। অতি সাংঘাতিক বিপদ দেখেও তিনি কখনও হতবুদ্ধি হতেন না কিংবা ভয় পেতেন না। জীবনে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। একটি ঘটনার কথা প্রকাশচন্দ্র বলেছিলেন— নয়াটোলার বাড়ীতে থাকতে একবার তোমার পাশের খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঈশ্বরস্তুতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র তোমাকে খবর দেবা মাত্র তুমি উপরের ঘরে আসলে। একখানা বড় শতরঞ্চি ছিল, সেটিকে স্নানের ঘরের জলে ভিজাইয়া জানালা দিয়া সেই জ্বলন্ত চালে ছুঁড়িয়া দিলে। তারপর বালতি দিয়া জল দিতে দিতে আগুন নেভানো হইল। এই ভাবে বড় বিপদ ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইল। তোমার সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখিইয়া সবাই চমৎকৃত হইয়াছিল।[৩৩]

অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্র একসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে ছিল সিমলা, আগ্রা, দার্জিলিং, মুসৌরি, রাজগৃহ, গয়া ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধ তীর্থস্থান

দর্শনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল। একবার রাজগৃহ থেকে ফিরবার সময় রাত হয়ে যাওয়ায় কোন যানবাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে অবশ্য দুটি ঘোড়া পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁদের ঘোড়ায় চড়া ও তা চালনা করার অভ্যাস ছিলনা। অঘোরকামিনী কিন্তু সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছিলেন। নিজে ঘোড়ায় চড়ে এমন ভাবে পথ চলতে লাগলেন যেন কেউ বুঝতেই পারল না, এটি তার প্রথম বার ঘোড়ায় চড়া। তাঁর সাহস দেখে সবাই অবাক হয়েছিল। আরেক বার সিমলায় পাহাড় চড়বার সময় ঘোড়ার গাড়ী অসুবিধায় পড়েছিল। কোন মতেই ঘোড়াকে বশে আনা যাচ্ছিল না। এখানেও অঘোরকামিনী শান্তভাবে ঘোড়ার রাশ টেনে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন। দার্জিলিঙের কার্সিয়াং পর্বতে গিয়ে একবার তাঁদের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয় এবং সঙ্গ লাভের সুযোগ হয়। মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব ও উপাসনা দেখে অঘোরকামিনী মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীকে সর্বদা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।[৩৪]

অঘোরকামিনী শপথ করেছিলেন স্বামীর বেতনের অর্থ প্রথমে দেবতাকে উৎসর্গ না করে তা ব্যবহার করবেন না। যে দিন থেকে ত্যাগের মন্ত্র গ্রহন করেছিলেন সেদিন থেকে ভাল বস্ত্র, অলংকার কিছুই ব্যবহার করতেন না। উপরন্তু কারও অভাব জানতে পারলে পরিবারের সব কিছুই অকাতরে দান করে দিতেন। একবার এক ব্যবসায়ী পাড়ার বেনারসী শাড়ি বিক্রি করতে এসেছিলেন। প্রকাশচন্দ্রের ভায়ের মেয়ে বসন্ত বলল কাকিমা একখানি শাড়ি কেন না? নিজে না পড় সরোজিনীকে একখানি কিনে দাও? তুমি সমস্ত বস্ত্রগুলি দেখলে কিন্তু সবগুলিই আবার ফিরিয়ে দিলে। বসন্ত জেদ করতে লাগলে তিনি বললেন একখানা কিনলে তো হবে না, আমার দশটি মেয়ে, কিনলে দশখানা শাড়ি কিনতে হবে। সত্যি সত্যিই পরিবারের সমস্ত মেয়েদেরই তিনি আপন মেয়ের মত দেখতেন।[৩৫] কখনই অন্যদের অবহেলা করে নিজের সন্তানদের ভাল বস্ত্র বা উন্নতমানের খাবার দিতেন না। তাই আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শি সকলের কাছে অঘোরকামিনী আদরণীয় ছিলেন।

কোন সামাজিক কুসংস্কার তিনি মানতেন না। একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা হয়েও কোনটা ধর্ম আর কোনটি কুসংস্কার তার তফাৎ ভালভাবে জানতেন। জীবনের অনেক ঘটনাতেই তার প্রমাণ মেলে। তিনি নিজেই লিখেছেন বহুদিন হল শাঁখা-সিঁদুর ছেড়ে বিধবা সেজে থাকি। সধবা থাকাকালীনই মাঝে মধ্যে তিনি বিধবাদের মত সাদা থান পরতেন। বলতেন, বস্ত্রে কি সধবা বিধবা হয়। প্রকাশচন্দ্রের লেখায় ফুটে উঠেছিল সংস্কার মুক্ত অঘোরকামিনীর কথা— ‘‘প্রথম প্রথম শাঁখা পরিধান করিতে, শেষে চুড়ি পরিতে, কিন্তু জীবনের শেষ কয়েক বছর শূন্য হস্তেই থাকিতে। হাতে নোয়া না থাকিলে

স্বামীর অকল্যাণ হয়, এ কুসংস্কার তোমার ছিল না।" পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এইভাবেই হয়ত অঘোরকামিনী দেবী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[৩৬]

কঠোর বৈরাগ্য ও অতিরিক্ত পরিশ্রম অঘোরকামিনী দেবীর শরীর আর সহ্য করতে পারছিল না। ১৮৯৫ খ্রি. থেকেই তাঁর শরীর ক্রমশঃ ভাঙতে শুরু করে। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্কুলের কাজ ও বাড়ীর সকল কাজ করতে থাকেন। এর মধ্যেও জীবনের মূলমন্ত্র ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ব্রহ্ম উপাসনা করতে কখনই ভোলেন নি। তিনি তাঁর স্বামীকে একদিন বললেন— ভাঙা শরীর আর বসাইয়া রাখিয়া কি হইবে? এই সময় থেকে তিনি নিজের দৈহিক সকল যন্ত্রণাকে 'মায়ের হাতের বেদনার দান' বলে গ্রহণ করতে শুরু করেন। জীবন-মৃত্যু সবকেই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিলেন। বললেন এখানে আমার কাজ শেষ। ১৮৯৫ সালের ৩০শে মে তিনি লেখেন— আমার মনে বড়ই ঝড় চলিতেছে ; কিছুই পরিষ্কার হইতেছে না। আমি কি কাহারও ধর্মের বাঁধা হইতেছি? কেন আমার মন এত ব্যাকুল? চিন্তা এত প্রবল যে শরীর সুস্থ হইতে পারিতেছে না।[৩৭] ক্রমে তার পেটে একটা যন্ত্রণা হতে শুরু করল। আসলে দীর্ঘ চার বছরের গুরুতর শ্রম ও মানসিক সংগ্রামে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পরে। ক্রমে তিনি মানুষের চির কাঙ্ক্ষিত 'মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকা' (Vally of the Shadow of Death) এ যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

এরপর তিনি পুরোপুরি বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ১৮৯৬ সালের ৫ই জুন ডাক্তার সূর্য বাবু বহু পরীক্ষার পর রোগ নির্ণয় করে বলেন 'রিউম্যার্টিজম অব দি হার্ট।' কিন্তু নিজ চিকিৎসার ভার পরেশের (সম্পর্কে তাঁর দাদা) হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন- 'যদি বাঁচিতে হয় দাদার হাতে বাঁচিব, যদি মরিতে হয় দাদার হাতে মরিব।' কোন হাসপাতালে ভর্তি বা বড় কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে চান নি। শেষপর্যন্ত সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে ১৮৯৬ খ্রি. ১৫ই জুন দুপুরে মাত্র ৪০ বছর বয়সে এই মহা তপস্বিনী পরলোক গমন করেন। এই সময়কার বর্ণনা প্রকাশচন্দ্র দিয়েছিলেন— "উত্তর-পশ্চিমের কুঠুরীতে তোমার দেহ রাখা হল। চতুর্দিকে আমরা বসিয়া উপাসনা করিলাম। সকল সন্তানরা ও আত্মীয়-স্বজনরা প্রার্থনা করিল। প্রতিবেশীরা তোমার দেহ ঘিরিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল"।[৩৮] প্রিয়তমা পত্নী অঘোরকামিনীর মৃত্যুতে প্রকাশচন্দ্র একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু সন্তানদের মুখ চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।[৩৯]

মৃত্যু নশ্বর শরীরকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আত্ম সত্যময়, অবিনাশী। দেবী অঘোরকামিনীর অশরীরী আত্মা আজও মুক্তি ও শান্তির মাঝে সমগ্র নারী জাতিকে দিব্য সঙ্কেত প্রদর্শন করে চলেছে। এইরূপ অসাধারণ নারীচরিত্র বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই।

বৈধব্যব্রত পালনের মধ্যে, হৃদয়ের ঔদার্যগুণে, কৌমার্য ব্রত ধারিণীর জীবনে কোন সৎকার্যে অতিবাহিত করা এবং দেশকালে একজন গৃহিনীর পক্ষে পর হিতার্থে আত্মদান করা- এযেন এক বিশাল যজ্ঞস্বরূপ। পৃথিবীর খুব কম মহিলার পক্ষে এটি সম্ভব। ধন্য সেই স্বামী যিনি বাল্যবিবাহের কলঙ্ক নিজের জীবন তপস্যায় মুছে নিঃশেষ করতে পেরেছেন। ধন্য সেই পত্নী যিনি পশুবৃত্তিপরায়ণ এই পতিত জাতির চোখে আধ্যাত্ম পরিণয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দাম্পত্য জীবনের এক নব আদর্শ স্থাপন করেছেন।[৪০] যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের চিন্তা-মনন-চেষ্টা এক হয়ে পড়ে সেখানে তাদের কণ্ঠস্বরও এক হয়ে যায়। তাই অঘোরকামিনী দেবীর এই স্বল্প জীবন কাহিনী প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁর 'অঘোর প্রকাশ' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের ঘনিষ্ঠ অমৃতলাল বসু 'ভারত মহিলা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় অঘোরকামিনীদেবী ও তার স্বামী প্রকাশচন্দ্রের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেছেন।

অঘোরকামিনী দেবী রত্নগর্ভা ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি তার কৃতি সন্তানদের এই ধরাধামে রেখে গিয়েছিলেন, যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁরা পিতা- মাতার ত্যাগ, সেবা, কর্মনিষ্ঠা ও মহান আদর্শের শিক্ষা পেয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধচন্দ্র রায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। মধ্যমপুত্র সাধনচন্দ্র রায় মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন-এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেছেন। আর অঘোরকামিনীর কনিষ্ঠ সন্তান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সফল চিকিৎসক হিসাবে মানুষের সেবা করেছেন। পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র রায় সফল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাংলার নবরূপকার হয়েছিলেন।[৪১] মা অঘোরকামিনী দেবীর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে পুত্র বিধানচন্দ্র মানব সেবার মহান ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। শুধু সন্তানদের গর্বিত মা হিসাবে নন, আপন প্রতিভা ও কীর্তিতে অঘোরকামিনী দেবী আজও সকলের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, বিধানচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ০১।

২. অশোককুমার কুন্ডু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৭-৯।

৩. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ২৭-২৮।

৪. ভারত মহিলা পত্রিকা, ১ম ভাগ, আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬-৪৭।
৫. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।
৬. সুদেব রায়চৌধুরী, বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সম্পর্ক পাবলিশার্স, কালিন্দী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫-৯।
৭. প্রবর্তক পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৪, পৃ. ৪৭৩-৪৭৭।
৮. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাক্তার বিধান রায়ের জীবনচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
৯. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
১০. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।
১১. ভারত মহিলা, ১৩১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১২. প্রবর্তক, ১৩৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।
১৩. শ্রী মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ-২৩, রথযাত্রা, ১৩৬০, পৃ. ১৩-১৮।
১৪. মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।
১৫. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।
১৬. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।
১৭. প্রবর্তক, ১৩৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪-৩৭৬।
১৮. প্রবাসী পত্রিকা, ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩১৯, পৃ. ১৭০-১৭১।
১৯. ভারত মহিলা, ১৩১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।
২০. প্রবাসী, ১৩১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
২১. প্রবাসী, ১৩১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩।
২২. প্রকাশচন্দ্র, অঘোর প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
২৩. ভারত মহিলা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৬, পৃ. ৮০-৮৩।
২৪. ভারত মহিলা, ১৩১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১১।
২৫. প্রবর্তক, ১৩৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭।
২৬. প্রবাসী, ১৩১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩।
২৭. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

২৮. গাগী চক্রবর্তী, মহীয়সী অঘোরকামিনী দেবী, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ৭ই জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪।

২৯. গার্গী চক্রবর্তী, অঘোরকামিনী দেবী : সমাজ সেবায় উজ্জ্বল, গোবরডাঙা পত্রিকা, (নবপর্যায়), সম্পাদক: দীপক কুমার দাঁ, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৮-১০।

৩০. প্রবাসী, ১৩১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

৩১. মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩২. প্রবাসী, ১৩১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

৩৩. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাঃ বিধান রায়ের জীবনচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

৩৪. মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

৩৫. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

৩৬. রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪।

৩৭. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

৩৮. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৩৯. মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬।

৪০. প্রবর্তক, ১৩৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫-৪৭৭।

৪১. সুদেব রায়চৌধুরী, বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

A study on Indian Culture in South East Asia under the Shailendra Dynasty

Ganesh Das
Independent Researcher
Department of Ancient Indian History,
Culture & Archaeology
Visva Bharati University, Santiniketan

Abstract:- *Hidden in the heart of the teaching Indian history is the unity, this sense of Unity among the divisions is emanating from the Indian mentality culture. How Indian culture spreaded over to South East Asia is a historical and systematic challenge today. We are not familiar with reasons about the development of Ancient India Civilization spread through Indian culture to different parts of the World, especially in different parts of Southeast Asia. Nevertheless, the fact that the imprint of Indian Culture spread to different parts of South East Asia is quite demanding and needs to be interpreted in different ways .The Shailendra dynasty is the subject of discussion to highlight the relevance of how Indian culture speed in South East Asia. In this context the geographical description of the Shailendra dynasty explained, why the culture of different regions of Southeast Asia was amalgamating with different states of India, and how Indian religion and art was imprinted in South East Asia under the Shailendra dynasty. In this paper the discussion has been made by the author on the development of Ancient Indian civilization & culture to south East Asia.*

Keywords: *Indian culture, South East Asia, Shailendra dynasty, Buddhism, Borobudur*

Introduction:- In the context of India's geographical location, the Vishnu purana states that the country is South of the sea and North of the Himalayas that country is India[1]. Numerous ports can be seen from the mouth of the Ganges on the East coast of India to Kanyakumari in the South with these costal ports , Malay Peninsular, Sumatra, Java, known as the Golden Land at South East Asia developed a deep connection between the island of Borneo and Anam and

Cambodia as well as the South Eastern states of India, which formed cultural structures From prehistoric time . A bridge was built between India and South East Asia, which is seen as a form of cultural relation[2]. The cultural expansion of India found a favorable natural environment in South East Asia .Through this favorable natural environment, mentioned in the Sailendra dynasty in Indonesia (Ancient java, sumatra ,Borneo) Indian culture especially influenced the people of the Shailendra dynasty in South East Asia especially the oldest Buddhism, Hinduism, Art, Architecture, Sculpture, etc., spread over as Indian culture in South East Asia under the shailendra dynasty. In this paper the author discusses how Indian culture spread in South East under the Shailendra dynasty.

Map of South East Asia

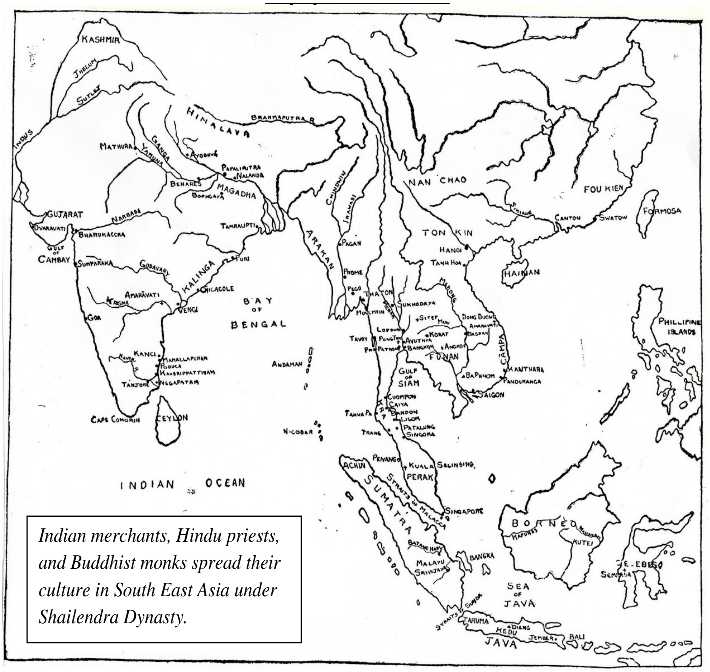

Indian merchants, Hindu priests, and Buddhist monks spread their culture in South East Asia under Shailendra Dynasty.

COURTESY: HISTORY OF SRI VIJAYA K. A. NILAKANTA SASTRI

Geographical location in South East Asia under Shailendra dynasty:- South East Asia is a vast region of Asia consisting of eleven countries in Asia. It is located almost geographically south of eastern China in the Indian sub-continent and Northwest of Australia. The region is bounded on the West of the Bay of Bengal in the center of the South India Ocean by the South China Sea and on the east by the Philippine sea and the Pacific Ocean .The South East Asian region consists of two separate geographical regions the northern part being known as the mainland South East Asia or Indochina and The Other as the maritime South East Asia or Malay island. There is a large Island called Indonesia .The Sailendra dynasty established a huge empire on the island of Sumatra, Java, Bali and Borneo[3] etc.

Source of History :- In order to know the history of the Shailendras we have to rely on various types of information , in this context it can be said from the inscription that was basically composed in Sanskrit, old Javanes, old Malay old Balinese etc were written in those languages. The Sailendra dynasty is known from various Chinese, Muslims and Indian texts. The important inscription about the Shailendra dynasty provide information on the Sojometro inscription in this context which is believed to have originated in the 8th century A.D. where the Batang Regency is a region very important for the development of the cultural at the Java Islands. Sojometro inscription show that Hindu and Buddhism fast intered Java within the region of Batang. The inscription symbolizes the kingdom of Mataram in this inscription of Shiva religion, whose main subject is the Dapunta Shailendra family in the main character. In addition the kalasan inscription, kelurak inscription, karangtengah inscripation, ligor inscription and Nalanda inscripation etc., formed the cultural relationship between the Shailendra dynasty and the Indians in South East Asia[4].

History of Shailendra dynasty :- The words Shailendra is a Sanskrit mixed word Saila and Indra meaning king of the mountain is the name of an influential Indonesian dynasty that emerge in Java in in eighth century . All presumed that the rise of the Shailendras was said to have taken place in the Kedu plain in Central Java, places such as the Sumatra,Bali ,Borneo are identified as the source of the Rise of the Shailendra dynasty. The Shailendra dynasty was the ruling family of

medang Kingdom in Central Java and the Srivijaya Kingdom in Sumatra[5].The Shailendra rulers took the title of Maharaja, the sansakrit word for great king[6].Various historians have commented on the origion of the Shailendra. In this context, Ramesh Chandra Majumdar says that the Shailendra came directly to India and were connected with the Sailodhhava kings. But they refused that their was no threaty with Kalinga Raj.

Cultural History According to Indian's 'Act East policy,' South East Asia has close ties with India for political and economic development, as well as cultural issues. However, South east Asia did not embrace all of the foreign traditions . Much of its exterior came from India, which served as the indigenous culture of South East Asia. Form prehistoric times Indian culture has crossed the Bay of Bengal and entered different parts of South East Asia. Indian culture has works in the cultural catalyst of different parts of South East Asia. The region in Indian culture that particularly influenced South East Asia was the Shailendra dynasty an Indonesian dynasty based in Java .The modern South East Asian cultures provide evidence of a long association with India, and cultural issues that act as catalysts are as follows[7]-

(1) Palembang is an important city of the Srivijaya Empire which is the birthplace of Buddhism. A special form of Buddhism in this Srivijaya Empire is Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism originated in India but during this period the Srivijaya empire become popular because in the seventh century trade relation between India and Srivijaya Empires influenced each other's religions. The Srivijaya rulers incorporated Buddhist philosophy into their public thought system. Where the Srivijaya raja srijaynas identified as a Boddhisattva. However, Srivijaya of Buddhist culture reached the golden age under this Shailendra dynasty of the Empire. In south East Asia a cultural harmony was formed between the Sumatra/Srivijaya empire Indian Pala dynasty. Srivijaya was the most important Hindu Kingdom in Sumatra which become the centre of cultural later known as Shailendra empire, where Devapala the king of the Pala dynasty is associated with an Alliance between Shailendra dynasty and South Sumatra in South East Asia. The Shailendra Raja Balaputra Deva was a devotee of Buddhism. The Balaputra Sent envoys to the royal Court of Devapala to build a

Buddhist monastery at Nalanda, to build this Buddhist monastery the Shailendra Kings had to contribute a lot of money to the Pala treasury .The scholars at Nalanda University in south East Asia were more influenced by the Pala dynasty. The influence of Mahayana Buddhism present in Bihar and Bengal under the Palas was so predominant in the Shailendra court that the Bengali scholar Kumar Ghosh was the guru of the Shailendra dynasty. However during the region of Devapala, cultural Alliances were formed between India and South East Asia[8].

(2) The Shailendras maintained friendly relation with the Chola kings of South India. The Chola King Raja Raja Chola ellowed Maravijayatungabaman to build a Buddhist monastery at Nagapattinam the name of which was Chulamanivarmadeva vihars. The Chola king Rajraja granted the revenues of a large village for its upkeep .His son Rajendra Chola conquered the kingdom of Shailendra for some time. Thus a cultural Alliance was formed between the Shailendra dynasty and the Chola Kingdom[8].

(3) India had a cordial relationship with Java, Indonesia in the first century A.D. The first Indian sattelment in Java was found on 56 A.D. The Fa-Hien, a Chinese Traveller navigation to Java in the 5th century A.D and Brahmanism was predominant in Java at that time. The Pallavas colonized Sumatra which later came to be known as the Srivijaya Empire. The kingdom of Mataram was established as a Hindu Kingdom in Java in the early 4th century A.D which was the heart of Hindu culture. The Hindu Kingdom was conquered by shailendra of Sumatra. The Java regained its independence after the 9th century. Java was the most important center of Buddhsim, especially Mahayana Buddhism was patronized by Shailendra kings. Even Dharmapala of Nalanda and Dipankar Srigyan of Vikramshila came here for higher studies. The another important historical monument in Java is the stupa of Borobudur, which is a sign of the artistic love of Shailendra kings [9].

(4) The fame of Hinduism and Buddhism spread from the mainland of south East Asia to Sumatara, java, Bali and now to Indonesia some time before the 5th century A.D. The greatest concentration of Java's own sacred architecture is located in the Kedu plains, 42 kilometers North -Waste of the present city of Yogyakarta and some 86 km (53 miles) West of the city Surakarta in Central Java .The Borobudur

temple was built around 800 A.D by the rules of the Shailendra dynasty, located on the Island of Java, Indonesia as a monument to the Buddha. The Borobudur Stupa is a 200 square meters monuments representing of Buddhism. The largest Buddhist monuments in the world, with artistic and sculpture carvings on stone. These ancient monuments are engraved a long side the statues of Buddha with 504 status of Buddha and 3000 relief sculpture. The path of how the Sailendra kings intended to present their issues should follow the footsteps of the Buddha, as illustrated by the teaching of the Buddha, the biography of the Buddha and the story of his birth[10]. The Sanskrit word for Borobudur comes from 'Vihara Buddha Uhr' which means Buddhist monastery in the hills. The Borobudur is a step pyramid that is three-dimensional model of Mahayana Buddhism, and is similar in size. The Borobudur to both the tomb of Lord Buddha and Buddhist pilgrims' site. Borobudur design is Javanes style and Gupta dynasty architecture of the ancient Javanese tribe and influences the blend of Indian aesthetics[11].The stupa of Borobudur is the highest symbol of Buddhism and similarly the replica of the universe which fuels Indian culture .

Conclusion:- It is fact that Indian culture spreaded over different parts of South East Asia in Ancient times. Admittedly the people of South East Asia reached the pinnacle of higher civilization by mingling with Indian civilization and culture. The Ancient Indian culture was deeply scarred under the Sailendra dynasty of South East Asia. But as a Hindu dominance of Indian came to an end. The importance of Hindu and Buddhist influenced cultures in various parts of South East Asia diminished. Although South East Asian countries currently consisting of Muslim population but the imprint of Indian culture is evident in their cultures. Despite the ups and downs of history, real images of Indian culture have come to life under the Sailendra dynasty of South East Asia.

Reference:-

1. Gangapadhyay, D.K. (2000). Bharat – Itihaser Sandhane: Adiparba, Kolkata, pp.505-508.
2. Maiti, P. (1985). Bharat Itihas Parikrama, Kolkata, p.409.

3. South East Asia – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
4. Shailendra Dynasty – en.wikipedia.org/wiki/shailendra.
5. Ibid.
6. Tarling, N. (1992). The Cambridge History of South East Asia, Vol. I, Cambridge, p. 206.
7. Indian culture and civilization influence on South East Asia. www.orfonline.org/expert - speak/Indians-culture.
8. Hall, D.G.E. (1955). A History of South East Asia, New York, pp.37-52.
9. Sharma, R. (1977). A History Text Book for Class-XI, New Delhi, pp.165-166.
10. Cotterell, A. (2014). A History of South East Asia, Singapore, p.117.
11. Mataram and Shailendra Kingdom and Borobudur - http://factsanddetails.com/indonesia/ History_and_Religion/sub6_1a/entry-3941.html

Conditions and Requirements of Marrital Relationship in The Society of Kathasaritsagara

Suhrid Chakraborty
Ph.D Scholar, The University of Burdwan

Abstract: *There are many conditions for the marital relationship in the society of Somadevabhatta's Kathāsaritsāgara. The mandatory basis of those conditions ware based on Indian Dharmaśastras, depending on either society or political causes. The feel of incompleteness without a spouse is very much rooted in the Kathāsaritsāgara. Important factors of selection were-birth, educations, truthfulness, good characters good looks etc. The women of that society sometimes put their conditions to make their marital relationship. It is remarkable that marriage proposal came from the side of the groom. Some marital relations were made by the matchmakers. Some example of Kanyā svyaṃvara the selection of a groom by the bride herself was seen in that society. Several instances of 'anuloma' the intercaste marriage are found in the social life of Kathāsaritsāgara.*

Keywords : *Selection, Condition, Betrothal, Matchmakers, Proposal, Svyamvara, Political view, Anuloma, Pratiloma*

Introduction

Marriage is ''the most important of all saṁskāras''.[1.] In the social document of kathāsaritsāgara we find great importance attached to marriage both for men and women. The sense of incompleteness without a life partner is noted in the Kathāsaritsāgara. King Udayana, Puskaraksha,Srutasena all were very anxious to get a suitable wife. King Udayana was unhappy for not getting a wife equal to him in birth and personality.[2.] King Śrutasena, a king of Deccan is worried because he has not obtained a suitable match. The writers of the dharmaśāstras mentioned that one should marry a woman who is suitable for him.

In the case of women, finding a suitable match for a daughter is the cause of great concern for the parents. Sometimes, match making was the more important things than marriage. King Hemaprabha speaks about

his daughter ratnaprabhā that the latter though modest, learned, young and beautiful affiicts him because has not obtained a husband.[3.] King candamahāsena was in great anxiety for marriage of his daughter Vāsavadattā.[4.] Not only in civilized society, even a rāksasi mother Viddychchhikhā also anxious for the marriage of her daughter when she grown upto fresh womanhood and gets married to an eligible man.[5.] King Paropakārin remarks about his daughter Kanakarekhā – A grow up daughter can't be kept in one's house, accordingly Kanakarekhā troubles my heart with anxiety about a suitable marriage for her. For a maiden of good family who does not obtain a proper position is like a song out of tune; when heard of by the ears of one unconnected with her causes distress. But a daughter who through folly made over to one not suitable is like learning imparted to one not fit to receive it, and can't tend to glory or merit, but only regret.[6.]

According to manu – a girl ought to be dependent on relations and not be independent,[7.] is repeated by king Paropakārin who also points out that it is not expedient that when a girl grows up she should remain unmarried, because envious people are fond of spreading scandals.[8.]

Selection in Marriage

There are different types of selecting factors were taken into account before choosing a suitable partner.

In the society of Kathāsaritsāgara important selecting factors were-Birth,education,truthfulness,good character,good looks etc. Asokadata the Brahmana was selected by the king of Varanasi for marriage with his daughter,the princess Madanalekhā. The king says that these are the qualities which are to be looked for in a bridegroom and not those that vanish in a moment.[9.] Rupaśikhā being interested to marry prince Śṛngabhuja tells her father the latter is matchless in looks, birth, character and suitable in age.[10.]

We find in the society of Kathāsaritsāgara interestingly that importance was attached to the good looks of a man in marriage selection. King Suradeva of Ujjayini brought the portraits of many young kings to select a handsome groom for his daughter.[11.] Princess Klingasenā left home to marry the handsome king Udayana as she had

listened a lot about his healthy body and handsome looks. The ugly looks of a man could be a disqualification. For example Aśokamālā, daughter of a ksatriya, refused to marry a man for his ugly looks.[12.]

Conditions for marital Relationship

There are instances in which the girls sometimes gave their conditions to make marital relationship. King Vīradeva's daughter Anangarati of Ujjayini told her father that she was to be a given in marriage to a good looking young man who was a perfect master of one art.[13.] Princess Kanakarekhā lays a condition that she must be given only to brāhmana or ksatriya who has seen golden city.[14.] Princess Gandharvadattā resolves that she shall marry one who is so well skilled in music.[15.]

Betrothal for Marrital Relation

The word of the father once given could not be broken in the question of marriage. There are some cases of betrothal in the Kathāsaritsāgra when Angiras askaed Astāvakra for the hand of his daughter Sāvitri in marriage; but Astāvakra could not accept though Angiras was an excellent match, because his daughter was already betrothed.[16.] Prince Naravāhanadatta was betrothed to Madanamanchukā since childhood. According to Manu as quoted by Laksmidhara retraction of a promise made in betrothal, is ordinary improper.[17.]

Matchmakers

Sometimes a bard or a female ascetic who roamed different and distant parts of the land,acted as matchmakes between royal families. The bard Manorathasiddhi played such a role in the marriage of Hansāvali and Kamalākara.[18.] Kātyāyani the female ascetic played role in the marriage of Mandārabatī and Sundarasena.[19.]

Marrital Proposal from Groom

It is noticeable that marriage proposal came from the side of the groom. This is what we find in the cases of princess kalingasenā of Taksasilā.[20.] Princess Madanasundari of Vidarbha and also princess Mrgavati.[21.] Further we can find that princess a princess of Siṇhala was asked for in marriage by king Tamralipti.[22.]

Svayamvara Sabhā

Svayamvara Sabhā as we find in the Raghubaṇsam (canto-VI) by kalidasa,is not found reffered to in the Dharmaśāstras. It is not found in the Kathāsaritsāgara excepting in its description of the epic story of Nala and Damayantī. Once again we can find that king suradeva of Ujjayani wanted to arrange 'Svayaṃvara Sabhā' for his daughter. But out of modesty the princess refused to select her husband in the 'Svayaṃvara Sabhā'.[23.]

Kanyā Svayamvara (Selecting ones husband)

'Kanyā Svayaṃvara' means selecting of a groom by the girl herself when a grown up girl,whose father or guardian failed to find out suitable husband for her, selects her own husband, it is called 'Kanyā Svayaṃvara'.[24.]

We can find some example of this kind of selection made by a bride in the Kathāsaritsāgara. Kalingasenā the princess of Taksasilā reached Kauśāmbi to marry king Udyana, as she had heard about his handsome looks. Though the father of Kalingasenā had not neglected to arrange her marriage. It was actually arranged with king Prasenjit on the ground of his high lineage. But Kalingasenā being told about the young and handsome king Udayana, left home without the knowledge of her parents and went to kauśambi.[25.]Matṛdatta the daughter of rich merchant, proud of her beuty,offered herself in marriage to Śrutasena of the deccan, we are told, was to marry her according to religious ceremony.[26.]

Age for marriage

The characters that we come across in the stories of Kathāsaritsāgara seem to be young men and women at the time of their marriage. The question of marriage of a maiden arose only when she attained womanhood as we see in the cases of princess Vāsavadattā, Hamsavalī, Patalī, in the case of Madanamancukā and also cases of vaisya girls like Madanasenā and Ratnavatī. Brahmana girl UpaKosā, the hermit girl Indivaraprabhā and Madanasundari a girl of washerman family.[27.] Sometimes we find example of early marriage in Kathāsaritsāgara, a Brahmana of Patliputra married a gril of Vardhamana.[28.]

Marrital relation depending on political view

We find some instances of marriage depending on political base. King Udayana with princess padmavatī of Magadha was effected for counteracting the possible obstacles that were apprehended from the king of Magadha in the conquest of quarters that king Udayana was going to undertake. At the time of the marriage the king of Magadha took a solemn vow promising his neutrality in the coming caṃpains of Udayana.[29.] Also we can see king Naravāhanadattā increases his political power by forming matrimonial alliances with the daughters of foreign kings.

Marriage by Betrayal and capture

In the society of Kathāsantisāgara sometimes marital relationship were purely based by the means of Betrayal. Men and women both go to great Lengths and even resort to disguise to marry their loved ones, Kalingasenā married by a Vidyādhara, who disguises himself, as Udayana and they are married in gāndarva style.

King canarabāla of Hastināpura took Yaśolekhā head queen of the defeated king as an inmate of his haren on the ground that she was captiured according to the custom of the Kṣatriyas. She is descrided as a happy partner to the new king.

Caste (Anuloma-Pratiloma)

In the early medieval society cast was the most important factor in marriage. Bride and groom from the same cast was the perfect in marital relationship as per the Manusmirti.[30.] But 'anuloma', the inter cast marriage, was approved by the law-givers.[31.] 'Anuloma' means man of uper cast married a woman belonging to the next lower cast. Several instances of 'anuloma'marriages are found in the Kathāsaritsāgara. Thus the marriage of Asokadatta with princess Madanalekhā, of vidusaka with princess of Ujjayini and of Devadatta with princess Śri of Pratisthana are instances of Brahmanas marrying Ksatriya princess.[32.]

The instances of 'Pratiloma' marriages, denounced by the law givers, are however, few in the Kathāsaritsāgara. The vaiśya and sudra suitors of the ksatriya princess Anangaratī of Ujjayinī are rejected as the very idea, we are told, of a ksatriya girl marrying a vaiśya or a Sudrya is

absurd.[33.] But the fact that men of the lower castes could aspire to marry a girl of a higher caste and could appear as suitors shows that though not approved by law or society, it was not totally out of practice we find a case of Candala youth who though possessing all the qualities required in a groom, could not think of his marriage with princess kurangī[34.] The marriage of the some Candala youth with the princess was finally made possible by a divine intervention. The fire god declared that the said Candala was his son brought up in a Candala house.

So the strong disapproval of 'Pratiloma' marriages are to be found in all the smṛtis and the same reflections to be mirrored in the social attitude of the Kathāsaritsāgara.

References:

1. History of Dharmaśāstra(2/427) – Kane P.V.
2. K.S.S.-XI,6
3. K.S.S-XXV, 126
4. K.S.S-XI, 62-64
5. K.S.S-XXV-199
6. K.S.S-XXIV-25-26
7. Manusamhita– V , 148
8. K.S.S-xxiv-38,204
9. K.S.S-XXX -161-163
10. K.S.S-XXXIV,93-94
11. K.S.S-LXXXIII,14
12. K.S.S-LII-34-36
13. K.S.S-IXXXIII,18
14. K.S.S-XXIV-42-43
15. K.S.S-CVI, 12-13
16. K.S.S-CV-22-23
17. Krtyakalpataru,Grhasthakanda, Garhasthyam
18. K.S.S-LXXI-69-115
19. K.S.S-C1-59-88
20. K.S.S-XXXI-55-61

21. K.S.S-IV-85-88; IX-37-38
22. K.S.S- LXXXI, 32-33
23. K.S.S-LXXXIII-16-17
24. Manusamhita IX-90
25. K.S.S-XXX-22-26-,XXXI 37-56
26. K.S.S-XXXIII,71-72
27. 11 K.S.S-XII,BKM,11Guccha,11,50,51,KSS LXXI1771BKM IX Guccha-1,291 ; K.S.S-111,62-69,XXXIV231
28. K.S.S-CXXIV-104-106
29. K.S.S-XVI-84
30. Manusamhita, chap-III,12
31. Yāgnvalkyasmrti, Ācāra Adhāya 57
32. K.S.S-XXV-177,XVII,203,VII 82-101
33. K.S.S-LXXXIII-35-38
34. K.S.S-CXII96

Bibliography

1. Bandopadhaya Manabendu-Manusamhita-Sanskrit Pustak Bhandar-Kolkata-2016
2. Kane, P.V.-History of Dharmasastra,vols II-IV. Pune-1954.
3. Keith, A.B-History of Sanskrit literature Motilal Banarasi Dass,New Delhi,1973.
4. Krishnamacheriar, M-History of classical Sanskrit Literature,Tirupati,Devasthanam press,Madras,1937.
5. Shastri, Jagdishlaal- Kathāsaritsāgara Motilal Banarasi Das. Delhi-Mumbai-chennai-Kolkata-Bangalore-Varanasi-Pune-Patna-2008.
6. Speyer, J.S-Studies about the Kathāsaritsāgara Naba press-1913.

Dalit Votebank and a New face of Electoral politics in India: A Case Study of West Bengal

Avishek Biswas
Assistant Professor in English
Vidyasagar College (Affiliated to University of Calcutta)
Kolkata, India

The massive victory of B.J.P led N.D.A in the General Election of India held in May 2019 has out rightly rejected many previously held notions of Dalit vote-bank. The title of my proposed paper has surely gained more prominence in the last few months as the result of the Loksabha elction has been corroborative with the term 'new face'. Although my contention is to bring the entire fabric of Indian electorates, the hub of my proposition dwells on the mobilization of Dalit vote banks in West Bengal. Politics in West Bengal has been different from the rest of the country in terms of ideology as well as political propaganda. The left with its electoral mobilization around the issue of class managed to make a mark in West Bengal. Caste, on the other hand, was not seen as a major factor and pertaining to this, it was subtly avoided.

Its historical impetus lies in a post-partition scenario of West Bengal where the refugee crisis was at its culmination and the major contesting parties like the Congress and the Left were both claiming to stand by the refugees. However, further complexities awaited as the Left front government came to acquire the political power in West Bengal in the year 1977. A party, which came with lot of promises in terms of poor people's upliftment, rehabilitation and establishment, was later accused of their caste oriented treatment of refugee crisis. One can hardly forget Left regime's unleashing atrocities on hundreds of Namasudras in Marichjhapi on 31st January, 1979. This Marichjhapi massacre has been debated over in myriad ways. But, one can hardly deny the fact that a considerable number of Dalit refugees was brutally tortured and killed, women molested and raped. The recent work of Deep Halder named *Blood Island* depicts such stories of acute trauma with the help of oral

narratives. Many scholarly works in the post 2000 scenario have also firmly established the fact that left leaders like Ram Chatterjee and Jyoti Basu met the refugees in Dandakaryanya before 1977 to assure a smooth rehabilitation in West Bengal once they come to power. There are suggestions of an ulterior truth that it was the left leaders who initially talked about a place like Marichjhapi. This historical foregrounding is crucial to understand how the Dalit electoral politics has been ignored, shaped and reshaped in different stages of political contestations in West Bengal.

The political foundation of the C.P.I.M led Left front government was the concept of class and not caste. In his reply to a letter sent by the Mondal commission, C.P.I.M leader and the then Chief Minister of West Bengal Jyoti Basu said that there are only two types of people in his state- the rich and the poor. This also points towards a political hegemony of upper caste people who prefer to remain indifferent towards the age old marginalization of people in terms of caste. However, this subdued voice of caste began to show its voice of dissent in an organized manner mainly by the political presence of an otherwise religious community known as Matua Mahasangha, which is predominantly a sangha of the Namasudra people. As the official records suggest, there are two crore Matuas in India, but as per the estimate of the MM, there are nearly five crore Matuas. Many of them are outside the electoral rolls. This is due to the fact that those who migrated to India from Bangladesh after 25 March 1971 have been denied citizenship in accordance with the Citizenship (Amendment) Act, 2003. In this connection, one should keep in mind the entire N.R.C turmoil in Assam, which primarily seemed like destabilizing the political face of B.J.P in Assam. However, this didn't happen. On the contrary, the implementation of N.R.C and all the succeeding hue and cry eventually ended with a landslide victory for B.J.P. Before probing into any theoretically enriched discussion of N.R.C and its socio-political impact, let me share a very personal anecdote: many of my 'Hindu' relatives, who were partition survivors from East Bengal settling in Assam as refugees, were somehow in agreement with the professed motif of N.R.C. One of my grandmothers Mrs. Minati Dutta, who lives near

Kalaphar in Guwahati and whose name was primarily not there in the list of N.R.C, astonished me by saying that this is a good policy for India. What she didn't explicitly mention at that point of time but I could make a sense of was they had got the essence that N.R.C can only be harmful for Bangladeshi Muslim infiltrators and not any Hindus. This might be quite relevant here to denote that with The Citizenship (Amendment) Bill, 2016, the government looks to change the previously held notions of illegal migrants. The Bill, introduced in the Lok Sabha on July 15, 2016, aims to revise the Citizenship Act, 1955 to provide citizenship to illegal migrants, from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who are of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian extraction.

What surely made people like Minati Dutta happy was that the Act doesn't have a provision for Muslim sects like Shias and Ahmediyas who also face persecution in Pakistan. This was largely due to their historical antipathy towards Muslim population drawn from the innumerable riots in post 1947 scenario in Dhaka, Khulna, Noakhali and some such places in the present Bangladesh. This picture was even clearer for me when for another project I conducted some interviews of Namasudra partition survivors in districts like Ranaghat and Bongaon very recently. I would mention some of them in the latter half of my paper.

To understand the dynamics of caste politics prevalent in West Bengal, our journey should start from Marichjhapi and via the erosion in Dalit vote share of C.P.I.M and rise of T.M.C, it should presently settle in the Loksabha results of 2019. Namasudra people have played an instrumental role in the politics of West Bengal, especially since the 2008 Panchayat election where Mamata Banerjee's political offspring Trinamool Congress gained prominence in terms of number of seats. Mamata Banerjee's Trinamool Congress had consistently received support from the Matuas in practically all the elections since 2008 (Loksabha election, 2019 seems like an exception) and the party had somehow reciprocated the political allegiance by appointing Saha-Sanghadipati of the Mahasangha, Manjul Krishna Thakur, as the Minister of State for Refugee Rehabilitation and Relief. Matua Mahasangha primarily didn't endorse this Citizenship Amendment Bill and this was

clear in Mamata's political stunt having Matua Mahasangha by her side to go against B.J.P for introducing this Bill. In a report published in The Telegraph on 6th April, 2019, Mamata was quoted saying "The NRC is a deep conspiracy. In two days after the NRC draft was published, I sent a team from my party to Assam. Senior (Trinamul) lawmakers were not allowed to go out of the airport and assaulted…. Do you know why they keep dividing Bengali Hindus and Bengali Muslims in Assam? If you unite, the BJP will become a minority." Importantly, Mamata bala Thakur (spouse of Late Kapilkrishna Thakur) was a member of this team of Mamata Banerjee, which was surely a Namasudra card for T.M.C.

However, the recently held Loksabha Election seems to be in a discord with the 2016 scenario. In demographically Namasudra dominated areas like Ranaghat and Bongaon in Nadia district, B.J.P candidates comfortably defeated the T.M.C candidates, despite the fact that T.M.C has gradually consolidated their Dalit vote bank in myriad ways. The semi-urban scheduled caste constituency Ranaghat has an estimated Scheduled Caste population of 35.98% and the B.J.P candidate Jagannath Sarkar could manage to have a clear victory by securing 52.78 % vote of the total poll. In the Bangaon Parliamentary constituency (rural scheduled caste constituency) of West Bengal, there is an estimated Scheduled Caste population of 42.52% and B.J.P candidate Shantanu Thakur got 48.85% vote, well ahead of T.M.C candidate Mamata Thakur who could only manage to secure 40.92% vote share. Moreover, the B.J.P candidate Shantanu Thakur belongs to the same family of Mamata Thakur, who was part of the delegation team of Mamata Banerjee that raised its voice against the Citizenship Amendment Bill of 2016. This result surely enraged Mamata Banerjee as she dreamt of having a comfortable victory in these areas because she has carefully tried to nurture the Scheduled caste sentiment since 2011 either by establishing P. R. Thakur Government College in Thakurnagar or by setting up two separate administrative boards for Namasudra and Matua community. Her effort to mobilize the Dalit masses could also be seen in the establishment of Cooch Behar Panchanan Barma University, which was named after the 19th century Rajbansi leader Panchanan Barma. In fact, if

we take into account all the 42 Loksabha seats of West Bengal, B.J.P's upper hand in securing more Dalit votes than T.M.C is pretty much everywhere. This was surely one of the most important factors in helping B.J.P secure 18 seats as compared to their deplorable result of winning only 2 seats in 2014 in spite of a Modi-wave all over India. Manogya Loiwal of India Today brilliantly sums this up when she says: "Political observers have blamed religious polarisation in Bengal for the BJP's rise. While Hindu voters consolidated behind the saffron party, Trinamool retained its Muslim vote bank. A series of low-scale riots, coupled with administrative decisions such as stipends for imams, postponing Durga Puja immersions for Muharram, etc. have led to disenchantment with the Mamata regime, say analysts."

So, political analysts have already started analyzing these results. But, from the perspective of social science, can these results be counted as a socio-cultural indicator? The Rashtriya Swayamsevak Sangh model of 'Hindutva' endorsed by B.J.P has never been so preferred by the Dalit electorates in India. But for the last 3-4 years, there is a startling change in this trend. How did B.J.P manage to do so? Does that indicate a consolidation of Dalit votes within the larger ambit of the term 'Hindu'? To answer these questions, one might have a look at the efforts of All India Hindu Mahasabha as they kept trying to embrace the Dalit population since 1923, even if for their Hindu arithmetic calculation, in the larger agenda of Hindutva. This Citizenship Amendment Bill, although chronologically a far-distant event, seems to be in absolute agreement with what Shyama Prasad Mukherjee said in his presidential address delivered at the 26th session of the All India Hindu Mahasabha on 24 December 1944:

> *"Our first and foremost social programme must therefore be the complete removal of untouchability and to regard every Hindu as enjoying equal social status.... Not only must we widen our base but also unhesitatingly take back all who are prepared to return to our fold...."*

(The 26th Session of All India Hindu Mahasabha, Presidential Address by Shyamaprasad Mukherjee, 24 December 1944, p. 16, Asutosh Lahiry Papers, NMML)

There are suggestions of this in the post-partition scenario of West Bengal. As Sekhar Bandopadhyay in his book *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947* opines : "In Bengal, the post-partition violence affected Dalit groups like Namasudras more directly and their desire for vengeance and the strategies of survival had led to an appropriation of their distinctive Namasudra identity by a more overreaching Hindu refugee identity." This overreaching Hindu refugee identity seems to have played a crucial role as we see B.J.P getting 55% Scheduled caste vote as compared to T.M.C's dismal performance of getting merely 33% Scheduled caste vote. I strongly believe B.J.P president Mr. Amit Shah's repeated reminder of the Citizenship Amendment Bill (this amendment secures citizenship for Hindu refugee and discards Muslim refugees) in political gatherings has been a masterstroke.

In the last few months before the Loksabha election, West Bengal had witnessed a strong political resistance against B.J.P and by the word 'political' I don't limit my proposition to merely the members of political parties. Eminent Dalit writers like Manoranjan Byapari have given vent to their antipathy towards B.J.P in any platform possible. In fact, Rohith Vemula's suicide in 2016, where he claimed to have committed suicide largely due to his suffering and humiliation as a Dalit, stirred the civilians of West Bengal and they vehemently protested against the ruling party B.J.P for their authoritarian oppression at the centre of power. However, my conversation with many people of Namasudra community has not been in complete consensus with this. In fact, some of these people are my relatives as I myself belong to this community and their political standpoint has been somewhat else. In course of these interviews I met a man Mr. Bibhutibhusan Biswas at Bagula (in Nadia district), who gave me a very interesting picture that strongly upholds the banner of 'new face' of Dalit vote bank. Mr. Bibhutibhusan actually lives near Gopalganj in Bangladesh but had come over to his relative's place at Bagula and I

somehow I chanced upon meeting him. Among many of his resentments about the present state of Bangladesh, he gave me two extremely interesting stories: the stories of the name of a school and of a place being planned to change into Islamic names. The name of the school was 'Debasur Prathamik Vidyalaya (Debasur Primary School) and the name of the place was 'Ramdihi'. Since 'Debasur' and 'Ramdihi' have Hindu origins, this made Bibhutibhusan Biswas angry and he along with many other Namasudra people went for many rituals to have a divine intervention in the Indian Loksabha Election in order to secure a clear victory for B.J.P. In fact, this man has future plans to settle in West Bengal once he retires from his job. This is exactly where the Dalit electoral politics stands now.

Bibliography:

1. Bandyopadhyay, Sekhar. *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal*
2. Bandyopadhyay, Sekhar. *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947*
3. Bandyopadhyay, Sekhar. *The Namasudra Movement*
4. Butalia, Urvashi. *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*
5. Bagchi Jasodhara. *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India*
6. Halder, Deep. *Blood Island: An Oral History of the Marichjhapi Massacre*
7. Portelli, Alessandro. *Form and Meaning in Oral History*
8. Sengupta, Nitish. *Bengal Divided: The Unmaking of a Nation*
9. Thakur, Kalyani. *Ami Kano Charal Likhi*

Sunil Ganguly's *East West* and V.S. Naipaul's *A House for Mr. Biswas*: Relatedness in the Literatures of Partition and Diaspora

Tamali Neogi
Assistant Professor in English
Guskara Mahavidyalaya, Guskara, Purba Burdwan

Abstract : *As the title of the paper indicates, the author wishes here to bring out the related aspects of the literature of Diaspora and the literature of Partition. By selecting two pivotal texts of diasporic literature and partition literature respectively_ for the present purpose the author has selected A House for Mr Biswas by V.S.Naipaul and East West by Sunil Ganguly _ the author intends to show though the historical compulsion remains different for the displacement of two communities that is Trinidadian Indians on the one hand and East Bengali refugees on the other, how the two communities are to experience almost the same sort of crises related to border crossing so far as the pain of 'rootlessness', the feelings of 'alienation', the sense of 'loss', the nostalgia of 'lost' homeland, the yearning to return , the identity problem and the fight for survival are concerned. On the basis of an in depth study of the two novels the author has tried to bring out the relatedness of the two texts by highlighting the related nature of the experiences of the two displaced communities in the foreign soil, their attempts to build 'home' anew and consequent disappointments they are to meet in the process. Amazing similarities are found between the literature of Partition and that of Diaspora_ even in the attitude to the place of migration which is found to be got changed in subsequent generations_ so that the author may reach the conclusion that the pathetic nature of the experience of the victims of displacement remains same worldwide, irrespective of the varied causes of the displacement, which further establishes the essentially related nature of Bengali Partition Literature and literature of Diaspora.*

Keyword: *Displacement, Partition, Diaspora, relatedness*

"and home isn't here
And home isn't there" (Landau, 2014).

"Refugee, exile, immigrant…did not simply live in two cultures….Displaced people also lived in two time zones, the here and the there, the present and the past….(Nguyen, 2015)

Displacement of communities is a worldwide phenomenon. Partition of Indian subcontinent in 1947and diaspora, both primarily imply displacement of communities of people caused by historical compulsion. It is then undeniable that the literature of Partition and that of diaspora should share some common aspects of concern. In this paper the author has tried to find out the relatedness in between the existential conditions of these displaced communities, East Bengali refugees on the one hand and Indian diaspora in Trinidad on the other, as are found in the novels of one of the most esteemed Bengali authors, Sunil Ganguly and V.S.Naipaul respectively. More specifically, the author intends to find out this relatedness by analyzing the behavioural patterns of the displaced individuals from various facets, keeping in mind the related dimensions such as homelessness, alienation, duality of belongingness, spilt identities, nostalgia, the process of identity formation as are found in Sunil's *East-West,* one of the milestones of Partition literature in Bengali and *A House for Mr Biswas*.

The relatedness is tried to be reached through detail study of two literary texts and not through exploring historical facts and documents as History is largely " state-centric and nationalistic"(Butalia, 1998) whereas literature is believed to be people centric in probing the lives of ordinary, marginalized people. Dr. Asaduddin observes: Partition is "one of the most massive demographic dislocations in history, with its attendent human tragedy… it defies chronicles to come to grip with it in all its dimensions"(Ganie and Rathor,2016). Mahatma Gandhi was all against partition but his final say on partition is "Partition is bad. But whatever is past is past. We have only to look to the future"(Nix, 2013). But to a poet who has experienced the trauma of partition , "Present means past." (My translation, ''Ak shringa gandar o nartaki" of Faiz Ahmed Faiz). Thus

there seems to be a persistent gap between the prevalent political history of a happening and literature reflecting that in its unique way. Just before Partition Gandhi says in an interview: " The question of the exchange of population is unthinkable and impracticable. This question never crossed my mind…The logical consequence of any such step is too dreadful to contemplate"(Ajgaonkar, 2002). The 'dreadful' subjective experiences of those who have undergone mass mobility because of historical compulsion, form a remarkable portion of both partition and diasporic literature. However, while searching for this relatedness, the author has found amazing similarities between the behavioural patterns of the victims of Partition and that of ''diaspora'', so that the conclusions about the real nature of the crises faced by the displaced people do not at all seem implausible.

Huge population exchanges occurred between the two newly-formed nation states, India and Pakistan, in the months immediately after Partition. "Partition is central to modern identity in the Indian subcontinent''(Dalrymple, 2015). "Partition literature" embodies the traumatic experiences of dislocation, the related violence, the insights of hazards and misfortune that common innocent people had to go through. Faiz Ahmed Faiz, In his editorial in *The Pakistan Times,* 1947, says: "The Muslims have got their Pakistan, the Hindus and Sikhs their divided Punjab and Bengal, but I have yet to meet a person, Muslim, Hindu or Sikh who feels enthusiastic about the future. I can't think of any country whose people felt so miserable on the eve of freedom and liberation". Moreover, we are to remember that Partition did not imply the same for Punjab and Bengal. The reasons of it, as Rituparna Ray points out, are following: "Compared with the Punjab Partition where there was more or less an equal exchange of population, Partition of Bengal turned out to be a continual process with migration happening predominantly in one direction: from East to West Bengal. Compared with the Punjab region, the dividing line in the East remained a flexible one and that facilitated the refugee movement". Thirdly and most importantly, as thinks Ray, the difference was between the attitude of the Centre towards the happenings of the two borders. "The crisis in Punjab was viewed as national

emergency whereas Nehru continued to believe that the infiltration in the East could be halted, even reversed provided the Government of East Pakistan could be persuaded to employ psychological measures to restore confidence among the minorities. This differentiation strikingly marked itself in the expenditure on the Punjabi and Bengali refugees. Its economic consequences for the state of West Bengal were destabilizing enough and it had an obvious impact on the way the West Bengal Government dealt with the East-Bengali refugees" (Ray, 2009). Sunil's *East-West* alongside capturing the causes and consequences of Partition, gives us a most poignant portrayal of the plight of East-Bengali refugees, the victims of severe injustice.

A diasporic community, as defined by Safran, must have the following features: "1) they or their ancestors, have been dispersed from a specific original ''center'' to two or more ''peripheral'' or foreign regions; 2) they retain a collective memory, vision or myth about their original homeland -- its physical location, history and achievements; 3) they believe that they are not -- and perhaps cannot be -- fully accepted by their host society and therefore feel partly alienated and insulated from it; 4) they regard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they or their descendants would (or should) eventually return -- when conditions are appropriate; 5) they believe that they should, collectively, be committed to the maintenance or restoration of their original homeland and to its safety and prosperity; and 6) they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in one way or another, and their ethnocommunal consciousness and solidarity are importantly defined by the existence of such a relationship" (Safran, 1991). Border crossing is an unavoidable yet almost inevitable human movement against the backdrop of history. It is very interesting to see how the alienated ,homeless, rootless individuals, (may be displaced because of different sorts of historical compulsions), tend to build homes in their imaginative space as well as in the foreign land and to what extent this effort leads to the fragmentation of their selves. In diasporic and exilic literature of V.S.Naipaul, how through transformation and difference', these displaced people are constantly producing and

reproducing themselves anew, has remained one of his major concerns. The author here wishes to examine how the pivotal work of V.S.Naipaul , *A House for Mr Biswas* and partition literature of Sunil Ganguly, are related in the sense they share commonalities of experiences of displaced individuals.

Set in Trinidad, *A House for Mr Biswas* highlights displaced individuals not of high genius, but individuals of medium merit, in pursuit of societal recognition and success. And the emphasis on this ‘‘displacement’’ in the overall structure and texture of the text is of immense importance as it underlies, almost all the time, the thematic concerns of the novel; it is manifested in the characters, their dress and food, religion and habits, time and place, action and language. Despite the displacement, the characters in *A House for Mr Biswas* are found to desperately maintain their Indianness. Almost all the characters in the novel are Indians. Indianness is evident in their dress as well as in their jewellery. Instances can be multiplied. Some such are : Mr Biswas, clads himself in Hindu Brahmin’s ‘‘dhoti’’ when Tara invites him at religious festivals (49). According to the narrator, Hari, ‘‘never looked so happy as when he changed from estate clothes into a dhoti and sat…reading from some huge, ungainly Hindi book’’(114). The jewellery of Tara – “arms enclosed with silver bangles from wrist to elbow, earnings, ‘‘nakphul’’, solid gold yoke around neck, thick silver bracelets on ankles” – are identical with that of a rural woman of Eastern part of India. The characters’ adherence to their past, their attempts to maintain Indianness seems to be unquestionable.

Though displaced from India for generations, the characters are still Indians in their choices, mannerism and habits. The characters here prefer Indian food. All the members of the Tulsi family are present on the day Mr Biswas invites Hari to bless his shop at The Chase. The narrator notices “They prepare bin after bin of rice, bucket after bucket of lentil and vegetables, vats of tea and coffee, volumes of chapattis’’ (156). The narrator observes that habitually each morning Mr Biswas ‘‘had his bath in the yard, cut a hibiscus twig, crushed one end and cleaned his teeth with it, split the twig and scraped his tongue with halves…’’(53). While

at Jairam's place, this is exactly how Mr Biswas starts his pre-'puja' preparations. In mannerism and etiquette even, these characters prefer to remain typically Indian. To his great satisfaction, Mr Biswas finds that Shama ''gave not a hint of sullenness she used with Bipti's sister Tara…she treated Bipti with all the respect of a Hindu daughter in-law. She had touched Bipti's feet with her fingers when Bipti came, and she never appeared before Bipti with her head uncovered''(426). Her husband observes with much pleasure that Shama is behaving like a ''Hindu daughter-in-law''(426). In her respectful attitude towards her mother-in-law Bipti, as well as in the very ways of her expression, that is, in other words, emotionally and in her manners too, Shama is still an Indian.

Next, the novel offers profuse examples of how the characters maintain Hindu rituals in a foreign land. The prediction of the Pundit at his birth is, the baby while grown up is to cause harm to the family but to diminish much of that evil, the advice of the pundit is: ''you must fill this brass plate with coconut oil – which, by the way, you must make yourself from coconuts you have collected with your own hands – and in the reflection on this oil the father must see his son's face'' (17). That the characters strictly maintain Hindu funeral rites too, are also found here. After the death of one of the Tulsi son-in-laws, Sharma, the author describes, the ''village had assembled to see the Hindu rites. Hari, in white jacket and beads, whined over the grave and sprinkled water over it with a mango leaf…Sharma's widow shrieked, fainted, revive and tries to fling herself into the grave, and while watching this demonstration of grief with interest, the villagers whisper about 'suttee' ''(414). In the mimicry of the original ritual the widow shows that Hindu practices, ideas and conventions are not wholly forgotten by the villagers though, by then, for generations they have been living in the distant land.

That there gradually grows attitudinal differences between the earlier generation the subsequent generations, towards the place of migration, is aptly portrayed in *A House for Mr Biswas*. While the younger generation thrives for getting an escape route for being able to explore the larger world outside Trinidad, particularly England, where

ambitions are assumed to be more successfully pursued, the older generation is found to be still dreaming the return to India. Moreover, Naipaul portrays with much sensitivity how in generations, during the process of their acculturation, the mother tongue of the Trinidadian Indians slowly recedes and English is becoming the dominant language. At Hanuman House, all have the license to speak in both Hindi and English. Hindi remains a language ‘‘too intimate and tender’’ (101) a ‘‘a secret language’’(360) and is used for intense emotional interaction and in reverse of that English is primarily used during quarrels or in exchanges with the outside world. Significantly, feeling himself as an alien at Hanuman House, ‘‘Mr Biswas nearly always spoke English at Hanuman House, even when the other person spoke Hindi; it had become one of his principles’’ (119). However to those of Anand’s generation Hindi is almost lost _ not ‘‘Bap and Mai’’ but ‘‘Daddy’’ and ‘‘Mummy’’ are used to address their parents(440). Younger generation can only understand Hindi but can no longer speak it. Thus Naipaul shows how in spite of the diasporic community’s desperate efforts to remain connected with their past, how they come to ‘lose’ their mother tongue in time. With time, being exposed to the dominating influences of West, the characters increasingly become less Indians and more Trinidadians.

The symbolic significance of the house is perhaps the most note worthy thing in the novel. To Mr Biswas it brings a sense of fulfillment. To him it is his final attainment of necessity and accommodation. According to Robert Morris, the house is ‘‘the grand symbol of his freedom, personal independence, pride and dignity…redeeming all his past trials, perhaps the very past itself’’ (Mason, 1986). The pathos lies here that though heroic, his final attainment is marked by ironies that ultimately turns his achievement into a paradox. Emotionally Mr Biswas is hugely relieved as the narrator says: ‘‘During these months of illness and despair he was struck again and again but the wonder of being in his own house, the audacity of it: to walk in through his own front gate, to bar entry to whoever he wished, to close his doors and windows every night, to hear no noises except those of his family, to wander freely from room to room…’’ (8). But in contrary to this complacency, peace and

satisfaction, there is his failure to pay the debt: ‘‘But the debt remained. Four thousand dollars. Like a buffer at the end of a track, frustrating energy and ambition’’(586). This leads one to the conclusion that ‘‘what is notable is that Naipaul refuses to grant any sense of achievement to Mr Biswas, while the novel attaches only a pathetic and small importance to his struggle against the odds’’ (Singh, 1998). By showing his final attainment being deeply embedded in ironies, perhaps the novelist intends to mean that “ …achievement and failure are aspects of a single experience typical of a world which is shot through with contradictions” (White, 1975). Min Zhou rightly observes: “The jerry-built house he finally acquires in all-encompassing symbol of his struggle, as well as of the compromise he makes with his social and historical contexts. It is a departure from the post-colonial subject’s route of identification, rather than a symbol of the realization of an independent identity.”(Zhou, 2015).

In this novel, the existential crisis of Trinidadian Indians is captured in much detail and the different facets of the experience of the displaced community — their sense of ‘loss’, their attempts to remain attached with their roots, the gradual fading away of old cultural habits, old rituals and even the language, the community’s attempt to adjust to the new surrounding realities, and obviously the problematics of identity or in other words, how Mr Biswas’ attempt to find his true self is repeatedly frustrated in absence of spiritual, religious and cultural sustenance in a foreign land _ are brought into focus with much poignancy. The ambivalent relationship formed between the displaced community and their ‘lost’ homeland and the difference in attitude to the land of migration, between older and younger generations, are also found to be essential parts of this discourse of displacement we get in the novel.

Alike *A House for Mr Biswas,* in *East-West* also the characters are embedded in the reality of displacement. The novel begins with Pratap’s family’s annual visit to Deoghar. Pratap seems to be upset throughout the journey and when Bablu, Pratap’s younger son, asks Kanu, to tell him the reason of his father’s depression, Kanu significantly says: ‘‘Because we are going the other way…’’. When Bablu fails to understand it clearly, Kanu made it more clear by saying: ‘‘Our own place is not in this

direction. It used to be over on the other side''(10). The narrator says: ''The last time Pratap went to Malkhanagar was to do the last rites of his mother. …With the death of his father his links with his ancestors were severed, it was as though a growing tree was yanked off its roots. For him the rivers and fields, the sweet breeze, early mornings with a taste of date palm juice, evenings humming with stories of grandmother – all these were gone for ever. He would have to spend the rest of his life in exile, in dark, stuffy tenanted rooms in Calcutta''(19). On Independence Day, at Sealdah, during his interaction with Biman Bihari, Pratap took one old beggar woman for Kalu's mother, the delivery nurse from Malkhanagar. Though Pratap understood his mistake later, he was stunned by the surprising similarity of the two women. The incident, though seemingly unimportant, must be noticed as it highlights the fact that internally Pratap has ever belonged to his past as the narrator says after a little while: ''Pratap still identified himself with them[the refugees]''(458-459). On another day Pratap on a sudden impulse bought a *hilsa* fish on his way home. It was late at night. Before buying the fish it never came to his mind that the cook has left and the cooking would have to be done by Mamata and his immediate family was not fish-lovers. Pratap's impulsive buying of the fish points out the fact that though East-Pakistan is not his country any more, he remains an East-Bengali so far as his choices, his habits – particularly food-habits, are considered. In his memory again and again he goes back to his childhood days – the blissful days he has spent in Malkhanagar. The memory of his childhood days sustains him throughout his life. Nostalgia, does not allow Pratap to create the sense of belongingness with the land of displacement. On the other hand, it does not permit him to visit his mother-land as with time he becomes doubtful of being able to find his roots there any more. Amrita Ghosh observes: " Thus they led a dual existence where one part of their being yearned to be a part of the present social fabric while the other part put a check on that desire by constantly engulfing them in the nostalgia of their bhitamati(home and hearth)"(Ghosh, 2019). Thus the dual belongingness of displaced refugees further questions the physical space of nation. They are nowhere or in other words they are "In a Free State'', in an imaginary

land, beyond borders and boundaries. The aspect of dual existence is clear from the following conversation:

> *"How old is this sister of yours? He asked his cousin. Has she even been to Brahmanbaria, or East-Bengal? You all left the country in 1947, didn't you?*
> *No, we left in 1949. This sister was born here. She is Eighteen now.*
> *-- Well, eighteen years is a long time. The letter says resident of Brahmanbaria. Do you have your house there?*
> *-- Unfortunately no.*
> *-- But you still cling to that old place? As though your Tollygunj home is only a temporary abode—your real home is still in Brahmanbaria!*
> *-- That is the usual format.*
> *-- The groom's family is also from Faridpur—that's what the letter says. Utter nonsense. We have left those parts long ago, severed relations completely. The two parts are not even on talking terms. What does Madaripur, Brahmanbaria and such names mean to our children?''(1016-17).*

Seeing the gathering of old men every evening in the arcade of Hanuman House Mr Biswas says: ''It was the time of day for which they lived. They could not speak English and were not interested in the land where they lived; it was a place where they had come for a short time and stayed longer than they expected. They continually talked of going back to India''(194). The ambivalence that marks the relationship of the diasporic community with its motherland is suitably brought into focus by Naipaul. The narrator perceives though the old men never stops speaking of returning to India, when the opportunity comes, most of them will refuse to go back to India, being ''afraid of the unknown, afraid to leave the familiar temporariness''(194). It seems that the displaced community is fated to yearn in order to reach the 'lost' homeland but the temporal and spatial distance that exists between the land of settlement

and ‘home’, often minimizes the probability of such return journey. Later in life when Mamun, attempting to know his real feelings in relation to his roots, asks him: ‘‘Tell me Pratap, why did you say you have nothing to do with Joi Bangla? Can you deny your roots? Wouldn’t you go visit Malkhanagar once the country becomes free?” In his reply Pratap says something that puts into words the core feeling of the East-Bengali refugees. Pratap says: ‘‘…What is the use? From what I have been hearing the doors and windows of our house have been taken out, the garden by the tank has turned into agricultural land. Some kind of a government office is housed in our outer house. I have no desire to go back and look at these. The main house must have been forcibly occupied. Would the present owner extend a hearty welcome to me? No Mamun, let me retain the beautiful memory of the house. I don’t want to spoil it” (494). In relation to mohajirs’ feeling of nostalgia, the narrator’s observation may be suitably quoted here: ‘‘ They say people come and go, places stay where they are. But ,in this case, the mohajiris had transported an entire city within the folds of their hearts. With some came the bricks of their houses, some carried entire homes intact’’(*Sleepwalkers,* 2001). Much like the people of older generation in *A House for Mr Biswas,* Pratap, despite all changes, tries to remain attached to his past, to ‘‘retain the beautiful memory of the house’’, of the homeland as it had been at the time of his departure.

The earlier generations of diaspora, for instance, characters like Mr and Mrs. Tulsi, Mr Biswas, are more Indians than Trinidadians while compared to the next generations of diaspora, as for example, Shekhar or Anand. Similarly, people of Pratap’s generation are more East-Bengali in their habits, language or life-style than that of his children’s. After spending so many years in Calcutta, Pratap and Mamun are surprised to see that they still retain marks of East- Bengali accent. Once Mamun asks Pratap ‘‘…how could he make out I am from Joy Bangla?’’ Pratap says: ‘‘Your accent!’’ Mamun is seemingly not ready to accept the truth as he says: ‘‘But I have spent so many years here, my Calcutta accent is perfect.’’ Pratap’s reply to this is noteworthy: ‘‘Traces remain, you know. I have been here quite a while but people can make out. But my children

don't have any East-Bengal accent. You can't change accent in one generation'' (490). The diasporic Indians, as we have seen, are gradually to loss their mother-tongue. The refugees are to acculturate so far as the issue of language is concerned.

Moreover, there is substantial difference between the first generation and the succeeding generations in their attitudes towards the place of migration or displacement, the new land as we have seen in the case of Indian diaspora in Trinidad. Avtar Brah notices: ''Clearly, the relationship of the first generation to the problem of migration is different from that of subsequent generations, mediated as it is by memories of what was recently left behind, and by the experiences of disruption and displacement as one tries to re-orientate, to form new social networks, and learns to negotiate new economic, political and cultural realities'' (Brah, 1996). And the same is applicable to both the cases _ any diasporic community as well as the case of East-Bengali refugees. Undoubtedly Harit Mandal's generation has to undergo immense torture and misery whereas hopefully life would be little easier for the generation of Harit's grandson. First generation's emotional attachments with the lost homeland is far greater in comparison to that of the second generation. Bablu, Piklu or Tutul are least worried about what is happening at their lost motherland but Pratap throughout remains concerned with that. The generation of Mr and Mrs Tulsi seems to be more attached with ''lost'' India than the generation of Mr Biswas or that of his children. This sense of ''loss'' and yearning for the lost homeland is most poignantly portrayed in the last wishes of Pratap and his mother at their death-beads. Pratap's mother dies with her wish to return to Malkhanagar. At his death-bed Pratap remembers the last words of his mother ''Khukon, can you take me there, just once?'' Just before his death Pratap visualizes his return to Malkhanagar, to his mother, in blue sari. ''He looked on, at the house, exactly the same, the thatched shed of the atchala, the rooms flanking the courtyard where the various aunts used to live, the same mango tree, the grapefruit tree, the fishes bobbing up and down in the south side pond…everything as it used to be. …There is mother, I am going to her… He closed his eyes in great contentment''(705-706).

Pratap is to wash his feet before touching his mother but there is mud all over his body. To the author, the mud speaks of his strenuous unhappy life as a refugee in Calcutta. In *A House for Mr Biswas* only Pundit Tulsi got the opportunity to make a return journey to India whereas Mr Biswas, entrapped in his new surrounding, has nowhere to go back to. As it happens in Pratap's case, Mr Biswas' death relieves him.

Mr Biswas' attempt to discover his true self, to establish his own identity that is obviously very difficult in a foreign soil, is symbolically represented through his great desire to acquire a house of his own. To what extent displacement is an important phenomenon so far as the aspect of establishing one's identity is considered, is similarly evident in *East-West*. Here we see the identity crisis of Atin. Edward Said says: "Once you leave your home, wherever you end up you simply cannot take up life and become another citizen of the new place"(Said, 1996). Mr Biswas spends his childhood as a poor destitute; practically he got no significant school education; in the name of marriage he is trapped; he switches off from one job to another and wanders from one place to the other. His desperate attempt to build a house of his own is probably the dream shared by all living in a displaced land and in case of the East-Bengali refugees it seems that this dream is never to come true. Insecurity leads them to leave their homeland. They are being driven like cattle but they are not accepted wholeheartedly either by people of West Bengal or by its government. The plight of the refugees is evident in the words of Harit Mandal: ''The government wants to send us to the Andaman for a life of exile. The other alternative is Dandakaranya, to be eaten up by monsters, you see, to them we are not Bengalis, we have run away from East Bengal of our own sweet will, so West Bengal won't have us. So we thought of shouting our demands to the Chief Minister. But the police beat up, hit me on the head, some of us may have had bullets through the stomach''(178). This homelessness is so painful that it leads most of them to have a frenzied state of mind. In the words of the narrator ''…They had no place in the new country, nobody welcomed them. They are putting up by the road side, on railway stations, in camps of charity. They were half-starved and sick''(301). Thousands of refugees are to live

in conditions worse than human. They are treated with indignity, inhumanity. Naturally what they want most is to return to their lost homeland. Harit, to some extent deluded by the struggle for independence in Bangladesh, asks Joga ''…if you are given the option of going back home or staying in India, what would you do?'' Joga's spontaneous reply must be noted: ''I will run away from India if I get that chance…" (142).

Finally, inspired by the communists' coming into power – the Left parties had championed the cause of the refugees for the last two decades – the East-Bengali refugees start to leave their camp life in Dandakaranya settlements in order to fulfill their dream, that is, to have a home of their own. At Morichjhapi they try to build a new life, to survive in a new way. They were self-reliant and when in 1979 the Left government was against these settlers—an environmental issue was supported in place of their case -- they were defiant unto the last. Against the government's injustice they fought till their last breath. Their slogan has been: ''*Amra kara? Bastuhara. Morichjhapi chharbona''*. ''Who are we? We are the dispossessed. We'll not leave Morichjhapi, do what you may''(Ghosh, 2004). The forced eviction of the settlers in the islands of Sunderban or in other words the Morichjhapi massacre brings to an end the refugees' final attempt to build a home of their own.

Mr Biswas dies at his Sikkim Street House among his own family members. It pleases him to think that he has become successful to free his immediate family from the domination of the Tulsis and has acquired his portion on earth. Mr Biswas feels: ''How terrible it would have been, at this time, to be without it: to have died among the Tulsis, amid the squalor of that large, disintegrating and indifferent family; to have left Shama and the children among them, in one room; worse, to have lived without even attempting to lay claim to one's portion of the earth; to have lived and died as one had been born, unnecessary and unaccommodated'' (13–14). Yet there remain his worries. What troubles him extremely till his death is that the house remains mortgaged to uncle Ajodha. Ironically it is at his yards where he first promises to himself to have a house of his own. Mr Biswas considers the idea of selling his car even to repair the house. The agonized state of mind of Mr Biswas all through the

remaining years of his life, is not to be overlooked. The narrator notices that his skin complexion gradually turns darker and that darkness ‘‘seemed to come from within’’(588), generated from the unhappiness caused by indications of uncertain future of next generation, specially from Anand’s letters and obviously because of the debt . Mr Biswas, realizing perhaps that no good is to be experienced further, dies almost broken hearted. Through ironies Naipaul obliquely presents the truth that Sunil expresses explicitly; the most common lot of these displaced people, is to live in this ‘‘terrible’’ plight – ‘‘unnecessary and unaccommodated’’.

The paper thus brings out the related aspects of studying the two novels, or in other words, it points out how the two novels can be studied in relation to one another, as effective portrayals of displacement and relocation, caused by partition in the context of East Bengali refugees in West Bengal and diaspora in the context of Trinidadian Indians. The role of memory, the sense of ‘loss’, the function of nostalgia are examined here with much poignancy so that the collective experience of those who are denied wholehearted acceptance in their present abode, can be felt in its real pathos. Further, the author has tried to show the related troubles of border crossing, (whatever is the historical cause of displacement) – identity crisis and fight for survival in a new land being essential parts of this experience –to highlight the impossibility of making a foreign soil one’s own which in turn leads to disastrous consequences at times. The relevant discussion on the attitudinal difference between the first generation and following generations of displaced community, contributes in large in understanding the discourse of displacement, as delineated in the novels. Finally, it can be said that it is extremely engaging to find out how diasporic literature and partition literature are related, in the sense they share almost the same version of experiences caused by forceful displacement.

Works Cited

1. Ajgaonkar, T. Meghshay. *Gandhiji on Partition*. Mani Bhavan Gandhi Sangrahalaya, 19, Laburnum Road, Gamdevi, Mumbai 400 007, 2002.
2. Brah, Avtar. *Cartographies of Diaspora*: *Contesting Identities*. London:Routledge,1996.
3. Butalia, Urvashi. *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*. Penguin Books India, 1998.
4. Dalrymple, William. *The Great Divide*. The New Yorker Books, June 29,2015.
5. Ganguly, Sunil. *East-West.* Trans.by Enakshi Chatterjee. Sahitya Akademi, New Delhi, 2000.
6. Ghosh, Amrita. "Nation- State Through Post-partition Nastalgia:Joginder Paul's *Sleepwalkers*". 23rd January, 2019. https://doi.org/10.3390/h
7. Ganie, Aijaz Ahmad and Rathor,M.S. "The Plight of Common People in Indian Subcontinent".Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, Online ISSN 2278- 8808, SJIF2016.
8. Ghosh, Amitav. *The Hungry Tide.* UK : Harper Collins, 2004.
9. Landau, Deborah. *The Last Usable Hour*. Copper Canyon Press, 2014.
10. Mason, Nondita. *The Fiction of V.S. Naipaul. Calcutta: World Press*,1986.
11. Naipaul, V.S. *A House for Mr Biswas*. London: Andre Deutsch, 1961.
12. Nguyen, V.Thanh. *The Sympathizer*. Grove Press, 2015.
13. Nix, Elizabeth. "6 Things You Might Not Know About Gandhi''.www.history.com updated August 31,2018/ original January 30, 2013.
14. Paul, Joginder. *Sleepwalkers.* Katha, New Delhi, 2001.
15. Ray, Rituparna. "The hungry tide. Bengali Hindu Refugees in the sub-Continent.'' *The Newsletter*. 59: 2009.

16. Safran, William. "Diaspora in Modern Societies: Myths of Homeland and Return." *Diaspora* (Spring 1991): 83-99.
17. Said, Edward.*Representation of the Intellectual*, New York: Vintage Books, 1996.
18. Singh, Manjit Indar. *The Poetics of Alienation and Identity: V.S. Naipaul and George Lamming*.Delhi: Ajanta, 1998.
19. White, Landeg. *V.S. Naipaul: A Critical Introduction*. London: Macmillan, 1975.
20. Zhou, Min. "The Transcription of Identities: A Study of V.S. Naipaul's Postcolonial Writings", *Cultural Studies*, 43 July 2015.

REFLECTION OR REFRACTION: History and Biography in Indian Cinema

Somshankar Ray
Asstt. Professor, Dept of History
Vidyasagar College for Women, Kolkata

***ABSTRACT**: The trend of portraying the lives and characters of historical personages is not new to the Indian screen. In fact, reputedly the first complete feature film in India Raja Harishchandra(1913) was based on the biography of a mythical king. Two Marathi biographical movies Sant Tukaram and Nayadhish Ramshastri received high acclaim from the European audience in the early days of Indian Cinema. Another pioneering effort was Dr Kotnis ki Amar Kahani. Films depicting the lives of rulers, saints and mythological figures proved to be particularly popular among the masses. Around the year of the Indian Independence a number of motion pictures based on the careers of the Delhi Sultans and the Mughal Emperors were produced. In the 1950s, Sivaji Ganeshan made a major venture in Tamil, titled Veer Pandya Kattabomman, describing the struggle of a local chieftain against the British invaders. In Bengal too, in the 1940s and `50s, some high quality films showcasing the activities of the major socio-cultural stalwarts of the Bengal Renaissance and the Bengali armed nationalists such as Kshudiram Bose, Surya Sen, Michael MadhusudanDutta, Sri Ramakrishna, Vidyasagar, Sister Nivedita and Raja Rammohun Ray were released. In the then East Pakistan some Bengali movies centering on the lives of heroes like Nawab Sirajud Daulah, a champion of communal harmony and local patriotism, and Titu Mir, the peasant leader, were made. Over the last decade and a half this tradition has made a vigorous comeback on the Indian screen. Biopics and TV serials focusing on the lives of ancient and medieval personages like Porus, Chandragupta Maurya, Padmavati, Baji Rao and the Rani of Jhansi have come up in quick succession. The careers of the leaders of more recent and contemporary*

times such as Gandhi, Netaji Bose and Sardar Patel have also attracted the attention of the producers and the directors.

However, these Indian biopics were different from major Western biographical ventures such as Spartacus, Napoleon, War and Peace and Motor Cycle Diaries. The Hollywood and European attempts are much more objective, realistic and well researched. In India the biopics and historical movies in general, are melodramatic, scrappily researched and lop sided in the treatment of their subjects. Possibly the quality of the audience is a decisive factor here. The less literate, common Indian spectators love colourful costume dramas rather than serious historical accounts. They often fail to treat historical movies simply as works of art and create unnecessary controversies, as in the case of Padmavat.

In this paper, I will try to place the Indian 'biopics' and historical movies in proper perspective and address the issues of propaganda and representation embedded in them.

***Key Words**: Indian screen, biography, motion pictures, Bengal, Biopics, TV serials, melodramatic, propaganda.*

'Actually history can be read any way and this is a major discovery'

Gao Xingjian (Nobel laureate in Literature, 2000 CE)

We love our historical movies. This is clearly proved by the regular churning out of colourful *historical* by Bollywood and regional film industries of India. *Jodha Akbar*, *Mohenjodaro*, *BajiRaoMastani*, *Padmavat* and of late, *Manikarnika* are some of the recent Indian movies based on history, that have captivated the audience. Historical movies in India are primarily concerned with biographies, legends, wars and patriotism.The trend of portraying the historical personages is not new to the Indian screen. In fact, reputedly the first complete feature film in India *Raja Harishchandra*(1913) was based on the biography of a mythical king. Two Marathi biographical movies *Sant Tukaram* and *Nayadhish Ramshastri* received high acclaim from the European audience in the early days of Indian Cinema. Another pioneering effort was *DrKotniski AmarKahani*, featuring V. Shantaram.Two films recalling the bygone heroic days were *Udaykal,* on Sivaji's exploits and

the *Beauty of Rajasthan*, telling the legend of Padmini.In the 1950s, Sivaji Ganeshan made a major venture in Tamil, titled *Veer Pandya Kattabomman*, describing the struggle of a local chieftain against the British invaders. In Bengal too, in the 1940s and `50s, some high quality films showcasing the activities of the major socio-cultural stalwarts of the Bengal Renaissance and the Bengali armed nationalists such as Kshudiram Bose, Surya Sen, Michael Madhusudan Dutta, Sri Ramakrishna, Vidyasagar, Sister Nivedita and Raja Rammohun Ray were released.[i]Over the last decade and a half this tradition has made a vigorous comeback on the Indian screen.The careers of the leaders of more recent and contemporary times such as Gandhi, Netaji Bose,Sardar Patel, and even Dr. Manmohan Singh or NarendraModi, have also attracted the attention of the producers and the directors. Generally we call these movies*biopics*.

However, the history depicted in these movies, and the history documented by the professional historians, are somewhat different. Being basically non-fictional in nature, these films are supposed to be based on unimpeachable truth, but in most cases they are not strictly factual. Historians, from a mass of confusing materials, sort out the authentic documents and other evidences, and collect indisputable facts from them. While writing research works based on such data, they refer to the documents in detailed footnotes and endnotes. These practices give the mainstream history books air of authenticity, but often repulse the general reader. Owing to paucity of reliable sources historians frequently leave great gaps in their narratives. For example, we know very little about the actual history of pre- Buddha India. For the same reason, the academic historians sometimes fail to depict the personal lives of famous personages adequately. However, there is a natural curiosity in the intelligent general reader to know more about the less highlighted topics in formal history. That is why, the historicity of Ramayana and Mahabharata remain vigorously debated topics among the common public even today. Historical fiction and motion pictures step in precisely to address this inquisitiveness. By using legends, hearsays, conjectures and plain imagination the historical movies fill in the frustrating gaps in

mainstream history. In the process, by refashioning and twisting genuine facts they create seamless narratives to suit the popular mind.[ii]

This is especially true for India. Here from the first, historical movies mainly depended on dramatic anecdotes and romanticized legends, rather than on authentic information. Ironically, when SohrabModi, the past master of grand historical films, attempted a strictly factual biopic of the Rani of Jhansi, it flopped at the box office. The movie was shot in Technicolour and involved huge expenditure, but failed to cut much ice. Such experiences bring forth a strange trait in the Indian psyche. In India, there is a tendency to mix factual history with fable, myth and melodrama right from most ancient days.*Mahbaharata* the greatest work produced by Indians of yore, defines itself as an *itihasa* or indigenous history. But this is not history in our sense. *Mahabharata i*s not an accurate chronological account of the later Vedic age. Rather the work is a compilation of certain semi-historical episodes and *upakhyanas* or stories selected to teach some moral and ethical lessons to the common populace. The same holds true for the *Puranas*, which are supposed to be the repositories of knowledge about early India. There are a few dynastic lists preserved in these texts, but they are so much mixed with philosophical, religious and supernatural elements that their historical value is diluted. Also, lists preserved in one particular *Purana*do not agree to statements in other *Puranas*. This is because knowledge in ancient India was transmitted orally and preserved in memory, rather than being written down. Naturally oral accounts got diluted with the passage of time. Later, royal biographical works like *Ramacharita*and *PrithvirajRaso*, contained genuine historical information but they were distorted by poetic embellishments and dramatic effects. In medieval times, the Rajput bards went on composing romantic and fanciful accounts of their royal patrons' exploits.When the British penetrated deep into Rajasthan, Col. James Tod, an English official, compiled a compendium on the Rajputs, banking mostly on the bardiclores.

The Indians' natural tendency to place colourful fiction over history is emphasized by the immediate sensation Tod's book created amongst the reading public. Reeling under British jibes and taunts the

educated Indians were desperately searching for military heroes in their bygone days, and they found them aplenty in Tod's annals. Soon enough, a number of vernacular books, drawing from Tod's work, were published, the most notable being Abanindranath Tagore's *Rajkahini.*By the beginning of the 20^{th} century, images of Goha and Bappaditya playing with the aborigines in the idyllic forests, princess Samyukta boldly garlanding the statue of PrithvirajChauhan, queen Padmavati committing the *Jauhar*, andRanaPratap bravely combating the mighty Akbar, even while consuming bread made of grass, became forever etched in the collective memory of the general Indian readers. Around this time, the discipline of history was getting formalized in the academic institutions of the country. Institutionally trained scholars soon started doubting the narration provided by Tod. Historians like Sir JadunathSarkar did their best, with the help of reliable evidence, to show that Goha, Bappaditya and Padmavati probably belonged to the realm of fantasy, there was little historical basis of Prithviraj – Samyukta romance and RanaPratap was never reduced to eating grass- bread. However, despite almost century long efforts, the academic historians have failed to remove those romantic images from the popular psyche.From that angle, the traditional Indian sense of the past has held its own in the face of Western scientific history.[iii] In the recent historical mega movie, *Padmavat*, in a particular scene, AlauddinKhalji (played by Ranveer Singh) proudly claimed that official history remembered only the victor. *Rawal*Ratan Singh (portrayed by ShaheedKapoor) immediately retorted that there would, always be, forms of history other than the formally documented ones.This sums up the Indian mindset adequately.

Quite naturally, the Indian film makers, with large financial investments to defend, catered to this indigenous sense of history. Also, unfortunately, the literacy rate of the Indians, especially in the rural and poor urban areas, still remains unsatisfactory. At the stroke of the Indianindependence, possibly only 15% of the populace was literate. It has remained difficult, for the unenlightened masses, to appreciate serious history. So, to satisfy this audience, mainstream Indian directors mostly have created strange hodgepodges of history, legend and fantasy. The

main emphasis was on production of colourful spectacles that would allow the poor Indians to forget their daily woes for a while.[iv] The ridiculous level to which such shallow efforts could reach was exemplified by the film *Dharam Veer*, in which Dharmendra, Jeetendra and ZeenatAman ran amock in gaudy costumes which curiously combined Greek, Islamic and British styles. Even in more serious ventures fiction was given precedence over fact. In *Kranti*, even a sensible thespian like Manoj Kumar took recourse to such a strategy. There the British soldiers were shown, stationed in a sail-ship, on the deck of which, prisoners Manoj Kumar and HemaMaliniperformed a memorable song sequence. However, the locale of the film was Central India in 1875. The area is far away from the coasts of India where such vessels could be stationed. Also the rebels could escape quickly to their hide outs from the ship.[v] This is geographically impossible. Actually Manoj Kumar was exploiting the popular identification of the British with ships.Such movies are basically not situated in any particular era, but in the notion of a crystallized past, a realm far away from our everyday mundane lives. A recent addition to this fantastic genre is Salman Khan starrer*Veer*.In this movie, a number of elements from colonial India, such as military officialdom, princely lifestyle, Pindari dacoits, flamboyant Indo-Western dresses and importance of English education, have been curiously combined to present a multi-hued canvas.

Since most of the Indians are not inclined to appreciate scholarly history on screen, influential forces in our country have sought to manipulate history in films, presumably for public good. Under the thin veil of the past, current day socio-political messages are presented to the people. In the late colonial era film makers like DadasahebPhalke,in the garb of myth and history, spread nationalism among the masses. Dadasaheb was aware of the potential of cinema to reach the most plebian audiences in far flung areas. He created a *swadeshi* genre of movies i.e. movies shot by a fully Indian company (owned by himself), financed by indigenous traders, created by Indian artistes and technicians and inspired by native literary traditions. This trait became particularly relevant after the independence.[vi] Then the newly formed nation state

tried to legitimize its position in the eyes of the voting public. At the same time, other competing political ideologies were also trying to make their presence felt. The Indian govt. did not take too kindly to films. However the leaders were aware of the propaganda potential of this medium. It seemed that the makers of modern India were inspired by the Mahabharata ideal of utilizing history to teach moral lessons. The film producers too, tried to be in the good books of the politicians, as they wanted 'industry' status for the filmdom. As a result, a number of movies on the Mughal Emperors were produced in the 1950s and early 1960s, especially on Akbar and Shah Jahan. Akbar, particularly, was portrayed as a benevolent patriarch who maintained a cordial relationship between all communities. Mughal courts were presented grandly and elaborate court rituals were showed minutely. Possibly this was done to support the official bureaucratic nature of the Nehruvian state. The classic example of this school of films was *Mughal EAzam* of K.Asif, where the grand old man of Bollywood Cinema, PrithvirajKapoor, played the role of patriarchal Akbar.[vii] However, films which preached too much of high political ideals, were not successes in the box office. *Samrat Asoka*, based on the career of Nehru's historical hero, the third Mauryan Emperor, proved this point. Another mega budget historical picture, *Sikander E Azam*, promoted supposedly age-old Indian traditions of non-aggression, tolerance and fair play. Here Porus, once again played by PrithvirajKapoor, in a lengthy speech defended Indian values before Alexander or Sikander, who championed European aggression. Even more anachronistically, the sons of Porus are seen singing a song in praise of the glories of a united India. Ambhi, the king of Taxila, who helped Alexander, is viewed here as a traitor to his nation. In reality, both Porus and Ambhi were local rulers, who simply had no sense of a pan Indian nation. Even an epic like Richard Attenborough's *Gandhi*, supported by the Indian govt, cannot avoid the charge of presenting lop-sided history. In this film narrative, Rabindranath Tagore and NetajiSubhash Bose found no place, while the limelight was focused on Nehru, Patel and Gokhale. All the complexities and blunders of Gandhi's life were ignored and he was extolled to the position of a saint.

Over the last two decades, rightist aggressive nationalism is becoming relevant in Indian society. This process is leaving its mark on film production too. In *Padmavat*, *Rawal*Ratan Singh proudly advertised Rajput valour by saying one who keeps on fighting, even after his head being cut off, was a true Rajput. In the recently released *Manikarnika*, the Rani of Jhansi (portrayed by KanganaRanawat) talked of liberating the entire nation from the British by military means. A few years ago, in *MangalPandey*, the protagonist (depicted by Aamir Khan) expressed his desire to establish people's rule once the British were overthrown by the rebels. This emphasis on militarism and strongly centralized nationhood is something new in Indian cinema. A number of films, displaying the adventurism of the Indian army, have also been produced in the recent years such as *Border, LOC Kargil* and *Uri*. History, here, is certainly being distorted for propaganda purposes as the Rani of Jhansi and MangalPandey simply had no sense of a broad nationalism or democracy.

The *biopics* depicting the lives of freedom fighters and political leaders too suffer from this defect often. The heroes or heroines are portrayed in larger- than- life fashion, thereby provoking polarized reactions. The production quality also is rather unsatisfactory, in most cases. The tendency to deify human characters is an old one in Indian cinema. This probably started with the *sant* films or pictures depicting the lives of regional saints or devotees, especially from the medieval age. There are a few exceptions of course, such as *Bose: the Forgotten Hero* directed by ShyamBenegal. This movie delineates the career of Subhash Bose in an objective but cordial manner. Owing to an adequate budget, the battle scenes and political agitations could be effectively shown.*The Legend of Bhagat Singh*, featuring Ajay Devgan, too deserves a mention on this count.However, Western blockbuster biopics still are far ahead in terms of factual research and efficient production. In films like *Lincoln, JFK* and *The Motorcycle Diaries* the central characters are portrayed in realistic, low key fashion. The directors methodically assembled large amount of pure facts and left the final judgement to the audience.[viii] The films appear to be smart and concise. Possibly, being apprehensive of emotional outbursts from the less enlightened crowds and intervention

from an over-sensitive censor board, our directors cannot be as realistic as their Western counterparts. Some biopics, though, focusing on non-political personages, are much better produced. The directors, in such cases, are generally not under pressure from socio-political forces and can perform with free minds. Two films, based on sports persons' careers, *BhaagMilkhaBhaag* and *Paan Singh Tomar* are really noteworthy. The first one traces the rise of Milkha Singh (portrayed by FarhanAkhtar) from an orphan refugee to an international sports icon. From a wayward criminal he emerged as an internationallypresentable human being. Here Milkha can be viewed as a symbol of the new emerging Indian nation which recovered from the horrors of partition to become a globally respected state. In contrast, the second movie, described the descent of PaanSingh(Irrfan Khan in the film) from the height of sporting glory to the abyss of crime. He was a national champion athlete. But grinding poverty and lack of support from his countrymen, forced him to give up his promising sporting career and become a bandit in the Chambal valley. In the end, instead of achieving fresh triumphs in the field, he was shot down by the police in an encounter. In this film, the social deprivation and inequality that continued to persist in India, decades after the independence , is brought forward.

The woes of the neglected sections of the Indian society were showed more tellingly earlier in the ShekharKapoor film, *The Bandit Queen*. Here an innocent Dalit girl, Phulan is exploited most abominably right from her childhood by the men folk, just for being low caste and poor. Ultimately she is forced to become a murderer bandit. Here the double-edged exploitation practiced in Indian society is exposed dispassionately. Phulan was ill-treated on two counts, for being a girl and a lowly placed destitute. SeemaBiswas attained iconic status for successfully portraying the role of Phulan Devi. The film which displayed another facet of Indian womanhood was *Neerja*. Here SonamKapoor played the role of an airhostess who calmly confronted a group of hijackers and at last gave up her life to save the passengers. In this case NeerjaBhanot represented the upcoming educated young Indian women of the globalisedgeneration, who were confident of taking on the world.

One more film, *Mary Kom*, concerned with a female sporting icon, made a similar statement. Here the potential of the people of the more obscure regions in India like Manipur is highlighted. If given proper opportunity and respect, members of any gender, coming from anywhere can flourish on the world stage. This is the message given in the picture.

Undoubtedly, historical and biographical movies inspire and entertain us. They do not provide a substitute for academic history and are often ‘faithful in spirit’ rather than true to hard facts. Still, they teach us important truths about the human condition. The visual impact of these movies on the public can hardly be denied. For many, film remains the only medium through which they access history. Numerous scholars acknowledge that movies first got them interested in history. Gore Vidal even boldly suggested that school going children should be introduced to history through films rather than books[ix]. Keeping this crucial role of motion pictures in mind, Indian film fraternity should pay more attention to historical authenticity than to propaganda and hero-worshipping (in case of biopics). Time has to be telescoped in films, issues and motives must be simplified and events have to be omitted sometimes. But while making cinemas, the directors should leave sufficient room for the ambiguity and inconsistency that are inevitable in human conditions. Then only, movies’ unique capacity for stimulating dialogue about the past can be truly fruitful.

End Notes:

---

1. Firoze Rangoonwalla, *A Pictorial History of Indian Cinema* (London 1979) chapter 3 p 28.
2. Ted Mico et al ed. *Past Imperfect : History According to the Movies* (New York, 1996)
3. For more information, see my article in *EiSamai*(Times of India group) newspaper, dated 14th November, 2017, page 6
4. Rangoonwalla, *Ibid*

5. Michel Woods, film historian, noted the Indian movie makers' capacity to romanticize almost any human situation, by introducing song, dance and playful gestures.
6. Ashish Rajadhyaksha*, Indian Cinema : A Very Short Introduction* (Oxford, 2016), p-16-19
7. Urvi Mukhopadhyay, *The 'Medieval' in Film* (Hyderabad 2013), chapter 5
8. The Times of India, Calcutta Times section, dated 16.1.2019 , page 6.
9. Ted Mico et al ed. *Ibid*, Introduction

Introspecting the Relation between Ethics and Politics: Key Concerns and Future Ahead

Kunal Debnath
Assistant Professor
Department of Political Science
Rabindra Bharati University
&
Souvik Chatterjee
Junior Research Fellow
Department of Politics and International Relations
Central University of Jharkhand

Abstract : *Politics as an essential human activity generally tends to separate ethical considerations from political action. Politics is associated with power and it is a means for resolution of conflicts within society. As a process politics focuses on maintaining social cohesion and social integration yet politicians and statesmen often engage in activities that do not fit well into the common moral standard of the society. On the other hand, ethics is a domain of pure principles ruled by moral imperatives. Ethics as a collective endeavor focuses on how society should progress in a moral direction. So in prima facie the relationship between ethics and politics may seem conflictual and contrasting one. So this study will try to deal with this fundamental question that whether ethics in politics is a myth or a reality. Additionally, it will also introspect that how ethical principles that govern politics are different from those that govern moral life more generally. In conclusion, this study reaffirms the belief that politics and ethics are not incompatible with one another because of differences between ends or means, rather this distinction occurs due to the moral values associated with politics and ethics.*

Keywords: *Politics, power, conflict resolution, ethics, morality.*

Introduction

The relationship between politics and ethics is complex and problematic one. Generally, politics and ethics are seen as an antithetical to one another. Amidst various understandings of politics, the notion of politics is greatly associated with power and as a mean for resolution of conflicts within society (Ball, 1988, p. 25). So to maintain social cohesion and for the promotion of social integration, politicians and statesmen often engage in activities that do not fit well into the common moral standard of the society. On the other hand, ethics is a domain of pure principles ruled by moral imperatives (Thompson, 1987, p. 1). Ethics as a collective endeavor focuses on how society should progress in a moral direction. Though it is highly normative in nature concerned with norms, values of society. Ethics also introspects in mitigating practical problems of society. Ethics takes into account both the ends and means of how societal problems should be addressed and what should be the best possible means to achieve societal goals conveniently. It often assumes that the ethical principles arehighly subjective and universal in nature. It tries to understand the societal problems in a uniform way, i.e. every society, regardless of its own complexity, faces certain problems that are universal in nature and requires urgent solutions. Thus ethics as a system of values prescribes the avenues that can resolve pertinent societal issues. Politics, on the other hand, is highly subjective in nature and political laws are incompatible with the idea of universality. Politics tries to redress various societal problems while taking into consideration of the various cleavages that exist within society. Politics never claims to provide ultimate or final solution to the societal issues. It only interprets societal issues and prescribes what can be done within a specific context. So in *prima facie* the relationship between ethics and politics may seem conflictual and contrasting. And historically this separation between ethics and politics is reinforced time and time again. Political realists argue that ethics and politics are incomparable with one another. For the

realists, politics is an active pursuit of power and nation-states are engaged with constant struggle with one another to maximize their security in the anarchic world order. So if politicians and statesmen are to be effective in this anarchic system. They cannot be bound by some abstract ethical principles that would constrain this pursuit. Political realists reject ethical principles as it constrains nations from the pursuit of power. For instance, Machiavelli with his classical doctrine of *raison d'état* endorsed separation of 'the political' from the domain of religion and morality followed by Hobbes, Marx and many others (Pfostl, 2016). So several important questions will be debated throughout this study and at the same time we will try to understand how best they should be addressed upon. We will try to understand and analyse whether it is possible for politics both as an activity and discipline to remain aloof from the ethical considerations and what is the significance of ethics in the political discourse.

Locating politics between ethics and power?

The meaning and nature of politics have been changed over the time right from the ancient Greek period where politics was related to ensuring good life within a political framework to present meaning of politics as an exercise of power and also resistance in response to power exercised. Politics can be defined in at least two senses. In a narrower sense, politics is related to government and 'what governments do'. Secondly, in a broader sense, politics is related with power – an individual or a group of individuals exercise power over the others despite the latter's resistances. The second sense has been a part of social relationships such as caste, class, occupational, religious, cultural, etc. (Tansey & Jackson, 2008, p. 3). Notwithstanding many definitions we can draw another meaning of politics that is resolution of human conflicts over the various social issues by authoritative decisions. These three senses are linked with ethics. The government must do its functions ethically, it is desirable and particularly for this reason governments get legitimation of the people. Sometimes, it

is hard to determine the conflicting human actions that which one is right or whose ethical or moral viewpoint has a strong argument to be allowed by the others. Everyone is right from their ethical point of view. But question remains how one's exercise of power over another is to be justified. In response to the third meaning one question may arise that why human conflicts generate? If everyone is guided by their societal ethics then there would not be any scope for social conflicts. Yet, human society produces social conflicts out of diversified ethical and moral leanings of human beings. Political science examines particular illustrations of morally and ethically just conduct. But due to variety of behaviour, attitudinal differences regarding what is morally just, it is an impossible task to separate between what is just and unjust. In politics, like medical science, engineering science, the people need to be experienced, mature to determine what is good, by being self-critic. Thus, "the end of political science, then, is the highest of all practical goods attainable by our actions" (Coleman, 2000, p. 151).

Dominant paradigm

The first paradigm of political studies dates back to the ancient Greek period and usually referred to as political philosophy based on ethical and normative questions. Political philosophers such as Plato and Aristotle's works were the philosophical enquiry of 'what should be' or 'what ought to be' regarded as 'good' life or 'ideal' society rather than 'what is'. For the traditionalists the questions of 'what society is to be regarded as just society?', 'why democracy is the best form of government?', 'why should we obey the state?' were primary concerns in analysing politics metaphysically. The role of ethics was fundamental in political philosophy even in practical senses, not merely in theoretical senses. Ethics, for Aristotle, argues Coleman (2000), is practical than that of theoretical, it aims to good living. Politics aims to good of an entire community. Another branch of traditional enquiry was concerned with

the study of the state institutions such as legislative bodies, administrative parts, and judicial organs.

Since the nineteenth century onwards the study of politics has been shifted from traditional normativism to contemporary empiricism towards the human behaviour with avoiding of the values, norms, and ethical enquiry in studying politics. The theoretical innovations such as positivism, logical positivism, linguistic philosophy, replaced the metaphysical analyses of politics and these innovations laid emphasis on the study of phenomenon based on 'what is' rather than that of ethical enquiry 'what ought to be'. Another shift was also visible that from political philosophy to political science. Due to the absence of ethical enquiry this phase is better known as the phase of 'normative aridity'.

After questions raised on the validity of the behaviouralism, a phase came into being that is 'rational choice theory' with an intention to analyse politics linked with political economy. The Virginia School of US articulated this 'formal political theory' emphasises on 'the rationally self-interested behaviour of the individuals involved' such as actions of voters, lobbyists, bureaucrats and politicians, as well as into the behaviour of states within the international system (Heywood, 2013, p. 15).

Another strong paradigm is the feminist perspective of politics that seems to have been a result of patriarchal leanings of politics and society based essentially on power discourse where women are excluded from the power structure dominated by men or patriarchy. Feminism wants to change conventional exercise of power by emancipation of women from patriarchal power discourse.

Marxism offers a strong substitute to mainstream political science approaches by adopting 'materialist conception of history' to interpret the rhythm of capitalism and its exploitative nature. Undeniably, Karl Marx was the first theorist who made an effort to interpret politics scientifically. For the Marxians, politics lies on the activity of

exploitations of the browbeaten class by the economically privileged class, and state plays a role of an instrument of the latter.

Politics and ethics: An inseparable relation

Right from its inception, politics as an activity as well as a discipline of social sciences have been aroused and affected by the ethical questions. Although every other branch of social sciences that systematically study society confronted by moral and ethical dilemmas, the question of ethics and morality become predominant in politics as it directly deals with the distribution of power. Historically the relationship between ethics and politics is complex and diverse one (Bobbio & Bertelsen, 1998, p. 13). Complexity arises as there is no best way to resolve this dilemma. At the same time diverse approaches and paradigms of politics try to understand this relationship all together from different understandings. Before understanding the bi-directional relationship between ethics and politics, it remains imperative to understand the historical connotations and confrontations between the two. Human being as a social animal is always molded by system of moral values that encompasses within the social institutions itself. The ancient Greek philosophers were the first who directly dealt with the ethical issues while understanding the notion of the political. Both Plato's and Aristotle's study of society and politics were concerned how to lead a good life and for them it is only possible if political power has a strong moral and political foundations. Human beings are the best animal creature in this world not only because they possess reason but they are naturally endowed with power to separate what is good and bad. It is often assumed that politics as a practical discourse, as it tries to analyse 'authoritative allocation of values' within the society based on reality, is incompatible with ethics that is highly normative and abstract in nature. Realism argues that politicians and policymakers have their own system of values (promotion, protection and further enhancement of national interest) that cannot be equated with the common moral values. The dichotomy between politics and ethics

becomes intensified as well as problematic when ethics is equated with theological belief. The erroneous assumption to link ethics as something out worldly based on some divine commands makes it a complex relationship. It is true that ethics as a set of values and norms is highly normative in nature but practical ethics tries to make a bridge between theory and practice. Practical ethics tries to get into the core of a conflict; critically analysis and elaborate it with its strong moral principles and tries to provide practical solutions using both moral reasoning as well as moral perception. Politics as a discipline not only focuses on distribution of political power within society, but it tries to understand the factors as well as whether this distribution is just or unjust. Political power unlike other forms of power is supreme, because it enjoys legitimacy of citizens at the same time it embodies values, norms and beliefs, ethics of the society at a given time (Grcic, 2000, p. 2). Similarly, politics under the influence of positivism and behavioural revolution tends to focus more on scientific understanding and analyse of political reality thus avoids the ethical as well as value laden considerations. But this empirical understanding of politics is flawed as the subject matters or the contents of politics like power, authority, legitimacy, social integration etc. all are highly subjective in nature grounded on ethical principles. Most of the works that try to understand the inter-relationship between politics and ethics generally come into two different and contrasting understandings. One is to reducing politics to morality; another is morality and politics remain independent of one another. But both of these approaches are short sighted as it fail to understand the correlation between the two. Political ethics in this context can play a substantial role to overcome this dilemma. Political ethics looks at the political process as well as political institutions from ethical point of view and draw moral judgements about it. The question of political ethics emerges due to the antagonistic nature of politics and ethics. Ethics as a system of moral values are universal in nature emphasises on universal applicability of moral principles

regardless of socio-political surrounding. On the other hand, politics as a process for arriving at common end cannot ignore its socio-cultural context that heavily influence the political process. Though there is no general agreement on how best to solve this incompatibility between ethics and politics. Bobbio and Bertelsen's definition of political ethics is best suited in this aspect. "Political ethics are the ethics of those who conduct political activity, but political activity, in the notion of those who breach the subject on the grounds of professional ethics, is not power as such, but the power to reach an end that is the common good, collective or general interest. It is not government, but good government. One of the traditional criterion constantly taken up again to distinguish good government from bad is precisely the evaluation of whether or not that specific end was reached: good government seeks common good, bad government seeks personal good" (Bobbio & Bertelsen, 1998, p. 39).

Concluding observations

Now it remains open for debate and discussion that what is the best way to resolve the conflictual relationship between ethics and politics. To put it in simple words that there is not a single technique by which this dilemma can be overcome. Historically and conceptually the relationship between ethics and politics is a complex one and interpreted very differently by the different scholars in different ages. But the understanding that politics which belongs to public sphere and tries to understand power dimension of society by accessing real world, while ethics as a field of moral philosophy belongs to the private sphere is essentially misguided one. It is true that ethics is guided by certain abstract understandings and moral principles but it is equally important to understand that ethics upholds the moral fabric of society. If politics detach from ethics, its consequences would be extremely destructive. In modern days politics there are several crises ongoing and yet political analysts do not have definitive answers. Incompatibility and inability to link politics with ethics is one of the primary reason behind this. So what

should be done in this aspect? How best we can reconcile between politics and ethics? In this aspect Bobbio and Bertelsen's argument is quite thought-provoking "seeking power for power to transform a means, which as much be judged by the face of the end, into an end in itself. Even for those who see an instrumental action in the political action, it is not an instrument for simply any end it pleases the politician to attain. But once the distinction is established between a good and a bad end, a distinction that has never failed to be made by any theory on the relation between morals and politics, it becomes unavoidable to distinguish between good and bad political action, otherwise aid, to subject it to moral judgement" (Bobbio & Bertelsen, 1998, p. 40). Another way to reinforce the mutually constitutive relationship between ethics and politics is to situate and reinterpret the role of political theory. Political theory makes a systematic and rational attempt to evaluate political power and institutions of government while remain subjective to ethical issues. It is only within broad construct of political theory, which combines both normative and empirical issues, the ethical questions can be properly dealt with. Because political theory does not only prescribe what should be the future course of actions but it also critically analyses current problems of society also from ethical point of view, whether any political actions are good or bad for society, whether political institutions and governments are just or not. So in short political theory acts as an important link to overcome the conflictual relationship between ethics and politics.

References :

1. Ball, A. R. (1988). *Modern Politics and Government* (4th ed.). London : Palgrave Macmillan.
2. Bobbio, N., & Bertelsen, M. (1998). Ethics and Politics. *Diogenes, 46/2*(182), 13-42.

3. Coleman, J. (2000). *A History of Political Thought: From Ancient Greece to Early Christianity*. Oxford: Blackwell.
4. Grcic, J. (2000). *Ethics and Political Theory*. Maryland: University Press of America.
5. Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
6. Pfostl, E. (Ed.). (2016). *Between Ethics and Politics: New Essays on Gandhi*. New Delhi: Routledge.
7. Tansey, S. D., & Jackson, N. (2008). *Politics: The Basics* (4th ed.). Oxon: Routledge.
8. Thompson, D. F. (1987). *Political Ethics and Public Office*. Massachusetts: Harvard University Press.

Significance of the Basics: Charlie Chaplin and the Culinary World

Ajanta Biswas
Associate. Professor, Department of History.
Rabindra Bharati University.
. Ritaja Mukherjee
Department of Comparative of Literature
Jadavpur University

Food is an integral part when it comes to Charlie Chaplin's films. Chaplin is a name that no one is unfamiliar with. His impish little gentleman character "the tramp", has associated itself with several food episodes which narrate a different kind of cultural identity. This idea of identity is very tricky while comprehending, for identity is partly what one hopes to create and partly what is imposed upon one. Chaplin's character "the tramp" displays this concept in different social situations with perfection. Especially through his dealings with culinary arts, he presented how the food at different layers of society define the identity of a person. A gentleman's table manners become an irony when there is a severe crisis of food, and Chaplin with different gestures from "the tramp" addresses this issue in a very detailed manner.

The use of food satirically is common in Chaplin's films. Especially in two of his very famous movies *'The Modern Times'* and *'The Gold Rush'* the use of culinary art has a very significant role to play both historically as well as for the structure and flow of the narrative. It is said that particularly while working on the film *" The Gold Rush ",* Chaplin was inspired by very old photographs of prospectors ascending the Chilkoot Pass while the Alaskan Gold Rush was going on and some photographs from the Donner Party tragedy. The history of mankind has been shaped majorly by the fact that what a living being does in life comes down to the fact that it survives on food. We live to eat and eat to

live. The desperation of hunger is a recurring theme in history, yet Chaplin's mastermind made this kind of a scenario into a comic scene and perfectly conveyed his message. The art of presenting the raw and hostile truth through soul-piercing humour is what Chaplin marvelled at. Caught up amidst heavy snow, stranded in a cabin in the middle of nowhere without any food as shown in '*The Gold Rush'* (1925) 'the Tramp prepares a proper 'Thanksgiving Dinner '[1]. Without food the men are crazy, they fight like savages, even cannibalism is considered, such is the desperation. Meanwhile, our Tramp cooks one of his boots like a gourmet chef and serves it as the main course, the regular abundance of food in Thanksgiving Dinners, is reduced to a non-edible item. Whereas he twirls the bootlaces and consumes them as if they are spaghetti, and dines on the sole of the boot with his table manners intact.

Eating shoe in *The Gold Rush*[A]

Two things are extremely noteworthy in this film. Firstly, the Tramp doesn't look well equipped for the freezing weather compared to the other characters shown in the film, losing a boot in such weather is not trivial, for the cold could kill him. Secondly, even in such a situation, the Tramp

doesn't lose compassion, his partner Big Jim is aggressive yet he gives the apparent better portion of the boot to him as dinner. On the other hand, hunger drives his partner crazy, he hallucinates the Tramp as a live chicken and tries to shoot him.[2] Later on, he continues with rags wrapped around his foot that lost the shoe and goes out in the snow, had he done otherwise the hunger would kill him, existence altogether is at great risk. "In this, Chaplin was right on the mark, miners were forever hungry, and they wrote constantly about food, craving it, buying it, cooking it and eating it. As Charlie Chaplin must have surmised in portraying Thanksgiving and New Year's meals in his film, food became a particularly intense topic at holidays. For these special meals, miners made extra efforts to recreate traditional, festive menus with whatever they had on hand."[3] writes Kathryn Taylor Morse. The ending too is sweet, after gaining all such riches the Tramp meets Georgia in his old clothes and a single boot.

Now it is important to understand how the use of culinary art in this particular masterpiece has left a milestone in the history of mankind. To understand the purpose of this discussed comparison it is very crucial to understand the history of the abundance of food and the absence of it. Homo *sapiens* are animals, like all other creatures they thrive on food at the end of the day, primitive man hunted for his food. Cannibalism too used to be a common practice in many cultural groups as observed by notable historians. Hence, the question that arises at this point is, what distinguishes "man" from all other animals? It is the extraordinary compassion that is traced in man that distinguishes him from all other species. Chaplin movies present a clear example of our claim. The "Humanity" as an idea is highly promoted in these works and it is the never-dying spirit of humanity that is being displayed by the character of Chaplin, bringing the crisis down to food. Also, it is very important to mention the hollowness of the idea of conducting oneself in a particular manner. The idea of having table manners where the lack of food is

leading to fatal consequences is the larger picture the narrator is pointing at. On the other hand, culinary arts is very well presented in ‘The Modern Times’ (1936) showing the rise of ‘man-eating machines’, foraging for food and the rise of materialism. Chaplin said while working on *Modern Times* “Machinery should benefit mankind. It should not spell tragedy, or throw it out of work.” A scene in this movie shows a factory worker being used as a tester of a mechanical feeder. The machine that would feed man his food, wipe his mouth, as if the mechanical table manners were not enough and now this gadget is invented to take these mannerisms to perfection. The human touch is lost, hence the machine doesn't differentiate between the food and iron weights, later gets into complete force-feeding. “Don’t stop for lunch. Be ahead of the competitors!”

‘Charlie Chaplin: The Art of the Meal’ says, “The Little Tramp becomes the poster boy for the dehumanization of the worker as we see him struggle to survive the modern, industrialized world. That is, according to Chaplin who takes the point to the extreme when the powers that be in a factory choose the Tramp as the guinea pig for a new feeding machine that will save them time and money. The contraption is robotic with the different courses of the meal laid out to be fed to the worker who is strapped in. At first, everything worked smoothly. The tray lifts, food is delivered into the Tramp’s mouth and an automatic mouth wiper follows. The action repeats and even includes the buttering of corn cob, but before long sparks start flying and the poor Tramp is assaulted by hot soup, iron bolts and flying corn. Chaplin makes his point, albeit in an ever-entertaining way, and the process manages to disrupt the perfectly timed mechanism of an entire factory to parody the assembly line created by Ford in 1913, which also happened to be used regularly by movie studios. It is by way of a meal that Chaplin shows that there is little sense in total automation, that the individual worker has the value that cannot be replaced.” [4]

Feeding machine from *Modern times*

Man’s losing grip over the machine can lead to a disaster and this scene is the perfect specimen. While the workers outside are robbing stores for food, children are stealing, unable to bear hunger pangs, the capitalist class are preparing to spare themselves from even the efforts of eating food by themselves, much like Queen Marie Antoinette's suggestion to eat cake for those who could not even afford bread. Chaplin presents the irony as such a labourer is used as the lab rat for the machine, one who doesn't get a full meal a day is being fed through this machine that feeds delicacies. How the French revolution shaped up and how much the lack of food at the ground level and the waste of food in the royal parties played a pivotal role is not unknown to people. The dehumanization of the queen is striking through this story. Surprisingly, how this machine would serve the poor was more interesting in this Chaplin movie, the labourers would continue working while this machine could feed them, saving the lunch break times, increasing productivity. Later on, the Tramp plays tricks to get into the prison to ensure daily meals, this shows how desperate one can be when hunger strikes! Evils of extreme industrialization are at full display. Gamin’s food theft points out the ugly truth of the society, Chaplin saves him gallantly, and also as a ploy to return to jail, food is such a crisis. It brings out the real face of the

society when the lack of food is bringing such abysmal change in the social order where man is committing the crime to get imprisoned, for that will ensure a bare minimum meal, which is a basic right of any being living and breathing under the sun. Also as the watchman of the departmental store, Chaplin, secretly lets Gamin into the store, as a secret entrance to the world of abundance, where he meets his ex-colleagues too, now turned into robbers due to the pangs of hunger.

Gamin in the store from *Modern Times.*[C]

Food and its crisis here in Chaplin's movies show how culinary arts seek the identity of a person and identity is not always neutral. The identity of the man and his position in society is shown by the food he consumes, and how he consumes it. Chaplin's art of the meal is one of his main strategies to define the state of a man in the social situation, and the introduction of food makes an abundance of food and desperation in hunger presented more clearly. These food-related scenes are very memorable from all of his movies. Chaplin's early life probably served as his rohstoff for his works later on and it turned out to be so close to the reality. He had seen immense crises in early life, lack of food, and lavish contrasting life of the capitalists. This quest for identity through culinary arts is perfectly presented in Charlie Chaplin movies.

The main reason why the movies of Chaplin are being recalled in the dire times when the world is suffering due to the pandemic for almost two years now is because of its treatment of the world's crisis periods. Chaplin films through humour deals with grief, fatal problems in a manner which it hits the minds of the audience and brings out the reactions from the very core. The pandemic is showing such gruesome sites to the human race currently that they did not witness ever in the recallable past. Food is playing a pivotal role as well, in case of quarantines or lockdown availability of common food items, supplies have all been disrupted. It will be fair to state that the entire idea and dynamics of the culinary world has altered prominently. The lockdown has prompted people to be more self-dependent when it came to food, more and more people learnt to cook for themselves. Not only people learnt how to make daily food, savoury items too were being made at home, items which we previously expected to get only in restaurants in the pre-pandemic world. We have witnessed how the migrant workers walked miles barefoot under scorching heat to return to their homelands, and how scarcity of basic hygiene, food and water led to a loss of valuable lives. In contrast to these situations, we have also seen how the fear of sudden lockdown led to hoarding unnecessary amounts of food items by people. Numerous small and large scale businesses that depended upon the culinary world crashed down. Eating out in restaurants have been entirely replaced by home delivery. It is needless to say the entire system of the culinary world has gone through a major alteration, and some of these changes are irrevocable, be it for better or for worse. This global crisis once again urges us to look back into the past and learn. It is time to learn how the undying spirit of humanity thrived through the toughest of times. Major world events changed the course of life previously, and currently the world is going through another such significant change. The impact that the events leave on the culinary practices, capture the timeframe and situation of a particular era in the

tradition it creates. Later when academicians will study about these major shifts in food habits in the post pandemic world, these practices we are now developing will pour out stories and information about what we are witnessing right now. Since the Chaplin movies have always treated the gruesome reality with the vaccine of humour, re-watching and picking up important lessons from these films can help us. It is also a great way in which the human race can be reminded of the fact that it is time to humble down for we are mere animals naturally dependent upon food and the environment for survival. Just like time stops for no one, history does not ever halt creating itself. Especially, the time that we are going through is changing our known world forever. Survival much like the primitive times have become the basic priority, and food and hunger are naturally entangled to the mere idea of survival. Food in itself is a language, and it captures tons of stories in itself. Through this analysis, we hope to draw the attention of our esteemed readers to the fact that it is time to recognize our priorities, which is survival and not take what once was easily available, for granted. Currently, all that we can look forward to each day is the hope to witness the sun rise the day after and food for the stomach is mandatory for food for thought can wait, because Martha Char Love said and we quote, " If your eyes cannot cry, then your gut will."

References

1. Gary, Golio, *How Young Charlie Chaplin Taught The World To Laugh (and Cry),* Candlewick Press, U.S, 2000
2. https://youtu.be/nt-_DXC-aik
3. Morse, Kathryn Taylor, *The nature of Gold: An Environmental History of the Klondike Gold Rush.* University of Washington Press, 15th December 2009
4. A-https://images.app.goo.gl/UdLzi1QZXiPfpWAX9
5. B-https://images.app.goo.gl/FFF9KBFAASAs9kzau7

6. C-https://images.app.goo.gl/Mg1huXtKEikWxwhK8
7. Haven, Lisa Stein, *Charlie Chaplin...His Recipes!* Charlie Chaplin, 2018
8. Chaplin, Charles, *My Autobiography,* Penguin Books Ltd. 2003
9. Rhodes, Jesse, *Food in the Films of Charlie Chaplin,* Smithsonian Magazine, 23rd February 2011
10. Love, Martha Char, Sterling, Robert W, *What's Behind Your Belly Button? A Psychological Perspective of the Intelligence of Human Nature and Gut Instinct,* Createspace Independent Publishers, 8th November, 2011

Study on Personality Profile of Selected Girl Students

Amit Dey
Guest Lecturer, Rishi Arobindo College of Education
Susanta Sarkar
Associate professor,
Department of Physical Education, University of Kalyani

Abstract:

Psychologically speaking, personality is all that a person is and also it is includes all the behavior patterns of a person. A personality characterized as good or bad, poor or magnificent, below average, above average or balance average, weak or strong, extrovert or introvert, social or unsocial, normal or abnormal is the result and outcome of determinants. The purpose of this study was to find out the status of personality profile. The total 35 students were selected as subjects from the various colleges, West Bengal, India. The purposive sampling technique was used to collect data through 16 PF Questionnaire, 1993. There were age ranging from 18 to 25 years who are actively not participated in daily physical activity. Mean and SD were used to described the personality profile in this study. The mean and SD value of 16 personality factors was ***A-*** *6.20±1.97,* ***B****- 5.37±1.87,* ***C****-6.34±2.03,* ***E****-5.26±1.74,* ***F****-5.71±2.26,* ***G****-7.03±1.27,* ***H****-4.66±1.75,* ***I****-6.94±2.13,* ***L****-6.20±2.04,* ***M****-6.14±1.78,* ***N****-7.14±1.68,* ***O****-6.46±1.84,* Q_1*-5.80±1.59,* Q_2*-6.06±1.75,* Q_3*-7.49±1.80 and* Q_4*-5.77±2.07.In this study five factors were above average personality, one factor was below average and ten factors were balance personality.*

Key Words: *Personality, Physical Activity etc.*

1. INTRODUCTION

Personality is a most important dimension in human psychology. Actually personality is all about behavior pattern of a person. It includes

everything, like physical, emotional, social, mental and spiritual make-up. Sometimes, we use personality as equivalent to one's character. This too is a wrong notion. Character is , by all means, a moral or ethical term which refers to the standards of right and wrong, whereas personality is purely a psychological term and hence it is not proper to use it in reference to the study of ethical values. Moreover, every personality is the product of heredity and environment. Both these contribute significantly towards the development of the children's personality. A child is not born with personality but develops one as a result of continuous interaction with his environment.

Personality is something unique and specific. Every one of use is a unique person in oneself. Every one of us has specific characteristics for making adjustments. The 16 basic or source trait dimensions were named as factors. R.B.Cattell regarded these factores as the building blocks of personality, i.e, the characteristics in terms of which one's personality can be described and measured. These 16 basic trait dimensions or factors are Reserved-Outgoing, Reasoning, Emotional stability, Dominance, Liveliness, Rule-consciousness, Social boldness, Sensitivity, Vigilance, Abstractedness, Privateness, Apprehension, Openness to change, Self-reliance, Perfectionism and Tension.

Objective of the study

The objective of this study was to find out the status of personality profile on general girls students.

2. METHODOLOGY

Selection of the sample: For accomplish the study a total 35 general female students were selected as sample from the Training college in west Bengal. The age of the sample taken from the population was ranged from 18 to 25 years. The sample was selected randomly.

Collection of data: The data was collected on the selected subjects by admitting the appropriate test before collection of data. The data were

collected by using standard personality questionnaire. In this study, the data was collected by using Cattell's 16 PF questionnaires.

This questionnaire is consist 105 question. Each question have three option to give answer which are measured the personality. It constructed by Cattell (1993). This questionnaire is measured some personality traits it is dividing the human personality into 16 factors - Reserved-Outgoing (A), Reasoning (B), Emotional stability (C), Dominance (E), Liveliness (F), Rule-consciousness (G), Social boldness (H), Sensitivity (I), Vigilance (L), Abstractedness (M), Privateness (N), Apprehension (O), Openness to change (Q_1), Self-reliance (Q_2), Perfectionism (Q_3) and Tension (Q_4). After collect the questionnaire, the raw score were converted into standard score by using norms. A factors was consist 6 items, B – 8 items, C to Q_4 - 6 items.

Statistical Procedure: To analyze the standard score of the data Mean and SD were used in this study.

3. RESULTS

The statistical analysis and interpretation was done on the basis of data collection. The data was analyzed and interpreted by using Mean and SD. The statistical result of the general girl students has shown in the following tables.

Table 1: Statistical Presentation of Reserved-Outgoing (A), Reasoning (B), Emotional (C) and Dominance (E)

	A	B	C	E
MEAN	6.20	5.37	6.34	5.26
SD	1.97	1.86	2.03	1.74

Table no 1 shows that the mean and SD value of Reserved-Outgoing (A), Reasoning (B), Emotional (C) and Dominance (E) were 6.20 ± 1.97, 5.37 ± 1.86, 6.34 ± 2.03 and 5.26 ± 1.74

Table 2: Statistical Presentation of Liveliness (F), Rule-consciousness (G), Social Boldness (H) and Sensitivity (I)

	F	G	H	I
MEAN	5.71	7.03	4.66	6.94
SD	2.26	1.27	1.75	2.13

Table no 2 shows that the mean and SD value of Liveliness (F), Rule-consciousness (G), Social Boldness (H) and Sensitivity (I) were 5.71 ± 2.26, 7.03 ± 1.27, 4.66 ± 1.75 and 6.94 ± 2.13.

Table 3: Statistical Presentation of Vigilance (L), Abstractedness (M), Privateness (N), and Apprehension (O)

	L	**M**	**N**	**O**
MEAN	6.20	6.14	7.14	6.46
SD	2.04	1.78	1.68	1.84

Table no 3 shows that the mean and SD value of Vigilance (L), Abstractedness (M), Privateness (N), and Apprehension (O) were 6.20 ± 2.04, 6.14 ± 1.78, 7.14 ± 1.68 and 6.46 ± 1.84.

Table 4: Statistical Presentation of Openness to change (Q_1), Self-Reliance (Q_2), Perfections (Q_3) and Tension (Q_4)

	Q_1	**Q_2**	**Q_3**	**Q_4**
MEAN	5.80	6.06	7.49	5.77
SD	1.59	1.75	1.80	2.07

Table no 4 shows that the mean and SD value of Openness to change (Q_1), Self-Reliance (Q_2), Perfections (Q_3) and Tension (Q) were 5.80 ± 1.59, 6.06 ± 1.75, 7.49 ± 1.80 and 5.77 ± 2.07.

Table no 5: Mean value of 16 factors of personality of the female general students.

P.T	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
Mean	6.20	5.37	6.34	5.26	5.71	7.03	4.66	6.94	6.20	6.14	7.14	6.46	5.80	6.06	7.49	5.77

Table no 5 shows that the mean values of the 16 personality factors of the general female students. The 16 personality factors indicate 16 different mental predisposition of an individual. The raw score of each factor has been converted to Ten-score according to the norms. The value between 4.7 – 6.3 was indicated the average value of the traits. The value below 4.7 has been indicated the below average personality and the value more than 6.3 indicated the above average personality. In this study the five factors (Rule-consciousness (G), Sensitivity (I), Privateness (N), Apprehension (O) and Perfections (Q3)) were above average personality. One factor (Social Boldness (H)) was below average personality and ten factors were balance personality.

Mandal, S.; Das, H.; Chatterjee, S. (2016) conducted a study to know the psychological profile on West Bengal male Handball players and found that 11 factors (A,B,C,E,H,I,L,Q_1,Q_2,Q_3 & Q_4)out of 16 factors were balance personality and 5 factors (F,G,M,N & O) were above average personality.

In order to understand these personality scores in respect of the established norm, the graph of personality profile was drawn in below.

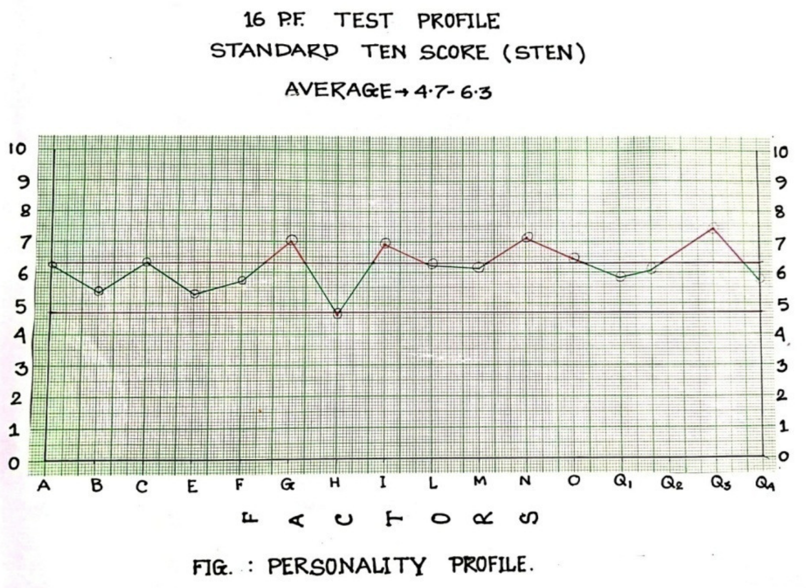

FIG: Graphical presentation of personality profile of general female students.

4. CONCLUSION

On the basis of finding and within the limitation of the present study following.

It was seen in the Graph-

1. There was one factor (Social Boldness (H)) was below average personality of general girls students.
2. There were five factors (Rule-consciousness (G), Sensitivity (I), Privateness (N), Apprehension (O) and Perfections (Q3)) were above average personality of general girls students.
3. Rest of ten factors (Reserved-Outgoing (A), Reasoning (B), Emotional stability (C), Dominance (E), Liveliness (F), Vigilance (L), Abstractedness (M), Openness to change (Q_1), Self-reliance (Q_2), and Tension (Q_4)) were balance personality of general girls students.

BIBLIOGRAPHY:

1. Allport G W (1937) Personality : A Psychology Interpretation, New York: Henry Holt and Co. Inc.
2. Bogardus, E S (1931) Fundamental of Social Psychology, New York: New York Countary.
3. Brown Francois J (1970) Educational Psychology, Tokyo Prentice Hall Inc., Charles E Turtle Co.
4. Kuppaswamy, B. (1971) Advanced Educational Psychology, New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd.
5. Lindquist E F (1970) Statistical Analysis In Educational Research, New Delhi: Wiley Easter Ltd.
6. Mandal, S.; Das, H.; Chatterjee, S. (2016) Physical motor and psychological profile of national level Handball players. ICSSR Sponsored International conference on scientific culture in physical education and sports. ISBN: 978-93-85446-45-0, Page no-756-759.
7. Mangal, S.K. (2015). Advanced educational psychology (2nd ed.). Delhi.

.8. Sorenson, Herbert (1977) Psychology in Education, New Delhi, Tata Mc Graw Hill Publishing .

9. Verma, J.P. (2009). *A text book on sports statistics*. Sports publication. New Delhi, India.

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে
www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 650/-